আল-হিদায়া

চতুর্থ খণ্ড

(হানাফী ফিকহের বিখ্যাত প্রামাণ্য গ্রন্থ)

শায়খুল ইসলাম
বুরহান উদ্দীন আল-মারগীনানী (র)

অনুবাদ

মাওলানা আবু তাহের মেসবাহ ও
মাওলানা ইসহাক ফরিদী

সম্পাদনা

সম্পাদনা পরিষদ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

আল-হিদায়া [চতুর্থ খণ্ড]
মূল : শায়খুল ইসলাম বুরহান উদ্দীন আল-মারগীনানী (র)
মাওলানা আবু তাহের মেসবাহ্ ও মাওলানা ইসহাক ফরিদী অনূদিত

অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা : ১৯১
ইফা প্রকাশনা : ২০২৯/১
ইফা গ্রন্থাগার : ৩৪০.৫৯
ISBN : 984-06-0634-4

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর ২০০১

দ্বিতীয় সংস্করণ
এপ্রিল ২০১৪
বৈশাখ ১৪২১
জুমাদা আছ ছানিয়া ১৪৩৫

মহাপরিচালক
সামীম মোহাম্মদ আফজাল

প্রকাশক
ড. আব্দুল্লাহ আল মা'রূফ
পরিচালক, অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫২৫

প্রচ্ছদ : জসিম উদ্দিন

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মোঃ মহিউদ্দীন চৌধুরী
প্রকল্প ব্যবস্থাপক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮১৮১৫৩৭

মূল্য: ৪২৫.০০ টাকা

AL-HIDAYA (4th Volume) (A Commentary on the Islamic Laws) : Written by Shaikhul Islam Burhan Uddin Abul Hassan Ali Ibn Abu Bakar Al-Fargani Al-Marghinani (Rh) in Arabic, translated into Bangla by Maulana Abu Taher Mesbah and Maulana Ishaque Faridi, edited by Editorial Board and published by Dr. Abdullah Al Maruf, Director, Department of Translation and Compilation, Islamic Foundation, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Phone : 8181525,
April 2014

E-mail : islamicfoundationbd@yahoo.com
Website : www. islamicfoundation.org.bd

Price : Tk 425.00 ; US Dollar : 18.00

সূচিপত্র

শিরোনাম পৃষ্ঠা

অধ্যায় ঃ শুফ'আ - ১৯

অধ্যায় ঃ বণ্টনের মাসাইল - ৬৩

অধ্যায় ঃ মুযারা'আত-বর্গা চাষ প্রসংগে-৯৫

অধ্যায় ঃ মুসাকাত-১০৯

অধ্যায় ঃ যবাহ এর মাসাইল-১১৭

শিরোনাম পৃষ্ঠা

শিরোনাম পৃষ্ঠা

অধ্যায় ঃ মা'আকিল বা দিয়ত-৪৯৫

অধ্যায় ঃ অসিয়ত-৫১১

অধ্যায় ঃ নপুংষক প্রসঙ্গ-৫৮৯

বিবিধ মাসআলা-৫৯৫

মহাপরিচালকের কথা

بسم الله الرحمن الرحيم

আল-হিদায়া হানাফী মাযহাবের একটি প্রসিদ্ধ ও জনপ্রিয় প্রামাণ্য ফিকাহ্ গ্রন্থ। এই গ্রন্থের প্রণেতা শায়খুল ইসলাম বুরহান উদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবনে আবূ বাকর ৫১১ হিজরী মোতাবেক ১১১৭ খ্রিস্টাব্দে আফগানিস্তানের মারগীনান শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ৫৯৩ হিজরী মোতাবেক ১১৯৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি ইন্তিকাল করেন।

অসাধারণ প্রতিভাধর এই আলেম ছিলেন একাধারে হাফেযুল কুরআন, মুফাস্সির, মুহাদ্দিস, ফকীহ্ এবং নীতিশাস্ত্রবিদ।

হিজরী ষষ্ঠ শতকে (দ্বাদশ খ্রিস্টাব্দ) রচিত এই গ্রন্থটির বিস্ময়কর জনপ্রিয়তা লেখকের গভীর পাণ্ডিত্য ও ফিকাহ্ শাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তির স্বাক্ষর বহণ করে। তাঁর সুদীর্ঘ ১৩ বছরের পরিশ্রমের ফসল এই 'আল-হিদায়া'ই তাঁকে বিশ্বের দরবারে অবিস্মরণীয় করে রেখেছে। তিনি তাঁর এই গ্রন্থটিতে অতি নিপুণভাবে সংক্ষিপ্ত বাক্যে গভীর ও ব্যাপক ভাব প্রকাশ করেছেন।

এতে তিনি ইসলামী আইনের বিভিন্ন ধারা ও উপধারায়, ক্ষেত্রবিশেষে অন্যান্য ইমামের মতামত দলিল-প্রমাণসহ উপস্থাপন করেছেন।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন এই মূল্যবান গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করে চার খণ্ডে প্রকাশ করেছে। এর চতুর্থ খণ্ডটি ২০০১ সালে প্রথম প্রকাশিত হয় এবং প্রকাশের স্বল্প সময়ের মধ্যে এর সকল কপি বিক্রি হয়ে যায়। ব্যাপক পাঠকচাহিদার প্রেক্ষিতে এবার গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো।

এ মূল্যবান গ্রন্থটির বিজ্ঞ অনুবাদক, সম্পাদক এবং গ্রন্থখানি প্রকাশনার ক্ষেত্রে যাঁরা সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আশা করি গ্রন্থটি আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ মাদরাসা শিক্ষার্থী ও দীনী ইলম চর্চাকারী এবং সর্বস্তরের পাঠকের জন্য অত্যন্ত সহায়ক হবে এবং পূর্বের মত পাঠকপ্রিয়তা লাভ করবে। আল্লাহ আমাদের এই প্রয়াসকে কবুল করুন। আমীন।

সামীম মোহাম্মদ আফজাল
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

প্রকাশকের কথা

بسمِ الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين

واله وصحبه أجمعين ·

আল-হিদায়া হানাফী মাযহাবের একটি নির্ভরযোগ্য ও প্রসিদ্ধ ফিকাহ্ গ্রন্থ। ইমাম বুরহান উদ্দীন আবুল হাসান আলী ইবনে আবূ বাকর (র) আল-ফারগানী আল-মারগীনানী কর্তৃক দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রণীত এই মহামূল্যবান গ্রন্থটি ইসলামী আইনের একটি মৌলিক গ্রন্থ হিসেবে মুসলিম বিশ্বে সমাদৃত হয়ে আসছে এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুসলিম আইনের ভাষ্য হিসেবে পঠিত হচ্ছে।

আমাদের জানামতে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় এ পর্যন্ত গ্রন্থটির ৩৬টি ভাষ্য, ৯টি টীকা ভাষ্য, ৫টি সার-সংক্ষেপ এবং ১৬টি পরিশিষ্ট রচিত হয়েছে। বৃটিশ শাসনামলে মুসলিম আইন প্রণয়ন এবং আইন শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে বাংলার তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংসের নির্দেশে জর্জ হ্যামিল্টন এ মূল্যবান গ্রন্থটি ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করেন।

বিশ্বের বহু ভাষায় গ্রন্থটির অনুবাদ প্রকাশিত হলেও বাংলা ভাষায় ইতিপূর্বে এর অনুবাদ প্রকাশিত হয়নি। এই অমূল্য জ্ঞানভাণ্ডার বাংলাভাষী পাঠকদের হাতে তুলে দেয়ার লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর অনুবাদ কার্যক্রম গ্রহণ করে। আল্লাহ্ তা'আলার অশেষ মেহেরবানীতে আমরা ইতোমধ্যে এর অনুবাদের কাজ সমাপ্ত করে চার খণ্ডে প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছি। চতুর্থ খণ্ডটি ২০০১ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রকাশের সাথে সাথে এর সকল কপি নিঃশেষ হয়ে যায়। ব্যাপক চাহিদার প্রেক্ষিতে এবার গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো।

গ্রন্থটির এই খণ্ডের অনুবাদক মাওলানা আবু তাহের মেসবাহ্ ও মাওলানা ইসহাক ফরিদী, সম্পাদনা পরিষদের সদস্য ড. আ.ফ.ম. আবু বকর সিদ্দীক অধ্যাপক আবদুল মালেক ও সাবেক পরিচালক জনাব মোহাম্মদ আব্দুর রব এবং প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে যাঁরা অবদান রেখেছেন, তাঁদের সকলের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। গ্রন্থটি নির্ভুলভাবে প্রকাশের প্রচেষ্টায় আমাদের কোন প্রকার ত্রুটি ছিল না, তবুও সম্মানিত পাঠকদের কাছে কোন ভুলত্রুটি ধরা পড়লে অনুগ্রহ করে আমাদের তা অবহিত করলে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে, ইনশাআল্লাহ্।

আশা করি, যুগ জিজ্ঞাসার জবাবে ইসলামী আইনশাস্ত্রের এই মূল্যবান গ্রন্থটি আমাদের প্রভূত সহায়ক হবে। আল্লাহ্ আমাদের এ প্রয়াসকে কবুল করুন, আমীন!

ড. আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ
পরিচালক, অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন

সম্পাদনা পরিষদ

ড. আ. ফ. ম. আবু বকর সিদ্দিক	সভাপতি
অধ্যাপক আবদুল মালেক	সদস্য
মোহাম্মদ আব্দুর রব	সদস্য সচিব

আল-হিদায়া

চতুর্থ (শেষ) খণ্ড

كِتَابُ الشُّفْعَةِ
অধ্যায় ঃ শুফ্‌'আ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الشُّفْعَةِ

অধ্যায় ঃ শুফ্‘আ

শুফ্‘আ (شُفْعَةٌ) শব্দটি শাফ্‘উন (شَفْعٌ) ধাতু হতে নির্গত। এর আভিধানিক অর্থ সংলগ্ন হওয়া, মিলিত হওয়া। একে শুফ্‘আ বলে এ জন্য নামকরণ করা হয়েছে যে, এতেও ক্রয়কৃত জমি শফী‘ (شَفِيْعٌ)-এর জমির সংলগ্ন হয়ে থাকে।[১]

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ বিক্রীত বস্তুর মূলে (نَفْسُ الْمَبِيْعِ) অংশীদার ব্যক্তির জন্য শুফ্‘আ সাব্যস্ত হবে। তারপর বিক্রীত বস্তুর হকের মধ্যে (حَقِّ الْمَبِيْعِ) যেমন পানির নালা ও রাস্তায় অংশীদার ব্যক্তির জন্য (শুফ্‘আ সাব্যস্ত হবে)। এরপর প্রতিবেশীর জন্য (শুফ্‘আ সাব্যস্ত হবে)।[২]

এই বাক্যের দ্বারা উল্লিখিত প্রত্যেক প্রকারের লোকদের জন্য শুফ্‘আর অধিকার সাব্যস্ত হওয়া প্রতীয়মান হয়। অনুরূপভাবে এর দ্বারা তাদের পর্যায়ক্রমে অধিকারী হওয়াও প্রতীয়মান হয়।

শুফ্‘আ সাব্যস্ত হওয়ার দলীল, রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ

اَلشُّفْعَةُ لِشَرِيْكٍ لَمْ يُقَاسَمْ - (مُسْلِم)

শুফ্‘আ এমন অংশীদার ব্যক্তির জন্য সাব্যস্ত হবে, যার অংশ বণ্টন করা হয়নি। (মুসলিম)

---

১. শরী‘আতের পরিভাষায় ক্রেতা যে পরিমাণ মূল্যের বিনিময়ে জমি অথবা বাড়ী ক্রয় করেছে, অংশীদার অথবা প্রতিবেশী হওয়ার ভিত্তিতে সে পরিমাণ মূল্যের বিনিময়ে উক্ত জমি অথবা বাড়ীর মালিক হওয়াকে শুফ্‘আ বলা হয়। হক্কে শুফ্‘আর অধিকারী ব্যক্তিকে শফী‘ (شَفِيْعٌ) বলা হয়।

২. শফী‘ তিন প্রকার। যথা ঃ (১) বিক্রীত মালের মূলে অংশীদার ব্যক্তি (شَرِيْكٌ فِىْ نَفْسِ الْمَبِيْعِ), (২) বিক্রীত মালের হকের মধ্যে অংশীদার ব্যক্তি (شَرِيْكٌ فِىْ حَقِّ الْمَبِيْعِ) ও (৩) প্রতিবেশী (جَارٌ)।

তিনি আরো বলেছেন ঃ

جَارُ الدَّارِ اَحَقُّ بِالدَّارِ وَالْاَرْضِ يُنْتَظَرُ لَهُ وَاِنْ كَانَ غَائِبًا اِذَا كَانَ طَرِيْقُهُمَا وَاحِدًا (ترمذى)

বাড়ীর প্রতিবেশী বাড়ী ও জমির অধিক হকদার। তার জন্য প্রতীক্ষা করা হবে; যদিও সে অনুপস্থিত থাকে; যদি তাদের উভয়ের রাস্তা এক হয়। (তিরমিযী)

তিনি আরো বলেছেন ঃ

اَلْجَارُ اَحَقُّ بِسَقَبِهٖ قِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَاسَقَبُهُ قَالَ شُفْعَتُهُ وَيُرْوٰى اَلْجَارُ اَحَقُّ بِشُفْعَتِهٖ - (بُخَارِىْ)

প্রতিবেশী তার সাকাব (سَقَبْ) এর ব্যাপারে অধিক হকদার। জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আল্লাহ্র রাসূল! প্রতিবেশীর সাকাব কি ? তিনি বললেন ঃ তার শুফ্‘আ। অপর বর্ণনায় আছে ঃ প্রতিবেশী তার শুফ্‘আর ব্যাপারে অধিক হকদার। (বুখারী)

ইমাম শাফিঈ (র) বলেন ঃ প্রতিবেশীর জন্য কোন শুফ্‘আ নেই। কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ

اَلشُّفْعَةُ فِيْمَا لَمْ يُقْسَمْ فَاِذَا وَقَعَتِ الْحُدُوْدُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ (بُخَارِىْ)

যে জমি বণ্টন করা হয়নি, তাতে শুফ্‘আ সাব্যস্ত হয়। কিন্তু যদি সীমা নির্ধারিত হয়ে যায় এবং রাস্তা অন্য দিক দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়, (অর্থাৎ প্রত্যেক অংশের জন্য আলাদা রাস্তা করে দেয়া হয়), তাহলে শুফ্‘আ সাব্যস্ত হবে না। (বুখারী) সর্বোপরি হক্কে শুফ্‘আ কিয়াস (যুক্তি) পরিপন্থী একটি বিষয়। কেননা, শুফ্‘আর দ্বারা অন্যের মালে তার সম্মতি ব্যতিরেকে মালিকানা অর্জন করা হয়; অথচ শরয়ী বিধান (হাদীস) অ-বণ্টিত সম্পদের ক্ষেত্রে বিবৃত হয়েছে।[১] আর প্রতিবেশী এই অর্থ (হাদীস-বিবৃত ক্ষেত্র)-এর অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা, মূল কথা এই যে, যে সম্পত্তি বণ্টন করা হয়নি, তাতে বণ্টনের ব্যয় নির্বাহ করতে হয়। পক্ষান্তরে ফরা‘ তথা বণ্টনকৃত সম্পত্তিতে এ ব্যয় নির্বাহ করার জটিলতা দেখা দেয় না। (সুতরাং প্রতিবেশী হক্কে শুফ্‘আর অধিকারী হবে না)।

আর আমাদের (হানাফীগণের) দলীল হলো, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীস, যা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। এছাড়া যৌক্তিক প্রমাণ, প্রতিবেশীর মালিকানা ক্রেতার মালিকানার সাথে চিরস্থায়ীভাবে সংযুক্ত থাকে। কাজেই আর্থিক বিনিময় পাওয়া গেলে প্রতিবেশীর জন্য হক্কে শুফ্‘আ সাব্যস্ত হবে; হাদীস-বিবৃত ক্ষেত্রের উপর কিয়াস অনুপাতে।[২] উক্ত হুকুম এজন্য যে, এ জাতীয় সংযুক্তি প্রতিবেশীর ক্ষতিকে

১. কাজেই যে সম্পত্তি এখনো বণ্টন করা হয়নি, তাতেই হক্কে শুফ্‘আ সাব্যস্ত হবে। কেননা উসূলে ফিক্হ এর সর্বজন স্বীকৃত নীতি হলো, কোন বিধান কিয়াস পরিপন্থী কোন নস (কুরআন বা সুন্নাহ) দ্বারা সাব্যস্ত হলে তা ঐ ক্ষেত্র পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে।

২. اَلْجَارُ اَحَقُّ بِشُفْعَتِهٖ–প্রতিবেশী তার শুফ্‘আর ব্যাপারে অধিক হকদার।

প্রতিহত করার জন্য শরী'আতে শুফ্'আর অধিকারী হওয়ার কারণ হিসাবে পরিগণিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কেননা, জানা মতে এটিই সমস্ত অনিষ্টের মূল। কাজেই শুফ্'আর দাবীকৃত সম্পত্তিতে (শফী'র) মালিকানা সাব্যস্ত করে এই ক্ষতির জড় উৎপাটিত করে দেওয়াই উত্তম। কেননা, শফী'কে তার পিতৃপুরুষের অংশ থেকে উচ্ছেদ করলে তার মারাত্মক ক্ষতি হবে। বস্তুত বণ্টনের ক্ষতি (বা ব্যয়ভার) শরী'আত কর্তৃক স্বীকৃত ও সমর্থিত। এটি শফী' ভিন্ন অপর ব্যক্তির ক্ষেত্রে ক্ষতির কারণ হিসাবে গণ্য হতে পারে না।[১]

আর ধারাবাহিকতা (অর্থাৎ উল্লেখিত তিন প্রকারের লোকদের পর্যায়ক্রমে শুফ্'আর অধিকারী হওয়া) রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তিনি ইরশাদ করেন ঃ

اَلشَّرِيْكُ اَحَقُّ مِنَ الْخَلِيْطِ وَالْخَلِيْطُ اَحَقُّ مِنَ الشَّفِيْعِ ‏.

শরীক ব্যক্তি খলীত ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক হকদার। আর খলীত ব্যক্তি শফী' অপেক্ষা অধিক হকদার।[২]

উক্ত হাদীসে শরীক বলতে মূল সম্পত্তিতে অংশীদার ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে, খলীত বলতে বিক্রীত সম্পত্তির হকের মধ্যে অংশীদার ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে। আর শফী' বলতে প্রতিবেশীকে বুঝানো হয়েছে। তাছাড়া বিক্রীত সম্পত্তির মূলে অংশীদারিত্বের কারণে যে সংযুক্তি রয়েছে; তা সর্বাধিক শক্তিশালী। কেননা, এই সংযুক্তি বিক্রীত বস্তুর প্রতিটি অংশে বিদ্যমান। এরপর বিক্রীত সম্পত্তির হকের মধ্যে অংশীদারীত্বের ভিত্তিতে যে সংযুক্তি থাকবে; তাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। কেননা, এই সংযুক্তি মালিকানা উপভোগে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে হয়ে থাকে। আর হুকমের কারণ শক্তিশালী হওয়ার ভিত্তিতেই মূলত: অগ্রাধিকার সাব্যস্ত হয়। স্মর্তব্য যে, বণ্টনের কষ্ট ও ব্যয় নির্বাহ যদিও শুফ্'আ লাভের কারণ হতে পারে না; কিন্তু তা অগ্রাধিকার দেওয়ার কারণ হতে পারে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ যে ব্যক্তি বিক্রীত সম্পত্তির মূলে অংশীদার, তার বর্তমানে রাস্তায় ও পানির নালায় অংশীদার ব্যক্তি প্রতিবেশীর জন্য শুফ্'আ সাব্যস্ত হবে না;

এর কারণ আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। কেননা, সে অগ্রগণ্য।

গ্রন্থকার বলেন ঃ যে ব্যক্তি বিক্রীত সম্পত্তির মূলে অংশীদার, সে যদি তার অধিকার ত্যাগ করে, তবে রাস্তার মধ্যে শরীক ব্যক্তির জন্য শুফ্'আ সাব্যস্ত হবে। যদি সে-ও তার অধিকার ত্যাগ করে; তবে প্রতিবেশী শুফ্'আ গ্রহণ করবে।

---

১. কাজেই বণ্টনের ক্ষতি, কষ্ট ও ব্যয় নির্বাহ শুফ্'আর অধিকারী হওয়ার কারণ হতে পারে না।

২. উপরোক্ত হাদীস সম্পর্কে হাদীস বিশ্লেষণকারীদের কেউ কেউ আপত্তি করেছেন। বস্তুত এটি একটি মুরসাল (مُرْسَل) রিওয়ায়েত। আর হাদীস বিশারদগণের মূলনীতি وَمَرَاسِيْلُ الثِّقَاتِ حُجَّةٌ عِنْدَنَا—অনুসারে এটি দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য। অধিকন্তু হাদীসটি ভিন্ন শব্দে মুসান্নাফে ইব্ন আবী শায়বা এবং মুসান্নাফে আবদুর রাযযাকেও বর্ণিত আছে।

কেননা, পর্যায়ক্রমিকতা আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। আর এই প্রতিবেশী বলতে সংযুক্ত ও সংলগ্ন প্রতিবেশীকে বুঝানো হয়েছে। আর সে হলো ঐ ব্যক্তি, যে শুফ্'আর দাবীকৃত বাড়ীর পেছনে বসবাস করে এবং তার বড়ীর দরজা অন্য গলিতে অবস্থিত।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র) এর মতে, যে ব্যক্তি বিক্রীত সম্পত্তির মূলে অংশীদার, তার বর্তমান থাকা অবস্থায় অপর কোন ব্যক্তি শুফ্'আর অধিকার হতে পারবে না। চাই সে শুফ্'আর অধিকার ত্যাগ করুক বা তা গ্রহণ করুক। কেননা তার বর্তমান থাকার কারণে অন্যরা শুফ্'আর অধিকার হতে বঞ্চিত হবে। (উল্লিখিত) যাহিরে রিওয়ায়েতের যুক্তি হলো ঃ শুফ্'আ সাব্যস্ত হওয়ার কারণ তাদের প্রত্যেকের মধ্যেই বিদ্যমান আছে। তবে মূল সম্পত্তিতে যে অংশীদার, তার জন্য অগ্রাধিকারের হক বিদ্যমান। তবে সে যখন তার দাবী ত্যাগ করবে তখন তার পরবর্তী ব্যক্তির (শুফ্'আর) অধিকার সাব্যস্ত হবে। উক্ত মাসআলা সুস্থ অবস্থায় গৃহীত ঋণের সাথে অসুস্থ অবস্থায় গৃহীত ঋণের মত।[১]

আর বিক্রীত সম্পত্তির মূলে যারা অংশীদার হয়, এ জাতীয় ব্যক্তি কখনো সম্পত্তিতে আংশিকভাবেও অংশীদার হয়ে থাকে। যেমন কোন ব্যক্তি বাড়ীর নির্দিষ্ট কোন ঘর কিংবা নির্দিষ্ট কোন দেওয়ালের অংশীদার। তাহলে এই ব্যক্তি ঐ ঘরের প্রতিবেশীর উপর অগ্রাধিকার প্রাপ্ত হবে। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি বাড়ীর অবশিষ্টাংশে অংশীদার, সেও প্রতিবেশীর উপর অগ্রাধিকার প্রাপ্ত হবে। এটি ইমাম আবু ইউসুফ (র) হতে বর্ণিত দুই রিওয়ায়েতের মধ্যে বিশুদ্ধতর রিওয়ায়েত। কেননা, তার সংযুক্তি প্রতিবেশীর তুলনায় অধিক শক্তিশালী। আর বাড়ীও একটিই। আর, (যে নালা ও রাস্তার ভিত্তিতে শুফ্'আ সাব্যস্ত হয়, সে) রাস্তা ও নালা খাস হওয়া আবশ্যক। তবেই এর অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে শুফ্'আর অধিকার প্রাপ্ত হওয়া যাবে। খাস বা বিশেষ রাস্তা বলতে এমন রাস্তাকে বুঝায়, যা সর্বসাধারণের চলার জন্য উন্মুক্ত নয়। আর বিশেষ নালা বলতে ঐ নালাকে বুঝায়, যাতে নৌযান চলাচল করে না। আর যে নালায় নৌযান চলাচল করে, তা হচ্ছে সাধারণ নালা। এটা ইমাম আবু হানীফা এবং ইমাম মুহাম্মদ (র) এর অভিমত।

পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর মতে বিশেষ খাল বলতে ঐ খালকে বুঝায়, যার পানি দ্বারা দুই বা তিনটি বাগানে সেচ করা যায়। আর যদি (সে খালের পানি দ্বারা) তিনের অধিক বাগান সেচ করা যায়, তবে তা সাধারণ খাল বলে গণ্য হবে।

---

১. যেমন এক ব্যক্তি সুস্থ অবস্থায় কারো থেকে কিছু টাকা ঋণ নিয়েছে। তারপর সে অসুস্থ হয়ে অপর এক ব্যক্তির নিকট থেকেও আবার কিছু টাকা ঋণ নিয়েছে। ইত্যবসরে ঋণ পরিশোধ না করেই সে মারা গেল। তাহলে মৃত ব্যক্তির পরিত্যাজ্য সম্পত্তি থেকে প্রথমে প্রথমোক্ত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ করা হবে। তার ঋণ পরিশোধ করার পর যদি টাকা বেঁচে যায়, তবে শেষোক্ত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ হবে। যদি প্রথমোক্ত ব্যক্তি তার পাওনা মাফ করে দেয় তাহলে তার বর্তমান থাকা অবস্থায়ই শেষোক্ত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ করা হবে। শুফ'আর মাসআলাও ঠিক তদ্রূপই। অর্থাৎ উপরোক্ত তিন প্রকারের প্রত্যেকের মধ্যেই শুফ্'আর অধিকারী হওয়ার কারণ বিদ্যমান আছে। তবে বিক্রীত সম্পত্তির মূলে যে অংশীদার, তার মধ্যে অগ্রাধিকার হক বিদ্যমান আছে। সে তার দাবী ত্যাগ করলে অন্যরা পর্যায়ক্রমে এর হকদার হবে।

সর্বসাধারণের চলাচলের জন্য উন্মুক্ত নয় এমন একটি গলি (খাল) থেকে যদি অনুরূপ একটি গলি (পথ) বের হয়ে লম্বালম্বিভাবে সামনের দিকে চলে যায় এবং নিম্নাংশে কোন বাড়ী বিক্রি হয়, তবে এ অংশের বাসিন্দাদের জন্য শুফ্'আ সাব্যস্ত হবে। কিন্তু (এ ক্ষেত্রে রাস্তার) উপরিভাগের লোকেরা শুফ্'আ পাবে না। আর যদি রাস্তার উপরিভাগে কোন বাড়ী বিক্রি হয়, তবে গলির উভয় দিকের লোকদের জন্যই শুফ্'আ সাব্যস্ত হবে। এর কারণ পূর্বে আমরা 'আদাবুল কাযী' অধ্যায়ে উল্লেখ করেছি।

একটি ছোট খাল থেকে যদি অপেক্ষাকৃত আরো একটি ছোট খাল প্রবাহিত হয়, তবে রাস্তার ক্ষেত্রে পূর্বে আমরা যে বিধান বর্ণনা করেছি, তা এ ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন ঃ কোন ব্যক্তির খেজুর গাছের ডাল অন্যের দেওয়ালের উপর থাকলে এতে সে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে শফী' বলে গণ্য হবে না। কিন্তু সে প্রতিবেশী হিসাবে শফী' হতে পারবে। কেননা (অংশীদারীত্বের ভিত্তিতে শফী' হওয়ার) ইল্লাত হলো, সম্পত্তিতে অংশীদার হওয়া। শুধুমাত্র খেজুর গাছের ডাল অন্যের দেওয়ালের উপর রাখার দ্বারা কেউ ঐ বাড়ীর অংশীদার হয় না। অবশ্য এতে সে ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী বলে গণ্য হবে।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন ঃ ঘরের দেওয়ালের উপর রক্ষিত লাকড়ীতে যে ব্যক্তি শরীক, সে প্রতিবেশী হিসাবে গণ্য হবে। এর কারণ আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ (একই সম্পত্তিতে) কয়েকজন শফী' শুফ্'আর দাবী করলে শুফ্'আ তাদের মধ্যে তাদের সংখ্যানুপাতে (সমান-সমান হারে) বণ্টন করা হবে। এ ক্ষেত্রে মালিকানার পার্থক্য ধর্তব্য হবে না।[১]

ইমাম শাফিঈ (র) বলেন ঃ তাদের অংশ অনুপাতে শুফ'আ বণ্টন করা হবে। কেননা, শুফ্'আ মূলত: মালিকানারই লাভ বিশেষ। উল্লেখ্য যে, মালিকানার লাভের পূর্ণতা বিধানের জন্যই মূলত: (শরী'আতে) শুফ্'আর অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। কাজেই শুফ্'আর বিষয়টি মুনাফা, উৎপন্ন শষ্য, সন্তান এবং ফল-ফলাদির মতই হলো।[২]

---

১. শফী'গণের অংশ কম-হোক বা বেশী হোক, এতে তাদের প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কোন তারতম্য হবে না।

২. যেমন এক ব্যক্তি দশ টাকা এবং অপর ব্যক্তি পাঁচ টাকা মূলধন নিয়ে ব্যবসা শুরু করল এবং এর দ্বারা কোন মাল খরীদ করল। তারপর তারা এ মাল বিক্রি করে তিন টাকা লাভ করল। এ অবস্থায় লভ্যাংশ থেকে দশ টাকার মালিক পাবে দুই টাকা, আর পাঁচ টাকার মালিক পাবে এক টাকা। অনুরূপভাবে যদি দুই ব্যক্তি কোন জমির মালিক হয় এবং তাদের এক জনের হয় ২/৩, আর দ্বিতীয় জনের হয় ১/৩ অংশ। এ অবস্থায় এ জমির উৎপাদিত ফসল তিন ভাগে ভাগ করা হবে। ২/৩ অংশের মালিক পাবে দুই ভাগ, আর ১/৩ অংশের মা-লিক পাবে এক ভাগ। অনুরূপভাবে যদি দুই ব্যক্তি মিলে একজনে দশ এবং অপরজনে পাঁচ এই পনের টাকা দিয়ে কোন বাঁদী খরীদ করে; তারপর তাকে কারো বিবাহে সমর্পণ করে এবং তার থেকে কোন সন্তান পয়দা হয়, তবে এ সন্তান তাদের উভয়ের গোলাম হিসাবে গণ্য হবে। তারা যদি একে ত্রিশ টাকায় বিক্রি করে, তবে দশ টাকার মালিক পাবে বিশ টাকা এবং পাঁচ টাকার মালিক পাবে দশ টাকা। এমনিভাবে যদি দুই ব্যক্তি যৌথ মূলধন বিনিয়োগ করে কোন বাগান খরিদ করে, তারপর এর থেকে ফল-ফলাদি উৎপন্ন হয়; তাহলে এ উৎপন্ন ফল তাদের মধ্যে তাদের মূলধনের অংশ অনুপাতে বণ্টিত হবে। শুফ'আর বিষয়টিও ঠিক তদ্রূপই।

আমাদের (হানাফীগণের) দলীল হলো ঃ শফী'গণ সকলেই শুফ্'আর অধিকারী হওয়ার সাবাব (سَبَبٌ) এর ক্ষেত্রে সমান। আর সে সাবাব বা কারণ হলো ঃ সম্পত্তিতে পরস্পরের সম্পৃক্ততা। কাজেই শুফ্'আর হকদার হওয়ার ক্ষেত্রে শফী'গণ সকলেই সমান হবে।

এ কথা তো সঠিক যে, যদি একাধিক শফী'র থেকে শুধুমাত্র একজন শুফ্'আর দাবী করে, তবে এই ব্যক্তিই পূর্ণ শুফ্'আর হকদার হবে। এটাই এ কথার দলীল যে, তাদের প্রত্যেকের মধ্যে শুফ্'আর অধিকারী হওয়ার কারণ পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান আছে। সম্পৃক্ততার আধিক্য দ্বারা কারণের আধিক্য বুঝা যায়। তবে অগ্রাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় দলীলের বলিষ্ঠতার দ্বারা, দলীলের আধিক্যের দ্বারা নয়। এখানে এক শফী'র মুকাবিলায় অন্য শফী'র আত্মপ্রকাশের ফলে দলীলের মধ্যে বলিষ্ঠতা হাসিল হয়নি। আর শফী' অন্যের মালিকানাভুক্ত কিছুর মালিক হলে একে তার মালিকানার ফল হিসাবে গণ্য করা হবে না। পক্ষান্তরে ফল-ফলাদি এবং এর অনুরূপ বস্তুর বিষয়টি হচ্ছে শুফ্'আর (বিষয়) থেকে ব্যতিক্রম।

যদি শফী'গণের কেউ তার অংশ ছেড়ে দেয়, তাহলে অবশিষ্ট লোকদের জন্য পূর্ণ শুফ্'আ তাদের সংখ্যানুপাতে সাব্যস্ত হবে। কেননা শফী'গণের প্রতিদ্বন্দ্বিতা (অর্থাৎ একাধিক হওয়া) এর কারণে তাদের মধ্যে শুফ্'আর সাবাব পূর্ণাঙ্গভাবে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তারা অংশ কম পেয়েছে। এখন সে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শেষ হয়ে গেছে।[১]

যদি শফী'গণের কেউ অনুপস্থিত থাকে, তবে উপস্থিতগণের মধ্যে তাদের সংখ্যানুপাতে শুফ্'আর ফায়সালা দেওয়া হবে। কেননা অনুপস্থিত ব্যক্তি হয়তো আর শুফ্'আর দাবী করবে না।

যদি উপস্থিত ব্যক্তির ব্যাপারে পূর্ণ শুফ্'আর ফয়সালা দেওয়ার পর অপর ব্যক্তি হাজির হয় (এবং শুফ্'আর দাবী করে), তবে তার জন্যও অর্ধেক শুফ্'আর ফয়সালা দেওয়া হবে। যদি তৃতীয় ব্যক্তি হাযির হয় (এবং শুফ্'আর দাবী করে) তাহলে (শফী'গণের মধ্যে) সমতা বিধানের উদ্দেশ্যে প্রথম দুইজনের হাতে যা আছে, তা থেকে তৃতীয় ব্যক্তি এক তৃতীয়াংশ পাবে। উপস্থিত শফী'কে সমস্ত শুফ্'আ প্রদান করার পর সে যদি তা ছেড়ে দেয়, তবে পরে আগমনকারী শফী' অর্ধেকের বেশী পাবে না। কেননা বিচারক কর্তৃক উপস্থিত ব্যক্তির জন্য পূর্ণ শুফ্'আর রায় দেওয়াতে অনুপস্থিত ব্যক্তি হতে তার অর্ধেক হক কর্তিত হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে যদি উক্ত ব্যক্তি বিচারকের রায়ের পূর্বে আসে, তবে হুকুম এর বিপরীত হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ বেচা-কেনা সংঘটিত হওয়ার দ্বারা শুফ্'আ সাব্যস্ত **হয়।** এর অর্থ হলো ঃ বেচা-কেনা সংঘটিত হওয়ার পর। মূলত: বেচা-কেনা শুফ্'আর কারণ নয়। বরং শুফ্'আর কারণ হলো সংযুক্তি—যা আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। এর কারণ এই যে, বিক্রেতা তার বাড়ীর মালিকানা হতে অনীহা প্রকাশ করলেই শুফ্'আ

১. কাজেই অবশিষ্ট শফী'গণ পূর্ণ শুফ্'আরই হকদার হবে।

সাব্যস্ত হয়। আর বিক্রয় এই অনীহার পরিচায়ক। এ কারণেই বিক্রেতার ক্ষেত্রে বিক্রয় প্রমাণিত হওয়াই শুফ্'আ সাব্যস্ত হওয়ার জন্য যথেষ্ট। কাজেই বিক্রেতা যখন তার বিক্রয়ের কথা স্বীকার করবে; তখন শফী' তার শুফ্'আ নিয়ে নিতে পারবে। যদিও ক্রেতা তা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ তলবে ইশহাদ বা সাক্ষী গ্রহণ দ্বারা শুফ্'আ প্রতিষ্ঠিত হয়।[১] **এ ক্ষেত্রে তলবে মুওয়াছাবাত অর্থাৎ তাৎক্ষণিক দাবীও আবশ্যক।** কেননা, শুফ্'আ একটি দুর্বল অধিকার। তা উপেক্ষার দ্বারা বাতিল হয়ে যায়। কাজেই সাক্ষ্য গ্রহণ এবং তাৎক্ষণিক দাবী আবশ্যক। এর দ্বারা শুফ্'আর মালে শফী'র আগ্রহ আছে বলে জানা যাবে। এই মালে তার অনিচ্ছা প্রতীয়মান হবে না। তাছাড়া শফী' ব্যক্তি বিচারকের আদালতে তার দাবী প্রমাণ করার মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। আর এটি সাক্ষী গ্রহণ ব্যতিরেকে সম্ভব নয়।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ শফী' যে সম্পত্তিতে শুফ্'আর দাবী করেছে, ক্রেতা যদি তা ছেড়ে দেয় এবং সে তা গ্রহণ করে নেয় অথবা এ সম্বন্ধে বিচারক ফয়সালা দেওয়ার পর সে (শফী') যদি তা নিয়ে নেয়, তবে সে এর মালিক হয়ে যাবে।

কেননা, ক্রেতার মালিকানা পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। কাজেই পারস্পরিক সম্মতি অথবা বিচারকের ফয়সালা ব্যতীত এই মালিকানা শফী'র নিকট স্থানান্তরিত হবে না। যেমন হিবা প্রত্যর্পণ করলে (উভয়ের সম্মতি অথবা বিচারকের ফয়সালা ব্যতীত) মালিকানা প্রত্যাবর্তিত হয় না। এর ফায়দা নিম্নোক্ত মাসআলায় প্রকাশ পাবে। যেমন উভয় প্রকার দাবীর[২] পর শফী' মরে গেল অথবা যে বাড়ীর মালিকানার ভিত্তিতে শুফ্'আর দাবী করা হয়েছিল, তা বিক্রি করা হলো অথবা বিচারকের রায়ের আগে বা প্রতিপক্ষ বাড়ীটি ছেড়ে দেওয়ার পূর্বে শুফ্'আর বাড়ীর পাশের বাড়ীটি বিক্রি করে দেওয়া হলো, তাহলে প্রথম অবস্থায় শুফ্'আর মধ্যে উত্তরাধিকার আইন প্রযোজ্য হবে না। দ্বিতীয় অবস্থায় সে শুফ্'আর হকদারই হবে না। কেননা, তার মালিকানা শেষ হয়ে গেছে। কুদূরী গ্রন্থকারের অভিমত ঃ "বেচা-কেনা সংঘটিত হওয়ার পর শুফ্'আ ওয়াজিব হবে"— এতে এ কথা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য যে, আর্থিক বিনিময় পাওয়ার সময় শুফ্'আ সাব্যস্ত হবে। এ ব্যাপারে আমরা পরে আলোচনা করবো-ইনশাআল্লাহ্। সঠিক সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে আল্লাহ্ই সর্বাধিক জ্ঞাত।

---

১. তলব কাকে বলে, তা কত প্রকার ও কি কি, এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পরবর্তী পরিচ্ছেদে করা হবে।

২. তলবে ইশহাদ (সাক্ষী গ্রহণ) ও তলবে মুওয়াছাবাত (তাৎক্ষণিক দাবী)।

শুফ্'আর দাবী করা এবং এ ব্যাপারে আরজি পেশ করার মাসাইল

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ শফী' যখন (শুফ্'আর দাবীকৃত সম্পত্তি) বিক্রয়ের সংবাদ পাবে; তখন সে ঐ বৈঠকেই তার দাবীর পক্ষে সাক্ষী কায়েম করবে। স্মর্তব্য যে, দাবী তিন প্রকার ঃ

(১) তল্‌বে মুওয়াছাবাত (طَلَبُ الْمُوَاثَبَةِ) অর্থাৎ (শুফ্'আর দাবীকৃত সম্পত্তি) বিক্রয়ের সংবাদ শুনামাত্র শুফ্'আর দাবী উত্থাপন করা। সুতরাং শফী'র নিকট বিক্রয়ের সংবাদ পৌছামাত্র শুফ্'আর দাবী না করলে তার শুফ্'আর অধিকার বাতিল হয়ে যাবে। এর কারণ আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। অধিকন্তু এ সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ اَلشُّفْعَةُ لِمَنْ وَاثَبَهَا —যে তাৎক্ষণিকভাবে শুফ্'আর দাবী করলো, শুফ্'আ তার জন্যই। যদি পত্রের মাধ্যমে সম্পত্তি বিক্রয়ের সংবাদ দেওয়া হয় এবং পত্রের প্রথম ভাগে অথবা মধ্যভাগে শুফ্'আর কথা থাকে; এ অবস্থায় যদি পত্রটি শেষ পর্যন্ত পাঠ করা হয়, (শুফ্'আর কথা পাঠ করা মাত্র শুফ্'আর দাবী না করা হয়); তাহলে শফী'র শুফ্'আর অধিকার বাতিল হয়ে যাবে। অধিকাংশ শায়খ এ মত পোষণ করেন। এটি ইমাম মুহাম্মদ (র) এর একটি অভিমতও বটে। অন্য এক রিওয়ায়েতে ইমাম মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, অবগতি মজলিস শেষ হওয়া অবধি তার শুফ্'আ দাবী করার অধিকার থাকবে। এই দুইটি বর্ণনা ইমাম মুহাম্মদ (র) এর নাওয়াদির (نَوَادِرُ) রিওয়ায়েতের মধ্যে উল্লেখ রয়েছে। দ্বিতীয় বর্ণনাটি ইমাম কারখী (র) গ্রহণ করেছেন। কেননা, এই ব্যক্তির জন্য যেহেতু মালিক হওয়ার ইখতিয়ার রয়েছে, তাই তাকে চিন্তা-ভাবনা করার জন্য অবশ্যই সময় দিতে হবে। যেমন অধিকারপ্রাপ্তা নারীর ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।[১]

শফী'র নিকট সম্পত্তি বিক্রয়ের সংবাদ পৌছার পর সে যদি আল্‌হামদু লিল্লাহ্; (اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ) লা-হাওলা ওয়ালাকুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ (لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ) বা সুব্‌হানাল্লাহ (سُبْحَانَ اللّٰهِ) বলে, তাহলে তার শুফ্'আ বাতিল হবে না। কেননা, প্রথম বাক্যটি প্রতিবেশীর অত্যাচার থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার উপর আল্লাহর প্রশংসা করা বুঝায়। দ্বিতীয় বাক্যটি বিক্রেতা কর্তৃক শফী'কে ক্ষতি করার ইচ্ছা করার উপর তার

১. অধিকারপ্রাপ্তা (مُخَيَّرَةٌ) নারী ঐ মহিলাকে বলা হয়, যাকে তার স্বামী 'اَمْرِيْ بِيَدِكِ' বা এর অনুরূপ বাক্য দ্বারা তালাকের অধিকার দিয়েছে। তার এ অধিকার মজলিস শেষ হওয়া অবধি বাকী থাকবে। সে যদি মজলিস থেকে উঠে যাওয়ার আগে নিজের প্রতি তালাক প্রয়োগ করে, তবে তার উপর তালাক প্রযোজ্য হবে। কিন্তু যদি মজলিস পরিবর্তন হয়ে যায়, তবে ইখতিয়ার বাতিল হয়ে যাবে। শুফ্'আর বিষয়টি ঠিক এরূপই

পক্ষ হতে বিস্ময় প্রকাশ করা বুঝায়। আর তৃতীয় বাক্যটি শফী'র কথার সূচনা করা বুঝায়। উপরোক্ত বাক্য তিনটির কোনটিই শুফ্'আ গ্রহণে অনিচ্ছা বুঝায় না। (কাজেই এ জাতীয় কথা বলাতে শুফ্'আর অধিকার বাতিল হবে না।)

অনুরূপভাবে বিক্রয়ের সংবাদ শুনে শফী' যদি বলে ঃ কে খরিদ করেছে; কত টাকার বিনিময়ে বিক্রি করা হয়েছে ? (তবে এতেও শুফ্'আর অধিকার বাতিল হবে না।) কেননা, শফী' একমূল্য দ্বারা শুফ্'আ গ্রহণে আগ্রহী হবে, কিন্তু অন্য মূল্য দ্বারাও শুফ্'আ গ্রহণে আগ্রহী হবে না। এমনিভাবে একজনের প্রতিবেশী হতে অনিচ্ছা প্রকাশ করবে, কিন্তু অন্যজনের প্রতিবেশী হতে অস্বীকার করবে না।

ইমাম কুদূরীর (র) বক্তব্য ঃ اَشْهَدَ فِىْ مَجْلِسِهٖ ذٰلِكَ عَلَى الْمُطَالَبَةِ—"তখন শফী' ঐ বৈঠকেই তার দাবীর পক্ষে সাক্ষী কায়েম করবে"-এর উদ্দেশ্য হলো; 'তলবে মুওয়াছাবাত' অর্থাৎ তাৎক্ষণিকভাবে শুফ্'আর দাবী করা। এ ক্ষেত্রে কাউকে সাক্ষী বানানো অপরিহার্য নয়। সাক্ষী তো বানাতে হয় (প্রতিপক্ষের) অস্বীকৃতি প্রতিহত করার জন্য। 'ঐ বৈঠকেই' বলে ইমাম কারখী (র) এর গৃহীত অভিমতটির প্রতি ইংগিত করা হয়েছে।

শুফ্'আর দাবী বুঝা যায় এমন সব ধরনের শব্দ দ্বারা শুফ্'আ দাবী করা সহীহ। যেমন কেউ বললো ঃ আমি শুফ্'আর দাবী করছি অথবা আমি শুফ্'আর দাবীদার। কেননা, এখানে অর্থই বিবেচ্য বিষয়।

ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে শফী'র নিকট বাড়ী বিক্রি করার সংবাদ পৌঁছার পর পরই সাক্ষী কায়েম করা তার উপর আবশ্যক নয়। অবশ্য যদি দু'জন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা অথবা একজন ন্যায়পরায়ণ বিশ্বস্ত ব্যক্তি তাকে এ সম্বন্ধে খবর দেয়, (তখনই সাক্ষী কায়েম করা তার উপর জরুরী।)

সাহেবাইনের মতে ঃ এক ব্যক্তি তাকে সম্পত্তি বিক্রয়ের সংবাদ দিলেই কাউকে সাক্ষী বানানো তার জন্য আবশ্যক। চাই সংবাদাতা আযাদ হোক বা ক্রীতদাস, বালক হোক বা মহিলা, যদি খবর সত্য হয়।

মূল মতভেদ প্রতিনিধি বরখাস্ত করার মাসআলার মধ্যে হয়েছে।[১] পূর্বে আমরা তা দলীল-প্রমাণসহ উল্লেখ করেছি।

---

১. অর্থাৎ ইমাম আবু হানীফা (র) ও সাহেবাইনের মধ্যকার মূল মত-পার্থক্য হয়েছিল উকীল (প্রতিনিধি)—বরখাস্ত করার মাসআলার মধ্যে। সে মত-পার্থক্য হলো এই যে, যদি উকীলকে তার দায়িত্ব থেকে বরখাস্ত করার খবর দেওয়া হয়, তবে এ বরখাস্ত কার্যকরী হওয়ার জন্য ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে নিসাবে শাহাদাত বা আদালত হলো অপরিহার্য। কিন্তু সাহেবাইনের মতে একজনের সংবাদই যথেষ্ট। শুফ্'আর ক্ষেত্রেও অনুরূপ মত-পার্থক্য বিদ্যমান। অর্থাৎ যদি শফী'কে সম্পত্তি বিক্রির সংবাদ দেওয়া হয় এবং সংবাদ দাতাদের মধ্যে নিসাবে শাহাদাত বা আদালত পাওয়া যায়, তবেই কাউকে সাক্ষী মনোনীত করা ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে অপরিহার্য। কিন্তু সাহেবাইনের মতে কোন এক ব্যক্তির পক্ষ হতেও যদি এ সংবাদ পাওয়া যায়, তবুও সাক্ষী কায়েম করা শফী'র উপর অপরিহার্য। তাদের মতে এ ক্ষেত্রে নিসাবে শাহাদাত বা আদালত অপরিহার্য নয়।

ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, এ মাসআলাটি ইখতিয়ারপ্রাপ্তা মাসআলার বিপরীত অর্থাৎ যদি ইখতিয়ার প্রাপ্তা মহিলাকে সংবাদ দেওয়া হয়।[১] কেননা ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে কোন হুকুমকে আবশ্যিক করা হয় না। আর ইহা ঐ মাসআলারও বিপরীত, যখন তাকে (শফী'কে) ক্রেতা নিজে সংবাদ দেয়।[২] কেননা, এক্ষেত্রে ক্রেতা তার বিবাদী। আর বিবাদীর (বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হওয়ার) ক্ষেত্রে আদালত (বিশ্বস্ততা ও ন্যায়পরায়ণতা) ধর্তব্য নয়।

(২) আর দ্বিতীয় প্রকার দাবী হচ্ছে ঃ তলবুত তাকরীর ওয়াল ইশহাদ (طَلَبُ التَّقْرِيْرِ وَالْاِشْهَادِ)। অর্থাৎ শুফ্'আ সাব্যস্ত করা এবং সাক্ষী নিয়োগ করা। কেননা, শুফ্'আপ্রার্থী বিচারকের নিকট নিজ দাবী প্রমাণ করার জন্য এর মুখাপেক্ষী এ আলোচনার ভিত্তিতে, যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। আর বাহ্যত: শুফ্'আ প্রার্থীর পক্ষে তলবে মুওয়াছাবাতের পরপরই সাক্ষী নিয়োগ সম্ভব নয়। কেননা, এই দাবী তো বিক্রয়ের সংবাদ জ্ঞাত হওয়ার সাথে সাথেই করতে হয়। তাই এর পরই সে সাক্ষী কায়েম করা এবং শুফ্'আ সাব্যস্ত করার মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে।[৩] এর বিবরণ কুদূরী গ্রন্থকার (নিম্নোক্ত বক্তব্যে) বলেছেন ঃ

তারপর সে (শফী') এখান থেকে (অর্থাৎ মজলিস থেকে) উঠবে এবং বিক্রেতার নিকট সাক্ষী কায়েম করবে, যদি বিক্রীত বস্তু বিক্রেতার আয়ত্বে থাকে। (এর অর্থ হলো ঃ যদি বিক্রেতা বিক্রীত বস্তু ক্রেতার নিকট সমর্পণ না করে।) অথবা ক্রেতার নিকট কিংবা যমীনের নিকট সাক্ষী কায়েম করবে। এরূপ করলে তার শুফ্'আর দাবী সাব্যস্ত হয়ে যাবে। এর কারণ এই যে, এ ব্যাপারে তাদের (ক্রেতা ও বিক্রেতা) প্রত্যেকেই শফী'র প্রতিপক্ষ বা বিবাদী। কেননা, প্রথম ব্যক্তির (বিক্রেতার) রয়েছে দখল। আর দ্বিতীয় ব্যক্তির রয়েছে মালিকানা। অনুরূপভাবে বিক্রীত বস্তুর নিকট সাক্ষী সায়েম করাও সহীহ হবে। কেননা, শুফ্'আর হক এর সাথেই সংশ্লিষ্ট। সুতরাং বিক্রেতা যদি বিক্রীত বস্তু (ক্রেতাকে) সমর্পণ করে দেয়, তাহলে তার নিকট সাক্ষী কায়েম করা সঠিক হবে না। কেননা, এ অবস্থায় সে আর প্রতিপক্ষ থাকে না। কারণ তার দখলও নেই এবং মালিকানাও নেই। এ অবস্থায় সে একজন অপরিচিত ব্যক্তি হিসাবে গণ্য হবে।

শুফ্'আ সাব্যস্ত করা এবং সাক্ষী কায়েম করার দাবীর নিয়ম হলো এই যে, সে (শফী' সাক্ষীগণকে) বলবে ঃ "অমুক ব্যক্তি এই বাড়ীটি ক্রয় করেছে, আমি এর শফী"। (প্রথমেই) আমি শুফ্'আর দাবী করেছিলাম এবং এখনও আমি এর দাবী করছি। তোমরা এ ব্যাপারে সাক্ষী থাক।

---

১. অর্থাৎ এ মর্মে সংবাদ দেওয়া হয় যে, তার স্বামী তাকে তালাক গ্রহণের ইখতিয়ার দিয়েছে। এ অবস্থায় ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে সংবাদ পৌঁছা মাত্রই সে উক্ত অধিকার প্রয়োগ বা প্রত্যাখ্যান করতে পারবে।

২. এ অবস্থায়ও ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে নিসাবে শাহাদাত ও আদালত শর্ত নয়। তাই সংবাদ পাওয়া মাত্রই সে শুফ্'আ প্রার্থী হওয়ার স্বপক্ষে সাক্ষী নিয়োগ করবে।

৩. কাজেই এই দ্বিতীয় প্রকারের দাবী তাৎক্ষণিক দাবীর পরই হতে হবে।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) হতে বর্ণিত আছে; তাঁর মতে বিক্রীত বস্তুর নামকরণ এবং এর সীমা নির্ধারণ করে দেওয়াই শর্ত। কেননা নির্ধারিত বস্তুর ক্ষেত্রেই কেবল দাবী হয়ে থাকে।

(৩) তৃতীয় প্রকার দাবী হলো ঃ তলবুল খুসূমাতি ওয়াত্ তামাল্লুক (طَلَبُ الْخُصُوْمَةِ وَالتَّمَلُّكِ)। অর্থাৎ প্রতিপক্ষ হওয়ার এবং মালিকানার দাবী করা। পরবর্তীতে অতিসত্বরই আমরা এর ধরন ও নিয়ম-নীতি সম্বন্ধে আলোচনা করব-ইন্‌শাআল্লাহ্।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ এই দাবী বিলম্বের কারণে শুফ্'আ রহিত হবে না।

এটা ইমাম আবু হানীফা (র) এর মত। আর এটি ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর একটি রিওয়ায়েতও বটে।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন ঃ যদি শফী' সাক্ষী কায়েম করার পর এক মাস পর্যন্ত 'তল্‌বে খুসূমাত' তথা প্রতিপক্ষ হওয়ার দাবী বর্জন করে, তাহলে শুফ্'আ বাতিল হয়ে যাবে। এটি ইমাম যুফার (র) এরও অভিমত।

এর মর্ম হলো ঃ যদি বিনা কারণে তলবে খুসূমাত না করে (তবে শুফ্'আ বাতিল হবে।)

ইমাম আবু ইউসুফ (র) হতে বর্ণিত আছে; যদি শফী' বিচারকের অধিবেশন সমূহ থেকে কোন এক অধিবেশনে প্রতিপক্ষ হওয়ার এবং মালিকানার দাবী ছেড়ে দেয়, তবে তার শুফ্'আ বাতিল হয়ে যাবে। কারণ বিচারকের অধিবেশনগুলোর কোন এক অধিবেশন যদি অতিক্রান্ত হয়ে যায় এবং এর মধ্যে শফী' স্বেচ্ছায় দাবী উত্থাপন না করে, তাহলে এতে তার অনিচ্ছা ও হক ছেড়ে দেওয়া প্রমাণিত হয়।

ইমাম মুহাম্মদ (র) এর বক্তব্যের যুক্তি হলো ঃ যদি তলবে খুসূমতের বিলম্বের কারণে শুফ্'আ কখনো রহিত না হয়, তাহলে এতে ক্রেতার ক্ষতি হবে। কেননা, যেহেতু এই লেন-দেন শফী'র পক্ষ হতে ভেঙ্গে দেওয়ার আশংকা রয়েছে, তাই এতে (এ অবস্থায়) কোন হস্তক্ষেপ করা ক্রেতার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই আমরা একে এক মাসের সাথে সংশ্লিষ্ট করে দিয়েছি। কেননা, এক মাস সময় দীর্ঘ মেয়াদী হিসাবে গণ্য হয়। আর এক মাসের কম সময় স্বল্প মেয়াদী সময় হিসাবে গণ্য হয়; যেমন কসম অধ্যায়ে তা আলোচিত হয়েছে।

ইমাম আবু হানীফা (র) এর বক্তব্য, যা যাহিরী মাযহাব এবং যার উপর ফাতওয়া, সে বক্তব্যের যুক্তি হলো ঃ কোন হক সাব্যস্ত ও প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তা রহিত না করলে, তা (হক) রহিত হবে না। আর এ রহিতকরণ হবে শফী'র মুখ দ্বারা স্পষ্ট ভাষায়, যেমন অন্য সকল হকের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

ইমাম মুহাম্মদ (র) কর্তৃক বর্ণিত ক্রেতার ক্ষতির কথার উপর জটিল প্রশ্ন হয়; যদি শফী' ব্যক্তি অনুপস্থিত থাকে; ক্রেতা চাই উপস্থিত থাকুক বা সফরে থাকুক, তাতে (মাসআলায়) কোন পার্থক্য নেই। যদি শফী' জানতে পারে যে, শহরে কোন বিচারক নেই, এ অবস্থায় (শুফ্'আর দাবীতে) সে বিলম্ব করলে সর্বসম্মতিক্রমে তার শুফ্'আর দাবী বাতিল হবে না। কেননা, শফী'র পক্ষে বিচারক ব্যতীত অন্য কারো নিকট মুকাদ্দমা পেশ করা সম্ভব নয়। কাজেই এটা ওযর হিসাবে গণ্য হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ শফী' যখন শুফ্'আর দাবীতে বিচারকের নিকট উপস্থিত হয় এবং শুফ্'আর দাবীকৃত জমি বিক্রয়ের কথা জানায় এবং শুফ্'আর দাবী করে, তখন বিচারক বিবাদীকে জিজ্ঞাসা করবেন, সে যদি ঐ জমিনে শফী'র মালিকানা স্বীকার করে, যার দ্বারা শফী' তার শুফ্'আর দাবী করছে (তবে তো তা ভাল), নতুবা বিচারক তাকে (শফী'কে) প্রমাণ পেশ করার জন্য বাধ্য করবেন।

কেননা, দখল একটি বাহ্যিক বিষয়, যার মধ্যে বিভিন্ন সম্ভাবনা রয়েছে । কাজেই এ দখল অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়।

গ্রন্থকার বলেন ঃ বিচারক বিবাদী (ক্রেতা) এর দিকে মনোনিবেশ করার পূর্বে বাদীকে (শফী'কে) বাড়ীর অবস্থান, সীমানা ইত্যাদি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। কেননা, শফী' এই বাড়ীতে তার হকের ব্যাপারে দাবী করেছে। কাজেই এ দাবী এমন হলো যে, সে মূল বাড়ীর দাবী করল। শফী' এসব বিষয়ের বিবরণ পেশ করলে বিচারক তাকে তার শুফ্'আ দাবী করার কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। কেননা, শুফ্'আর বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে। তখন শফী' যদি বলে, বিক্রীত বাড়ীর সাথে সংলগ্ন আমার একটি বাড়ীর মালিকানার ভিত্তিতে এখন আমি এর শফী', তাহলে ইমাম খাস্সাফ (র)-এর মতে তার দাবী পূর্ণ হয়ে যাবে। 'ফাতাওয়া' গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, যে বাড়ীর মালিকানার ভিত্তিতে শুফ্'আর দাবী করা হচ্ছে, সে বাড়ীর সীমানা বর্ণনা করাও আবশ্যক। 'তাজনীস' ও 'মাযীদ' নামক গ্রন্থে আমি এ সম্পর্কে আলোচনা করেছি।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ শফী' যদি প্রমাণ পেশ করতে অক্ষম হয়, তবে বিচারক ক্রেতা থেকে 'হলফ' গ্রহণ করবেন। (এর শব্দ হবে এরূপ যে,) **আল্লাহর শপথ! সে জানেনা যে, শফী' যে জমি দ্বারা শুফ্'আর কথা উল্লেখ করছে, সে এর মালিক।** এর অর্থ হলো–শফী'র দাবীর প্রেক্ষিতে ক্রেতাকে শপথ করাতে হবে। কেননা, সে (শফী') তার নিকট এমন বস্তুর দাবী করেছে, যদি সে (ক্রেতা) তা স্বীকার করে তাহলে তা প্রদান করা তার উপর অপরিহার্য হবে। যেহেতু তাকে অন্যের দখলী জিনিষের উপর হলফ দেওয়া হয়েছে, তাই তাকে তার জানার উপরই শপথ করতে হবে।

এরপর ক্রেতা যদি শপথ করতে অস্বীকার করে, অথবা শফী'র পক্ষ হতে যদি প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, তাহলে যে বাড়ীর (মালিকানার) ভিত্তিতে শুফ্'আর দাবী করা হচ্ছে, তাতে তার মালিকানা সাব্যস্ত হয়ে যাবে এবং তার প্রতিবেশী হওয়াও সাব্যস্ত হয়ে যাবে। তারপর বিচারক তাকে (বিবাদী ক্রেতাকে) জিজ্ঞাসা করবেন ঃ সে কি তা খরীদ করেছে, না করেনি ? যদি সে খরীদ করার বিষয়টিকে অস্বীকার করে, তখন শফী'কে বলা হবে; তুমি প্রমাণ পেশ কর। কেননা বেচা-কেনা সাব্যস্ত হওয়ার পরই শুফ্'আ ওয়াজিব হয়। আর বেচা-কেনা সাব্যস্ত হয় দলীল-প্রমাণ দ্বারা।[১]

---

১. কাজেই হয় ক্রেতা বেচা-কেনার ব্যাপারে স্বীকারোক্তি করবে অথবা শফী' এ ব্যাপারে প্রমাণ পেশ করবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ আর যদি শফী' প্রমাণ পেশ করতে অক্ষম হয়, তাহলে বিচারক ক্রেতা থেকে হলফ গ্রহণ করবেন এ মর্মে যে, আল্লাহ্র শপথ! সে এ বাড়ী খরীদ করেনি, অথবা আল্লাহ্র শপথ! সে যে কারণ উল্লেখপূর্বক এই বাড়ীর শুফ্'আ দাবী করছে, এর ভিত্তিতে সে এ বাড়ীর শুফ'আর হকদার হতে পারে না। এটি (শপথটি) হচ্ছে হাসিল (শুফ্'আর সাবাব অর্জিত) হওয়ার উপর শপথ; আর প্রথমটি হচ্ছে সাবাবের উপর শপথ। এ সম্পর্কে দাওয়া (দাবী) অধ্যায়ে আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি এবং আল্লাহ্র দেওয়া তাওফীকের ভিত্তিতে সেখানে আমরা ইমামগণের মতানৈক্যের বিষয়টিও উল্লেখ করেছি। (দ্বিতীয় অবস্থায়) বিচারক ক্রেতার নিকট থেকে অকাট্যভাবে এজন্য শপথ নিবেন যে, এই শপথ হচ্ছে মূলত: ক্রেতার নিজের কাজের উপর এবং তার হস্তগতকৃত সম্পত্তির উপর। আর এ জাতীয় ক্ষেত্রে অকাট্যভাবেই শপথ গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ শুফ্'আর ব্যাপারে (আদালতে) মুকাদ্দমা দায়ের করা জাইয, যদিও শফী' বিচারকের ইজলাসে শুফ্'আ দাবীকৃত বস্তুর মূল্য উপস্থিত না করে। অবশ্য বিচারক যখন শুফ্'আর ব্যাপারে ফয়সালা প্রদান করবেন তখন মূল্য উপস্থিত করা শফী'র জন্য অপরিহার্য হয়ে যাবে। এটিই আসল তথা 'মাবসূত' গ্রন্থের যাহিরী বিওয়ায়েত।

ইমাম মুহাম্মদ (র) হতে বর্ণিত আছে যে, শফী' মূল্য হাযির না করা পর্যন্ত বিচারক শুফ্'আর ব্যাপারে ফয়সালা দিবেন না। এটি ইমাম আবু হানীফা (র) হতে ইমাম হাসান (র) এর বর্ণনা। কেননা শফী' দরিদ্রও হতে পারে। কাজেই মূল্য হাযির করা পর্যন্ত শুফ্'আর ফয়সালা মওকূফ থাকবে; যাতে ক্রেতার মাল নষ্ট না হয়। যাহেরী রিওয়ায়েতের যুক্তি হলো এই যে, শুফ্'আর ফয়সালা দেওয়ার আগে মূল্য আদায় করা শফী'র উপর অপরিহার্য নয়। এ কারণেই (ফয়সালা দেওয়ার আগে ক্রেতাকে) মূল্য সমর্পণ করা শফী'র উপর শর্ত নয়। তদ্রূপ (এ অবস্থায়) মূল্য উপস্থিত করাও শর্ত করা যাবে না।

তারপর বিচারক যখন শফী'র পক্ষে বাড়ীটির ফয়সালা দিবেন, তখন ক্রেতা বাড়ীটি (সমর্পণ না করে) আটকিয়েও রাখতে পারবে, যতক্ষণ না সে এর মূল্য পূরাপূরি বুঝে পাবে।

ইমাম মুহাম্মদ (র) এর মতেও বিচারকের ফয়সালা কার্যকর হবে। কেননা, এটি একটি ইজ্তিহাদী মাসআলা। এবং তার (শফী'র) উপরও মূল্য আদায় করা ওয়াজিব হবে। কাজেই ক্রেতা তা আটকিয়ে রাখতে পারবে। বিচারক "শফীকে মূল্য পরিশোধ করে দাও" বলার পরও সে (শফী') যদি মূল্য পরিশোধ করতে বিলম্ব করে; তবে এতে তার শুফ্'আ বাতিল হবে না। কেননা, বিচারকের আদালতে মুকাদ্দমা দায়ের করার দ্বারা শুফ্'আর বিষয়টি মযবূত ও দৃঢ় হয়ে গিয়েছে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ শফী' যদি বিক্রেতাকে (বিচারকের আদালতে) হাযির করে এবং বিক্রীত বস্তুও বিক্রেতার দখলে থাকে, তাহলে শফী' বিক্রেতার বিরুদ্ধে শুফ্'আর ব্যাপারে আর্জি পেশ করতে পারবে। কেননা বিক্রীত বস্তু বিক্রেতার অধিকারে রয়েছে এবং এই অধিকার প্রতিষ্ঠিত অধিকার। এ ক্ষেত্রে ক্রেতা উপস্থিত না হলে বিচারক শফী'র সাক্ষী-প্রমাণ শুনবেন না। ক্রেতা উপস্থিত হওয়ার পর বিচারক তার উপস্থিতিতে বেচা-কেনা বাতিল করে দেবেন এবং বিক্রেতার উপর শফী'র জন্য শুফ্'আর রায় দিয়ে দেবেন। আর দায়-দায়িত্ব তার (বিক্রেতার) উপরই অর্পণ করবেন।[১] কেননা, মালিকানা হচ্ছে ক্রেতার এবং দখল হচ্ছে বিক্রেতার। আর বিচারক যেহেতু উভয়টির (মালিকানা ও দখল) ক্ষেত্রেই শফী'র পক্ষে ফয়সালা দিয়ে থাকেন, তাই তাদের উভয়ের উপস্থিতি আবশ্যক। পক্ষান্তরে যদি বাড়ীটি (ক্রেতার) হস্তগত হয়ে যায় এ অবস্থায় বিক্রেতার উপস্থিতি ধর্তব্য হবে না। কেননা এখন সে অপরিচিত হয়ে গেছে। কারণ তার দখল ও মালিকানা এখন আর কিছুই অবশিষ্ট নেই।

"এরপর বিচারক তার (ক্রেতার) উপস্থিতিতে বেচা-কেনা বাতিল করে দিবেন।" ইমাম কুদূরীর (র) এ বক্তব্য দ্বারা অন্য একটি কারণের দিকে ইশারা করা হয়েছে। আর তা হলো ঃ ক্রেতার পক্ষে বেচা-কেনা ভঙ্গ করলে তার উপস্থিতি একান্ত অপরিহার্য, যাতে তার উপর বেচা-কেনা ভঙ্গ করার ফয়সালা দেওয়া যায়। আর উল্লেখিত বিক্রি ভঙ্গের রূপ এই যে, এই ভঙ্গ হবে ক্রেতার অধিকারের সম্পর্কের ব্যাপারে। কেননা, শুফ্'আ গ্রহণ করায় ক্রেতার দখল এখানে নিষিদ্ধ। আর এই নিষিদ্ধ হওয়াই বেচা-কেনা ভঙ্গ করাকে অনিবার্য করে। তবে এক্ষেত্রে মূল বেচা-কেনা বাকী থেকে যাবে। কারণ এ অবস্থায় বেচা-কেনা ভঙ্গ করা সম্ভব নয়। কেননা এর উপরই শুফ্'আর বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত। তবে ক্রয়-বিক্রয়ের বিষয়টি ক্রেতা থেকে শফী'র প্রতি স্থানান্তর হয়ে যাবে এবং সে এমন হয়ে যাবে, যেন সে-ই (বিক্রেতার নিকট হতে) ক্রেতা। এ কারণেই সমস্ত দায়-দায়িত্বের বিষয়ে সে বিক্রেতার প্রতি রুজু করবে। পক্ষান্তরে ক্রেতা যদি বিক্রীত বস্তু দখল করে নেয় এবং শফী' তার হাত (দখল) থেকে ঐ সম্পত্তি গ্রহণ করে; তখন সমস্ত দায়-দায়িত্ব ক্রেতার উপর বর্তাবে। কেননা, সম্পত্তি হস্তগত করার কারণে তার মালিকানা পূর্ণ হয়ে গেছে। প্রথম অবস্থায় ক্রেতার দখল অসম্ভব এবং এ অবস্থা ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ করাকে অপরিহার্য করে। আল্লাহ্‌র তাওফীকে 'কিফায়াতুল মুনতাহী' গ্রন্থে এ সম্পর্কে আমি দীর্ঘ আলোচনা করেছি।

ইমাম কুদূরী (র) **বলেন ঃ কেউ অন্যের জন্য বাড়ী খরীদ করলে** সেই ব্যক্তি **শফী'র বিবাদী বলে গণ্য হবে।** কেননা, সে-ই আকদ সম্পাদনকারী। আর শুফ্'আর ভিত্তিতে সম্পত্তি গ্রহণ করা আকদের অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই শফী' 'আকদ সম্পাদনকারীর কাছে যাবে।

---

১. অর্থাৎ যদি এই সম্পত্তির কোন মালিক বের হয়ে আসে তাহলে বিক্রেতাকেই এই মূল্যের জরিমানা ও দায়-দায়িত্ব বহন করতে হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ কিন্তু উকীল (প্রতিনিধি) যদি বাড়ীটি তার মুআক্কেলের নিকট সমর্পণ করে দেয় (তখন সে আর বিবাদী হবে না।) কেননা, এখন আর তার কোন দখল ও মালিকানা অবশিষ্ট নেই। এ অবস্থায় (উকীল নিযুক্তকারী) মুআক্কিলই মূল বিবাদী হবে। এর কারণ এই যে, এ অবস্থায় উকীল মুআক্কিলের পক্ষ হতে বিক্রেতার ন্যায় হয়ে গেছে। সুতরাং উকীলের মুআক্কিলের নিকট সম্পত্তি সমর্পণ করা; বিক্রেতার ক্রেতার নিকট সমর্পণ করার মতই। কাজেই তার (মুআক্কিলের) সাথেই বিবাদ হবে। তবে এতদসত্ত্বেও উকীল যেহেতু মুআক্কিলের স্থলাভিষিক্ত, তাই মুআক্কিলের নিকট বিক্রীত বস্তু সমর্পণের পূর্বে, বিবাদে শুধু উকীলের উপস্থিতিই যথেষ্ট বলে বিবেচিত হবে। অনুরূপভাবে বিক্রেতা যদি অনুপস্থিত ব্যক্তির উকীল হয়, আর এ অবস্থায় বিক্রীত বস্তু যদি তার তত্ত্বাবধানে থাকে, তবে শফী' তার থেকেই ঐ বস্তুটি নিয়ে নিবে। কেননা, সেই আকদ সম্পাদনকারী। তদ্রূপ, যে সব বস্তু অসী (অসিয়ত বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি) এর জন্য বেচা-কেনা করা জাইয, সে সব বস্তুর ক্ষেত্রে বিক্রেতা যদি কোন মৃত ব্যক্তির অসী হয় হাহলে এ ক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম প্রযোজ্য হবে। এর কারণ আমরা উল্লেখ করেছি।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ যদি কোন বাড়ীর ব্যাপারে শফী'র পক্ষে ফয়সালা দেওয়া হয়, অথচ সে এখনও তা দেখেনি, তাহলে তার খিয়ারে রুয়াত থাকবে।[১] দেখার পর সে যদি তাতে কোন ত্রুটি দেখতে পায়, তবে সে তা ফেরৎ দিয়ে দিতে পারবে। যদিও ক্রেতা বাড়ীটি নিখুঁত হওয়ার শর্ত করে থাকুক না কেন। কেননা শুফ্'আর মাধ্যমে কিছু গ্রহণ করা খরীদ করার মতই। লক্ষণীয় যে, এখানেও মালের বিনিময়ে মাল গ্রহণ করা হয়। কাজেই এতেও (শুফ্'আতেও) উভয় প্রকার ইখতিয়ার সাব্যস্ত হবে, যেমন ক্রয়ের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। ক্রেতার পক্ষ হতে ত্রুটি মুক্তির শর্ত করায় শফী'র খিয়ারে রুয়াত রহিত হবে না। কেননা ক্রেতা শফী'র পক্ষ হতে প্রতিনিধি নয়। কাজেই ক্রেতা শফী'র পক্ষ হতে খিয়ার রহিত করার অধিকারী হবে না।

পরিচ্ছেদ ঃ শফী' ও ক্রেতা এবং ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে মতানৈক্য হওয়া সম্পর্কিত মাসাইল

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ যদি মূল্যের পরিমাণ নিয়ে শফী' ও ক্রেতার মধ্যে মতপার্থক্য হয়, তাহলে ক্রেতার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা, শফী' কম মূল্য পরিশোধ করে শুফ্'আর দাবীকৃত বাড়ীটির অধিকার লাভ করার চেষ্টা করছে। অথচ ক্রেতা তা অস্বীকার করছে। আর অস্বীকারকারী ব্যক্তির কথাই গ্রহণযোগ্য হয় শপথের সাথে। কিন্তু তারা উভয়ে শপথ করবে না। কেননা, শফী' যদিও বাড়ীর অধিকার

---

১ কোন বস্তু না দেখে খরীদ করার পর ক্রেতা যখন তা দেখে, তখন তার ইখতিয়ার হাসিল হয়। ইচ্ছা করলে তা রাখতে পারে; আবার ফেরৎও দিয়ে দিতে পারে। এ জাতীয় ইখতিয়ারকে শরী'আতে 'খিয়ারে রুয়াত' বলে।

লাভের দাবী করছে, কিন্তু ক্রেতা (শফী'র নিকট) কোন কিছুর দাবী করছে না। কারণ শফী'র ইখতিয়ার রয়েছে, ইচ্ছা করলে সে শুফ্'আ গ্রহণ করতে পারে, আবার ইচ্ছা করলে তা ছেড়েও দিতে পারে। আর এ ক্ষেত্রে কোন নস্ অর্থাৎ কুরআন-হাদীস ভিত্তিক কোন দলীল নেই। কাজেই শফী' ও ক্রেতা তারা উভয়ে শপথ করবে না।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ যদি তারা (শফী' ও ক্রেতা) উভয়ে সাক্ষী-প্রমাণ পেশ করে, তাহলে শফী'র সাক্ষ্য-প্রমাণই গ্রহণযোগ্য হবে। এটি ইমাম আবু হানীফা এবং ইমাম মুহাম্মদ (র) এর অভিমত।

পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন ঃ ক্রেতার সাক্ষ্য-প্রমাণই গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা, তার সাক্ষ্য-প্রমাণেই অধিক মূল্যের দাবী প্রমাণিত হচ্ছে।[১] কাজেই এটি (উক্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ) বিক্রেতা, উকীল এবং শত্রুর নিকট হতে খরীদকারী ব্যক্তির সাক্ষ্য-প্রমাণের মত হয়ে গেল।

ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র) এর দলীল এই যে, ক্রেতা ও শফী'র সাক্ষ্য-প্রমাণে কোন বিরোধ নেই। কাজেই ধরে নিতে হবে যে, এখানে দুটি বেচা-কেনা হয়েছে। আর শফী' ইচ্ছা করলে উভয় বেচা-কেনার যে কোন একটির দ্বারা শুফ্'আ গ্রহণ করতে পারবে। শফী'র এ মাসআলা ক্রেতার সাথে বিক্রেতার মাসআলার পরিপন্থী। কেননা ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে দু'টি আকদ একের পর এক জমা হতে পারে না। অবশ্য প্রথম বেচা-কেনা ভঙ্গ করলে হতে পারে। আর এখানে শফী'র বেলায় এ ভঙ্গকরণ (এর কোন প্রতিক্রিয়া) প্রকাশ হবে না। কেননা, বেচা-কেনা ভঙ্গ হয় ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে; শফী' তো তৃতীয় ব্যক্তি।

উকীলের সাক্ষ্য-প্রমাণের ক্ষেত্রেও মাসআলা এরূপই। কেননা, উকীল বিক্রেতার ন্যায় এবং মুআক্কিল হলো ক্রেতার ন্যায়। এটি কেমন করে হতে পারে।[২] অথচ ইমাম মুহাম্মদ (র) এর বর্ণনা মতে উকীলের সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণযোগ্য নয়। আর শত্রু হতে ক্রয়কারী ব্যক্তির বেলায় আমরা বলব যে, 'সিয়ারে কাবীর' গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে ঃ পুরাতন মালিকের সাক্ষ্যই সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণযোগ্য হবে। কাজেই আমরা এ কথা বলতে পারি যে, আমরা এটিকে স্বীকার করি না। আর যদি স্বীকার করেও নেই; তাহলে আমরা বলব যে, ঐখানে দ্বিতীয় বেচা-কেনা সহীহ হবে না, প্রথমটি ভঙ্গ না করা পর্যন্ত। আর এখানকার বিষয়টি এর থেকে ভিন্নতর। অধিকন্তু শফী'র দলীল-প্রমাণ হলো مُلْزِمَةٌ (অপরিহার্যকারী) কিন্তু ক্রেতার দলীল-প্রমাণ مُلْزِمَةٌ নয়।[৩] আর দলীল-প্রমাণ পেশ করাই হলো কোন কিছুকে অপরিহার্য করার জন্য।

---

১. কেননা, ক্রেতা অধিক মূল্যের দাবী করছে। আর শফী' কম মূল্যের দাবী করছে। আর مُثْبِتْ زَائِدْ -ই যেহেতু গ্রহণযোগ্য হয় তাই ক্রেতার কথা গ্রহণযোগ্য হবে।

২. ক্রেতার সাক্ষ্য-প্রমাণকে উকীলের সাক্ষ্য-প্রমাণের উপর কিয়াস করা।

৩. কেননা শফী'র সাক্ষী-প্রমাণ যদি গ্রহণযোগ্য হয়, তাহলে ক্রেতার বাড়ী শফী'কে সমর্পণ করা এবং ক্রেতাকে এর বিনিময় ফেরৎ দেওয়া অপরিহার্য হবে। পক্ষান্তরে যদি ক্রেতার সাক্ষী গ্রহণ করা হয়, তবে শফী'র উপর কোন কিছু অপরিহার্য হবে না। উপরে এ কথাই বলা হয়েছে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ ক্রেতা যদি (অধিক) মূল্য দাবী করে এবং বিক্রেতা দাবী করে তার থেকে কম; অথচ বিক্রেতা এখন পর্যন্ত মূল্য হস্তগত করেনি, তাহলে বিক্রেতার কথা মত মূল্য পরিশোধ করে শফী' তা (বাড়ীটি) নিয়ে নেবে। এ ক্ষেত্রে অবশিষ্ট মূল্য ক্রেতার উপর থেকে কমিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে গণ্য করা হবে।

উপরোক্ত হুকুম এ কারণে যে, লেন-দেন যদি বিক্রেতার কথা অনুপাতে হয়ে থাকে, তাহলে তো এর বিনিময়েই শুফ্'আ সাব্যস্ত হবে। আর যদি ক্রেতার কথা অনুপাতে হয়ে থাকে, তাহলে (এ কথা ধরে নিতে হবে যে,) বিক্রেতা মূল্যের কিছু পরিমাণ হ্রাস করে দিয়েছে। এ হ্রাসকরণ শফী'র ক্ষেত্রেও প্রকাশ পাবে ঐ কারণে, যা আমরা পরে বর্ণনা করবো-ইনশাআল্লাহ্। অধিকন্তু বেচা-কেনার প্রস্তাবনার কারণে শফী' বিক্রেতার উপর শুফ্'আর দাবীকৃত বাড়ীর মালিক হয়েছে। কাজেই মূল্যের পরিমাণের ক্ষেত্রে বিক্রেতার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে; যতক্ষণ পর্যন্ত বিক্রেতার দাবী বাকী থাকবে। সুতরাং শফী' তার (বিক্রেতার) কথা মতই শুফ'আ গ্রহণ করবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ যদি বিক্রেতা অধিক মূল্যের দাবী করে, তবে তারা (ক্রেতা-বিক্রেতা) উভয়েই হলফ করবে, (যদি তাদের পক্ষে কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ না থাকে) এবং তারা পরস্পর একজনে অপর জনের দাবী খণ্ডন করবে। তাদের কোন একজন শপথ করতে অস্বীকার করলে, এতে এ কথা প্রতীয়মান হবে যে, অপরজন যে মূল্যের কথা বলছে, তাই ঠিক। সুতরাং শফী' এই মূল্য পরিশোধ করেই শুফ্'আ গ্রহণ করবে। আর যদি উভয়েই শপথ করে, তবে বিচারক বিধিমত ক্রয়-বিক্রয় বাতিল করে দেবেন। এ অবস্থায় শফী' বিক্রেতার কথা অনুপাতে মূল্য দিয়ে ঐ বাড়ীটি গ্রহণ করবে। কেননা, বেচা-কেনা বাতিল করে দেওয়া শফী'র হক বাতিল হওয়াকে অপরিহার্য করে না।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ আর বিক্রেতা যদি মূল্য হস্তগত করে থাকে এবং শফী' যদি শুফ্'আ গ্রহণ করতে চায়, তাহলে সে ক্রেতার কথামত মূল্য দিয়ে তা গ্রহণ করবে। এক্ষেত্রে সে বিক্রেতার কথার প্রতি কর্ণপাত করবে না। কেননা, বিক্রেতা তার মালের পূর্ণ-মূল্য উসূল করে নিয়েছে, তাই আক্দের হুকুমও পূর্ণ হয়ে গেছে এবং সেও ক্রয়-বিক্রয়ের আকদের মধ্য হতে বের হয়ে গেছে। এ অবস্থায় সে একজন অপরিচিতের ন্যায় হয়ে গেছে। কাজেই এখন মতভেদ রয়ে গেল শুধু ক্রেতা ও শফী'র মধ্যে। এ কথাটি আমরা পূর্বেই বর্ণনা করেছি। যদি মূল্য পরিশোধ করার বিষয়টি স্পষ্ট না হয়; এ অবস্থায় বিক্রেতা বলে ঃ আমি এ বাড়ীটি এক হাজার টাকায় বিক্রি করেছি এবং মূল্যও হস্তগত করে নিয়েছি, তাহলে শফী' তা এক হাজার টাকার বিনিময়ে নিয়ে নেবে। কেননা, সে (বিক্রেতা) যখন বেচা-কেনার স্বীকারোক্তির দ্বারা কথা-বার্তা আরম্ভ করেছে, তখন এর সাথে শুফ্'আর বিষয়টি সম্পর্কিত হয়ে পড়েছে। এরপর তার বক্তব্যঃ 'আমি মূল্য হস্তগত করেছি'-এর দ্বারা সে নিজ থেকে শুফ্'আর হক রহিত করতে চায়। সুতরাং এই বক্তব্য তার উপর প্রত্যাখ্যাত হবে। আর যদি সে বলে

ঃ আমি মূল্য হস্তগত করেছি এবং তা হচ্ছে এক হাজার টাকা; তবে তার এ কথার প্রতি কোন কর্ণপাত করা হবে না। কেননা, বিক্রেতা তার প্রথম কথার দ্বারা অর্থাৎ মূল্য হস্তগত করার স্বীকারোক্তির দ্বারা আক্‌দের মাঝ থেকে বের হয়ে গেছে এবং মূল্যের পরিমাণের ব্যাপারে তার কথার গ্রহণযোগ্যতা রহিত হয়ে গেছে।

পরিচ্ছেদ ঃ যে জিনিষ দ্বারা শুফ্‌'আর দাবীকৃত সম্পত্তি গ্রহণ করা যায়

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ বিক্রেতা যদি (বিক্রীত মালের) কিছু মূল্য ক্রেতা হতে কমিয়ে দেয়, তবে এই পরিমাণ মূল্য শফী'র উপর থেকেও রহিত হয়ে যাবে। আর যদি বিক্রেতা পূর্ণ মূল্য রহিত করে দেয়, তবে তা শফী'র থেকে রহিত হবে না। কেননা, মূল্যের কিছু অংশ রহিত করলে তা মূল আক্‌দের সাথে সম্পর্কিত হয় এবং তা (রহিতকরণ) শফী'র ক্ষেত্রেও প্রকাশ হবে। কেননা, রহিত করার পর যা থাকে, তা-ই প্রকৃত মূল্য। অনুরূপভাবে মূল্যের বিনিময়ে শফী' ঐ বাড়ীটি নিয়ে নেওয়ার পর, বিক্রেতা যদি মূল্য হ্রাস করে দেয়, তাহলে শফী' থেকেও এই পরিমাণ মূল্য হ্রাস হয়ে যাবে। অবশেষে শফী' ক্রেতার নিকট থেকে এই পরিমাণ টাকা ফেরৎ নিয়ে নেবে। কিন্তু পূর্ণ মূল্য ছেড়ে দিলে এর হুকুম হবে বিপরীত। কেননা, এ হ্রাসকরণ কখনো মূল আকদের সাথে সম্পর্কিত হবে না। এ সম্পর্কে বেচা-কেনা অধ্যায়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

আর যদি ক্রেতা ব্যক্তি বিক্রেতার জন্য মূল্য বাড়িয়ে দেয়, তবে এ বর্ধিতকরণ শফী'র ক্ষেত্রে অপরিহার্য হবে না। কেননা, যদি অতিরিক্ত মূল্যের বিষয়টি ধরা হয়, তবে এতে শফী'র ক্ষতি হয়। কেননা, সে তো এর থেকে কম মূল্যেই তা হাসিল করার হকদার। কিন্তু মূল্য হ্রাস করার বিষয়টি এর থেকে ব্যতিক্রম। কেননা, এতে (হ্রাস করাতে) তার উপকার রয়েছে। মূল্য বর্ধিত করার উদাহরণ হলো ঃ প্রথমে কোন বস্তু মূল্যে ক্রয়-বিক্রয় করা হয়েছে, পরে তা আবার এর থেকে অধিক মূল্যে ক্রয়-বিক্রয় করা হয়েছে, এ ক্ষেত্রে শফী'র উপর এ অতিরিক্ত মূল্য প্রদান আবশ্যিক হবে না। কাজেই শফী'র জন্য প্রথম মূল্যে ঐ বস্তুটি গ্রহণ করা জাইয। এর কারণ আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। এখানকার মাসআলাটিও ঠিক তদ্রূপ।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ কোন ব্যক্তি একটি বাড়ী আসবাবপত্রের বিনিময়ে ক্রয় করলে শফী' তা ঐ সম্পদের মূল্যের বিনিময়ে গ্রহণ করবে।

কেননা, আসবাবপত্র মূল্যমান-সম্পন্ন বস্তুর অন্তর্ভুক্ত। **আর ক্রেতা যদি ঐ বস্তুটি পরিমাপযোগ্য ও ওযনযোগ্য বস্তুর বিনিময়ে ক্রয় করে, তাহলে শফী'ও ঐ বাড়ীটি অনুরূপ বস্তুর বিনিময়ে গ্রহণ করবে।** কেননা, উপরোক্ত (পরিমাপযোগ্য এবং ওযনযোগ্য বস্তু) উভয়ই ذَوَاتُ الأَمْثَالِ বা সাদৃশ্যপূর্ণ বস্তুর অন্তর্ভুক্ত। এর কারণ এই যে,

ক্রেতা যে প্রকার বস্তুর বিনিময়ে কোন কিছুর মালিক হয়েছে, শরী'আত সেরূপ বস্তুর বিনিময়েই ক্রেতার উপর শফী'র মালিকানা হাসিল করার অধিকার সাব্যস্ত করে দিয়েছে। কাজেই এ বিষয়ের প্রতি যথাসম্ভব লক্ষ্য রাখতে হবে। যেমন تَلَافٌ। বা কোন মাল ধ্বংস করার অবস্থায় হয়ে থাকে।[১] আর গণনাযোগ্য বস্তু, যার একটি অপরটির সাথে সামঞ্জস্যশীল, কাছাকাছি, সেগুলো ذَوَاتُ الْاَمْثَالِ এর অন্তর্ভুক্ত।

আর কেউ যদি কোন জমি অপর জমির বিনিময়ে বিক্রি করে, তাহলে জমির শফী' অপর জমির মূল্য দিয়ে তার শুফ্‌'আ গ্রহণ করবে। কেননা, এতদুভয় জমির একটি অপরটির বিনিময়। আর এ জমি যেহেতু মূল্যমান সম্পন্ন বস্তু, তাই মূল্য পরিশোধ করেই শফী' তা গ্রহণ করবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ বিক্রেতা যদি কোন সম্পত্তি বাকী মূল্যে বিক্রি করে, তাহলে শফী'র জন্য ইখতিয়ার থাকবে। ইচ্ছা করলে সে বাড়ীটি নগদ মূল্যে নিয়ে নেবে। আর ইচ্ছা করলে সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়া পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করবে। এরপর সময় অতিবাহিত হলে বাড়ীটি গ্রহণ করবে। কিন্তু বর্তমানে সে বাকী মূল্যে বাড়ীটি গ্রহণ করতে পারবেনা।

ইমাম যুফার (র) বলেন ঃ শফী' বাড়ীটি বর্তমানেও বাকী মূল্যে গ্রহণ করতে পারবে। এটিই ইমাম শাফি'ঈ (র) এর পুরাতন অভিমত। কেননা বাকী মূল্য, 'মূল্যের একটি অবস্থা', যেমন 'অচল মুদ্রা' হওয়াও মুদ্রার একটি অবস্থা। (আর মূল্যের বিনিময়েই যেহেতু শুফ্‌'আ গ্রহণ করা হয়ে থাকে, তাই মূল্যের মূল এবং গুণগত অবস্থা উভয় দিকের প্রতি লক্ষ্য রেখেই শফী' তার শুফ্‌'আ গ্রহণ করবে। যেমন অচল মুদ্রার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।)

আমাদের দলীল হলো ঃ সময়সীমা সাব্যস্ত হয় শর্ত দ্বারা। কিন্তু এখানে শফী' এবং বিক্রেতা অথবা শফী' এবং ক্রেতার মধ্যে কোন শর্ত নেই। অধিকন্তু ক্রেতার বেলায় বাকী মূল্যে বিক্রেতার সম্মতি প্রদান শফী'র বেলায়ও তা সম্মতি হিসাবে গণ্য হবে না। কেননা, ধন-সম্পদের ক্ষেত্রে মানুষে মানুষে পার্থক্য রয়েছে। প্রকৃত পক্ষে সময়সীমা মূল্যের কোন গুণাগুণ বা অবস্থা নয়। কেননা, এটি ক্রেতার অধিকার। যদি সময় সীমা মূল্যের গুণাগুণ হতো, তাহলে তা অবশ্যই মূল্যের تَابِعٌ হিসাবে গণ্য হতো এবং মূল্যের ন্যায় এটিও বিক্রেতার হক হিসাবে গণ্য হতো। উপরোক্ত মাসআলাটি এমন ঃ যেমন কেউ বাকী মূল্যে কোন কিছু খরিদ করলো। তারপর সে তাউলিয়ার বা অধিকার প্রাপ্ত হওয়ার ভিত্তিতে এটি আবার অন্য লোকের কাছে বিক্রি করে দিল, তাহলে এ সময়-সীমা তার জন্য সাব্যস্ত হবে না। অবশ্য সময় সীমার কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করলে, তা তার জন্যও সাব্যস্ত হবে। এরপর শফী' যদি নগদ মূল্যে তা বিক্রেতা থেকে নিয়ে নেয়, তবে ক্রেতার উপর থেকে মূল্য (প্রদানের বিষয়টি) রহিত হয়ে যাবে। এর কারণ আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। আর শফী' যদি নগদ মূল্যের বিনিময়ে বাড়ীটি ক্রেতা

---

১. কোন ব্যক্তি যদি কারো মাল ধ্বংস করে, তখন প্রকৃত বস্তু ফেরৎ দেওয়া অসম্ভব হলে, মাল যদি মিসলী বস্তু হয়, তাহলে এর মিস্‌লে সূরী বা আকার-আকৃতিতে সমতুল্য বস্তু ফেরৎ দেওয়া আবশ্যক। যদি মিসলে সূরী ফেরৎ দেওয়া সম্ভব না হয় তাহলে এর মূল্য ফেরৎ দিতে হবে।

থেকে গ্রহণ করে, তাহলে বিক্রেতা বাকী মূল্য ক্রেতার নিকট থেকে আদায় করে নেবে। যেমন বেচা-কেনার আকদের সময় শর্ত ছিল। কেননা, ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে যে শর্ত হয়েছে, শফী'র নগদ গ্রহণের কারণে তা বাতিল হবে না। কাজেই এ শর্তের হুকুম বাকী থাকবে। উপরোক্ত বিষয়টি এমনই ঃ যেমন কেউ নগদ মূল্যে কোন সম্পত্তি বিক্রি করলো। অথচ সে তা খরীদ করেছিল বাকী মূল্যে। আর শফী' যদি অপেক্ষা করাকে অবলম্বন করে, তাহলে তার জন্য এও জাইয। কেননা, নগদ মূল্য পরিশোধ করার ক্ষতি বরণ করে নেওয়াকে নিজের উপর আবশ্যিক না করার ইখতিয়ার শফী'র রয়েছে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ "ইচ্ছা করলে সে সময়সীমা অতিক্রান্ত হওয়া পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করবে।" এর অর্থ হলো, শুফ্'আ গ্রহণ না করে ধৈর্য ধারণ করা। তবে শুফ্'আর দাবী তার নিকট তৎক্ষণাৎই করতে হবে। এমনকি সে যদি (তাৎক্ষণিক) দাবী না করে নীরব থাকে, তবে ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র) এর মতে তার শুফ্'আ বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর দ্বিতীয় মত এর বিপরীত। কেননা শুফ্'আর হক সাব্যস্ত হয় ক্রয়-বিক্রয়ের দ্বারা। তবে শুফ্'আ গ্রহণ করার বিষয়টি দাবী হতে বিলম্বও হতে পারে। আর সে তা তৎক্ষণাৎও গ্রহণ করতে পারে। যেমন শফী' নগদ মূল্য পরিশোধ করে দিল। কাজেই বেচা-কেনা সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়ার সাথে সাথেই দাবী করা শর্ত।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ যদি কোন যিম্মী ব্যক্তি মদ ও শূকরের বিনিময়ে বাড়ী খরীদ করে আর তার শফী'ও একজন যিম্মী হয়, তাহলে সে তা (বাড়ীটি) মদের অনুরূপ বস্তু এবং শূকরের মূল্যের বিনিময়ে গ্রহণ করবে। কেননা, তাদের পরস্পরের মধ্যে এ জাতীয় লেন-দেন সহীহ বলে ফয়সালা দেওয়া হয়েছে। আর হক্কে শুফ্'আর বিষয়ে মুসলমান ও যিম্মী সকলেই সমান। সর্বোপরি তাদের জন্য মদ এমন, যেমন আমাদের জন্য সিরকা এবং শূকর (আমাদের জন্য) বকরীর ন্যায়। কাজেই প্রথম অবস্থায় শফী' এই বাড়ীটি মদের অনুরূপ বস্তুর বিনিময়ে এবং দ্বিতীয় অবস্থায় মূল্যের বিনিময়ে গ্রহণ করবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ যদি এর (বাড়ীর) শফী' মুসলমান হয়, তাহলে সে এটি মদ ও শূকরের মূল্যের বিনিময়ে গ্রহণ করবে।

শূকরের বিষয়টি তো স্পষ্ট। মদের হুকুমও ঠিক অনুরূপই। কেননা, মুসলমানের জন্য মদের আদান-প্রদান নিষিদ্ধ। সুতরাং মদের বিষয়টি গায়রে মিসলী বস্তুর সাথে সম্পর্কিত হবে। আর যদি বাড়ীর শফী' একজন মুসলমান ও একজন যিম্মী হয়, তাহলে بعض (অংশ বিশেষ) কে كل (পূর্ণ বিষয়) এর উপর কিয়াস করে এ কথা বলা হয় যে, মুসলিম ব্যক্তি বাড়ীর অর্ধাংশ গ্রহণ করবে মদের মূল্যের অর্ধেকের বিনিময়ে। আর যিম্মী ব্যক্তি মদের অনুরূপ বস্তু মূল্যের অর্ধেকের বিনিময়ে বাড়ীর অর্ধাংশ গ্রহণ করবে। যদি ঐ যিম্মী ব্যক্তি মুসলমান হয়ে যায়, তাহলে সে মদের মূল্যের অর্ধেকের বিনিময়ে

বাড়ীটির অর্ধাংশ গ্রহণ করবে। কেননা, মদের মালিক বানাতে সে অক্ষম। আর ইসলাম গ্রহণ করায় তার শুফ্‌'আর অধিকার আরো দৃঢ় হয়েছে; বাতিল হয়নি। তাই এটি এমন হলো ঃ যেমন এক ব্যক্তি এক 'কুর'[১] কাঁচা খেজুরের বিনিময়ে বাড়ীটি খরীদ করলো। তারপর খেজুর কাটার পর শফী' উপস্থিত হলো, তাহলে শফী' কাঁচা খেজুরের মূল্যের বিনিময়ে বাড়ীটি গ্রহণ করবে। এই মাসআলাটিও ঠিক তদ্রূপ-ই।

পরিচ্ছেদ ঃ বিবিধ মাসাইল

ইমাম কুদূরী বলেন ঃ যদি ক্রেতা শুফ্‌'আর দাবীকৃত জমিতে গৃহ নির্মাণ করে বা বৃক্ষ রোপণ করে, তারপর শফী'র জন্য শুফ্‌'আর ফয়সালা দেওয়া হয়, তাহলে (এ অবস্থায়) শফী'র ইখতিয়ার থাকবে, চাইলে ঐ জমি (জমির) মূল্য এবং গৃহ ও বৃক্ষ রোপণের মূল্য দিয়ে সে নিয়ে নেবে। আর ইচ্ছা করলে সে ক্রেতাকে তা উৎপাটিত করে দেওয়ার জন্য বাধ্য করতে পারবে।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) হতে বর্ণিত আছে, শফী' তাকে এগুলো উৎপাটনের জন্য বাধ্য করবে না, বরং তাকে ইখতিয়ার দেওয়া হবে, ইচ্ছা হয় জমিনটি এর মূল্য এবং ঘর ও বৃক্ষের দামসহ গ্রহণ করবে কিংবা শুফ'আর দাবী ত্যাগ করবে।

ইমাম শাফিঈ (র) ও অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তার মতে শফী' নিজেই তা উৎপাটিত করতে পারবে। তবে তাকে গৃহ নির্মাণের মূল্য দিয়ে দিবে।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর দলীল হলো; ক্রেতা গৃহ নির্মাণ করে হকের উপরই আছে। কেননা, সে তো এই হিসাবে গৃহ নির্মাণ করেছে যে, উক্ত বাড়ী তার মালিকানাধীন। আর উৎপাটনে বাধ্য করা সীমালংঘন এবং যুল্‌মের হুক্‌মের মধ্যে শামিল। এই ক্রেতার অবস্থা হিবা গ্রহীতা এবং ফাসিদ ক্রয়ের ক্রেতার মত হলো। আর এটি এমন হলো, যেমন (ক্রেতা কোন জমি খরীদ করে তাতে) কৃষি করলো, এ অবস্থায়ও তাকে তা উৎপাটিত করার জন্য বাধ্য করা যাবেনা। উক্ত হুকুম এ জন্য যে, (বৃক্ষ রোপণ এবং গৃহ নির্মাণের) মূল্য দিয়ে গ্রহণ করাতে উভয় প্রকার ক্ষতি হতে নিম্ন মানের ক্ষতিকে স্বীকার করে, বড় ধরনের ক্ষতিকে প্রতিহত করা হয়। কাজেই এর উপরই আমল করা হবে।[২]

যাহিরী রিওয়ায়েত (-এ উল্লেখিত বক্তব্য) এর যুক্তি এই যে, ক্রেতা এমন স্থানে ঘর নির্মাণ করেছে, যে স্থানের সাথে অন্যের মযবুত হক সংশ্লিষ্ট রয়েছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে হকদার ব্যক্তির পক্ষ হতে ক্রেতাকে কোন ক্ষমতা প্রদান করা হয়নি। কাজেই

১. একটি বিশেষ পরিমাপ যন্ত্র।

২. অর্থাৎ যাকে হিবা করা হয়েছে, সে যদি হিবাকৃত ভূমিতে ঘর-বাড়ী নির্মাণ করে এবং এর পর হিবাকারী যদি সে ভূমি ফেরৎ নিতে চায় এবং বাড়ী ঘর ভেঙ্গে দিতে চায় ; তাহলে এখন আর সে তা করতে পারবে না। এমনি ভাবে ফাসিদ ক্রয়ের মাধ্যমে কেউ যদি কোন সম্পত্তি ক্রয় করে তাতে বাড়ী ঘর বানায় তবে এ অবস্থায়ও বিক্রেতা ঐ বাড়ী-ঘর ভেঙ্গে দিতে পারবে না।

(নির্মিত বাড়ী-ঘর) ভেঙ্গে ফেলতে হবে। যেমন বন্ধকদাতা ব্যক্তি যদি বন্ধককৃত ভূমিতে বাড়ী ঘর বানায় (তবে তা ভেঙ্গে ফেলতে হবে)। কেননা, শফী'র অধিকার ক্রেতার অধিকার হতে বলিষ্ঠতর। কেননা তাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়ে থাকে। আর এ কারণেই ক্রেতার বেচা-কেনা, হিবা ইত্যাদি তার কার্যাবলী অকার্যকর করে দেওয়া হবে।

ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে হিবা ও ফাসিদ ক্রয়-বিক্রয়ের বিষয়টি এর ব্যতিক্রম। কেননা, এতদুভয় ক্ষেত্রে হকদারের পক্ষ হতে তাদেরকে ক্ষমতা প্রদান করা হয়ে থাকে। অধিকন্তু এতদুভয়ের (হিবা ও ফাসিদ ক্রয়-বিক্রয়ের) ক্ষেত্রে ফেরৎ গ্রহণের হক দুর্বল। এ কারণেই (এ দুই ক্ষেত্রে) গৃহ নির্মাণের পর হক অবশিষ্ট থাকেনা, আর শুফ'আর অধিকার বাকী থাকে। কাজেই এ অবস্থায় মূল্য ওয়াজিব (আবশ্যিক) করার কোন অর্থ হয়না। যেমন إِسْتِحْقَاقْ এর (মূল মালিক বেরিয়ে আসা) অবস্থায় হয়ে থাকে।[১]

শস্য উৎপাটিত করার হুকুম কিয়াসের ভিত্তিতে প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু সূক্ষ্ম কিয়াসের আলোকে তা উপড়ানো হবেনা। কেননা শস্য (কাটা) এর একটি নির্ধারিত সময়-সীমা রয়েছে। অধিকন্তু (উৎপাদিত) শস্য ইজারার বিনিময়েও বাকী থাকতে পারে ; এবং এতে (শফী'র) অধিক ক্ষতি নেই। আর শফী' যদি সে বাড়ীটি গৃহ ও বৃক্ষের মূল্য দিয়ে গ্রহণ করে, তাহলে উৎপাটিত গৃহ ও বৃক্ষের মূল্য ধর্তব্য হবে। যেমন আমরা গসব (জোর পূর্বক দখল) অধ্যায়ে আলোচনা করেছি।

যদি শফী'র (হক্কে শুফ'আর ভিত্তিতে) কোন বাড়ী গ্রহণ করে তাতে গৃহ নির্মাণ করে বা বৃক্ষ রোপণ করে এবং এরপর সে বাড়ীতে কারো মালিকানা সাব্যস্ত হয়, তাহলে শফী' (ক্রেতা বা বিক্রেতার নিকট থেকে এর) মূল্য ফেরৎ নিয়ে নেবে। কেননা, এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, শফী' তা বিনা অধিকারে গ্রহণ করেছে। এ অবস্থায় শফী' গৃহ ও বৃক্ষের মূল্য' ফেরৎ নিতে পারবে না, বিক্রেতার নিকট হতেও ফেরৎ নিতে পারবে না, যদি সে তার থেকে শুফ'আ গ্রহণ করে থাকে। অনুরূপ ভাবে ক্রেতার নিকট হতেও ফেরৎ পাবে না, যদি সে শুফ'আ তার (ক্রেতা) থেকে গ্রহণ করে থাকে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ শফী' মূল্য ফেরৎ নিতে পারবে। কেননা, শফী' ঐ ব্যক্তির উপর মালিকানা হাসিল করেছে। তাই তাকে বিক্রেতা ও ক্রেতার স্থানে গণ্য করা হবে। প্রসিদ্ধ রিওয়ায়েত মতে উভয় অবস্থার পার্থক্য এই যে, বিক্রেতার পক্ষ হতে ক্রেতাকে প্রতারিত করা হয়েছে এবং তার পক্ষ হতে তার উপর তাকে অধিকারও প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু ক্রেতার পক্ষ হতে শফী'র ক্ষেত্রে কোন প্রতারণা করা হয়নি এবং তাকে অধিকারও প্রদান করা হয়নি। কেননা সে (ক্রেতা) তো এর উপর (শফী'কে দিতে) বাধ্য।

---

১. যেমন কেউ কোন জমি খরীদ করে তাতে বাড়ী-ঘর নির্মাণ করার পর অন্য কেউ এর মালিকানা দাবী করলো। দাবীর প্রেক্ষিতে বিচারক মূল মালিকের পক্ষে ফয়সালা দিয়ে দিল। এ অবস্থায় জমির মূল মালিক ঐ জমি নিয়ে নেবে এবং তাতে নির্মিত বাড়ী-ঘর ভেঙ্গে দেবে। এতে তার উপর কোন জরিমানা বা মূল্য ওয়াজিব হবেনা। অবশ্য ক্রেতা বিক্রেতার নিকট থেকে তার ক্ষতিপূরণ নিয়ে নিতে পারবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ যদি কারো হস্তক্ষেপ ব্যতীত শুফ্'আর দাবীকৃত জমি ধ্বসে যায় অথবা এর বাড়ী-ঘর পুড়ে যায় অথবা বাগানের গাছ শুকিয়ে যায়, তাহলে শফী'র ইখতিয়ার থাকবে। সে ইচ্ছা করলে তা পূর্ণ মূল্য দিয়ে গ্রহণ করবে। কেননা গৃহ নির্মাণ ও বৃক্ষ রোপণ হচ্ছে ভূমির সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়। কাজেই ক্রয়-বিক্রয়ে এসবের কথা উল্লেখ না করলেও তা ক্রয়-বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে। সুতরাং এ দু'য়ের মুকাবিলায় কোন মূল্য ধর্তব্য হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তা মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হিসাবে গণ্য হবে। এ কারণেই উপরোক্ত অবস্থা সমূহে পূর্ণ মূল্যের বিনিময়ে সে তা মুনাফার ভিত্তিতে বিক্রি করতে পারবে। পক্ষান্তরে যদি শুফ্'আর দাবীকৃত ভূমির অর্ধাংশ ডুবে যায়, তাহলে শফী' বাকী অংশ এর সম মূল্য পরিমাণ মূল্য দিয়ে গ্রহণ করবে। কেননা ডুবে যাওয়া অংশ মূল জমির অংশ বিশেষ।[১]

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ ইচ্ছা করলে সে তা পরিহারও করতে পারবে। কেননা তার (শফী'র) অধিকার আছে, সে (চাইলে) তার মাল দ্বারা বাড়ীর মালিক হওয়া থেকে নিবৃত্ত থাকতে পারবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ ক্রেতা যদি ঘরটি ভেঙ্গে ফেলে, তাহলে শফী'কে বলা হবে, তুমি ইচ্ছা করলে এই (ঘর বিহীন) আঙ্গিনাটি এর অংশের মূল্য দিয়ে নিয়ে নাও। আর তুমি ইচ্ছা করলে তা ছেড়েও দিতে পার।

কেননা اتلاف (ভেঙ্গে ফেলা) এর কারণে তা (ঘরটি) মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে। কাজেই এর মুকাবিলায়ও মূল্য ধার্য হবে। প্রথম অবস্থাটি এর বিপরীত। কেননা (এ অবস্তায় বাড়ীটি) ধ্বংস হয়েছে নৈসর্গিক দুর্যোগের কারণে।

শফী'র জন্য ভাঙ্গা ঘরটি নিয়ে নেওয়া জাইয নেই। কেননা এটি (মূল সম্পত্তি) থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছে। কাজেই এখন আর এটি এর (ভূমির) সাথে সংশ্লিষ্ট নয়।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ যদি কেউ এমন জমি (বাগান) খরীদ করে, যার বৃক্ষে এখনও ফল রয়েছে, তাহলে শফী' এ জমিটি ফলসহ গ্রহণ করবে।

এর অর্থ হলো, যদি বেচা-কেনার সময় ফলের মূল্যের কথা উল্লেখ করা হয়। কেননা (ক্রয়-বিক্রয়ের সময়) উল্লেখ করা ব্যতিরেকে তা ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে গণ্য হবে না। এখানে যা উল্লেখ করা হয়েছে, তা সূক্ষ্ম কিয়াসের কথা। আর কিয়াসের দাবী হলো, শফী' ফল গ্রহণ করবে না। কেননা ফল জমিনের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। এটা কি লক্ষণীয় নয় যে, বেচা-কেনার সময় এর (ফলের) উল্লেখ না করলে, তা বেচা-কেনার মধ্যে গণ্য হয় না। এ হিসাবে ফল-ফলাদি ঘরে রক্ষিত আসবাবপত্রের মত হলো।

সূক্ষ্ম কিয়াসের যুক্তি হলো, সংশ্লিষ্টতার দিক থেকে ফল-ফলাদিও জমিনের সাথে সংশ্লিষ্ট; যেমন বাড়ীতে নির্মিত ঘর এবং ঘরের সাথে জড়িত আসবাবপত্র বাড়ীর সাথে সংশ্লিষ্ট। তাই শফী' এগুলো সহই গ্রহণ করবে।

---

১. আর জমির অংশ বিশেষ নষ্ট হলে সে পরিমাণ মূল্য কমে যাওয়াই স্বাভাবিক।

গ্রন্থকার বলেন ঃ অনুরূপভাবে ক্রেতা যদি কোন জমি (বাগান) খরীদ করে; অথচ তখন এর বৃক্ষগুলোতে কোন ফল-ফলাদি ছিল না, কিন্তু (পরে) ক্রেতার আয়ত্বাধীন থাকা অবস্থায় এতে ফল আসে।

অর্থাৎ এ অবস্থায় শফী' এর ফল-ফলাদি গ্রহণ করবে। কেননা, (এগুলোও) বিক্রীত বস্তুর সাথে সংশ্লিষ্ট। কারণ বেচা-কেনা এর মধ্যেও কার্যকর হয়েছে। যেমন বিক্রীত দাসীর সন্তানের মাসআলায় তা বর্ণিত হয়েছে।

গ্রন্থকার বলেন ঃ যদি ক্রেতা বৃক্ষের ফল কেটে নেওয়ার পর শফী' এসে উপস্থিত হয় তাহলে শফী' উল্লেখিত দুই অবস্থার কোন অবস্থাতেই ফল গ্রহণ করবে না। কেননা, শফী'র জমি গ্রহণ করার সময় ফল আর জমির সাথে সংশ্লিষ্ট থাকেনি। যেহেতু তা ভূমি থেকে আলাদা করা হয়ে গিয়েছে, কাজেই শফী' (এ অবস্থায়) তা (ফল) আর গ্রহণ করবে না। কুদূরী গ্রন্থকার (তৎপ্রণীত)'মুখতাসারুল কুদূরী গ্রন্থে' বলেছেন ঃ "ক্রেতা যদি গাছের ফল কেটে ফেলে, তাহলে শফী'র উপর থেকে এর (মূল্যের) অংশ রহিত হয়ে যাবে।"

গ্রন্থকার বলেন ঃ ইমাম কুদূরীর এ বক্তব্য প্রথম মাসআলার উত্তর। কেননা, সে অবস্থায় এটি (ফল) বেচা-কেনার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হিসাবেই বেচা-কেনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কাজেই এর মুকাবিলায় কিছু মূল্য ধার্য হবে। আর দ্বিতীয় মাসআলায় ফল ছাড়াই পূর্ণ মূল্য দিয়ে সে শুফ্'আ গ্রহণ করবে। কেননা, 'আকদের সময় ফল (গাছে) বিদ্যমান ছিল না। তাই ফল বিক্রীত বস্তু হিসাবে গণ্য হবে না। কিন্তু সংশ্লিষ্ট হিসাবে গণ্য। সুতরাং এর মুকাবিলায় কোন মূল্য ধার্য হবে না। আল্লাহ্-ই সর্বজ্ঞ।

যে বস্তুতে শুফ্‘আ সাব্যস্ত হয় আর যে বস্তুতে শুফ্‘আ সাব্যস্ত হয় না

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ জমির মধ্যে শুফ্‘আ সাব্যস্ত হয়, যদিও তা এমন সম্পত্তি হয়, যা বণ্টনযোগ্য নয়।

ইমাম শাফিঈ (র) বলেন, যে সম্পত্তি বণ্টযোগ্য নয়, তাতে শুফ্‘আ সাব্যস্ত হবে না। কেননা বন্টনের কষ্ট ও বোঝাকে দূরীকরণার্থেই শুফ‘আ সাব্যস্ত (প্রবর্তন) করা হয়েছে। আর বন্টন অযোগ্য সম্পত্তিতে এটি পাওয়া যায় না। আর আমাদের দলীল হলো, নবী করীম (সা)-এর বাণী। তিনি ইরশাদ করেছেন ঃ

اَلشُّفْعَةُ فِىْ كُلِّ شَىْءٍ عَقَارٍ اَوْ رَبْعٍ ٠

শুফ্‘আ প্রত্যেক বস্তুতে সাব্যস্ত হয়; চাই তা জমি হোক বা আবাসগৃহ হোক।[১]

এছাড়া অপরাপর ব্যাপক অর্থবোধক হাদীস সমূহও আমাদের হানফীদের দলীল।

অধিকন্তু শুফ্‘আর কারণ তো হল, মালিকানার সংশ্লিষ্টতা ও সংযুক্তি। আর এর হিকমত (রহস্য) হচ্ছে, খারাপ প্রতিবেশীর ক্ষতি প্রতিহত করা। যেমন পূর্বে এ সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। আর শুফ্‘আর এই কারণ ও যৌক্তিকতা বন্টনযোগ্য ও বন্টন অযোগ্য উভয় প্রকার সম্পত্তিকেই শামিল করে। বন্টন অযোগ্য সম্পত্তি যেমন ঃ গোসলখানা, আটা পেষার চাক্কি, কুয়া ও রাস্তা।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ আসবাবপত্র এবং নৌকায় শুফ্‘আ সাব্যস্ত হয় না।

কেননা, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন,

لَاشُفْعَةَ اِلاَّ فِىْ رَبْعٍ اَوْ حَائِطٍ (رواه البزار)

–বাসস্থান এবং বাগান ব্যতীত অন্য কিছুতে শুফ্‘আ সাব্যস্ত হয় না। (বাযযার)

বস্তুত: নৌকায় শুফ্‘আ সাব্যস্ত করার ব্যাপারে এ হাদীসটি ইমাম মালিক (র) এর মতের বিপক্ষে দলীল।[২]

---

১. হাদীসটি ইমাম বুখারী (র) এর উস্তাদ ইমাম ইসহাক ইব্ন রাহ্ওয়াহ (র) বর্ণনা করেছেন। তাহাভী শরীফেও অনুরূপ অর্থবোধক হাদীস বর্ণিত রয়েছে। এর রাবীগণ সকলেই নির্ভরযোগ্য। আল্লামা জামালুদ্দীন যায়লাঈ (র) এ হাদীসের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন।

২. ইমাম মালিক (র) এর মতে নৌকার মধ্যেও শুফ্‘আ সাব্যস্ত হবে। তার মতের বিপরীতে উক্ত হাদীসটি আমাদের দলীল।

অধিকন্তু শুফ্'আ চিরস্থায়ীভাবে প্রতিবেশীর অনিষ্টের ক্ষতিকর প্রভাবকে প্রতিহত করার জন্যই কেবলমাত্র সাব্যস্ত হয়েছে। আর অস্থাবর সম্পত্তিতে মালিকানা স্থায়ী হয় না, যেমন জমিতে স্থায়ী মালিকানা হাসিল হয়। কাজেই অস্থাবর সম্পত্তিকে স্থাবর সম্পত্তির সাথে সম্পৃক্ত করা যাবে না।

মুখ্তাসারুল কুদূরীর কোন কোন সংস্করণে উল্লেখ আছে যে, ঘর ও খেজুর বৃক্ষ যদি জমি ব্যতিরেকে বিক্রি করা হয়, তবে তাতে শুফ্'আ সাব্যস্ত হবে না। এটিই সহীহ মত। আসল তথা মাবসূত গ্রন্থে তা উল্লেখ রয়েছে। কেননা এগুলার কোন স্থায়ীত্ব নেই। তাই এগুলো অস্থাবর সম্পত্তিরূপে গণ্য হবে। এ জাতীয় বস্তুর হুকুম عُلُوّ (উপর তলার) এর হুকুম এর বিপরীত। কেননা, শুফ্'আর ভিত্তিতে উপর তলার অধিকারী হওয়া যায় এবং এর দ্বারা নীচ তলার শুফ্'আর অধিকারীও হওয়া যায়।

যদি উপরতলার রাস্তা নীচে না হয়।[১] কেননা (ভূমির সাথে সংযুক্ত হওয়ায়) উপর তলার স্থায়ীত্ব রয়েছে। কাজেই এটি জমির সাথে সম্পৃক্ত বলে গণ্য হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ শুফ্'আর অধিকারে মুসলমান এবং যিম্মী[২] সকলেই সমান। কেননা এ ব্যাপারে (বর্ণিত) দলীলগুলো হচ্ছে আম (ব্যাপক অর্থবোধক)। আর এই কারণে যে, তারা উভয়ে শুফ্'আর কারণে এবং যৌক্তিকতায় সমান। কাজেই শুফ্'আর অধিকারী হওয়ার ক্ষেত্রেও তারা সমান হবে। এ কারণেই শুফ্'আর অধিকারের ক্ষেত্রে পুরুষ, মহিলা, নাবালিগ-বালিগ, রাষ্ট্রদ্রোহী-ন্যায়পরাণ এবং আযাদ ও ক্রীতদাস সকলেই সমান। (উল্লেখ্য যে,) ক্রীতদাস তখনই শুফ্'আর অধিকারী হবে, যদি সে অনুমতিপ্রাপ্ত বা মুকাতাব (চুক্তিবদ্ধ) হয়।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ যদি কোন ব্যক্তি এমন বস্তুর বিনিময়ে জমির মালিক হয় যা মালরূপে গণ্য, তাহলে এতে শুফ্'আ সাব্যস্ত হবে। কেননা এতে শরী'আতের (আরোপিত) শর্তের প্রতি লক্ষ্য রাখা সম্ভব। আর তা হলো ঃ ক্রেতা যে বস্তুর বিনিময়ে সম্পত্তির মালিক হয়েছে, সে বস্তুর অনুরূপ বিনিময়ে শফী'র ঐ সম্পত্তির মালিক হওয়া। চাই তা সূরত এর দিক থেকে হোক, বা মূল্যের দিক থেকে হোক। যেমন পূর্বে তা আলোচিত হয়েছে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ এমন বাড়ীতে শুফ্'আ সাব্যস্ত হয় না, যে বাড়ীর বিনিময়ে কোন পুরুষ কোন মহিলাকে বিবাহ করেছে অথবা যে বাড়ীর বিনিময়ে কোন মহিলা (তার স্বামীর সাথে) খুলা করেছে অথবা যে বাড়ীর বিনিময়ে কেউ অন্য কোন বাড়ী কিংবা অন্য কিছু ভাড়ায় গ্রহণ করেছে অথবা যে বাড়ীর বিনিময়ে

---

১. ভূমি ব্যতীত শুধু ঘর বিক্রি করলে এতে শুফ'আ সাব্যস্ত হয় না। তদ্রূপ দ্বিতল অট্টালিকার উপরতলা বিক্রি করলে তাতেও শুফ'আ সাব্যস্ত না হওয়া উচিত। কিন্তু উপরতলার মাসআলা ঘরের মাসআলা হতে ভিন্নতর। কেননা উপরতলার রাস্তা নীচে না থাকার শর্ত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, এ অবস্থায় শুফ'আ প্রতিবেশী হিসাবে সাব্যস্ত হবে, অংশীদার হিসাবে নয়। আর যদি উপরতলার রাস্তা নীচ তলায় থকে, তবে এ অবস্থায় অংশীদার হিসাবে শুফ'আ সাব্যস্ত হবে, প্রতিবেশী হেসাবে শুফ'আ সাব্যস্ত হবে না।

২. ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিম ব্যক্তি, যে ইসলামী রাষ্ট্রকে নিয়মিতভাবে কর প্রদান করে।

কেউ ইচ্ছাকৃত খুনের বদলে সন্ধি করেছে অথবা যে বাড়ীর বিনিময়ে কেউ কোন গোলাম আযাদ করেছে। কেননা, আমাদের মাযহাবে মালের পরিবর্তে মালের বিনিময়ের ক্ষেত্রেই কেবল শুফ্'আ সাব্যস্ত হয়ে থাকে। এর কারণ আমরা পূর্বেই বর্ণনা করেছি। আর এই বিনিময়সমূহ মাল নয়। কাজেই এসব বিনিময়ের ক্ষেত্রে শুফ্'আ সাব্যস্ত করা শরী'আত পরিপন্থী এবং উদ্দেশ্যের বিপরীত কাজ বলে গণ্য হবে।

ইমাম শাফিঈ (র) এর মতে, এসব বিনিময়ের ক্ষেত্রেও শুফ্'আ সাব্যস্ত হবে। কেননা তার মতে এই বিনিময়সমূহও মূল্যমানসম্পন্ন বস্তু। অতএব শুফ্'আর দাবীকৃত বাড়ীটি উক্ত বিনিময়ের অনুরূপ বিনিময় দ্বারা গ্রহণ করা অসম্ভব হলেও এর মূল্য দ্বারা তা গ্রহণ করা সম্ভব। যেমন আসবাবপত্রের বিনিময়ে বিক্রয় করার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। হিবার বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা হিবার মধ্যে মূলত:ই কোন বিনিময় নেই।

ইমাম শাফিঈ (র) এর বক্তব্য তখনই প্রযোজ্য হবে, যদি স্বামী তার বাড়ীর কিছু অংশ মহর বা এ জাতীয় কিছুর বিনিময় হিসাবে সাব্যস্ত করে দেয়। কেননা তার মতে এ জাতীয় (শরীকী) সম্পত্তিতেই শুফ্'আ সাব্যস্ত হয়।

আমরা (হানাফীগণ) বলছি ঃ আকদে ইজারার ভিত্তিতে স্ত্রীর যৌনাঙ্গ উপভোগ করা বিবাহের মধ্যে এবং অন্যান্য জিনিষের মূল্যমান সম্পন্ন হওয়ার বিষয়টি প্রযোজনের ভিত্তিতে সাব্যস্ত হয়েছে।[১] অতএব শুফ্'আর বেলায় তা প্রকাশ পাবে না। অনুরূপভাবে খুন এবং আযাদ করার বিষয়টিও কোন মূল্যমান সম্পন্ন বিষয় নয়। কেননা, মূল্য তো এমন জিনিষকে বলা হয়, যা মূল প্রতিপাদ্য কোন বিশেষ অর্থের ক্ষেত্রে অন্যের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। আর এটি এই দুই জিনিষের মধ্যে পাওয়া যায় না।

তদ্রূপ যদি কোন পুরুষ কোন মহিলাকে বিনা মহরে বিবাহ করে, এরপর একটি বাড়ী তার মহরানা হিসাবে ধার্য করে দেয় (তবে এটিও আকদের মধ্যে ধার্য করার অনুরূপ বলে গণ্য হবে)। কেননা এটিও যৌনাঙ্গের মুকাবিলায় হওয়ার ব্যাপারে আক্দের মধ্যে ধার্য হওয়ার অনুরূপই। পক্ষান্তরে যদি কোন বাড়ী মহরে মিস্ল বা ধার্যকৃত মহরের বিনিময়ে বিক্রি করে (তবে এর হুকুম হবে ভিন্ন ধরনের।) কেননা, এতে মালের পরিবর্তে মাল পাওয়া যায়।

কেউ যদি বাড়ীকে মহর ধার্য করে এই কথার উপর বিবাহ করে যে, স্ত্রী তাকে এক হাজার (টাকা) ফেরৎ দিবে, তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতানুসারে বাড়ীর কোন অংশেই শুফ্'আ সাব্যস্ত হবে না।

কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র) এর মতে এক হাজারের অংশে শুফ্'আ সাব্যস্ত হবে। কেননা, তার বেলায় এতে মালের পরিবর্তে মাল পাওয়া গিয়েছে।

ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন ঃ এতে (বিবাহে) বেচা-কেনার অর্থটি হচ্ছে গৌণ। আর এ কারণেই বেচা-কেনা নিকাহ (বিবাহ) শব্দ দ্বারাও সংঘটিত হয় এবং

---

১. আর উসূলে ফিক্হ এর সর্বজন স্বীকৃত নীতি হলো اَلضَّرُوْرَةُ تَتَقَدَّرُ بِقَدْرِ الضَّرُوْرَةِ-কোন বিধান জরুরী ভিত্তিতে সাব্যস্ত হলে তা প্রয়োজনীয় স্থানেই সীমাবদ্ধ থাকে। কাজেই শুফ্'আর ক্ষেত্রে তা কার্যকরী হবে না এবং এসব বিনিময়ের ক্ষেত্রে শুফ্'আ সাব্যস্ত হবে না।

বেচা-কেনায় নিকাহের শর্ত আরোপের কারণে তা ফাসিদ হয় না। মূলে (নিকাহতে) যেমন শুফ্'আ সাব্যস্ত হয় না, অনুরূপভাবে এর تَابِعٌ (সংশ্লিষ্ট বিষয়) এর মধ্যেও শুফ্'আ সাব্যস্ত হবে না। অধিকন্তু শুফ্'আ প্রবর্তিত হয়েছে উদ্দেশ্যমূলকভাবে, মালের পরিবর্তে মালের বিনিময়ের ক্ষেত্রে। এ কারণেই মুযারিব (অংশীদারীত্বের ভিত্তিতে ব্যবসাকারী ব্যক্তি) যদি কোন বাড়ী বিক্রি করে এবং এতে যদি লাভও অন্তর্ভুক্ত থাকে; তাহলে رَبُّ الْمَالِ (অর্থ-যোগানদাতা ব্যক্তি) তার লাভের অংশের মধ্যে শুফ্'আর অধিকারী হবে না। কেননা, এই লাভ মূল পূঁজির تَابِعٌ (গৌণ বিষয়)।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন : অথবা অস্বীকৃতির সাথে কোন ব্যক্তি যদি ঐ ঘরের বিনিময়ে সন্ধি করে (তাহলে এতে শুফ্'আ সাব্যস্ত হবে না।[১]) আর যদি স্বীকারোক্তির অবস্থায় কেউ (বাদী বিবাদীর সাথে) ঐ ঘরের ব্যাপারে সন্ধি করে, তাহলে এতে শুফ্'আ সাব্যস্ত হবে না।

গ্রন্থকার বলেন : মুখতাসারুল কুদূরীর অধিকাংশ সংস্করণে এভাবেই উল্লেখ রয়েছে। তবে সহীহ হলো : এখানে "أَوْ يُصَالِحُ عَلَيْهَا بِانْكَارٍ"-এর স্থলে "أَوْ يُصَالِحُ عَنْهَا بِانْكَارٍ" হবে। কেননা যদি অস্বীকৃতির সাথে কোন বাড়ীর ব্যাপারে সন্ধি হয়, তবে এই বাড়ী তার মালিকানায়ই থেকে যাবে। সে মনে করবে যে, বাড়ীটি সর্বদাই তার মালিকানায়ই ছিল। (কখনো তা তার মালিকানা বহির্ভূত হয়নি।) অনুরূপভাবে যদি কেউ নীরবতার অবস্থায় কোন বাড়ীর ব্যাপারে সন্ধি করে, তাহলে এ অবস্থায়ও শুফ্'আ সাব্যস্ত হবে না। কেননা সম্ভাবনা আছে যে, বিবাদী তার কসমের ফিদইয়া হিসাবে মাল ব্যয় করেছে অথবা সে তার প্রতিপক্ষের চীৎকারকে বন্ধ করার জন্য মাল ব্যয় করেছে। যেমন স্পষ্টভাবে অস্বীকৃতির অবস্থায় হয়ে থাকে।

পক্ষান্তরে যদি কেউ স্বীকৃতির সাথে ঐ বাড়ীর ব্যাপারে সন্ধি করে (তাহলে এ অবস্থায় শুফ্'আ সাব্যস্ত হবে)। কেননা সে বাদীর মালিকানা স্বীকার করেছে। আর সে এ বাড়ীর মালিকানা লাভ করেছে সন্ধির মাধ্যমে। কাজেই এটি মালের পরিবর্তে মালের বিনিময় হলো। মোদ্দা কথা হচ্ছে, কেউ যদি স্বীকারোক্তি, নীরবতা কিংবা অস্বীকৃতির সাথে ঐ বাড়ীর ব্যাপারে সন্ধি করে তাহলে উপরোক্ত সব অবস্থাতেই শুফ্'আ সাব্যস্ত হবে। কেননা, সে তার ধারণা মতে স্বীয় হকের বিনিময়েই ঐ বাড়ীটি গ্রহণ করেছে। যদি তা তার হকের জাত থেকে না হয়। কাজেই তার ধারণা অনুসারেই তার সাথে আচরণ করা হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন : হিবার মধ্যে শুফ্'আ নেই। এর কারণ আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। অবশ্য হিবা যদি কোন শর্তযুক্ত বিনিময়ের প্রেক্ষিতে হয়ে থাকে, (তাহলে তাতে শুফ্'আ সাব্যস্ত হবে।) কেননা এটিও পরিণামের দিক দিয়ে বেচা-কেনা। এক্ষেত্রে (মাল) হস্তগত করা অপরিহার্য। আর এটাও অপরিহার্য যে,

১. এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির উপর এ মর্মে দাবী করলো যে, সে যে ঘরে আছে– তা আমার। কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তি তা অস্বীকার করলো। এ অবস্থায়ও বিবাদী বাদীকে এক হাজার টাকা দিয়ে এ ব্যাপারে সন্ধি করে নিল। এ পরিস্থিতিতে শুফ্'আ সাব্যস্ত হবে না।

হিবাকৃত বস্তু এবং এর বিনিময় কোনটাই شَائِعٌ (অবন্টিত) বস্তু হতে পারবে না। কেননা, সূচনার দিক থেকে তা হিবা। হিবা অধ্যায়ে আমরা এ সম্বন্ধে বিবরণ দিয়ে এসেছি। কিন্তু যদি চুক্তির মধ্যে হিবার বিনিময়ের বিষয়টি শর্তযুক্ত না হয়, তবে এর হুকুম বিপরীত ধরনের হবে। কেননা এ দু'য়ের প্রতিটিই হচ্ছে নিঃশর্ত হিবা। আর যেহেতু ঐ বাড়ীর বিনিময় দেওয়া হয়েছে তাই এ হিবা প্রত্যাহার করা যাবে না।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ কেউ যদি খিয়ারে শর্তের সাথে কোন কিছু বিক্রি করে, তাহলে এক্ষেত্রে শফী'র জন্য শুফ্'আ সাব্যস্ত হবে না। কেননা তা (বিক্রেতার ইখতিয়ার) বিক্রেতা থেকে তার মালিকান দূরীভূত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক।

তারপর সে যদি খিয়ার রহিত করে দেয় তবে শুফ্'আ সাব্যস্ত হবে। কেননা মালিকানা দূরীভূত হওয়ার ক্ষেত্রে যেটি প্রতিবন্ধক ছিল, তা নিঃশেষ হয়ে গেছে। সহীহ মতে খিয়ার রহিত হওয়ার সময় শুফ্'আর জন্য দাবী উত্থাপন করা শর্ত। কেননা এই সময়ই বেচা-কেনা (উক্ত বিক্রীত বস্তু হতে) মালিকানা নিঃশেষ করার কারণ হিসাবে পরিগণিত হয়ে থাকে।

কেউ যদি খিয়ারে শর্তের সাথে কোন কিছু খরীদ করে, তাহলে এতে শুফ্'আ সাব্যস্ত হবে। কেননা তা (ক্রেতার ইখতিয়ার) বিক্রেতা থেকে মালিকানা নিঃশেষ হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক নয়, এবং এতে ইমামগণ সকলেই একমত। আর বিক্রেতার মালিকানা নিঃশেষ হওয়ার উপরই শুফ্'আ নির্ভরশীল। যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। **শফী** যদি সে বাড়ীটি তিন দিনের ভেতর নিয়ে নেয়, তাহলে বেচা-কেনা ওয়াজিব হয়ে যাবে। যেহেতু ক্রেতা তা ফেরৎ দিতে অক্ষম। এক্ষেত্রে শফী'র জন্য কোন খিয়ার সাব্যস্ত হবে না। কেননা তা (খিয়ার) শর্ত সাপেক্ষে সাব্যস্ত হয়। আর এই শর্ত আছে ক্রেতার জন্য, শফী'র জন্য নয়।

আর যদি ঐ বাড়ীর পার্শ্বে অপর একটি বাড়ী বিক্রি হয় এবং তাদের (ক্রেতা বা বিক্রেতা) কোন একজনের জন্য খিয়ার থাকে, তবে তার (যার ইখতিয়ার রয়েছে) জন্য জাইয হবে শুফ্'আর ভিত্তিতে ঐ বাড়ীটিও নিয়ে নেওয়া। বিক্রেতার জন্য জাইয হওয়ার বিষয়টি তো স্পষ্ট। কেননা যে বাড়ীর সংলগ্নতার কারণে সে শুফ্'আর দাবী করছে, তাতে তার মালিকানা বাকী রয়েছে। অনুরূপভাবে যদি ক্রেতার জন্য খিয়ার থাকে, তবে সেও তা শুফ'আর ভিত্তিতে গ্রহণ করতে পারবে। তবে এক্ষেত্রে একটি জটিলতা (اشكال) রয়েছে। সে সম্বন্ধে আমরা ক্রয়-বিক্রয় অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এখানে আর এর পুনরাবৃত্তি করবো না। আর ক্রেতা যখন ঐ বাড়ীটি শুফ্'আর মাধ্যমে নিয়ে নেবে, তখন এর দ্বারা তার পক্ষ হতে বেচা-কেনার অনুমতি হয়ে যাবে। (অর্থাৎ এটি তার পক্ষ হতে বেচা-কেনার অনুমতিরূপে গণ্য হবে।) পক্ষান্তরে সে যদি পূর্বোক্ত বাড়ীটি না দেখে ক্রয় করে (তাহলে এর হুকুম বিপরীত হবে অর্থাৎ পার্শ্বে যে বাড়ী বিক্রি হচ্ছে শুফ্'আর ভিত্তিতে তা গ্রহণ করায় তার (ক্রেতার) খিয়ার বাতিল হবে না। কেননা, খিয়ারে রুয়াত স্পষ্ট বাতিল করার দ্বারাই বাতিল হয় না, তাহলে তা ইংগিতের দ্বারা কেমন করে বাতিল হবে ? এরপর যদি পূর্বোক্ত বাড়ীর শফী' এসে উপস্থিত হয়,

তাহলে শফী' এ বাড়ীটি হক্কে শুফ'আর ভিত্তিতে নিয়ে নিতে পারবে। কিন্তু দ্বিতীয়টি নিতে পারবে না। কেননা, দ্বিতীয় বাড়ীটি বিক্রির সময় প্রথমোক্ত বাড়ীতে তার মালিকানা ছিল না।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ কেউ যদি ফাসিদ তরীকায় কোন বাড়ী বিক্রি করে, তাহলে এতে শুফ্'আ সাব্যস্ত হবে না। (ক্রেতার মাল) হস্তগত করার পূর্বে তো এজন্য হবে না; যেহেতু এর থেকে বিক্রেতার মালিকানা নিঃশেষ হয়নি। আর হস্তগত করার পর (এ জন্য) শুফ্'আ সাব্যস্ত হবে না, যেহেতু এতে ফস্‌খ (বেচা-কেনা ভঙ্গ করা) এর সম্ভাবনা রয়েছে। আর ফাসাদ তথা বিপর্যয় দূর করার জন্যই শরী'আতে বেচা-কেনা ভঙ্গ করার অধিকার সাব্যস্ত করা হয়েছে। অথচ শুফ্'আর অধিকার সাব্যস্ত করা হলে এর দ্বারা সে ফাসাদকেই প্রতিষ্ঠিত করা হয়। কাজেই এভাবে শুফ্'আ গ্রহণ করা জাইয হবে না। পক্ষান্তরে যদি সহীহ্ ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রেতার খিয়ার থাকে (তবে এই খিয়ার শুফ্'আ সাব্যস্ত হওয়ার ব্যাপারে অন্তরায় হবে না)। কেননা, সে (ক্রেতা) এ বেচা-কেনায় (কৃত) বস্তু ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট (খাস) হয়ে গিয়েছে। আর ফাসিদ বেচা-কেনায় বস্তুর ব্যবহার নিষিদ্ধ।

গ্রন্থকার বলেন ঃ যদি ক্রয়-বিক্রয় ফস্‌খ (ভঙ্গ) করার অধিকার রহিত হয়ে যায়, তবে শুফ্'আ ওয়াজিব (সাব্যস্ত) হয়ে যাবে। কেননা, অন্তরায় দূরীভূত হয়ে গিয়েছে। যদি (ফাসিদ ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে) বিক্রীত বাড়ীর পাশে অন্য কোন বাড়ী বিক্রি করা হয়, অথচ বাড়ীটি এখনো বিক্রেতার আয়ত্বেই রয়েছে, তাহলে এতে বিক্রেতার জন্য শুফ'আ সাব্যস্ত হবে। কেননা, এখনো এতে তার মালিকানা বাকী রয়েছে। আর সে (বিক্রেতা) যদি তা বিক্রেতার নিকট সমর্পণ করে দেয়, তবে সেই (ক্রেতা)-এর শফী' হিসাবে গণ্য হবে। কেননা, মালিকানা তো তারই। স্মর্তব্য যে, যদি বিক্রেতার অনুকূলে শুফ'আর ফয়সালা দেওয়ার পূর্বে সে ঐ বাড়ীটি হস্তান্তর করে দেয়, তবে তার হক্কে শুফ'আ বাতিল হয়ে যাবে। যেমন সে যদি বাড়ীটি বিক্রি করে দেয় (তাহলে তার শুফ'আর অধিকার বাতিল হয়ে যায়।) পক্ষান্তরে সে যদি তার পক্ষে শুফ'আর ফয়সালা দেওয়ার পর তা হস্তান্তর করে দেয় (তাহলে তার শুফ'আর অধিকার বাতিল হবে না। কেননা যে বাড়ীর মাধ্যমে বিক্রেতা শুফ'আর দাবী করছে, শুফ'আর ফয়সালা দেওয়ার পরও তাতে তার মালিকানা বাকী থাকা শর্ত নয়। কাজেই শুফ'আর মাধ্যমে গৃহীত বাড়ী তার মালিকানায়ই বাকী থাকবে। ক্রেতার পক্ষে শুফ'আর ফয়সালা হওয়ার আগেই বিক্রেতা যদি সে বাড়ীটি তার নিকট থেকে ফেরৎ নিয়ে নেয়, তাহলে তার (ক্রেতার) শুফ'আর অধিকার বাতিল হয়ে যাবে। কেননা, তার পক্ষে শুফ'আর ফয়সালা দেওয়ার পূর্বেই সে বাড়ী থেকে তার মালিকানার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে, যে বাড়ীর মাধ্যমে সে শুফ'আর দাবী করছিল। পক্ষান্তরে বিক্রেতার পক্ষে শুফ'আর ফয়সালা হওয়ার পর ক্রেতা যদি তা তার নিকট হতে ফেরৎ নিয়ে নেয়, তবে দ্বিতীয় বাড়ীটি তার মালিকানাধীন থাকবে। এর কারণ আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ যখন অংশীদারগণ (যৌথ মালিকানাধীন) জমি বন্টন করে নেয়, তখন উক্ত বন্টনের কারণে তাদের প্রতিবেশীদের জন্য এতে শুফ'আ সাব্যস্ত হবে না। কেননা এই বন্টনের মধ্যে জমি পৃথক করে নেওয়ার অর্থ ও

(উদ্দেশ্য) নিহিত রয়েছে। এ কারণেই এতে জবরদস্তি করা যায়। পক্ষান্তরে কেবল বিনিময়ের অবস্থায়ই শরী'আতে শুফ'আর অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ ক্রেতা কোন বাড়ী খরীদ করার পর শফী' যদি তা থেকে তার শুফ'আর অধিকার প্রত্যাহার করে নেয়, তাপরে ক্রেতা সে বাড়ীটি বিচারকের ফয়সালা মতে খিয়ারে রুয়ত, খিয়ারে শর্ত বা খিয়ারে আয়বের ভিত্তিতে ফেরৎ দিয়ে দেয়, তাহলে শুফ'আ দাবীদারের জন্য আর শুফ'আর অধিকার বহাল থাকবে না। কেননা এই ফেরৎ দান সর্বদিক থেকেই আক্দ বা চুক্তি ভঙ্গ করে দেওয়া বলে গণ্য হবে। কাজেই তা পুরোনো মালিকানায় ফিরে এসেছে।[১] আর শুফ'আ তো নতুন আকদ (বেচা-কেনা) এর ক্ষেত্রে সাব্যস্ত হয়। এক্ষেত্রে (বাড়ী) হস্তগত করা ও না করার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

আর যদি উক্ত বাড়ীটিকে দোষগত কারণে বিচারকের ফয়সালা ব্যতিরেকেই সে (ক্রেতা) ফেরৎ দিয়ে দেয় অথবা যদি ক্রেতা ও বিক্রেতা পরস্পর সম্মতিক্রমে বিক্রয়কে ইকালা (রদ) করে দেয়, তাহলে এ অবস্থায় শফী'র জন্য শুফ্'আ সাব্যস্ত হবে না। কেননা এটি তাদের উভয়ের ক্ষেত্রে বিক্রয়কে ফস্খ (ভঙ্গ) করে দেওয়ার শামিল। এটি এ কারণে যে, তাদের নিজেদের উপর তাদের কর্তৃত্ব রয়েছে এবং তারা (সে কর্তৃত্বের ভিত্তিতে) ফস্খের ইচ্ছাও করেছে। (কাজেই এ অবস্থায় শফী'র জন্য শুফ'আ সাব্যস্ত হবে না।) এ ফস্খ তৃতীয় ব্যক্তির ক্ষেত্রে নুতন বেচা-কেনা বলে পরিগণিত হবে, কেননা এতে বেচা-কেনার সংজ্ঞা বিদ্যমান রয়েছে। আর তা হলো পরস্পরে সম্মত হয়ে মালের পরিবর্তে মালের বিনিময় করা। আর শফী'ই হচ্ছে সে তৃতীয় ব্যক্তি।

দোষজনিত কারণে (মাল) ফেরৎ দেওয়ার দ্বারা কুদূরী গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য হচ্ছে ঃ "হস্তগত করার পর তা ফেরৎ দেওয়া"। কেননা হস্তগত করার পূর্বে (মাল) ফেরৎ দেওয়া মূলতঃই বেচা-কেনা ভঙ্গ করে দেওয়ার শামিল। যদিও তা বিচারকের ফয়সালা ব্যতিরেকে করা হয় না কেন— ঐ ব্যাখ্যা মুতাবিক, যা সর্বজন স্বীকৃত।

'আল জামি'উস সগীর' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, বন্টন ও খিয়ারে রুয়াত (দেখার ইখতিয়ার) এর ক্ষেত্রে শুফ'আ সাব্যস্ত হবে না। وَلَاخِيَارُ رُؤْيَة-শব্দের رَاء অক্ষরে যের হবে। এ অবস্থায় (কিতাবের 'ইবারতের) অর্থ হবে ঃ খিয়ারে রুয়াতের ভিত্তিতে ফেরৎ দেওয়ার কারণে শুফ'আর অধিকারও সাব্যস্ত হবে না। ঐ দলীলের ভিত্তিতে যা আমরা ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি। শুফ'আ শব্দের উপর عَطْف করে خِيَار এর رَاءُ -অক্ষরে যবর দেওয়া সহীহ নয়। কেননা (আল জামিউস সগীর গ্রন্থের) বন্টন অধ্যায়ে বর্ণনা সংরক্ষিত আছে যে, বন্টনের মধ্যে খিয়ারে রুয়াত এবং খিয়ারে শর্ত সাব্যস্ত হবে। কেননা, যে সব ক্ষেত্রে কোন বিষয় অপরিহার্য হওয়া সন্তুষ্টির সাথে সম্পর্কিত, সে সব ক্ষেত্রে সন্তুষ্টির মধ্যে বিঘ্ন সৃষ্টি হলে তাতে খিয়ারে রুয়াত ও খিয়ারে শর্ত সাব্যস্ত হয়। আর বন্টনের মধ্যে এই অর্থ (কারণটি) পাওয়া যায়। আল্লাহ্ তা'আলাই সর্বাধিক জ্ঞাত।

---

১. কাজেই এ অবস্থায় শফী' তার প্রত্যাহারকৃত হক্কে শুফ'আর জন্য পুনরায় দাবী করতে পারবে না।

যে যে কারণে শুফ'আর অধিকার বাতিল হয়ে যায়

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ যদি শফী' বেচা-কেনা সম্বন্ধে অবগত হওয়ার সময় সাক্ষী[১] কায়েম করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সাক্ষী কায়েম না করে, তবে তার শুফ'আর অধিকার বাতিল হয়ে যাবে। কেননা, সে শুফ'আর দাবী হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। ক্ষমতা থাকার শর্ত এই জন্য আরোপ করা হয়েছে যে, এ বিমুখতা প্রমাণিত হয় ইখতিয়ার থাকা অবস্থায়। আর এ ইখতিয়ার পাওয়া যায় ক্ষমতা থাকার অবস্থায়।

অনুরূপভাবে শফী' যদি মজলিসে সাক্ষী কায়েম করে, কিন্তু ক্রেতা বা বিক্রেতা তাদের কারো নিকট সাক্ষী কায়েম না করে, এমনকি শুফ'আর দাবীকৃত জমির নিকটও সাক্ষী কায়েম না করে। (তখনও তার শুফ'আ বাতিল হয়ে যাবে।) পূর্বে এ সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত আলোচনা পেশ করেছি।[২]

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ যদি শফী' কোন বিনিময়ের পরিবর্তে স্বীয় শুফ'আর ব্যাপারে আপোষ করে, তাহলে তার শুফ'আ বাতিল হয়ে যাবে, এবং উক্ত বিনিময়টি ফেরৎ দিয়ে দিতে হবে। কেননা, হক্কে শুফ'আ এমন কোন হক নয়, যা কোন নির্দিষ্ট স্থানে স্থির থাকে বা স্থায়ী হয়। বরং এটি মালিকানা হাসিল করার একটি অধিকার মাত্র। কাজেই এর পরিবর্তে কোন বিনিময় গ্রহণ করা সঠিক নয়।

শুফ'আর হক রহিতকরণ কোন বৈধ শর্তের সাথে সম্পর্কিত হয় না। সুতরাং ফাসিদ শর্তের সাথে তো কোনভাবেই তা সম্পর্কিত হবে না। তাই শর্ত (করলে তা) বাতিল হবে এবং রহিতকরণ সঠিক বলে গণ্য হবে।[৩]

---

১. এখানে সাক্ষী কায়েম করা দ্বারা তলবে ইশহাদ (طَلَبُ اِشْهَاد) ও তলবে তাকরীর (طَلَبُ تَقْرِير) উদ্দেশ্য নয়; বরং তলবে মুওয়াসাবা (طَلَبُ مُوَاثَبَة) অর্থাৎ তাৎক্ষণিক দাবী উদ্দেশ্য। গ্রন্থকারের কথা (لاِعْرَاضِهِ عَنِ الطَّلَبِ) এর দ্বারা এ কথাই প্রতীয়মান হয়।

২ অর্থাৎ তলবে ইশহাদ করলেও তার শুফ'আ বাতিল হয়ে যাবে।

৩. যেমন শফী' ক্রেতাকে বললো ঃ আমি এই শর্তের উপর আমার শুফ'আর অধিকার রহিত করে দিলাম যে, বিক্রেতা আমার নিকট এর মূল্য দাবী করতে পারবে না। এ অবস্থায় শফী' যদি উক্ত সম্পত্তি গ্রহণ না করে, তবে ক্রেতা-বিক্রেতা কেউই তার নিকট মূল্য দাবী করতে পারবে না। এরূপ শর্ত করা জাইয। পক্ষান্তরে শফী' যদি ক্রেতাকে বলে যে, আমি এই শর্তে আমার হক রহিত করে দিলাম যে, তুমি আমাকে এক হাজার টাকা দেবে। এরূপ শর্ত করা জাইয নয়। মোদ্দা কথা হচ্ছে, শর্তের সাথে শুফ'আ রহিত করণের কোন সম্পর্ক নেই। চাই শর্ত সহীহ হোক বা ফাসিদ হোক। বস্তুত: শফী'র বক্তব্যের দ্বারা শুফ'আ রহিত হয়ে যায়। কাজেই শর্ত সাপেক্ষে শুফ'আ রহিত করা হলে শর্ত বাতিল বলে গণ্য হবে এবং রহিতকরণ কার্যকর হবে। কোন বিনিময়ের শর্তে শুফ'আ রহিত করে থাকলে তা ফেরৎ দেওয়া অপরিহার্য হবে।

অনুরূপভাবে যদি শফী' তার শুফ'আ কোন মালের বিনিময়ে বিক্রি করে দেয় (তবে এ অবস্থায়ও তার শুফ'আ বাতিল হয়ে যাবে।)[১] এর কারণ আমরা ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি। কিন্তু কিসাসের হুকুম এর ব্যতিক্রম। কেননা কিসাস একটি প্রতিষ্ঠিত হক (অধিকার)[২]। এমনিভাবে তালাক এবং ইতাক (আযাদ করা)-ও এর বিপরীত। কেননা, (এতদুভয়ের) প্রত্যেকটিতেই নির্দিষ্ট স্থানে অর্জিত মালিকানার পরিবর্তে বিনিময় গ্রহণ করা হয়ে থাকে।[৩] এর উদাহরণ হলো, যেমন স্বামী তার তালাকের অধিকারপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বললো ঃ তুমি আমাকে এক হাজারের বিনিময়ে গ্রহণ কর অথবা পৌরুষত্বহীন স্বামী তার স্ত্রীকে বললো ঃ এক হাজারের বিনিময়ে তুমি বিবাহ ভঙ্গ করাকে পরিহার কর। এরপর স্ত্রী স্বামীকে গ্রহণ করলে তার (স্ত্রীর) ইখতিয়ার রহিত হয়ে যাবে এবং বিনিময়ও সাব্যস্ত হবে না।[৪]

এক বর্ণনা মতে, প্রাণের বিনিময়ে দায়িত্ব গ্রহণ করা (দায়িত্ব ও বিনিময় উভয় বাতিল হওয়ার ক্ষেত্রে) শুফ'আর পর্যায়ভুক্ত। অপর বর্ণনা মতে, কাফালা (দায়িত্ব গ্রহণ) বাতিল হবে না এবং মালও ওয়াজিব হবে না। কারো কারো মতে, এ বর্ণনাটি কেবলমাত্র শুফ'আর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কেউ কেউ বলেন ঃ এটি শুধুমাত্র কাফালা'র ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যথাস্থানে এ বিষয়ে জ্ঞাত করা হয়েছে।[৫]

---

১. কাজেই গৃহীত অর্থ ফেরৎ দিয়ে দিতে হবে।

২. এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, হক্কে শুফ'আ যেভাবে মাল নয়, অনুরূপভাবে হক্কে কিসাসও মাল নয়। কাজেই হক্কে কিসাসের ক্ষেত্রে যেমনিভাবে বিনিময় গ্রহণ করা জাইয, তদ্রূপ হক্কে শুফ'আর ক্ষেত্রেও বিনিময় গ্রহণ জাইয হওয়া চাই। এর জবাবে গ্রন্থকার (র) বলেন ঃ হক্কে শুফ'আ কোন প্রতিষ্ঠিত অধিকার নয়। কিন্তু হক্কে কিসাস হচ্ছে একটি প্রতিষ্ঠিত অধিকার। প্রতিষ্ঠিত অধিকারের ক্ষেত্রে বিনিময় গ্রহণ করা জাইয। কিন্তু যে অধিকার প্রতিষ্ঠিত নয়, সেক্ষেত্রে বিনিময় গ্রহণ জাইয নয়।

৩. যেমন স্বামী যদি তার স্ত্রীকে মালের বিনিময়ে তালাক দেয় অথবা মুনীব যদি মালের বিনিময়ে তার গোলামকে আযাদ করে দেয়, তাহলে উভয় অবস্থাতেই বিনিময় স্বরূপ মাল গ্রহণ করা জাইয হবে। কেননা স্বামী এবং মুনীব উভয়ের হক্কই হচ্ছে প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট স্থানে তাদের মালিকানা অর্জিত আছে। কাজেই সেই প্রতিষ্ঠিত মালিকানার পরিবর্তে বিনিময় গ্রহণ করা জাইয হবে।

৪. তালাকের অধিকারপ্রাপ্তা স্ত্রী অথবা পৌরুষত্বহীন পুরুষের স্ত্রী যদি তার স্বামীকে প্রত্যাখ্যান করার অধিকার বর্জন করে, তবে তার অধিকার রহিত হয়ে যাবে। আর উল্লেখিত বিনিময়ের কিছুই সে পাবে না। কেননা তাদের বিবাহ ভঙ্গ করার ইখতিয়ার কোন নির্দিষ্ট স্থানে প্রতিষ্ঠিত নয়। যেহেতু তাদের ইখতিয়ার থাকা অবস্থায় এবং ইখতিয়ার বাতিল করার পর তাদের স্বামী একইরূপে তাদের গুপ্তাঙ্গের মালিক থেকে যায়। তাই কোন অবস্থাতেই বিনিময় প্রদান স্বামীর উপর ওয়াজিব হবে না।

৫. কেউ যদি কোন ব্যক্তির জানের ব্যাপারে দায়িত্ব গ্রহণ করে, তবে তাকে কফীল বলা হবে। কফীলের কাজ হলো ঃ مَكْفُوْل বা যার দায়িত্ব গ্রহণ করা হয়েছে, مَكْفُوْل لَه বা যার জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করা হয়েছে, এর নিকট উপস্থিত করে দেওয়া। কফীল যদি مَكْفُوْل কে বলে ঃ এক হাজার টাকার বিনিময়ে তুমি আমাকে এ দায়িত্ব হতে মুক্ত করে দাও, তবে এক্ষেত্রে ফকীহগণের একাধিক মতামত রয়েছে। এক বর্ণনা মতে ঃ কাফালাতের বিষয়টি হুবুহ শুফ'আর মতই। অর্থাৎ এরূপ অবস্থায় কাফালাত বাতিল বলে গণ্য হবে এবং বিনিময়ও ওয়াজিব হবে। অপর বর্ণনা মতে ঃ মাল ওয়াজিব হবে না এবং কাফালাতও বাতিল হবে না। হানাফী ফকীহগণের কেউ কেউ বলেন ঃ কাফালার অনুরূপ শুফ'আর ক্ষেত্রেও একটি বর্ণনা রয়েছে। অর্থাৎ শুফ'আ বাতিল হবে না এবং বিনিময়ও ওয়াজিব হবে না। মাশায়িখে কিরামের কেউ কেউ বলেন ঃ এ বর্ণনাটি কেবলমাত্র কাফালাতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, শুফ'আর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। শুফ'আর ক্ষেত্রে হুকুম তো হল, শুফ'আ বাতিল এবং বিনিময়ও বাতিল হবে। এরপর গ্রন্থকার (র) বলেন ঃ এ মাসআলার বিস্তারিত বিবরণ মাবসূতের মধ্যে উল্লেখ রয়েছে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ শফী' যদি মারা যায়, তবে তার শুফ'আ বাতিল বলে গণ্য হবে।

ইমাম শাফি'ঈ (র) বলেন ঃ শফী'র পক্ষ এতে উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত হবে।

গ্রন্থকার বলেন ঃ শুফ'আ বাতিল হওয়ার অর্থ হলো, (জমি) বিক্রির পর শুফ'আ সম্বন্ধে আদালত কর্তৃক ফয়সালা দেওয়ার পূর্বে যদি শফী' মারা যায় (তাহলে উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে।) আর যদি বিচারকের ফয়সালার পর মূল্য পরিশোধ করা ও তা হস্তগত করার পূর্বে শফী' মারা যায়, তাহলে তার উত্তরাধিকারীদের জন্য বেচা-কেনা অপরিহার্য বলে গণ্য হবে।

হানাফী ও শাফি'ঈ ফকীহগণের মধ্যকার এ মতানৈক্য ঐ মতানৈক্যের মতই, যা খিয়ারে শর্তের মধ্যে হয়েছে। বেচা-কেনা অধ্যায়ে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। শুফ'আর ক্ষেত্রে উত্তরাধিকার বিধান প্রযোজ্য না হওয়ার কারণ হলো এই যে, মৃত্যুর কারণে বাড়ী-ঘর হতে উক্ত ব্যক্তির মালিকানা নিঃশেষ হয়ে যায় এবং বিক্রির পর এর মালিকানা উত্তরাধিকারীদের জন্য সাব্যস্ত হয়ে যায়। অথচ বেচা-কেনার সময় শফী'র মালিকানা থাকা এবং আদালতের ফয়সালা পর্যন্ত তার সে মালিকানা অবশিষ্ট থাকা, শুফ'আর জন্য অপরিহার্য শর্ত। অতএব এ শর্ত ব্যতীত শুফ'আ সাব্যস্ত হবে না।

আর ক্রেতা যদি মারা যায় তাহলে শুফ'আ বাতিল হবে না। কেননা, হকদার ব্যক্তি বহাল আছে এবং তার হকদার হওয়ার মূল কারণে কোনরূপ পরিবর্তন সাধিত হয়নি। এ অবস্থায় শুফ'আর দাবীকৃত বাড়ী ক্রেতার ঋণ পরিশোধ এবং অসিয়্যত বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে বিক্রি করা যাবে না। কাজেই, বিচারক বা ওসী যদি তা বিক্রি করে দেয় অথবা ক্রেতা যদি নিজে এ সম্বন্ধে কোন অসিয়্যত করে যায়, তাহলে শফী' উপরোক্ত এসব বিষয়াদি বাতিল করে দিতে পারবে এবং তার হক অগ্রগণ্য হওয়ায় সে এ বাড়ীটি নিয়ে নিতে পারবে। আর এ কারণেই ক্রেতা জীবিত থাকা অবস্থায়ও যদি এতে কোন হস্তক্ষেপ করে, তাহলে শফী' তাও নাকচ করে দিতে পারবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ শফী' যে বাড়ীর মাধ্যমে শুফ'আর দাবী করছে শুফ'আর ব্যাপারে বিচারকের ফয়সালার পূর্বে সে যদি ঐ বাড়ীটি বিক্রি করে দেয়, তাহলে তার শুফ'আ বাতিল হয়ে যাবে। কেননা, মালিকানা হাসিলের পূর্বে অধিকার লাভের কারণটি (তার থেকে) শেষ হয়ে গেছে। আর সেই কারণটি হলো, তার মালিকানার সাথে সংযুক্তি। আর এই (বাড়ী বিক্রির) কারণেই তার থেকে শুফ'আর অধিকার তিরোহিত হয়ে যাবে। যদিও সে শুফ'আর দাবীকৃত বাড়ীটির বিক্রি সম্বন্ধে অনবহিত থাকে (তবুও তার শুফ'আ বাতিল হয়ে যাবে।) যেমন শফী' যদি স্পষ্টভাবে তার শুফ'আর অধিকার ছেড়ে দেয়, অথবা কেউ কাউকে ঋণ থেকে মুক্ত করে দেয় অথচ তার (শফী' বা ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির) এ সম্পর্কে কোন অবগতি নেই (তবে এ অবস্থায়ও উক্ত হুকুম কার্যকর হবে।) পক্ষান্তরে শফী' যদি তার বাড়ীটি খিয়ারে শর্তের ভিত্তিতে বিক্রি করে (তবে তার শুফ'আ বাতিল হবে না।) কেননা, শফী'র খিয়ার থাকায় বিক্রীত বস্তু হতে তার মালিকানা শেষ হয়নি। কাজেই তার জমির সাথে সংযুক্তি বাকী রয়ে গেছে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ বিক্রেতার উকীল নিজে শফী' হওয়া সত্ত্বেও যদি (মুআক্কিলের) বাড়ী বিক্রি করে, তবে সে আর শুফ'আ পাবে না। কিন্তু ক্রেতার উকীল যদি বাড়ী খরীদ করে, তবে সে শুফ'আ পাবে। এ সম্বন্ধে মূলনীতি হলো এই যে, যদি কেউ নিজে বিক্রি করে অথবা তার জন্য বিক্রি করা হয়, তাহলে সে শুফ'আ পাবে না। আর যে ব্যক্তি নিজে খরীদ করে বা যার জন্য খরীদ করা হয়, সে শুফ'আ পাবে। কেননা, প্রথমোক্ত অবস্থায় শুফ'আর দাবীকৃত বাড়ী বা জমি গ্রহণ করলে এর অর্থ হবে, যে ক্রয়-বিক্রয়কে সে সম্পন্ন করেছে, তা সে নিজেই নাকচ করে দেওয়ার চেষ্টা করছে। পক্ষান্তরে ক্রেতা যদি ঐ জমি বা বাড়ীটি শুফ'আর মাধ্যমে গ্রহণ করে, তবে এতে সে ক্রয়কে ভঙ্গ করছে এরূপ বলা যাবে না। কেননা, শুফ'আ গ্রহণ করাও খরীদ করার মতই। অনুরূপভাবে যদি কোন ব্যক্তি বিক্রেতার পক্ষ হতে জমির জরিমানা অথবা ক্ষয়-ক্ষতির দায়-দায়িত্বের ব্যাপারে জামিন হয়, অথচ সে-ই হলো শফী' তাহলে সে হক্কে শুফ'আর অধিকারী হবে না। এমনিভাবে যদি কেউ জমি বিক্রি করে অন্যের জন্য খিয়ারের শর্ত আরোপ করে, আর পরবর্তীতে (উক্ত ব্যক্তি) যার (জন্য) খিয়ারের শর্ত করা হয়েছে, সে ঐ বেচা-কেনাকে কার্যকর করার ঘোষণা দিয়ে দেয়, অথচ সে নিজেই হচ্ছে শফী' তাহলে সেও শুফ'আর হকদার হবে না। কেননা, তার কার্যকর করাতেই বেচা-কেনা পরিপূর্ণ হয়েছে। পক্ষান্তরে যদি ক্রেতার পক্ষ হতে কোন ব্যক্তির জন্য খিয়ারের শর্ত রাখা হয় এবং সে-ই শফী' হয়, তাহলে তার শুফ'আর অধিকার বাতিল হবে না।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ শফী'র নিকট এ মর্মে সংবাদ পৌছলো যে, (তার পার্শ্বের) বাড়ীটি এক হাজার দিরহামে বিক্রি করা হয়েছে। (এ কথা শুনে) সে এর থেকে দাবী প্রত্যাহার করে নিল। তারপর জানতে পারলো যে, এটি এর চেয়ে কম মূল্যে বিক্রি করা হয়েছে, অথবা গম বা যবের বিনিময়ে বিক্রি করা হয়েছে—যার মূল্য এক হাজার থেকে কম বা বেশী, তাহলে তার পূর্বোক্ত প্রত্যাহার বাতিল বলে গণ্য হবে এবং সে শুফ'আর অধিকারী হবে। কেননা, প্রথমোক্ত অবস্থায় সে মূল্যের আধিক্যের দরুণ শুফ'আ ছেড়ে দিয়েছিল। দ্বিতীয় অবস্থায় যে বস্তুর কথা তার নিকট পৌছেছিল, তা আদায় করা তার জন্য কঠিন হওয়ায় ছেড়ে দিয়েছিল। কিন্তু যে বস্তুর বিনিময়ে বিক্রি করা হয়েছে, তা আদায় করা তার জন্য সহজ ছিল। কাজেই প্রত্যাহার বাতিল হবে এবং সে শুফ'আর অধিকারী হবে। কারণ (শরী'আতে) উপরোক্ত বস্তুগলো বিভিন্ন প্রজাতির বস্তু হিসাবে গণ্য। অনুরূপভাবে পরিমাণযোগ্য বস্তু (مَكِيلِى), ওযনযোগ্য বস্তু (مَوْزُوْنِى) এবং সংখ্যায় গণনাযোগ্য বস্তু যা পরস্পর একটি অপরটির কাছাকাছি—এগুলোর হুকুমও ঠিক তদ্রূপই। পক্ষান্তরে শফী' যদি পরবর্তীতে এ কথা জানতে পারে যে, এটি (বাড়ীটি) এমন মাল-সামানের বিনিময়ে বিক্রি করা হয়েছে—যার মূল্য এক হাজার বা এক হাজারের চেয়ে বেশী (তাহলে সে শুফ'আর অধিকারী বলে গণ্য হবে না, বরং তার দাবী প্রত্যাহার সহীহ বলে গণ্য হবে।) কেননা সামানের বিনিময়ে মাল ক্রয় করা হলে, এ অবস্থায় কীমত (قِيْمَةٌ) তথা মূল্য ওয়াজিব

হয়। আর সে মূল্যটি হলো দিরহাম ও দীনার। আর যদি এ কথা প্রকাশ পায় যে, ঐ বাড়ীটি এই পরিমাণ দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) এর বিনিময়ে বিক্রি করা হয়েছে—যার মূল্য হাজার দিরহাম, তাহলে সে আর শুফ'আর হকদার হতে পারবে না। অনুরূপ এর মূল্য যদি এক হাজারের চেয়েও বেশী হয়,তাহলে এ ক্ষেত্রেও উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে।

ইমাম যুফার (র) বলেন ঃ সে ব্যক্তি শুফ'আর অধিকারী হবে বস্তুর প্রজাতির বিভিন্নতার কারণে। আর আমাদের দলীল হলো এই যে, মূল্যমানের দিক থেকে দিরহাম ও দীনার একই জাতীয় বস্তু।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ শফী'কে বলা হলো যে, ক্রেতা অমুক। এ কথা শুনে সে শুফ'আর দাবী ছেড়ে দিল। এরপর সে জানতে পারলো যে, বাড়ীর ক্রেতা অমুক ব্যক্তি নয় বরং অন্যজন, তাহলে সে শুফ'আর হকদার হবে। কেননা, প্রতিবেশী প্রতিবেশীর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। **আর সে যদি জানতে পারে যে, ক্রেতা উক্ত ব্যক্তি তো আছেই, তবে তার সাথে আরো এক ব্যক্তি রয়েছে, তাহলে শফী' অন্য ব্যক্তির অংশ শুফ'আ বাবত গ্রহণ করতে পারবে।** কেননা, অপরের অংশের ক্ষেত্রে তার প্রত্যাহার পাওয়া যায়নি। **বাড়ীটি অর্ধেক বিক্রয় হয়েছে বলে, শফী'র নিকট সংবাদ পৌছার পর সে তা প্রত্যাহার করেছিল। তারপর প্রকাশ পেল যে, পুরা বাড়ীই বিক্রি করা হয়েছে, তাহলে সে শুফ'আর অধিকারী হবে।** কেননা, অংশীদারীত্বের ক্ষতির আশংকায় শফী' প্রথমে শুফ'আর দাবী ছেড়ে দিয়েছিল, অথচ এ ক্ষেত্রে কোন অংশীদারীত্ব নেই। পক্ষান্তরে এর বিপরীত অবস্থায় 'যাহিরী রিওয়ায়েত মতে' শুফ'আ সাব্যস্ত হবে না, কেননা, সমস্ত বাড়ী হতে শুফ'আ ছেড়ে দিলে অংশের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য হবে।

পরিচ্ছেদ ঃ শুফ'আ বাতিল করার কৌশল[১] সম্পর্কিত মাসাইল

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ কেউ যদি তার বাড়ী বিক্রি করে শফী'র বাড়ী সংলগ্ন অংশ থেকে লম্বালম্বিভাবে এক হাত বাদ দিয়ে, তাহলে এ ক্ষেত্রে শফী' তার বাড়ীতে শুফ'আর দাবীদার হতে পারবে না। কেননা, তার প্রতিবেশী হওয়ার দাবী শেষ হয়ে গিয়েছে। মূলত: (শুফ'আ বাতিল করার) এটি একটি কৌশল। অনুরূপভাবে বাড়ীর মালিক যদি সে বাড়ী থেকে এ পরিমাণ অংশ কাউকে হিবা করে দেয় এবং তা তার নিকট হস্তান্তরও করে দেয় (তাহলেও উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে।) এর কারণ আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ কেউ যদি মূল্যের বিনিময়ে শুফ'আর বাড়ীটির কিছু অংশ প্রথমে ক্রয় করে, তারপর অবশিষ্টাংশ ক্রয় করে, তাহলে প্রতিবেশীর জন্য

১. অনেক সময় দেখা যায় যে, শফী' দুষ্ট প্রকৃতির মানুষ। তার পক্ষ হতে জ্বালাতন ও নির্যতনের শিকার হওয়ার সমূহ আশংকা রয়েছে। এ অবস্থায় সে যেন শুফ'আর দাবীদার না হতে পারে, সে জন্য কৌশল অবলম্বন করার অনুমতি ইসলামী শরী'আতে রয়েছে। একে শরী'আতের পভিবাষায় 'হীলা' বলা হয়। কিন্তু শরী'আত অনুমোদিত কোন কারণ না থাকা অবস্থায় এরূপ কৌশল অবলম্বন করা উচিত নয়।

শুধুমাত্র প্রথম অংশে শুফ'আর অধিকার সাব্যস্ত হবে। অপর অংশে সাব্যস্ত হবে না। কেননা, (উক্ত) শফী' উভয় অংশের মধ্যেই প্রতিবেশী। তবে ক্রেতা ব্যক্তি দ্বিতীয় অংশ (যা সে পরে খরীদ করেছে) এর মূল ভূমিতে অংশীদার। কাজেই সে (ক্রেতা) তার (শফী'র) উপর অগ্রাধিকার লাভ করবে। তারপর ক্রেতা যদি হীলা অবলম্বন করার ইচ্ছা করে, তবে সে শুফ'আর বাড়ীটির একাংশ এক দিরহাম কম পূর্ণ মূল্য দিয়ে খরীদ করবে। এরপর ঐ এক দিরহাম মূল্যের বিনিময়ে বাকী অংশ খরীদ করবে।[১]

কেউ যদি মূল্যের বিনিময়ে বাড়ী খরীদ করে (মূল্য পরিশোধ না করে) এর পরিবর্তে কাপড় প্রদান করে, তাহলে মূল্যের বিনিময়ে শুফ'আ সাব্যস্ত হবে, কাপড়ের বিনিময়ে শুফ'আ সাব্যস্ত হবে না। কেননা, এটি (কাপড়ের বিনিময়ে মূল্য পরিশোধ করা) ভিন্ন একটি আকদ (লেন-দেন)। আর মূল্য প্রদান করাই মূলতঃ বাড়ীর আসল বিনিময়।

গ্রন্থকার বলেন ঃ এটি অপর একটি হীলা—যা প্রতিবেশী এবং অংশীদার উভয়কে শামিল করে। কাজেই বাড়ীটি এর মূল্য হতে কয়েক গুণ অধিক মূল্যে বিক্রি করা যাবে এবং পরে ঐ মূল্যের বিনিময়ে কিছু কাপড় প্রদান করা যাবে।[২] কিন্তু যদি শুফ'আর বাড়ীটি অন্যের বলে সাব্যস্ত হয়, তবে দ্বিতীয় বিক্রয় অবশিষ্ট থাকায়—কাপড়ের খরিদ্দার (বাড়ী বিক্রয়কারী) এর উপর পূর্ণ মূল্য বাকী থেকে যাবে। এতে বাড়ী বিক্রেতার ক্ষতি সাধিত হবে। হীলার উত্তম রূপ হলো, এ অবস্থায় দিরহামের মূল্যের বিনিময় দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) বিক্রি করা হবে। এমনকি যখন শুফ'আর দাবীকৃত বাড়ীর অন্য কোন মালিক বের হয়ে আসবে, তখন (ক্রেতা-বিক্রেতার) 'বায়য়ে-সারফ' বাতিল বলে গণ্য হবে। এ ক্ষেত্রে ক্রেতার উপর ওয়াজিব হবে দীনার ফেরৎ দেওয়া। অন্য কিছু নয়।[৩]

---

১. যেমন একটি বাড়ীর মূল্য বিশ হাজার টাকা। ক্রেতা প্রথমে এর একটি অংশ উনিশ হাজার নয় শ নিরানব্বই টাকার বিনিময়ে খরীদ করলো। তারপর অপর অংশটি এক টাকার বিনিময়ে খরীদ করলো। এ অবস্থায় শেষোক্ত অংশটিতে শফী হক্কে শুফ'আর দাবীদার হতে পারবে না। কেননা, ক্রেতা ব্যক্তি এ ক্ষেত্রে তার থেকে অগ্রাধিকার রাখে, অবশ্য প্রথম অংশে সে শুফ'আ দাবী করার অধিকার রাখে। কিন্তু এত অধিক মূল্য দিয়ে সে তা গ্রহণ করবে না। শুফ'আ বাতিল করার এটি একটি সফল কৌশল।

২. যেমন কোন একটি বাড়ীর মূল্য তিন হাজার টাকা। আর এর মূল্য ধার্য করা হলো বিশ হাজার টাকা। পরে এই বিশ হাজার টাকার বিনিময়ে তিন হাজার টাকা মূল্যের কিছু কাপড় প্রদান করা হলো। এখন যদি শফী' এই বাড়ীটি নিতে চায়, তবে তাকে বিশ হাজার টাকা পরিশোধ করেই তা নিতে হবে। কাপড়ের বিনিময়েও নিতে পারবে না এবং তিন হাজারের বিনিময়েও নিতে পারবে না। পরিণামে সে এত চড়া মূল্য দিয়ে শুফ'আ গ্রহণ করবে না। এই হীলা প্রতিবেশী এবং অংশীদার উভয়ের মাঝে পরিব্যাপ্ত। আর প্রথমটি শুধুমাত্র প্রতিবেশীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

৩. হিদায়া গ্রন্থকার বলেন, এই হীলা তো খুবই চমৎকার। কিন্তু এতে একটি ক্ষতিকর দিক রয়েছে। তা হলো এই যে, যদি ঘটনাক্রমে এই বাড়ীর প্রকৃত মালিক বলে দাবী করে এবং বিচারক সে বাড়ী তাকে হস্তান্তর করে দেয় তবে ক্রেতা বিক্রেতার নিকট থেকে এর মূল্য উসূল করে নেবে। এখন প্রশ্ন হলো, সে কি আসল মূল্য উসূল করে নেবে, না কি কাপড় উসূল করে নেবে ? আসল মূল্য তো বিশ হাজার টাকা। এ পরিমাণ টাকা যদি ক্রেতাকে পরিশোধ করতে হয়, তাহলে এতে তো বিক্রেতার বিরাট ক্ষতি। সে নিয়েছিল কাপড়, এখন তাকে দিতে হচ্ছে বিশ হাজার টাকা। তাই উত্তম হলো, প্রথমে বাড়ীটি বিশ হাজারের বিনিময়ে বিক্রি করবে। পরে এই বিশ হাজার দিরহামকে এক দীনারের বিনিময়ে বিক্রি করে দেবে। এ অবস্থায় শফী' যদি এ বাড়ীটি নিতে চায়, তবে বিশ হাজারের বিনিময়ে নিতে হবে। আর ঘটনাক্রমে যদি এর অপর কোন হকদার বের হয়ে আসে, তাহলে বিক্রেতা ক্রেতাকে মাত্র এক দীনার ফেরৎ দেবে। এ প্রক্রিয়া অবলম্বন করলে শফী'রও ক্ষতি হবে না, এমনিভাবে বিক্রেতারও কোন ক্ষতি হবে না।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ শুফ'আ বাতিল করার জন্য হীলা অবলম্বন করা ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর মতে মাকরূহ নয়। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (র) এর মতে মাকরূহ। কেননা, ক্ষতি প্রতিহত করার জন্য শুফ'আ সাব্যস্ত করা হয়েছে। এমতাবস্থায় আমরা যদি হীলাকে বৈধ রাখি, তাহলে আমরা তো শফী'র ক্ষতিকে প্রতিহত করলাম না। (বরং তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য আরো সুযোগ করে দিলাম।)

ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর যুক্তি হলো, হীলা অবলম্বন করা মূলত: হক সাব্যস্ত করা থেকে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার নামান্তর। (এটা কাউকে ক্ষতি করা নয়), কাজেই একে ক্ষতিকর পদক্ষেপরূপে গণ্য করা হবে না। যাকাত রহিত করার জন্য হীলা বা কৌশল অবলম্বন করার ব্যাপারেও এ জাতীয় মতানৈক্য বিদ্যমান রয়েছে।

পরিচ্ছেদ ঃ বিবিধ মাসাইল

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন ঃ যদি পাঁচ ব্যক্তি কোন এক ব্যক্তির নিকট থেকে বাড়ী খরীদ করে, তবে শফী' এই পাঁচজনের কোন একজনের হিস্যা শুফ'আ বাবত গ্রহণ করতে পারবে। আর যদি এক ব্যক্তি পাঁচ ব্যক্তির নিকট থেকে কোন বাড়ী খরীদ করে, তাহলে শফী' হয়তো পূর্ণ বাড়ীটি শুফ'আ বাবত গ্রহণ করবে, অথবা পূর্ণ বাড়ীটি ছেড়ে দেবে।

উপরোক্ত মাসআলা দু'টির মধ্যে পার্থক্যের কারণ হলো এই যে, দ্বিতীয় মাসআলায় শফী' যদি বাড়ীর কোন একটি অংশ শুফ'আ বাবত গ্রহণ করে, তবে এতে ক্রেতার জন্য বেচা-কেনায় পার্থক্য দেখা দেবে। (এরূপ করা নিষিদ্ধ।) কারণ এতে তার ভীষণ ক্ষতি হবে। আর প্রথম মাসআলায় শফী' উক্ত পাঁচজন খরিদ্দারের কোন একজনের স্থলাভিষিক্ত হবে। এতে বেচা-কেনায় কোনরূপ পার্থক্য সাধিত হবে না। আর উপরোক্ত হুকুমের মধ্যে কোন পার্থক্য সাধিত হবে না—চাই (ক্রেতা) মালামাল হস্তগত করুক বা না করুক। আর এটিই সঠিক অভিমত। তবে (ক্রেতাদের) হস্তগত করার পূর্বে শফী' তাদের পাঁচজনের কোন একজনের অংশ শুফ'আ বাবত গ্রহণ করতে পারবে না, যদিও সে তার নিকট যা পাওনা তা নগদ পরিশোধ করে দেয়; যতক্ষণ না অপরাপর ক্রেতাগণ তাদের নিকট পাওনা নগদ মূল্যে পরিশোধ করবে—যাতে বিভিন্ন সময়ে বাড়ীর মূল্য হস্তগত করা পর্যন্ত বিক্রেতাকে না পৌছে দেয়। বস্তুত: শফী'র বিষয়টি যৌথভাবে কোন কিছু খরীদকারী দুই ক্রেতার কোন একজনের মতই। পক্ষান্তরে বাড়ী হস্তগত করার পর এমনটি হলে এর হুকুম হবে ভিন্ন ধরনের। কেননা, এ ক্ষেত্রে বিক্রেতার আধিপত্য ও মালিকানা নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। চাই বিক্রেতা উক্ত বাড়ীর প্রতিটি অংশের মূল্য পৃথক পৃথকভাবে নির্ধারিত করে দেন বা মূল্যের পরিমাণ সমষ্টিগতভাবে বলে দেন (তাতে হুকুমের মধ্যে কোন পার্থক্য সাধিত হবে না।) কেননা, এ ক্ষেত্রে লেন-দেনকে ভাগ করার বিষয়টিই হলো বিবেচ্য; মূল্যের বিষয়টি বিবেচ্য নয়। এখানে আরো অনেকগুলো খণ্ড খণ্ড মাসআলা রয়েছে, যা আমি 'ফিকায়াতুল মুনতাহী' গ্রন্থে সবিস্তারে উল্লেখ করেছি।

'জামে সগীর' গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন ঃ কেউ যদি এমন বাড়ীর অর্ধাংশ খরীদ করে, যা এখনো বন্টন করা হয়নি (বরং ইজমালী রয়েছে)। এরপর বিক্রেতা ক্রেতাকে তা বন্টন করে দেয়। তাহলে শফী' ক্রেতার জন্য যে অর্ধাংশ বির্ধারিত হয়েছে, তা শুফ'আ বাবত গ্রহণ করতে পারবে। অথবা সে তা (ইচ্ছা করলে) ছেড়ে দেবে। কেননা, বন্টন করার দ্বারা হস্তগত করা সম্পন্ন হয়। কারণ এর বন্টন দ্বারা উপকৃত হওয়ার বিষয়টির পূর্ণতা বিধান করা হয়। এ কারণেই হিবার মধ্যে বন্টন দ্বারা কব্‌য্ তথা হস্তগতকরণ পরিপূর্ণ হয়ে থাকে। আর শফী' হস্তগতকরণ রোধ করতে পারে না। যদিও বেচা-কেনার দায়-দায়িত্ব বিক্রেতার উপর বর্তায় বিধায় এই হস্তগতকরণে শফী'র কিছুটা লাভালাভের ব্যাপারও নিহিত রয়েছে। কাজেই শফী' (যেমন হস্তগতকরণকে রোধ করতে পারে না, তেমনিভাবে সে) যে বিষয়টি (বন্টন) এর পূর্ণতার সাথে সম্পর্কিত, তাও রোধ করতে পারবে না।

পক্ষান্তরে যদি দুই অংশীদারের কোন একজন তাদের ইজমালী বাড়ী হতে নিজ অংশ বিক্রি করে দেয় এবং পরে যদি ক্রেতা যে অংশীদার এখনো তার অংশ বিক্রি করেনি, তার থেকে নিজ অংশ বন্টন করে নেয়, তাহলে শফী' এই বন্টনকে নাকচ করে দিতে পারবে। কেননা ক্রেতা যার সাথে বন্টনকার্য সম্পন্ন করেছে, তার সাথে 'আক্‌দ (চুক্তি) সম্পাদিত হয়নি। কাজেই এ বন্টন ঐ হস্তগতকরণের পূর্ণতা বিধানকারীরূপে গণ্য হবে না—যা আকদের হুকুম ছিল। বরং এটি মালিকানার ভিত্তিতে (ক্রেতার) এক ধরনের تَصَرُّفٌ বা হস্তক্ষেপ। সুতরাং শফী' এই হস্তক্ষেপকে নাকচ করে দিতে পারবে—যেভাবে সে ক্রেতার বেচা-কেনা এবং হিবাকে নাকচ করে দিতে পারে।[১]

এরপর মূল কিতাব 'জামে সগীর গ্রন্থে' উত্তরটিকে মুতলাক (مُطْلَقٌ) রাখায় এ কথার প্রতি ইংগিত বহন করে যে, শফী' ঐ অর্ধাংশই শুফ'আ বাবত গ্রহণ করবে, যা ক্রেতার অংশ হিসাবে সাব্যস্ত হয়েছে, তা যেই দিক থেকেই হোক না কেন।[২] ইমাম আবু ইউসুফ (র) হতে এ কথাই বর্ণিত রয়েছে। কেননা ক্রেতা বন্টনের মাধ্যমে শফী'র হক বাতিল করার অধিকার রাখে না।[৩]

ইমাম আবু হানীফা (র) হতে বর্ণিত আছে যে, শফী' ঐ অর্ধাংশ শুফ'আ বাবত তখনই গ্রহণ করবে, যদি তা শফী'র বাড়ীর দিকে অবস্থিত হয়, যে বাড়ীর উপর ভিত্তি করে সে শুফ'আর দাবী করছে। কেননা, ক্রেতার অর্ধাংশ যদি অন্য প্রান্তে থাকে,

---

১. যেমন একটি বাড়ীর দু'জন মালিক। তাদের একজন সেই ইজমালী বাড়ী হতে তার নিজ অংশটি বিক্রি করে দিল। এ অবস্থায় ক্রেতা যদি তার অংশটি ঐ অংশীদার ব্যক্তি থেকে বন্টন করে আলাদা করে নেয়, যে তার অংশটি বিক্রি করেনি, তাহলে শফী' এ বন্টনকে নাকচ করে দিতে পারবে। কেননা এখানের বন্টন হস্তগতকরণের জন্য পূর্ণতা বিধানকারী নয়। কারণ এ বন্টন বিক্রেতার সাথে হয়নি। এমন ব্যক্তির সাথে হয়েছে, যে এক্ষেত্রে একজন অপরিচিত ব্যক্তির ন্যায়। কাজেই শফী' তা নাকচ করে দিতে পারবে।

২. জামে সগীরের বর্ণনা মতে একথা প্রতীয়মান হয় যে, ক্রেতার অংশ শফী'র বাড়ীর দিকে সাব্যস্ত হোক বা অন্য দিকে সাব্যস্ত হোক, উভয় অবস্থায়ই শফী' ঐ অর্ধাংশের শুফ'আর অধিকারী হবে।

৩. ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর অভিমতও তাই, যাতে শফী'র হক বাতিল করার কোন সুযোগ না হয়।

তাহলে সে আর ঐ বাড়ীর প্রতিবেশী থাকে না।[১] **(এবং এ অবস্থায় শুফ'আর দাবী করাও তার জন্য বৈধ হবে না।)**

ইমাম মুহাম্মদ (র) 'জামে সগীর' গ্রন্থে বলেন ঃ কোন ব্যক্তি একটি বাড়ী বিক্রি করলো; অথচ তার এমন একটি (ব্যবসার ব্যাপারে) অনুমতিপ্রাপ্ত গোলাম আছে, যার উপরে ঋণ রয়েছে, তাহলে (মুনীবের বিক্রীত বাড়ীতে) তার জন্য শুফ'আ সাব্যস্ত হবে। অনুরূপভাবে গোলাম যদি বিক্রেতা হয়, তাহলে মুনীবও তার বিক্রীত বাড়ীতে শুফ'আর হকদার হবে। কেননা, শুফ'আর মাধ্যমে সম্পত্তি গ্রহণ করা মূল্যের বিনিময়ে মালিক হওয়ারই নামান্তর। কাজেই শুফ'আর মাধ্যমে হাসিল করাকে ক্রয়ের মাধ্যমে হাসিল করার পর্যায়ে গণ্য করা হবে। আর তা এজন্য যে, এভাবে ক্রয় করা গোলামের জন্য লাভজনক বিষয়। কারণ গোলাম ব্যক্তি সে তো ঋণদাতা-পাওনাদার ব্যক্তিদের জন্য লেন-দেন করে থাকে। পক্ষান্তরে গোলাম যদি ঋণগ্রস্ত না হয়, তবে এর হুকুম ভিন্ন ধরনের হবে। কেননা, এ অবস্থায় সে তো মুনীবের লাভালাভের জন্যই বেচা-কেনা করে। আর যার জন্য বেচা-কেনা করা হয়, সে শুফ'আর হকদার হয় না।

ইমাম মুহাম্মদ (র) 'জামে সগীর' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর মতে নাবালকের পক্ষ হতে পিতা বা (অসিয়্যত বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত) অসী, যদি তার শুফ'আর বিষয়টি প্রত্যাহার করে বা ছেড়ে দেয়, তবে তা জাইয আছে।

কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ ও যুফার (র) এর মতে নাবালক বাচ্চা সাবালক হওয়া পর্যন্ত তার শুফ'আর অধিকার বহাল থাকবে।

ফকীহগণ বলেন ঃ নাবালকের বাড়ীর পার্শ্বে অপর একটি বাড়ী বিক্রি হওয়ার সংবাদ পিতা বা অসীর নিকট পৌছার পর তারা যদি তার পক্ষ হয়ে শুফ'আর দাবীদার না হয় তাহলে এ ক্ষেত্রেও উপরোক্ত মতানৈক্য প্রযোজ্য হবে। এমনিভাবে যে ব্যক্তিকে শুফ'আ দাবী করার জন্য উকীল নিয়োগ করা হয়েছে, সে যদি শুফ'আর দাবী ছেড়ে দেয়, তবে 'কিতাবুল ওয়াকালাত' এর বর্ণনামতে এ ক্ষেত্রে উক্ত মতানৈক্য প্রযোজ্য হবে। আর এটিই সহীহ অভিমত।

ইমাম মুহাম্মদ এবং ইমাম যুফার (র) তাদের মতের সমর্থনে বলেন ঃ নাবালকের জন্য শুফ'আর অধিকার একটি প্রতিষ্ঠিত অধিকার। কাজেই দিয়াত (মুক্তিপণ) ও কিসাসের মত তারা তার শুফ'আর অধিকারকেও বাতিল করতে পারবে না। অধিকন্তু শরী'আতে শুফ'আর অনুমোদন দেওয়া হয়েছে শফী'কে ক্ষয়-ক্ষতি থেকে রক্ষা করার জন্য। অথচ শুফ'আর অধিকার বাতিল করাতে তার ক্ষতিই সাধন করা হয়। (কাজেই তারা তার শুফ'আর অধিকার বাতিল করতে পারবে না।)

১. পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন ঃ ক্রেতার সে অর্ধাংশ যদি শফীর বাড়ীর দিকে অবস্থিত হয়, তবে শফী' তা শুফ'আ বাবত গ্রহণ করতে পারবে।

শায়খায়নের[১] দলীল হলো এই যে, শুফ'আর মাধ্যমে সম্পত্তি গ্রহণ করা মূলত: ব্যবসার মতই একটি বিষয়। তাই পিতা বা অসী তা ছেড়ে দিতে পারবে। লক্ষণীয় যে, কেউ যদি নাবালক বাচ্চার জন্য বেচা-কেনাকে ওয়াজিব করে, তবে পিতা বা অসী (ইচ্ছা করলে) তা রদ করে দিতে পারবে এবং তা সহীহও হবে। দ্বিতীয়ত: শুফ'আর মাধ্যমে কোন সম্পত্তি গ্রহণ করার বিষয়টি লাভ-ক্ষতির মাঝে আবর্তিত হয়। কাজেই শুফ'আ বর্জন করা কখনো তার জন্য অনুকম্পা ও দয়া হিসাবে গণ্য হয়। এতে মূল্য (টাকা-পয়সা) নাবালকের মালিকানায় থেকে যায়। আর ওলীর জন্য এ অধিকার অনুকম্পা ও অনুগ্রহের ভিত্তিতেই সাব্যস্ত হয়ে থাকে, (অন্য কারণে নয়।) কাজেই তারা এর অধিকারী হবে। নাবালকের পক্ষ হতে শুফ'আর দাবী না করে পিতা বা অসী যদি নীরবতা পালন করে, তবে এ-ও তাদের পক্ষ হতে নাবালকের হক বাতিল করার অন্তর্ভুক্ত। কেননা চুপ থাকা শুফ'আ গ্রহণে অনীহার দলীল। এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে, যদি ঐ বাড়ী বা সম্পত্তি বাজার দরের বিনিময়ে বিক্রি করা হয়।

পক্ষান্তরে যদি বাজার দর হতে এমন অধিক মূল্যে বাড়ীটি বিক্রি করা হয় —যে পরিমাণ দামের ক্ষেত্রে মানুষ সাধারণত: ধোঁকা খায় না, তাহলে এ ক্ষেত্রে (ফকীহগণের মতভেদ রয়েছে)। কেউ কেউ বলেন ঃ শুফ'আ ছেড়ে দেওয়া ঐক্যমত জাইয। কেননা, এ অবস্থায় শুফ'আ ছেড়ে দিলে নাবালকের প্রতি স্নেহ ও দয়া প্রদর্শন করা হয়। আবার কেউ কেউ বলেন ঃ পিতা বা অসী শুফ'আ ছেড়ে দিলে তা ঐক্যমতের ভিত্তিতে জাইয হবে না। কেননা, এ অবস্থায় উপরোক্ত দুই ব্যক্তির কেউই শুফ'আ গ্রহণের হকদার নয়। কাজেই তারা শুফ'আ ছেড়ে দেওয়ারও হকদার হবে না। যেমন অপরিচিত ব্যক্তি হকদার হয় না।

যদি বাড়ীটি উচিত মূল্য হতে অনেক বাদ দিয়ে বিক্তি করা হয়, তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে তাদের পক্ষ হতে শুফ'আ ছেড়ে দেওয়া বৈধ হবে না। এ ক্ষেত্রে ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর কোন বর্ণনা নেই। আল্লাহ্ সম্যক অবহিত।

---

১. ইমাম আবু হানীফা (র) ও ইমাম আবু ইউসুফ (র) কে শায়খায়ন বলা হয়।

كِتَابُ الْقِسْمَةِ

অধ্যায় ঃ বণ্টনের মাসাইল

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْقِسْمَةِ

অধ্যায় ঃ বন্টনের মাসাইল

গ্রন্থকার বলেন: যৌথ মালিকানাধীন ইজমালী বস্তু বণ্টন করা শরী'আত অনুমোদিত। কেননা, নবী করীম (স) গনীমতের মাল এবং উত্তরাধিকার সম্পদে বন্টনকর্ম সম্পাদন করেছেন। অধিকন্তু এ বন্টনকর্ম কোনরূপ আপত্তি ছাড়াই যুগযুগ ধরে চলে আসছে। সর্বোপরি এতে বিনিময়ের অর্থও বিদ্যমান রয়েছে। কেননা, দুইজন অংশীদার ব্যক্তির কোন একজনের ভাগে যে অংশ আছে, এর কিছু অংশ তো তার এবং অপর কিছু অংশ তার সাথীর। সে এ অংশটি গ্রহণ করেছে ঐ অংশের পরিবর্তে, যা তার সাথীর ভাগে তার অংশ থেকে রয়েছে। কাজেই এতে বিনিময়ের অর্থও নিহিত রয়েছে। পরিমাণযোগ্য এবং ওযনযোগ্য বস্তুতে কোনরূপ তফাৎ না থাকায় তাতে পৃথক করার অর্থই স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। এ কারণেই এ জাতীয় বস্তুর ক্ষেত্রে দুই অংশীদারের একজন অপর জনের অনুপস্থিতিতে নিজের অংশ বুঝে নিতে পারে।

যদি দুই ব্যক্তি যৌথভাবে কোন বস্তু খরীদ করে পরে তা বণ্টন করে নেয় তবে তাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ অংশ (পূর্ণমুল্য হতে) অর্ধ মূল্যের বিনিময়ে মুরাবাহার (লাভের) ভিত্তিতে লাভে বিক্রি করতে পারবে।

যেহেতু জীব জানোয়ার এবং আসবাব পত্রের মধ্যে পরস্পর ব্যবধান বিদ্যমান, এ কারণে এ সবের ক্ষেত্রে বিনিময়ের অর্থটি স্পষ্ট। আর এ কারণেই অংশীদারদের এক জন অপর জনের অনুপস্থিতিতে নিজ অংশ গ্রহণ করতে পারবে না। যদি (তারা) দুই জন মিলে কোন কিছু খরীদ করার পর তা বন্টন করে নেয়, এ বন্টনের পর তাদের কেউই নিজ নিজ অংশ মুরাবাহার ভিত্তিতে বিক্রয় করতে পারবে না। কিন্তু যদি ঐ জীব- জানোয়ারগুলো একই প্রজাতির হয়, তাহলে শরীকদের কোন একজনের বণ্টন কামনা করার সময় বিচারক তা বণ্টন করে দেওয়ার জন্য (সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে) বাধ্য করবে। কেননা, উদ্দেশ্যের বিভিন্নতার কারণে এগুলোর মধ্যে পৃথক করার অর্থও বিদ্যমান আছে। আর مبادلة বা বিনিময়ের বিষয়টি এমন, যাতে বল প্রয়োগের বিষয়টি প্রযোজ্য হয়। যেমনিভাবে ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে বল প্রয়োগের বিষয়টি প্রযোজ্য হয়ে থাকে।

বণ্টনের জন্য বিচারক এ কারণেই বাধ্য করবে যে, শরীকদের কোন একজন বণ্টন কামনা করে বিচারকের নিকট মূলত: এ দাবীই করছে যে, বিচারক যেন তার অংশ দ্বারা তাকেই উপকৃত হওয়ার সুযোগ করে দেন এবং তার মালিকানাধীন সম্পত্তি দ্বারা অন্যের লাভালাভ হাসিল করার ক্ষেত্রে যেন বিধি-নিষেধ আরোপ করেন। অতএব বিচারকের জন্য অপরিহার্য হলো তার দাবী মঞ্জুর করা।

পক্ষান্তরে, জীব–জানোয়ার গুলো যদি বিভিন্ন প্রজাতির হয়, তাহলে এ সবের উদ্দেশ্যের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান থাকায় (বণ্টনে) সমতা বিধান করা অসম্ভব হওয়ার কারণে, বিচারক বণ্টনের ব্যাপারে বিবাদী পক্ষকে বাধ্য করবে না। যদি অংশীদার সকলেই বণ্টনের ব্যাপারে রাযী থাকে তবে বণ্টন করা জাইয হবে। কেননা, হক(পাওনা) তাদেরই।

ইমাম কুদূরী বলেন : বিচারকের জন্য সমীচীন হলো (স্বাধীন ভাবে) একজন বণ্টনকারী (আমীন) নিয়োগ করা। বায়তুল মাল (রাষ্ট্রীয় ধনাগার) থেকে তার জীবিকার ব্যবস্থা করা হবে এবং সে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা ব্যতিরেকে মানুষের বণ্টন কার্য সম্পাদন করে দেবে। কেননা, এটি আদালতের সাথেই সম্পর্কিত একটি কাজ, যেহেতু এর দ্বারা পরস্পরের ঝগড়া–বিবাদ নির্মূল হয়। এ হিসাবে বণ্টনকারীর জীবিকার বিষয়টি বিচারকের জীবিকার মতই হলো। কাজেই বিচারকের ন্যায় তার জন্যও বায়তুল মাল থেকে জীবিকার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। দ্বিতীয়ত: বণ্টনকারী নিয়োগ করার উপকার জনসাধারণ সকলেই ভোগ করে থাকে। কাজেই জন সাধারণের মাল থেকেই তাদের জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা করতে হবে, 'লাভ হিসাবে জরিমানা' এ বিধান বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে।[১]

ইমাম কুদূরী বলেন: বিচারক যদি (সরকারীভাবে) কোন বণ্টনকারী নিয়োগ না করে, তবে সে এমনভাবে একজন বণ্টনকারী নিয়োগ করবে, যে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে বণ্টন কার্য সম্পাদন করবে। এর অর্থ হলো : যারা বণ্টন করাবে, এ পারিশ্রমিকের দায়–দায়িত্ব তাদের উপরই বর্তাবে। কেননা, এতে উপকার তো বিশেষভাবে তাদেরই হচ্ছে। বিচারক তার জন্য স্বাভাবিক পারিশ্রমিক সাব্যস্ত করে দেবেন, যাতে সে (সরকারী লোক হওয়ার সুযোগে) অধিক পারিশ্রমিক গ্রহণ করে যুল্‌ম করার সুযোগ না পায়। তবে উত্তম হলো : বায়তুল মাল হতে তার জীবিকার ব্যবস্থা করা। কেননা, এটাই মানুষের জন্য সহজ ব্যবস্থা এবং তার অপবাদ থেকে দূরে থাকার উপায়।

বণ্টনকারী ব্যক্তির জন্য অপরিহার্য হলো ঃ (১) ন্যায়পরায়ণ (২) আমানতদার (৩) এবং বণ্টন সম্পর্কে প্রাজ্ঞ হওয়া। কেননা, এটিও বিচার ব্যবস্থার অনুরূপ একটি কাজ। অধিকন্তু এ কাজ আঞ্জাম দেয়ার জন্য কুদরত তথা ক্ষমতাবান হওয়া আবশ্যক। আর তা হাসিল হয় এ সম্পর্কিত ইলমের(জ্ঞানের) দ্বারা। অনুরূপভাবে এ কাজের জন্য

১. হাদীসেও এ কথা উল্লেখ রয়েছে যে, اَلْغُرْمُ بِالْغُنْمِ। – লাভ হিসাবেই জরিমানা তথা দায়িত্ব আপতিত হয়ে থাকে। কাজেই যাদের লাভ হবে তাদেরই এর ভরণ-পোষণের দায়–দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে।

তার নির্ভরযোগ্য এবং গ্রহণযোগ্য হওয়াও আবশ্যক। আর তা হাসিল হয় আমানতদারীর মাধ্যমে।

বিচারক এক বন্টনকারীকে মেনে নেওয়ার জন্য লোকদেরকে বাধ্য করতে পারবে না। এর অর্থ হলো : বিচারক লোকদেরকে এ ব্যাপারে বাধ্য করতে পারবে না যে, তারা যেন তাকেই এ কাজের জন্য শ্রম বিনিয়োগকারী বলে সাব্যস্ত করে। কেননা, আকদের ব্যাপারে বল প্রয়োগ জাইয নয়। অধিকন্তু যদি এক ব্যক্তিকেই বন্টনকারী মনোনীত করা হয়, তাহলে সে স্বাভাবিক পারিশ্রমিক হতে অধিক পারিশ্রমিক গ্রহণ করে লোকদের প্রতি যুল্‌ম করবে।

যদি অংশীদারগণ একমত হয়ে নিজেদের সম্পত্তি নিজেরা পরস্পর বন্টন করে নেয়, তাহলে তা জাইয আছে। কিন্তু যদি অংশীদারদের মধ্যে কোন নাবালক বাচ্চা থাকে, তাহলে এ ক্ষেত্রে বিচারক বা আদালতের ফয়সালা আবশ্যক হবে। কেননা, তাদের (অংশীদারদের) তার (নাবালকের) উপর কোন কর্তৃত্ব নেই।

ইমাম কুদূরী বলেন : **বন্টনকারীদেরকে এ সুযোগ দেওয়া যাবে না যে, তারা সকলে একত্রে মিলে বন্টন কার্য সম্পাদন করবে,** যাতে তাদের পারস্পরিক ঐক্যমতের কারণে পারিশ্রমিকের বিষয়টি অত্যধিক বৃদ্ধি না পেয়ে যায়। অবশ্য যদি বন্টনকারীগণ পরস্পর ঐক্যবদ্ধ না থাকে, তাহলে বন্টন কার্য হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার আশংকায় তারা প্রত্যেকেই কাজ হাসিলের ব্যাপারে প্রতিযোগিতা করবে। ফলে পারিশ্রমিক সস্তা হবে।

ইমাম কুদূরী বলেন : **বন্টনের পারিশ্রমিক মাথা পিছু হারে ধার্য হবে,** ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে। পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র) এর মতে প্রত্যেক্যের ভাগ অনুসারে তা সাব্যস্ত হবে। কেননা, এটি হচ্ছে মালিকানার ব্যয়। কাজেই তা মালিকানা হিসাবেই সাব্যস্ত হবে। যেমন কয়াল-ওযনদাতার খরচা, যৌথ কূপ খনন করার ব্যয় এবং যৌথ মালিকানাধীন গোলামের খরচা ইত্যাদি (মালিকানা হিসাবেই সাব্যস্ত হয়)।

ইমাম আবু হানীফা (র) এর দলীল হলো : পারিশ্রমিক দিতে হয় মালামাল পৃথক করার দরুন। আর এ পৃথক করণের বিষয়টিতে কোন তফাৎ নেই। অনেক সময় স্বল্প মালের প্রতি নযর রাখা কঠিন বিষয় হয়ে পড়ে। আবার কখনো বিপরীতও হয়ে থাকে। বস্তুত: কম-বেশীর বিষয়টি হিসাবে আনা খুবই দুস্কর ব্যাপার। কাজেই মালামাল পৃথক করণের সাথেই মূল হুকুম সম্পর্কিত হবে।[১] কূপ খননের বিষয়টি এর থেকে ভিন্ন। কেননা, সেখানে পারিশ্রমিক দিতে হয় মাটি স্থানান্তরিত করার কারণে। আর এতে বেশ-কম হয়ে থাকে। (কাজেই কূপ খননের বিষয়ের উপর আলোচ্য মাসআলাকে কিয়াস করা যাবে না।)

---

১. আর এ বিষয়টিতে যেহেতু কম-বেশীর কারণে কোন ব্যবধান হয় না, তাই বন্টনের পারিশ্রমিক মাথাপিছু হারেই পরিশোধ করতে হবে।

কয়ালী ও ওযন করা যদি বণ্টনের উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে তবে ফকীহদের এতে অনুরূপ মতানৈক্য বিদ্যমান রয়েছে। আর যদি এ কাজ বণ্টনের জন্য না হয়ে থাকে, তাহলে পারিশ্রমিক দিতে হবে কয়ালী ও ওযন করার বিনিময়ে। আর এ কাজের মধ্যে কম-বেশী হয়ে থাকে। (কাজেই পারিশ্রমিকের মধ্যেও কম্-বেশী হবে।) কিন্তু যদি বিষয়টি স্পষ্ট না বলে সাধারণভাবে বর্ণনা করে, তবে এটি হবে একটি ওযর।[১]

ইমাম আবু হানীফা (র) হতে বর্ণিত আছে যে, বন্টনকারীর পারিশ্রমিক যে বণ্টন করে নিতে চায়, তার উপর বর্তাবে, বণ্টন অস্বীকারকারীর উপর বর্তাবে না। কেননা, এতে লাভ হলো তার, যে বণ্টন করে নিতে চায় আর লোকসান হলো, অস্বীকার কারীর।[২]

ইমাম কুদূরী বলেন : যদি অংশীদারদের সকলে বিচারকের আদালতে হাযির হয় এবং বাড়ী বা জমি তাদের মালিকানায় থাকে, আর তারা এ মর্মে দাবী করে যে, তারা অমুক থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে এ সম্পত্তির মালিক হয়েছে, (এখন তারা এ সম্পত্তি ভাগ করে নিতে চায়) তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে, বিচারক (তাদেরকে) এ সম্পত্তি ততক্ষণ পর্যন্ত বণ্টন করে দেবেন না, যতক্ষণ না তারা উক্ত ব্যক্তির মারা যাওয়া এবং ওয়ারিশদের সংখ্যা কত, এ ব্যাপারে-সাক্ষী-প্রমাণ পেশ করবে।

পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইউসুফ এবং ইমাম মুহাম্মদ (র) এর মতে, বিচারক তাদের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে উক্ত সম্পত্তি বণ্টন করে দেবেন এবং তিনি বণ্টন নামায় এ কথা উল্লেখ করে দেবেন যে, তিনি তাদের সকলের কথা মতই এ বণ্টন কার্য সম্পাদন করেছেন।

যদি এ যৌথ সম্পত্তি জমি না হয়ে অন্য কোন মালামাল হয় এবং তারা দাবী করে যে, তারা মীরাস সূত্রে এ মালামাল প্রাপ্ত হয়েছে, তাহলে ইমামত্রয়ের সকলের মতে বিচারক তাদের দাবীর প্রেক্ষিতে তাদের এ মালামাল বণ্টন করে দেবেন। আর যদি জমির ব্যাপারে অংশীদারগণ দাবী করে যে, তারা খরীদ সূত্রে এ সম্পত্তির মালিক হয়েছে, তাহলেও বিচারক তাদের দাবীর প্রেক্ষিতে এ জমি বণ্টন করে দেবেন।

ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র) এর যুক্তি এবং দলীল হলো এই যে, কব্যা তথা দখল হচ্ছে মালিকানার দলীল এবং স্বীকারোক্তি হচ্ছে সত্যতার আলামত। আর তাদের যেহেতু কোন প্রতিপক্ষও নেই, কাজেই বিচারক তাদের মাঝে ঐ সম্পত্তি বণ্টন করে দেবেন। যেমন, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত অস্থাবর সম্পত্তি এবং খরীদকৃত জমির ক্ষেত্রে করে থাকেন। (এ ক্ষেত্রে—সাক্ষী প্রমাণের আদৌ কোন প্রয়োজন নেই।) এটা এ কারণে যে,তাদের বক্তব্যের (বিরুদ্ধে) প্রতিবাদকারী ও তা অস্বীকারকারী কেউ

---

১. আর ঐ ওযরের কারণেই মালিকানা অনুপাতে কয়াল ও ওযনকারীকে পারিশ্রমিক প্রদানের হুকুম দেওয়া হয়েছে।

২. এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে, যদি অংশীদারদের কেউ বণ্টন করে নিতে চায় এবংত অপরাপর ব্যক্তিগণ বণ্টনের ব্যাপারে অস্বীকৃতি প্রকাশ করে। যদি অংশীদারদের সকলেই বণ্টনের দাবী করে, তাহলে সমানভাবে সকলের উপরই পারিশ্রমিক প্রদানের দায়িত্ব বর্তাবে।

নেই। অথচ অস্বীকারকারীর উপরই কেবলমাত্র স্বাক্ষী-প্রমাণ পেশ করা অপরিহার্য হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে যেহেতু কোন অস্বীকারকারী নেই, অতএব সাক্ষী-প্রমাণ পেশ করাতে কোন ফায়দা নেই। তবে বিচারক বণ্টননামায় এ কথা লিখে দেবেন যে, তিনি তাদের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে এ বণ্টন কার্য সম্পাদন করেছেন, যাতে বণ্টনের বিষয়টি তাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, তাদের থেকে যেন অন্যদের পর্যন্ত সম্প্রসারিত না হয়।

আর ইমাম আবু হানীফা (র) এর দলীল এই যে, বণ্টনের অর্থ হলো : মৃত ব্যক্তির উপর ফয়সালা জারি করা। কেননা, বণ্টনের পূর্ব পর্যন্ত (মৃত ব্যক্তির) পরিত্যাজ্য সম্পদ তার মালিকানায়ই থাকে। এ কারণেই (এ অবস্থায়) এর থেকে যদি কোন কিছু নতুন ভাবে বর্ধিত হয়, তাহলে এ বর্ধিত অংশেও মৃত ব্যক্তির অসিয়্যত কার্যকর হবে এবং এর দ্বারাও তার ঋণ পরিশোধ করা যাবে।

অবশ্য বণ্টনের পরবর্তী অবস্থা এ হুকুম থেকে ব্যতিক্রম। মোদ্দা কথা হলো : বণ্টন করার অর্থ ব্যক্তির উপর রায় বা ফয়সালা জারি করা।[১] আর স্বীকারোক্তি এ ক্ষেত্রে গ্রহণীয় কোন দলীল নয়। কাজেই সাক্ষী-প্রমাণ আবশ্যক।

উল্লেখ্য যে, এ সাক্ষী-প্রমাণ(কোন অহেতুক বিষয় নয়, বরং এটি) একটি উপকারী বিষয়ও বটে। কেননা, (প্রয়োজনে ওয়ারিসদের কোন এক জনকে মৃত (মুরিস) ব্যক্তির বিবাদী নির্ধারণ করাও হতে পারে, আর তার স্বীকারোক্তির কারণে এটি নিষিদ্ধও হবে না। যেমন (মৃত ব্যক্তির) ওয়ারিস বা অসিয়্যত কার্যকরী করার দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি ঋণের কথা স্বীকার করে, তাহলে তার স্বীকারোক্তি সত্ত্বেও তার সামনে তার বিপক্ষে সাক্ষ্য- প্রমাণ গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে।[২]

অস্থাবর সম্পদের বিষয়টি এ হুমুমের ব্যতিক্রম। কেননা, এ জাতীয় সম্পদ বণ্টনের মধ্যে এগুলোর হিফাযতের বিষয়টিই লক্ষণীয় হয়ে থাকে। আর জমি তো নিজে নিজেই সংরক্ষিত। (কাজেই অস্থাবর সম্পদের উপর জমির বিষয়কে কিয়াস করা যাবে না।) অধিকন্তু অস্থাবর সম্পদ যার দখলে থাকবে, সেই এর যামিন হবে। কিন্তু জমির বিষয়টি ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে এমন নয়। অনুরূপভাবে খরীদকৃত জমির বিষয়টিও এর থেকে ব্যক্তিক্রম। কেননা, বিক্রীত জমি বণ্টন না হলেও তা বিক্রেতার মালিকানায় থাকে না। তাই তা বণ্টনের কারণে অন্যের উপর ফয়সালা জারী করা অপরিহার্য হয় না।

---

১. আর এ ফয়সালা জারী করার জন্য গ্রহণযোগ্য দলীল-প্রমাণ আবশ্যক। এ পর্যায়ে শুধু স্বীকারোক্তি যথেষ্ট নয়। কেননা, এটি একটি অসম্পূর্ণ প্রমাণ (حُجَّتٌ قَاصِرَةٌ) কাজেই মৃত ব্যক্তির উপর কোন রায় জারী করতে হলে সাক্ষী-প্রমাণ ব্যতিরেকে তা করা যাবে না।

২. সাহেবায়নের যুক্তিতে এ কথা উল্লেখ করা হয়েছিল যে, সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণ করাতে এখানে কোন ফায়দা নেই। এর জবাবে ইমাম আবু হানীফা (র) এর পক্ষ হতে বলা হচ্ছে যে, এটি কোন অহেতুক কাজ নয়; বরং এটি একটি উপকারী কাজ। কেননা, উপরোক্ত অবস্থায় অংশীদারদের কোন একজনকে মৃত ব্যক্তির প্রতিনিধি মানোনীত করা হবে, আর অপর ব্যক্তিকে তার মুকাবিলায় বিবাদী হিসাবে গণ্য করা হবে। তখনই বিচারকের পক্ষে ফয়সালা দেওয়া সম্ভব হবে। উল্লেখ্য যে, তাদের স্বীকারোক্তি সত্ত্বেও তারা বাদী-বিবাদী হতে পারবে। যেমন মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশ ও অসীর স্বীকারোক্তি সত্ত্বেও তাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে। কাজেই এ ক্ষেত্রেও অনুরূপ বিধান প্রযোজ্য হবে।

ইমাম কুদূরী বলেন : যদি অংশীদারগণ আদালতে উপস্থিত হয়ে মালিকানা দাবী করে, কিন্তু কিভাবে এ সম্পত্তি তাদের মালিকানায় স্থানান্তরিত হয়ে এসেছে, তা উল্লেখ না করে তাহলেও বিচারক এ সম্পত্তি তাদের মধ্যে বণ্টন করে দেবেন। কেননা, এ জাতীয় সম্পত্তি বণ্টন করা দ্বারা অন্যের উপর ফয়সালা জারী করা হয় না। (এ ক্ষেত্রে) তারা অন্যের জন্য মালিকানার স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করেনি।

গ্রন্থকার বলেন : এটি 'মাবসূত' গ্রন্থের বণ্টন অধ্যায়ের একটি বর্ণনা।

'জামে সগীর' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, এক খণ্ড জমি—দুই ব্যক্তি এসে এর মালিকানা দাবী করলো এবং তারা এ ব্যাপারে সাক্ষ্য-প্রমাণও কায়েম করলো। আর তা তাদের দখলেও আছে। এমতাবস্থায় তারা যদি এ জমিটি বণ্টন করে নিতে চায়, তাহলে "এ জমিটি তাদের"—এ ব্যাপারে তারা সাক্ষ্য-প্রমাণ কায়েম না করা পর্যন্ত বিচারক জমিটি তাদের মাঝে বণ্টন করে দেবেন না। কেননা, এখানে সম্ভাবনা রয়েছে যে, এ জমিটি তাদের নয়, বরং অন্য মানুষের। বলা হয়, এটি শুধুমাত্র ইমাম আবু হানীফা (র) এর অভিমত। কেউ কেউ বলেন : এটি সকলেরই অভিমত। আর এ কথাটিই অধিকতর বিশুদ্ধ। কেননা, জমির ক্ষেত্রে হিফাযতের জন্য তা বণ্টনের কোন প্রয়োজন নেই। আর মালিকানা বণ্টনের জন্য মালিকানা বাকী বা প্রতিষ্ঠিত থাকা আবশ্যক। অথচ এখানে প্রতিষ্ঠিত কোন মালিকানা নেই। কাজেই উক্ত জমি বণ্টন করা যাবে না।

ইমাম কুদূরী বলেন : যদি দুই ওয়ারিস ব্যক্তি (আদালতে) হাযির হয়ে মুরিস (যার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়েছে) ব্যক্তির মৃত্যু এবং ওয়ারিসদের সংখ্যা নিরূপণ করে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ এবং বাড়ীটিও তাদের দখলে থাকে, এমতা বস্থায়(এ সম্পত্তির) তৃতীয় কোন ওয়ারিস যদি অনুপস্থিত থাকে, তাহলে উপস্থিত লোকদের বণ্টনের দাবীর ভিত্তিতে বিচারক ঐ জমিটি তাদের মধ্যে বণ্টন করে দেবেন। এ পর্যায়ে বিচারক কোন এক ব্যক্তিকে উকীল নিয়োগ করবেন, সে ঐ অনুপস্থিত ব্যক্তির অংশটি বুঝে নেবে। অনুরূপভাবে যদি অনুপস্থিত ব্যক্তির পরিবর্তে কোন নাবালিকা সন্তান ওয়ারিস হয়, (আর মাসআলা পূর্ববৎ হয়), তাহলে বিচারক জমিটি বণ্টন করে দেবেন। তবে এ ক্ষেত্রে তিনি একজনকে অসী নিয়োগ করবেন, সে এ নাবালকের অংশটি বুঝে (দখল করে) নেবে। কেননা এতে অনুপস্থিত ব্যক্তি এবং নাবালকের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ নিহিত রয়েছে। ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে উপরোক্ত অবস্থায়ও সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ আবশ্যক। কিন্তু সাহেবায়ন এতে ভিন্ন মত পোষণ করেন। যেমন আমরা এ সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করেছি। যদি বণ্টনপ্রার্থী ক্রেতাদের মধ্যে দুই ব্যক্তি উপস্থিত হয়, তবে তাদের তৃতীয় (ক্রেতা) জন অনুপস্থিত থাকা অবস্থায় বিচারক জমিটি বণ্টন করবেন না।

উক্ত মাসআলা দু'টির মধ্যে পার্থক্যের মূল কারণ হলো এই যে, ওয়ারিস ব্যক্তির মালিকানা প্রতিনিধিত্বমূলক মালিকানা। এ কারণেই মুরিস যদি কোন কিছু খরীদ করে (মারা যায়) এবং এতে যদি কোন ত্রুটি পাওয়া যায়, তবে ওয়ারিস তা (বিক্রেতার নিকট) ফেরৎ দিতে পারবে। আর সে যদি কোন কিছু বিক্রি করে (মারা যায়), তাহলে ওয়ারিস ব্যক্তির নিকট তা ফেরৎ দেওয়া যাবে। অধিকন্তু মুরিস ব্যক্তির খরীদের কারণে ওয়ারিস ব্যক্তি কখনো প্রতারিত হয়।

এ পর্যায়ে ওয়ারিসদের কোন একজন মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে তার হাতে যে মাল আছে, এর ব্যাপারে, এক পক্ষ হবে এবং অপর ব্যক্তি নিজের পক্ষ হতে দ্বিতীয় পক্ষ হবে। পরিণামে এ বন্টন বাদী-বিবাদী উভয়ের সামনে ফয়সালা করার অনুরূপ বলে ধর্তব্য হবে।[১]

বস্তুত: খরীদ করার মাধ্যমে যে মালিকানা হাসিল হয়, তা নুতন ধরনের মালিকানা। এ কারণেই খরীদকৃত মালে কোন ত্রুটি পাওয়া গেলে ক্রেতা তা বিক্রেতার নিকট ফেরৎ দিতে পারে না। অতএব উপস্থিত ব্যক্তি অনুপস্থিত ব্যক্তির তরফ হতে পক্ষ হতে পারবে না। এতেই উভয় মাসআলার মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়।

জমি যদি অনুপস্থিত ওয়ারিসের দখলে থাকে অথবা জমির কিয়দংশ যদি উক্ত ব্যক্তির দখলে থাকে, তাহলে বিচারক এ জমি বন্টন করতে পারেন না। অনুরূপভাবে এ সম্পত্তি যদি অনুপস্থিত ব্যক্তি কর্তৃক রক্ষিত আমানতদার ব্যক্তির থাকে, তাহলে এ ক্ষেত্রেও উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে। এমনিভাবে এ সম্পত্তি যদি নাবালকের কাছে থাকে, তাহলেও উক্ত হুকুম হবে। (অর্থাৎ তা বন্টন করা যাবে না।) কেননা যেহেতু এ সম্পদ অনুপস্থিত ব্যক্তি এবং নাবালকের দখলে আছে, তাই (এ অবস্থায় যদি তা বন্টন করা হয়, তাহলে) এ বন্টন তাদের উপর সম্পাদিত হবে এমন অবস্থায়, যখন তাদের তরফ থেকে কোন পক্ষ উপস্থিত নেই। (অথচ এভাবে বন্টন করা জাইয নয়।) উল্লেখ্য যে, বিপক্ষের আমীন (আমানতদার ব্যক্তি) তার পক্ষ হতে তার উপর অধিকারের দাবী করার ক্ষেত্রে বিবাদী হতে পারবে না। অথচ বিবাদীর

১. যেমন মুরিস ব্যক্তি কোন দাসী খরীদ করে পরে মারা গেল। এরপর ওয়ারিস ব্যক্তি তাকে উম্মে ওয়ালাদ (সন্তানের মা) বানিয়ে নিল। এরপর অপর কোন ব্যক্তি এ দাসীর মালিকানা দাবী করলো। এ অবস্থায় সন্তানটি আযাদ গণ্য হবে এবং ওয়ারিসের উপর ওয়াজিব হবে পাওনাদার ব্যক্তিকে বাচ্চার মূল্য পরিশোধ করা এবং দাসীকে মহর প্রদান করা। তারপর ওয়ারিস ব্যক্তি বিক্রেতার নিকট থেকে বাচ্চার দাম ও দাসীর মূল্য ফেরৎ নিয়ে নেবে, মহর ফেরৎ নিতে পারবে না। মুরিস নিজে জীবিত থাকলে তার ক্ষেত্রেও অনুরূপ বিধান প্রযোজ্য হতো। এ পর্যালোচনার দ্বারা এ কথা প্রতিভাত হচ্ছে যে, ওয়ারিসের মালিকানা হচ্ছে প্রতিনিধিত্বমূলক মালিকানা। কাজেই এ অবস্থায় অনুপস্থিত ব্যক্তির উপর ফয়সালা করা অপরিহার্য হয় না। আর খরীদ করার মাধ্যমে যে মালিকানা হাসিল করা হয়েছে, এর বিষয়টি পূর্বোক্ত মাসআলা থেকে ব্যতিক্রম। কেননা, এটি প্রতিনিধিত্বমূলক মালিকানা নয়, বরং এটি নুতন একটি মালিকানা। এ কারণেই ক্রেতা যদি খরীদকৃত মালে কোন ত্রুটি দেখতে পায়, তাহলে সে তা বিক্রেতার নিকট তো ফেরৎ দিতে পারবে; কিন্তু বিক্রেতার বিক্রেতার নিকট ফেরৎ দিতে পারবে না। কেননা এ অবস্থায় অনুপস্থিত ব্যক্তির উপর ফয়সালা করা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়।

উপস্থিতি ব্যতিরেকে ফয়সালা দেওয়া জাইয নয়।[১] এ মাসআলার ক্ষেত্রে সাক্ষী-প্রমাণ কায়েম করা ও না করার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এটিই সহীহ অভিমত। যেমন কিতাবে (জামে সগীর গ্রন্থে) বিষয়টিকে সাধারণভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন : যদি কেবলমাত্র একজন ওয়ারিস হাযির হয় (এবং বন্টনের দাবী করে), তবে বিচারক জমিটি বন্টন করে দেবেন না। যদিও সে এ বিষয়ে (প্রয়োজনীয়) সাক্ষী-প্রমাণ পেশ করে। কেননা, ফয়সালার জন্য বাদী-বিবাদী উভয়ের উপস্থিতি জরুরী। কারণ, একই ব্যক্তি বাদী আবার, বিবাদী উভয়টি হতে পারে না। এমনিভাবে একই ব্যক্তি মুকাসিম (বন্টনের দাবীদার) এবং মুকসাম (যার থেকে বন্টন করে নেওয়া হবে) হতে পারে না। কিন্তু যদি উপস্থিত ব্যক্তির সংখ্যা দুই হয়, তবে এর হুকুম ভিন্নতর হবে, যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি।

যদি দুইজন ওয়ারিস হাযির হয় এবং তাদের একজন নাবালক হয় এবং অপরজন সাবালক হয়, তবে বিচারক নাবালকের পক্ষে একজনকে অসী নিয়োগ করবেন এবং সাক্ষী-প্রমাণ কায়েম করার পর তিনি তাদের দাবীমত জমিটি বন্টন করে দেবেন। অনুরূপভাবে যদি একজন সাবালক ওয়ারিস এবং مُوْصَى لَهُ بِالثُّلُثِ فِيْهَا (যার জন্য ঐ বাড়ীর এক তৃতীয়াংশের ব্যাপারে অসিয়্যত করা হয়েছে) -হাযির হয়ে বন্টন দাবী করে, আর তারা মীরাস ও অসিয়্যতের বিষয়ে সাক্ষ্যী-প্রমাণও কায়েম করে, তাহলে বিচারক তাদের দাবী অনুযায়ী বাড়ীটি বন্টন করে দেবেন, (বাদী-বিবাদী উভয়ের উপস্থিতির কারণে।) সাবালক ব্যক্তি তো মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে এবং যার জন্য অসিয়্যত করা হয়েছে সে হবে নিজের পক্ষ হতে। এমনিভাবে নাবলকের পক্ষে অসী নিয়োগ করা অবস্থায়ও বন্টন করা যাবে। কেননা অসী যেহেতু নাবলকের প্রতিনিধি, তাই যেন নাবালক/সাবালক হওয়ায় নিজেই আদালতে উপস্থিত আছে।[২]

পরিচ্ছেদ : যে যে জিনিস বন্টন করা যাবে এবং যে যে জিনিস বন্টন করা যাবে না

ইমাম কুদূরী (র) বলেন : যদি (একাধিক) অংশীদারদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ **অংশ দ্বারা ফায়দা হাসিল করতে সক্ষম হয়, তাহলে বিচারক অংশীদারদের কোন একজনের দাবীর প্রেক্ষিতে জমিটি বন্টন করে দিতে পারবেন। (যদিও অপর অংশীদার তা অস্বীকার করে)।** কেননা, যে যে ক্ষেত্রে বন্টনের বিষয়ে অংশীদারদের

---

১. কেননা আমানতদার ব্যক্তি তো মালের হিফাযতের যিম্মাদার। বিবাদী হয়ে অন্যের অধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য তাকে এ দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। কাজেই সে বিবাদী হতে পারবে না। এতদসত্ত্বেও ফয়সালা দেওয়া হলে, এ ফয়সালা বিবাদীর উপস্থিতি ব্যতিরেকে দেওয়া অপরিহার্য হয়ে দাঁড়াবে। অথচ এভাবে ফয়সালা করে জমি বন্টন করা জাইয নয়।

২. অর্থাৎ এ অবস্থায়ও যেহেতু বাদী বিবাদী উভয় উপস্থিত, তাই বিচারক তাদের দাবী অনুযায়ী জমি বা বাড়ীটি বন্টন করে দেবেন।

কোন একজনের দাবী উত্থাপনের অবস্থায় তা বন্টন করে দেওয়া একটি অপরিহার্য হক বা (অধিকার, যা এড়িয়ে যাওয়ার কোন সুযোগ নেই)। যেমন আমরা পূর্বেও তা বর্ণনা করেছি।

আর যদি জমির অবস্থা এমন হয় যে, অংশীদারদের কোন একজন তো নিজ অংশ দ্বারা ফায়দা হাসিল করতে পারে, কিন্তু অপরজনের অংশ কম হওয়ায় সে তার অংশ দ্বারা ফায়দা হাসিল করতে পারছে না, বরং তার ক্ষতি হচ্ছে, এ অবস্থায় বেশী অংশের মালিক যদি বন্টনের দাবী করে, তবে বিচারক জমিটি বন্টন করে দেবেন। আর যদি কম অংশের মালিক এর দাবী করে, তাহলে বিচারক তা বন্টন করে দেবেন না। কেননা প্রথম ব্যক্তি তার জমি দ্বারা লাভবান হচ্ছে, কাজেই তার কথা ধর্তব্য হবে। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি বন্টনের দাবী উত্থাপন করে নিজের ধ্বংস কামনা করছে। কাজেই তার দাবী গ্রহণযোগ্য হবে না। কিন্তু ইমাম জাস্‌সাস (র) এর বিপরীত অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তার যুক্তি হলো এই যে, বেশী অংশের মালিক বন্টনের দাবী করে দ্বিতীয় পক্ষকে ক্ষতিগ্রস্ত করার ইচ্ছা করছে। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি সন্তুষ্ট চিত্তে নিজের ক্ষতিকে মেনে নিচ্ছে।

হাকিম শহীদ (র) তৎপ্রণীত 'মুখতাসার' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, শরীকদের যে কেউ বন্টনের দাবী উত্থাপন করলে বিচারক জমিটি বন্টন করে দেবেন। পূর্বোল্লেখিত আলোচনায় এর কারণ সন্নিবেশিত হয়েছে। পক্ষান্তরে কিতাবে যে মতটি উল্লেখ করা হয়েছে, তাই বিশুদ্ধতম। আর তা হলো প্রথমোক্ত অভিমতটি।

আর যদি অংশীদারদের প্রত্যেকের অংশই কম হয় এবং এ কারণে প্রত্যেক অংশীদার ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহলে উভয় অংশীদারের সম্মতি ছাড়া বিচারক ঐ জমি বন্টন করবেন না। কেননা বন্টনের ব্যাপারে জোর প্রয়োগ করা হয় লাভালাভের পূর্ণতা বিধানের জন্য। অথচ এক্ষেত্রে (লাভ তো দূরের কথা) লাভ পূরাটাই হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। অবশ্য উভয় অংশীদার যদি বন্টনের ব্যাপারে রাযী থাকে, তবে তা বন্টন করা জাইয হবে। কেননা, হক তো তাদেরই এবং তারাই তাদের নিজেদের অবস্থার ব্যাপারে অধিক জ্ঞাত। আর বিচারক তো বাহ্যিক বিষয়ের উপর নির্ভর করে ফয়সালা দিয়ে থাকেন।[১]

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ আসবাব-সামগ্রী যদি একই ধরনের হয়, তবে (জোরপূর্বক হলেও) বিচারক তা বন্টন করে দেবেন। কেননা, এক জাতীয় বস্তুর ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যও একই ধরণের হয়ে থাকে। কাজেই এ জাতীয় বস্তু বন্টন করা হলে তাতে সমতা বিধানও হবে এবং লাভালাভও পরিপূর্ণভাবে হাসিল হবে।

---

১. বাহ্যিক অবস্থার প্রেক্ষিতে যেহেতু এতে ক্ষতিই দেখা যাচ্ছে, কাজেই একজনের দাবীর উপর ফয়সালা করা হবে না। অবশ্য যদি উভয় ব্যক্তি সম্মত হয়ে বন্টনের দাবী করে, তবে ফয়সালা করা হবে। এ ক্ষেত্রে মনে করা হবে যে, হয়তো এতে কোন কল্যাণ নিহিত আছে।

কিন্তু দুই প্রজাতির জিনিস যদি এমন হয় যে, এর কিছু অন্য প্রজাতির মধ্যে মিলানো থাকে, তাহলে বিচারক বল প্রয়োগ করে তা বন্টন করবেন না।[১] কেননা দুই প্রজাতির বস্তুর মধ্যে সংমিশ্রন হয় না। কাজেই বন্টনের দ্বারা দুই বস্তুর পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য সূচিত হয় না। বরং এতে হয় পরস্পরের মধ্যে বিনিময়। আর এ বিনিময় সিদ্ধ হওয়ার একমাত্র পথ হলো পরস্পর রাযী হয়ে তা করা, বিচারকের বল প্রয়োগে নয়।

বিচারক (প্রয়োজনে বল প্রয়োগ করেও) বন্টন করে দিতে পারবেন ওযনযোগ্য বস্তু এবং পরিমাণযোগ্য বস্তু, চাই তা বেশী হোক বা কম হোক। (এমনিভাবে) গণনাযোগ্য এমন বস্তুও, যা পরস্পর কাছাকাছি অর্থাৎ প্রায় সমান-সমান; এবং সোনা, রূপা, লোহা এবং তামার টুকরা। (এমনিভাবে বন্টন করে দিতে পারবেন) শুধু উট, গরু বা বকরী। কিন্তু বকরী, উট, ঘোড়া ও গাধা যদি একত্রিত থাকে, তাহলে বিচারক তা জোরপূর্বক বন্টন করবেন না। তবে বরতন এবং পাত্রও বন্টন করবেন না। কেননা এগুলোর তৈরী কৌশল বিভিন্ন রকমের হওয়ায় এগুলোকে বিভিন্ন প্রজাতির বস্তুর ন্যায় গণ্য করা হয়েছে।

হিরুভী কাপড় (অংশীদার কর্তৃক বন্টনের দাবী করার পর) বিচারক তা বন্টন করে দেবেন। কেননা এগুলো এক প্রকারের বিশেষ কাপড় হিসাবে গণ্য।

তবে কাপড়ের সংখ্যা যদি একটি মাত্র হয়, তাহলে বিচারক তা বন্টন করে দেবেন না। কেননা, একটি কাপড় যদি ভাগ করা হয়, তবে তাতে কেবল ক্ষতিই হয়। কারণ কাটা ছাড়া বন্টন করা আদৌ সম্ভব নয়। (অথচ কর্তন করার পর তা আর ব্যবহারযোগ্য থাকে না।)

অনুরূপভাবে যদি কাপড়ের সংখ্যা দুই হয় তবে তাও বিচারক বন্টন করবেন না; যদি এগুলোর মূল্য বিভিন্ন রকমের হয়। এর কারণ আমি পূর্বেই বর্ণনা করেছি। **পক্ষান্তরে যদি কাপড়ের সংখ্যা তিনটি হয়, তবে এর হুকুম ভিন্নতর হবে। অর্থাৎ তা জাইয হবে।**[২] **যদি একটি কাপড়কে দু'টি কাপড়ের পরিবর্তে অথবা এক কাপড় এবং অন্য কাপড়ের এক চতুর্থাংশকে; এক কাপড় ও অন্য কাপড়ের তিন চতুর্থাংশের পরিবর্তে প্রদান করা হয়।** কেননা এ ক্ষেত্রে কোন কোন কাপড়ে বন্টন কার্য সম্পাদিত হচ্ছে, আবার কোনটির মধ্যে হচ্ছে না। আর এরূপ করা জাইয আছে।

ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন ঃ গোলাম এবং হিরা-জহরতের মধ্যে যেহেতু মূল্যের কম-বেশী রয়েছে, তাই বিচারক (জোরপূর্বক) এসব কিছু বন্টন করবেন না। পক্ষান্তরে সাহেবায়ন (র) বলেন ঃ (বিচারক জোরপূর্বক) গোলাম বন্টন করে দিতে পারবেন। কারণ এসবের জাত এক। যেমন উট ও বকরীর মধ্যে বেশ-কম থাকা সত্ত্বেও তা বন্টন করা জাইয। যেমনিভাবে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হিসাবে প্রাপ্ত গোলাম বন্টন করা জাইয। (কাজেই সাধারণ গোলামও বন্টন করা যাবে।)

---

১. যেমন দুই ব্যক্তির মালিকানাধীন কিছু উট এবং গরু একত্রে মিলিতভাবে থাকে।

২. যেমন আমাদের দেশের পপলিন, টেট্রন, পলিষ্টার ইত্যাদি কাপড়।

ইমাম আবু হানীফা (র) এর যুক্তি হলো ঃ মানুষের অভ্যন্তরীণ গুণাগুণের মধ্যে বিরাট ব্যবধান বিদ্যমান। তাই মানুষের বিষয়টি বিভিন্ন প্রজাতির জীবের ন্যায় বলে গণ্য হবে। (অতএব বিভিন্ন প্রজাতির জীবের বন্টনের ক্ষেত্রে যেমন বিচারক বল প্রয়োগ করতে পারে না, এক্ষেত্রেও পারেবে না।) জীব-জানোয়ারের বিষয়টি মানুষ থেকে ব্যতিক্রম। কেননা, এক জাতীয় জীবের ক্ষেত্রে সাধরণত: কম ব্যবধানই হয়ে থাকে। লক্ষণীয় যে, আদম সন্তানের মধ্যেও নর ও নারী দুই জাতি হিসাবে গণ্য। অথচ জীব-জানোয়ারের মধ্যে নর ও মাদী (দুই জাতি নয়, বরং) একই জাতি হিসাবে গণ্য। এমনিভাবে যুদ্ধলব্ধ সম্পদের গোলামের বিষয়টিও এ হুকুম থেকে ব্যতিক্রম। কেননা যোদ্ধাদের হক (গোলামের) মালিয়্যাতের (মূল্যের) সাথে সম্পর্কিত। এ কারণেই রাষ্ট্র প্রধান গোলাম বিক্রি করে এর মূল্য তাদের মধ্যে বন্টন করে দেওয়ার অধিকার রাখেন। আর সাধারণ গোলামের ক্ষেত্রে অংশীদারদের হক গোলামের সত্বা এবং মালিয়্যাত উভয়ের সাথে সম্পর্কিত। কাজেই উভয় ধরনের গোলামের মধ্যে ব্যবধান সুস্পষ্ট।[১]

হীরা-জহরতের বিষয়ে ফকীহগণ বলেন ঃ যদি এগুলো বিভিন্ন জাতের হয়–যেমন মোতি, ইয়াকূত ইত্যাদি, তাহলে (বিচারক তা জোর করে) বন্টন করবেন না, কেউ কেউ বলেন ঃ হীরা-মোতি যেগুলো বড় ধরনের, বিচারক তা বন্টন করবেন না। যেহেতু এগুলোর মধ্যে ব্যবধান বেশী। তবে ছোট ছোটগুলো বন্টন করে দেবেন। যেহেতু এগুলোর মধ্যে ব্যবধান কম। আবার কেউ বলেন ঃ হীরা-মোতি বন্টন করা আদৌ জাইয নয়। কেননা, হীরা ও মণি মুক্তা সম্বন্ধে যে অস্পষ্টতা রয়েছে, তা গোলামের বিষয়ের অস্পষ্টতা থেকেও অধিক। লক্ষণীয় যে, কেউ যদি হীরা-মোতি বা ইয়াকূতের বিনিময়ে কোন মহিলাকে বিবাহ করে অথবা এসবের বিনিময়ে কারো সাথে খুলা করে, তাহলে এসবের নাম উল্লেখ করা সহীহ হবে না। কিন্তু গোলামের বিনিময়ে যদি বিবাহ বা খুলা করে, তবে তা সহীহ হবে। সুতরাং হীরা-মোতি বন্টনের ব্যাপারে বিচারক বল-প্রয়োগ করতে পারবেন না।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ গোসলখানা, কূঁয়া এবং (আটা ইত্যাদি পেষার) চাক্কি (জোরপূর্বক) ভাগ করা যাবে না। অবশ্য অংশীদারগণ সম্মত হলে এগুলো ভাগ করা যাবে। অনুরূপভাবে দুই বাড়ীর মধ্যকার প্রাচীরও ভাগ করা যাবে না। কেননা, এতে উভয় পক্ষের ক্ষয়-ক্ষতি নিহিত রয়েছে। আর বন্টনের পর কারো অংশই এমন থাকবে না, যার দ্বারা কাংখিত উপকার হাসিল হবে। কাজেই (এ জাতীয়) বিষয়াদি বিচারক জোরপূর্বক বন্টন করবেন না। অবশ্য তারা যদি পরস্পর রাযী থাকে, তবে তা জাইয হবে। এর কারণ আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ একই শহরে যদি যৌথ মালিকানাধীন কতগুলো বাড়ী থাকে, তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে বিচারক প্রতিটি বাড়ী পৃথক-পৃথকভাবে বন্টন করে দেবেন। সাহেবায়ন (র) বলেন ঃ যদি অংশীদারদের

---

১. সুতরাং যৌথ মালিকানাধীন গোলামকে জীব-জানোয়ার এবং যুদ্ধ-লব্ধ গোলামের উপর কিয়াস করা যাবে না।

জন্য প্রত্যেক বাড়ীতে অংশ রেখে মিলিতভাবে বন্টন করা অধিক কল্যাণকর হয়, তাহলে বিচারক এভাবেই বন্টন করে দেবেন।[১] ইমামগণের উপরোক্ত মতপার্থক্য যৌথ মালিকানাধীন পৃথক পানি ও বৃক্ষ শূন্য জমিখণ্ডসমূহেও বিদ্যমান।

সাহেবাইন (র)-এর যুক্তি হলো ঃ উপরোক্ত বাড়ীসমূহ বসবাসের প্রেক্ষিতে নাম এবং আকারের দিক থেকে একই জাতীয় জিনিষ। কিন্তু উদ্দেশ্য এবং বসবাসের বিভিন্নতার প্রেক্ষিতে অর্থগত দিক থেকে বহু জাতীয় জিনিষ। কাজেই কোন্‌টিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে এ বিষয়টি বিচারকের মতামতের উপর ছেড়ে দেওয়া হবে।

আর ইমাম আবু হানীফা (র) এর যুক্তি হলো ঃ প্রতিটি বস্তুর গুণাগুণই মূলত: ধর্তব্য বিষয় এবং এটিই হলো মূল উদ্দেশ্য। আর এ উদ্দেশ্য দেশ, স্থান, প্রতিবেশী ইত্যাদির বিভিন্নতার কারণে খুব বেশী বিভিন্নতা হয়ে থাকে। এমনিভাবে মসজিদ ও পানির নিকটবর্তী হওয়ার প্রেক্ষিতেও এ উদ্দেশ্যের মধ্যে বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। এ অবস্থায় বন্টনে সমতা বিধান করা সম্বব নয়। এ কারণেই বাড়ী খরীদ করার জন্য উকীল নিয়োগ করা জাইয নয়। অনুরূপভাবে কেউ যদি কোন বাড়ীর বিনিময়ে বিবাহ করে, তাহলে এরূপ নাম উল্লেখ করা (মহর হিসাবে) সহীহ হবে না। এই ওকালত ও বিবাহ যদি কাপড়ের উপর হয়, তাহলে সেক্ষেত্রেও এই হুকুম হবে। কিন্তু একই বাড়ীতে যদি কয়েকটি ঘর থাকে,তবে এর হুকুম ভিন্নতর হবে। কেননা প্রতিটি ঘরকে ভিন্ন ভিন্নভাবে বন্টন করাতে বিরাট ক্ষতি রয়েছে। কাজেই বাড়ীটি যৌথভাবেই বন্টন করা হবে।[২]

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন ঃ ইমাম কুদূরী (র) 'একই শহরে' হওয়ার শর্ত আরোপ করে এ কথার প্রতি ইংগিত করেছেন যে, যদি বাড়ী দু'টি দুই শহরে থাকে, তাহলে সাহেবাইনের মতেও এগুলো যৌথভাবে বন্টন করা হবে না। (বরং পৃথক পৃথকভাবে বন্টন করা হবে।) হিলাল (র) সাহেবাইন থেকে অনুরূপই বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, (না, বরং) যৌথভাবেই বন্টন করা হবে। বস্তুত একই মহল্লাতে বা কয়েক মহল্লাতে যদি কয়েকটি ঘর থাকে, তাহলে এগুলোকে যৌথভাবে বন্টন করা হবে। কেননা এগুলোর মধ্যে ব্যবধান খুবই নগণ্য। যেসব মঞ্জিল একত্রে মিলিত, সেগুলো একত্রে মিলিত ঘরের মতই। আর যেসব মঞ্জিল পৃথক পৃথক আছে, সেগুলো পৃথক পৃথক বাড়ীর হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে।[৩] কেননা এর বিষয়টি বাড়ী

---

১. প্রতিটি বাড়ী পৃথক পৃথকভাবে বন্টন করাকে "قِسْمَتْ فَرْدْ" বলে। প্রত্যেক বাড়ীতে প্রত্যেকের অংশ রেখে বন্টন করাকে "قِسْمَتْ جَمْعْ" বলে। কাজেই একই শহরে যদি যৌথ মালিকানাধীন কতগুলো বাড়ী থাকে, তাহলে এ বাড়ী কিভাবে বন্টন করা হবে ? এ বিষয়ে ইমাম আবু হানীফা ও সাহেবায়ন (র) এর মাঝে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন ঃ প্রতিটি বাড়ী পৃথক পৃথকভাবে বন্টন করা হবে। সাহেবায়ন (র) বলেন, এটি বিচারকের উপর ছেড়ে দেওয়া হবে। তিনি ভাল মনে করলে পৃথক পৃথকভাবে বন্টন করবেন। আর ভাল মনে করলে প্রতিটি বাড়ী যৌথভাবেও বন্টন করতে পারবেন।

২. অর্থাৎ একজনকে কয়েকটি ঘর এবং অপরজনকেও অনুরূপ কয়েকটি ঘর দিয়ে দেওয়া হবে।

৩. মঞ্জিল হল বাড়ী (دَار) থেকে ছোট এবং ঘর (بَيْت) থেকে বড়। মৌলিকভাবে মঞ্জিলের সম্পর্ক বাড়ী-ঘর উভয়ের সাথেই রয়েছে। কাজেই কোন কোন ক্ষেত্রে এর হুকুম বাড়ীর মত হবে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে এর হুকুম ঘরের মত হবে।

এবং ঘরের মাঝামাঝিতে রয়েছে। যেমন পূর্বে তা বর্ণনা করা হয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, মঞ্জিলের সম্পর্ক বাড়ী এবং ঘর উভয়ের সাথেই রয়েছে। অবস্থার প্রেক্ষিতে ফয়সালা করা হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ যদি সম্পত্তির মধ্যে বাড়ী ও জমি থাকে অথবা যদি বাড়ী ও দোকান থাকে, তাহলে বিচারক এগুলোর প্রত্যেকটিকে পৃথক পৃথকভাবে ভাগ করে দেবেন। যেহেতু এগুলোর (جِنْس) বা জাত বিভিন্ন।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন ঃ কুদূরী গ্রন্থপ্রণেতা 'বাড়ী ও দোকানকে' দুই জাতীয় বস্তু বলে সাব্যস্ত করেছেন। ইমাম খাস্সাফ (র)ও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুহাম্মদ (র) মাবসূতের ইজারা অধ্যায়ে উল্লেখ করেছেন যে, দোকানের বিনিময়ে বাড়ীর লাভালাভকে ইজারা দেওয়া জাইয নেই। এতে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, বাড়ী এবং দোকান একই জাতীয় জিনিষ। কাজেই একথা ধরে নিতে হবে যে, মাসআলাতে দুই ধরনের বর্ণনা রয়েছে। অথবা (এ কথা বলা হবে যে, এখানে) সূদ হারাম হওয়ার বিষয়টি সমজাতীয় হওয়ার সন্দেহের উপর নির্ভরশীল।[১]

পরিচ্ছেদ ঃ বন্টন পদ্ধতি সম্পর্কিত মাসাইল

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ বন্টনকারী ব্যক্তির জন্য সমীচীন হলো, যে সম্পত্তি বা বস্তুটি বন্টন করা হবে, প্রথমে সে কাগজের মধ্যে এর একটি নকশা তৈরী করবে। যাতে এ সম্পদের বন্টন কার্যের বিষয়টি সদা তার স্মরণে থাকে। **তারপর কাগজের মধ্যেই তা সমান হারে ভাগ করবে।** অর্থাৎ সে তা সমান হারে ভাগ করবে। কোন কোন বর্ণনায় 'وَيَعْزِلُهُ' -শব্দটিও উল্লেখ রয়েছে। এ হিসাবে এর অনুবাদ হবে, "এবং একে তিনি এ বন্টনের মাধ্যমে অপরাপর অংশ থেকে পৃথক করে দেবেন" **এবং তা পরিমাপ করবেন।** যাতে এখানে কি পরিমাণ জায়গা আছে, তা স্পষ্টভাবে বুঝা যায়। **তারপর এতে যে ঘর-বাড়ী আছে, সেগুলোর মূল্যও সাব্যস্ত করবেন।** কেননা, পরে এরও প্রয়োজন হবে। **এরপর রাস্তা এবং পানির নালাসহ এক এক অংশকে অপরাপর অংশ থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক করে ভাগ করবেন।** যাতে এক অংশের সাথে অপর অংশের কোন সম্পর্ক না থাকে। তাহলেই তাদের পরস্পরের ঝগড়া-বিবাদ শেষ হয়ে যাবে এবং বন্টনের উদ্দেশ্য পরিপূর্ণভাবে সাধিত হবে।

তারপর একটি ভাগকে প্রথম অংশ, এর সাথের ভাগকে দ্বিতীয় অংশ, এর সাথের ভাগকে তৃতীয় অংশ বলে -এভাবে সবগুলো অংশের নামকরণ করবে। এরপর লটারী দেওয়া হবে। এতে যার নাম প্রথমে আসবে, সে প্রথম অংশ পাবে। যার নাম দ্বিতীয় বারে আসবে, সে দ্বিতীয় অংশ পাবে। (এভাবে শেষ পর্যন্ত চলতে থাকবে।)

---

১. উক্ত আলোচনার দ্বারা এ কথা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, এখানে দুই ধরনের বর্ণনা রয়েছে ঃ (১) বাড়ী ও দোকান এক জাতীয় জিনিস, (২) এগুলো দুই রকমের জিনিস; কিন্তু এতে এক জাতীয় হওয়ার সন্দেহ রয়েছে। আর সূদের ব্যাপারে সন্দেহ থাকাও হাকীকতের মতই। আর এ কারণেই উপরোক্ত ইজারাকে না-জাইয বলা হয়েছে।

বস্তুত: এ ব্যাপারে মূলনীতি হলো এই যে, অংশীদারদের ভাগসমূহের মধ্যে যে ভাগটি সবচেয়ে কম, সেটির প্রতি লক্ষ্য রেখেই সম্পত্তিকে বিভক্ত করা হবে। যদি সর্বাধিক কম অংশটি এক তৃতীয়াংশ হয়, তাহলে জমিটিকে তিন ভাগে ভাগ করা হবে। আর যদি ষষ্ঠাংশ হয়, তবে জমিটিকে ছয় ভাগে ভাগ করা হবে, যাতে বণ্টন করা সম্ভব (ও সহজ) হয়। আল্লাহ্ প্রদত্ত তাওফীকের ভিত্তিতে 'কিফায়তুল মুনতাহী' গ্রন্থে এ সম্বন্ধে আমি সবিস্তার আলোচনা করেছি।

গ্রন্থকার কিভাবে "এবং বণ্টনকারী ব্যক্তি রাস্তা ও পানির নালাসহ প্রতিটি ভাগকে আলাদা ও পৃথক করে দেবেন" বলে যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন, এতে তিনি উত্তম বিষয়টির বর্ণনা দিয়েছেন। (এটি কোন অপরিহার্য বিষয় নয়।) কাজেই বণ্টনকারী যদি তা না করেন, বা তার পক্ষে যদি তা সম্ভব না হয়, তবুও বণ্টন জাইয হবে। ইনশাআল্লাহ্ এ সম্বন্ধে আমি বিস্তারিত আলোচনা করবো।

আর লটারী দেওয়ার কথা যে উল্লেখ করা হয়েছে- এর উদ্দেশ্য হলো : অংশীদারদের চিত্তের প্রশান্তি বিধান করা এবং স্বজনপ্রীতির অপবাদ থেকে রক্ষা পাওয়া। কাজেই বণ্টনকারী যদি লটারী ছাড়াই তাদের প্রত্যেকের অংশ বির্ধারণ করে দেন, তবে তাও জাইয হবে। কেননা, বণ্টনের বিষয়টিও অর্থগত দিক থেকে আদালতের ফয়সালার অনুরূপ। সুতরাং (বিচারকের ন্যায়) তিনিও সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়ার অধিকারী হবেন।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন : বণ্টনকারী ব্যক্তি দিরহাম ও দীনারকে বণ্টনের মধ্যে শামিল করবে না। কিন্তু অংশীদারগণ যদি এ বিষয়ে রাযী থাকে, তাহলে তিনি তা করতে পারবেন। কেননা দিরহামের মধ্যে অংশীদারীত্ব চলে না। অথচ বণ্টনের বিষয়টি অংশীদারীত্বেরই একটি হক তা অধিকার। অধিকন্তু অংশীদারগণ যদি এ বিষয়ে রাযী থাকে, তাহলে তিনি তা করতে পারবেন। কেননা (এরূপ করার অবস্থায়) একজন তো মূল জমিতে পৌছে যাবে, অথচ তার যিম্মায় থেকে যাবে অন্য জনের দিরহাম সমূহ। এ ক্ষেত্রে এ কাথারও সম্ভাবনা রয়েছে যে, সে হয়তো এ দিরহাম সমূহ তার নিকট হস্তান্তর করবে না।[১]

যদি (সম্পত্তিতে) জমি এবং ইমারত থাকে, তবে ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর মতে এ দুয়ের প্রত্যেকটি মূল্য হিসাবে বণ্টন করা হবে। কেননা মূল্য সাব্যস্ত করা ব্যতিরেকে এ ক্ষেত্রে সমতা বিধান করা সম্ভব নয়।

---

১. যেমন দুই ব্যক্তি যৌথভাবে একটি বাড়ীর মালিক। তাদের একজন চাচ্ছে বাড়ীর যে অংশে বিল্ডিং আছে, সে ঐ অংশ নেবে এবং অতিরিক্ত অংশের জন্য অপর অংশীদারকে টাকা দিয়ে দেবে। কিন্তু অপর অংশীদার টাকা নিতে রাযী নয়; বরং সে এর বিনিময়ে জমি নিতে চাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে বিচারক তাকে টাকা নিতে বাধ্য করতে পারবেন না; বরং তাকে জমিই দিতে হবে।

ইমাম আবু হানীফা (র) হতে বর্ণিত আছে যে, জমি পরিমাপ করে বণ্টন করা হবে। কেননা, পরিমাপযোগ্য বিষয়ের ক্ষেত্রে এটিই হচ্ছে মূল বিধান। এরপর ইমারত যার ভাগে পড়বে অথবা যার ভাগে উত্তম জমি পড়বে, সে অপরজনকে কিছু দিরহাম (টাকা) দিয়ে দেবে, যাতে উভয়ের অংশ সমান সমান হয়ে যায়। (তাঁর মতে) জরুরতের প্রেক্ষিতে দিরহাম বণ্টনের অন্তর্ভুক্ত হবে। যেমন, বোনের মালে (হস্তক্ষেপ করার ব্যাপারে) ভাইয়ের কোন কর্তৃত্ব নেই। কিন্তু বিবাহের জরুরতের প্রেক্ষিতে সে বোনের মহর নির্ধারিত করে দেওয়ার অধিকার রাখে।

ইমাম মুহাম্মদ (র) হতে বর্ণিত আছে যে, যার ভাগে ইমারত পড়বে, সে এ ইমারতের বিনিময়ে অপর শরীককে এর সমপরিমাণ আঙ্গিনা দিয়ে দেবে। এরপরও কারো ভাগে যদি কিছু অতিরিক্ত থেকে যায় এবং সমতা বিধান সম্ভব না হয়, যেমন আঙ্গিনা ইমারতের মূল্যের সমপরিমাণ হয়না, তহলে সে(ইমারত ওয়ালা ব্যক্তি) অপর অংশীদারকে অতিরিক্ত পরিমাণের জন্য কিছু দিরহাম (টাকা) পরিশোধ করে দেবে। কেননা, জরুরত শুধু এই পরিমাণটুকুর ক্ষেত্রেই। কাজেই এই টুকুর ক্ষেত্রেই কেবল মূল বিধানকে বর্জন করা যাবে। (এর বেশীর ক্ষেত্রে করা যাবে না।) এই অভিমতটি 'মাবসূত গ্রন্থের' বর্ণনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন : বিচারক যদি অংশীদারদের অংশসমূহ বন্টন করে দেন, অথচ তাদের কোন একজনের পানির নালা বা রাস্তা রয়েছে অপরজনের অংশের মধ্যে এবং বন্টনের মধ্যে (সময়) এগুলোর ব্যাপারে কোন শর্তও আরোপ করা হয়নি, এ অবস্থায় যদি অপরের অংশ থেকে তার রাস্তা ও নালাকে ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়, তাহলে অপরের অংশে রাস্তা বানানো এবং পানি বহিয়ে নেওয়া তার জন্য জাইয হবে না। কেননা, অন্যের ক্ষতি সাধন কারা ব্যতিরেকে এ ক্ষেত্রে বণ্টনের মর্মার্থের পূর্ণ বাস্তাবায়ন সম্ভব। **আর যদি ঐ ভাবে তা সম্ভব না হয়, তবে (কৃত) বণ্টন রহিত হয়ে যাবে।**[১] কেননা, অন্যের অংশের সাথে সংশ্লিষ্টতা বাকী থাকার কারণে বণ্টনের স্বার্থ বিঘ্নিত হয়েছে। কাজেই পুনরায় নতুনভাবে বণ্টন করতে হবে। কিন্তু ক্রয়–বিক্রয়ের বিষয়টি এর থেকে ব্যতিক্রম। কেননা, ক্রয়- বিক্রয় এ অবস্থায় ফাসিদ হয় না। বস্তুত: ক্রয়- বিক্রয়ের উদ্দেশ্য হলো, কোন বস্তুর মূলের মালিক হওয়া। আর এটি হলে উপকৃত হওয়া অসম্ভব এমন বিষয়ের সাথেও জমা (একত্রিত) হতে পারে। পক্ষান্তরে বণ্টনের বিষয়টি এমন নয়। কেননা, বণ্টন তো প্রবর্তিত হয়েছে–লাভের পূর্ণতা বিধানের জন্য। আর লাভের পূর্ণতা প্রতিষ্ঠিত হয়না রাস্তা ছাড়া। যদি প্রথমোক্ত অবস্থায়[২] হকসমূহের কথা উল্লেখ করা হয়ে থাকে, তবে এ ক্ষেত্রেও পূর্ববৎ জবাব প্রযোজ্য হবে। কেননা, বণ্টনের অর্থ হলো : পৃথক করণ ও

---

১. অর্থাৎ বিচারক অংশীদারদের অংশ বণ্টন করে দেওয়ার সময় নালা এবং রাস্তা সম্পর্কে কোন আলোচনা হলো না। পরে দেখা গেল, কোন এক শরীকের।

২. অর্থাৎ যদি রাস্তা ও নালা অন্যের জমি থেকে সরিয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অংশের দিকে ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়।

আলাদা করণ। এটি তখনই পূর্ণতায় পৌছবে যদি তাদের একজনের অংশের সাথে অপর জনের অংশের কোন সম্পর্ক অবশিষ্ট না থাকে। আর এমনটি করা সম্ভবও বটে।

আর তার অংশের রাস্তা ও নালার মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব, এতে কারো কোন ক্ষতিও হবে না। অতএব তা অন্য দিকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। উল্লেখ্য যে, ক্রয়-বিক্রয়ের বিষয়টি এর থেকে ব্যতিক্রম হবে, যদি এ ক্ষেত্রে হুকুম এর কথা উল্লেখ করা হয়। অর্থাৎ এ অবস্থায় তার রাস্তা ও নালা যতকিছু আছে সবই এর মধ্যে দাখিল বলে গণ্য হবে। কেননা, অন্যের মালিকানার সাথে এতটুকু সম্পর্ক বাকী থাকা অবস্থায়ও বিক্রয়ের অর্থ অর্থাৎ মালিক বানিয়ে দেওয়ার বিষয়টি এতে পাওয়া যাওয়া সম্ভব।

আর শেষোক্ত অবস্থায় নালা ও রাস্তা বণ্টনের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে। কেননা, বণ্টন তো করা হয় পূর্ণাঙ্গ রূপে ফায়দা হাসিল করার জন্য। আর পূর্ণাঙ্গভাবে ফায়দা হাসিল হয় রাস্তার ও নালার দ্বারা। যখন রাস্তা ও নালার কথা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হবে, তখন ফায়দা পূর্ণ করার জন্য এ গুলোও বণ্টনের মধ্যে দাখিল হবে। আর বণ্টনের মধ্যে পৃথক করণের অর্থ রয়েছে এবং পৃথক করণ সাব্যস্ত হবে সম্পর্ক ছিন্ন করা দ্বারা -যেমন, আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। এই পৃথক করণের প্রতি লক্ষ্য করে একথা বলা যায় যে, রাস্তা এবং নালা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা ছাড়া বণ্টনের মধ্যে দাখিল হবে না। কিন্তু ইজারার বিষয়টি এর থেকে ব্যতিক্রম। কেননা, সেখানে এগুলো স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা ছাড়াও চুক্তির মধ্যে দাখিল থাকে। কেননা, ইজারার উদ্দেশ্য হলো উপকার হাসিল করা। আর তা রাস্তা-নালাকে অন্তর্ভুক্ত করণ ব্যতীত হাসিল হয় না। কাজেই ইজারার মধ্যে উল্লেখ করা ছাড়াও রাস্তা ও নালা চুক্তির মধ্যে শামিল হবে।

যদি অংশীদারগণের মধ্যে বণ্টনে রাস্তা ছাড়ার ব্যাপারে পরস্পর মতানৈক্য হয় আর এ অবস্থায় যদি তাদের নিজ নিজ অংশে রাস্তা খোলা সম্ভব হয় তাহলে বিচারক তাদের সকলের জন্য রাস্তা খোলা ছাড়াই তাদের সম্পত্তি বণ্টন করে দেবেন। কেননা, রাস্তা রাখা ব্যতিরেকেই পৃথককরণের অর্থ এ ক্ষেত্রে পাওয়া যায়।[১]

আর যদি এমনটি সম্ভব না হয় অর্থাৎ প্রত্যেকের অংশে ভিন্ন ভিন্ন রাস্তা করা সম্ভব না হয়, তাহলে বিচারক সমস্তের জন্য একটি রাস্তা রেখে বন্টনকার্য সম্পাদন করবেন, যাতে রাস্তা ব্যতীত সম্পত্তির অবশিষ্টাংশের ফায়দা পরিপূর্ণভাবে হাসিল করা সম্ভব হয়।

---

১ অর্থাৎ যদি অংশীদারদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয়, কেউ বলে, রাস্তা রাখা হবে না, আবার কেউ বলে যে, রাস্তা রাখা তো হবে। এরূপ অবস্থা হলে বিচারক অনুসন্ধান করে দেখবেন যে, তাদের পক্ষে নিজ নিজ অংশে রাস্তা বানানো সম্ভব কিনা? যদি সম্ভব হয়, তবে রাস্তা বের করা ছাড়াই বিচারক তাদের সম্পত্তি বণ্টন করে দেবেন। এতে কারো কোন ক্ষতি হবে না।

যদি সম্পত্তির অংশীদারগণ রাস্তার পরিমাণ নিয়ে মতভেদ করে, তাহলে বাড়ীর প্রধান ফটকের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ যে পরিমাণ হবে, ঐ পরিমাণ রাস্তা রাখা হবে।[১] কেননা, এর দ্বারাই প্রয়োজন সেরে যায় এবং তারা তাদের অংশের আনুপাতিক হারে রাস্তার মালিকানা লাভ করবে, যেমন বণ্টনের আগে ছিল। কেননা, বণ্টন তো হয়েছে রাস্তা ব্যতীত অন্যান্য অংশে, রাস্তা সহকারে নয়। যদি বণ্টনের সময় তারা এরূপ শর্ত করে যে, রাস্তা তাদের মধ্যে $\frac{১}{৩}$ করে থাকবে(অর্থাৎ কারো ভাগে থাকবে দুই তৃতীয়াংশ এবং অপর জনের ভাগে থাকবে এক তৃতীয়াংশ) তাহলে তা জাইয হবে। যদিও মূল রাস্তাটি তাদের মধ্যে আধাআধি করে আছে। কেননা, পরস্পরের সম্মতির ভিত্তিতে কম- বেশী করে বণ্টন করা জাইয।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন : যদি নীচের তলায় দুই ব্যক্তির অংশীদারীত্ব থাকে, এর উপরে অংশীদারীত্ব না থাকে, অথবা উপরের তলায় অংশীদারীত্ব থাকে, কিন্তু নীচে নয়, অথবা নীচ ও উপর উভয় তলায় অংশীদারীত্ব থাকে তবে প্রত্যেক তলার মূল্য পৃথক পৃথক ভাবে সাব্যস্ত হবে। এ ক্ষেত্রে এ (মূল্য) ছাড়া অন্য কিছু ধর্তব্য হবে না।

গ্রন্থকার বলেন : এটি ইমাম মুহাম্মদ (র) এর অভিমত। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন : এ জাতীয় সম্পত্তি পরিমাপ করে বণ্টন করা হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র) এর যুক্তি হচ্ছে : নীচের তলায় এমন উপযুক্ততা এবং সম্ভাবনা রয়েছে, যা উপরের তলায় নেই। যেমন, (নীচে) পানির কূপ তৈরী করা, মাটির নীচে কামরা তৈরী করা, উট বা ঘোড়ার খোয়াড় বানানো, ইত্যাদি। এ অবস্থায় উপর ও নীচ তলার মধ্যে মূল্য নির্ধারণ করা ব্যতিরেকে সমতা বিধান করা সম্ভব নয়। (কাজেই মূল্য) সাব্যস্ত করে সে হিসাবেই তা বণ্টন করা হবে।) আর ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর যুক্তি হলো : হাত ও গজ দ্বারা পরিমাপ করে বণ্টন করাই হলো আসল। কেননা, এখানে অংশীদারীত্ব তো পরিমাপযোগ্য বস্তুতেই, মূল্যের ক্ষেত্রে নয়। কাজেই যথা সম্ভব পরিমাপ করে বণ্টন করার উপরই আমল করার চেষ্টা করা হবে। আর এখানে লক্ষ্যণীয় হলো বসবাসের ক্ষেত্রে সমতা বিধান করা, উপকার হাসিল করার ক্ষেত্রে সমতা বিধান করা নয়।

এরপর ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর মধ্যেও এ ব্যাপারে মতভেদ হয় যে, গজ বা হাত দ্বারা কেমন করে পরিমাপ করা হবে? ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন : নীচের তলার এক হাত উপরের তলার দুই হাতের সমান। আর ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন : (না, বরং) এক হাতই এক হাতের সমান বলে গণ্য হবে। কেউ কেউ বলেন, নীচের তলাকে উপর তলার উপর অগ্রাধিকার প্রদান বা উভয়টিকে সমান মান দেওয়া অথবা কখনো নীচের তলাকে অগ্রাধিকার দেওয়া আবার

---

১. এখানে দৈর্ঘ্য বলতে উচ্চতা বুঝানোই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ রাস্তার উচ্চতা নিয়ে যদি মতভেদ হয়, তাহলে বাড়ীর প্রধান ফটকের উচ্চতা যে পরিমাণ এবং এর প্রস্থ যে পরিমাণ, সে হিসাবেই রাস্তার উচ্চতা এবং প্রস্থের বিষয়টি নির্ণয় করা হবে।

কখনো উপরের তলাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার বিষয়ে আমাদের ইমামদ্বয় যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন, তা তারা তাদের সমকালীন অবস্থার প্রেক্ষিতে করেছেন অথবা নিজ নিজ শহরের লোকদের রেওয়াজ হিসাবে বলেছেন। কেউ কেউ বলেন : (না,) ফিকহী কারণেই এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন; রেওয়াজ হিসাবে নয়।

ইমাম আবু হানীফা (র) এর বক্তব্যের যুক্তি হচ্ছে : উপরের তলার তুলনায় নীচের তলায় দ্বিগুণ ফায়দা নিহিত আছে। কেননা, উপরের তলা ধবংস হয়ে যাওয়ার পরও নীচের তলার ফায়দা বাকী থেকে যায়। কিন্তু নীচের তলা ধবংস হয়ে যাওয়ার পর উপরের তলার ফায়দা আর বাকী থাকে না। অধিকন্তু নীচের তলায় ভিন্নভাবে কিছু বানানো এবং বসবাস করা উভয়টিই সম্ভব। কিন্তু উপরের তলায় শুধু মাত্র বসবাস করাই সম্ভব, অন্য কিছু সম্ভব নয়। কেননা, নীচের তলার মালিকের সম্মতি ব্যতিরেকে উপরের তলায় কোন কিছু বানানো সম্ভব নয়। কাজেই নীচের তলার এক হাত উপরের তলার দুই হাতের সমান বলে ধর্তব্য হবে।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর যুক্তি হলো : উপর তলা এবং নীচের তলা উভয় তলার উদ্দেশ্যই হলো– বসবাস করা। আর এ বসবাসের ক্ষেত্রে উভয় তলা হচ্ছে সমান এবং উভয়ের ফায়দাই হলো বরাবর। কেননা, ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর মূলনীতি অনুসারে প্রত্যেক তলার মানুষের জন্যই এমন কিছু সম্ভব; যা অন্যের জন্য ক্ষতিকর নয়। (কাজেই উপর তলার এক হাত নীচের তলার এক হাতের সমান বলেই গণ্য হবে।)

আর ইমাম মুহাম্মদ (র) এর যুক্তি হলো : উপর তলা এবং নীচের তলার গরম ও ঠান্ডা এক রকমের হয় না। এই হিসাবে উভয় তলার ফায়দাও বিভিন্ন রকমের। এ অবস্থায় মূল্যের ভিত্তিতে উপর তলা ও নীচের তলার মধ্যে সমতা বিধান করা ব্যতিরেকে অন্য উপায়ে সমতা বিধান করা সম্ভব নয়। (কাজেই মূল্যের ভিত্তিতেই উভয় তলার মধ্যে সমতা বিধান করা হবে।) বর্তমানে ইমাম মুহাম্মদ (র) এর মতামতের উপরই ফাতওয়া। অধিকন্তু তার মতের যৌক্তিকতা প্রমাণ করার জন্য অতিরিক্ত ব্যাখ্যার কোন প্রয়োজন নেই।

ইমাম আবু হানীফা (র) এর বক্তব্যের ব্যাখ্যা যা কিতাবে (কুদূরীতে) উল্লেখ রয়েছে, তা হলো : بَيْتُ كَامِلْ তথা দ্বিতল ভবনের ৩৩$\frac{১}{৩}$ হাত শুধু উপর তলা ভবনের ১০০ হাতের সমান হবে। কেননা, শুধু উপর তলা– নীচ তলার অর্ধেকের অনুরূপ। সুতরাং নীচ তলার ৩৩$\frac{১}{৩}$ হাত উপর তলার ৬৬$\frac{২}{৩}$ হাত এর সমান হবে। এর সাথে আরো যোগ হবে উপর তলার ৩৩$\frac{১}{৩}$ হাত। এই হিসাবে ১০০ হাত – যা শুধু উপর তলা ভবনের ১০০ হাতের সমান। আর শুধু নীচ তলা বিশিষ্ট ভবনের ১০০ হাত (بَيْتُ كَامِلْ) তথা দ্বিতল ভবনের ৬৬$\frac{২}{৩}$ হাতের সমান হবে। কেননা, এর (بَيْتُ كَامِلْ) উপর তলা– নীচ তলার অর্ধেকের মত। এই হিসাবে এর সর্বশেষ পরিমাণ হলো ১০০ হাত। যেমন– আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর বক্তব্যের ব্যাখ্যা হলো : بَيْتٌ كَامِلٌ তথা দ্বিতল ভবনের ৫০ হাত শুধু নীচ তলা ভবনের ১০০ হাতের সমান অথবা শুধু উপর তলা ভবনের ১০০ হাতের সমান হবে।

কেননা ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর মতে উপর–নীচ উভয় সমান। কাজেই পূর্ণাঙ্গ (দ্বিতল) ভবনের ৫০ হাত– ১০০ হাতের সমান বলে গণ্য হবে। ৫০ হাত নীচের তলা থেকে আর বাকী ৫০ হাত উপরের তলা থেকে ধর্তব্য হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন : বণ্টনপ্রার্থী অংশীদারদের পরস্পরের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হওয়ার পর যদি বণ্টনকারী দুই ব্যক্তি সাক্ষ্য প্রদান করে তাহলে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে।

গ্রন্থকার বলেন : উপরে কুদূরী গ্রন্থকার যা বলেছেন, তা মূলত: ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর অভিমত। পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন : তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর প্রথম অভিমতও এরূপই ছিল। ইমাম শাফিঈ (র) ও অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। অবশ্য ফকীহ্ খাস্সাফ (র) ইমাম মুহাম্মদ (র) এর অভিমত শায়খায়নের অভিমতের অনুরূপ বলে উল্লেখ করেছেন। বিচারকের পক্ষ হতে নিয়োগ প্রাপ্ত দুই বণ্টনকারী এবং অন্যান্যদের হুকুম একই।

ইমাম মুহাম্মদ (র) এর যুক্তি হলো : তারা (সাক্ষীদ্বয়) তাদের নিজেদের কর্মের অনুকূলে সাক্ষ্য দিয়েছে (অথচ নিজের ব্যাপারে নিজের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হয় না।) কাজেই তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না।

যেমন কেউ যদি নিজের গোলাম আজাদ করার বিষয়টিকে অপরের কর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট করে এবং এ অবস্থায় ঐ তৃতীয় ব্যক্তি যদি নিজের সে কর্ম সম্পাদনের ব্যাপারে নিজেই সাক্ষ্য প্রদান করে, তাহলে তার এ সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হয় না।

শায়খাইনের যুক্তি হলো : বণ্টনকারীদ্বয় অন্যের কর্মের ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করেছে। আর তা হলো : বণ্টিত সম্পত্তি বুঝে পওয়া এবং দখলে নেওয়া। তারা তাদের নিজেদের কর্মের উপর সাক্ষী দেয়নি। কেননা, তাদের কাজ তো হলো বণ্টন করে পরস্পরের হক আলাদা করে দেওয়া। এ কাজের ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদানের কোন প্রয়োজন নেই। দ্বিতীয়ত: এ পৃথককরণের বিষয়টি مَشْهُوْدٌ بِه তথা এমন কোন বিষয় নয়, যার ব্যাপারে সাক্ষ্য দেওয়া যায়। কেননা, এটি (পৃথক করণকে মেনে নেওয়া) কোন অপরিহার্য ব্যাপার নয়। এটি তো অপরিহার্য হয় দখল করা ও বুঝে নেওয়ার দ্বারা। আর এ দখল ও বুঝে নেওয়া হচ্ছে অপরের কাজ (বণ্টনকারীদের কাজ নয়)। সুতরাং অন্যের কাজের ব্যাপারে বণ্টনকারীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে।

ইমাম তাহাভী (র) বলেন, বণ্টকারীদ্বয় যদি পারিশ্রমিকের বিনিময়ে বণ্টনকার্য করে থাকেন, তাহলে ফকীহগণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত মতে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। কোন কোন মাশাইখ এ অভিমতের প্রতিই আকৃষ্ট হয়েছেন বলে উল্লেখ পাওয়া

যায়। কেননা, তারা (সাক্ষীদ্বয়) এমন কাজ পরিপূর্ণ হয়েছে বলে দাবী করছে, যে কাজের ব্যাপারে তাদেরকে শ্রম বিনিয়োগের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। কাজেই এটি বাহ্যিক দৃষ্টিতে শাহাদাত (সাক্ষ্য) বলে ধর্তব্য হলেও সূক্ষ্ণ ও অভ্যন্তরীণ দৃষ্টিতে এটি হলো একটি দাবী। অতএব এ অবস্থায় তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। তবে এ মাসআলার ব্যাপারে আমাদের বক্তব্য হলো : বণ্টনকারীদ্বয়ের এ সাক্ষ্য তাদের নিজেদের অনুকূলে কোন লাভালাভকে টেনে আনছে না। কেননা, বণ্টনপ্রার্থী অংশীদার ব্যক্তিগণ এ ব্যাপারে পরিপূর্ণ একমত যে, বণ্টনকারীদ্বয়কে যে কাজ, তথা সম্পত্তি পৃথক করণ ও ভাগ করণের কাজে শ্রম বিনিয়োগের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে, তারা তা পূরা করেছে। (অতএব বুঝা যাচ্ছে যে, তাদের কর্মের ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই), মতভেদ হলো : হক বুঝে পাওয়ার ব্যাপারে। কাজেই তাদের প্রতি অপবাদ আরোপ করার কোন সুযোগ নেই। (এই হিসাবে বণ্টনকারীদ্বয়ের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়)।

যদি একজন বণ্টনকারী সাক্ষ্য প্রদান করে, তবে তা গ্রহণীয় হবে না। কেননা, একা-এক ব্যক্তির সাক্ষ্য অপরের বেলায় গ্রহণযোগ্য হয়না। বিচারক যদি নিজের কোন ব্যক্তিকে বলেন, অপর কোন ব্যক্তির নিকট মালামাল হস্তান্তর করে দেওয়ার জন্য, তাহলে আমীনের কথা গ্রহণযোগ্য হবে- তার উপর থেকে জরিমানা করার ক্ষেত্রে। কিন্তু অন্যের উপর কোন কিছুকে চাপিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। যদি সেই তৃতীয় ব্যক্তি এ বিষয়টিকে অস্বীকার করে। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

বণ্টনে ভুল হয়েছে বলা এবং এতে মালিকানার দাবী উত্থাপন করা[1]

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ; যদি বণ্টনপ্রার্থীদের কোন একজন বণ্টনে ভুল হয়েছে দাবী করে বলে যে, তার ভাগের কিছু জিনিস তার (অমুক) সাথীর দখলে রয়েগিয়েছে, অথচ সে তার অংশ বুঝে পাওয়ার বাপারে প্রথমে স্বীকারোক্তিও করেছিল, তাহলে দলীল প্রমাণ ছাড়া তার এ কথা বিশ্বাসযোগ্য হবে না। কেননা বণ্টন কার্য সম্পাদিত হওয়ার পর, সে তা রহিত হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে দাবী করছে। কাজেই দলীল– প্রমাণ ছাড়া তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না।

যদি বাদী ব্যক্তির অনুকূলে দলীল-প্রমাণ সাব্যস্ত না হয় তাহলে অংশীদারদের থেকে শপথ নেওয়া হবে (যদি বাদী চায়)। তাদের থেকে যদি কেউ শপথ করতে অস্বীকার করে, তবে তার এবং বাদীর অংশ একত্রিত করা হবে। পরে তাদের হিস্যা অনুপাতে এ সম্পত্তি তাদের মধ্যে বণ্টন করা হবে।

কেননা, অস্বীকার করা বিশেষ ভাবে তার ক্ষেত্রে দলীল হিসাবে কাজ করবে। অতএব তাদের ধারণা অনুপাতে তাদের সাথে আচরণ করা হবে।

গ্রন্থকার বলেন : তার দাবী গ্রহণ না করাই উচিত। কেননা, তার বক্তব্যে বৈপরিত্য বিদ্যমান রয়েছে। গ্রন্থকার পরবর্তী বাক্যে এদিকেই ইংগিত করেছেন।

বাদী যদি বলে : আমি আমার হক বুঝে পেয়েছি, তবে তুমি আমার থেকে কিছু সম্পত্তি নিয়ে গিয়েছো,তাহলে শপথসহ বিবাদীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা, বাদী- বিবাদীর বিরুদ্ধে সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়ার দাবী করছে। অথচ সে এ বিষয়টিকে অস্বীকার করছে।

যদি বাদী বলে, আমার জায়গা ঐ পর্যন্ত, কিন্তু সে আমাকে তা হস্তান্তর করে দেয়নি, আর যদি সে সম্পত্তি বুঝে পাওয়ার ব্যাপারে স্বীকারোক্তিও ব্যক্ত না করে, এ অবস্থায় তার সাথে যে ব্যক্তি শরীক, সে যদি তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তাহলে তারা উভয়ই শপথ করবে, এরপর এ বণ্টন বাতিল করে দেওয়া হবে। কেননা, বণ্টনের মাধ্যমে তারা যে পরিমাণ সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়েছে, ঐ পরিমাণ নিয়েই তাদের মধ্যে মতভেদ। কাজেই এটি নজীর ঐ মতভেদের, যা বিক্রীত মালের

---

১. বণ্টনকারী ব্যক্তি সম্পত্তি বণ্টন করে দেওয়ার পর যদি এতে কোন ভুল ধরা পড়ে, অথবা কেউ যদি বণ্টিত সম্পত্তিতে মালিকানা দাবী করে, তবে এর বিভিন্ন ধরন ও প্রক্রিয়া হতে পারে। এগুলোর প্রত্যেকটির হুকুম ভিন্ন। এ পরিচ্ছেদে এরই বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

পরিমাণের ব্যাপারে সংঘটিত হয়ে থাকে। পূর্বে পরস্পর শপথ করার বিধিবিধান সম্পর্কিত আলোচনায় এ বিষয়ে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।

যদি অংশীদার দু'জন সম্পদের মূল্য নির্ধারণের ব্যাপারে মতভেদ করে, তাহলে তাদের বক্তব্যের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করা হবে না। কেননা এটি পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ। এ অভিযোগ বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ধর্তব্য হয় না। অনুরূপভাবে বণ্টনের মধ্যেও তা শোনা হবে না। কেননা, এখানে বণ্টনপ্রার্থীদের মধ্যে পরস্পর সম্মতি রয়েছে। **কিন্তু বণ্টন যদি বিচারকের ফয়সালা অনুপাতে হয় এবং পক্ষপাতিত্ব যদি খুব বেশী হয়** (তাহলে অভিযোগ শোনা হবে।) কেননা, বিচারকের হস্তক্ষেপে ন্যায়পরায়ণতা বিদ্যমান থাকা শর্ত, (অথচ এখানে তা নেই।) **যদি দুই শরীকের মধ্যে কোন বাড়ী বণ্টন হয় এবং এ বণ্টনে তারা এক একটি অংশ প্রাপ্ত হয়, এ অবস্থায় তাদের একজন যদি অন্যের দখলে বিদ্যমান কোন একটি ঘরের ব্যাপারে এ মর্মে দাবী করে যে, বণ্টনে একটি সে প্রাপ্ত হয়েছিল** (কিন্তু সে তা-তার নিকট হস্তান্তর করেনি) **এ পর্যায়ে বিবাদী যদি বাদীর দাবী অস্বীকার করে, তাহলে বাদীর উপর অপরিহার্য হবে** সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করা। **এর কারণ আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি।** আর যদি তারা **উভয়েই সাক্ষ্য- প্রমাণ পেশ করে , তবে বাদীর সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণযোগ্য হবে।**

কেননা, বাদীর এখানে দখলদারীত্ব নেই। আর যার দখলদারীত্ব নেই, তার সাক্ষ্য- প্রমাণই অগ্রাধিকার পায় দখলদার ব্যক্তির সাক্ষ্য- প্রমাণের উপর। যদি সম্পত্তি বুঝে পাওয়ার স্বীকারোক্তির আগে আগে **ঘটনা ঘটে, তাহলে তারা উভয়ে শপথ করবে এবং বণ্টনকে রদ করে দেবে। অনুরূপ ভাবে যদি তারা সীমানা নিয়ে মতভেদ করে এবং উভয়ই সাক্ষ্য- প্রমাণ পেশ করে, তাহলে ফয়সালা দেওয়া হবে প্রত্যেকের জন্য ঐ অংশের, যা অপরের দখলে আছে।**[১] **এর কারণ আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। যদি একজনের অনুকূলে সাক্ষ্য- প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহলে তার পক্ষ্যে ফয়সালা দেওয়া হবে। আর যদি কারো পক্ষেই সাক্ষ্য- প্রমাণ না পাওয়া যায়, তবে তারা উভয় শপথ করবে,** যেমন : বেচা-কেনার মধ্যে হয়ে থাকে।

পরিচ্ছেদ : হক তথা মালিকানা দাবী করার মাসাইল

ইমাম কুদূরী (র) বলেন : (বণ্টনের পর) যদি দুই শরীকের কোন এক জনের অংশের নির্দিষ্ট কিয়দংশের ব্যাপারে মালিক বের হয়ে আসে, তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে এতে বণ্টন বাতিল হবে না। এ অবস্থায় উক্ত ব্যক্তি তার অংশের সমপরিমাণ তার সাথীর অংশ থেকে নিয়ে নিবে। পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন : এ অবস্থায় বণ্টন রহিত বা বাতিল হয়ে যাবে।

গ্রন্থকার বলেন : ইমাম কুদূরী (র) এর মতে, নির্দিষ্ট কিয়দংশের মধ্যে মালিক বের হয়ে এলে ইমামদ্বয়ের এ মতভেদ প্রযোজ্য হবে। 'আসরার' গ্রন্থেও অনুরূপ বর্ণিত

১. অর্থাৎ বর্তমানে যে অংশটি যার দখলে আছে, তা দ্বিতীয় জন পাবে।

রয়েছে। প্রকৃত পক্ষে সহীহ হলো : দুই শরীকের কোন এক জনের অ-বিভাজ্য কিয়দংশের মধ্যে মালিক বের হয়ে এলে ইমামদ্বয়ের এ মতভেদ প্রযোজ্য হবে। পক্ষান্তরে যদি নির্দিষ্ট কিয়দংশের মধ্যে মালিক বের হয়ে আসে, তবে ফকীহগণের সর্বসম্মত রায় অনুসারে উক্ত বন্টন বাতিল হবে না। আর যদি পূর্ণ সম্পত্তির অবিভাজ্য কিয়দংশের ব্যাপারে মালিক বের হয়ে আসে, তবে ফকীহগণের সর্বসম্মত রায়ে বন্টন বাতিল হয়ে যাবে। এ হিসাবে এখানে তিনটি অবস্থা হলো। ইমাম কুদূরী (র) এখানে ইমাম মুহাম্মদ (র) এর অভিমতটি উল্লেখ করেননি। অবশ্য আবু সুলায়মান (র) তাকে ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর সাথে উল্লেখ করেছেন। আর আবু হাফ্স (র) তাকে ইমাম আবু হানীফা (র) এর সাথে উল্লেখ করেছেন। এটিই বিশুদ্ধতম মত। ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর যুক্তি হলো : অবিভাজ্য কিয়দংশের মালিক বের হয়ে আসায় একথা প্রকাশ পেয়ে গেছে যে, উক্ত দুই মালিকের মালে তৃতীয় অপর একজন মালিকও আছে। কাজেই তার সম্মতি ছাড়া বণ্টন বাতিল বলে পরিগণিত হবে। যেমনিভাবে বণ্টন বাতিল বলে পরিগণিত হয়, যখন উভয়ের অবিভাজ্য অংশে মালিক বের হয়ে আসে। এর[১] কারণ হলো : অবিভাজ্য অংশের মালিক বের হয়ে আসার কারণে বণ্টনের অর্থ শেষ হয়ে গিয়েছে। আর তা হলো : পৃথক পৃথক করণ। কেননা, এ অবিভাজ্য অংশের মালিকানা ওয়াজিব করে অবিভাজ্য ভাবে অপরের অংশ থেকে অনুরূপ পরিমাণ সম্পত্তি নিয়ে নেওয়া, নির্দিষ্ট কিয়দংশের মালিক বের হয়ে আসার বিষয়টি এর থেকে ব্যতিক্রম।

ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র) এর যুক্তি হলো : কোন এক শরীকের অংশের অবিভাজ্য কিয়দংশের মালিক বের হয়ে আসার কারণে পৃথক করণের অর্থ শেষ হয় না। আর এ কারণে শুরু অবস্থাতেই এভাবে সম্পত্তি বণ্টন করা জাইয আছে। যেমন কোন একটি সম্পত্তির সামনের অর্ধেকে দুই ব্যক্তি এবং অপর ব্যক্তি (তিন ব্যক্তি) শরীক। আর পেছনের অর্ধেকে শুধুমাত্র দুই ব্যক্তি শরীক। এতে আর কোন শরীক নেই। এই অবস্থায় উক্ত দুই শরীক ব্যক্তি যদি এইভাবে সম্পত্তি বণ্টন করে যে, সামনের অর্ধেকে তাদের যা আছে তা এবং পেছনের এক চতুর্থাংশ এক জনে নিবে, তবে এ বণ্টন জাইয হবে।[২] (প্রথমত : যেভাবে জাইয) এমনিভাবে শেষের দিকেও এ

---

১. কোন একজনের অবিভাজ্য কিয়দংশের মালিক বের হয়ে আসার বিষয়টি উভয়ের অবিভাজ্য কিয়দংশের মধ্যে মালিক বের হয়ে আসার মতই।

২. যেমন একটি বাড়ীতে যায়দ, সাজিদ এবং খালিদ, এই তিন ব্যক্তি শরীক। বাড়ীর সামনের অর্ধেকে তিন জনই শরীক। কিন্তু পেছনের অর্ধেকে শুধুমাত্র যায়দ এবং খালিদ শরীক। এতে সাজিদের কোন অংশ নেই। এ অবস্থায় যায়দ এবং খালিদ যদি তাদের সম্পত্তি এভাবে বণ্টন করে যে, সামনের অংশ পূর্ণটাই যায়দ নেবে এবং পেছনের অংশ থেকে $\frac{1}{4}$ নেবে, অর্ধেক নয়। এভাবে বণ্টনের ফলে মাসআলার ধরন এরূপ হলো যে, যায়দ এবং সাজিদ সামনের অর্ধেকের আধাআধির অংশীদার হলো। আর পেছনের অর্ধেকের মধ্যে খালিদের $\frac{3}{4}$ এবং যায়দের $\frac{1}{4}$ অংশ হলো। উল্লেখ্য যে, এভাবে বন্টন করা জাইয। এতে পৃথক করণের বিষয়টিও বহাল আছে। কাজেই যেমনিভাবে প্রথম অবস্থায় বন্টন করা জাইয, ঠিক তদ্রূপ শেষ অবস্থায়ও বণ্টন করা জাইয হবে।

জাতীয় লেন-দেন করা জাইয। এ হিসাবে উক্ত মাসআলাটি **নির্দিষ্ট অংশে** মালিক বের হয়ে আসার মতই হয়ে গেল। পক্ষান্তরে উভয় শরীকের অবিভাজ্য অংশে মালিক বের হয়ে এলে এর হুমুমের থেকে ব্যতিক্রম হবে। কেননা, এ অবস্থায়ও যদি বণ্টনকে বহাল তথা কার্যকরী রাখা হয়, তাহলে তৃতীয় ব্যক্তির অবশ্যই ক্ষতি হবে। (এ অবস্থায়) তার অংশ পূর্বের দুই শরীকের অংশের মধ্যে ছড়িয়ে থাকার কারণে। কিন্তু আলোচ্য মাসআলায় নতুন মালিকের কোন ক্ষতি নেই। কাজেই এ দুটি মাসআলার মধ্যে ব্যবধান সুস্পষ্ট।[১]

সূরতে মাসআলা (মাসআলার প্রকৃতি বা ধরন) হলো এই যে, যখন শরীক দুই জনের একজনে বাড়ীর সামনের এক তৃতীয়াংশ নিল এবং অপরজনে নিল পেছনের অংশের দুই তৃতীয়াংশ, আর এই উভয় অংশের মূল্য হচ্ছে সমান, এ অবস্থায় কেউ সামনের ভাগের অর্ধেক অংশের মালিকানা দাবী করলো, তাহলে ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র) এর মতে উক্ত ব্যক্তি (সামনের ভাগের মালিক যায়দ) ইচ্ছা করলে এ বণ্টনকে নাকচ করে দিতে পারবে– অধিক ভাগাভাগি করার ক্রটিকে দূরীভূত করার লক্ষ্যে। আর ইচ্ছা করলে সে এ বণ্টনকে বহাল রেখে, যে অংশীদারের ভাগে পেছনের অংশ পড়েছে, তার সে অংশ থেকে এক চতুর্থাংশ ফেরৎ নিয়ে নেবে। কেননা, সামনের পূর্ণ অংশের মালিক বের হয়ে এলে, সে ঐ ব্যক্তির দখলে যে পরিমাণ আছে তার অর্ধেক ফেরৎ নিয়ে নিত। যেহেতু সামনের ভাগের অর্ধেকের মালিক বের হয়ে এসেছে, কাজেই সে তার অপর সাথীর দখলে যা আছে এর অর্ধেকের অর্ধেক তথা এক চতুর্থাংশ ফেরৎ নিয়ে নেবে। অংশ বিশেষকে পূর্ণ বস্তুর উপর কিয়াস করে এ বিধান দেওয়া হয়েছে।

সম্মুখ ভাগের মালিক ব্যক্তি তার অংশের অর্ধেক বিক্রি করে দেওয়ার পর যদি অবশিষ্ট অর্ধেকের নতুন কোন মালিক বের হয়ে আসে তাহলে ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মুহাম্মদ (র) এর মতে উক্ত (সম্মুখ ভাগের মালিক) ব্যক্তি পেছনের অংশের মালিকের নিকট থেকে এক চতুর্থাংশ ফেরৎ নিয়ে নেবে। এর কারণ আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। আর প্রথমোক্ত মাসআলায় বণ্টন নাকচ করে দেওয়া বা না দেওয়ার ব্যাপারে তার যে ইখতিয়ার ছিল, সম্পত্তির কিয়দংশ বিক্রি করে দেওয়ায় তার সে ইখতিয়ার এখন আর থাকবে না; বরং রহিত হয়ে যাবে।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর মতে এ অবস্থায় তার অপর সাথীর দখলে যে সম্পত্তি রয়েছে, তা তারা আধাআধি করে পাবে। আর সম্মুখের অংশ যা বিক্রি করা হয়েছে এর অর্ধেক মূল্য সম্মুখ ভাগের মালিক– পেছনের ভাগের মালিক ব্যক্তিকে জরিমানা স্বরূপ ফেরৎ দিয়ে দেবে। কেননা, ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর মতে, যে বণ্টন কার্য পূর্বে সম্পাদন করা হয়েছিল, তা ফাসিদ হয়ে গেছে। তা সত্ত্বেও ফাসিদ আকদের ভিত্তিতে যে মূল্য হস্তগত হয়, তা যেহেতু مَمْلُوْك হিসাবে গণ্য হয় অর্থাৎ তাতেও যেহেতু মালিকানা

১. কাজেই একটিকে অপরটির উপর কিয়াস করা ঠিক নয়।

প্রতিষ্ঠিত হয়, সেহেতু এতেও ক্রয়-বিক্রয়ের হুকুম কার্যকরী হবে। আর তা হলো বিক্রীত মূল্যের জরিমানা প্রদান করা। কাজেই তাকে তার অপর শরীক ব্যক্তির অর্ধাংশের জরিমানা পরিশোধ করতে হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন : (মৃত ব্যক্তির পরিত্যাজ্য) সম্পত্তি (ওয়ারিসদের মধ্যে) বণ্টন হয়ে যাওয়ার পর পরিত্যাজ্য সম্পত্তির উপর যদি এমন ঋণের কথা প্রকাশ হয়, যা পুরা সম্পত্তি গ্রাস করে নেয়, তাহলে পূর্ব বণ্টন রদ তথা বাতিল করে দেওয়া হবে। কেননা, এ ঋণ ওয়ারিসদের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক।[১] এমনি ভাবে ঋণ যদি তার সমুদয় মাল গ্রাস করে না নেয়, তাহলেও, (বণ্টন বাতিল করে দেওয়া হবে।) কেননা, পাওনাদারদের হক এ সম্পত্তির সাথে যাওয়ার পরও এ পরিমাণ সম্পত্তি বাকী থাকে, যা-দ্বারা পাওনাদারদের ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব, তাহলে বণ্টন বাতিল হবে না। কেননা, এ অবস্থায় পাওনাদারদের হক তথা পাওনা পরিশোধ করার জন্য কৃত বণ্টন বাতিল করার কোন দরকার নেই।

বণ্টনের পর যদি পাওনাদারগণ তাদের পাওনা মাফ করে দেয় অথবা ওয়ারিসগণ যদি তাদের মাল থেকে ঋণ পরিশোধ করে দেয়, চাই ঋণ পূর্ণ সম্পত্তি গ্রাস করে নেক বা না নেক, এ অবস্থায় বণ্টন জাইয হবে। কেননা, বণ্টনের ক্ষেত্রে যা প্রতিবন্ধক ছিল, তা শেষ হয়ে গেছে। যদি বণ্টন প্রার্থীদের একজন পরিত্যাজ্য সম্পদে ঋণ আছে বলে দাবী করে, তবে তার দাবী সহীহ হবে। কেননা, এতে (প্রথমে সম্পদ বণ্টন করা ও পরে ঋণের দাবী করাতে) কোন বৈপরিত্য নেই। কারণ ঋণের সম্পর্ক হলো পরিত্যাজ্য সম্পদের মালিয়াতের সাথে। আর বণ্টনের সম্পর্ক হলো পরিত্যাজ্য সম্পদের বাহ্যিক অবস্থার সাথে।

যদি ওয়ারিসদের কোন একজন পরিত্যাজ্য সম্পত্তির মধ্যে নির্দিষ্ট কোন একটি মালের মালিকানা দাবী করে, তা যে কোন উপায়েই হোক না কেন, তাহলে তার কথা গ্রাহ্য হবে না। কেননা, এ ক্ষেত্রে তার দাবী ও কর্মে বৈপরিত্য রয়েছে। কেননা, বণ্টনের ব্যাপারে পদক্ষেপ নেওয়ার মধ্যে এ কথার স্বীকারোক্তি রেয়েছে যে, যে মাল বণ্টন করা হয়েছে, তা শরিকী মাল।(একক কারো মাল নয়। কাজেই তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না।)

---

১. কোন ব্যক্তি মারা যাওয়ার পর সে যদি পরিত্যাজ্য সম্পদ রেখে যায়, তবে এর দ্বারা প্রথমে তার (মৃত ব্যক্তির) দাফন- কাফনের ব্যবস্থা করা হবে। এরপর সে ঋণগ্রস্ত হয়ে থাকলে তার ঋণ পরিশোধ করা হবে। তারপর অবশিষ্ট সম্পদের এক তৃতীয়াংশের দ্বারা তার অসিয়ত বাস্তবায়িত করা হবে। এরপর যদি আরো সম্পদ বাকী থাকে, তবে তা ওয়ারিসদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হবে। এটাই হলো মৃত- ব্যক্তির পরিত্যাজ্য সম্পত্তির ক্ষেত্রে ইসলামের বিধান। তা সত্ত্বেও কেউ মারা যাওয়ার পর যদি ওয়ারিসগণ তার সমুদয় সম্পত্তি বণ্টন করে নেয়, এরপর জানা যায় যে, তার যিম্মায় ঋণ আছে, এ অবস্থায় দেখতে হবে, ঋণ তার পূরা সম্পত্তি গ্রাস করে নেয় কিনা? উপরোক্ত দুই অবস্থাতেই বণ্টন বাতিল করে দিতে হবে। প্রথমোক্ত অবস্থায় এই পরিত্যাজ্য সম্পত্তির সাথে ওয়ারিসদের হক সম্পর্কিত না হওয়ার কারণে, আর শেষোক্ত অবস্থায় এই সম্পত্তির সাথে পাওনাদারদের হক সম্পর্কিত হওয়ার কারণে। অবশ্য সম্পত্তি বণ্টন করে নেওয়ার পরও যদি এ পরিমাণ সম্পদ অ -বণ্টিত অবস্থায় থাকে, যা-দ্বারা পাওনাদারদের পাওনা পরিশোধ করা সম্ভব, তাহলে এ অবস্থায় বণ্টন বাতিল করার প্রয়োজন হবে না। বরং এ অবস্থায় বণ্টন বহাল থাকবে।

পরিচ্ছেদ : মুহায়াত[১] -এর বিবরণ

প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে ইস্‌তিহসান এর ভিত্তিতে লাভ, মুনাফা এবং সুবিধা সমূহ বণ্টন করে নেওয়া জাইয। কেননা, অনেক সময় সমষ্টিগত ভাবে মুনাফা বা সুবিধা হাসিল করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এ কারণেই এতে বিচারক বল প্রয়োগ করতে পারেন, যেমন বল প্রয়োগ করতে পারেন তিনি বণ্টনের ক্ষেত্রে। তবে এদুয়ের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এই যে, মুনাফা হাসিলের তাকমীল(পূর্ণতা অর্জন) এর ক্ষেত্রে বণ্টনের বিষয়টি অধিক শক্তিশালী। কেননা, বণ্টনের মধ্যে একই সময়ে সমুদয় মুনাফাকে একত্রিত করা হয়। আর تَهَايُؤْ এর মধ্যে মুনাফাকে একত্রিত করা হয় পর্যায়ক্রমে। যেহেতু বণ্টনের বিষয়টি مُهَايَا থেকে অধিক শক্তিশালী। এ কারণেই যদি দুই শরীকের কোন একজন বণ্টনের দাবী করে এবং অপর জন مُهَايَاةْ প্রার্থনা করে, তাহলে বিচারক (مُهَايَاةْ না করে) তাদের সম্পত্তি বণ্টন করে দেবেন। কেননা, বণ্টনের বিষয়টি (লাভালাভের) পূর্ণতা বিধানের ক্ষেত্রে অধিক কার্যকরী।

যদি বণ্টনযোগ্য সম্পত্তিতে 'مُهَايَاةْ' করা হয়, এরপর শরীকদের কোন একজন বণ্টনের দাবী করে, তবে সম্পত্তি বণ্টন করে দেওয়া হবে এবং' مُهَايَاةْ' বাতিল হয়ে যাবে। কেননা, লাভ পৌঁছানোর ক্ষেত্রে বণ্টনের বিষয়টি অধিক কার্যকর.। শরীকদের কোন এক জনের মারা যাওয়ার কারণে বা উভয়ের মারা যাওয়ার কারণে ' مُهَايَاةْ' বাতিল হবে না। কেননা, যদি ' مُهَايَاةْ' বাতিল হয়ে যায়, তাহলে বিচারক তা আবার নতুন করে করবেন। অথচ একবার ভঙ্গ করে আবার নতুন ভাবে মুহায়াত করাতে কোন লাভ নেই।

কোন বাড়ীতে দুইজন শরীক আছে। তারা যদি পরস্পর এভাবে মুহায়াত করে যে, সে বাড়ীর এ অংশে থাকবে এবং অপরজন অন্য অংশে থাকবে, অথবা সে উপর তলায় থাকবে এবং অপরজন নীচ তলায় থাকবে, তবে তা জাইয হবে। কেননা, এভাবে মূল সম্পত্তি বণ্টন করা জাইয, কাজেই এভাবে ' مُهَايَاةْ' (মুনাফা বণ্টনও) জাইয হবে। উল্লেখ্য যে, এ প্রক্রিয়ায়' تَهَايُؤْ' করার মর্ম হলো সমুদয় অংশকে পৃথক করে দেওয়া। মূলত: এটি সম্পদের' مُبَادَلَةْ' তথা বিনিময় নয়। এ কারণেই এতে' تَاقِيْتْ' তথা সময় নির্দিষ্ট করণ শর্ত নয়।

মুনাফা বণ্টনকারী প্রত্যেক অংশীদারের এই হক থাকবে যে, তারা মুহায়াতের মাধ্যমে যা প্রাপ্ত হয়, তা অন্যের নিকট ভাড়া দিতে পারবে, চাই মূল আকদের মধ্যে ভাড়া দেওয়ার কথা শর্ত হিসাবে উল্লেখ করা হোক বা না হোক। কেননা,

---

১. মুহায়াত (مُهَايَاةْ) বাবে মুফা'আলার (بَابُ مُفَاعَلَةْ) ক্রিয়ামূল। আর তাহায়ু, (تَهَايُؤْ) بَابُ تَفَاعُلْ এর ক্রিয়ামূল। এর অর্থ হলো লাভ, মুনাফা এবং সুবিধাসমূহ বণ্টন করে নেওয়া। প্রথমে গ্রন্থকার (র) মূল সম্পত্তি ও বস্তুর বণ্টন সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। সে আলোচনার পর তিনি মুনাফা ইত্যাদির বণ্টন সম্পর্কিত আলোচনা এখানে করেছেন। কেননা, এদুয়ের মধ্যে একটি মূল ও অপরটি শাখার মর্যাদা রাখে। তাই প্রথমে তিনি মূল সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

প্রত্যেকের মালিকানায় ভিন্ন ভিন্ন ভাবেই মুনাফা হাসিল হয়ে থাকে। (তাই তারা তা ভাড়াও দিতে পারবো।)

যদি দুই (শরীক) ব্যক্তি কোন এক গোলামের ব্যাপারে এইভাবে' مُهَايَاةٌ ' তথা পালা বণ্টন করে যে, সে এক দিন তার খিদমত করবে এবং দ্বিতীয় দিন অপর জনের খিদমত করবে, তবে তা জাইয হবে। অনুরূপভাবে ছোট ছোট কামরার ক্ষেত্রেও এভাবে' تَهَايُؤْ ' (পালা বণ্টন) করা জাইয। কেননা,' مُهَايَاةٌ ' কখনো সময়ের হিসাবে হয়, আবার কখনো স্থানের হিসাবে হয়। এখানে প্রথমটিই নির্দিষ্ট।

' تَهَايُؤْ ' সময়ের হিসাবে হয়েছে না স্থানের হিসাবে হয়েছে, এ ব্যাপারে যদি দুই অংশীদারের মধ্যে মতভেদ হয় এমন বস্তুর ক্ষেত্রে, যাতে উভয়টিরই সম্ভাবনা রয়েছে, তাহলে বিচারক উভয়কে নির্দেশ দেবেন, যাতে তারা পরপর একমত হয়ে যায়। কেননা, যদি স্থানের পালা বণ্টন করা হয়, তবে তা হবে খুবই ইনসাফপূর্ণ কাজ। আর যদি সময়ের হিসাবে পালা বণ্টন করা হয়, তবে এতে মুনাফা হাসিল হবে পূর্ণাঙ্গ ভাবে। (অর্থাৎ এ অবস্থায় সে পূর্ণ ঘর বা কামরা থেকে একাই ফায়দা হাসিল করতে সক্ষম হবে।)

আর যখন বণ্টনের দিক এবং অবস্থার ব্যাপারে মতভেদ হয়ে গেছে তখন এ ক্ষেত্রে তাদের পরস্পরের ঐক্যমত হচ্ছে অপরিহার্য। যদি সময়ের হিসাবে তারা "تَهَايُؤْ কে গ্রহণ করে নেয়, তবে প্রথমে কে ব্যবহার করবে, তা নির্ধারণের জন্য লটারীর ব্যবস্থা করা হবে, অপবাদ থেকে বাঁচার লক্ষ্যে। যদি দুই (শরীক) ব্যক্তি দুইজন গোলমের ব্যাপারে এভাবে মুনাফা বণ্টন করে যে, এই গোলাম অমুকের খিদমত করবে এবং ঐ গোলাম অমুকের খিদমত করবে, তবে সাহেবায়নের মতে এভাবে পালা বণ্টন জাইয আছে। কেননা, তাদের মতে বিচারক কর্তৃক বল প্রয়োগ করে অথবা তাদের স্বেচ্ছা সম্মতিক্রমে এভাবে বণ্টন করা যেহেতু জাইয, কাজেই এভাবে পালা বণ্টনও জাইয হবে। কেউ কেউ বলেন : ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে বিচারক এভাবে বণ্টন করবেন না, আর ইমাম আবু হানীফা (র) হতে এভাবেই বর্ণিত রয়েছে। কেননা, তাঁর মতে এ জাতীয় মুনাফা বণ্টনের ক্ষেত্রে বল প্রয়োগ করা যায় না।

কিন্তু বিশুদ্ধতম বর্ণনায় ইমাম আবু হানীফা (র) এর অভিমতও হচ্ছে এই যে, বিচারক তা বণ্টন করে দেবেন। কেননা, খিদমতের মুনাফার মধ্যে সাধারণত: কম ব্যবধানই হয়ে থাকে। কিন্তু গোলামের মূল সত্তার বিষয়টি হলো এ হুকুম থেকে ব্যতিক্রম। কেননা, এ ক্ষেত্রে খুব বেশী ব্যবধান হয়ে থাকে। যেমন এ সম্পর্কে পূর্বেও বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।[১]

যদি দুই ব্যক্তি গোলাম দু'টির ব্যাপারে এভাবে تَهَايُؤْ করে যে, যে যাকে নেবে সে-ই তার খানা-পিনার ব্যবস্থা করবে, তবে তা জাইয আছে। এটি ইস্তিহসান (সূক্ষ্ম কিয়াস) এর কথা। কেননা দাস-দাসীকে আহার করানোর ব্যাপারে লোকেরা

১। 'যে যে জিনিস বণ্টন করা জাইয এবং যে যে জিনিস বণ্টন করা জাইয নয়, অনুচ্ছেদে।

সাধারণতঃ বদান্যতা প্রদর্শন করে থাকে। কিন্তু পোশাক-পরিচ্ছদের শর্ত করণের বিষয়টি পূর্ব হুকুম থেকে ব্যতিক্রম। কেননা পোশাকের ব্যাপারে লোকেরা সাধারণত বদান্যতা প্রদর্শন করে না।

যদি দুই ব্যক্তি দু'টি বাড়ীর ব্যাপারে এ মর্মে ' تَهَايُؤ ' (মুনাফা বন্টন) করে যে, তাদের প্রত্যেকে এক একটি বাড়ীতে বসবাস করবে, তবে তা জাইয হবে। আর এ ব্যাপারে বিচারক তাদেরকে বাধ্যও করতে পারবেন। সাহেবাইনের মতে তো এ বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট। কেননা সাহেবাইনের মতে দু'টি বাড়ী একই বাড়ীর অনুরূপ। কেউ কেউ বলেন ঃ ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে এ বিষয়ে তাদেরকে বাধ্য করা যাবে না। এ বিষয়টিকে তিনি বন্টনের বিষয়ের উপর কিয়াস করেছেন। অপর এক বর্ণনায় ইমাম আবু হানীফা (র) হতে বর্ণিত রয়েছে যে, দুই বাড়ীর ব্যাপারে মুহায়াত আদৌ জাইয নয়। বল প্রয়োগ করেও জাইয নয়। ঐ দলীলের ভিত্তিতে, যা পূর্বে আমি বর্ণনা করেছি। অনুরূপভাবে পারস্পরিক সম্মতি থাকলেও জাইয হবে না। কেননা এটি হলো 'سُكْنَى' (বসবাস) এর বিনিময়ে 'سُكْنَى' (বসবাস) এর ক্রয়-বিক্রয়। পক্ষান্তরে মূল বাড়ী দু'টির বন্টনের মাসআলা এর থেকে ব্যতিক্রম। কেননা মূল বাড়ী দু'টির কোন একটিকে অপরটির বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয় করা জাইয।

যাহিরী রিওয়ায়েতে যে মতামত উদ্ধৃত করা হয়েছে, তার যুক্তি হলো ঃ মুনাফার মধ্যে সাধারণত : ব্যবধান খুব কমই হয়ে থাকে। কাজেই পরস্পর সম্মতির অবস্থায় এর বন্টন জাইয হবে এবং এতে বিচারক বল প্রয়োগও করতে পারবেন। আর একে 'اِفْرَازٌ' তথা পৃথককরণ বলেও গণ্য করা হবে। অবশ্য মূলগত দিক থেকে বাড়ী দু'টির মধ্যে ব্যবধান যেহেতু বেশী, এ কারণে এ পর্যায়ে একে ' مُبَادَلَةٌ' তথা বিনিময় বলে গণ্য করা হবে।

ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে সওয়ার হওয়ার ব্যাপারে দুই পশুর ক্ষেত্রে تَهَايُؤ (মুনাফা বন্টন) করা জাইয নয়। কিন্তু সাহেবাইনের মতে জাইয। তারা মূল বস্তুর বন্টনের উপর কিয়াস করে এ কথা বলেন।

ইমাম আবু হানীফা (র) এর দলীল হলো ঃ আরোহীর বিভিন্নতার কারণে ব্যবহারের মধ্যেও বিভিন্নতা এসে যায়। কেননা কোন কোন আরোহী বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ, আবার কোন কোন আরোহী হচ্ছে আনাড়ী বা বোকা।

একই পশুর উপর সওয়ার হওয়ার ব্যাপারে 'تَهَايُؤ'-করাতেও অনুরূপ মতভেদ রয়েছে। এর কারণ আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। গোলামের বিষয়টি এর থেকে ব্যতিক্রম। কেননা গোলাম তো নিজ ইখতিয়ারে খিদমত করে। কাজেই সে তার ক্ষমতা বহির্ভূত অতিরিক্ত খিদমতের বিষয়টি সহ্য করে নেবে না। পক্ষান্তরে পশু অতিরিক্ত খিদমতের বিষয়টি সহ্য করে নিতে বাধ্য।

যাহিরী রিওয়ায়েতের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট একটি বাড়ী কিরায়া দেওয়ার ব্যাপারে 'تَهَايُؤ' করা জাইয। কিন্তু একজন গোলাম বা একটি পশুকে এভাবে কিরায়া দেওয়ার

ব্যাপারে 'تَهَايُؤ' করা জাইয নয়। পূর্বে আলোচিত এবং পরের আলোচিত মাসআলার মধ্যে পার্থক্যের কারণ এই যে, (বাড়ীর ক্ষেত্রে) কিরায়ার পয়সা তারা পর্যায়ক্রমে হাসিল করছে এবং এ ক্ষেত্রে বর্তমানে সমতাও আছে। আর এ সমতা ভূমির ব্যাপারে ভবিষ্যতেও বাকী থাকবে। পক্ষান্তরে জীব-জানোয়ারের ব্যাপারে এ বিষয়টি পরিবর্তনশীল। কেননা পরিবর্তনের সমূহ কারণ জীবের ক্ষেত্রে সর্বদাই আবর্তিত হতে থাকে। এ কারণে এ ক্ষেত্রে সমতা বিধান সম্ভব নয়। (অতএব নির্দিষ্ট কোন পশু কিরায়া দেওয়ার ব্যাপারে 'تَهَايُؤ' তথা পালাক্রমে মুনাফা বন্টন করা জাইয নয়।)

দুই শরীকের কোন একজনের পালা চলাকালে যে ভাড়া ছিল, অপর জনের পালার অবস্থায় যদি ভাড়ার পরিমাণ এর থেকে বেড়ে যায়, তবে এই অতিরিক্ত পরিমাণ ভাড়ার মধ্যে তারা উভয়ই শরীক হবে, যাতে উভয় শরীকের মধ্যে সমতা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। পক্ষান্তরে মুনাফার উপর পালা-বন্টনের চুক্তি হওয়ার পর, যদি অংশীদারদের কোন একজন তার পালা চলাকালে অতিরিক্ত কিরায়া হাসিল করে; তাহলে এ অতিরিক্ত পরিমাণের মধ্যে তারা উভয়ে শরীক হবে না। কেননা যে মুনাফার উপর পালা বন্টন চুক্তি হয়েছে, সেক্ষেত্রে তো সমতা আছে। (যদিও ভাড়ার মধ্যে সমতা নেই।) কাজেই পরবর্তীতে অতিরিক্ত কিরায়া লাভ করার কারণে সমতা বিনষ্ট হবে না। দুই বাড়ী ভাড়া দেওয়ার ব্যাপারে যদি শরীকদের মধ্যে পালা বন্টন করা হয় তবে তা-ও যাহিরী রিওয়ায়েত অনুসারে জাইয হবে, ঐ দলীলের ভিত্তিতে, যা আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। যদি তাদের দু'জনের কোন একজন অতিরিক্ত ভাড়া হাসিল করে, তাহলে এতে উভয় অংশীদার শরীক হবে না। (এ অতিরিক্ত পরিমাণ শুধুমাত্র পালাওয়ালা ব্যক্তিই পাবে।) কিন্তু বাড়ী একটি হলে এর হুকুম ভিন্নতর হবে। এক বাড়ী এবং দুই বাড়ীর ক্ষেত্রে মুনাফা হাসিল করার সময় হচ্ছে এক। এ কারণে দুই বাড়ীর মধ্যে পৃথক করণের অর্থ হচ্ছে প্রবল। আর এক বাড়ীর ক্ষেত্রে শরীকদের মুনাফা যেহেতু পর্যায়ক্রমে হাসিল করতে হয়, তাই এতে (নিজের অংশের মুনাফা বহির্ভূত অতিরিক্ত মুনাফাকে) ঋণ হিসাবে গণ্য করা হবে এবং (তাদের) প্রত্যেককে তার পালা চলাকালে তার সাথীর পক্ষ হতে উকীল অর্থাৎ প্রতিনিধি বলে গণ্য করা হবে। এ কারণেই কোন অংশীদার যদি তার পালার সময় অন্য অংশীদারের তুলনায় অধিক ভাড়া অর্জন করে, তাহলে এই অতিরিক্ত ভাড়া হতে আনুপাতিক হারে তাকেও দিতে হবে।

অনুরূপভাবে সাহেবাইনের মতে দুই গোলামের মধ্যেও ভাড়া দেওয়ার ব্যাপারে পালা বন্টন বা تَهَايُؤ করা জাইয, যেমনিভাবে মুনাফার ব্যাপারে 'تَهَايُؤ' করা জাইয। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে এটি জাইয নয়। কেননা সময়ের ব্যবধানের ফলে এক গোলামের মধ্যে যে ব্যবধান হয়,[১] দুই গোলামের যাতের মধ্যে ব্যবধানের পরিমাণ এর চেয়ে অনেক বেশী। কাজেই দুই গোলামকে ভাড়া দেওয়ার ব্যাপারে শরীকদের মধ্যে 'تَهَايُؤ' করা জাইয না হওয়া অধিক বাঞ্ছনীয়। উল্লেখ্য যে,

১. যার ফলেই এক গোলামকে ভাড়া দেওয়ার ব্যাপারে শরীকদের পালা বন্টন জাইয নয় বলা হয়েছে।

খিদমতের ব্যাপারে 'تَهَايُؤْ' তথা পালা-বন্টনের বিষয়টি তো প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে জাইয বলা হয়েছে। কিন্তু ভাড়া লাভের ক্ষেত্রে সে প্রয়োজন নেই। কেননা ভাড়া বন্টনযোগ্য বস্তু, যেহেতু এটি একটি 'عَيْنُ شَيْئٍ' অর্থাৎ যা দেখা যায় ও ধরাছোঁয়া যায়। অধিকন্তু খিদমতের বিষয়টিকে সহজ হিসাবে গ্রহণ করা হয়। কিন্তু ভাড়া দেওয়ার বিষয়টিকে সহজভাবে গ্রহণ করা হয় না, বরং এক্ষেত্রে খুব বেশী খোঁজ-খবর নেওয়া হয়। কাজেই খিদমতের বিষয়ের উপর ভাড়া দেওয়ার বিষয়টিকে কিয়াস করা যাবে না।

ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে দু'টি পশু ভাড়ায় খাটানোর ব্যাপারে পালা বন্টন করা জাইয নয়। কিন্তু সাহেবাইন-এর থেকে ভিন্ন মত পোষণ করেন। 'সওয়ার হওয়ার মাসআলায়' এর কারণ আমরা বর্ণনা করেছি। যদি দুই ব্যক্তির শরীকানায় খেজুর গাছ বা কোন বৃক্ষ অথবা কোন বকরী থাকে এবং তারা এভাবে বন্টন করে যে, তাদের প্রত্যেকে এর এক একটি অংশ নিজ দখলে রেখে এর থেকে ফল-ফলাদি উৎপাদন করবে অথবা ঐ অংশে তারা পৃথক পৃথকভাবে পশু চরাবে এবং দুগ্ধ পান করবে, তবে এভাবে 'تَهَايُؤْ' করা জাইয নয়। কেননা মুনাফার ব্যাপারে تَهَايُؤْ করা এই প্রয়োজনের ভিত্তিতেই জাইয সাব্যস্ত করা হয়েছে যে, মুনাফা বাকী থাকে না—কাজেই তা বন্টন করা অসম্ভব। অথচ এখানে যেসব বস্তুর কথা আলোচনা করা হয়েছে, তা عَيْنُ شَيْئٍ—অর্থাৎ যা দেখা যায় এবং ধরা-ছোঁয়াও যায় এবং এগুলো বাকীও থাকে। কাজেই এগুলো যখন হস্তগত হবে, তখন তা বন্টনও করা যাবে।

(গাছ এবং বকরীর ব্যাপারে تَهَايُؤْ জাইয নয়; কিন্তু এ পর্যায়ে হীলা অবলম্বন করা যেতে পারে।) হীলা হল এই যে, হয়তো কোন একজন শরীক তার অংশটি অন্য শরীকের নিকট বিক্রি করে দেবে, তারপর তার পালার সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেলে সে আবার পুরাটাই খরীদ করে নেবে অথবা সে তার সঙ্গীর অংশটি ঋণ হিসাবে নিয়ে নির্ধারিত পরিমাণ দুধ (বা অন্য কিছু) ভোগ করবে। কেননা অবিভাজ্য বস্তু ঋণ হেসাবে নেওয়া জাইয। সঠিক বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলাই সর্বাধিক জ্ঞাত।[১]

---

১. গাছ এবং বকরীর ক্ষেত্রে 'تَهَايُؤْ' করা জাইয নয়। তা সত্ত্বেও যদি এ জাতীয় লেন-দেন করতে হয়, তবে এ পর্যায়ে হীলা (কৌশল) অবলম্বন করা যেতে পারে। কৌশল দুইভাবে করা যায় ঃ

(১) যায়দ খালিদের পালা চলাকালে তার অংশটি খালিদের নিকট বিক্রি করে দেবে। এখন সমস্ত মাল খালিদের হয়ে যাবে এবং এরপর পালা শেষ হয়ে গেলে সে সমস্ত মালামাল যায়দের হাতে বিক্রি করে দেবে এবং সে এর থেকে মুনাফা হাসিল করতে থাকবে।

(২) অথবা যায়দ বকরীগুলো সবই তার কাছে রেখে দেবে এবং খালিদের অংশের দুধ তার থেকে ঋণ নিয়ে নেবে। এমনিভাবে খালিদও তার পালা আসলে এ প্রক্রিয়া অবলম্বন করবে। উল্লেখ্য যে مشاع (অবিভাজ্য) বস্তু ঋণ হিসাবে আদান-প্রদান করা জাইয। অতএব এ হীলাও জাইয।

كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ
অধ্যায় ঃ বর্গা চাষ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ

অধ্যায় ঃ মুযারা'আত—বর্গা চাষ প্রসংগে

(ইমাম কুদূরী [(র)] বলেন,) **ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন ঃ উৎপাদিত ফসলের এক তৃতীয়াংশ বা এক চতুর্থাংশের বিনিময়ে মুযারা'আ তথা বর্গা চাষ করা না-জাইয।** জ্ঞাতব্য যে, مُزَارَعَةٌ (মুযারা'আত) শব্দটি আভিধানিকভাবে ز - ر- ع -ধাতু থেকে উদ্‌গত بَابُ مُفَاعَلَةٌ -এর مَصْدَرٌ (ক্রিয়ামূল)। শরী'আতের পরিভাষায় উৎপাদিত ফসলের কিয়দংশের বিনিময়ে চাষাবাদের চুক্তি করাকে মুযারা'আত (বার্গাচাষ) বলা হয়।

ইমাম আবু হানীফা (র) এর **মতে বর্গাচাষ (-চুক্তি) ফাসিদ কাজ। সাহেবাইনের মতে বর্গাচাষ চুক্তি জাইয। কেননা বর্ণিত আছে ঃ**

اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ اَهْلَ خَيْبَرَ عَلَى نِصْفِ مَايَخْرُجُ مِنْ تَمَرٍ اَوْ زَرْعٍ -

নবী করীম (সা) খায়বারের অধিবাসীদের সাথে তাদের ভূমি হতে যে পরিমাণ ফসল ও ফল-ফলাদি উৎপাদিত হবে, এর অর্ধেক তাঁকে প্রদানের শর্তে বর্গাচাষ চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

অধিকন্তু বর্গাচাষ হলো ঃ মাল ও শ্রম সমন্বিত এক অংশীদারীত্বমূলক আকদের নাম। কাজেই মুযারাবাত চুক্তি (যাতে মাল ও শ্রমের সমন্বয় রয়েছে) এর ন্যায় —বর্গাচাষও জাইয হবে। আর এক্ষেত্রে 'عِلَّتٌ جَامِعَةٌ' বা সার্বিক কারণ হচ্ছে মানুষের প্রয়োজন পূরা করা। কেননা এমন বহু লোকও রয়েছে —যাদের প্রচুর মাল আছে, কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্যর ক্ষেত্রে তার কোন অভিজ্ঞতা নেই। আবার (সমাজে) এমন লোকও রয়েছে, যে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে সক্ষম, কিন্তু তার নিকট কোন মাল নেই। কাজেই ব্যবসা করতে সক্ষম গরীব এবং ব্যবসায় অনভিজ্ঞ বিত্তশালী এই দুই ধরনের মানুষের

মাঝে আকদ (লেন-দেন চুক্তি) সম্পাদিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। (তবেই সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থা সচল হওয়া সম্ভব হবে।) কিন্তু বকরী, মুরগী এবং রেশমের পোকা ইত্যাদি অতিরিক্ত (উৎপাদিত) পণ্যের অর্ধেকের বিনিময়ে বর্গা দেওয়ার বিষয়টি এর থেকে ব্যতিক্রম।[১] কেননা এই শ্রমজীবী ব্যক্তির শ্রমের কোন প্রভাব বিদ্যমান নেই। তাই এখানে অংশীদারীত্ব পাওয়া যায় না।

ইমাম আবু হানীফা (র) এর দলীল হলো ঃ

اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهٰى عَنِ الْمُخَابَرَةِ ـ

নবী করীম (সা) মুখাবারা তথা বর্গাচাষ করতে নিষেধ করেছেন। (সহীহ মুসলিম)

অধিকন্তু এতে চাষীর কর্মের মাধ্যমে যা উৎপাদিত হয়, তার কিয়দংশের বিনিময়েই আবার ঐ চাষীকে আজীর তথা মজুর নিয়োগ করা হয়। অর্থগত দিক থেকে এটিতো قَفِيْزُ الطَّحَّانِ এর মতই হয়ে গেল।[২]

সর্বোপরি বর্গাচাষের ক্ষেত্রে বিনিময় অজ্ঞাত থাকে এবং ক্ষেত্রবিশেষে বিনিময়ও থাকে না।[৩] এ জাতীয় বিষয়ও আক্দকে ফাসিদ করে দেয়। আর নবী করীম (সা) খায়বারের অধিবাসীদের সাথে যে লেন-দেন করেছিলেন, তা ছিল 'খারাজে মুকাসামার' ভিত্তিতে। তিনি তাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করে এবং সন্ধি করতে গিয়ে এমনটি করেছেন।[৪] আর রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য এরূপ করা জাইয।

ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে বর্গাচাষ ফাসিদ আকদের শামিল। তা সত্ত্বেও এই চুক্তির ভিত্তিতে জমিতে পানি সেচ করা এবং জমি চাষাবাদ করার পর যদি জমি থেকে ফসলই উৎপাদিত না হয়, তাহলে চাষী 'اَجْرُ مِثْلٍ' বা ন্যায্য পারিশ্রমিক পাবে। কেননা উক্ত বর্গাচাষ অর্থগত দিক থেকে ফাসিদ ইজারার অন্তর্ভুক্ত। এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে, যদি বীজ জমির মালিক সরবরাহ করে থাকে। আর বীজ যদি চাষী সরবরাহ করে থাকে, তাহলে চাষীর উপর অপরিহার্য হবে ভূমি মালিককে উজারা বাবত তার ন্যায্য পাওনা পরিশোধ করা। আর উভয় অবস্থাতেই[৫] উৎপাদিত ফসল বীজ সরবরাহকারী ব্যক্তি পাবে। কেননা এটি তার মালিকানাধীন বস্তুর বর্ধিত অংশ। আর অপরজন তার ন্যায্য বিনিময় পাবে। যেমন পূর্বে আমরা এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

---

১. অর্থাৎ এগুলো উৎপাদিত পণ্যের অর্ধেকের বিনিময়ে বর্গা দেওয়া জাইয নয়।

২. قَفِيْزُ الطَّحَّانِ (কাফীযুত তাহহান) অর্থ হলো ঃ কাউকে আটা পেষার জন্য মজুর নিয়োগ করা এই শর্তে যে, তাকে এই পরিমাণ আটা পারিশ্রমিক হিসাবে প্রদান করা হবে। এরূপ করা জাইয নয়। কেননা ফিকহের একটি মূলনীতি হলো এই যে, মজুর যদি কোন কাজ করে, তবে ঐ জিনিস থেকেই তাকে মজুরী দেওয়া জাইয নয়। এ ব্যাপারে হাদীসেও নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। অথচ বর্গাচাষের ক্ষেত্রে এটিই হয়ে থাকে।

৩. ফসল উৎপাদন হলে বিনিময় অজ্ঞাত থাকে, আর ফসল উৎপাদন না হলে কোন বিনিময়ই থাকে না।

৪. খারাজ দুই প্রকার ঃ (১) খারাজে ওয়াযীফা, (২) খারাজে মুকাসামা। খারাজে মুকাসামা ভিন্ন জিনিস আর মুযারাআ ভিন্ন জিনিস। কাজেই এটি বর্গাচাষের বৈধতার দলীল হতে পারে না।

৫. চাই বীজ চাষী সরবরাহ করুক বা ভূমি মালিক সরবরাহ করুক।

উল্লেখ্য যে, বর্গাচাষের তীব্র প্রয়োজন হেতু বর্তমানে এ ব্যাপারে ফাতওয়া হচ্ছে সাহেবাইনের অভিমতের উপর। অধিকন্তু এ বিষয়ে উম্মতের পর্যায়ক্রমিক تعامل ও বিদ্যমান রয়েছে। আর 'تعامل' বা পরস্পরের আমল তো এমন বিষয়, যার ভিত্তিতে কিয়াসকেও বর্জন করা যায়। যেমন অর্ডার দেয়া মালের ক্ষেত্রে (কিয়াস বর্জন) করা হয়েছে।

প্রণিধানযোগ্য যে, যারা বর্গাচাষকে জাইয বলেন, তাদের মতে বর্গাচাষের বিশুদ্ধতার জন্য নিম্নোক্ত শর্ত রয়েছে ঃ

(১) জমি চাষাবাদ উপযোগী হওয়া। কেননা এছাড়া উদ্দেশ্য হাসিল হবে না।

(২) ভূমি মালিক এবং চাষী উভয়ই আকদ সম্পাদন করার যোগ্য হতে হবে। (পাগল এবং জ্ঞানহীন হলে হবে না।) এ শর্তটি বর্গাচাষের সাথে খাস নয়। কেননা চুক্তি সম্পাদনকারী যোগ্য না হলে কোন আকদই সহীহ হবে না।

(৩) বর্গাচাষের সময়সীমা উল্লেখ থাকতে হবে। কেননা এটি ভূমির মুনাফার উপর অথবা চাষীর মুনাফার উপর একটি চুক্তি। আর সময় সীমাই হলো সেই মুনাফার জন্য মাপকাঠি, যার দ্বারা ঐ মুনাফা সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়।

(৪) বীজ কে দেবে তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে। ঝগড়া খতম করার জন্য এবং কোন্ জিনিষের উপর চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে, তা কি ভূমির মুনাফা, না চাষীর মুনাফা, এ সম্বন্ধে অবহিত করার জন্য।[১]

(৫) যার পক্ষ হতে বীজ সরবরাহ করা হবে না, তার অংশ কি পরিমাণ হবে, তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করতে হবে। কেননা সে তো শর্তের কারণেই তার অংশের হকদার হয়ে থাকে। তাই তার অংশটি জানা থাকা আবশ্যক। আর যে জিনিষ অজ্ঞাত, তা সম্বন্ধে আক্দের মধ্যে শর্ত করলেও এর হকদার হওয়া যাবে না।

(৬) চাষীর জন্য ভূমি মালিক কর্তৃক ভূমি সম্পূর্ণরূপে অবমুক্ত করে দেওয়া। তার পক্ষ থেকে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা না থাকা। সুতরাং যদি ভূমিতে মালিকের কর্মের শর্ত আরোপ করা হয়, তাহলে ভূমি অবমুক্ত না হওয়ার কারণে আক্দ ফাসিদ হয়ে যাবে।

(৭) ফসল উৎপাদনের পর উৎপাদিত ফসলে উভয়ের শরীকানা থাকতে হবে। কেননা পরিণামের দিক থেকে বর্গাচাষ হচ্ছে একটি অংশীদারী চুক্তি। কাজেই যে শর্তের কারণে ঐ অংশীদারীত্ব খতম হয়ে যায়, তা অবশ্যই চুক্তিকে বিনষ্ট করে দেবে।

(৮) বীজ কি হবে, তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে, যাতে বিনিময় জানা হয়ে যায়। (অজানা না থাকে।)

---

১. বীজ কে দেবে তা নির্দিষ্ট করতে হবে, যাতে ঝগড়া খতম হয়ে যায় এবং এ কথা জানা হয়ে যায় যে, যে জিনিসের উপর চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে-তা কি ? জমির মুনাফা না চাষীর মুনাফা ? যদি চাষী বীজ সরবরাহ করে তবে এর অর্থ হবে যে, চাষীই এই ভূমির মুনাফা হাসিল করবে। আর যদি ভূমি মালিক বীজ সরবরাহ করে, তবে এতে প্রতীয়মান হবে যে, সে-ই চাষীর মুনাফা হাসিল করবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন : সাহেবায়নের মতে বর্গা চাষ চার ভাবে হতে পারে ঃ

(১) যদি জমি ও বীজ একজনের এবং গরু (কৃষিযন্ত্র) ও শ্রম অন্য জনের হয় তবে এভাবে বর্গাচাষ জাইয। কেননা, গরু কৃষিযন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। এটি এমন হলো,যেন সে কোন একজন দরজীকে(কর্মচারী) নিয়োগ করলো তার নিজস্ব সুঁই দ্বারা সেলাই কাজ সম্পাদনের জন্য।

(২) যদি জমি একজনের এবং শ্রম,গরু ও বীজ অপর জনের হয়, তবে তাও জাইয। কেননা, এটি হলো উৎপাদিত ফসলের নির্দিষ্ট কিয়দংশের বিনিময়ে জমি ভাড়া দেওয়া। কাজেই তা জাইয হবে, যেমন নির্দিষ্ট পরিমাণ দিরহামের(টাকার) বিনিময়ে জমি ভাড়া দেওয়া জাইয।

(৩) আর যদি জমি,বীজ এবং গরু একজনের এবং শ্রম অপর জনের হয়, তবে তা-ও জাইয। কেননা, এভাবে করে ভূমি মালিক চাষীকে নিজ যন্ত্রপাতি দিয়ে চাষাবাদ করার জন্য (শ্রমিক) নিয়োগ করেছে। (এরূপ করাও জাইয।)এটি এমন হলো- যেমন কেউ কোন দরজীকে শ্রমিক হিসাবে নিয়োগ করেছে তারই সুঁই দিয়ে তার কাপড় সেলাই করে দেওয়ার জন্য -অথবা কেউ যেন প্লাষ্টারকারী ব্যক্তিকে শ্রমিক নিয়োগ করেছে তারই হাতিয়ার দিয়ে তার বাড়ীতে প্লাষ্টার করার জন্য।

(৪) আর যদি জমি ও গরু একজনের এবং বীজ ও শ্রম অপর জনের হয়, তবে তা বাতিল বলে গণ্য হবে। এটি হলো যাহিরে রিওয়ায়াতের কথা। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ (র) হতে বর্ণিত আছে যে, এভাবে বর্গা চাষ করাও জাইয। কেননা, ভূমি মালিকের উপর বীজ ও গরু সরবরাহের শর্ত করা যেমনি ভাবে জাইয, এমনি ভাবে শুধু গরু সরবরাহের শর্ত করাও জাইয। কাজেই এটি এমনভাবে জাইয, যেমন চাষীর উপর গরু সরবরাহের শর্ত করা জাইয।

যাহিরী রিওয়ায়েতের যুক্তি হলো গরুর উপকারীতা এবং ভূমির উপকারিতা একই জাতীয় জিনিস নয়। কেননা, ভূমির উপকারিতা- ভুমি অভ্যন্তরস্থ এমন একটি শক্তির নাম, যার দ্বারা উদ্ভিদ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। আর গরুর উপকারিতা গরুর মধ্যকার এমন যোগ্যতার নাম, যার দ্বারা কাজ সম্পাদিত হয়ে থাকে। এই সবগুলোই আল্লাহর সৃষ্টি। কাজেই এগুলো এক জাতীয় জিনিষ নয়। অতএব গরুর উপকারিতাকে জমির উপকারিতার সাথে সংশ্লিষ্ট করা যাবে না। কিন্তু গরুর উপকারিতার বিষয়টি যদি চাষীর সাথে সংশ্লিষ্ট করা হয়, তবে তা জাইয হবে। কেননা, এই দু'টি উপকারিতা এক জাতীয় বস্তু। কাজেই গরুর উপকারিতার বিষয়টিকে চাষীর উপকারিতার সাথে সংশ্লিষ্ট করে দেওয়া জাইয হবে।

এখানে আরো দুটি (অবস্থা) হতে পারে, যা তিনি (ইমাম কুদূরী) উল্লেখ করেননি।

(১) একজনে দেবে বীজ এবং অপর জনে দেবে জমি, গরু এবং শ্রম। এভাবে বর্গাচাষ চুক্তি করা জাইয নয়। কেননা, এ অংশীদারীত্ব চুক্তি পূর্ণতা লাভ করেছে বীজ এবং শ্রমের সমন্বয়ে। অথচ এ প্রক্রিয়ায় বর্গাচাষ চুক্তি সম্পাদন করার ব্যাপারে ইসলামী শরীয়তে কোন বিধান নেই।

(২) একজনের পক্ষ হতে বীজ এবং গরু সরবারাহ করা। এভাবেও বর্গাচাষ চুক্তি সম্পাদন করা জাইয নয়। কেননা, একজনের পক্ষ হতে শুধু বীজ বা গরু সরবরাহ করা এবং অপর জনের পক্ষ হতে বাকী সব কিছু সরবরাহ করা যেমনিভাবে জাইয নয়, ঠিক তেমনি ভাবে যদি একজনের উপর বীজ ও গরু সরবরাহের শর্ত করা হয়, তবে তাও জাইয হবে না।

এ বর্ণনা মতে এ ক্ষেত্রে উৎপাদিত ফসল উভয় অবস্থাতেই বীজ সরবরাহকারী ব্যক্তি পাবে। অন্যান্য ফাসিদ বর্গাচাষের উপর এখানকার ফাসিদ বর্গাচাষকে কিয়াস করা হয়েছে। অপর বর্ণনা মতে উৎপাদিত ফসল ভূমি মালিক পাবে এবং বীজ তার নিকট ঋণ হিসাবে গণ্য হবে। আর বীজ যেহেতু জমির সাথে মিশে গেছে, তাই এ বীজ সে হস্তগত করে নিয়েছে বলেও ধর্তব্য হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন : নির্ধারিত মেয়াদের উল্লেখ করা ব্যতিরেকে বর্গাচাষ সহীহ হবে না । এর কারণ আমরা পূর্বেই বর্ণনা করেছি। **আর উৎপাদিত ফসলের মধ্যে উভয়েই অংশীদার হবে। তবে এ অংশীদারীত্ব হবে অবিভাজ্য ভাবে,** অংশীদারীত্বের অর্থকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে। **যদি ভূমি মালিক এবং চাষী উভয়ে মিলে কোন একজনের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ কফীয (বিশেষ ধরণের পরিমাপ) এর শর্তে বর্গাচাষ চুক্তি সম্পাদন করে, তবে তা বাতিল বলে গণ্য হবে।**[১] যেহেতু এভাবে করাতে অংশীদারীত্ব আর থাকেনা। কেননা, হতে পারে যে, জমিতে এ পরিমাণ ফসলই উৎপন্ন হয়েছে। এটি এমন হলো, যেমন কেউ নির্দিষ্ট পরিমাণ দিরহামের বিনিময়ে মুযারা'আ চুক্তি করলো। (অথচ এভাবে মুযারা'আ চুক্তি করা জাইয নয়, অনুরূপভাবে এভাবে বর্গাচাষ করাও জাইয নয়।)

এমনি ভাবে ভূমি মালিক এবং চাষী যদি এই শর্তে বর্গাচাষ করে যে, বীজ দাতা বীজ পরিমাণ শষ্য উঠিয়ে নেওয়ার পর বাকী শষ্য তাদের মধ্যে আধা আধি করে ভাগাভাগি করা হবে।[২] কেননা, এরূপ শর্ত এক নির্দিষ্ট পরিমাণের মধ্যে অথবা সমস্ত ফসলের মধ্যে অংশীদারীত্ব নিঃশেষ করার পর্যায়ে পৌছে দেবে। (সমস্ত মালে অংশীদারীত্ব খতম হওয়ার অবস্থা হলো) যেমন জমি থেকে বীজ পরিমাণ ফসলই উৎপাদিত হলো, তার বেশী নয়। এটি এমন হলো, যেমন খারাজী ভূমির ক্ষেত্রে ভূমি মালিক এবং চাষী এরূপ শর্ত করে বর্গাচাষ চুক্তি করলো যে, খারাজ নিয়ে যাওয়ার পর যা বাকী থাকবে তা তারা ভাগ করে নেবে। (অথচ এভাবে শর্ত করা ফাসিদ।) পক্ষান্তরে বীজ সরবারাহকারী যদি এরূপ শর্ত করে যে, সে উৎপাদিত ফসলের এক দশমাংশ নেবে অথবা অপর জন এ পরিমাণ নেবে, এরপর যা বাকী থাকবে তা তারা উভয়ে ভাগাভাগি করে নেবে। কেননা, উক্ত পরিমাণ নির্দিষ্ট বটে, কিন্তু তা মোশা' অর্থাৎ অবিভাজ্য। কাজেই এতে অংশীদারীত্ব খতম হবে না। যেমন উশরী ভূমির ক্ষেত্রে যদি ভূমি মালিক এবং চাষী এরূপ শর্ত সাপেক্ষে বর্গাচাষ করে যে, প্রথমে উশর আলাদা করে রাখা হবে, পরে যা বাকী থাকবে, তা তাদের উভয়ের মধ্যে বণ্টন করা হবে।

---

১. অর্থাৎ উৎপাদিত ফসলের এত ভাগের এত ভাগ।

২. এই অবস্থায়ও বর্গাচাষ বাতিল বলে গণ্য হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন : এমনি ভাবে বর্গাচাষ জাইয হবে না, যদি তারা নালার পাশে উৎপাদিত ফসলের শর্ত করে অর্থাৎ কোন একজনের জন্য। **কেননা,** যদি কোন একজনের জন্য এক নির্দিষ্ট জায়গায় ফসলের শর্ত করা হয়, তাহলে এটি অংশীদারীত্ব খতম করার পর্যায়ে পৌছে দেবে। কেননা, হতে পারে এখানেই ফসল হয়েছে, অন্য স্থানে ফসল হয়নি। অনুরূপ ভাবে (বর্গাচাষ জাইয হবে না যদি কোন একজনের জন্য নির্দিষ্ট প্রান্তের ফসলের শর্ত করা হয় এবং অপর জনের জন্য অন্য প্রান্তের ফসলের শর্ত করা হয়।

অনুরূপ ভাবে বর্গাচাষ জাইয হবে না, যদি তাদের কোন একজনের জন্য খড় এবং অপর জনের জন্য শস্যের শর্ত করা হয়। কেননা, হতে পারে, ফসলের উপর এমন বিপর্যয় আসবে, যার ফলে ফসলে কোন রূপ দানা-ই সৃষ্টি হবে না। শুধু কেবল খড়ই হবে।

এমনি ভাবে বর্গাচাষ জাইয হবে না– যদি খড় আধাআধি করে এবং সশ্য নির্দিষ্ট কোন একজনের প্রাপ্তির শর্ত করা হয়। কেননা, এ জাতীয় শর্তও মূখ্য বস্তু তথা শস্যের মধ্যে অংশীদারীত্বকে খতম করার পর্যায়ে পৌছে দিয়ে থাকে। **আর যদি তারা শস্য আধাআধি করে নেওয়ার শর্ত করে এবং খড় সম্পর্কে কোন আলোচনাই না করে, তাহলে বর্গাচাষ চুক্তি সহীহ হবে।** কেননা, তারা মুখ্য বস্তুর তথা শস্যের মধ্যে অংশীদারীত্বের শর্ত আরোপ করেছে। এ অবস্থায় বীজদাতা ব্যক্তি খড়ের মালিক হবে। কেননা, এটি তার মালিকানাধীন বস্তুরই বর্ধিত অংশ। আর বীজদাতা ব্যক্তির (জন্য ভূমি সাব্যস্ত করার) ক্ষেত্রে শর্ত আরোপ করার প্রয়োজন নেই। বিশেষ ক্ষেত্রে শর্তই বর্গাচাষকে ফাসিদ করে। অথচ এই ব্যক্তি এ সম্পর্কে নিঃশ্চুপ। বলখের মাশাইখে কিরাম চুক্তি সম্পাদনকারী ব্যক্তিদ্বয় যে বিষয়ে স্পষ্ট কোন কথা বলেনি, সে বিষয়ে ওরফের বা প্রচলিত রীতির উপর কিয়াস করে বলেন : খড় উভয়ের মধ্যে বণ্টিত হবে। অধিকন্তু ভূসি হচ্ছে শস্যের সাথে সংশ্লিষ্ট বস্তু। আর মূল্যের ক্ষেত্রে যে শর্ত থাকে সংশ্লিষ্ট এর ক্ষেত্রেও সে শর্ত প্রযোজ্য হয়ে থাকে।

যদি তারা (ভূমি মালিক এবং চাষী) এরূপ শর্ত করে বর্গা চাষ করে যে, শস্য তারা অর্ধেক অর্ধেক করে পাবে এবং খড় পাবে বীজদাতা, তবে বর্গাচাষ সহীহ হবে। কেননা, এ শর্ত বর্গাচাষের হুকুমের অনুকূলেই রয়েছে। (বিপরীত নয়) । অবশ্য তারা যদি এরূপ শর্ত করে যে, খড় অন্য কোন ব্যক্তি পাবে, তবে বর্গাচাষ চুক্তি ফাসিদ হয়ে যাবে। কেননা, এটি এমন একটি শর্ত, যা অংশীদারীত্ব খতম করার পর্যায়ে পৌছে দেবে। যেমন- কোন বছর জমি থেকে শুধু ভূসিই পয়দা হলো, অন্য আর কিছুই হল না। দ্বিতীয়ত: যে ব্যক্তি বীজ দেয়নি, তার কোন কিছুর মালিক হওয়া শর্তের ভিত্তিতেই হতে পারে। অথচ এখানে এরূপ কোন শর্ত নেই।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন : বর্গাচাষ চুক্তি যদি সঠিক ভাবে সম্পাদিত হয় তবে উৎপাদিত **ফসল শর্ত** মুতাবিক বণ্টন করা হবে। **কেননা, তারা যা অপরিহার্য শর্ত** হিসাবে গ্রহণ **করেছে,** তা সঠিকই হয়েছে। জমিতে যদি কোন ফসল উৎপাদন না হয়, তাহলে চাষী কিছুই পাবে না। কেননা, সে তো অংশীদারীত্বের ভিত্তিতে ফসলের হকদার হবে। আর ফসলই যদি উৎপাদন না হয়, তবে অংশীদারীত্ব কিসের? যদি বলা

হয় যে, এটি তো (প্রাথমিক অবস্থার বিবেচনায়) ইজারা চুক্তি: কাজেই চাষীর পারিশ্রমিক পাওয়া উচিত; তাহলে বলা হবে যে, তার পারিশ্রমিক নির্দিষ্ট আছে। কাজেই সে এ নির্দিষ্ট পারিশ্রমিক ছাড়া অন্য কিছুর অধিকারী হতে পারবে না।[১] পক্ষান্তরে বর্গাচাষ চুক্তি যদি ফাসিদ হয়ে যায়, তাহলে চাষী তার ন্যায্য পারিশ্রমিক প্রাপ্ত হবে। কেননা, এ ন্যায্য পারিশ্রমিক জমির মালিকের যিম্মায় ওয়াজিব হয়। আর যে জিনিস যিম্মায় ওয়াজিব হয়, তা ফসল উৎপাদন না হওয়ার কারণে ছুটে যায় না।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন : বর্গাচাষ যদি ফাসিদ হয়ে যায়, তবে বীজ সরবরাহ কারী ব্যক্তিই উৎপাদিত ফসলের অধিকারী হবে। কেননা, এগুলো তার মালিকানাধীন বস্তুরই বর্ধিত অংশ। আর অপর ব্যক্তি, যে উৎপাদিত ফসলের মালিক হয়, তা হয় চুক্তির মধ্যে উল্লেখ করার কারণে। অথচ এখানে সে উল্লেখ করণ (تَسْمِيَة) এর বিষয়টিই ফাসিদ হয়ে গেছে। কাজেই বীজ থেকে বৃদ্ধি প্রাপ্ত শস্য পুরাটাই বীজ সরবরাহকারী ব্যক্তি প্রাপ্ত হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন : (ফাসিদ বর্গাচাষের ক্ষেত্রে) ভূমি মালিক যদি বীজ দিয়ে থাকে, তবে চাষী ব্যক্তি ন্যায্য পারিশ্রমিক পাবে। তবে চাষীর জন্য যা শর্ত করা হয়েছে, এ পারিশ্রমিক তা থেকে অতিরিক্ত হতে পারবে না। কেননা, অতিরিক্ত পরিমাণ গ্রহণ না করার ব্যাপারে সে নিজেই রাযী আছে। এটি ইমাম আবু হানীফা এবং ইমাম আবু ইউসূফ (র) এর অভিমত। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন : সে তার ন্যায্য পারিশ্রমিক পাবে এবং এর পরিমাণ যত বেশী সম্ভব ধার্য করা যাবে। কেননা, ভূমি মালিক ফাসিদ আকদের মাধ্যমে তার (চাষীর) মুনাফাকে পুরাপুরি হাসিল করে নিয়েছে। কাজেই তার উপর ওয়াজিব হলো এই মুনাফার মূল্য পরিশোধ করে দেওয়া। কেননা, মুনাফার অনুরোপ কোন বস্তু নেই। ইজারা অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

যদি চাষীর পক্ষ থেকে বীজ প্রদান করা হয়ে থাকে, তাহলে ভূমি মালিক স্বীয় ভূমির ন্যায্য ভাড়া পাবে। কেননা, চাষী ফাসিদ চুক্তির মাধ্যমে ভূমির মুনাফা পুরাপুরি ভাবেই হাসিল করে নিয়েছে। কাজেই তার উপর ওয়াজিব হলো সেই মুনাফাকে ফেরৎ দিয়ে দেওয়া। কিন্তু এরূপ করা অসম্ভব এবং এর অনুরূপ কোন বস্তু নেই। অতএব তার উপর ওয়াজিব হবে সেই মুনাফার মূল্য পরিশোধ করে দেওয়া। তবে ভূমি মালিকের জন্য উৎপাদিত ফসল থেকে যে পরিমাণ প্রদানের শর্ত করা হয়েছিল, তা থেকে অধিক দেওয়া যাবে কিনা এ বিষয়ে ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে– যা আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি।

ভূমি এবং গরুর কথা একত্রিত ভাবে শর্ত করে বর্গাচাষ চুক্তি করলে তা ফাসিদ হয়ে যাবে এবং এ অবস্থায় চাষীর উপর ওয়াজিব হবে ভূমি মালিককে ভূমি ও গরুর ন্যায্য ভাড়া পরিশোধ করে দেওয়া। এটিই সহীহ অভিমত। কেননা, গরুও ইজারা স্বরূপ প্রদান করা হয়ে থাকে। আর বর্গাচাষও অর্থগত দিক থেকে ইজারার মত। (কাজেই গরুর ভাড়াও দিতে হবে।)

১. আর যেহেতু কোন ফসলই উৎপাদিত হয়নি, তাই সে কিছুই পাবে না।

ফাসিদ বর্গাচাষের ক্ষেত্রে বীজ সরবরাহ করার কারণে যেহেতু ভূমি মালিক উৎপাদিত ফসলের হকদার হয়, কাজেই তার জন্য উৎপাদিত ফসলের পুরাটাই গ্রহণ করা জাইয হবে। কেননা তার মালিকানাধীন ভূমিতেই ফসলের এ বর্ধিত অংশ উৎপাদিত হয়েছে। আর যদি চাষী ব্যক্তি (বীজ সরবরাহের কারণে) উৎপাদিত ফসলের হকদার হয়, তাহলে সে বীজ এবং ভূমি ভাড়ার সমপরিমাণ শস্য গ্রহণ করবে। আর বাকীগুলো সাদাকা করে দেবে। কেননা, বীজ থেকেই এ বৃদ্ধি হাসিল হয়েছে এবং তা উদগত হয়েছে জমি থেকে। আর জমির মুনাফার মালিকানার ফাসাদ তথা অশুদ্ধতা মালিকানার ক্ষেত্রে ফাসাদ তথা অশুদ্ধতাকে অপরিহার্য করে। সুতরাং কিছুর বিনিময়ে যা তাকে প্রদান করা হয়েছে, তা তো তার জন্য হালাল। আর যে জিনিস কোন কিছুর বিনিময়ে তার হাসিল হয়নি, তা সে সাদাকা করে দেবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন : বর্গাচাষ চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর যদি বীজদাতা শ্রম বিনিয়োগ থেকে নিবৃত্ত থাকে, তবে তাকে এ ব্যাপারে বাধ্য করা যাবে না। কেননা, নিজের ক্ষতি স্বীকার করা ব্যতিরেকে চুক্তি পুরা করা সম্ভব নয়। কাজেই এটি এমন হলো– যেমন কেউ অপর কোন ব্যক্তিকে নিজের কোন একটি ঘর ধ্বসিয়ে দেওয়ার জন্য শ্রমিক নিয়োগ করলো, এরপর সে (মালিক) এর থেকে নিবৃত্ত হয়ে গেল, তাহলে বিচারক তাকে ঘর ভাঙ্গার জন্য বাধ্য করবে না। **যার পক্ষ হতে বীজ সরবরাহের শর্ত করা হয়নি, এ জাতীয় ব্যক্তি যদি-শ্রম বিনিয়োগ করতে অস্বীকৃতি প্রকাশ করে বা কর্ম থেকে নিবৃত্ত থাকে; তবে বিচারক তাকে কাজের ব্যাপারে বাধ্য করতে পারবে না।** কেননা, চুক্তি পূরা করাতে তার কোন ক্ষতি নেই। অথচ চুক্তি পূরা করা তার উপর অপরিহার্য। যেমন ইজারা চুক্তি পূরা করা অপরিহার্য। কিন্তু যদি এমন কোন ওযর এসে যায়, যার কারণে ইজারা রহিত হয়ে যায়, এ জাতীয় কারণ দেখা দিলে বর্গাচাষ চুক্তিও রহিত হয়ে যাবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন : (চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর) যদি ভূমি মালিক বর্গাচাষের ব্যাপারে অস্বীকৃতি ব্যক্ত করে; অথচ বীজ সে-ই সরবরাহ করেছে এবং চাষী ব্যক্তিও জমি চাষবাদ করে নিয়েছে, তাহলে চাষী চাষাবাদের বিনিময়ে কিছুই পাবে না। বলা হয়, এটি হচ্ছে আইনের কথা। কিন্তু নৈতিকতার দৃষ্টিতে ভূমি মালিকের উপর অপরিহার্য হবে-চাষী ব্যক্তিকে রাযী-খুশী করানো। কেননা, ভূমি মালিক বর্গাচাষের ব্যাপারে তাকে (চাষীকে) ধোঁকা দিয়েছে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন : যদি চুক্তি সম্পাদনকারী পক্ষদ্বয়ের কোন একজন মারা যায়, তাহলে বর্গাচাষ চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। ইজারার উপর কিয়াস করে এ বিধান দেওয়া হয়েছে। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা ইজারা অধ্যায়ে করা হয়েছে।

ভূমি মালিক তিন বছরের জন্য জমি বর্গা দিয়েছে। এরপর প্রথম বছর এতে ফসল উৎপন্ন হয়েছে; কিন্তু এখনো পর্যন্ত তা কাটা হয়নি। এ অবস্থায় যদি ভূমি মালিক মারা যায়, তাহলে এ ভূমি ফসল পর্যন্ত চাষীর হাতেই থাকবে। ফসল

কাটার পর তা শর্ত মুতাবিক বন্টন করা হবে। আর অবশিষ্ট দুই বছরের ক্ষেত্রে বর্গাচাষ চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। কেননা প্রথম বছরে (বর্গাচাষ) চুক্তি বহাল রাখতে উভয় পক্ষের হকের প্রতিই লক্ষ্য রাখা হয় সমানভাবে। কিন্তু পরবর্তী দ্বিতীয় ও তৃতীয় বছরের হুকুম এর থেকে ভিন্নতর। কেননা (বর্গাচাষ বাতিল করে দিলে) এতে চাষীর কোন ক্ষতি নেই। কাজেই এই দ্বিতীয় ও তৃতীয় বছরের বর্গাচাষ চুক্তি বাতিল করার ক্ষেত্রে কিয়াসের সংরক্ষণ করা হবে।

জমি চাষাবাদ করা এবং জমিতে খাল খানন করার পর, কিন্তু ফসল বপণ করার পূর্বে যদি জমির মালিক মারা যায়, তবে বর্গাচাষ চুক্তি নাকচ হয়ে যাবে। কেননা এতে চাষীর কোন মাল নষ্ট করা হয়না। আর চাষী এতে যে শ্রম বিনিয়োগ করেছে, তার বিনিময়ে সে কিছুই পাবে না। যেমন এ সম্পর্কে আমরা অচিরেই বিস্তারিত আলোচনা করবো–ইনশাআল্লাহ! ঋণের দায়ে ভারাক্রান্ত অবস্থায় যদি জমি বিক্রি করার প্রয়োজন দেখা দেয়, এবং চাষাবাদ চুক্তি ভঙ্গ করে জমি বিক্রি করে দেওয়া হয়, তবে তা জাইয হবে। যেমন ইজারার ক্ষেত্রে করা জাইয হয়। এ অবস্থায় চাষী ভূমি চাষাবাদ করা এবং ভূমিতে খাল খনন করার বিনিময় স্বরূপ ভূমি মালিকের নিকট কোন কিছুরই দাবী করতে পারবেনা। কেননা, মুনাফা আক্‌দের কারণেই মূল্যমান সম্পন্ন বস্তু হিসাবে পরিগণিত হয়, এবং মুনাফার মূল্যায়ন উৎপাদিত ফসলের সাথেই সংশ্লিষ্ট। এ ক্ষেত্রে যেহেতু কোন উৎপাদনই নেই, কাজেই তার জন্য কোন কিছু ওয়াজিবও হবে না। যদি ফসল গজিয়ে উঠে, কিন্তু এখনো তা কর্তন করা হয়নি, এমতাবস্থায় ঋণের কারণে জমি বিক্রি করা যাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না ফসল কাটা হয়।[১]

কেননা, জমি বিক্রি করা হলে এতে চাষীর হক বাতিল হয়ে যায়। আর তা (চাষীর হক) বাতিল না করে ঋণদাতার পাওনা বিলম্বে আদায় করা সহজ তথা উত্তম। যদি ভূমি মালিককে ঋণের কারণে বন্দী করা হয়ে থাকে, তাহলে এ সময় বিচারক তাকে বন্দীশালা থেকে মুক্তি দিয়ে দেবে। কেননা, এ অবস্থায় ভূমি বিক্রি করা যেহেতু নিষিদ্ধ, কাজেই সে যালিম সাব্যস্ত হবে না। অথচ জেল খানায় বন্দী করা যুলমের শাস্তি হিসাবেই হয়ে থাকে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন : ফসল পাকার পূর্বেই যদি বর্গাচাষের মেয়াদ অতিক্রান্ত হয়ে যায়, তাহলে চাষীর যে পরিমাণ পাওনা, ঐ পরিমাণ ভূমির ভাড়া ফসল কাটা পর্যন্ত সময়ে যত টাকা আসে, তা পরিশোধ করা তার উপর অপরিহার্য হবে। আর ফসলের ব্যাপারে যত খরচ হবে, সমুদয় খরচ তারা উভয়ে নিজ নিজ হক অনুসারে নির্বাহ করবে। অর্থাৎ ফসল কাটা পর্যন্ত তারা এ ব্যয় নির্বাহ করতে থাকবে। কেননা, أَجْرُ مِثْلٍ তথা ন্যায্য ভাড়া পরিশোধের বিনিময়ে জমিতে ফসল বাকী

১. কাজেই তৎক্ষণাৎ জমি বিক্রি না করে ফসল কাটার পর বিক্রি করে পাওনাদারের পাওনা পরিশোধ করা হবে।

রাখতে দেওয়ার মধ্যে উভয় পক্ষের প্রতিই মমতা সুলভ সমতা বিধান করা হয়। কাজেই এ নীতিই অবলম্বন করা হবে। (ফসল কাটা পর্যন্ত) তারা উভয়েই এতে শ্রম বিনিয়োগ এ জন্য করবে যে, মেয়াদ শেষ হওয়ার সাথে সাথে চুক্তিও শেষ হয়ে গেছে। আর এ শ্রম প্রয়োগ হবে শরিকী মালের মধ্যে। (কাজেই তাদের প্রত্যেককে নিজ নিজ অংশ অনুপাতে এতে শ্রম দিতে হবে এবং ব্যয় নির্বাহও করতে হবে।)

পক্ষান্তরে, যদি ফসল পাকার পূর্বে (কাঁচা অবস্থায়) ভূমি মালিক মারা যায়, তাহলে বাকী কাজের দায়-দায়িত্ব চাষীর উপর বর্তাবে। কেননা, এ ক্ষেত্রে (মউতের অবস্থায়) আমরা আক্‌দ বা চুক্তিকে এর মেয়াদ পর্যন্ত বাকী রেখেছি। আর আক্‌দ চাষীর শ্রম বিনিয়োগের দাবী করে।(তাই এ ক্ষেত্রে শ্রম চাষীর উপরই বর্তাবে)। কিন্তু উপরোক্ত (মেয়াদ অতিক্রান্ত হওয়ার) মাসআলার ক্ষেত্রে চুক্তি শেষ হয়ে গিয়েছে। এ ক্ষেত্রে আকদকে আর বাকী রাখা হচ্ছে না। কাজেই এ ক্ষেত্রে চাষী কেবল শ্রম দেবেনা, বরং উভয়কেই শ্রম দিতে হবে।

যদি তাদের একজন অপর জনের অনুমতি ছাড়া এবং বিচারকের নির্দেশ ব্যতিরেকে এতে টাকা-পয়সা ব্যয় করে, তবে এ ব্যয় নফল বা অতিরিক্ত হিসাবে গণ্য হবে। কেননা, তাদের এক জনের অপর জনের উপর কোন কর্তৃত্ব নেই। **যদি ভূমি মালিক কাঁচা অবস্থায়ই ফসল কেটে নিতে সংকল্প করে, তবে তার জন্য এরূপ করার ইখতিয়ার থাকবে না।** কেননা, এতে চাষীকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হবে। **কিন্তু যদি চাষী ব্যক্তি কাঁচা অবস্থায়ই ফসল কেটে নিতে চায়, তাহলে ভূমি মালিককে বলা হবে, ফসল কেটে নাও। তারপর তা তোমাদের মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে যাবে। অথবা এ কথা বলা হবে যে, চাষীকে তার অংশের মূল্য দিয়ে দাও অথবা বলা হবে যে, ফসল পাকা পর্যন্ত তুমি খরচ চালিয়ে যাও। তারপর যা খরচ করবে সে পরিমাণ তার অংশ থেকে নিয়ে নেবে।** কেননা, চাষী যেহেতু শ্রম দিতে অস্বীকৃতি প্রকাশ করেছে, তাই তাকে আর এ ব্যাপারে বাধ্য করা যাবেনা। কেননা, চুক্তি সমাপ্তকারী কারণ পাওয়া যাওয়ার পর চুক্তিকে বাকী রাখা হয়েছিল কৃষকের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে। কিন্তু সে নিজেই তার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শনকে পরিত্যাগ করেছে। (কাজেই চুক্তি বাকী রাখার আর কোন প্রশ্নই আসতে পারে না।) আর ভূমি মালিককে উপরোক্ত ইখতিয়ারসমূহ প্রদান করা হবে। কেননা, এর প্রতিটির দ্বারাই অন্যের ক্ষতিকে প্রতিহত করা হয়।

জমিতে ফসল উদগত হওয়ার পর যদি চাষী ব্যক্তি মারা যায় এবং তার ওয়ারিসগণ বলে যে, আমরা ফসল পাকা পর্যন্ত কাজ করে যাব, কিন্তু ভূমি মালিক তা অস্বীকার করে, তাহলে ওয়ারিসদের জন্য এ অধিকার থাকবে। কেননা, এতে ভূমি মালিকের কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু তাদের এ প্রশ্নের কারণে তারা কোন পারিশ্রমিক পাবে না। কেননা, তাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করেই আমরা (ফকীহগণ)

আকদকে বাকী রেখেছি। তারা যদি ফসল উৎপাটিত করে ফেলতে চায়, তাহলে তাদেরকে শ্রম বিনিয়োগের ব্যাপারে বাধ্য করা হবে না। এর কারণ আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। আর মালিক ব্যক্তিকে উক্ত তিন ধরণের ইখ্‌তিয়ার প্রদান করা হবে। এর কারণও আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন : অনুরূপ ভাবে[১] ফসল কাটা, মাঠে স্তুপ দেওয়া, মাড়াই করা এবং ফসল উড়ানোর খরচও আনুপাতিক হারে উভয়ের উপর বর্তাবে। কিন্তু ভূমি মালিক এবং চাষী যদি বর্গাচাষ চুক্তির মধ্যে এ সব ব্যয় চাষীর উপর বর্তাবে বলে শর্ত করে, তাহলে বর্গাচাষ ফাসিদ হয়ে যাবে। এ হুকুম উক্ত মাসআলা তথা ফসল পাকার আগে বর্গাচাষের মেয়াদ অতিক্রম হয়ে যাওয়ার সাথে খাস নয়। বরং এ হুকুম বর্গা চাষের সমস্ত বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত। এর কারণ এই যে, ফসল পেকে গেলে চুক্তি খতম হয়ে যায়, উদ্দেশ্য অর্জিত হয়ে যাওয়ার কারণে। তারপর যা থাকে, তা হচ্ছে উভয়ের শরিকী বা যৌথ মাল। অথচ এ অবস্থায় কোন চুক্তি নেই। (চুক্তির সময় শেষ)। কাজেই এ অবস্থায় যা খরচ হবে, এর ব্যয়-ভার উভয়েরই উপর বর্তাবে।

যদি আক্‌দের মধ্যে এমন শর্ত আরোপ করা হয় ,যা মুযারা'আত চুক্তির বিপরীত, অথচ এতে কোন একজনের মুনাফা আছে, তাহলে এতে আকদ ফাসিদ হয়ে যাবে। যেমন চাষীর উপর বোঝা বহন করে এনে দেওয়া বা পিষে দেওয়ার শর্ত আরোপ করা ইত্যাদি।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) হতে বর্ণিত আছে যে, যদি চাষীর উপর এ জাতীয় কিছুর শর্ত করা হয়, তবে اِسْتِصْنَاعٌ (অর্ডারী মাল) এর উপর কিয়াসের ভিত্তিতে تَعَامُلْ (উম্মতের অব্যাহত আমল) হিসাবে জাইয হবে। বলখের মাশাইখে কিরামও এ মতটি পসন্দ করেছেন। শামসুল আইম্মা সারাখসী (র) বলেন : আমাদের দেশের জন্য এটিই বিশুদ্ধতম অভিমত।

মোদ্দা কথা হলো : ফসল পাকার আগের কাজ, যেমন পানি সিঞ্চন করা, রক্ষণা বেক্ষণ করা ইত্যাদি এ গুলো চাষীর উপর বর্তাবে। ফসল পাকার পরে, কিন্তু বণ্টনের আগে যে কাজ, তা যাহিরী রিওয়ায়েত অনুসারে উভয়ের উপর বর্তাবে। যেমন– ফসল কাটা, মাড়াই করা ইত্যাতি। যেমন– আমরা পূর্বেও তা বর্ণনা করেছি। আর বণ্টনের পরের যে কাজ, তার ব্যয় উভয়ের উপর বর্তাবে। বাগ-বাগিচা বর্গা দেওয়ার ব্যাপারেও উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ ফসল পাকার আগে যে কাজ করা হয়, যেমন বাগানে পানি সিঞ্চন করা, গাছের মধ্যে প্রজনন কর্ম করা এবং তা রক্ষণাবেক্ষণ করা। এ গুলো

---

১. অর্থাৎ পাকার আগে বর্গাচাষের সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেলে যেমনি ভাবে উভয়ের উপর খরচের দায়-দায়িত্ব বর্তায়।

চাষীর উপর বর্তাবে। ফসল পাকার পর যা করা হয়, যেমন ফসল কাটা ও হিফাযত করা ইত্যাদি এগুলোর ব্যয় উভয়ের উপর বর্তাবে। যদি চাষীর উপর ফসল কাটার শর্ত করা হয়, তাহলে এটি কোন ইমামের মতেই জাইয হবে না। কেননা এরূপ করার কোন প্রচলন নেই। আর বন্টনের পর যে কাজ করা হবে, তা উভয়ের উপর বর্তাবে। কেননা, তখন এটি শরিকী মাল এবং আকদও বাকী থাকবে না। যদি ভূমি মালিকের উপর ফসল কেটে দেওয়ার শর্ত করা হয়, তবে এটিও ফকীহগণের সর্বসম্মত মতে জাইয নয়। কেননা, এরূপ করার প্রচলনও আমাদের দেশে নেই। যদি তারা ফসল কাঁচা থাকতেই কাটার ইচ্ছা করে, অথবা খেজুর অর্ধ-পাকা অবস্থায় কাটার সংশয় করে, অথবা পাকা খেজুর পাড়ার ইরাদা করে, তবে এর ব্যয় তাদের উভয়ের উপর বর্তাবে। কেননা তারা আকদকে খতম করে দিয়েছে কাঁচা ফসল কাটার বা অর্ধ পাকা খেজুর কর্তন করার সংকল্প করে। কাজেই এ বিষয়টি ফসল পাকার পরবর্তী অবস্থার হুকুমের ন্যায় হবে। আল্লাহই এ বিষয়ে সর্বাধিক জ্ঞাত।

كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ
অধ্যায় ঃ মুসাকাত
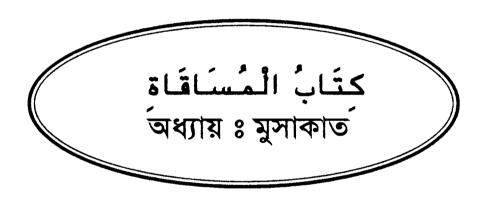
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْمُسَاقَاةِ

অধ্যায় : মুসাকাত[১]

ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন : উৎপন্ন ফল- ফলাদির কিয়দংশের বিনিময়ে মুসাকাত তথা- বাগান বর্গা দেওয়া জাইয নয়। এরূপ করা হলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন : যদি চুক্তিতে নির্দিষ্ট মেয়াদের উল্লেখ থাকে এবং ফল- ফলাদির কিয়দংশের কথা অবিভক্ত ভাবে উল্লেখ করা হয়, তাহলে মুসাকাত জাইয হবে।[২] বস্তুত: গাছ-গাছালি- বাগ-বাগিচা ভাগে বা বর্গা দেওয়ার নামই হলো মুসাকাত। মুযারা'আ এর ন্যায় মুসাকাত এর ব্যাপারেও বিভিন্ন ধরণের আলোচনা রয়েছে।

ইমাম শাফিঈ (র) বলেন : মুসাকাত জাইয, কিন্তু মুযারা'আ জাইয নয়। কিন্তু মুসাকাত এর تابع বা সংশ্লিষ্ট হিসাবে মুযারা'আও জাইয হতে পারে। কেননা, এ (পারস্পরিক সহযোগিতামূলক লেন- দেনের বৈধতার ব্যাপারে) আসল হচ্ছে মুযারাবা। আর মুযারাবার সাথে মুসাকাতের সম্পর্কই হলো সর্বাধিক বেশী। কেননা, মুসাকাতের মধ্যে বর্ধিত অংশেই শুধু অংশীদারীত্ব সাব্যস্ত হয়, মূল বিষয়ের মধ্যে হয় না। আর মুযারা'আর ক্ষেত্রে যদি লভ্যাংশের মধ্যে অংশীদারীত্বের শর্ত করা হয়, বীজের মধ্যে অংশীদারীত্ব না থাকে, যেমন শর্ত করা হলো যে, উৎপন্ন ফসল থেকে প্রথমে বীজ পরিমাণ ফসল নিয়ে নেওয়া হবে, (তারপর তা বণ্টন করা হবে), তাহলে মুযারা'আ ফাসিদ হয়ে যাবে। কাজেই মুসাকাতকে আমরা আসল সাব্যস্ত করে মুযারা'আকে এর تابع বা এর সাথে সংশ্লিষ্ট হিসাবে জাইয সাব্যস্ত করেছি। যেমন – ভূমি বিক্রির ক্ষেত্রে

---

১. গাছ-গাছালি, বাগ-বাগিচা ইত্যাদি বর্গা দেওয়া। যেমন কেউ গাছ লাগিয়ে বাগান করে এ বলে তা হাওয়ালা করলো যে, তুমি এটি দেখাশুনা করবে, প্রয়োজনে এতে পানি দেবে। অতঃপর বাগানে যখন ফল আসবে তখন আমরা তা ভাগাভাগি করে নেব।

২. যেমন উৎপন্ন ফল-ফলাদির অর্ধেক, এক তৃতীয়াংশ, এক চতুর্থাংশ ইত্যাদি।

নালা এবং জমি ওয়াকফ করার ক্ষেত্রে অস্থাবর সম্পদও তাবে' হিসাবে এর সাথে শামিল হয়ে যায়।১

মুসাকাত এর মধ্যে মুদ্দতের শর্ত করা কিয়াস এর দাবী। কেননা, অর্থগত দিক থেকে এটি হচ্ছে ইজারা। যেমন মুযারা'আর মধ্যে মুদ্দতের কথা উল্লেখ থাকা শর্ত। কিন্তু ইস্‌তিহ্‌সান তথা সূক্ষ্ম কিয়াস এর দৃষ্টিতে যদি মুসাকাত এর মধ্যে মুদ্দতের কথা বর্ণনা না করা হয় তবুও তা জাইয হবে। এবং এই আক্‌দ প্রথমবার উৎপাদিত ফল-ফলাদির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। কেননা, ফল পাকার একটি নির্দিষ্ট সময় রয়েছে। এ সময়ের মধ্যে সাধারণত : কম ব্যবধানই হয়ে থাকে। আর এই মুসাকাত এর মধ্যেও যেটি নিশ্চিত তাই শামিল হবে।২

উল্লেখ্য যে, গান্দনা (এক প্রকারের ঘাস) এর মূলে বীজ পরিপক্ক হওয়ার বিষয়টি মুদ্দত বর্ণনার ক্ষেত্রে ফল পাকার মতই। কেননা, এরও একটি নির্দিষ্ট সময়-সীমা রয়েছে। কাজেই এ ক্ষেত্রেও মুদ্দত বর্ণনা করা শর্ত নয়। কিন্তু ফসলের বিষয়টি এর থেকে ব্যতিক্রম। কেননা, এর সূচনার সময়টি বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে হেমন্ত, গ্রীষ্ম এবং বসন্ত ইত্যাদি মৌসুমের ব্যবধানের কারণে। আর শেষ সময়টি যেহেতু সূচনা কালের উপরই নির্ভরশীল, এ হিসাবে ফসলের সময়- সীমার ব্যাপারে জাহালত তথা অজ্ঞতা বিদ্যমান। (কাজেই ফসলের মুদ্দতের বর্ণনা অত্যাবশ্যক।)

এমনিভাবে কেউ যদি জমিতে চারা লাগিয়ে তা মুসাকাত এর ভিত্তিতে কারো কাছে ন্যাস্ত করে, অথচ ঐ গাছগুলো তখনো ফল দেওয়ার পর্যায়ে পৌছেনি, তাহলেও (মুদ্দত বর্ণনা করা ব্যতিরেকে) এ লেন-দেন জাইয হবে না। কিন্তু মুদ্দত বর্ণনা করে দিলে তা জাইয হবে। কেননা, জমির উৎপাদন ক্ষমতা বেশী হওয়া এবং দুর্বল হওয়ার প্রেক্ষিতে গাছের ফল দেওয়ার সময়ের মধ্যেও মারাত্মক ধরনের ব্যবধান হয়ে থাকে।

এমনি ভাবে কেউ যদি মুসাকাত এর ভিত্তিতে এই শর্তে কাউকে খেজুর বৃক্ষ বা গান্দনা গোড়া প্রদান করে যে, সে এটি দেখাশুনা ও তত্ত্বাবধান করবে অথবা গান্দনার গোড়া কোন শর্ত ছাড়াই প্রদান করে, তাহলে এ লেন- দেনও ফাসিদ বলে গণ্য হবে। কেননা, এরও কোন নির্দিষ্ট সীমা নেই। কারণ এটি জমিতে যতদিন থাকবে, ততদিন কেবল বাড়তেই থাকবে। এই হিসাবে এর মুদ্দতও মাজ্‌হুল তথা অজ্ঞাত থাকবে। মুসাকাত সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত হলো : অবিভক্ত অংশ (جُزْءٌ مُشَاعٌ) এর কথা এখানে উল্লেখ করতে হবে। এর কারণ আমরা মুযারা'আর মধ্যে বর্ণনা করেছি। কেননা, নির্দিষ্ট অংশ বিশেষের কথা শর্ত করা হলে, তাতে অংশীদারীত্ব নিঃশেষ হয়ে যাবে।

১. এভাবে - মুযারা'আও মুসাকাত এর তাবে' হিসাবে জাইয।

২. আর সেটি হলো প্রথম বারের উৎপাদিত ফল- ফলাদি। কাজেই এই আকদ প্রথমবারের ফল-ফলাদির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

যদি বাগান বর্গাদাতা ও গ্রহীতা মুসাকাত চুক্তির মধ্যে এমন সময়ের কথা উল্লেখ করে, যে সময়ের মধ্যে বাগানে ফল ধরবে না বলে তারা উভয়েই জানে, তাহলে মুসাকাত ফাসিদ হয়ে যাবে। উদ্দেশ্য তথা উৎপন্ন ফল-ফলাদিতে অংশীদারীত্ব হাত ছাড়া হয়ে যাওয়ার কারণে। **আর যদি তারা এমন সময়ের কথ উল্লেখ করে, যে সময়ের ভেতরে কখনো ফল এসে যায়,** আবার কখনো এর থেকে **বিলম্বও হয়ে যায়, তাহলে মুসাকাত চুক্তি জাইয হবে।** কেননা, এ অবস্থায় উদ্দেশ্য হাত ছাড়া হয়ে যাবে বলে আমরা নিশ্চিত হতে পারছি না। **এহেন অবস্থায় ফল- ফলাদি যদি চুক্তিতে উল্লেখিত মেয়াদের ভেতর এসে যায়, তাহলে এ ফল- ফলাদি অংশীদারীত্বের ভিত্তিতেই ভাগ - বণ্টন করা হবে,** চুক্তি সহীহ হওয়ার কারণে। **আর যদি ফল আসতে (এর থেকে) বিলম্ব হয়ে যায়, তাহলে 'আমিল (বাগান পরিচর্যা কারী ব্যক্তি) তার ন্যায্য পারিশ্রমিক পাবে,** মুসাকাত চুক্তি ফাসিদ হওয়ার কারণে। যেহেতু উল্লেখিত ও নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে স্পষ্টভাবে ত্রুটি প্রকাশ পেয়েছে, এই হিসাবে বিষয়টি এমন হয়ে গেল, যেন তারা ফল না আসার কথাটি প্রথম থেকেই জানতো। পক্ষান্তরে যদি বাগানে আদৌ ফল না আসে, তাহলে চুক্তি ফাসিদ হবে না। কেননা, ফল না আসার বিষয়টি (আসমানী) বিপর্যয়ের কারণেই হয়ে থাকে। অতএব এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মুদ্দত বর্ণনার ক্ষেত্রে কোন ত্রুটি ছিল না। সুতরাং চুক্তি সহীহ থাকবে। আর এ অবস্থায় কারো জন্য কারো উপর কোন প্রকার পাওনা- দেনাও অপরিহার্য হবে না।

ইমাম কুদুরী (র) বলেন : **খেজুর গাছ, অন্যান্য বৃক্ষ, আঙ্গুর বাগান, তরি-তরকারি এবং বেগুন গাছ মুসাকাত হিসাবে প্রদান করা জাইয আছে।**

ইমাম শাফিঈ (র) এর পরবর্তী অভিমত হলো : কেবলমাত্র আঙ্গুর এবং খেজুর বৃক্ষের ক্ষেত্রেই মুসাকাত জাইয। কেননা, মুসাকাতা-এর বৈধতা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে এবং হাদীসে এই দুই ধরনের বৃক্ষের কথাই বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আর সে হাদীসটি হলো- খায়বারের ঘটনা সম্পর্কিত হাদীস।[১]

আমাদের (হানাফীদের) দলীল হলো : মুসাকাত এর বৈধতা সাব্যস্ত হয়েছে প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে,এবং এ প্রয়োজন হচ্ছে ব্যাপক-(উপরোক্ত সমস্ত গাছ-গাছালির ক্ষেত্রেই তা প্রযোজ্য)। আর খায়বারের ঘটনা সম্বলিত হাদীসটি এই দুই ধরনের বৃক্ষের সাথে খাস নয়। কেননা, খায়বারবাসী ইয়াহুদীরা সব ধরনের গাছ-গাছালিই লাগাতো এবং তরি- তরকারী চাষাবাদ করতো। সর্বোপরি বিষয়টি যদি তাই হয়, যেমনটি ইমাম শাফিঈ (র) ধারণা করেছেন, তাহলেও আমরা বলবো যে, নুসূস (হাদীস)-এর

---

১. উপরোক্ত হাদীসে আছে যে, খায়বার বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ (সা) সেখানকার ইয়াহুদী সম্প্রদায়কে এই শর্তে তথায় বহাল রাখেন যে , তারা খায়বারের ভূমি চাষাবাদ করবে এবং বিনিময়ে উৎপাদিত ফল এবং ফসলাদি থেকে অর্ধাংশ পাবে।

মধ্যে আসল হলো, তা معلول بالعلة হওয়া। বিশেষভাবে ইমাম শাফিঈ (র)-এর মূলনীতি অনুসারে।[১]

আঙ্গুর বাগানের মালিকের জন্য চাষীকে বিনা কারণে বের করে দেওয়ার ইখতিয়ার নেই। কেননা চুক্তি পূর্ণ করাতে তার কোন ক্ষতি নেই। **এমনিভাবে চাষীর জন্যও বিনা কারণে কাজ বর্জন করার ইখতিয়ার নেই।** পক্ষান্তরে মুযারা'আর ক্ষেত্রে বীজদাতা ব্যক্তিকে এ ব্যাপারে কোনরূপ বাধ্য করা যাবে না, ঐ তফসীল মুতাবিক, যা আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন : **কেউ যদি মুসাকাত এর ভিত্তিতে এমন খেজুর বাগান কাউকে প্রদান করে, যাতে খেজুর রয়েছে এবং যা কর্ম তথা পরিচর্যার কারণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তবে তা জাইয হবে। কিন্তু খেজুর যদি পরিপক্ক হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে জাইয হবে না।** অনুরূপভাবে পূর্ববর্তী কিয়াসের ভিত্তিতে একথা বলা যায় যে, কেউ যদি কাউকে কোন শস্য ক্ষেত্র প্রদান করে এবং ফসল কাঁচা থাকে, তবে তা জাইয হবে। কিন্তু ফসল যদি কাটার উপযুক্ত হয়ে যায় এবং পেকে যায়, তবে জাইয হবে না। কেননা চাষী ফসলাদির হকদার হয় কর্মের কারণে। অথচ ফসল পেকে যাওয়ার পর চাষীর কর্মের কোন স্বাক্ষরই ফসলের মধ্যে পাওয়া যায় না। এ অবস্থায়ও যদি আমরা এ লেন-দেনকে বৈধ বলি, তাহলে চাষী কর্ম ছাড়াই ফসলের হকদার হচ্ছে। অথচ কর্ম ছাড়া ফসলের হকদার হওয়া সম্বন্ধে শরী'আতে কোন দলীল বিদ্যমান নেই। পক্ষান্তরে সময়ের পূর্বেই যদি কাউকে ফসলী জমি দিয়ে দেওয়া হয়, তবে তা জাইয হবে। কেননা এ অবস্থায়ও চাষী কর্তৃক শ্রম বিনিয়োগের আবশ্যকতা রয়েছে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন: **মুসাকাত চুক্তি যদি ফাসিদ হয়ে যায়, তবে চাষী তার ন্যায্য পারিশ্রমিকের হকদার হবে।** কেননা এ অবস্থায় এটি ফাসিদ ইজারার অর্থে গণ্য হবে। এমনিভাবে মুযারা'আ ফাসিদ হলে যা হয়, এটিও তার অনুরূপ হয়ে যাবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন : **মৃত্যুর কারণে মুসাকাত বাতিল হয়ে যায়।** কেননা, অর্থগত দিক থেকে মুসাকাত ইজারার অনুরূপই।[২] আর ইজারার আলোচনায় আমরা এ সম্বন্ধে বর্ণনা করেছি।

---

১. অর্থাৎ যদি আমরা একথা স্বীকার করেও নেই যে, খায়বারবাসী লোকেরা শুধু মাত্র এই দুই ধরনের বৃক্ষই আবাদ করতো, তাহলেও এখানে আমাদের প্রশ্ন যে, এই দুই ধরনের বৃক্ষের ক্ষেত্রে মুসাকাত জাইয হওয়ার কারণ কি? কেননা, নুসূস (হাদীস) ইল্লত (কারণ) সম্বলিত হওয়াই আসল। বিশেষভাবে ইমাম শাফিঈ (র)-এর মতে। আর সে ইল্লত (কারণ) হলো, মানুষের প্রয়োজনীয়তা। আর সে প্রয়োজনীয়তা হচ্ছে ব্যাপক, সব ধরনের বৃক্ষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। অতএব উপরোক্ত সব ধরনের বৃক্ষের ক্ষেত্রেই মুসাকাত জাইয হবে।

২. কাজেই চুক্তি সম্পাদনকারী উভয় পক্ষের মৃত্যুর কারণে ইজারা যেমনিভাবে বাতিল হয়ে যায়, অনুরূপভাবে মুসাকাতও বাতিল হয়ে যাবে। আর মৃত্যুর কারণে ইজারা কেন বাতিল হয়, এ সম্বন্ধে গ্রন্থকার (র) বলেন: এ ব্যাপারে ইজারা অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

যদি ফল-ফলাদি অর্ধ পাকা অবস্থায় ভূমি মালিক মারা যায়, তবে চাষী ফল-ফলাদি পাকা পর্যন্ত এর তত্ত্বাবধান করে যাবে;যেমন তার মারা যাওয়ার আগে সে করছিল। যদিও এ বিষয়টিকে ভূমি মালিকের ওয়ারিসগণ অপছন্দ করে। এ হুকুম ইস্‌তিহ্‌সান -এর ভিত্তিতে প্রদান করা হয়েছে; কাজেই আকদ বাকী থাকবে। এতে চাষীর উপর থেকে ক্ষতি দূর হয়ে যাবে। আর এ অবস্থায় ওয়ারিসগণেরও কোন ক্ষতি নেই।

যদি চাষী ব্যক্তি নিজের ক্ষতিকে স্বীকার করে নেয়, তাহলে ভূমি মালিকের ওয়ারিসদেরকে ইখতিয়ার দেওয়া হবে (১) হয়তো তারা এ অর্ধ পাকা ফলই ভাগ বণ্টন করে নেবে। (২) অথবা তার (চাষীর) অংশের এই অর্ধ পাকা ফলের যে মূল্য, তা তাকে দিয়ে দেবে। (৩) অথবা এ অর্ধ পাকা ফল পাকা পর্যন্ত যা খরচ লাগবে, তা তারা করে যাবে। এরপর চাষীর পাকা খেজুরের অংশ থেকে তারা এই পরিমাণ উসুল করে নিয়ে নেবে। কেননা, এতে তাদের কোন ক্ষতি নেই। মুযারা'আর মধ্যে এর নযীর আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি।

যদি 'আমিল তথা চাষী ব্যক্তি মারা যায়, তাহলে তার ওয়ারিসগণ বাগানের তত্ত্বাবধান চালিয়ে যেতে পারবে। যদিও ভূমি মালিক তা অপছন্দ করে। কেননা, এতে উভয়কুল রক্ষা পায়। যদি চাষীর ওয়ারিসগণ এই অর্ধ পাকা খেজুরই কেটে নেওয়ার ইচ্ছা করে, তবে ভূমি মালিকের উপরোক্ত তিন অবস্থার কোন একটি গ্রহণ করার ব্যাপারে ইখতিয়ার থাকবে, যা আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি।

যদি চুক্তি সম্পাদনকারী বাগানের মালিক এবং চাষী উভয়েই মারা যায়, তাহলে উপরোক্ত ইখতিয়ার চাষীর ওয়ারিসদের জন্য সাব্যস্ত হবে। কেননা তারাই চাষীর স্থলাভিষিক্ত প্রতিনিধি। বস্তুত : এটি হলো আর্থিক হকের (حَقٌّ مَالِيٌّ) মধ্যে প্রতিনিধিত্ব। আর আর্থিক প্রতিনিধিত্ব হলো ফল পাকা পর্যন্ত এগুলোকে গাছের উপর রেখে দেওয়া। প্রকৃতপক্ষে এটি ইখতিয়ার প্রাপ্তির মধ্যে উওরাধিকার আইনের প্রয়োগ নয়।

যদি চাষীর ওয়ারিসগণ বাগান তত্ত্বাবধান করতে অসম্মতি প্রকাশ করে তবে এ অবস্থায় ভূমি মালিকের ওয়ারিসগণের ইখতিয়ার থাকবে, ঐ প্রক্রিয়ায়, যা আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন : ফল অর্ধ পাকা থাকা অবস্থায়ই যদি মুসাকাতের মেয়াদ অতিক্রান্ত হয়ে যায়, তাহলে এ মাসআলা এবং প্রথমোক্ত মাসআলা উভয়টি একই ধরনের হবে। এ পর্যায়ে ফল পাকা পর্যন্ত চাষী ব্যক্তি এ বাগানের তত্ত্বাবধান করতে পারবে; তবে কোন পারিশ্রমিক পাবে না। কেননা, গাছ- গাছালি ইজারা দেওয়া জাইয নেই। কিন্তু এই অবস্থায় মুযারা'আর হুকুম-এর থেকে ভিন্নতর। কেননা, জমি ইজারা দেওয়া জাইয। এমনিভাবে মুসাকাতের ক্ষেত্রে কাজের সমস্ত দায়-দায়িত্ব 'আমিল তথা চাষীর উপর। আর মুযারা'আর ক্ষেত্রে এই অবস্থায় কাজের দায়-দায়িত্ব বর্গাদাতা ও গ্রহীতা উভয়ের উপর। কেননা, বর্গাচাষের ক্ষেত্রে মেয়াদ অতিক্রান্ত হওয়ার পর চাষীর উপর ভূমির ন্যায্য ইজরা ওয়াজিব হয়। কাজেই, এ ক্ষেত্রে চাষীর উপর এককভাবে কোন দায়-দায়িত্ব বর্তাবে না। আর আলোচ্য মাসআলায়

চাষীর জন্য কোন পারিশ্রমিক নেই। কাজেই মেয়াদ অতিক্রান্ত হওয়ার আগে তার উপর যেমন কাজের দায়িত্ব ছিল,অনুরূপভাবে মেয়াদ অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও কাজের দায়িত্ব তার উপরই বর্তাবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন : মুসাকাত চুক্তি রহিত হয়ে যায় ওযরের কারণে। এর কারণ আমরা ইজারা অধ্যায়ে বিস্তারিত বর্ণনা করেছি এবং সেখানে ওযরের সম্ভাব্য দিকসমূহ সম্পর্কেও আমরা আলোচনা করেছি। সে ওযরসমূহ থেকে কতিপয় ওযর নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ (১) 'আমিল (চাষী) ব্যক্তি একজন চোর। তার ব্যাপারে আশংকা আছে যে, হয়তো সে ফল-ফলাদি পাকার আগেই গাছের ডাল এবং কাঁচা ফল কেটে নিয়ে যাবে। এ অবস্থায়ও যদি 'আক্‌দ বহাল রাখা হয়, তবে এতে বাগানের মালিকের এমন ক্ষতি হবে, যা সে তার নিজের উপর অবধারিত করেনি। কাজেই এ অবস্থায় মুসাকাত চুক্তি রহিত হয়ে যাবে। (২) অথবা চাষী হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। (এ অবস্থায়ও চুক্তি রহিত হয়ে যাবে।) যদি এ অসুখের কারণে সে কাজ করতে দুর্বল হয়ে পড়ে। কেননা এ অবস্থায়ও যদি তাকে কাজ করতে বাধ্য করা হয়, তাহলে অতিরিক্ত কষ্ট দিয়ে শ্রমিকদেরকে কাজে খাটানো অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়াবে। অথচ এরূপ করাকে সে তার নিজের উপর অবধারিত করেনি। কাজেই এটিকে (অসুস্থতাকে) ওযর হিসাবে গণ্য করা হবে।

চুক্তি সম্পাদনের পর যদি চাষী নিজেই কাজ না করার ইচ্ছা ব্যক্ত করে, তবে তা ওযর হিসাবে স্বীকৃত হবে কি-না, এ সম্বন্ধে দুই ধরনের বর্ণনা রয়েছে। সে দুই বর্ণনার একটির ব্যাখ্যা হলো এই যে, যদি চুক্তিতে চাষীর নিজ হস্তে কর্ম সম্পাদনের শর্ত করা হয়, তবে সে ক্ষেত্রে তার পক্ষ থেকে এটি ওযর হিসাবে বিবেচিত হবে।

যদি কোন ব্যক্তি নির্দিষ্ট কয়েক বছরের জন্য খালি ভূমিতে বৃক্ষের চারা রোপণ করার জন্য কাউকে তা এ শর্তে প্রদান করে যে, এই জমি এবং বৃক্ষ ভূমি মালিক ও চারা রোপণকারী ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যে আধাআধি করে বণ্টন করা হবে, তাহলে এ চুক্তি জাইয হবে না। কেননা, চুক্তিতে এমন বিষয়ে (জমিতে) অংশীদারীত্বের শর্ত করা হয়েছে, যা তাদের যৌথ শ্রম বিনিয়োগের পূর্ব হতেই বিদ্যমান আছে। যেখানে চাষীর কর্মের কোন দখল নেই। এহেন অবস্থায় ভূমি মালিকই সমস্ত ফল-ফলাদি এবং চারাসমূহের অধিকারী হবে। আর বৃক্ষ রোপনকারী ব্যক্তি তার রোপনকৃত চারাসমূহের মূল্য এবং তার কর্মের ন্যায্য পারিশ্রমিক প্রাপ্ত হবে। কেননা, এ বিষয়টি অর্থগত দিক থেকে আটা পেষণকারী ব্যক্তির কাফীযের ন্যায় হয়ে গেছে। কেননা, এখানে শ্রমিককে তার শ্রম দ্বারা অর্জিত বস্তুর কিয়দংশের বিনিময়ে ভাড়া গ্রহণ করা হয়েছে। আর তা হলো বাগানের অর্ধাংশ। সুতরাং এ চুক্তি ফাসিদ বলে গণ্য হবে। তবে চারা যেহেতু বাগানে লাগানো হয়েই গেছে, তাই তা ফেরত দেওয়া অসম্ভব। কাজেই এ অবস্থায় চারার মূল্য এবং শ্রমিকের ন্যায্য পাওনা চাষীকে অবশ্যই প্রদান করতে হবে। কেননা, চাষীর পারিশ্রমিক চারার মূল্যের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না এ কারণে যে, চারার স্বতন্ত্র মূল্য রয়েছে। এ মাসআলার উদ্ধৃতি অন্য ভাবেও আছে, যা আমি 'কিফায়াতুল মুনতাহী' গ্রন্থে উল্লেখ করেছি। তবে এখানে যা উল্লেখ করা হয়েছে, তা হচ্ছে এদুয়ের মধ্যে বিশুদ্ধতম, আল্লাহ্ই সর্বাধিক জ্ঞাত।

كِتَابُ الذَّبَائِحِ
অধ্যায় ঃ যবাহ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الذَّبَائِحِ

অধ্যায় ঃ যবাহ্ এর মাসাইল

আল্লামা বুরহান উদ্দীন মারগীনানী (র) বলেন : যবীহা (যবাহকৃত পশু) হালাল হওয়ার জন্য যবাহ করা হচ্ছে শর্ত। কুরআন মজীদে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন: اِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ —তবে তোমরা যা যবাহ করতে পেরেছো, তা ব্যতীত (সবই তেমাদের জন্য হারাম)। (৫ : ৩)

অধিকন্তু না-পাক রক্ত পাক গোশত থেকে এই যবাহ-এর দ্বারাই পৃথক হয়।১

উল্লেখ্য যে, যবাহ–এর দ্বারা যেমনি ভাবে পশুর গোশত (খাওয়া) হালাল হয়, ঠিক তেমনি ভাবে এই যবাহ এর দ্বারা مَاكُوْلُ اللَّحْمِ অর্থাৎ যেসব পশুর গোশত খাওয়া জাইয এবং غَيْرُ مَاكُوْلِ اللَّحْمِ অর্থাৎ যে সব পশুর গোসত খাওয়া জাইয নয়, উভয় প্রকার পশু পাক-পবিত্রও হয়। কেননা, زَكَاةٌ বা যবাহ্ শব্দের মধ্যে এর প্রতি ইংগিত রয়েছে। নিম্নোক্ত হাদীসেও زَكَاةٌ (যাকাত) শব্দটি অনুরূপ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে : زَكَاةُ الْاَرْضِ يُبْسُهَا —জমির পবিত্রতা হলো তা শুকিয়ে যাওয়া।২

যবাহ্ দুই প্রকার ঃ

(১) ইখ্তিয়ারী– যেমন সীনা ও চোয়ালের মধ্যখানে যখম করা।

(২) ইয্তিরারী–এটি শরীরের যে কোন স্থানে যখম করলেই হয়ে যাবে।৩

---

১. কাজেই পশুকে হালাল করার জন্য যবাহ অত্যাবশ্যক।

২. হাদীসটি তাহারাত অধ্যায়েও উদ্ধৃত হয়েছে।

৩. গ্রন্থকার (র) বলেন : যবাহ দুই প্রকার : (১) ইখতিয়ারী যবাহ (২) ইযতিরারী যবাহ। ইখতিয়ারী যবাহ এর স্থান হলো গলা। আর ইযতিরারী যবাহর জন্য কোন স্থান নির্দিষ্ট নেই। যেখানেই যখম করা যায়, এতে যবাহ হয়ে যায়। কেননা, অনন্যোপায় অবস্থায়ই এ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়ে থাকে। তবে এ দু'টি পদ্ধতির মধ্যে ইখতিয়ারী যবাহ হচ্ছে আসল এবং ইযতিরারী যবাহ হচ্ছে এর বিকল্প। দ্বিতীয়টির উপর তখনই আমল করা জাইয হবে, যদি প্রথমটি অবলম্বন করা সম্ভব না হয়। কাজেই অনন্যোপায় অবস্থায়ই- ইযতিরারী যবাহ জাইয হবে। স্বাভাবিক অবস্থায় জাইয হবে না।

দ্বিতীয়টি হচ্ছে প্রথমটির বিকল্প। কেননা, প্রথমটির বাস্তাবায়ন থেকে অপারগ অবস্থায়ই কেবলমাত্র দ্বিতীয়টি অবলম্বন করা জাইয। আর এটিই হলো– বিকল্প হওয়ার নিদর্শন। দ্বিতীয়টি যে প্রথমটির বিকল্প, এর আরেকটি যুক্তি হলো এই যে, পশুর শরীর থেকে রক্ত বের করার ক্ষেত্রে প্রথমটি অধিক ফলপ্রসূ। কিন্তু দ্বিতীয়টি এ ক্ষেত্রে অপূর্ণাঙ্গ। কাজেই প্রথমোক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করতে অক্ষম হলে, কেবলমাত্র তখনই দ্বিতীয়টি অবলম্বন করা জাইয হবে। কেননা, শক্তি ও সামর্থ্য অনুসারেই মানুষকে আমলের ব্যাপারে বাধ্য করা হয়েছে।[১]

যবাহ সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত হলো : যবাহকারী ব্যক্তিকে অবশ্যই একত্ববাদে বিশ্বাসী হতে হবে। চাই তা বিশ্বাসগতভাবে হোক, যেমন মুসলিম ব্যক্তি অথবা মৌখিক দাবীর পর্যায়ের হোক, যেমন তাহলে কিতাবের কোন ব্যক্তি। অনুরূপভাবে যবাহকারী ব্যক্তিকে **অবশ্যই হালাল** (মুহরিম নয়) হতে হবে এবং হরম এলাকার বাইরে হতে হবে। এর দলীল আমরা পরে উল্লেখ করবো ইনশাআল্লাহ।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন : মুসলিম এবং কিতাবী ব্যক্তির যবাহকৃত পশু হালাল, ঐ আয়াতের ভিত্তিতে যা আমরা পূর্বে উদ্ধৃত করেছি। (اِلاَّ مَاذَكَّيْتُمْ) আর এ সম্বন্ধে আমাদের দ্বিতীয় দলীল হচ্ছে কুরআন মজীদের এ আয়াত :

وَطَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ

–এবং যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে, তাদের খাদ্যদ্রব্য তোমাদের জন্য হালাল (৫ : ৫)।

যবাহকারী ব্যক্তি যদি বিস্‌মিল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান রাখে, যবাহ করতে সক্ষম হয় এবং যবাহ এর মধ্যে যে সব রগ কাটা আবশ্যক তা চিনে ও জানে তাহলে নাবালিগ, পাগল এবং মহিলা হওয়া সত্ত্বেও তার যবাহ সহীহ হবে। পক্ষান্তরে সে যদি রগ কাটতে না জানে, বিসমিল্লাহ্ পড়তে না পারে এবং যবাহ করার পদ্ধতি সম্বন্ধেও অবগত না থাকে; তবে তার যবাহকৃত পশু হালাল হবে না। কেননা, যবাহ করার প্রাক্কালে 'বিস্‌মিল্লাহ' বলা শর্ত, যা কুরআন মজীদের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। আর এ 'বিসমিল্লাহ্' পাঠ স্বেচ্ছায় এবং ইরাদার সাথে হতে হবে। আর এই ইরাদা তখনই সহীহ হবে, যদি তাতে উক্ত গুণাগুণসমূহ বিদ্যমান থাকে। যবাহ করার ব্যাপারে খতনাবিহীন এবং খতনাকৃত ব্যক্তি উভয়ই সমান ঐ দলীলের ভিত্তিতে, যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। কুরআন মজীদে যে কিতাবী শব্দের উল্লেখ করা হয়েছে, তাতে যিম্মী, হরবী, আরবী এবং তাগ্‌লিবী সব ধরনের কিতাবীই শামিল রয়েছে। কেননা, শর্ত তো হলো কোন আসমানী ধর্মাদর্শের অনুসারী হওয়া। যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

---

১. কুরআন মজীদে এরশাদ হয়েছে: لاَيُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلاَّ وُسْعَهَا আল্লাহ কারো উপর এমন কষ্টদায়ক দায়িত্ব অর্পণ করেন না, যা তার সাধ্যাতীত। (২ : ২৮৬)।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন : অগ্নিপূজক ব্যক্তির যবাহকৃত পশু খাওয়া যাবে না। কেননা, নবী করীম (সা) ইরশাদ করেন :

سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ اَهْلِ الْكِتَابِ غَيْرَ نَاكِحِي نِسَائِهِمْ وَلاَ اٰكِلِى ذَبَائِحِهِمْ -

–তোমরা অগ্নি পুজকদের সাথে কিতাবীদের অনুরূপ আচরণ করবে। তবে তাদের মহিলাদের বিবাহ করবে না এবং তাদের যবাহকৃত পশু ভক্ষণ করবে না।[১]

অধিকন্তু তারা (অগ্নি পূজকরা)– একত্ববাদের দাবীদার নয়। এই হিসাবে বিশ্বাসগত দিক থেকে এবং মৌখিক দাবীর দিক থেকে কোন ভাবেই তারা আসমানী ধর্মাদর্শের অনুসারী নয়। **ইমাম কুদূরী (র) বলেন : মুরতাদ-(ধর্মত্যাগী) এর যবাহকৃত পশুও খাওয়া যাবে না।** কেননা, তার তো কোন ধর্মই নেই। যেহেতু সে যেদিকে ফিরে গিয়েছে, তাকে এর উপর বহাল রাখা হবে না। কিন্তু কিতাবীর বিষয়টি এর থেকে ব্যতিক্রম, যদি সে নিজ ধর্ম ছেড়ে অন্য ধর্ম অবলম্বন করে। কেননা আমাদের ধর্মমতে কিতাবীকে তার ফিরে যাওয়া ধর্মের উপর বহাল রাখা হবে। কাজেই যবাহ্-এর সময় সে কোন্ ধর্মের উপর ছিল, সেটিই ধর্তব্য হবে। যবাহ্-এর আগে সে কোন্ ধর্মের উপর ছিল তা ধর্তব্য হবে না।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, মূর্তিপূজারী ব্যক্তির যবাহকৃত পশুও খাওয়া যাবে না। কেননা কোন ধর্মাদর্শের প্রতিই তার কোন বিশ্বাস নেই।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন : মুহরিম ব্যক্তির শিকারকৃত পশু খাওয়া যাবে না। অনুরূপভাবে ঐ শিকারকৃত পশুও খাওয়া যাবে না, যা হরম এলাকায় যবাহ করা হয়। কিতাবে সাধারণভাবে মুহরিম ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বুঝা যায় যে, হিল্ল এবং হরম উভয় এলাকাতেই তার জন্য এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। উল্লেখ্য যে, হরম এলাকায় যবাহ করার ব্যাপারে মুহরিম এবং হালাল (যে মুহরিম নয়) উভয়ই সমান। কেননা যবাহ করা একটি শরী'আত স্বীকৃত কাজ। আর মুহরিম ব্যক্তির কোন পশু শিকার করা বা হরম এলাকায় কোন পশু যবাহ করা হচ্ছে হারাম কাজ। কাজেই এতে যবাহ হবে না। পক্ষান্তরে মুহরিম ব্যক্তি যদি শিকারী পশু ছাড়া অন্য পশু যবাহ করে, তবে তা সহীহ হবে। কেননা এটি একটি শরী'আত অনুমোদিত কাজ। আর হরম (এলাকা) বকরীকে আমান নিরাপত্তা দেয় না। অনুরূপভাবে মুহরিম ব্যক্তির জন্য যবাহ করা হারাম নয়, অর্থাৎ শিকারী পশু ছাড়া অন্য পশু।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন: যদি যবাহকারী ব্যক্তি স্বেচ্ছায় বিস্‌মিল্লাহ বলা বর্জন করে; তাহলে এ পশু মৃত পশু বলে গণ্য হবে, এবং তা খাওয়া যাবে না। আর যদি ভুলক্রমে বিস্‌মিল্লাহ বর্জন করে, তবে তা খাওয়া যাবে।

পক্ষান্তরে ইমাম শাফিঈ (র) বলেন ঃ উভয় অবস্থাতেই পশুটি খাওয়া যাবে। ইমাম মালিক (র) বলেন ঃ কোন অবস্থাতেই খাওয়া যাবে না। আর বিস্‌মিল্লাহ বর্জন করার

১. এ হাদীসের অনুরূপ একটি হাদীস মুসান্নাফে আবদিররাযযাক এবং মুসান্নাফে ইবন আবী শায়বাতে উল্লেখ রয়েছে।

(হুকুমের) ব্যাপারে অমুসলিম ও কিতাবী উভয়ই সমান। অনুরূপ মতভেদ প্রযোজ্য হবে যদি কেউ বাজপাখী এবং কুকুর ছাড়ার সময় এবং তীর নিক্ষেপের সময় বিস্‌মিল্লাহ বলা বর্জন করে।

ইমাম শাফিঈ (র)-এর বক্তব্য (ইচ্ছাকৃতভাবে বিস্‌মিল্লাহ না বলে পশু যবাহ্ করা হলে সে পশু হালাল হওয়া) ইজমার পরিপন্থী। কেননা, ইচ্ছাকৃতভাবে বিস্‌মিল্লাহ না বলে কোন পশু যবাহ করা হলে তা খাওয়া হারাম হওয়ার ব্যাপারে পূর্ববর্তী উম্মতের মধ্যে কোনই দ্বিমত নেই। অবশ্য ভুলে বিস্‌মিল্লাহ না বলে কোন পশু যবাহ করা হলে তা খাওয়া যাবে কি না, এ ব্যাপারে পূর্ববর্তী আলিমগণের মধ্যে মতভেদ ছিল। হযরত ইবন উমর (রা)-এর মতে এ জাতীয় পশু হারাম আর হযতর আলী ও হযরত ইবন আব্বাস (রা)-এর মতে এ জাতীয় পশু খাওয়া হালাল। তবে ইচ্ছাকৃতভাবে বিস্‌মিল্লাহ বর্জন করার বিষয়টি এর থেকে ব্যতিক্রম। আর এ কারণেই ইমাম আবূ ইউসুফ (র) এবং অন্যান্য মাশাইখে কিরাম বলেছেন যে, যে পশু যবাহ করার সময় ইচ্ছাকৃতভাবে বিস্‌মিল্লাহ বর্জন করা হয়েছে, তার বিষয়টি এমন যে, এতে ইজতিহাদের কোন অবকাশ নেই। এ কারণেই বিচারক যদি এ জাতীয় পশু বিক্রি করার বৈধতার ব্যাপারে ফয়সালা দেয়, তবে তার এ ফয়সালা কার্যকর হবে না। কেননা, এটি ইজমার পরিপন্থী ফয়সালা।

ইমাম শাফিঈ (র)-এর দলীল রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন :

اَلْمُسْلِمُ يَذْبَحُ عَلٰى اِسْمِ اللّٰهِ تَعَالٰى سَمّٰى اَوْلَمْ يُسَمِّ۔

—মুসলিম ব্যক্তি আল্লাহর নাম নিয়েই যবাহ করে, চাই সে বিস্‌মিল্লাহ বলুক বা না বলুক।[১]

অধিকন্তু যবাহ সহীহ হওয়ার জন্য যদি বিসমিল্লাহ্ বলা শর্ত হিসাবে গণ্য হতো, তাহলে ভ্রমজনিত ওযরের কারণে তা রহিত হতো না। যেমন সালাতের ক্ষেত্রে তাহারাত (শর্ত এবং তা ভ্রমজনিত ওজরের অবস্থায় রহিত হয় না।) আর যদি একথা ধরেও নেওয়া হয় যে, বিস্‌মিল্লাহ বলা শর্ত; তাহলে মিল্লাতে ইসলাম এর স্থলাভিষিক্ত হবে, যেমন ভুলে যাওয়া ব্যক্তির ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

আর আমাদের দলীল হলো আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ

وَلَاتَاْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ۔

—এবং যাতে আল্লাহ্‌র নাম নেওয়া হয়নি, তার কিছুই তোমরা আহার করবে না। (৬:১২১) এ আয়াতটি নিষেধাজ্ঞামূলক আয়াত। এটি تَحْرِيْمٌ (হারামকরণ) এর জন্য নাযিল হয়েছে। আমাদের দ্বিতীয় দলীল হলো ইজমা, যা আমরা পূর্বেও বর্ণনা

১. হাদীসটি এই শব্দে গরীব। তবে এর সমার্থবোধক অন্য একটি হাদীস রয়েছে, যা ইমাম দারুকুতনী (র) তাঁর সংকলিত হাদীস গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

করেছি। আমাদের তৃতীয় দলীল হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাদীস। এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন হযরত 'আদী ইবন হাতিম তাঈ (রা)। এ হাদীসের শেষাংশে নবী করীম (সা) হযরত আদী (রা)-কে লক্ষ্য করে বলেছেন :

فَانَّكَ اِنَّمَا سَمَّيتَ عَلٰى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلٰى كَلْبٍ غَيْرِكَ ـ

–কেননা, তুমি তো তোমার কুকুর ছাড়ার সময় বিস্‌মিল্লাহ পড়েছো; কিন্তু অন্য কুকুরের উপরতো বিস্‌মিল্লাহ বলনি।[১]

এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) বিস্‌মিল্লাহ না বলাকেই পশু হারাম হওয়ার কারণ হিসাবে উল্লেখ করেছেন।

ইমাম মালিক (র)-এর দলীল ঃ পূর্বে আমরা যে হাদীসটি উল্লেখ করেছি, এর স্পষ্ট শব্দ ভাষ্যকেই তিনি দলীল হিসাবে পেশ করে থাকেন। কেননা (উল্লেখিত) কুরআন ও হাদীসে স্বেচ্ছায় ও অনিচ্ছায় বিস্‌মিল্লাহ বর্জন করার মধ্যে কোন পার্থক্য নির্ণয় করা হয়নি।

ইমাম মালিক (র)-এর বক্তব্যের জবাবে হানাফীদের পক্ষ থেকে বলা হয় ঃ এ ক্ষেত্রে আমাদের কথা হলো (এখানে আয়াত ও হাদীসের যাহিরী অর্থ উদ্দেশ্য নয়। কেননা, এখানে যাহিরী অর্থকে উদ্দেশ্য হিসাবে সাব্যস্ত করা হলে আমরা এমন কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হবো, যা কারো নিকটই অস্পষ্ট নয়। কেননা মানুষ জীবনে বহু ভুল করে থাকে। এ ভুলের অবস্থায়ও যদি বিস্‌মিল্লাহ্ বলাকে অপরিহার্য সাব্যস্ত করা হয়, তবে অসাধ্য কাজের ব্যাপারে মানুষকে বাধ্য করা হবে। অথচ অসাধ্য ও অতিশয় কষ্টের বিষয়কে শরী'আত থেকে অপসৃত করে দেওয়া হয়েছে।[২]

সর্বোপরি উপরোক্ত আয়াত ও হাদীস এখানে যাহিরী অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। যদি এগুলোর যাহিরী অর্থ উদ্দেশ্য হতো, তবে অবশ্যই পূর্ববর্তী লোকেরা (যারা ভুল বশত: বিস্‌মিল্লাহ্ বর্জন করলে পশু হারাম হয়ে যায় বলতেন) এ আয়াতকে দলীল হিসাবে পেশ করতেন এবং অপরাপর ব্যক্তিগণ তা মেনে নিতেন। ফলে ইসলামের প্রথম যমানাতেই মতভেদ শেষ হয়ে যেতো। ভুলবশত : বিস্‌মিল্লাহ বর্জনকারী ব্যক্তি মা'যূর হওয়ায় তার ক্ষেত্রে মিল্লাতে ইসলামকে বিস্‌মিল্লাহর স্থলাভিষিক্ত করা হয়। আর স্বেচ্ছায় বিস্‌মিল্লাহ্ বর্জনকারী ব্যক্তির ক্ষেত্রে ওযর না থাকায় মিল্লাতে ইসলামকে বিস্‌মিল্লাহর স্থলাভিষিক্ত করা হয় না। উল্লেখ্য যে, ইমাম শাফিঈ (র) যে হাদীসটি এখানে বর্ণনা করেছেন, তা ভুলবশত: বিস্‌মিল্লাহ বর্জন করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

ইখতিয়ারী যবাহের ক্ষেত্রে যবাহ এর সময় বিস্‌মিল্লাহ বলা শর্ত এবং এ বিস্‌মিল্লাহ যবাহকৃত পশুর উপর পঠিত হবে। আর শিকারের ক্ষেত্রে শিকারী পশু ছাড়া বা তীর নিক্ষেপের সময় বিস্‌মিল্লাহ্ বলা শর্ত, এবং এই বিস্‌মিল্লাহ পঠিত হবে آلة। তথা

১. এ হাদীসটি সিহাহ সিত্তার সব কিতাবেই বর্ণিত হয়েছে।

২. কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে : وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ এবং তিনি দীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন কঠোরতা আরোপ করেননি। (২২:৭৮)

—১৬

শিকার করার উপকরণের উপর। কেননা প্রথমোক্ত অবস্থায় যবেহ করা তার ক্ষমতার আওতায় আছে এবং শেষোক্ত অবস্থায় পশু ছাড়া বা তীর নিক্ষেপ করা তার ক্ষমতার আওতায় আছে, তীর বিদ্ধ করা নয়। কাজেই যে কাজটি মানুষের ক্ষমতার আওতায়, সে কাজের সময়ই বিস্‌মিল্লাহ বলা শর্ত হিসাবে গণ্য হবে। এ কারণে কেউ যদি একটি বকরী শোয়ায়ে বিস্‌মিল্লাহ বলে এর দ্বারা অপর কোন বকরী যবাহ করে তবে এ যবাহ সহীহ হবে না।[১] অপর পক্ষে কেউ যদি বিস্‌মিল্লাহ বলে কোন শিকার পশুর দিকে তীর নিক্ষেপ করে, আর সে তীর গিয়ে লাগে অন্য পশুর গায়ে, তবে তা হালাল বলে গণ্য হবে। শিকারী পশু (যেমন কুকুর বা বাজ) ছাড়ার ক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম প্রযোজ্য হবে। কেউ যদি বকরী শোয়ানোর পর বিস্‌মিল্লাহ উচ্চারণ করে, তারপর (হাতের) ছুরিটি নিক্ষেপ করে ফেলে দিয়ে অন্য ছুরি দ্বারা তা যবাহ করে তবে যবাহকৃত পশুটি খাওয়া যাবে। আর যদি তার হাতে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে পরে ঐ তীরটি ফেলে দিয়ে অন্য একটি তীর শিকারের প্রতি নিক্ষেপ করে, তাহলে ঐ শিকার খাওয়া যাবে না।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন : আল্লাহর নামের সাথে অন্য কিছুর কথা উল্লেখ করা মাকরূহ। এমনিভাবে যবাহের সময় اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ فُلَانٍ (হে আল্লাহ! অমুকের পক্ষ হতে এটি কবুল করে নেন।) বলাও মাকরূহ।

এখানে তিনটি মাসআলা রয়েছে ঃ

(১) প্রথমটি হলো– আল্লাহর নামের সাথে অন্য কিছুর তথা সংযোজিতভাবে উল্লেখ না করে মিলিতভাবে উল্লেখ করা। আর এরূপ করা মাকরূহ। তবে এতে যবাহকৃত পশু হরাম হবে না। ইমাম মুহম্মাদ (র) কিতাবে যা বলেছেন, এর উদ্দেশ্য এটিই। এর উদারহণ হলো ঃ যেমন কেউ বললো ঃ بِسْمِ اللّٰهِ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ (এরূপ বলা মাকরূহ, হারাম নয়)। কেননা এখান শিরক পাওয়া যায়নি। কাজেই এ যবাহ গায়রুল্লাহ তথা মুহাম্মদ (সা)-এর জন্য হয়নি। কিন্তু এখানে বাহ্যিকভাবে আল্লাহ্‌র নামের সাথে রাসূলুল্লাহ্‌র নাম উল্লেখ করায় এটি বাহ্যিকভাবে হারাম সূরতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে গেছে বিধায় এরূপ বলা মাকরূহ বলে গণ্য হবে।

(২) দ্বিতীয় মাসআলা হলো ঃ যবাহ এর সময় আল্লাহর নামের সাথে অন্য কারো কথা বা নাম সংযোজন করে মিলিতভাবে উল্লেখ করা। যেমন কেউ বললো ঃ بِسْمِ اللّٰهِ وَاسْمِ فُلَانٍ। অথবা বললো ঃ بِسْمِ اللّٰهِ وَفُلَانٍ অথবা বললোঃ بِسْمِ اللّٰهِ مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللّٰهِ মুহাম্মদ শব্দের دال এ যের এর সাথে; তাহলে যবাহকৃত পশু হারাম বলে গণ্য হবে। কেননা এটি গায়রুল্লাহর নামে যবাহ করা হয়েছে।

(৩) তৃতীয় মাসআলা হলো ঃ আল্লাহর নামের সাথে অন্য কিছুর কথা বা কারো নাম বাহ্যিকভাবে ও অর্থগত দিক থেকে তথা উভয় হিসাবে পৃথকভাবে উল্লেখ করা। যেমন কেউ আল্লাহর নাম উচ্চারণ করার আগে কিংবা পশু শোয়ানোর আগে অন্য কারো নাম উল্লেখ করলো অথবা পরে উল্লেখ করলো, এতে কোন অসুবিধা নেই।

১. কেননা জবাহকৃত পশুর উপর বিস্‌মিল্লাহ পড়া হয়নি।

কেননা, নবী করীম (সা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি যবাহ করার পর বলেছেন ঃ

اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ هٰذِهِ عَنْ اُمَّةِ مُحَمَّدٍ(ص) مِمَّنْ شَهِدَ لَكَ بِالْوَحْدَانِيَّةِ وَلِىْ بِالْبَلاَغِ

হে আল্লাহ! এই কুরবানী কবুল করে নিন উম্মতে মুহাম্মদীর ঐ সমস্ত লোকদের পক্ষ হতে, যারা আপনার একত্ববাদের প্রতি সাক্ষ্য প্রদান করেছে এবং সাক্ষ্য প্রদান করেছে আমার ব্যাপারে যে, আমি আমার দায়িত্ব যথাযথভাবে পৌছে দিয়েছি। যবাহ এর সময় আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করার ক্ষেত্রে শর্ত হলো আল্লাহর নাম খালিসভাবে স্মরণ করতে হবে এবং তার নিজের চাওয়া-পাওয়া হতে মুক্ত হতে হবে। যেমন হযরত ইবন মাসউদ (রা) বলেছেন ঃ جَرِّدُوا التَّسْمِيَةَ – তোমরা সবকিছু থেকে মুক্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করবে।

সুতরাং কেউ যদি যবাহ করার সময় বলে ঃ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ (হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করে দিন) তবে যবাহকৃত পশু হালাল হবে না। কেননা এটি হচ্ছে দু'আ এবং প্রার্থনা।

পক্ষান্তরে কেউ যদি আল্লাহ্র নাম উচ্চাণ করার নিয়তে বলে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ অথবা سُبْحَانَ اللّٰهِ বলে, তবে যবাহকৃত পশু হালাল হয়ে যাবে। কেউ যদি যবাহ করার সময় হাঁচি দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ্ বলে, তবে দুটি বর্ণনার মধ্যে বিশুদ্ধতর বর্ণনা মুতাবিক যবাহকৃত পশু হালাল হবে না। কেননা সে এর দ্বারা আল্লাহর নি'আমতের উপর আল্হামদু লিল্লাহ্ বলার ইচ্ছা করেছে, আল্লাহর নাম উচ্চারণ করার ইচ্ছা করে নি।

সাধারণত: যবাহ করার সময় মানুষ যে দু'আটি পাঠ করে তা হচ্ছে ঃ بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ মহান আল্লাহর বাণী : فَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ (সুতরাং শারিবদ্ধভাবে দন্ডায়মান অবস্থায় এদের উপর তোমরা আল্লাহ্র নাম উচ্চারণ করবে। (২২: ৩৬)- এর ব্যাখ্যায় হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) হতে এটি বর্ণিত রয়েছে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন : গলা এবং সীনার মাঝামাঝি স্থানে যবাহ করা বাঞ্ছনীয়। 'জামে সগীর' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, গলার মাঝে, উপরিভাগে এবং নীচে যে কোন স্থানে যবাহ করা জাইয। এতে কোন অসুবিধা নেই। এ সম্বন্ধে মূল দলীল হলো : রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর নিম্নোক্ত বাণী : اَلزَّكَاةُ مَا بَيْنَ اللَّبَّةِ وَاللَّحْيَيْنِ-

সীনা এবং দুই চিবুকের মধ্যবর্তী স্থানে যবাহ করতে হবে।

কেননা, গলা হলো নালী এবং রগ সমূহের সংযোগস্থল। এ সংযোগস্থানে যদি যবাহ্ এর কাজ করা হয় তবে রক্তক্ষরণ হবে পূর্ণাঙ্গ ভাবে। অতএব– গলার সব জায়গা দিয়েই যবাহ্ করা সমান, এতে কোন ব্যবধান নেই।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন : যবাহ এর মধ্যে যে সব রগ কর্তন করা জরুরী, তা চারটি : (১) কণ্ঠনালী (২) খাদ্য নালী (৩,৪) ওয়াদজান (দুই পাশের দুটি মোটা

রগ)। কেননা, নবী করীম (সা) ইরশাদ করেন : اَفْرِالْاَوْدَاجَ بِمَا شِئْتَ- যে কোন জিনিস দ্বারা চাবে, তুমি রগগুলো কেটে দেবে। উল্লেখ্য যে, الاوداج শব্দটি اسم جمع এর নিম্নতম সংখ্যা হচ্ছে তিনটি। কাজেই খাদ্য নালী এবং ওয়াদজান (দু'টি মোটা রগ) এতে শামিল হবে। এ হাদীসটি ইমাম শাফিঈ (র) এর বিপক্ষে দলীল। তাঁর মতে যবাহ সহীহ হওয়ার জন্য কণ্ঠ নালী এবং খাদ্য নালী কর্তন করাই যথেষ্ট। আর (হানাফীদের মতে যে তিনটি রগ কাটা দরকার) সে তিনটি কণ্ঠ নালী কর্তন করা ছাড়া সম্ভব নয়। অতএব কণ্ঠ নালী কর্তন করার বিষয়টি উক্ত হাদীসের اقْتِضَاءُ النَّصِّ বা হাদীসের শব্দ ভাষ্যের চাহিদা দ্বারা প্রমাণিত হয়ে যায়। আর আমরা যে হাদীসটি উল্লেখ করেছি এর বাহ্যিক ইবারতকে ইমাম মালিক (র) দলীল হিসাবে পেশ করেন। তাঁর মতে এর অধিকাংশগুলো কর্তন করলেই যবাহ জাইয (শুদ্ধ) হবে না, বরং সবগুলোই কর্তন করা শর্ত।

আমাদের (হানাফীদের) মতে যদি সব গুলো রগ কাটা হয়,তবে যবাহকৃত পশু ভক্ষণ করা হালাল বলে গণ্য হবে। আর যদি অধিকাংশগুলো কাটা হয়, তবে এ ক্ষেত্রেও ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে অনুরূপ হুকুম হবে। কিন্তু সাহেবাইনের মতে কণ্ঠনালী, খাদ্যনালী এবং ওয়াদজানের (মোটা দুটি রগের) যে কোন একটি কর্তন করা আবশ্যক।

গ্রন্থকার বলেন : ইমাম কুদূরী (র) তৎপ্রণীত 'মুখতাসারুল' কুদূরী গ্রন্থে ইমামগণের মতভেদ এভাবেই বর্ণনা করেছেন। তবে আমাদের মাশায়িখে কিরামের কিতাব সমূহের মশহুর বর্ণনা মতে এটি হচ্ছে শুধুমাত্র ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর অভিমত।

ইমাম মুহাম্মদ (র) 'জামে সগীর' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, যদি কণ্ঠনালীর অর্ধেক এবং আওদাজ এর অর্ধেক কর্তন করা হয়, তবে ঐ পশু খাওয়া যাবে না। অথবা পশুটি মারা যাওয়ার আগেই যদি কণ্ঠনালী এবং আওদাজের অধিক পরিমাণ অংশ কেটে দেওয়া হয়, তবে তা খাওয়া যাবে। এ ক্ষেত্রে তিনি কোন মতভেদের কথা উল্লেখ করেন নি। অথচ এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরণের বর্ণনা রয়েছে।

মোদ্দা কথা হলো : ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে যে কোন তিনটি রগ কাটা হলে যবাহকৃত পশুটি খাওয়া হালাল হবে। ইমাম আবু ইউসুফ (র) প্রথম দিকে এ কথাই বলতেন। এরপর আমরা যে অভিমতটি এখানে উল্লেখ করেছি, এর প্রতি তিনি ফিরে গিয়েছেন। আর ইমাম মুহাম্মদ (র) এর মতে প্রতিটি রগের অধিকাংশ কর্তন করা আবশ্যক। এটি ইমাম আবু হানীফা (র) এর একটি বর্ণনাও বটে। কেননা, প্রতিটি রগ যেহেতু পৃথক ও আলাদা, তাই এগুলোর প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র অঙ্গ হিসাবে গণ্য হবে। অধিকন্তু হাদীসে প্রতিটি রগ কর্তন করার হুকুম দেওয়া হয়েছে। কাজেই প্রতিটি রগের অধিকাংশ কর্তন করার বিষয়টিই ধর্তব্য হবে। ইমাম আবু ইউসুফ (র) যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন, এর যুক্তি হলো : ঘাড়ের মোটা রগ দু'টি কর্তন করা দ্বারা উদ্দেশ্য হল,

রক্ত প্রবাহিত করা। সুতরাং ওয়াদজান তথা মোটা রগ দু'টোর একটি অপরটির স্থলাভিষিক্ত হতে পারবে। কেননা, এ দুয়ের প্রত্যেকটিই রক্ত প্রবাহিত হওয়ার স্থান। (অতএব এদুয়ের যে কোন একটি কর্তন করাই যথেষ্ট।) আর হলকুম (حُلْقُوْم) ও মারী (مَرِىْ) হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন নালী। কেননা, হলকুম হলো খাদ্য নালী –এর দ্বারা খাদ্য ও পানীর গ্রহণ করা হয়। আর মারী হলো– শ্বাস নালী,[১] কাজেই উভয়টি কর্তন করা আবশ্যক।

ইমাম আবু হানীফা (র) এর বক্তব্যের যুক্তি হলো : বহু হুকুম–আহকামের ক্ষেত্রে اَكْثَرُ (অধিকাংশ) كُلْ (পূর্ণ অঙ্গ) এর স্থলাভিষিক্ত ধরা হয়ে থাকে। কাজেই এই চারটি রগের যে তিনটি কর্তন করা হোক না কেন, এতে اَكْثَرُ (অধিকাংশ) কর্তন হয়েছে বলে ধর্তব্য হবে।

আর পশু যবাহ করার দ্বারা যা উদ্দেশ্য, তা এই তিনটি কর্তন করার দ্বারাই হাসিল হয়ে যায়। কেননা, পশু যবাহ করার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো : প্রবাহিত রক্তকে বের করে দেওয়া। কেননা, শ্বাসনালী এবং খাদ্যনালী কর্তনের পর আর কোন পশু জীবিত থাকতে পারে না। আর ঘাড়ের মোটা রগ দুটোর কোন একটি কর্তন করা দ্বারাই প্রবাহিত রক্ত সব বের হয়ে যায়। অতএব যবাহ এর ক্ষেত্রে তিনটি রগ কাটাই যথেষ্ট। তাহলে পশুকে অধিক কষ্ট দেওয়া হতেও বাঁচা যাবে।

পক্ষান্তরে যদি (ঐ চারটি রগের) অর্ধেক কাটা হয়, (তবে এতে যবাহকৃত পশু হালাল হবে না।) কেননা, এখানো অধিকাংশ রগ অকর্তিত রয়ে গেছে। কাজেই, সে যেন কিছুই কর্তন করেনি। সর্তকতা বশত হারাম হওয়ার দিকটিকে প্রধান্য দেওয়ার জন্য এ হুকুম প্রদান করা হয়েছে।

ইমাম মুহাম্মদ (র) 'জামে সগীর' গ্রন্থে বলেন : নখ, দাঁত এবং শিং দ্বারা যবাহ করা জাইয– যদি এগুলো শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকে। কাজেই এগুলোর দ্বারা যবাহ করার পর সে পশু খাওয়াতে কোন দোষ নেই। অবশ্য এভাবে যবাহ করা মাকরূহ।

পক্ষান্তরে ইমাম শাফিঈ (র) বলেন : এসবের দ্বারা যদি কোন পশু যবাহ করা হয়, তাহলে যবাহকৃত পশু মৃত পশু বলে গণ্য হবে। কেননা, নবী করীম (সা) ইরশাদ করেছেন :

كُلْ مَا اَنْهَرَ الدَّمَ وَاَفْرَى الْاَوْدَاجَ مَاخَلاَ الظُّفُرَ وَالسِّنَّ فَاِنَّهُمَا مَدَى الْحَبْشَةِ ـ

অর্থাৎ যে জিনিষ রক্ত প্রবাহিত করে এবং যা রগগুলোকে কেটে দেয়, সে জিনিষের দ্বারা যবাহ কৃত পশু খাও। তবে নখ ও দাঁত দিয়ে নয়। কেননা, এ হলো : হাবশীদের ছুরি। (বুখারী– ২য় খন্ড)।

---

১. এখানে হলকুমকে খাদ্যনালী এবং মারীকে কণ্ঠনালী বলা হয়েছে। অথচ বিষয়টি সম্পূর্ণ উল্টো। কেননা, হলকুম হল কণ্ঠনালী এবং মারী হল খাদ্য নালী।

অধিকন্তু এটি (নখ, দাঁত ইত্যাদি দ্বারা যবাহ করা) হচ্ছে শরী'আত অ-সমর্থিত কাজ। সুতরাং এর দ্বারা যবাহ জাইয হবে না। যেমন- অনুৎপাটিত তথা শরীরের সাথে লাগানো নখ ইত্যাদি দ্বারা যবাহ করা হলে (যবাহ জাইয হয় না)।

আর আমাদের দলীল হলো : রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর নিম্নোক্ত বাণী : اَنْهِرِ الدَّمَ بِمَا شِئْتَ – যে কোন জিনিষের দ্বারা ইচ্ছা রক্ত প্রবাহিত করে দাও। অপর এক বর্ণনায় রয়েছে : اَفْرِ الْاَوْدَاجَ بِمَا شِئْتَ – রগগুলোকে যে কোন জিনিসের দ্বারা চাও কেটে দাও।

বস্তুত ইমাম শাফিঈ (র) যে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, তা শরীরের সাথে সংযুক্ত ও অনুৎপাটিত নখ ইত্যাদির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কেননা, হাবশী লোকেরা তাই করতো।আমাদের যৌক্তিক দলীল হলো : উপরোক্ত জিনিসগুলো হচ্ছে- ক্ষতকারী অস্ত্র। কাজেই এগুলোর দ্বারা উদ্দেশ্য তথা রক্ত প্রবাহিত করা হাসিল হবে। এই হিসাবে নখ ইত্যাদি পাথর-ও লোহার ন্যায় হয়ে গেছে।১ তবে যে নখ বা দাঁত শরীরের সাথে সংযুক্ত, উৎপাটিত নয়, এর হুকুম ভিন্নতর। কেননা, এ অবস্থায় প্রকৃতপক্ষে যবাহকারী ব্যক্তি নিজের ভারিক্কি দ্বারাই যবাহ করে থাকে। কাজেই এটি অর্থগত দিক থেকে শ্বাসরোধ মৃত জন্তুর হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে। তবে উৎপাটিত নখ ইত্যাদি দ্বারা যবাহ করা মাকরূহ। কেননা, এতে মানুষ-অঙ্গ ব্যবহার করা হয়২। অধিকন্তু এতে জীবের প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করা হয়। অথচ জীবের প্রতি ইহ্সান (অনুগ্রহ) করার জন্য আমাদেরকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন : নারিকেলের ধারালো খোল, ধারালো পাথর এবং রক্ত প্রবাহিত করার মত সর্বপ্রকার বস্তু দ্বারা যবাহ করা জাইয। তবে শরীরের সাথে লাগানো, স্বস্থানে বহাল দাঁত ও নখ দ্বারা যবাহ করা জাইয নয়।

কেননা, এগুলোর দ্বারা যবাহকৃত পশু মৃত জন্তু হিসাবে গণ্য। এর কারণ আমরা পূর্বেই বর্ণনা করেছি। ইমাম মুহাম্মদ (র) 'জামে সগীর' গ্রন্থে পরিস্কার ভাবে বর্ণনা করেছেন যে, এ পশু মৃত বলে গণ্য হবে। এ ব্যাপারে তিনি নিশ্চয়ই কোন না কোন হাদীস পেয়েছেন। আর যেখানে তিনি কোন হাদীস পাননি, সেখানে তিনি সতর্কতা অবলম্বন করতেন। তিনি হালাল বস্তুর ক্ষেত্রে বলতেন : لَابَاْسَ بِهٖ-এতে কোন অসুবিধা নেই)। আর হারাম বস্তুর ক্ষেত্রে বলতেন : يُكْرَهُ (এটি মাকরূহ) অথবা বলতেন : لَمْ يُؤْكَلْ -(এটি খাওয়া যাবেনা।) **ইমাম কুদূরী (র) বলেন : যবাহকারী ব্যক্তির জন্য মুস্তাহাব হলো : তার ছুরিটি ধার দিয়ে নেওয়া।** কেননা, নবী করীম (সা) ইরশাদ করেছেন :

---

১. অর্থাৎ পাথর ও লোহার দ্বারা যেমন যবাহ করা জাইয, অনুরূপভাবে নখ ইত্যাদি দ্বারাও যবাহ করা জাইয।
২. আর এতে মানব জাতির প্রতি অসম্মান প্রদর্শিত হয়। অথচ মানুষ হচ্ছে আশরাফুল মাখলূকাত।

اِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ الْاِحْسَانَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ فَاِذَا قَتَلْتُمْ فَاَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَاِذَا ذَبَحْتُمْ فَاَحْسِنُوْا الذِّبْحَةَ وَلْيُحِدَّ اَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيْحَتَهُ ـ

আল্লাহ্ তাআলা সমস্ত কিছুর প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করা তোমাদের উপর ফরয করে দিয়েছেন। সুতরাং তোমরা যখন হত্যা করবে তখন ভালভাবে হত্যা করবে এবং তোমরা যখন যবাহ করবে, তখন উত্তম রূপে যবাহ করবে। এ সময় তোমাদের প্রত্যেকেই যেন নিজ নিজ ছুরি ধার দিয়ে নেয় এবং যবাহকৃত পশুকে আরাম দেয়। পশু শোয়ানোর পর ছুরি ধার দেওয়া মাক্রূহ। কেননা, নবী করীম (সা) থেকে বর্ণিত আছে : একদা তিনি এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে, সে বকরীকে শোয়ানোর পর ছুরি ধার করছে। এ দেখে তিনি তাকে বললেন : তুমি তো এটিকে দুইবার মারতে সংকল্প করেছো। বকরীটি শোয়ানোর পুর্বেই ছুরিটি ধার দিয়ে নিলে না কেন?

ইমাম কুদূরী (র) বলেন : কেউ যদি মজ্জা পর্যন্ত ছুরি পৌছায়ে দেয় অথবা মাথা সহ কেটে (আলাদা করে) ফেলে, তবে তা মাক্রূহ হবে। কিন্তু (তা সত্বেও) যবাহকৃত পশুটি খাওয়া যাবে। কুদূরীর কোন কোন সংস্করণে بَلَغَ (পৌছিয়ে দেয়) এর পরিবর্তে قَطَعَ (কেটে ফেলে) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কিতাবে نُخَاعٌ (নুখা) বলে ঘাড়ের অস্থিতে বিদ্যামন একটি সাদা রগকে বুঝানো হয়েছে।

এভাবে যবাহ কৃত পশু মাক্রূহ। কেননা, নবী করীম (সা) থেকে বর্ণিত আছে যে, اَنَّهُ نَهٰى اَنْ تُنْخَعَ الشَّاةُ اِذَا ذُبِحَتْ –তিনি বকরী যবাহ করার সময় نُخَاعٌ তথা অস্থিতে বিদ্যমান সাদা রগ পর্যন্ত পৌছতে নিষেধ করেছেন। আর নবী করীম (সা) এর বক্তব্যের ব্যাখ্যা তো তাই, যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। কিন্তু কেউ কেউ বলেন : نُخَاعٌ (নুখা) অর্থ হলো : পশুর মাথা এমন ভাবে টেনে ধরা, যাতে যবাহ– এর স্থান স্পষ্ট হয়ে যায়। আবার অপরাপর ফকীহগণ বলেন : নুখা অর্থ হলো : যবাহ কৃত পশুর নড়াচড়া বন্ধ হওয়ার আগেই এর ঘাড় ভেঙ্গে দেওয়া। উপরোক্ত সবগুলো কাজই মাক্রূহ। কেননা, উপরোক্ত বিষয় সমূহের দ্বারা এবং পশুর মাথা কর্তন করা দ্বারা পশুকে বিনা লাভে কষ্ট দেওয়া হয়। অথচ পশুকে কষ্ট দেওয়া নিষিদ্ধ।

মোদ্দা কথা হচ্ছে, যে কাজে পশুর অধিক কষ্ট হয়, অথচ যবাহ এর জন্য এটি নিঃস্প্রয়োজন, যবাহ এর ক্ষেত্রে এ জাতীয় কাজ হচ্ছে মাক্রূহ।

অনুরূপভাবে যে বকরীটি যবাহ করার সংকল্প করা হয়েছে, সেটিকে ধরে টেনে যবাহ এর স্থানে নিয়ে যাওয়া মাকরূহ। এমনি ভাবে পশুর নড়াচড়া বন্ধ হয়ে তা সম্পূর্ণ ঠাণ্ডা হওয়ার পূর্বে এর ঘাড় ভেঙ্গে দেওয়া মাক্রূহ। অবশ্য ঠাণ্ডা হওয়ার পর যেহেতু কোন কষ্ট হয় না, এ কারণে এ অবস্থায় ঘাড় ভাঙ্গা ও চামড়া টেনে ছিলা মাক্রূহ হবে না। উল্লেখ্য যে, এ মাক্রূহ হওয়া যেহেতু অতিরিক্ত অন্য একটি কারণে, আর তা

হলো : যবাহ এর আগে বা পরে পশুকে অতিরিক্ত কষ্ট দেওয়া। কাজেই এতে হারাম সাব্যস্ত হবে না। এ কারণেই ইমাম কুদূরী (র) বলেছেন : এভাবে কোন পশু যবাহ করা হলে তা খাওয়া যাবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন : কেউ যদি বকরী গর্দানের দিক থেকে যবাহ করে এবং তা জীবিত থাকে, এ অবস্থায় যদি সবগুলো রগই কেটে দেওয়া হয়– তাহলে পশুটি হালাল বলে গণ্য হবে– শরয়ী যবাহ এর মাধ্যমে মৃত্যু সংঘটিত হওয়ায়। তবে তা মাক্‌রূহ হবে। কেননা, এভাবে যবাহ করা হলে বিনা প্রয়োজনে পশুকে কষ্ট দেওয়া হয়। কাজেই এটি এমন হলো : যেন পশুটিকে প্রথমে যখম করা হলো, তারপর এর রগ সমূহ কর্তন করা হল। আর যদি রগসমূহ কর্তন করার আগেই পশুটি মারা যায়, তবে তা খাওয়া যাবে না, যে কাজটি শরী'আতে যবাহ হিসাবে স্বীকৃত নয়, এর মাধ্যমে পশুটির মৃত্যু সংঘটিত হওয়ার কারণে।

ইমাম কুদুরী (র) বলেন : কোন শিকার পশু যদি পোষ মেনে নেয়, তবে তা হালাল হবে যহাহ এর মাধ্যমে। আর কোন গৃহপালিত পশু যদি বন্য পশুতে পরিণত হয়ে যায়, তবে তা হালাল হবে কর্তন ও ক্ষত করার মাধ্যমে[১]।

কেননা, ইখতিরারী বা অনুপায় যবাহ করা তখনই অবলম্বন করা হবে, যদি ইয্‌তিয়ারী যবাহ করতে অপারগতা প্রতীয়ামন হয়। যেমন পূর্বেও এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। শেষোক্ত অবস্থায় অপারগতা প্রতীয়মান হয়, প্রথমোক্ত অবস্থায় অপারগতা প্রতীয় মান হয় না। (কাজেই শেষোক্ত অবস্থায় ইয্‌তিরারী যবাহ প্রযোজ্য হবে।)

অনুরূপভাবে যদি কোন গৃহপালিত পশু কূপে পড়ে যায় এবং ইখতিয়ারী যবাহ করতে অপারগ হয় (তবে এ ক্ষেত্রেও ইখতিয়ারী যবাহ প্রযোজ্য হবে।) এর কারণ আমরা পূর্বেই বর্ণনা করেছি।

ইমাম মালিক (র) বলেন : উপরোক্ত দুই অবস্থার কোন অবস্থাতেই ইযতিরারী যবাহ এর দ্বারা পশুটি হালাল হবে না। কেননা, এমনটি হওয়া বিরল এবং দুর্লভ বিষয়।

আর আমাদের বক্তব্য হলো : প্রকৃতপক্ষে অপারগ হওয়াই এ ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয় এবং তা প্রমাণিত হয়েছে। কাজেই, বিকল্পের দিকেই ফিরে যেতে হবে, তা যেভাবেই হোক না কেন। আর এটিকে যে বিরল ঘটনা বলা হয়েছে, তাও আমরা স্বীকার করি না বরং এটি ব্যাপক ঘটমান একটি বিষয়।

কুদূরী গ্রন্থে গৃহপালিত পশুর বন্য হয়ে যাওয়ার কথাটি (مُطْلَقًا) অর্থাৎ ব্যাপক অর্থে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (র) হতে বর্ণিত আছে যে, গৃহপালিত বকরী যদি মাঠে ময়দানে পালিয়ে যায় এবং বন্য পশুর ন্যায় হয়ে যায়, তবে তা হালাল হবে যখম করার মাধ্যমে। আর যদি শহরের মধ্যে সেটি পালিয়ে বন্য হয়ে যায়, তবে যখম করার দ্বারা তা হালাল হবে না।

---

১. অর্থাৎ গৃহপালিত পশু যদি বন্য পশুতে পরিণত হয়, তবে এ ক্ষেত্রে ইয্‌তিরারী যবাহ প্রযোজ্য হবে। আর বন্য পশু যদি পোষ মেনে নেয়, তবে এ ক্ষেত্রে ইখ্‌তিয়ারী যবাহ প্রযোজ্য হবে।

কেননা, এ অবস্থায় বকরী নিজেকে রক্ষা করতে পারবে না, বরং তাকে শহরের মধ্যেই ধরে ফেলা সম্ভব হবে। কাজেই এ ক্ষেত্রে অপারগতা প্রতীয়মান হয় না। আর গরু ও উটের ক্ষেত্রে শহর ও মাঠ উভয়ই হচ্ছে সমান। কেননা, তারা নিজেদেরকে রক্ষা করতে সক্ষম। কারো পক্ষেই তাদেরকে ধরা সম্ভব নয়। যদিও তারা শহরের মধ্যে পালিয়ে এভাবে বন্য পশুর ন্যায় হয়ে যায়। সুতরাং গরু ও উটের ক্ষেত্রে অপারগতা সুপ্রমাণিত। হামলা করাও পালিয়ে বন্য পশুতে পরিণত হওয়ার মতই; যদি কেউ তাকে ধরে ফেলতে সক্ষম না হয়। সুতরাং যার উপর হামলা করা হয়েছে সে যদি যবাহ এর ইচ্ছায় ঐ পশুটিকে হত্যা করে, তাহলে সেটি খাওয়া হালাল হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন : উটের ক্ষেত্রে নহর (نَحْر) মুস্তাহাব। অবশ্য যদি তা যবাহ করা হয় তবুও জাইয হবে; কিন্তু মাকরূহ হবে। আর গরু ও বকরীর ক্ষেত্রে যবাহ মুস্তাহাব। যদি এগুলোকে নহর করা হয় তবে জাইয হবে; কিন্তু মাক্রূহ হবে। [১]

উটের ক্ষেত্রে নহর এবং গরু ও বকরীর ক্ষেত্রে যবাহ মুস্তাহাব হলো এ কারণে যে, তা প্রচলিত সুন্নত অনুরূপ। অধিকন্তু উটের নহরের স্থলে এবং গরু ও বকরীর যবাহ এর স্থলেই রগগুলো একত্রিত থাকে। আর মাক্রূহ হবে সুন্নাতের বিপরীত করার কারণে। আর মাক্রূহ হওয়ার হুকুম এমন একটি কারণে প্রদান করা হয়েছে, যা যবাহ এর অন্তর্ভুক্ত কোন বিষয় নয়। কাজেই এতে বৈধতা ও হালাল হওয়ার ক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবে না। পক্ষান্তরে ইমাম মালিক (র) এর বক্তব্য এর থেকে ব্যতিক্রম। তার মতে এভাবে যবাহ করলে পশুটি খাওয়া হালাল হবে না।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন : কেউ উট নহর করা বা গরু যবাহ করার পর যদি এর পেটের ভেতর মৃত বাচ্চা পায়, তবে তা খাওয়া যাবে না; চাই তাতে পশম উঠুক বা না উঠুক। এটি ইমাম আবু হানীফা (র) এর অভিমত। ইমাম যুফার এবং ইমাম হাসান ইবন্ যিয়াদ (র)-ও অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন : যদি বাচ্চাটির গঠন আকৃতি পূর্ণ হয়ে যায়,তবে তা খাওয়া যাবে। এটি ইমাম শাফিঈ (র) এরও অভিমত। সাহেবাইন এবং ইমাম শাফিঈ (র) এর দলীল হলো : রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন : زَكَاةُ الْجَنِيْنِ زَكَاةُ اُمِّهٖ। –বাচ্চার মায়ের যবাহই বাচ্চার যবাহ এর জন্য যথেষ্ট।

অধিকন্তু বাচ্চাটি তো প্রকৃত পক্ষে তার মায়েরই অংশ বিশেষ। কেননা, এটি তো তার মায়ের সাথেই মিলিত আছে। এ কারণেই একে আলাদা করতে হলে কাঁচি দ্বারা কেটে আলাদা করতে হয়, মায়ের খাদ্য থেকেই সে খাদ্য-প্রাপ্ত হয় এবং মায়ের শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণের মাধ্যমে সেও শ্বাস- প্রশ্বাস গ্রহণ করে থাকে। অনুরূপভাবে হুকুমের দিক থেকেও এটি তার মায়েরই অংশ বিশেষ। এ কারণেই মায়ের ব্যাপারে সংঘটিত

১. গর্দানের নিম্নভাগে বক্ষস্থিত রগসমূহ কর্তন করাকে নহর বলা হয়। আর সীনা ও চিবুকের মধ্যস্থিত স্থানের রগ সমূহ কর্তন করাকে যবাহ বলা হয়।

বেচা-কেনাতে এটিও শামিল হয়ে যায় এবং মাকে আযাদ করা হলে এটিও আযাদ হয়ে যায়। মোদ্দা কথা হচ্ছে., বাচ্চাটি যেহেতু তার মায়েরই অংশ বিশেষ, কাজেই বাচ্চাটিকে যবাহ করা অপারগ হওয়া অবস্থায় এর মায়ের শরীরে যখম করাই তার যবাহ এর জন্য যথেষ্ট হবে, যেমন শিকার পশুর ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। আর ইমাম আবু হানীফা (র) এর দলীল হলো : বাচ্চাটির হায়াত (জীবন) হচ্ছে স্বতন্ত্র হায়াত। একারণেই তার মা মারা যাওয়ার পরও তার জীবিত থাকার কল্পনা করা যায়। (বরং বাস্তবেও এমনটি দেখা যায়।) কাজেই বাচ্চাটিকেও স্বতন্ত্রভাবে যবাহ করতে হবে। আর এ কারণেই দাস-দাসী দেওয়া ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে এটি স্বতন্ত্র হিসাবে গণ্য হয়ে থাকে। আযাদ করার বিষয়টিকে এর দিকে সম্বোধন (نِسْبَتْ) করা হলে তা আযাদ হয়ে যায় এবং এর অনুকূলে বা এর ব্যাপারে অসিয়ত করা সহীহ্ হয়।[১] অধিকন্তু এটি হচ্ছে এমন একটি প্রাণী, যার ধমনীতে সদা রক্ত প্রবাহিত। আর যবাহ এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো রক্ত ও গোশ্ত আলাদা করা। এটি মায়ের শরীরে যখম করা দ্বারা হাসিল হবে না। কেননা, মায়ের শরীরে যখম করার কারণে বাচ্চার শরীর থেকে রক্ত বের হয়ে যাবে না। অতএব রক্ত প্রবাহের ব্যাপারে বাচ্চাকে মায়ের সংশ্লিষ্ট বলে সাব্যস্ত করা যাবে না।

পক্ষান্তরে শিকার পশুতে যখম করার বিষয়টি এর থেকে ব্যতিক্রম। কেননা, এ যখমের দ্বারাও শিকার পশু থেকে রক্ত বের হয়ে যায় (তবে তা পূর্ণাঙ্গ ভাবে নয়, বরং) অপূর্ণাঙ্গ ভাবে। অতএব ওযরের সময় এটিকে (পূর্ণাঙ্গের) স্থলাভিষিক্ত করা হবে। আর ক্রয়-বিক্রয়ে বাচ্চাটির অন্তর্ভুক্তির হুকুম ক্রয়-বিক্রয়কে বৈধ করার জন্যই প্রদান করা হয়েছে, যাতে বাচ্চাটিকে বিক্রি থেকে বাদ দেওয়ার কারণে ক্রয়-বিক্রয় ফাসিদ না হয়ে যায়। এমনিভাবে বাচ্চার মাকে আযাদ করার সাথে সাথে বাচ্চাটিও আযাদ হয়ে যাবে বলে যে হুকুম প্রদান করা হয়েছে, তা এ কারণে, যাতে আযাদ নারী থেকে গোলাম সন্তান ভূমিষ্ঠ না হয়।

পরিচ্ছেদ ঃ যে সব পশু খাওয়া হালাল এবং যে সব পশু খাওয়া হালাল নয় সে প্রসংগে

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ দাঁত বিশিষ্ট হিংস্র প্রাণী এবং পাঞ্জা বিশিষ্ট হিংস্র পাখি খাওয়া জাইয নেই।[২] কেননা, নবী করীম পাঞ্জা বিশিষ্ট সর্বপ্রকার হিংস্র প্রাণী

---

১. যেমন দুই মহিলা পরস্পর ঝগড়া করে একজন আরেক জনের পেটে লাথি মারলো। আর এ লাথিতে মহিলার পেটের বাচ্চাটি মরে গেল। তাহলে যে মহিলা লাথি মেরেছে তার উপর غُرَّةٌ অর্থাৎ একটি গোলাম বা একটি দাসী দেওয়া ওয়াজিব হবে। শুধু বাচ্চার কারণে غُرَّةٌ ওয়াজিব হওয়াতে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, এর জীবন হচ্ছে স্বতন্ত্র। এমনি ভাবে মনীব যদি দাসীর পেটের বাচ্চা সম্বন্ধে বলে যে, সে আযাদ, তবে সে আযাদ হয়ে যাবে। এটিও তার স্বতন্ত্র হওয়ার দলীল। কেউ যদি পেটের বাচ্চা সম্বন্ধে বলে যে, তাকে আমার মাল থেকে এ পরিমাণ মাল দেওয়ার জন্য আমি অসিয়ত করলাম, তবে তা সহীহ হবে। এমনিভাবে কেউ যদি তার গাভীর বাচ্চার ব্যাপারে বলে যে, এটি আমি অমুককে হাদিয়া দেওয়ার জন্য অসিয়ত করলাম, তবে এ অসিয়তও সহীহ হবে। এতেও প্রমাণিত হয় যে, বাচ্চার জীবন হচ্ছে স্বতন্ত্র জীবন। কাজেই এটিকে পৃথকভাবেই যবাহ করতে হবে।

২ অর্থাৎ যে সব হিংস্র প্রাণী দাঁত দিয়ে কামড়িয়ে শিকার করে এবং যে সব হিংস্র পাখী পাঞ্জা ও থাবা দিয়ে শিকার করে, তা খাওয়া জাইয নয়।

এবং দাঁত বিশিষ্ট সর্বপ্রকার হিংস্র প্রাণী খেতে নিষেধ করেছেন। উপরোক্ত হাদীসে উভয় প্রকার প্রাণীর পরই اَلسِّبَاعُ বা হিংস্র শব্দ যুক্ত রয়েছে। কাজেই এটি উভয়ের সাথে সংযুক্ত হবে এবং হিংস্র প্রাণী ও হিংস্র পাখি উভয়ই এর মধ্যে শামিল হবে। পক্ষান্তরে, যে পাখি পাঞ্জা বিশিষ্ট, কিন্তু হিংস্র নয় এবং যে প্রাণী দাঁত বিশিষ্ট, কিন্তু হিংস্র নয়, তা এতে শামিল হবে না। উল্লেখ্য যে, اَلسِّبَاعُ বা হিংস্র ঐ প্রাণীকে বলা হয়, যা সাধারণত: কোন কিছু থাবা দিয়ে নিয়ে যায়, হামলা করে, যখম করে, হত্যা করে। শায়খ বুরহান উদ্দীন (র) বলেন : উপরোক্ত পশু-পাখী সমূহকে হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে আদম সন্তানের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের লক্ষ্যে, আল্লাহই সম্যক অবহিত, যাতে এ সব হিংস্র পাখী ও প্রাণী ভক্ষণ করার কারণে এগুলোর মন্দ স্বভাব মানুষের মধ্যে সংক্রমিত না হয়। হিংস্র প্রাণীর মধ্যে গণ্ডার এবং খেকশিয়ালও অন্তর্ভুক্ত। কাজেই এ হাদীস ইমাম শাফিঈ (র) এর বিপক্ষে আমাদের দলীল। তাঁর মতে এগুলো হল মুবাহ প্রাণী। হাতিও দাঁত বিশিষ্ট প্রাণী, কাজেই হাঁতি খাওয়া মাক্রূহ। জংলী ইঁদুর ও বেজিও হিংস্রপ্রাণী তবে এগুলো মাটিতে গর্ত খুঁড়ে বসবাস করে, এগুলো খাওয়া হারাম। ফকীহগণ মানুষ খেকো পাখি এবং শকুনী খাওয়াকে মাক্রূহ বলেছেন। কেননা, এগুলো মৃত জিনিস খায়।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন : যে কাক কেবলমাত্র শস্যদানা খায়, তা ভক্ষণ করাতে কোন অসুবিধা নেই। কেননা, এগুলো মরা লাশ খায় না এবং এগুলো হিংস্র পাখির অন্তর্ভুক্ত নয়।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন: আবকা' তথা কাল-সাদা মিশ্রিত রঙ এর কাক, যা মরা লাশ খায়, তা ভক্ষণ করা যাবে না। গিদাফ[১] (غُدَافٌ) এর হুকুমও অনুরূপই।

ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন : 'আক'আক (عَقْعَقٌ) (কবুতরের সমান কাকের ন্যায় কাল ও সাদা রংগের এক প্রকার পাখি, যার লেজ লম্বা হয়।) **ভক্ষণ করাতে কোন অসুবিধা নেই।** কেননা, এগুলো পাক বস্তুর সাথে নাপাক বস্তুও খায়। সুতরাং এগুলোর অবস্থা মুরগির সাথে সামঞ্জস্যশীল। আর ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে এগুলো খাওয়া মাকরূহ। কেননা, এ জাতীয় প্রাণী অধিকাংশ সময় দুর্গন্ধযুক্ত মরা লাশ ভক্ষণ করে থাকে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন : গণ্ডার, গোসাপ, কচ্ছপ, ভিমরুল এবং সমস্ত কীট পতঙ্গ খাওয়া মাক্রূহ। গণ্ডার খাওয়া মাক্রূহ হওয়ার কারণ তো আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। আর গোসাপ খাওয়া মাকরূহ হওয়ার কারণ হলো :

এ সম্বন্ধে হাদীস উল্লেখ রয়েছে যে,

اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَائِشَةَ حِيْنَ سَاَلَتْهُ عَنْ اَكْلِهٖ

একদা হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) নবী করীম (সা) কে গোসাপ খাওয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করলে, তিনি তাকে তা খেতে নিষেধ করেন। এ হাদীসটি ইমাম শাফিঈ (র) এর বিপক্ষে আমাদের জন্য দলীল। তাঁর মতে গোসাপ খাওয়া মুবাহ।

১. এও এক প্রকারের কাক, যা প্রচন্ড গরমের দিনে দেখা যায়। এর পা খুব মোটা এবং লম্বা হয়। এ জাতীয় কাকও নাপাক জিনিস খায়, তাই এগুলো খাওয়া মাকরূহ।

আর ভিমরুল হলো কষ্টদায়ক কীট-পতঙ্গের অন্তর্ভুক্ত। (এ কারণে ভিমরুল খাওয়া মাকরূহ।) এমনিভাবে কচ্ছপও অপবিত্র এবং খবীস কীট-পতঙ্গের অন্তর্ভুক্ত। (তাই কচ্ছপ খাওয়াও মাকরূহ)। এ কারণেই মুহরিম ব্যক্তি যদি এগুলোর কোন একটি মারে, তবে তার উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। আর সমস্ত কীট-পতঙ্গ মাক্রূহ হওয়ার দলীল হলো : গোসাপ খাওয়া মাক্রূহ। আর গোসাপ কীট-পতঙ্গের অন্তর্ভুক্ত। (কাজেই গোসাপের ন্যায় অন্যান্য কীট-পতঙ্গও মাকরূহ হবে।)

ইমাম কুদূরী (র) বলেন : গৃহপালিত গাধা এবং খচ্চর খাওয়া জাইয নয়। কেননা, হযরত খালিদ ইবন ওয়ালীদ (র) বর্ণনা করেণ যে,

اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ لُحُوْمِ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيْرِ –

নবী করীম (সা) ঘোড়া খচ্চর ও গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন।

অনুরূপভাবে হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে,

اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَهْدَرَ الْمُتْعَةَ وَحَرَّمَ لُحُومَ الْحُمُرِ الْاَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ ٠

নবী করীম (সা) খায়বার যুদ্ধের দিন মুত'আ বিবাহকে বাতিল এবং গৃহপালিত গাধার গোশত খাওয়াকে হারাম ঘোষণা করেন।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন : ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে ঘোড়ার গোশ্ত খাওয়া মাকরূহ। এটি ইমাম মালিক (র) এরও অভিমত। পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইউসুফ., ইমাম মুহাম্মদ এবং ইমাম শাফিঈ (র) বলেন : ঘোড়ার গোশ্ত খাওয়াতে কোন দোষ নেই। কেননা, হযরত জাবির (রা) হতে বর্ণিত আছে যে,

نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْاَهْلِيَّةِ وَاَذِنَ فِىْ لُحُوْمِ الْخَيْلِ يَوْمَ خَيْبَرَ ٠

রাসূলুল্লাহ (সা) খায়বার যুদ্ধের দিন গৃহপালিত গাধার গোশ্ত খেতে নিষেধ করেন এবং তিনি ঘোড়ার গোশ্ত খাওয়ার জন্য অনুমতি প্রদান করেন।

আর ইমাম আবু হানীফা (র) এর দলীল হলো– মহান আল্লাহর বাণী :

وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيْرَ لِتَرْكَبُوْهَا وَزِيْنَةً ٠

তোমাদের আরোহণের জন্য ও শোভার জন্য তিনি সৃষ্টি করেছেন অশ্ব, খচ্চর ও গাধা। (১৬:৮)

এ বক্তব্য আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহ প্রদর্শনের লক্ষ্যে প্রদান করেছেন। আর আহার করা হচ্ছে সর্বোচ্চ লাভের ব্যাপার। কাজেই প্রজ্ঞাবান সত্তা কখনো সর্বোচ্চ নি'আমতের কথা বাদ দিয়ে নিম্ন পর্যায়ের নি'আমতের দ্বারা অনুগ্রহ প্রদর্শন করতে পারেন না।

অধিকন্তু ঘোড়া হচ্ছে শত্রুকে ভীত-সন্ত্রস্ত করার উপকরণ। কাজেই ঘোড়ার প্রতি সম্মান প্রদর্শন হেতু ঘোড়া খাওয়া মাকরূহ হওয়া বাঞ্ছনীয়।[১]

এ কারণেই ঘোড়ার জন্য গনীমতের মালের অংশ প্রদান করা হয়। সর্বোপরি ঘোড়া খাওয়াকে মুবাহ সাব্যস্ত করা হলে যুদ্ধের উপকরণে ঘাটতি সাধন অনিবার্য হয়ে পড়বে। (অথচ কুরআন ও হাদীসে যুদ্ধের উপকরণ বাড়ানোর জন্য হুকুম দেওয়া হয়েছে।)

আর উপরে হযরত জাবির (রা)-এর সূত্রে যে হাদীসটি বর্ণনা করা হয়েছে, তা হযরত খালিদ (রা) এর হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক। এ অবস্থায় হারামের বিধান সম্বলিত হাদীসকেই অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত।

উল্লেখ্য, উপরে যে ঘোড়ার গোশ্‌ত মাকরূহ বলা হয়েছে, কারো কারো মতে এর দ্বারা উদ্দেশ্যে হলো একথা বুঝানো যে, ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে ঘোড়ার গোশ্‌ত খাওয়া মাকরূহ তাহরিমী। কেউ কেউ বলেন ঃ মাকরূহ তানযিহী। প্রথমোক্ত অভিমতটি বিশুদ্ধতর। আর ঘোড়ার দুধ সম্বন্ধে কেউ কেউ বলেন যে,ঘোড়ার দুধ পান করাতে কোন দোষ নেই। কেননা, এতে জিহাদের উপকরণে ঘাটতি সাধন করা অনিবার্য হয় না।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ খরগোশের গোশ্‌ত খাওয়াতে কোন দোষ নেই। কেননা,খরগোশের ভুনা গোশত নবী করীম (সা)-কে হাদিয়া দেওয়া হলে তিনি তা থেকে আহার করেন এবং সাহাবায়ে কিরামকেও তা থেকে খেতে হুকুম দেন। আর খরগোশ হিংস্র প্রাণীর অন্তর্ভুক্ত নয় এবং তা ঐ সমস্ত জীব জানোয়ারেরও অন্তর্ভুক্ত নয়, যা মরা লাশ ও নাপাক জিনিস খায়। এ হিসাবে এটি হরিণের মত।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ যে সব পশুর গোশ্‌ত খাওয়া জাইয নয়, তা যদি যবাহ করা হয়,তবে তার চামড়া এবং গোশত পাক হয়ে যাবে। কিন্তু মানুষ ও শূকরের বিষয়টি এর থেকে ব্যতিক্রম। কেননা এ দুয়ের মধ্যে যবাহ কোন কার্যকরী প্রভাব ফেলতে পারে না। মানুষের মধ্যে তো প্রভাব ফেলতে পারে না, মানুষের মর্যাদা ও সম্মানের কারণে। আর শূকরের মধ্যে প্রভাব ফেলতে পারে না। সত্তাগত দিক থেকে তা নাপাক হওয়ার কারণে। যেমনিভাবে দাবাগাত বা চামড়া পাকা করার পদ্ধতি দ্বারা এগুলো পাক হয় না।

ইমাম শাফিঈ (র) বলেন ঃ যবাহ উপরোক্ত বিষয়ের কোনটির ক্ষেত্রেই কার্যকরী প্রভাব ফেলতে পারে না। কেননা, যবাহ প্রধানত : গোশত্‌কে হালাল করার ক্ষেত্রে কার্যকরী হয়ে থাকে। আর গোশত ও চামড়াকে পাকা করার ক্ষেত্রে তা কার্যকরী হয়ে থাকে تَبَعًا অর্থাৎ প্রাসঙ্গিক ক্রমে। কাজেই, আসল এবং প্রধান বিষয়ের অনুপস্থিতির অবস্থায় প্রাসঙ্গিক বিষয়ের ক্ষেত্রে তা কখনো কার্যকরী হতে পারে না। সুতরাং এটি (যে সব পশুর গোশত খাওয়া যায় না, তা যবাহ করা) অগ্নিপূজকের যবাহ -এর মত হয়ে যাবে।[২]

---

১. এতে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, ঘোড়া খাওয়া মাকরূহ। যদি তা খাওয়া মাকরূহ না হতো, তবে অবশ্যই তিনি এখানে খাওয়ার কথাও উল্লেখ করতেন।

২. অর্থাৎ অগ্নিপূজকের যবাহ এর দ্বারা যেমনিভাবে পশু হালাল হয় না এবং পশুর গোশ্‌ত ও চামড়া পাক হয় না, এমনিভাবে যে সব পশুর গোশত খাওয়া হালাল নয়, তা যবাহ করা হলে এর দ্বারা এ পশুর গোশত্‌ ও চামড়া পাক হবে না।

আমাদের দলীল হলো ঃ যবাহ কার্যকরী হয় যবাহকৃত পশুর শরীর থেকে আর্দ্রতা ও প্রবাহিত রক্ত দূরীকরণের ক্ষেত্রে এবং এগুলোই হলো মূল নাপাক বস্তু, চামড়া এবং গোশ্‌তের জাত নয়। অতএব আর্দ্রতা দূরীভূত হয়ে যাওয়ার পর গোশত অবশ্যই পাক হয়ে যাবে। যেমন দাবাগাতের দ্বারা চামড়া পাক হয়ে যায়। আর চামড়ার ক্ষেত্রে তা পাক হয়ে যাওয়াই হচ্ছে মুখ্য বিষয়। যেমন গোশ্‌ত ভক্ষণ করা হচ্ছে মুখ্য বিষয়। উল্লেখ্য যে, অগ্নিপূজকের কাজটি শরীয়াতের দৃষ্টিতে পশুকে মেরে ফেলার শামিল। কাজেই অগ্নিপূজক কর্তৃক কোন পশু যবাহ করার পর তা পুনরায় (পবিত্রতার জন্য) দাবাগাত করা উচিত। যবাহ এর দ্বারা যেমনিভাবে পশুর গোশ্‌ত পাক হয়ে যায়, অনুরূপভাবে এর দ্বারা পশুর চর্বিও পাক হয়ে যায়। সুতরাং যদি স্বল্প পরিমাণ পানিতে চর্বি পতিত হয়, তবে তা পানিকে নাপাক করবে না। কিন্তু ইমাম শাফিঈ (র)-এর থেকে ভিন্নমত পোষণ করেন।

এ জাতীয় পশুর চর্বি খাওয়া ছাড়া অন্য কাজে ব্যবহার করা জাইয কিনা, এ সম্বন্ধে কেউ কেউ বলেন ঃ জাইয নয়, যেমন খাওয়া জাইজ নয়। আবার কেউ কেউ বলেন, জাইয আছে, যেমন যায়তুনের সাথে যদি মৃত পশুর চর্বি মিশ্রিত হয়ে যায় এবং যায়তুনের পরিমাণ বেশী হয়, তবে তা খাওয়া যাবে না বটে, কিন্তু খাওয়া ছাড়া অন্য সমস্ত কাজে তা ব্যবহার করা যাবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ জলচর প্রাণীর মধ্যে মাছ ছাড়া অন্য কিছু খাওয়া জাইয নেই। ইমাম মালিক (র)-এবং একদল আলিম বলেন ঃ নদীতে যত প্রাণী আছে সব ধরনের প্রাণীই খাওয়া জাইয। আবার কেউ কেউ শূকর, কুকুর এবং সামুদ্রিক মানুষকে এর থেকে বাদ দিয়ে থাকেন।

ইমাম শাফিঈ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তাঁর মতে জলচর সমস্ত প্রাণীই খাওয়া জাইয। জলচর প্রাণী খাওয়া ও বিক্রি করার মধ্যে একই ধরনের মতভেদ রয়েছে। তাদের (ইমাম মালিক ও ইমাম শাফিঈ (র))-এর দলীল হলো ঃ

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ

তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার হালাল করা হয়েছে। (৫ঃ৯৬)

এ আয়াতে কোন প্রকার তারতম্য ছাড়াই ব্যাপক অর্থে সামুদ্রিক শিকার হালাল হওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

এমনিভাবে সামদ্রিক শিকার সম্বন্ধে নবী করীম (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ

هُوَ الطَّهُورُ مَاءُهُ وَالْحِلُّ مَيْتَتُهُ .

সমুদ্রের পানি পাক এবং মৃত প্রাণী হালাল। (তিরমিযী শরীফ)

অধিকন্তু এ জাতীয় প্রাণীর মধ্যে কোন রক্ত নেই। কেননা . রক্ত বিশিষ্ট প্রাণী পানিতে বাস করতে পারে না। আর রক্তই হচ্ছে হারাম। তাই এগুলো মাছের মতই হয়ে গেল। (অতএব মাছের ন্যায় অন্যান্য প্রাণীও হালাল হবে।)

আর আমাদের দলীল হলো, কুরআনুল করীমের আয়াত ঃ

وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

আর তিনি তাদের জন্য অপবিত্র বস্তু হারাম করেন। (৭ঃ১৫৭) উল্লেখ্য যে, পানিতে মাছ ছাড়া যত প্রাণী আছে, সবই হচ্ছে খবীস এবং অপবিত্র। অপবিত্র (কাজেই মাছ ছাড়া সমস্ত জলজ প্রাণীই হারাম হবে।) এমনিভাবে রাসূলুল্লাহ (সা)-ঐ ঔষধ সেবন করতে নিষেধ করেছেন, যাতে ব্যাঙ ব্যবহার করা হয়েছে। অনুরূপভাবে তিনি কাঁকড়া বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।[১]

উল্লেখ্য যে, কুরআন মজীদে বর্ণিত "اصطياد" শব্দটি "صيد" (শিকার করা) এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আর এ শিকার করা হারাম প্রাণীর ক্ষেত্রেও মোবাহ (বৈধ)। এমনিভাবে "والحل ميتته" হাদীসে মৃত প্রাণী বলে মাছকেও বুঝানো হয়েছে। কেননা মরা মাছও হালাল এবং মরা মাছের বিষয়টি সমুদ্রের অন্যান্য মরা প্রাণী থেকে ব্যতিক্রম। কারণ নবী করীম (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ

أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ أَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالسَّمَكُ وَالْجَرَادُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ .

আমাদের জন্য দুই ধরনের মরা প্রাণী এবং দুই ধরনের রক্ত হালাল করা হয়েছে। দুই ধরনের মরা প্রাণী হলো ঃ মাছ ও পঙ্গপাল। আর দুই ধরনের রক্ত হলো কলিজা ও তিল্লী (প্লীহা)।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ সমুদ্রের যে সব মাছ নিজে নিজে মরে পানির উপরে ভেসে উঠে, তা খাওয়া মাকরূহ।

পক্ষান্তরে ইমাম মালিক ও ইমাম শাফিঈ (র) এর মতে এ জাতীয় মাছ খাওয়াতে কোন দোষ নেই। কেননা, আমরা পূর্বে যে হাদীসটি (وَالْحِلُّ مَيْتَتُهُ) বর্ণনা করেছি, তা ব্যাপক অর্থে বর্ণনা করা হয়েছে। অধিকন্তু উক্ত হাদীসে সমুদ্রের মরা মাছকে হালাল বলে অভিহিত করা হয়েছে।

আর আমাদের দলীল হলো হযরত জাবির (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস। তিনি নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ

مَانَضَبَ عَنْهُ الْمَاءُ فَكُلُوْا وَمَا لَفَظَهُ الْمَاءُ فَكُلُوْا وَمَا طَفَا فَلاَ تَاكُلُوْا .

পানি শুকিয়ে যাওয়ার কারণে যে মাছ মারা গেছে, তোমরা তা খাবে এবং পানি যে মাছকে তীরে নিক্ষেপ করেছে তাও তোমরা খাবে। তবে যে মাছ নিজে নিজে মরে ভেসে উঠেছে তা খাবে না। একদল সাহাবী থেকে আমাদের মাযহাবের অনুরূপ

---

১. উপরোক্ত হাদীসসমূহের দ্বারাও মাছ ছাড়া অন্যান্য জলজ প্রাণী খাওয়া হারাম হওয়া প্রতীয়মান হয়।

অভিমত বর্ণিত রয়েছে। হাদীসে বর্ণিত সমুদ্রের মরা মাছ বলে ঐ মাছকে বুঝানো হয়েছে, যা সমুদ্র তীরে নিক্ষেপ করে দিয়েছে। তবেই তো এ মাছের মৃত্যুর বিষয়টি সমুদ্রের দিকে সম্পর্কিত করা হবে। তবে কিন্তু ঐ মাছ নয়, যা কোন আপদ বিপদ ছাড়াই পানিতে মরেছে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ জিররীস, মারমাহী[1] সর্বপ্রকার মাছ এবং পঙ্গপাল যবাহ করা ছাড়া খাওয়াতে কোন দোষ নেই।

ইমাম মালিক (র) বলেন ঃ পঙ্গপাল শিকার করার পর যদি শিকারী ব্যক্তি এর মাথা কেটে দেয় এবং তা ভুনা করে, তাহলেই তা খাওয়া হালাল হবে; অন্যথায় হালাল হবে না। কেননা, এটি হলো ভূচর শিকার। আর একারণেই যদি মুহরিম ব্যক্তি পঙ্গপাল হত্যা করে, তবে তার উপর এমন বিনিময় ওয়াজিব হবে, যা এর সাথে সামঞ্জস্যশীল। পূর্বে আমরা যে হাদীসটি বর্ণনা করেছি; সেটিই ইমাম মালিক (র)-এর বিপক্ষে আমাদের দলীল। অনুরূপভাবে নিম্নোক্ত হাদীসটিও আমাদের দলীল। বর্ণিত আছে যে, একদা হযরত আলী (রা)-কে ঐ পঙ্গপাল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলো– যা কোন ব্যক্তি জমি থেকে শিকার করে, যার মধ্যে কিছু জীবিত এবং কিছু মৃত আছে ? জবাবে তিনি বলেন, كُلْهُ كُلَّهُ সব গুলোই খাও। হযরত আলী (রা)-এর এ জবাবকে তার পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তব্যের মধ্যে গণ্য করা হয়। এ কথার দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এ জাতীয় পঙ্গপাল খাওয়াও হালাল, যদিও তা স্বাভাবিকভাবে মরে। কিন্তু মাছের বিষয়টি এর থেকে ব্যতিক্রম, যদি তা বিপদ আপদ ছাড়া মারা যায়। কেননা এ প্রকারের মাছের বিষয়টিকে আমরা سَمَكٌ طَافِي সম্পর্কিত হাদীস দ্বারা খাস করে থাকি।

উল্লেখ্য যে, মাছের ব্যাপারে আমাদের মূলনীতি হলো ঃ মাছ যদি কোন বিপদ-আপদের কারণে মারা যায়, তবে তা হালাল বলে গণ্য হবে, যেমন শিকারকৃত মাছ হালাল হয়ে থাকে। আর মাছ যদি বিপদ-আপদ ছাড়া স্বাভাবিকভাবে মারা যায়, তবে তা খাওয়া হালাল হবে না। যেমন– "سَمَكٌ طَافِي" উপরোক্ত মূলনীতির উপর ভিত্তি করে বহু শাখা মাসআলা উদ্ভাবিত হয়, যেগুলোকে আমরা 'কিফায়াতুল মুনতাহী' গ্রন্থে বর্ণনা করেছি। একটু চিন্তা-ভাবনা করলেই পণ্ডিত লোকেরা ঐসব শাখা মাসআলা সম্বন্ধে অবগত হতে সক্ষম হবেন। সেসব শাখা মাসআলাসমূহ থেকে একটি হলো ঃ যদি কোন মাছের কিয়দংশ কেটে ফেলা হয় এবং তা মারা যায়, তবে যে অংশটি কেটে আলাদা করা হয়েছে এবং যা বাকী আছে, সবই খাওয়া হালাল হবে। কেননা, এর মৃত্যু সংঘটিত হয়েছে বিপদের কারণে। যদিও এ অংশটি জীবিত মাছ থেকে আলাদা করা হয়েছে এবং যদিও তা মৃত। কিন্তু মরা মাছ যেহেতু হালাল, তাই এটিই হালাল বলে গণ্য হবে। গরম ও ঠাণ্ডার কারণে যে মাছ মারা যায়, এর ব্যাপারে দুই ধরনের বর্ণনা রয়েছে। আল্লাহই সঠিক বিষয় সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত।

---

১. জিররীস (جريث) অর্থ কালো মাছ। আল্লামা আয়নী (র) বলেন ঃ জিররীস হলো ঢালের ন্যায় গোলাকৃতি বিশিষ্ট এক প্রকারের মাছ। আর মারমাহী হলো সাপের ন্যায় লম্বা এক প্রকারের মাছ।

كِتَابُ الْأُضْحِيَّةِ
অধ্যায় ঃ কুরবানীর মাসাইল

بِسمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْأُضْحِيَةِ

অধ্যায় ঃ কুরবানীর মাসাইল

ইমাম কুদূরী (র) বলেন : আযাদ মুসলিম, মুকীম (মুসাফির নয়) এবং কুরবানীর দিনে বিত্তশালী অর্থাৎ নিসাব পরিমাণ মালের মালিক—এ জাতীয় ব্যক্তির উপর তার নিজের পক্ষ হতে এবং নিজের নাবালক সন্তানদের পক্ষ হতে কুরবানী করা ওয়াজিব। কুরবানী ওয়াজিব–এ কথা বলেন, ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মুহাম্মদ, ইমাম যুফার এবং ইমাম হাসান (র)। এটি ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর দুই বর্ণনার একটি বর্ণনাও বটে।

পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর অপর বর্ণনা মতে, কুরবানী করা সুন্নাত। এ কথা তিনি জাওয়ামি' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। ইমাম শাফিঈ (র) এর অভিমতও তাই। ইমাম তাহাভী (র) বলেন ঃ কুরবানী করা ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে ওয়াজিব। আর ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র) এর মতে সুন্নাতে মুআক্কাদা। মাশায়েখদের কেউ কেউ ইমামগণের মতভেদকে এভাবেই বর্ণনা করেছেন।

সুন্নাত হওয়ার দলীল হলো নবী করীম (সা) এর নিম্নোক্ত বাণী ঃ

مَنْ اَرَادَ اَنْ يُضَحِّيَ مِنْكُمْ فَلَا يَاْخُذْمِنْ شَعْرِهٖ وَاَظْفَارِهٖ شَيْئًا ـ

–তোমাদের কেউ যদি কুরবানী করার ইচ্ছা করে, তবে সে যেন তার চুল এবং নখ থেকে কিছুই না কাটে।

এখানে কুরবানী করাকে ইরাদা ও সংকল্পের সাথে সংযুক্ত করে বর্ণনা করা হয়েছে–যা ওয়াজিব হওয়ার পরিপন্থী।[১] অধিকন্তু কুরবানী করা যদি মুকীম ব্যক্তির উপর ওয়াজিব হয়, তবে তা মুসাফিরের উপরও ওয়াজিব হবে। কেননা ইবাদতে মালীর ক্ষেত্রে মুকীম ও মুসাফিরের মধ্যে কোন তারতম্য হয় না। যেমন যাকাত (এর ক্ষেত্রে

---

১. কাজেই কুরবানী করা ওয়াজিব হতে পারে না, বরং সুন্নাতে মুআক্কাদা হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

মুকীম ও মুসাফিরের মধ্যে কোন তারতম্য নেই।) বস্তুত: কুরবানীর বিষয়টি 'আতীরার ন্যায় হয়ে গেছে।[১]

আর ওয়াজিব হওয়ার দলীল হলো রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর নিম্নোক্ত বাণী ঃ

مَنْ وَّجَدَ سَعَةً وَلَمْ يُضَحِّ فَلاَ يَقْرُبَنَّ مُصَلاَّنَا ۔

–কেউ যদি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কুরবানী না করে; তবে সে যেন আমাদের ঈদগাহের নিকটেই না আসে।

এ জাতীয় ধমক 'ওয়াজিব নয়' এমন আমলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে না। অধিকন্তু এটি হলো এমন নৈকট্য লাভের আমল, যা নির্দিষ্ট সময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট। যেমন বলা হয় ঃ يَوْمُ الأَضْحٰى (কুরবানীর দিন) এর দ্বারা ওয়াজিব হওয়াই প্রতীয়মান হয়। কেননা, এরূপ সংশ্লিষ্টতা নির্দিষ্ট করণের জন্যই হয়ে থাকে। আর এ নির্দিষ্ট করণ তখনই হবে, যখন কুরবানীর অস্তিত্ব পাওয়া যায়। কাজেই (শরী'আতের) মুকাল্লাফ মানুষের বাহ্যিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে এ কথা বলা যায় যে, ওয়াজিবই وُجُوْدٌ কে অবশ্যম্ভাবী করে।[২] তবে কুরবানী আদায় করা এমন কিছু বিষয়ের (أَسْبَابٌ এর) সাথে খাস, যার উপস্থিতি মুসাফিরের ক্ষেত্রে কষ্টকর। এমনিভাবে এ আদায় নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে শেষ হয়ে যায়। কাজেই মুসাফিরের উপর জুমুআর নামাযের ন্যায় কুরবানীও ওয়াজিব হবে না।

বর্ণিত হাদীসে যে ইরাদার কথা বলা হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে এখানে তা ভুলের বিপরীত অর্থে (ضِدُّ السَّهْوِ) ব্যবহৃত হয়েছে। মূলত: এ দ্বারা কুরবানীর ব্যাপারে কাউকে ইখতিয়ার দেয়া উদ্দেশ্য নয়। আর এ ক্ষেত্রে আতীরার বিষয়টিকেও নযীর হিসাবে উল্লেখ করা ঠিক নয়; কেননা আতীরার বিষয়টি রহিত হয়ে গেছে। বস্তুত: আতীরা হলো এমন বকরী, যা রজব মাসে যবাহ করা হতো, যেমন বর্ণনা করা হয়েছে। কুরবানী ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টি আযাদ ব্যক্তির সাথে খাস করা হয়েছে। কেননা এটি হচ্ছে আর্থিক ইবাদত। আর আর্থিক ইবাদত মালিকানা সত্ব ছাড়া আদায় হয় না। আর আযাদ ব্যক্তি ব্যতীত অন্য মালিকও হতে পারে না।

কুরবানীকে ইসলামের সাথে এ কারণে খাস করা হয়েছে যে, এটি হচ্ছে একটি আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে নেক আমল। (আর নেক আমল ইসলাম ছাড়া সহীহ

---

১. আতীরা হলো রজব মাসে জাহিলী যুগের লোকেরা এবং ইসলামের প্রথমদিকে মুসলমানরা আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য যে বকরী যবাই করতো। পরে এ বিধান রহিত হয়ে যায়। আতীরা (عَتِيْرَةٌ) যেমন মুকীম-মুসাফির কারো উপরই ওয়াজিব হয় না; ঠিক তদ্রূপ কুরবানীও মুকীম-মুসাফির কারো উপরই ওয়াজিব হবে না।

২. কাজেই কুরবানী করা ওয়াজিব হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কেননা ওয়াজিব হলেই وُجُوْدٌ হবে। আর وُجُوْدٌ হলেই নির্দিষ্টকরণের বিষয়টিও পাওয়া যাবে। পক্ষান্তরে যদি কুরবানীকে সুন্নাত বলা হয়, তবে হতে পারে কোন এক সময় কোন মানুষই কুরবানী করবে না। ফলে কুরবানীর وُجُوْدٌ হবে না। আর وُجُوْدٌ না হলে নির্দিষ্ট করণের বিষয়টিও পাওয়া যাবে না।

হয় না।) একে মুকীম হওয়ার সাথে ঐ কারণে খাস করা হয়েছে, যা আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। আর বিত্তশালী হওয়ার সাথে ঐ হাদীসের কারণে খাস করা হয়েছে, যে হাদীস আমরা বর্ণনা করেছি, যাতে সামর্থ্যবান হওয়ার শর্ত আরোপ করা হয়েছে। আর বিত্তশালী হওয়ার জন্য ঐ পরিমাণ মালের মালিকানা আবশ্যক, যে পরিমাণ মালের মালিক হলে সাদাকাতুল ফিত্‌র ওয়াজিব হয়। সপ্তম অধ্যায়ে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এমনিভাবে কুরবানী ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টি সময়ের সাথেও খাস বা নির্দিষ্ট। আর সেটি হলো কুরবানীর দিন। কেননা, কুরবানীর বিষয়টি সময়ের সাথে নির্দিষ্ট। এ সময়ের পরিমাণ কি, তা অচিরেই ইনশাআল্লাহ্ বর্ণনা করবো।

নিজের পক্ষ হতে কুরবানী করা ওয়াজিব । কেননা, মানুষের নিজের উপর কোন কিছু ওয়াজিব হওয়াই হলো আসল তথা মুখ্য বিষয়। এর কারণ আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। অনুরূপভাবে নিজের নাবালিগ সন্তানের পক্ষ হতেও কুরবানী করা ওয়াজিব। কেননা মানুষের নাবালিগ সন্তানও তার নিজের বিষয়ের অনুরূপই। কাজেই নাবালিগ সন্তানের বিষয়টিও তার নিজের সাথে যোগ হবে। যেমন সাদাকাতুল ফিতরের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। এটি ইমাম হাসান (র) এর সূত্রে বর্ণিত ইমাম আবু হানীফা (র) এর একটি বর্ণনা। ইমাম আবু হানীফা (র) থেকে অপর এক বর্ণনায় রয়েছে যে, নাবালিগ সন্তানের পক্ষ থেকে কুরবানী করা ওয়াজিব নয়। এটিই যাহিরী রিওয়ায়েত। কিন্তু সাদাকাতুল ফিতরের বিষয়টি এর থেকে ব্যতিক্রম। কেননা সাদাকাতুল ফিত্‌র ওয়াজিব হওয়ার কারণ হচ্ছে এমন ব্যক্তি, যার খোর-পোষ তার দায়িত্বে এবং যার কর্তৃত্ব ও তত্ত্বধানের দায়িত্বও তার উপর। আর এ দুটি (খোর-পোষ এবং তত্ত্বাবধান) বিষয়ই নাবালিগের ক্ষেত্রে বিদ্যমান।[1] পক্ষান্তরে কুরবানীর বিষয়টি হচ্ছে একটি একনিষ্ঠ আমল। আর আমলের ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো যে, একজনের মধ্যে কারণ পাওয়া যাওয়ায় অপর জনের উপর তা ওয়াজিব হয় না। আর এ কারণেই গোলামের পক্ষ হতে মুনীবের উপর কুরবানী করা ওয়াজিব হয় না। যদিও তার পক্ষ হতে সাদাকাতুল ফিতর আদায় করা (মুনীবের উপর) ওয়াজিব হয়।

যদি নাবালিগ সন্তানের নিজস্ব মালামাল থাকে, তবে ইমাম আবু হানীফা এবং ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর মতে পিতা বা পিতা কর্তৃক নিয়োজিত অলী (অসীয়ত বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি) তার মাল থেকে কুরবানী করবে। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ, ইমাম যুফার ও ইমাম শাফিঈ (র) বলেন যে, তারা নিজের মাল থেকে কুরবানী করবে, নাবালিগের মাল থেকে নয়। উল্লেখ্য যে, এ ক্ষেত্রে মতভেদটি সাদাকাতুল ফিতরের মতভেদের অনুরূপই।[3] কেউ কেউ বলেন, কোন ইমামের মতেই নাবালিগের মাল থেকে কুরবানী করা জাইয নেই। কেননা, কুরবানী তো রক্ত প্রবাহিত করার দ্বারাই আদায় হয়ে যায়। এরপর গোশ্‌ত সাদাকা করে দেওয়া তো নফল কাজ। অথচ

১. কাজেই নাবালিগের সাদাকাতুল ফিতর আদায় করা ওলীর উপর ওয়াজিব।
২. কাজেই নাবালিগের পক্ষ হতে ওলীর উপর কুরবানী করা ওয়াজিব নয়।
৩. অর্থাৎ যদি নাবালিগ সন্তানের মাল থাকে তবে শায়খাইনের মতে তার মালে সাদাকাতুল ফিত্‌র ওয়াজিব হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র) ও অন্যান্যের মতে তার মাল থেকে ওয়াজিব হবে না।

নাবালিগের মাল থেকে নফল সাদাকা করা জাইয নয়। আর নাবালিগের পক্ষে সমুদয় গোশ্‌ত ভক্ষণ করাও সম্ভব নয়। শায়খ বুরহান উদ্দীন (র) বলেন ঃ বিশুদ্ধতম অভিমত হলো এই যে, নাবালিগের মাল থেকেই কুরবানী করা হবে এবং তার পক্ষে যে পরিমাণ খাওয়া সম্ভব, তা সে খাবে। আর অবশিষ্ট গোশ্‌ত দ্বারা এমন জিনিস খরিদ করবে, যা অক্ষুণ্ন রেখেই ব্যবহার করা যায়।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ তাদের প্রত্যেকের (পিতা ও নাবালিগ সন্তান) পক্ষ থেকে একটি বকরী যবাহ করবে অথবা সাত ব্যক্তির পক্ষ থেকে একটি গাভী (গরু) বা একটি উট যবাহ করবে। অবশ্য কিয়াস তথা যুক্তির দাবী তো এই যে, গরু বা উট এক ব্যক্তির পক্ষ হতেই যবাহ হতে হবে। একাধিক ব্যক্তির পক্ষ হতে তো জাইয না হওয়া বাঞ্ছনীয়। কেননা, এ ক্ষেত্রে إراقة বা যবাহ একটিই। আর এটিই হলো قُرْبَةٌ বা নেক আমল। তবে আমরা এ যুক্তিকে হাদীসের কারণে বর্জন করেছি। তা হলো হযরত জাবির (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস। তিনি বলেন ঃ

نَحَرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبُدْنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ .

আমরা রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাথে একটি গরু সাত ব্যক্তির পক্ষ হতে এবং একটি উট সাত ব্যক্তির পক্ষ হতে কুরবানী করেছি। (মুসলিম, তিরমিযী)। তবে বকরীর ব্যাপারে যেহেতু কোন হাদীস নেই, কাজেই তা মুল কিয়াসের উপরই বাকী থাকবে। (অর্থাৎ একটি বকরী এক ব্যক্তির পক্ষ হতেই কুরবানী করা হবে।)

গরু বা উট পাঁচ-ছয় ব্যক্তির পক্ষ হতেও কুরবানী করা জাইয বলে ইমাম মুহাম্মদ (র) আসল (মাবসূত) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। কেননা, এগুলো যেহেতু সাত ব্যক্তির পক্ষ হতে কুরবানী করা জাইয, কাজেই সাতের কম সংখ্যক মানুষের পক্ষ হতে তা আরো উত্তমভাবে জাইয হবে। তবে আট ব্যক্তির পক্ষ হতে তা জাইয হবে না। এক্ষেত্রে কিয়াসকে গ্রহণ করা হয়েছে, যেহেতু এ ক্ষেত্রে কোন হাদীস নেই। এমনিভাবে যদি শরীকদের কোন একজনের অংশ সপ্তমাংশ থেকে কম হয়, তবে কারো কুরবানীই জাইয হবে না। কেননা এক জনের ক্ষেত্রে وَصْفُ قُرْبَةٍ (নেক-আমলের অপরিহার্য গুণাগুণ) পাওয়া যায়নি। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা পরে করবো ইনশাআল্লাহ্‌।

ইমাম মালিক (র) বলেন ঃ এক ঘর তথা এক পরিবারের পক্ষ হতেও একটি কুরবানী করা জাইয; যদিও তাদের সংখ্যা সাতের অধিক হয়। তবে দুই পরিবারের পক্ষ হতে একটি (পশু) কুরবানী করা জাইয নয়। যদিও তাদের সংখ্যা সাতের চেয়ে কম হয়। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ

عَلٰى كُلِّ اَهْلِ بَيْتٍ فِىْ كُلِّ عَامٍ اُضْحَاةٌ وَعَتِيْرَةٌ .

প্রতিবছর প্রত্যেক পরিবারের উপর একটি কুরবানী এবং একটি 'আতীরা ওয়াজিব।[১]

১. এ হাদীসের ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণের আপত্তি রয়েছে। কাজেই এটি দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়।

শায়খ বুরহান উদ্দীন (র) বলেন ঃ উক্ত হাদীসে "প্রত্যেক পরিবারের উপর" বলে পরিবারের তত্ত্বাবধায়ককে বুঝানো হয়েছে। (এ সম্বন্ধে আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।)

কেননা মালদারী তো তারই। এ ব্যাখ্যা নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা সমর্থিত। এতে উল্লেখ রয়েছে যে,

عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ فِىْ كُلِّ عَامٍ اُضْحَاةٌ وَعَتِيْرَةٌ ·

প্রতি বছর প্রত্যেক মুসলমানের উপর একটি কুরবানী ও একটি 'আতীরা' ওয়াজিব।

যদি একটি উটে দুই ব্যক্তি সমানভাবে অংশীদার হয়, তবে বিশুদ্ধতম মতানুসারে এটিকে দুই ব্যক্তির পক্ষ হতে কুরবানী করা জাইয। কেননা যেহেতু সাতভাগের তিনভাগের কুরবানী জাইয, তাই সাতভাগের অর্ধেকের ক্ষেত্রেও কুরবানী জাইয হবে এর সংশ্লিষ্ট হওয়ার কারণে। শরিকী কুরবানী করা জাইয। তবে এ অবস্থায় গোশ্‌ত ওযন করে বন্টন করতে হবে। কেননা গোশ্‌ত ওজনযোগ্য বস্তু। যদি অংশীদারগণ অনুমান করে গোশ্‌ত বন্টন করে, তাহলে তা জাইয হবে না। কিন্তু যদি গোশতের সাথে কিছু পায়া এবং চামড়াও থাকে, তবে বেচা-কেনার উপর কিয়াস করে এভাবে গোশত বণ্টন করা জাইয হবে।[১]

কেউ যদি নিজের পক্ষ হতে (একা) কুরবানী করার জন্য একটি গাভী (গরু) খরিদ করে এবং এরপর এতে আরো ছয় ব্যক্তিকে শরীক করে নেয়, তাহলে সূক্ষ্ম কিয়াসের (اِسْتِحْسَانٌ) আলোকে এ কুরবানী জাইয হবে। কিন্তু কিয়াস অনুযায়ী তা জাইয হবে না। এটি ইমাম যুফার (র) এরও অভিমত। কেননা, সে এটিকে قُرْبَةٌ – (আমল) এর জন্য তৈরী করে নিয়েছে কাজেই এ অবস্থায় টাকা হাসিলের জন্য তা বিক্রি করা যাবে না। অপরাপর লোকদেরকে শরীক করার মাঝে এ কারণটি পাওয়া যায়।

সূক্ষ্ম কিয়াসের কারণ এই যে, অনেক সময় খরিদ করার জন্য মোটা তাজা গরু পাওয়া যায়, কিন্তু বেচা-কেনার সেই মুহূর্তে কোন শরীকদার পাওয়া যায়না, এ অবস্থায় শরীকদার পরে তালাশ করা হয়। এ জাতীয় প্রয়োজন সাধারণত: মানুষের জীবনে দেখা দিয়ে থাকে। কাজেই মানব জীবনের এ জটিলতাকে দূরীভূত করার লক্ষ্যে আমরা এভাবে গরু খরিদ করাকে জাইয বলেছি। আর বাস্তবেও এভাবে জটিলতা নিরসন করা সম্ভব। কেননা কুরবানীর জন্য খরিদ করাতে বেচাকেনা নিষিদ্ধ হয়ে যায় না। তবে এ ক্ষেত্রে উত্তম হলো পশু খরিদ করার পূর্বেই শরীকদার ঠিক করে নেওয়া। তাহলেই মতভেদ থেকে দূরে থাকা যাবে এবং قُرْبَةٌ তথা ইবাদতের ক্ষেত্রে ফিরে যাওয়ার অবস্থা থেকেও বাঁচা যাবে। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে (কুরবানীর জন্য)

১. যদি গোশতের বদলায় গোশত বিক্রি করা হয়, তাহলে কম-বেশী করে বেচা-কেনা জাইয হবে না। অবশ্য যদি কোন একদিকে পায়া এবং চামড়া থাকে, তবে এ অবস্থায় কম-বেশী করে বেচা-কেনা জাইয হবে। কুরবানীর গোশত বন্টনের ক্ষেত্রে এ নিয়ম প্রযোজ্য হবে।

কোন পশু খরিদ করার পর তাতে অন্যান্য লোকদেরকে শরীক করা মাকরূহ। এর কারণ আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি।

ইমাম কুদূরী (র) বলেনঃ গরীব এবং মুসাফির ব্যক্তির উপর কুরবানী করা ওয়াজিব নয়। এর কারণ আমরা পূর্বেই বর্ণনা করেছি। হযরত আবুবকর এবং উমর (রা)ও সফরের অবস্থায় কুরবানী করতেন না। হযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত আছে ঃ

لَيْسَ عَلَى الْمُسَافِرِ جُمُعَةٌ وَلَا اُضْحِيَةٌ ۔

–মুসাফিরের উপর জুমু'আ এবং কুরবানী ওয়াজিব নয়।

ইমাম কুদূরী (র) বলেনঃ কুরবানীর সময় শুরু হয় কুরবানীর দিনে (১০ই যিলহজ্জের) ফজর উদিত হওয়া অর্থাৎ সুবৃহে সাদিক হওয়ার পর হতেই। তবে ইমামের ঈদের নামায আদায়ের আগে শহরবাসী লোকদের জন্য কুরবানী করা জাইয নয়। অবশ্য গ্রামের লোকেরা (যেখানে জুম'আ জাইয নয়) সুবৃহে সাদিকের পর পরই কুরবানী করতে পারবে।

এ সম্বন্ধে দলীল হলো রাসুলুল্লাহ (সা)-এর বাণী, তিনি ইরশাদ করেছেন ঃ

مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلٰوةِ فَلْيُعِدْ ذَبِيْحَتَهُ وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلٰوةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَاَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِيْنَ ۔

যদি কেউ ঈদের সালাতের আগে যবাহ করে, তবে তার পুনরায় যবাহ করা উচিত। আর যে ব্যক্তি ঈদের সালাতের পর যবাহ করলো, সে তার কুরবানীকে পুরা করলো এবং সে মুসলামানদের সুন্নাতটি ঠিক ভাবে আদায় করলো।

রাসূলুল্লাহ (সা) আরো ইরশাদ করেন ঃ

اِنَّ اَوَّلَ نُسُكِنَا فِىْ هٰذَا الْيَوْمِ الصَّلٰوةُ ثُمَّ الْاُضْحِيَةُ ۔

নিশ্চয় আজকের দিনে আমাদের প্রথম আমল হল, ঈদের সালাত আদায় করা, তারপর কুরবানী করা।

তবে (প্রথমে ঈদের সালাত আদায় করার) এ শর্ত ঐ লোকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, যাদের উপর ঈদের সালাত ওয়াজিব। আর তারা হলো শহরবাসী লোক (এবং ঐ গ্রামবাসী মানুষ, যাদের উপর জুমু'আ এবং ঈদের সালাত ওয়াজিব)। তবে গ্রামবাসী লোক নয় (যাদের উপর জুমু'আ এবং ঈদের সালাত ওয়াজিব নয়।) অধিকন্তু কুরবানীকে (ঈদের সালাতের থেকে) বিলম্বিত করার বিধান এই জন্য দেওয়া হয়েছে, যাতে কুরবানীতে মশগুল হয়ে কেউ সালাতের ব্যাপারে উদাসীন না হয়ে পড়ে। কাজেই গ্রাম্য লোকদের কুরবানীকে বিলম্বে আদায় করার কোন কারণ থাকতে পারে না। কারণ তাদের উপর তো ঈদের সালাতও ওয়াজিব নয়। আর আমরা পূর্বে যে হাদীসটি বর্ণনা করেছি, তা ইমাম মালিক ও ইমাম শাফিঈ (র) এর বিপক্ষে আমাদের দলীল। তাদের

মতে, ঈদের সালাতের পর ও ইমামের কুরবানী করার আগে কুরবানী করা জাইয নয়। উল্লেখ্য যে, এ ক্ষেত্রে কুরবানীর পশুর স্থানটি হলো ধর্তব্য বিষয়। অতএব পশু যদি গ্রামে থাকে এবং কুরবানীদাতা থাকে শহরে, তাহলে সুব্‌হে সাদিক হওয়া মাত্রই কুরবানী করা জাইয হবে। আর যদি বিষয়টি এর বিপরীত হয় (অর্থাৎ পশুটি শহরে এবং কুরবানীদাতা গ্রামে) তবে ঈদের সালাতের পরই কুরবানী জাইয হবে। এর আগে জাইয হবে না। যদি শহুরে ব্যক্তি তড়িৎ তথা ঈদের সালাতের আগেই কুরবানী করতে চায়, তবে তার জন্য কৌশল হলো যে, সে পশুটি শহরের বাইরে পাঠিয়ে দেবে। এরপর সুব্‌হে সাদিক হওয়ার পরই তা কুরবানী করবে। এর (পশুর স্থানটি ধর্তব্য হওয়ার) কারণ হলো এই যে, কুরবানীর বিষয়টি যাকাতের অনুরূপ। কেননা নিসাবের মাল ধ্বংস হয়ে গেলে যেমনিভাবে যাকাত রহিত হয়ে যায়, তেমনিভাবে কুরবানীর দিনসমূহ অতিক্রান্ত হওয়ার আগেই যদি মাল ধ্বংস হয়ে যায়, তবে কুরবানীও রহিত হয়ে যায়। কাজেই কুরবানী আদায়ের ক্ষেত্রে পশুর স্থানের বিষয়টিই ধর্তব্য হবে। কুরবানীদাতার স্থানের বিষয়টি ধর্তব্য হবে না। যাকাতের উপর কিয়াস করে এ হুকুম প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু সাদাকাতুল ফিতরের বিষয়টি এর থেকে ব্যতিক্রম। কেননা, ঈদুল ফিতরের দিন সুব্‌হে সাদিক হয়ে যাওয়ার পর যদি মাল ধ্বংসও হয়ে যায়, তথাপিও তা রহিত হয়না।

যদি কেউ মসজিদে ঈদের জামা'আত হয়ে যাওয়ার পর ময়দানের জামা'আতের আগেই কুরবানী করে তাহলে সূক্ষ্ম কিয়াসের আলোকে তা জাইয হবে। কেননা, এ সালাতও গ্রহণযোগ্য সালাত। এমনকি যদি লোকেরা শুধুমাত্র মসজিদেই ঈদের সালাত আদায় করে, তবে তাও তাদের জন্য জাইয আছে। অনুরূপভাবে যদি এর বিপরীত অবস্থা হয়, তবুও কুরবানী জাইয হবে। কেউ কেউ বলেন ঃ এ অবস্থায় কিয়াস ও ইসতিহ্‌সান (সূক্ষ্ম কিয়াস) উভয়দিকের বিবেচনায়ই কুরবানী জাইয হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ তিনদিন পর্যন্ত কুরবানী করা জাইয। তা হলো ঃ কুরবানীর দিন (১০ই যিলহজ্জ) এবং এরপর আরো দুই দিন।

ইমাম শাফিঈ (র) বলেন ঃ এরপর আরো তিনদিন পর্যন্ত কুরবানী করা জাইয।

কেননা, নবী করীম (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ

أَيَّامُ التَّشْرِيْقِ كُلُّهَا أَيَّامُ ذَبْحٍ .

আইয়ামে তাশরীক (ঈদুল আযহার পরের তিনদিন) এর সবগুলো দিনই কুরবানীর দিন।

আর আমাদের দলীল হলোঃ হযরত উমর, আলী ও ইব্‌নে 'আব্বাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস। তাঁরা বলেন ঃ আইয়ামে নহর (কুরবানীর দিন) হচ্ছে তিনদিন। তবে উত্তম হলো প্রথম দিনে (১০ই যিলহজ্জ) কুরবানী করা।

তারা এ কথা রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে শুনেই বর্ণনা করেছেন। কেননা, مقادير (পরিমাণ বর্ণনা) এর ক্ষেত্রে রায় কার্যকরি হয় না। অধিকন্তু হাদীস সমূহের মধ্যে

রয়েছে تَعَارُض (বৈপরীত্য)। কাজেই আমরা নিশ্চিতটি অর্থাৎ কম দিনের কথা সম্বলিত হাদীসটি গ্রহণ করেছি। এই দিনগুলোর মধ্যে উত্তম হলো, প্রথমদিনে কুরবানী করা, যেমন উপরোক্ত তিন সাহাবী বলেছেন। অধিকন্তু এতে قُرْبَةٌ তথা কুরবানী আদায় হয় দ্রুত। আর এটিই হলো আসল, যদি বিপরীত কিছু না থাকে।

কুরবানীর দিনের রাতগুলোতেও কুরবানী করা জাইয, তবে মাকরূহ। কেননা, রাতের অন্ধকারের কারণে কুরবানীর কাজে ভুল-ভ্রান্তি হওয়ার আশংকা রয়েছে।

আইয়ামে নহর হচ্ছে তিনদিন এবং আইয়ামে তাশ্‌রীকও তিনদিন। আর এই সবগুলোই অতিক্রান্ত হয় চারদিন অতিক্রান্ত হলে। এর মধ্যে প্রথম দিনটি হলো, শুধুমাত্র কুরবানীর দিন এবং শেষ দিনটি হলো শুধুমাত্র তাশরীকের দিন। আর মাঝখানের দুইদিন হলো, কুরবানী ও তাশরীক উভয়ের দিন। কুরবানীর দিন সমূহে কুরবানী করাই উত্তম, কুরবানীর পশুর মূল্য সাদাকা করার থেকে। কেননা, কুরবানী করা হয়তো ওয়াজিব অথবা সুন্নাত। আর সাদাকা করা হচ্ছে, শুধু নফল কাজ। কাজেই তা (কুরবানী করা) উত্তম হবে এর (নফল সাদাকা করার) চাইতে। অধিকন্তু কুরবানীর সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেলে কুরবানী ফওত বা ছুটে যায়। কিন্তু সাদাকা সব সময়ই আদায় করা যায়। এই হিসাবে কুরবানীর বিষয়টি আফাকী (মীকাতের বাইরে অবস্থানকারী) ব্যক্তির তাওয়াফ ও নফল নামায আদায়ের মত হয়ে গেল।[১]

যদি আইয়ামে নহর অতিক্রান্ত হয়ে যায় এবং এ সময়ের ভেতরে কেউ কুরবানী করতে না পারে, অথচ সে নিজের উপর কুরবানী করাকে ওয়াজিব করে নিয়েছে, অথবা গরীব ছিল এবং কুরবানী করার জন্য পাশুও ক্রয় করে নিয়েছে, তাহলে সে জীবিত পশুই সাদাকা করে দেবে। আর যদি উক্ত ব্যক্তি বিত্তশালী হয়, তবে একটি বকরীর মূল্য সাদাকা করে দেবে। চাই সে কুরবানীর পশু খরিদ করে থাকুক, বা না করে থাকুক। কেননা, বিত্তশালী ব্যক্তির উপর তো কুরবানী করা ওয়াজিব। আর আমাদের মাযহাবে গরীব ব্যক্তির উপরও কুরবানী ওয়াজিব হয়ে যায় কুরবানী নিয়তে পশু খরিদ করার কারণে। এ অবস্থায় যেহেতু কুরবানীর সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, তাই তার উপর সাদাকা ওয়াজিব হবে- দায়িত্ব থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য। যেমন জুমু'আর নামায ছুটে গেলে যুহরের কাযা পড়তে হয়, অথবা অপারগতার কারণে রোযা ছুটে গেলে এর ফিদ্‌য়া আদায় করতে হয়।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন : অন্ধ, কানা, এবং এমন লেংড়া পশু, যা কুরবানীর স্থান পর্যন্ত হেঁটে যেতে পারে না, তা কুরবানী করা জাইয নয়। এমনিভাবে ক্ষীণ দেহ বিশিষ্ট পশুও কুরবানী করাও জাইয নয়।

---

১. অর্থাৎ যেমনিভাবে আফাকী ব্যক্তির জন্য নফল নামাজের তুলনায় তাওয়াফ উত্তম। কেননা নফল নামায তো দেশে ফিরে গিয়েও আদায় করা যাবে। অনুরূপভাবে সাদাকার তুলনায়ও কুরবানী করা উত্তম।

কেননা, নবী করীম (সা) ইরশাদ করেছেন :

لَاتُجْزِئُ الضَّحَايَا اَرْبَعَةٌ اَلْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوْرُهَا وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرْجُهَا وَالْمَرِيْضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا وَالْعَجْفَاءُ الَّتِىْ لَا تُنْقِىْ ·

চার ধরনের পশু কুরবানী করা জাইয নয় : (১) এমন কানা পশু,যার কানা হওয়া স্পষ্ট (২) এমন লেংড়া পশু, যার লেংড়া হওয়া স্পষ্ট, (৩) এমন রুগ্ন পশু,যার রুগ্ন হওয়া স্পষ্ট এবং (৪) এমন ক্ষীণকায় পশু, যার মজ্জা শুকিয়ে গিয়েছে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন : কান এবং লেজ কাটা পশু কুরবানী করা জাইয নয়।

কান কাটা পশু কুরবানী করা যাবে না এ জন্য যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেছেন : اِسْتَشْرِفُوا الْعَيْنَ وَالْاُذُنَ -পশুর চোখ এবং কান অক্ষত কিনা তা ভালভাবে দেখে নেবে।

আর লেজ কাটা পশু কুরবানী করা জাইয না হওয়ার কারণ হলো এই যে, লেজ একটি পরিপূর্ণ অঙ্গ এবং মুখ্য অঙ্গ। কাজেই এটি কানের মত হয়ে গেল।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন : এমনিভাবে যে পশুর কান এবং লেজের অধিকাংশ নেই, তাও কুরবানী করা জাইয নয়। পক্ষান্তরে,যদি কান ও লেজের অধিকাংশ বাকী থাকে, তবে কুরবানী জাইয হবে। কেননা, থাকা না থাকা উভয় অবস্থায় অধিকাংশের জন্য গোটাটার হুকুম প্রযোজ্য হয়ে থাকে। আর সামান্য পরিমাণ দোষ-ক্রুটি থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব নয় বিধায় এ পরিমাণ ক্রুটিকে মাফ করে দেওয়া হয়েছে। (কাজেই অধিকাংশের কম কাটা থাকলে কুরবানী জাইয হবে।) তবে অধিকাংশের পরিমাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফা (র) থেকে একাধিক বর্ণনা রয়েছে। ইমাম আবু হানীফা (র) থেকে 'জামে সগীর' গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, যদি কোন পশুর লেজ, কান, চোখ অথবা নিতম্বের এক তৃতীয়াংশ কাটা থাকে অথবা এর চেয়ে কম কাটা থাকে, তবে তা কুরবানী করা জাইয। আর যদি এর থেকে বেশী কাটা থাকে, তবে কুরবানী করা জাইয হবে না। কেননা, এক তৃতীয়াংশ এমন একটি পরিমাণ, যাতে ওয়ারিসদের সম্মতি ছাড়াই অসিয়ত কার্যকরী হয়। এতে প্রতীয়মান হয় যে, এক তৃতীয়াংশ স্বল্পপরিমাণের মধ্যে গণ্য। আর এক তৃতীয়াংশের অধিক পরিমাণের ক্ষেত্রে অসিয়ত ওয়ারিসদের সম্মতি ছাড়া কার্যকরী হয় না। তাই এক তৃতীয়াংশের অধিক বেশী পরিমাণ বলে গণ্য হবে। ইমাম আবু হানীফা (র) থেকে এও বর্ণিত আছে যে, এক চতুর্থাংশ অধিক পরিমাণ হিসাবে গণ্য। কেননা, বহু মাসআলায় এক চতুর্থাংশকে পূর্ণ বস্তুর মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে। যেমন সালাত অধ্যায়ে তা বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম আবু হানীফা (র) হতে বর্ণিত আছে যে, এক তৃতীয়াংশও অধিক পরিমাণ হিসাবে গণ্য।

কেননা, অসিয়ত সম্পর্কিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ

اَلثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيْرٌ ـ

—এক তৃতীয়াংশের ব্যাপারে অসিয়ত কর। কেননা এক তৃতীয়াংশই অনেক।

ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন ঃ যদি অর্ধেক হতে অধিক বাকী থেকে যায়, তবে তাও কুরবানী করা জাইয, বাস্তব ভাবেই তা অধিক হওয়ার কারণে। যেমন সালাত অধ্যায়ে এ সম্পর্কিত বিবরণ পেশ করা হয়েছে। ফকীহ আবুল লায়স (র) এ অভিমতটিকে পছন্দ করেছেন। ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন ঃ আমার অভিমত সম্পর্কে ইমাম আবু হানীফা (র) কে সংবাদ দিলে তিনি বললেন, "তোমার মতই আমার মত"। কেউ কেউ বলেন ঃ এতে ইমাম আবু হানীফা (র) এবং ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর অভিমতের প্রতি রুজু হওয়া প্রতীয়মান হয়। কেউ কেউ বলেন, উপরোক্ত বক্তব্যের অর্থ হলো আমার মত তোমার মতের কাছাকাছি।

যদি পশুর কোন অঙ্গের অর্ধেক নষ্ট হয়ে যায় অর্থাৎ না থাকে; তবে এ জাতীয় পশু কুরবানী করা জাইয না হওয়ার ব্যাপারে ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র) হতে দুই ধরনের বর্ণনা রয়েছে। যেমনিভাবে শরীরের কোন অঙ্গের কাপড় খুলে যাওয়ার ব্যাপারে ইমাম আবু ইউসুফ (র) হতে দুই ধরনের বর্ণনা রয়েছে।

চোখ ছাড়া অন্যান্য অঙ্গের ক্ষেত্রে পরিমাণ নির্ধারিত করা তো খুবই সহজ। (কিন্তু চোখের বিষয়ই হচ্ছে জটিল)। চোখের পরিমাণ নির্ধারণের পদ্ধতি কি হবে; এ সম্বন্ধে ফকীহগণ বলেন ঃ প্রথমে একদিন বা দুইদিন পর্যন্ত বকরীটিকে ঘাস-পানি দেওয়া বন্ধ রাখা হবে। তারপর দোষী চোখটি বন্ধ করে কিছু দূর থেকে ঘাস-পানি এর সামনে পেশ করা হবে। এরপর যে স্থান থেকে ঐ পশুটি ঘাস-পানি দেখতে সক্ষম হবে, সে স্থানে একটি নিদর্শন রাখা হবে। তারপর আবার ভাল চোখটি বন্ধ করে কিছু দূর থেকে ঘাস-পানি এর সামনে পেশ করা হবে। যেখান থেকে পশুটি ঘাস পানি দেখতে সক্ষম হবে, সে স্থানে আরেকটি নিদর্শন রাখা হবে। তারপর লক্ষ্য করা হবে যে, ঐ দুই স্থানের মধ্যে কি পরিমাণ ব্যবধান। যদি দেখা যায় যে, অপরদিকের তুলনায় একদিকের ব্যবধান এক তৃতীয়াংশ পরিমাণ, তাহলে ধরে নিতে হবে যে, এর দৃষ্টিশক্তি এক তৃতীয়াংশ পরিমাণ নষ্ট হয়েছে। আর যদি অপরদিকের তুলনায় একদিকের পরিমাণ অর্ধেক হয়, তাহলে ধরে নিতে হবে যে, তার এ চোখের দৃষ্টিশক্তি অর্ধেক নষ্ট হয়েছে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ জাম্মা (جَمَّاءُ) পশু কুরবানী করা জাইয। জাম্মা বলা হয় এমন পশুকে, যার আদতেই কোন শিং নেই। কেননা শিংয়ের সাথে কুরবানীর কোন উদ্দেশ্য সংশ্লিষ্ট নয়। এমনিভাবে যে পশুর শিং ভেঙ্গে গেছে, তাও কুরবানী করা জাইয। এর কারণ আমরা পূর্বেই বর্ণনা করেছি। খাসীকৃত পশুকেও কুরবানী করা জাইয। কেননা, এ জাতীয় পশুর গোশ্ত অত্যন্ত সুস্বাদু হয়ে থাকে। অধিকন্তু সহীহ সনদে একথা প্রমাণিত আছে যে, নবী করীম (সা) সাদা কালো মিশ্রিত রং এর খাসীকৃত দুটি ভেড়া কুরবানী করেছিলেন।

এমনিভাবে সাওলা (ثَوْلَاءُ) তথা পাগলা পশু কুরবানী করাও জাইয। কেউ কেউ বলেন ঃ এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে, যদি পশুটি দানা পানি গ্রহণ করে। কেননা, এ অবস্থায় উদ্দেশ্য বিঘ্নিত হওয়ার কোন আশংকা নেই। কিন্তু পশুটি যদি দানা পানি গ্রহণ না করে, তবে তা কুরবানী করা জাইয হবে না।

উল্লেখ্য যে, খুজলি-পাঁচড়া বিশিষ্ট পশু যদি মোটা তাজা হয়, তবে তা কুরবানী করা জাইয। কেননা, খুজলির প্রভাব তো চামড়া পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু এর গোশ্‌তের মধ্যে কোন ত্রুটি নেই। আর পশুটি যদি ক্ষীণকায় হয়, তবে কুরবানী জাইয হবে না। কেননা, এ অবস্থায় খুস্‌জলির প্রভাব গোশ্‌ত পর্যন্ত পৌছে যায়। ফলে পশুর মধ্যে ত্রুটি এসে যাওয়া অনিবার্য হয়।

হাতমা (هَتْمَاءُ) পশু অর্থাৎ যে পশুর দাঁত নেই, তা কুরবানী দেওয়া যাবে কিনা; এ সম্বন্ধে ইমাম আবু ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, দাঁতের ক্ষেত্রে তিনি কম-বেশী বাকী থাকার বিষয়টি বিবেচনা করে থাকেন। আর তাঁর থেকে এ কথাও বর্ণিত আছে যে, যদি পশুটির এই পরিমাণ দাঁত বাকী থাকে; যার দ্বারা সে ঘাস পানি গ্রহণ করতে পারে; তাহলে এটিকে কুরবানী করা জাইয হবে। কেননা, এ অবস্থায়ও উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে যাবে।[১]

সাক্কা (سَكَّاءُ) অর্থাৎ যে পশুর জন্মগতভাবেই কান নেই, তা কুরবানী করা জাইয নয়। কেননা, কানের অধিকাংশ কাটা থাকলে যেহেতু কুরবানী জাইয হয় না, তাই কান না থাকা অবস্থায় কুরবানী কোন ভাবেই জাইয হতে পারে না। উপরোক্ত বিবরণ তখনই প্রযোজ্য হবে, যদি খরিদ করার সময়ও পশুর মধ্যে এ ত্রুটি বিদ্যমান থাকে। কিন্তু যদি খরিদ করার সময় পশুটি নিখুঁত থাকে এবং পরে তা এমনভাবে ত্রুটিযুক্ত হয়ে পড়ে যে, তা আর কুরবানী করা জাইয নয়, তবে লোকটি ধনী হলে তার উপর অন্য একটি পশু কুরবানী দেওয়া ওয়াজিব হবে। আর গরীব হলে-এ পশুটি কুরবানী করাই তার জন্য যথেষ্ট হবে। কেননা, ধনী ব্যক্তির উপর প্রথম হতেই শরী'আতের পক্ষ হতে কুরবানীকে ওয়াজিব করা হয়েছে। খরিদ করার কারণে তার উপর কুরবানী ওয়াজিব হয়নি। কাজেই ওয়াজিব আদায়ের জন এটি নির্দিষ্ট হবে না। আর গরীব ব্যক্তির উপর কুরবানী ওয়াজিব হয়েছে কুরবানীর নিয়তে পশু খরিদ করার কারণে। অতএব খরিদ কৃত পশুটি কুরবানীর জন্য নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছে। তবে পশুতে যে ত্রুটি দেখা দিয়েছে, সে কারণে তার উপর কোন ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না, যেমন যাকাতের নিসাবের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

উপরোক্ত মূলনীতির উপর ভিত্তি করে ফকীহগণ বলেছেন: কুরবানীর জন্য খরিদকৃত পশু যদি মারা যায়,তবে বিত্তশালী ব্যক্তি এর পরিবর্তে অন্য একটি পশু কুরবানী করবে। কিন্তু গরীব ব্যক্তির উপর কোন কিছুই ওয়াজিব হবে না। কুরবানীর জন্য খরিদকৃত পশু হারিয়ে বা চুরি হয়ে যাওয়ায় এর পরিবর্তে অন্য পশু খরিদ করার পর যদি আইয়ামে

---

১. অর্থাৎ যদি অধিকাংশ দাঁত বাকী থাকে, তবে কুরবানী জাইয হবে। অন্যথায় জাইয হবেনা।

নহরের মধ্যেই আগের পশুটি পাওয়া যায়, তবে বিত্তশালী ব্যক্তি এর যে কোন একটি কুরবানী করতে পারবে। কিন্তু গরীব ব্যক্তির উপর উভয়টিই কুরবানী করা ওয়াজিব।

কুরবানীর পশু মাটিতে শোয়ানোর পর নড়াচড়া করার ফলে যদি এর পা ভেঙ্গে যায় এবং এরপরও তা যবাহ করা হয়, তবে আমাদের মাযহাবে ইসতিহ্‌সানের ভিত্তিতে এ কুরবানী জাইয হবে। কিন্তু ইমাম যুফার এবং শাফিঈ (র) এর থেকে ভিন্ন মত পোষণ করেন। কেননা, যবাহ এবং যবাহ এর পূর্ববর্তী অবস্থা যবাহ এর সাথেই সংশ্লিষ্ট। কাজেই শরী'আত ও কিয়াস উভয়দিক থেকেই এ ক্রটি যবাহ এর কারণে হয়েছে বলে ধর্তব্য হবে। এমনিভাবে যদি কোন পশু যবাহ এর অবস্থায় ক্রটিযুক্ত হয়ে যায় এবং এরপর তা ভেঙ্গে যেতে উদ্যত হয়, পরে তা তৎক্ষণাৎ ধরে এনে যবাহ করা হয়, তাহলে এ কুরবানীও জাইয হবে। এমনিভাবে যদি তৎক্ষণাৎ না হয়ে সামান্য কিছু ক্ষণ পরও তা ধরে আনা হয়,তবুও ইমাম মুহাম্মদ (র) এর মতে কুরবানী জাইয হবে। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর থেকে ভিন্নমত পোষণ করেন। কেননা, (ইমাম মুহাম্মদ (র) এর মতে) এটি যবাহ এর ভূমিকা মূলক কর্মের কারণে সংঘটিত হয়েছে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন : উট, গরু এবং বকরী দ্বারা কুরবানী করা যাবে। কেননা, কুরবানী বিষয়টি শরী'আত কৃতক জানা গেছে। আর নবী করীম (সা) ও সাহাবায়ে কিরাম থেকে এই তিন ধরনের পশু ছাড়া অন্য কোন পশু দ্বারা কুরবানী করার বিষয়টি বর্ণিত হয়নি।[১]

ইমাম কুদূরী (র) বলেন : উপরোক্ত পশুগুলো যদি ছানী (ثَنِى) এর পর্যায়ের অথবা এর চেয়ে অধিক বয়সী হয় তবে এর দ্বারা কুরবানী জাইয হবে। কিন্তু ভেড়ার বিষয়টি এর থেকে ব্যতিক্রম। কেননা, ভেড়া (ও দুম্বা) যদি ছয় মাসেরও হয়, তবুও এর দ্বারা কুরবানী জাইয হবে। কেননা, নবী করীম (সা) ইরশাদ করেছেন :

ضَحُّوْا بِالثَّنَايَا اِلاَّ اَنْ يَّعْسِرَ عَلٰى اَحَدِكُمْ فَلْيَذْبَحِ الْجَزَعَ مِنَ الضَّانِ ‏.

তোমরা ছানায়া (ثنايا) পর্যায়ের পশু কুরবানী করবে। কিন্তু তোমাদের কারো জন্য যদি এরূপ পশু কুরবানী করা কঠিন হয়, তবে সে যেন জাযা' (جَزَعْ) কুরবানী করে।

তিনি আরো ইরশাদ করেছেন :

نِعْمَتِ الْاُضْحِيَّةُ الْجَزَعُ مِنَ الضَّانِ ‏.

–ছয় মাসের ভেড়ার বাচ্চা কতই না উত্তম কুরবানী।

ফকীহগণ বলেন : এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে, যদি এগুলো এমন মোটা- তাজা হয় যে, এগুলোকে ছানী (ثَنِى) পর্যায়ের পশুর সাথে মিলানো হলে দূরবর্তী দর্শককে তা সন্দীহান করে দেয় (অর্থাৎ সে আর তখন ঐ গুলোর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে না।)–

---

১. কাজেই এ তিন ধরনের পশু ছাড়া অন্য পশুর দ্বারা কুরবানী জাইয হবে না। অবশ্য মহিষ গরুর অন্তর্ভুক্ত এবং ভেড়া ও দুম্বা বকরীর অন্তর্ভুক্ত। কাজেই এগুলোর দ্বারাও কুরবানী সহীহ হবে।

ফকীহগণের মাযহাব অনুযায়ী জাযা' (جَذَعٌ) ঐ ভেড়ার বাচ্চাকে বলা হয়, যার বয়স ছয় মাস পূর্ণ হয়ে গেছে। ইমাম যা'আফরানী (র) বলেন : সাত মাসের বাচ্চাকে 'জাযা' বলা হয়। ভেড়া ও বকরীর এক বছরী বয়সের বাচ্চা , গরুর দুই বছরের বাছুর আর উটের পাঁচ বছর বয়সের বাচ্চাকে ছানী (ثَنِى) বলা হয়। গরুর মধ্যে মহিষও শামিল। কেননা, মহিষ গরু জাতীয় পশুই। বন্য ও গৃহপালিত পশুর সমন্বয়ে যে বাচ্চা জন্মগ্রহণ করে, তা তার মায়ের হুমুকের অন্তর্ভুক্ত হবে। কেননা, অন্যের সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে মা-ই হচ্ছে আসল। কাজেই কোন নেকড়ে যদি বকরীর সাথে সংগত হয় (এবং এতে বাচ্চা হয়) তবে এ বাচ্চা কুরবানী করা জাইয হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন : সাত ব্যক্তি মিলে কুরবানী করার লক্ষ্যে গরু খরিদ করার পর কুরবানী করার আগেই যদি তাদের কোন এক জন মারা যায় এবং মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশগণ বলে যে, এটিকে তার এবং তোমাদের পক্ষ থেকে যবাহ করে দিন,তবে কুরবানী জাইয হবে। যদি ছয় শরীকের কোন একজন খ্রীস্টান ধর্মাবলম্বী হয়, অথবা শরীকদের কোন একজন গোশত খাওয়ার নিয়তে কুরবানী করে, তবে কারো কুরবানীই জাইয হবে না। কেননা, একটি গরু সাত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কুরবানী করা জাইয। তবে শর্ত হলো এ ক্ষেত্রে প্রত্যেক শরীকের মধ্যে ইবাদতের নিয়ত থাকতে হবে। যদিও এর (অবস্থা) ভিন্ন ধরনের হয়, যেমন কেউ কুরবানীর নিয়ত, কেউ দমে কিরানের নিয়ত, আবার কেউ দমে তামাত্তুর নিয়ত করলো ইত্যাদি। কেননা, আমাদের মাযহাবে এসবের উদ্দেশ্য একই। আর তা হচ্ছে ইবাদত। আর তা প্রথমোক্ত অবস্থায় পাওয়া গেছে। কেননা, অন্যের পক্ষ হতে কুরবানী করাও শরী'আতে ইবাদত হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকে। লক্ষ্যণীয় যে, নবী করীম (সা) তাঁর উম্মতের পক্ষ হতে কুরবানী করেছেন। এ বর্ণনা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। আর দ্বিতীয় অবস্থায় এ শর্তটি পাওয়া যায়নি। কেননা, খ্রীস্টান ব্যক্তি ইবাদতের যোগ্য নয়। এমনিভাবে গোশত খাওয়ার সংকল্প ইবাদতের পরিপন্থী। যেহেতু এটি কোন একজনের ক্ষেত্রে (ইবাদত) হয়নি, অথচ প্রবাহিত করা কুরবতের ক্ষেত্রে ভাগ বণ্টনকে কবুল করে না, কাজেই কারো ক্ষেত্রেই তা কুরবত হিসাবে গণ্য হবে না। অতএব এ কুরবানী জাইয হতে পারে না। বস্তুত: ইমাম মুহাম্মদ (র) যে অভিমতটি পেশ করেছেন, তা হচ্ছে সূক্ষ্ম কিয়াসের কথা। আর কিয়াসের দাবী হলো : প্রথমোক্ত অবস্থায়ও কুরবানী জাইয হবে না। এটি ইমাম আবু ইউসুফ (র) এরও অভিমত। কেননা, এটি হচ্ছে মাল নষ্ট করে এক ধরনের বদান্যতা প্রদর্শন করা। কাজেই তা অন্যের পক্ষ হতে জাইয হবে না। যেমন মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে দাস মুক্ত করা (জাইয হয় না।)

আমাদের বক্তব্য হলো: কুরবত (ইবাদত)মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতেও জাইয আছে, যেমন মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে সাদাকা করা (জাইয)। কিন্তু দাম মুক্ত করার বিষয়টি এর থেকে ব্যতিক্রম। কেননা, এতে মৃত ব্যক্তির উপর মীরাছ অপরিহার্য করা হয়।

যদি (অংশীদারদের মধ্যে নাবালিকা সন্তান থাকে এবং) অংশীদারগণ নাবালিগের পক্ষ থেকে পশুটি কুরবানী করে অথবা উম্মে ওয়ালাদের পক্ষ হতে তা তারা কুরবানী

করে, তবে কুরবানী জাইয হবে। কেননা, আমরা পূর্বেই একথা বর্ণনা করেছি যে, এটি হচ্ছে মালী ইবাদত। অংশীদারদের কোন একজনের মারা যাওয়ার পর মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশদের অনুমতি ছাড়াই অবশিষ্ট অংশীদারগণ যদি পশুটি যবাহ করে দেয়, তাহলে এ অংশের ক্ষেত্রে এটি কুরবত হিসাবে গণ্য হবে না। আর পূর্বোক্ত অবস্থায় যেহেতু ওয়ারিশগণের অনুমতি পাওয়া গেছে, কাজেই তা কুরবত বা ইবাদত হিসাবে গণ্য হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন : কুরবানীদাতা ব্যক্তি কুরবানীর গোশত নিজে খাবে অপরারপর ধনী-গরীব লোকদেরকে খাওয়াবে এবং ইচ্ছা করলে তা জমা করেও রাখতে পারবে। কেননা, নবী করীম (সা) ইরশাদ করেছেন :

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ اَكْلِ لُحُوْمِ الْاَضَاحِيْ فَكُلُوْا مِنْهَا وَادَّخِرُوْا .

আমি তোমাদেরকে কুরবানীর গোশত খেতে নিষেধ করেছিলাম। কিন্তু এখন থেকে তোমরা তা খাবে এবং জমাও করে রাখতে পারবে। আর যেহেতু ধনী ব্যক্তির জন্য তা খাওয়া জাইয, তাই ধনীকে খাওয়ানোও জাইয হবে।

সাদাকা করার ক্ষেত্রে এক তৃতীয়াংশের থেকে কম সাদাকা না করা মুস্তাহাব। কেননা, কুরবানীর গোশত ব্যবহার করার পদ্ধতি তিনটি যথা -নিজে খাওয়া এবং জমা করে রাখা ঐ হাদীসের ভিত্তিতে, যা আমরা বর্ণনা করেছি।

আর অন্যকে খাওয়ানোর বিষয়টি আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ :

وَاَطْعِمُوْا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ .

–আর আহার করাবে ধৈর্যশীল অভাব গ্রস্তকে ও যাঞ্চাকারী অভাব গ্রস্তকে।

(২২: ৩৬)

এই হিসাবে কুরবানীর গোশত তিন ভাগে বণ্টিত হবে। **ইমাম কুদুরী (র) বলেন : কুরবানীর চামড়া সাদাকা করে দেওয়া হবে।** কেননা, এটি কুরবানীরই একটি অংশ। **অথবা এর দ্বারা এমন কিছু তৈরী করা যাবে, যা ঘরে ব্যবহৃত হবে।** যেমন দস্তরখান, থলে বা চালনি ইত্যাদি। কেননা চামড়া দ্বারা উপকৃত হওয়া হারাম নয়। এমনিভাবে সূক্ষ্ম কিয়াসের দৃষ্টিতে এর দ্বারা এমন জিনিস খরিদ করা যাবে, যেটিকে অক্ষুণ্ন রেখে ঘরে ব্যবহার করা যাবে। আর তা ঐ সমস্ত জিনিসের অনুরূপই, যা আমরা উল্লেখ করেছি। কেননা, বদলকৃত বস্তুর হুকুম, যার বদলা প্রদান করা হয়েছে, এর হুকুমের অনুরূপই হয়ে থাকে। তবে এর দ্বারা এমন জিনিস খরিদ করা যাবে না, যার দ্বারা ফায়দা হাসিল করতে হলে তা অক্ষুণ্ন রাখা যায় না। যেমন–সিরকা, মসলা ইত্যাদি। এ মাসআলাটিকে দিরহাম তথা টাকা-পয়সার বিনিময়ে চামড়া বিক্রি করার মাসআলার উপর কিয়াস করা হয়েছে। এর কারণ এই যে, এভাবে বিনিময় করা মূলত: টাকা -পয়সা ও মালামাল হাসিল করার নিমিত্তে হস্তক্ষেপ করারই শামিল। সহীহ মতানুসারে গোশতের হুকুমও চামড়ার অনুরূপই।

কেউ যদি গোশত বা চামড়া দিরহাম তথা টাকা-পয়সার বিনিময়ে বিক্রি করে, অথবা এমন জিনিসের বিনিময়ে বিক্রি করে, যা অক্ষুণ্ন রেখে উপকৃত হওয়া যায় না, তবে এর মূল্য সাদাকা করে দেবে। কেননা, ইবাদত তার বিনিময়কৃত বস্তুর দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়েছে।

আর রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিম্নোক্ত বাণী :

مَنْ بَاعَ جِلْدَ اُضْحِيَّتِهٖ فَلاَ اُضْحِيَةَ لَهُ .

"যদি কোন ব্যক্তি তার কুরবানীর পশুর চামড়া বিক্রি করে, তবে তার কুরবানী হবে না।"

এর দ্বারা চামড়া বিক্রি করা যে মাক্রূহ তা প্রমাণিত হয়। অবশ্য মূল বেচা-কেনা জাইয। কেননা, উক্ত বস্তুতে ব্যক্তির মালিকানাও আছে এবং সে তা হস্তান্তর করতেও সক্ষম। কুরবানীদাতা ব্যক্তি কুরবানীর পশু থেকে কসাইকে পারিশ্রমিক দিতে পারবে না। কেননা, নবী করীম (সা) হযরত আলী (রা)-কে বলেছিলেন :

تَصَدَّقْ بِجِلاَلِهَا وَخِطَامِهَا وَلاَ تُعْطِ اَجْرَالْجَزَّارِ مِنْهَا شَيْئًا .

পশুর গায়ের জড়ানো চাদর এবং এর লাগাম ও এর নাসারন্ধ্রে পরানো দড়ি সাদাকা করে দেবে। এর থেকে পারিশ্রমিক হিসাবে কসাইকে কিছুই দিতে পারবে না।

উল্লেখ্য যে, উক্ত ব্যাপারে যে নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত রয়েছে, তাতে বেচা কেনার ব্যাপারেও নিষেধাজ্ঞা প্রমাণিত হয়। কেননা, এটিও এক প্রকারের বেচা-কেনা। কুরবানীর পশু যবাহ করার আগে এর পশম কর্তন করে তা দ্বারা উপকৃত হওয়া মাক্রূহ। কেননা, সে কুরবানীর পশুর সমুদয় অংশের দ্বারাই قربة তথা ইবাদত আদায়কে অপরিহার্য করে নিয়েছে। (কাজেই এ ক্ষেত্রে কোন কাট-ছাট করা যাবে না।) কিন্তু যবাহ এর পরবর্তী অবস্থাটি এর থেকে ব্যতিক্রম। কেননা, কুরবানী করার সাথে সাথেই কুরবত প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। যেমন হাজীদের কুরবানীর পশুর ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। কুরবানীর পশুর দুগ্ধ দোহন করে তা দ্বারা উপকৃত হওয়া মাক্রূহ –যেমন পশম কর্তন করা মাক্রূহ।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন : কেউ যদি ভালভাবে যবাহ করতে পারে, তবে তার জন্য উত্তম হলো নিজের কুরবানীর পশু নিজে যবাহ করা। আর ভালভাবে যবাহ করতে না পারলে অন্যের সাহায্য গ্রহণ করা উত্তম। অন্যের সাহায্য গ্রহণের সময় কুরবানীদাতার নিজে সেখানে উপস্থিত থাকা বাঞ্ছনীয়।

কেননা, নবী করীম (সা) হযরত ফাতিমা (রা)-কে বলেন :

قُوْمِىْ فَاشْهَدِىْ اُضْحِيَتَكِ فَانَّهُ يُغْفَرُ لَكِ بِاَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهَا كُلُّ ذَنْبٍ .

তুমি উঠ এবং তোমার কুরবানীর সামনে গিয়ে হাজির হও। কেননা, এ পশুর রক্তের প্রথম বিন্দুর সাথে সাথেই তোমার সমুদয় গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন : কিতাবী কর্তৃক কুরবানীর পশু যবাহ্ করা মাকরূহ। কেননা, যবাহ্ করা এমন আমল, যা মূলত:ই ইবাদত। অথচ কিতাবী ব্যক্তি কুরবতের যোগ্য নয়। অবশ্য কোন মুসলমান যদি কোন কিতাবী ব্যক্তিকে কুরবানী করার জন্য হুকুম দেয় এবং আদিষ্ট হয়ে সে তা যবাহ্ করে, তাহলে এ কুরবানী জাইয হবে। কেননা, কিতাবী ব্যক্তি যবাহ্ করার যোগ্য। আর কুরবত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মুসলিম কর্তৃক কিতাবী ব্যক্তিকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করা এবং মুসলিম ব্যক্তির নিয়তের ভিত্তিতে। পক্ষান্তরে কোন মুসলিম ব্যক্তি যদি কোন অগ্নিপূজক ব্যক্তিকে যবাহ্ করার জন্য হুকুম করে, তবে তার যবাহ্ হালাল হবে না। কেননা, সে যবাহ্ করার যোগ্য নয়। অতএব তার অর্থাৎ অগ্নিপূজক কর্তৃক এ কাজ বরবাদ করা হিসাবে গণ্য হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন : যদি দুই ব্যক্তি ভুল করে একজনে অপর জনের পশু কুরবানী করে ফেলে, তবে তাদের উভয়ের কুরবানী জাইয হয়ে যাবে, এবং তাদের উপর কোন ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না। এটি সূক্ষ্ম কিয়াসের কথা। এ সম্বন্ধে মূল নীতি হলো এই যে, কোন ব্যক্তি যদি অন্যের কুরবানীর পশু তার অনুমতি ব্যতিরেকে যবাহ্ করে, তবে কুরবানীদাতার জন্য এ পশু খাওয়া হালাল হবে না। বরং যবাহ্কারী ব্যক্তি এর মূল্য পরিশোধের ব্যাপারে জামিনদার হবে। আর কিয়াসের দৃষ্টিতেও এতে কুরবানী আদায় হবে না। এটি ইমাম যুফার (র) এরও অভিমত। কিন্তু সূক্ষ্ম কিয়াসের দৃষ্টিতে কুরবানী জাইয হবে। আর যবাহ্কারী ব্যক্তির উপর কো্ন ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না। এটিই আমাদের অভিমত।

কিয়াসের যুক্তি হলো এই যে, উক্ত ব্যক্তি অন্যের পশু তার অনুমতি ছাড়াই যবাহ্ করে ফেলেছে। কাজেই তাকে এর ক্ষতিপূরণ আদায় করতে হবে। যেমন কেউ যদি কসাই এর খরিদকৃত বকরী যবাহ্ করে দেয়, (তবে তার উপর ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হয়।)

আর সূক্ষ্ম কিয়াসের যুক্তি হল এই যে, উক্ত পশুটি কুরবানীর জন্য সুনির্দিষ্ট হওয়ার কারণে তা যবাহের জন্য সুনির্দিষ্ট হয়ে গেছে। আর এ কারণেই উক্ত পশুটি কুরবানীর দিনে যবাহ্ করা তার উপর ওয়াজিব এবং এ পশুটিকে অন্য পশুর দ্বারা পরিবর্তন করা মাক্রূহ। এই কারণেই প্রাসঙ্গিকভাবে প্রমাণিত যে, পশুর মালিক সাহায্য প্রার্থনাকারী বলে গণ্য হবে–প্রত্যেক ঐ ব্যক্তির নিকট থেকে, যে কুরবানী করার যোগ্য এবং তার পক্ষ হতে উক্ত ব্যক্তির জন্য এটি অনুমতি বলেও সাব্যস্ত হবে। কেননা, কুরবানীর এই দিনগুলো অতিক্রান্ত হয়ে কুরবানী হাতছাড়া হয়ে যাওয়ারও আশংকা রয়েছে এবং হতে পারে যে, কোন 'ওযরের' কারণে পশুর মালিক একে কুরবানী করতে অপারগ হয়ে পড়েছে। কাজেই এই মাসআলাটি এমন হলো, যেন কসাই কোন বকরীর পা বাঁধার পর অন্য কেউ এসে তা যবাহ্ করে দিল। (কাজেই তার উপর ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না।)

যদি এখানে প্রশ্ন করা হয় যে, এতে তো একটি মুস্তাহাব আমল ছুটে যাচ্ছে। আর তা হচ্ছে কুরবানীর পশু নিজে যবাহ করা অথবা যবাহের সময় নিজে সেখানে উপস্থিত থাকা। কাজেই কুরবানীদাতা ব্যক্তি অন্যের যবাহের উপর রাযী থাকতে পারে না। এরূপ প্রশ্ন করা হলে এর জবাবে আমরা বলবো যে, এখানে কুরবানীদাতার আরো অতিরিক্ত দুটি মুস্তাহাব আমলের সওয়াব অর্জিত হচ্ছে। তা হলো (১) সে যে পশুটিকে কুরবানীর জন্য নির্দিষ্ট করেছে, তার কুরবানী সে সম্পাদন করে নিয়েছে (২) এবং এ বিষয়টিকে সে তড়িৎভাবে সম্পাদন করে নিয়েছে। সুতরাং কুরবানীদাতা ব্যক্তি অন্যের মাধ্যমে কুরবানী সম্পাদিত হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চয়ই রাযী থাকবে। (নারাজ হওয়ার কোন কারণ নেই।)

আমাদের উলামায়ে কিরামের নিকট এ জাতীয় আরো ইস্‌তিহ্‌সানি[১] মাসাইল রয়েছে। যেমন কেউ অন্যের গোশত রান্না করে নিল, বা অপরের গম পিষে নিল, কিংবা অন্যের কলস উঠানোর সময় তা ভেঙ্গে গেল অথবা কেউ অপরের সওয়ারীর উপর নিজের বোঝা উঠালো এবং এতে তা মারা গেল, এইসব কিছু মালিকের অনুমতি ছাড়া হয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির উপর এর ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে।

পক্ষান্তরে মালিক যদি ডেগচিতে গোশত রেখে ডেগচি উনানের উপর রাখে এবং উনানের নীচে থাকে লাকড়ি, এ অবস্থায় অপর কোন ব্যক্তি যদি আগুন জ্বালিয়ে ঐ গোশ্‌ত রান্না করে নেয় অথবা মালিক যদি টুকরীতে গম রেখে (চক্কি চালানোর জন্য) এর সাথে পশু বেঁধে দেয় এবং অপর কোন ব্যক্তি এসে পশুটি চালিয়ে আটা পিষে নেয় অথবা মালিক যদি তার কলসটি উপরে উঠানোর জন্য উদ্যত হয় এবং তা নিজের দিকে ঝুঁকিয়ে নেয়, এ অবস্থায় যদি অন্য কোন ব্যক্তি কলসটি উপরে উঠাতে তাকে সাহায্য করে, আর অমনি তা তাদের উভয়ের হাতে ভেঙ্গে যায়, অথবা মালিক যদি নিজের সওয়ারীর উপর কোন বোঝা উঠায় এবং পরে এর পিঠ থেকে পড়ে যায়, এ অবস্থায় অন্য কোন ব্যক্তি যদি পড়ে যাওয়া মালামালসমূহ ঐ সওয়ারীর পিঠে উঠিয়ে দেয় এবং এতে সে মারা যায়, তাহলে উপরোক্ত অবস্থাসমূহে দ্বিতীয় ব্যক্তির উপর সূক্ষ্ম কিয়াসের ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না। কেননা, উপরোক্ত অবস্থা সমূহে আনুষঙ্গিকভাবে অনুমতি বিদ্যমান রয়েছে। উক্ত বক্তব্য যেহেতু সুপ্রমাণিত, কাজেই আমরা কুদূরী গ্রন্থের "এক ব্যক্তি কর্তৃক অপর ব্যক্তির কুরবানীর পশু তার স্পষ্ট অনুমতি ছাড়া যবাহ করা" সম্বন্ধে বলবো যে, এটি তো হুবহু ইমাম যুফার (র) এর সেই ইখ্‌তিলাফী (মতানৈক্য সম্বলিত) মাসআলা। এতে কিয়াস ও সূক্ষ্ম কিয়াস উভয়টিই প্রযোজ্য, যেমন আমরা উল্লেখ করেছি। অতএব উপরোক্ত অবস্থায় উল্লেখিত দুই ব্যক্তির প্রত্যেকেই অপর ব্যক্তির নিকট থেকে সে পশু, যার চামড়া ছোলা হয়েছে, তা নিয়ে নেবে এবং তাদের কারো উপরই কোন ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না। কেননা, তারা তাদের কর্মের ব্যাপারে প্রাসংগিকভাবে একজন অপর জনের প্রতিনিধি।

১. এমন মাসআলা সমূহ, যা সূক্ষ্ম কিয়াসের আলোকে প্রমাণিত।

দুইজনের প্রত্যেকেই অন্য জনের পশু যবাহ করে খেয়ে ফেলার পর যদি তারা (মূল ঘটনা) জানতে পারে, তবে তারা নিজ নিজ পশু অন্য জনের জন্য হালাল করে দিবে (এবং বলে দিবে যে, এতে আমার কোন দাবী নেই) এবং এতেই তাদের প্রত্যেকের কুরবানী সহীহ হয়ে যাবে। কেননা, কুরবানী দাতার জন্য প্রথমেই কুরবানীর গোশত অন্যকে আহার করানো জাইয যদিও সে ধনী ব্যক্তি হয়। অনুরূপভাবে শেষ অবস্থায়ও তা অন্যের জন্য হালাল করে দেওয়া জাইয আছে।

আর যদি উক্ত দুই ব্যক্তি পরস্পর বিবাদে লিপ্ত হয়,[১] তাহলে তাদের প্রত্যেকেই অপর ব্যক্তির নিকট থেকে নিজ নিজ গোশতের ক্ষতিপূরণ মূল্যের ক্ষতিপূরণ আদায় করে নিতে পারবে। তারপর এ মূল্য সমূহ সবই সাদাকা করে দিতে হবে। কেননা এতো গোশতের পরিবর্তে গৃহীত বিনিময়। কাজেই এটি কুরবানীর গোশ্ত বিক্রি করে দেওয়ার মতে হয়ে গেল। কেননা, কুরবানী যার গোশতও তারই হবে। কেউ যদি অপরের কুরবানীর গোশত নষ্ট করে দেয়, তাহলে এর হুকুম তাই হবে, যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। **কেউ যদি কারো বকরী ছিনিয়ে নিয়ে তা কুরবানী করে, তাহলে বকরী মূল্য তাকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে পরিশোধ করতে হবে। তবে তার কুরবানী জাইয হয়ে যাবে**। কেননা, সে পূর্বোক্ত জবর দখল বা ছিনিয়ে আনার দ্বারা এর মালিক হয়ে গিয়েছে। (কাজেই কুরবানী জাইয হবে।) পক্ষান্তরে, যদি কারো নিকট একটি বকরী আমানত রাখা হয় এবং পরে সে তা কুরবানী করে দেয় (তবে তার কুরবানী জাইয হবে না।) কেননা, যবাহ এর কারণেই আমানত গ্রহীতার উপর ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হয়। কাজেই যবাহ এর পূর্বে তার জন্য এতে মালিকানা সাব্যস্ত হবে না বরং যবাহ এর পরেই এতে তার মালিকানা সাব্যস্ত হবে। আল্লাহ তা'আলাই এ সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত।

كِتَابُ الْكَرَاهِيَةِ
অধ্যায় ঃ মাকরূহ বিষয়াদি

بِسمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْكَرَاهِيَةِ

অধ্যায় ঃ মাকরূহ[1] বিষয়াদি সম্পর্কিত মাসাইল

হিদায়া গ্রন্থকার শায়খ বুরহান উদ্দীন (র) বলেন ঃ মাক্রূহ শব্দের অর্থ সম্বন্ধে ফিক্হ শাস্ত্রবিদগণের একাধিক অভিমত রয়েছে। ইমাম মুহাম্মদ (র) হতে স্পষ্টভাবে বর্ণিত রয়েছে যে, প্রতিটি মাক্রূহ বিষয়ই হারাম। তবে এ ব্যাপারে তিনি যেহেতু (কুরআন ও হাদীসের) কোন অকাট্য দলীল পাননি, এ কারণে তিনি এর উপর হারাম শব্দ প্রয়োগ করেননি। ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, মাক্রূহ হারামের নিকটবর্তী। কারাহিয়া অধ্যায়ে কয়েকটি অনুচ্ছেদ রয়েছে।

পরিচ্ছেদ ঃ খাদ্য ও পানীয় বস্তু সম্পর্কিত মাসাইল

ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন ঃ গাধীর গোশ্ত খাওয়া এরপর দুধ এবং উটের পেশাব পান করা মাক্রূহ। পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন ঃ উটের পেশাব পান করাতে কোন দোষ নেই। ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর মতের ব্যাখ্যায় বলা হয় যে, যদি চিকিৎসার জন্য উটের পেশাব পান করা হয়, তবে এতে কোন দোষ নেই। এ বিষয়ে আমরা সালাত ও যবাহ্ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এখানে আর এর পুনরুল্লেখ করবো না। উল্লেখ্য যে, দুধ গোশত থেকেই সৃষ্টি হয়, কাজেই গোশতের হুকুম যা, দুধের হুকুমও তাই হবে।

---

১. কারাহিয়্যা (كراهية) শব্দের আভিধানিক অর্থ ঃ অপসন্দ করা। আর অপসন্দনীয় কাজ, বস্তু বা আচরণকে মাক্রূহ বলা হয়: মাক্রূহ দুই প্রকার। (১) মাক্রূহ তাহরীমী যা হারামের কাছাকাছি বা যে কাজের পরিণাম স্বরূপ শাস্তির ভয় প্রদর্শিত হয়েছে। (২) মাক্রূহ তানযীহী যে কাজ বা আচরণের পরিনাম স্বরূপ শাস্তির ভয় প্রদর্শিত হয়নি, তবে এ ধরনের কাজ বা আচরণ শরী'আত পসন্দ করে না উল্লেখ্য যে, হিদায়া গ্রন্থকার শায়খ বুরহান উদ্দীন (র) এ অধ্যায়ে যেমন মাক্রূহ বিষয়াদি সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন তেমনিভাবে তিনি এতে মাকরূহ নয় এমন বিষয়াদি সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ পুরুষ মহিলা কারো জন্যই সোনা-রূপার পাত্রে পানাহার করা জাইয নয়। এমনিভাবে এগুলোকে তৈল ও সুগন্ধির পাত্র হিসাবেও ব্যবহার করা জাইয নয়।

কেননা, যারা সোনা-রূপার পাত্রে পানাহার করে, নবী করীম (সা) তাদের সম্বন্ধে বলেছেন ঃ

إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِيْ بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ ۔

–সে তো তার পেটের ভেতর জাহান্নামের আগুন ভরছে।

বর্ণিত আছে যে, একদা রূপার পাত্রে হযরত আবু হুরায়রা (রা)-কে পানি দেওয়া হলে তিনি তা কবুল করেননি। এবং সাথে সাথেই তিনি বলেন ঃ এরূপ পাত্র ব্যবহার করতে রাসূলুল্লাহ (স) আমাদেরকে নিষেধ করেছেন।

উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত হাদীস দ্বারা যেহেতু সোনা-রূপার পাত্রে পান করা নিষিদ্ধ প্রমাণিত হয়, কাজেই এতে করে তৈল ইত্যাদি ব্যবহার করাও নিষেধজ্ঞার আওতাভুক্ত হবে। কেননা, তৈল ব্যবহারও পান করার মতই একটি বিষয়। অধিকন্তু এতে রয়েছে মুশরিক লোকদের আকৃতি-প্রকৃতির অনুসরণ এবং বিলাসপ্রিয় অপব্যয়কারী লোকদের বিলাসীতার অন্ধ অনুকরণ।

উল্লেখ্য যে, ইমাম মুহাম্মদ (র) 'জামে সগীর' গ্রন্থে لَا يَجُوْزُ (জাইয নেই)– এর স্থানে يُكْرَهُ (মাকরূহ হবে) বলেছেন। এর দ্বারা হারাম হওয়া বুঝানোই উদ্দেশ্য। নিষেধাজ্ঞার হুকুম যেহেতু ব্যাপক, তাই এ ক্ষেত্রে পুরুষ-মহিলা সকলেই সমান। এমনিভাবে সোনা-রূপার চামচে কোন কিছু খাওয়া, সোনা-রূপার শলা দ্বারা চোখে সুরমা লাগানো বা এর অনুরূপ কোন কিছু তৈরী করা যেমন সুরমাদানী, আয়না ইত্যাদি সব কিছুর ক্ষেত্রে উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে। এর কারণ আমরা পূর্বেই বর্ণনা করেছি।
ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ দস্তা, কাঁচ, স্ফটিক, আকীক পাথরের পাত্র ব্যবহার করাতে কোন দোষ নেই। ইমাম শাফিঈ (র) বলেন এ জাতীয় পাত্র ব্যবহার করা মাকরূহ। কেননা, অহংকার প্রকাশের ক্ষেত্রে এগুলোও সোনা-রূপার মতই। আমাদের পক্ষ হতে এ যুক্তির জবাবে বলা হয় যে, আসলে বিষয়টি এমন নয়। কেননা, সোনা-রূপা ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা অহংকার প্রকাশের অভ্যাস তাদের বা মুশরিকদের মধ্যে ছিল না।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে রূপার নিকেল করা পাত্রে পানি পান করা জাইয। অনুরূপভাবে রূপার নিকেল করা গদীর উপর আরোহণ, রূপার নিকেল করা চেয়ার এবং চৌকিতে উপবেশন করা জাইয, যদি রূপা বিজড়িত স্থানটুকু বাদ দিয়ে তা ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ পান করার সময় ঐ স্থানে যেন মুখ না লাগে। মুখ লাগানো থেকে বেঁচে থাকবে। কেউ কেউ বলেন, রূপার স্থান থেকে মুখ সরিয়ে রাখবে এবং ধরার সময় ঐ স্থান থেকে হাতও সরিয়ে রাখবে। আর চৌকি ও গদীর ক্ষেত্রে রূপার স্থান হতে সরে বসবে।

পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইউসূফ (র) বলেন ঃ উপরোক্ত সবগুলো বিষয়ই মাক্রূহ। আর ইমাম মুহাম্মদ (র) এর এক বর্ণনা ইমাম আবু হানীফা (র) এর মত এবং অপর এক বর্ণনা ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর মত। অনুরূপ মতভেদ রয়েছে ঐ পাত্র ও চেয়ারের ক্ষেত্রে, যাতে সোনা ও রূপার পাত লাগানো হয়েছে। এমনিভাবে যদি তরবারির গায়ে সোনা-রূপা জড়ানো হয়, অথবা শান দেওয়ার পাথরের সোনা-রূপা জড়ানো অথবা আয়নার বৃত্ত যদি সোনা রূপার দ্বারা প্রস্তুত করা হয, তবে এসব ক্ষেত্রেও অনুরূপ মতভেদ রয়েছে। এরূপ মতভেদ ঐ মাসহাফ তথা গ্রন্থের ক্ষেত্রেও রয়েছে, যা স্বর্ণ-রৌপ্যের দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়েছে। এমনিভাবে যদি লাগাম, পাদানী ও লেজ বন্ধনী রৌপ্য খচিত হয় তবে এ অবস্থায়ও অনুরূপ মতভেদ রয়েছে। এমনিভাবে যে কাপড়ে স্বর্ণ বা রৌপ্য খচিত কোন লেখা রয়েছে, সে ক্ষেত্রে উক্ত মতভেদ প্রযোজ্য হবে। উক্ত মতভেদ ঐ সোনা-রূপার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, যা উপরোক্ত বস্তুসমূহ থেকে পৃথক করা যায়। পক্ষান্তরে যদি কোন বস্তুকে সোনা-রূপা এমনভাবে গিলিট করা হয়, যা পৃথক করা যায় না; তাহলে এ জাতীয় বস্তু ব্যবহার করাতে কোন দোষ নেই। এ ব্যাপারে ফকীহগণের ইজ্‌মা সংঘটিত হয়েছে।

সাহেবাইনের যুক্তি হলো কোন পাত্রের অংশ বিশেষ ব্যবহারকারী ব্যক্তি মূলত পাত্রের সমুদয় অংশসমূহ ব্যবহারকারী হিসাবেই গণ্য হয়ে থাকে। সুতরাং তা মাকরূহ হিসাবেই গণ্য হবে। যেমনিভাবে স্বর্ণ-রৌপ্য জড়িত অংশটি ব্যবহার করা হলে তা মাকরূহ্ হয়ে থাকে।

আর ইমাম আবু হানীফা (র) এর দলীল হলো এই যে, উপরে যে স্বর্ণ-রৌপ্যের কথা বলা হয়েছে, তা মূল জিনিসের তাবে (মূল জিনিষের সাথে সংশ্লিষ্ট)। আর তাবে তথা সংশ্লিষ্ট বিষয় শরীআতে ধর্তব্য হয় না। কাজেই সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ভিত্তিতে কোন জিনিষকে মাকরূহ বলা যাবে না। যেমন রেশমের ঝালরযুক্ত পাঞ্জাবী, রেশমের কারুকার্য খচিত কাপড় এবং আংটির পাথরের উপর স্বর্ণের কীলক।

ইমাম মুহাম্মদ (জামে সগীর গ্রন্থে) বলেন ঃ এক ব্যক্তি তার অগ্নিপূজক শ্রমিক বা খাদিমকে (গোশত খরীদ করার জন্য) প্রেরণ করলো। এরপর সে গোশত খরীদ করে এনে বললো ঃ আমি এই গোশত ইয়াহুদী খৃষ্টান বা মুসলমান থেকে খরীদ করেছি, তাহলে প্রেরণকারী ব্যক্তির জন্য এ গোশ্‌ত খাওয়া জাইয হবে। কেননা, মু'আমালাত তথা লেনদেনের ক্ষেত্রে কাফির ব্যক্তির কথাও গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে। আর এ সংবাদ বিশুদ্ধ, কেননা তা অর্জিত হয়েছে এমন ব্যক্তির থেকে যার বিবেক আছে এবং ধর্মও আছে যে ধর্মে মিথ্যা বলা হারাম বলে বিশ্বাস করা হয়। আর যেহেতু মানব জীবনে লেনদেনের বিষয়টি খুব বেশী ঘটে থাকে, তাই অগ্নিপূজক ব্যক্তির সংবাদ গ্রহণ করার বিষয়টি অনস্বীকার্য এবং অতীব জরুরী।

আর যদি গোশত **খরীদকারী** অন্যরকম বলে (যেমন **বলল**, আমি এ গোশত **অগ্নিপূজক হতে খরীদ করেছি),তবে** প্রেরণকারী ব্যক্তির জন্য এ গোশত **খাওয়া জাইয** হবে না। **অর্থাৎ** যদি কিতাবী বা মুসলিম ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ তা যবাহ করে, তাহলে

উক্ত হুকুম হবে। কারণ বৈধতার ক্ষেত্রে যেহেতু তার কথা গ্রহণযোগ্য হয়েছে, কাজেই অবৈধতার বর্ণনার ক্ষেত্রেও তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে, যা বলার অপেক্ষা রাখে না।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ হাদিয়া এবং অনুমতি (প্রাপ্তির সংবাদ প্রদান) এর ব্যাপারে দাস-দাসী এবং নাবালিগের কথা গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা, হাদিয়া সাধারণত এ জাতীয় লোকদের হাতেই প্রেরণ করা হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে সফরে বা বাজারে বেচা-কেনার সময় অনুমতির ব্যাপরে সাক্ষী সাথে রাখা সম্ভব নয়, তা সত্ত্বেও যদি তাদের কথা কবুল না হয়, তবে এতে অসুবিধা সৃষ্টি হবে।

'জামে সগীর' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, যদি কোন ক্রীতদাসী কাউকে বলে যে, আমাকে আমার মুনীব তোমার জন্য হাদিয়া স্বরূপ প্রেরণ করেছেন, তাহলে উক্ত ব্যক্তি তা গ্রহণ করতে পারবে। কেননা, পূর্বেই আমরা এ কথা বলেছি যে, দাসী তার নিজেকে অথবা অন্য কোন বস্তুকে হাদিয়া স্বরূপ পাঠানোর সংবাদ দিলে তাতে কোন পার্থক্য নেই।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ লেন-দেনের ক্ষেত্রে ফাসিকের কথা গ্রহণযোগ্য হবে। কিন্তু দ্বীনি বিষয়ে একমাত্র ন্যায়পরায়ণ ও বিশ্বস্ত ব্যক্তির কথাই গ্রহণযোগ্য হবে।

এক্ষেত্রে পার্থক্যের কারণ হলো এই যে, লেন-দেনের বিষয়টি মানুষের মধ্যে খুব বেশী ঘটে থাকে। কাজেই এ অবস্থায় যদি অতিরিক্ত কোন শর্ত আরোপ করা হয়, তবে তাতে জটিলতা সৃষ্টি হবে। অতএব এ ক্ষেত্রে এক ব্যক্তির কথাও গ্রহণযোগ্য হবে। চাই সে ন্যায়পরায়ণ হোক বা ফাসিক, কাফির হোক বা মুসলমান, আযাদ হোক বা ক্রীতদাস পুরুষ হোক বা মহিলা, উক্ত জটিলতা দূর করার জন্য।

পক্ষান্তরে দ্বীনি বিষয়ের প্রচলন লেন-দেনের তুলনায় খুব কর্ম হয়ে থাকে। কাজেই এ ক্ষেত্রে অতিরিক্ত শর্ত আরোপ করা বিধিসম্মত বিষয়। অতএব এ ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণ বিশ্বস্ত মুসলিম ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা, ফাসিক তো অভিযুক্ত ব্যক্তি। আর কাফির ব্যক্তি নিজেই ইসলামী অনুশাসনের অনুসারী নয়। কাজেই সে কোন মুসলমানের উপর কোন বিধানকে চাপিয়ে দিতে পারবে না, কিন্তু লেন-দেনের বিষয়টি এর থেকে ব্যতিক্রম। কেননা, লেন-দেনের সুব্যবস্থা ছাড়া কোন কাফির ব্যক্তি আমাদের দেশে অবস্থান করতে পারবে না। আর লেন-দেন সম্ভব হবে না লেন-দেনের ক্ষেত্রে তার কথা গ্রহণ করা ব্যতিরেকে। তাই এ অনিবার্য কারণে তার কথা গ্রহণ করা হবে। (দ্বীনি বিষয়ে)যার অবস্থা অজ্ঞাত ও অখ্যাত, যাহিরী রিওয়ায়েত অনুসারে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। আর ইমাম আবু হানীফা (র) হতে বর্ণির্ত আছে যে, এ ক্ষেত্রে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। ইমাম আবু হানীফা (র) স্বীয় নীতির থেকেই এ কথা বলেছেন। কেননা, তাঁর মতে অজ্ঞাত ও অখ্যাত ব্যক্তির কথার ভিত্তিতে বিচারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়। যাহিরী রিওয়ায়েত অনুসারে অজ্ঞাত অখ্যাত ব্যক্তি এবং ফাসিক ব্যক্তি উভয়ই সমান। সুতরাং তাদের উভয়ের ক্ষেত্রে অধিকতর প্রবল ধারণার উপর বিবেচনা করা যায়।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ দ্বীনি বিষয়ে দাস-দাসী এবং আযাদ ব্যক্তির কথা গ্রহণযোগ্য হবে, যদি তারা ন্যায়পরায়ণ ও বিশ্বস্ত হয়। কেননা, ন্যায়পরায়ণ ও বিশ্বস্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে সততার দিকটিই প্রবল হয়ে থাকে। আর এ প্রাবল্যের কারণেই কথা গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে। পূর্বোল্লোখিত বিষয়গুলো লেন-দেনের অন্তর্ভুক্ত এবং উকিল নিয়োগ করার বিষয়টিও এর অন্তর্ভুক্ত।

দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত বিষয় হলোঃ পানির অপবিত্র হওয়া সম্বন্ধে সংবাদ দেওয়া। অতএব কোন বিশ্বস্ত মুসলিম ব্যক্তি যদি এ বিষয়ে সংবাদ দেয়, তবে এ পানি দ্বারা উযূ করা যাবে না, বরং তায়াম্মুম করতে হবে। যদি সংবাদদাতা ব্যক্তি ফাসিক বা অজ্ঞাত ও অখ্যাত হয়, তবে চিন্তা ভাবনা করে দেখতে হবে। যদি সে সত্যবাদী বলে মনে প্রবল ধারণা হয়, তবে তায়াম্মুম করবে। এ পানি দ্বারা উযূ করা জাইয হবে না। অবশ্য যদি সে এ পানি দিয়ে উযূ করে এবং এরপর তায়াম্মুমও করে, তবে এটি হবে খুবই সতর্কতামূলক কাজ।

উল্লেখ্য যে, যদি সংবাদদাতার মধ্যে ন্যায়পরায়ণতা ও বিশ্বস্ততা থাকে, তবে তার ক্ষেত্রে আর মিথ্যার কোন সম্ভাবনা থাকে না। কাজেই এ ক্ষেত্রে সে পানি দিয়ে উযূ করে সতর্কতা অবলম্বনের কোন অর্থ নেই। আর চিন্তা করা হলো শুধুমাত্র একটি ধারণা। এই অবস্থায় যদি প্রবল ধারণা হয় যে, লোকটি তার কথায় মিথ্যাবাদী, তবে সে উক্ত পানি দ্বারা উযূ করবে, তায়াম্মুম করবে না। কেননা, চিন্তার ভিত্তিতে মিথ্যার দিকটি প্রবল হয়েছে। এটি (উযূ করা, কিন্তু তায়াম্মুম না করা) হচ্ছে শরী'আতের আইনগত কথা। তবে সতর্কতার কথা হলো, উযূর পর তায়াম্মুমও করে নেওয়া। ঐ কারণে যা আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি।

দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহের মধ্যে আরেকটি বিষয় হলো, হালাল- হারাম সম্পর্কে সংবাদ দেওয়া, যদি এতে কারো মালিকানা বিদূরিত না হয়। এ ক্ষেত্রে বিস্তারিত বিবরণ এবং বহু শাখা-প্রশাখা জাতীয় মাসআলা রয়েছে। সেগুলো আমরা 'কিফায়াতুল মুন্তাহী' গ্রন্থে উল্লেখ করেছি।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন ঃ যদি কাউকে ওলীমার দাওয়াত দেওয়া হয় অথবা কোন ভোজসভায় নিমন্ত্রণ করা হয় এবং সে সেখানে গিয়ে দেখে যে, উক্ত ভোজসভায় ক্রীড়া-কৌতুক অথবা গান-বাজনা চলছে, তবে সেখানে বসে খানা খাওয়াতে কোন দোষ নেই। ইমাম আবু হানীফা (র) বলেনঃ আমিও একবার এ সমস্যায় পড়েছিলাম, তখন ধৈর্য ধারণ করেছিলাম। এর কারণ হলো এই যে, দাওয়াত গ্রহণ করা সুন্নত।

নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ

مَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ .

যে ব্যক্তি দাওয়াত কবুল করলো না, সে আবুল কাশিম [রাসূলুল্লাহ (স)] এর নীতি অমান্য করলো।

কাজেই অন্যের কোন বিদ'আতী কর্মকাণ্ডের সংমিশ্রণের কারণে তা বর্জন করা যাবে না। যেমন জানাযার নামায কায়েম করা ওয়াজিব, যদিও সেখানে কান্নাকাটি চলতে থাকে। আমন্ত্রিত ব্যক্তি তাদেরকে এ কাজে বাধা দিতে পারলে বাধা দিবে। আর বাধা দিতে না পারলে ধৈর্য ধারণ করবে। এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে, যদি আমন্ত্রিত ব্যক্তি নেতৃস্থানীয় এবং অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব না হয়। যদি সে নেতৃস্থানীয় ও অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব হন, কিন্তু বাধা দিতে সক্ষম না হন, তবে সেখানে না বসে বের হয়ে চলে আসবেন। কেননা, এতে দ্বীনের উপর কলঙ্ক আসে এবং সাধারণ মুসলমানদের জন্য অন্যায়ের রাস্তা উন্মুক্ত হয়ে যায়।

উক্ত কিতাবে (জামে সগীরে) ইমাম আবু হানীফা (র) সম্পর্কে যা বর্ণনা করা হয়েছে, তা তাঁর অনুসরণীয় ও নেতৃস্থানীয় ইমাম হিসাবে পরিচিত হওয়ার পূর্বের ঘটনা।

যদি খানার দস্তরখানেই গান- বাজনা হতে থাকে, তবে সেখানে বসা কারো জন্যই সমীচীন নয়। যদিও সে নেতৃস্থানীয় কোন ব্যক্তি না হয়।

কেননা, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرٰى مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۔

তবে স্মরণ হওয়ার পরে যালিম সম্প্রদায়ের সাথে বসবে না। (৬:৬৮)

এইসব কথা অনুষ্ঠানে উপস্থিতির পরে জানার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। আর উপস্থিতির আগেই যদি এ সম্পর্কে জানতে পারে, তবে এ জাতীয় মজলিসে যোগদান করবে না। কেননা, এ অবস্থায় দাওয়াত গ্রহণের হক তার উপর বর্তায় না। পক্ষান্তরে যদি কাউকে দাওয়াত গ্রহণের উপর বাধ্য করা হয় (তবে তার বিষয়টি ব্যতিক্রম হবে।) কেননা, এ অবস্থায় তার উপর দাওয়াত গ্রহণের হক অপরিহার্য হয়ে যায়। উপরোক্ত মাসআলা থেকে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, সব রকমের খেলাধূলা হারাম। এমনকি বাঁশের বাঁশি দ্বারা গান করাও হারাম। অনুরূপভাবে ইমাম আবু হানীফা (র) এর বক্তব্য "আমিও একবার এরূপ পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলাম," থেকেও হারাম হওয়া প্রতীয়মান হয়। কেননা, اِبْتِلَاءُ (পরীক্ষা)-এর সম্মুখীন হওয়া হারাম কাজের ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে।[১]

---

১. গান গাওয়া এবং গান শুনা উভয়ই হারাম। এমনিভাবে গানের অনুষ্ঠানে যোগদান করাও হারাম, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন ঃ

اِسْتِمَاعُ الْمَلَاهِىْ مَعْصِيَةٌ وَالْجُلُوْسُ فِيْهَا فِسْقٌ وَالتَّلَذُّذُ بِهَا كُفْرٌ ۔

গান বাজনা শুনা পাপ, গানের মজলিসে বসা ফিস্‌ক (আল্লাহ্‌র হুকুম অমান্য করার শামিল) এবং গান শুনে স্বাদ গ্রহণ করা কুফরী। অপর এক হাদীসে বর্ণিত রয়েছে;

রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেনঃ আল্লাহ্ তাআলা মদ, জুয়া, তবলা ও সারেঙ্গী হারাম করেছেন।

(মুসনাদে আহমদ, সুনানে আবু দাউদ)

পরিচ্ছেদ ঃ পোশাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কিত মাসাইল

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ পুরুষদের জন্য রেশমী পোশাক পরিধান করা হালাল নয়। কিন্তু মহিলাদের জন্য হালাল। কেননা, নবী করীম (সা) রেশমী এবং রেশমী কিংখাব কাপড় পরিধান করতে নিষেধ করেছেন এবং তিনি বলেছেন ঃ

إِنَّمَا يَلْبِسُهُ مَنْ لَاخَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ .

–রেশমী বস্ত্র তারাই পরিধান করবে, যাদের আখিরাতে কোন অংশ নেই।

তবে নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা মহিলাদের জন্য তা হালাল হওয়া সাব্যস্ত হয়েছে। হাদীসটি কয়েকজন সাহাবী বর্ণনা করেছেন। তাদের মধ্যে একজন হলেন হযরত আলী (রা)। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা) এক হাতে রেশমের কাপড় এবং অন্য হাতে স্বর্ণ নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে এলেন এবং বললেন : আমার উম্মতের পুরুষ লোকদের জন্য এই দুইটি বস্তু হারাম। আর তাদের নারীদের জন্য হালাল। কোন কোন বর্ণনায় حَلَالٌ لِاِنَاثِهِمْ এর পরিবর্তে حِلٌّ لِإِنَاثِهِمْ বর্ণিত রয়েছে। কিন্তু সামান্য পরিমাণ হলে তা মাফ ক্ষমাযোগ্য। আর তা হলো তিন বা চার আঙ্গুল পরিমাণ কাপড়। যেমন কাপড়ে রেশমের বুটা বা ঝালর বিশিষ্ট কাপড়। কেননা, বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সা) রেশমী পোশাক পরিধান করতে নিষেধ করেছেন। তবে দুই,তিন বা চার আঙ্গুল পরিমাণ হলে তা ক্ষমাযোগ্য। বস্তুত এর দ্বারা বুটা ইত্যাদিকে বুঝিয়েছেন। অধিকন্তু নবী করীম (সা) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি রেশমের ঝালর বিশিষ্ট জুব্বা পরিধান করতেন।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন : ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে রেশমের বালিশে হেলান দেওয়া এবং এর উপর মাথা রেখে নিদ্রা যাওয়াতে কোন দোষ নেই। কিন্তু সাহেবায়ন (র) বলেন : এরূপ করা মাকরূহ। 'জামে সগীর' গ্রন্থে শুধুমাত্র ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর কথা উল্লেখ করা হয়নি। অবশ্য ইমাম কুদূরী (র)-এর অপরাপর মাশায়িখে কিরাম তাঁর কথা উল্লেখ করেছেন। অনুরূপ মতভেদ রেশমের পর্দা তৈরী করা এবং তা দরজায় ঝুলিয়ে রাখার ব্যাপারে।

ইমাম আবু ইউসুফ এবং ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর দলীল হলো- উপরোক্ত হাদীসসমূহ, যাতে ব্যাপকভাবে রেশমী কাপড় ব্যবহার করতে নিষেধ করা হয়েছে। অধিকন্তু রেশমী বালিশ ইত্যাদি ব্যবহার করা হচ্ছে অনারব রাজন্যবর্গ এবং অহংকারী লোকদের প্রথা। অথচ তাদের সাদৃশ্য অবলম্বন হারাম।

হযরত 'উমর (রা) বলেছেন ঃ إِيَّاكُمْ وَزِيَّ الْأَعَاجِمِ .

তোমরা অনাবর লোকদের লেবাস-পোশাকের অনুরূপ পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করা হতে বেঁচে থাকবে।

ইমাম আবু হানীফা (র) এর দলীল হলো, রাসূলুল্লাহ (সা) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি রেশমের হেলান দেয়া বালিশে হেলান দিয়ে বসেছেন। এমনিভাবে হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা)-এর বিছানার উপর রেশমের হেলানা দেয়া বালিশ পাওয়া যেত। এ বিষয়ে যৌক্তিক দলীল হলো এই যে, পরিধেয় বস্ত্রের ক্ষেত্রে সামান্য পরিমাণ রেশম মুবাহ যেমন বুটা, ঝালর ইত্যাদি। কাজেই স্বল্প পরিমাণ রেশমী কাপড় পরিধান এবং এর ব্যবহার মুবাহ হওয়া বাঞ্ছনীয়। এ ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে বিদ্যমান কারণ হলো— রেশমের কাপড় শুধুমাত্র নমুনা হিসাবে ব্যবহার করা, ঐ ব্যাখ্যা মুতাবিক যা সর্বজনবিদিত।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন : ইমাম আবু ইউসুফ এবং ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে যুদ্ধের ময়দানে রেশমী এবং রেশমী কিংখাব–কাপড় পরিধান করাতে কোন দোষ নেই। কেননা, হযরত শা'বী (র) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) যুদ্ধ ক্ষেত্রে রেশমী এবং রেশমী কিংখাব কাপড় ব্যবহারের ব্যাপারে অনুমতি দিয়েছেন। অধিকন্তু যোদ্ধাদের এ জাতীয় পোশাক পরিধান করার আবশ্যকতাও রয়েছে। কেননা, খাটি রেশম যুদ্ধাস্ত্র প্রতিহত করতে অধিক কার্যকর এবং চাকচিক্যের কারণে শত্রুর চোখে অধিক আতঙ্ক সৃষ্টি করে থাকে।

পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে (যোদ্ধাদের জন্যও) এ জাতীয় পোশাক মাক্রূহ। কেননা, আমরা পূর্বে যে হাদীস বর্ণনা করেছি, তাতে (যোদ্ধা এবং অযোদ্ধাদের মধ্যে) কোন পাথক্য করা হয়নি। আর যুদ্ধে রেশম ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা সূতা মিশ্রিত রেশম দ্বারা সমাধা হয়ে যায়। সূতা মিশ্রিত রেশম হচ্ছে, যে কাপড়ের বানা রেশম কিন্তু তানা অন্য কিছু। আর নিষিদ্ধ বস্তু শুধুমাত্র প্রয়োজনের অবস্থায়ই বৈধ হয়ে থাকে। আর উপরে যে, হাদীসটি বর্ণনা করা হয়েছে -এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে সূতা মিশ্রিত রেশমী কাপড়।

'জামে সগীর' গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন : যে কাপড়ের তানা রেশম এবং বানা অন্য কিছু, যেমন তুলা বা কাঁচা রেশম, তা যুদ্ধে বা অন্যান্য স্বাভাবিক অবস্থায় পরিধান করাতে কোন দোষ নেই। কেননা, সাহাবীগণ খায (কাঁচা রেশম) দ্বারা তৈরী কাপড় ব্যবহার করতেন। খায এমন কাপড়-যার তানা হচ্ছে রেশমের। এ পর্যায়ে যৌক্তিক কারণ হচ্ছে এই যে, সূতা দ্বারা বুননের পরই কাপড় প্রস্তুত হয়ে থাকে। আর বুননের কাজ সম্পন্ন হয় বানা'র দ্বারা। সুতরাং বানা'র বিষয়টিই ধর্তব্য হবে এবং তানা'র বিষয়টি ধর্তব্য হবে না। ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন : কায (গুটি পোকার রেশম) দ্বারা তৈরী কাপড়, যা শরীরের চামড়া ও বহিরাবনের মাঝখানে থাকে, তা মাক্রূহ। তবে কাঁচা রেশম কোন কিছুতে ঢুকিয়ে তা ব্যবহার করাতে কোন দোষ নেই। কেননা, কাপড় তো পরিধান করা হয় কিন্তু কাচা রেশম ভর্তি বস্তু পরিধান করা হয় না।

'জামে সগীর' গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন : যে কাপড়ের বানা রেশম এবং তানা হচ্ছে অন্য কিছু, সে কাপড় প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে **যুদ্ধের ময়দানে ব্যবহার**

করাতে কোন দোষ নেই। অবশ্য যুদ্ধের ময়দান ছাড়া অন্যান্য অবস্থায় এ জাতীয় পোশাক ব্যবহার করা মাকরূহ। কেননা, এ ক্ষেত্রে কোন আবশ্যকতা নেই। আর বানা'র বিষয়টিই ধর্তব্য বিষয় ঐ ব্যাখ্যার ভিত্তিতে, যা আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। **ইমাম কুদূরী (র) বলেন : পুরুষের জন্য স্বর্ণালংকার পরিধান করা জাইয নেই,** ঐ হাদীসের আলোকে, যা আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। **অনুরূপভাবে রৌপ্য নির্মিত অলংকারও পুরুষের জন্য ব্যবহার করা জাইয নেই।** কেননা, রৌপ্য মূলত: স্বর্ণের মতই। কিন্তু রৌপ্যের আংটি, কোমর বন্ধনী এবং তরবারির অংগ সজ্জার জন্য রৌপ্য ব্যবহার করা হলে তা জাইয হবে। কেননা, এ গুলো নমুনার ন্যায় জিনিস। আর রৌপ্য যেহেতু স্বর্ণের কাজ নয়, তাই স্বর্ণ ব্যবহার করা আমাদের আবশ্যক নয়। কেননা, উভয় ধাতু একই প্রকৃতির। আর এটি কেন জাইয হবে না। অথচ রৌপ্যের ব্যবহার মুবাহ হওয়ার ক্ষেত্রে বহু হাদীস বর্ণিত রয়েছে। 'জামে সগীর' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, রূপা ছাড়া অন্য কোন ধাতুর আংটি পরিধান করা জাইয নেই। এতে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, পাথর, লোহা এবং পিতল দ্বারা আংটি তৈরী করা হারাম। রাসূলুল্লাহ্ (সা) এক ব্যক্তির হাতে পিতলের আংটি দেখে বললেন : আমার কী হলো যে, আমি তোমার থেকে মূর্তির দুর্গন্ধ পাচ্ছি। তিনি অপর এক ব্যক্তির হাতে লোহার আংটি দেখে বললেন: কী হলো আমার যে, আমি তোমার গায়ে জাহান্নামীদের অলংকার দেখতে পাচ্ছি। কতেক মানুষের মতে ইয়াশীব (يَشْبُ) পাথর ব্যবহার করা বৈধ। কেননা, এটি পাথর নয় এবং এটি পাথরের ন্যায় ভারী নয়। কিন্তু 'জামে সগীর' কিতাবে যেভাবে মাসআলা বর্ণনা করা হয়েছে, তাতে এটিও হারাম বলে প্রমাণিত হয়েছে।

স্বর্ণ দ্বারা তৈরী আংটি পুরুষের জন্য হারাম, ঐ হাদীসের ভিত্তিতে যা আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। হযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত আছে যে,

اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ ۔

নবী করীম (সা) স্বর্ণের আংটি ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। অধিকন্তু আংটির ক্ষেত্রে মূলকথা হচ্ছে যে, আংটি ব্যবহার হারাম। প্রয়োজনের তাগিদে সীল-মহর ও নমুনার ক্ষেত্রে মুবাহ (বৈধ) করা হয়েছে। আর এই প্রয়োজন নিম্নমানের ধাতু অর্থাৎ রৌপ্য দ্বারা সমাধা হয়। হালকা অর্থাৎ আংটি বৃত্ত হলো ধর্তব্য বিষয়। কেননা, এর দ্বারাই আংটির অস্তিত্ব হয়। আংটির নগীনা ধর্তব্য নয়। কেননা, তা পাথর দ্বারাও হতে পারে। নগীনা এবং কারুকার্যের দিকটি হাতের ভেতরের দিকে রাখবে। পক্ষান্তরে মহিলাগণ রাখবে বাইরের দিকে। কেননা, আংটি পরিধান মহিলাদের ক্ষেত্রে সাজ-সজ্জার অন্তর্ভুক্ত।

বাদশাহ এবং বিচারকের যেহেতু সীল মহরের প্রয়োজন হয়, তাই তারা আংটি ব্যবহার করতে পারবেন। আর তাদের ব্যতীত অন্যান্য ব্যক্তিদের জন্য আংটির ব্যবহার বর্জন করাই উত্তম। যেহেতু তাদের তা ব্যবহারের কোন প্রয়োজন হয় না।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন : আংটির নকশার ছিদ্রে স্বর্ণের তৈরী পেরেক ব্যবহারে কোন দোষ নেই। কেননা, এটি আংটির সাথে সংশ্লিষ্ট একটি বস্তু (মূল বস্তু

নয়), যেমন কাপড়ে খচিত নকশা। অতএব এ কারণে তাকে স্বর্ণ পরিধান কারী বলে গণ্য করা হবে না। **ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন : স্বর্ণ দ্বারা দাঁত বাধাই করা জাইয নয়, কিন্তু রৌপ্য দ্বারা জাইয,** আর এটি ইমাম আবু হানীফা (র) এর অভিমত। ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন : স্বর্ণ দ্বারা দাঁত বাধাই করতেও কোন ক্ষতি নেই। আর ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর মত তাদের প্রত্যেক্যের সাথে রয়েছে।

সাহেবায়নের দলীল হলো ; হযরত আরফাজা ইব্‌ন আসআদ (রা)-এর নাক কিলাব যুদ্ধের দিন নষ্ট হয়ে যায়। তারপর তিনি রৌপ্যের নাক বানিয়ে নেন। উক্ত নাক থেকে দূর্গন্ধ বের হওয়া শুরু হলে নবী করীম (সা) তাকে স্বর্ণ দ্বারা নাক বানিয়ে নেওয়ার জন্য আদেশ করেন। আর ইমাম আবু হানীফা (র)-এর দলীল হলো স্বর্ণ মূলত: হারাম। প্রয়োজনে তা ব্যবহার করা বৈধ। আর এ প্রয়োজন রৌপ্য দ্বারাই সমাধা হয়ে যায়–যা নিম্নমানের ধাতু। সুতরাং স্বর্ণ ব্যবহারের অবৈধতা বহাল থাকবে। বর্ণিত হাদীসে নাকের ক্ষেত্রে প্রয়োজন স্বর্ণ ব্যতিরেকে সমাধা হয়নি। কেননা, নাক দূর্গন্ধ যুক্ত হয়ে পড়েছিল।[১]

ইমাম কুদূরী (র) বলেন: বাচ্চাদেরকে স্বর্ণ এবং রেশমের পোশাক পরিধান করানো মাক্‌রূহ। কেননা, পুরুষের ক্ষেত্রে যখন এর ব্যবহার হারাম সাব্যস্ত হয়েছে এবং তা পরিধান করা হারাম হয়ে গেছে, তখন অন্যকে তা পরিধান করানোও হারাম বলে গণ্য হবে। যেমন মদপান করা হারাম, অনুরূপভাবে অন্যকে তা পান করানোও হারাম।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন : টুকরা কাপড় যা সাথে রাখা হয় এবং যা দ্বারা শরীরের ঘাম মোছা হয়, তা মাক্‌রূহ। কেননা এও এক ধরনের অহংকার এবং দাম্ভিকতা। **এমনিভাবে যে টুকরা কাপড় দ্বারা উযুর পানি মোছা হয় এবং নাক পরিষ্কার করা হয়, তা-ও মাক্‌রূহ।** কেউ কেউ বলেন : প্রয়োজনে ব্যবহার করা হলে তা আর মাক্‌রূহ হবে না। এটিই সহীহ্ অভিমত। উল্লেখ্য যে, এ জাতীয় কাপড়ের ব্যবহার তখনই মাক্‌রূহ হবে, যখন তা অহংকার ও আভিজাত্য প্রকাশের জন্য ব্যবহার করা হবে। কাজেই এটি চারজানু হয়ে বসার মত হলো।[২]

যদি কোন পুরুষ ব্যক্তি প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে নিজের আঙ্গুলে কিংবা আংটিতে সুতা বাঁধে, তবে তাতে কোন দোষ নেই। একে রতম (رَتْمٌ) ও রতীমা (رَتِيْمَةٌ) বলে। এরূপ করা আরবদের একটি অভ্যাস ছিল। যেমন কোন আরব কবি বলেছেন :

لَايَنْفَعَنْكَ الْيَوْمَ اِنْ هَمَّتْ بِهِمْ كَثْرَةُ مَاتُوْصِىْ وَتَعْقَادُ الرَّتَمِ ۔

আজ তোমার কোন অসিয়ত ও গাছের ডালা বেঁধে রাখা কোন কাজে আসবে না। যদি সে কোন ব্যভিচারের সংকল্প করে থাকে।[৩]

---

১. এ কারণে রাসূলুল্লাহ্ (সা) আরফাজা ইব্‌ন আসআদ (রা)কে স্বর্ণের নাক তৈরী করে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

২. অর্থাৎ যদি অহংকার প্রকাশের নিমিত্তে কেউ চার জানু হয়ে বসে তবে তা মাক্‌রূহ হবে। কিন্তু প্রয়োজনের কারণে তা মাক্‌রূহ হবে না।

৩. তৎকালীন যুগে আরবের লোকদের অভ্যাস ছিল যে, যখন তারা বিদেশ ভ্রমণে যেত, তখন এক বিশেষ ধরনের গাছের ডালের সাথে অপর ডাল বেঁধে রাখতো। ভ্রমণ হতে ফিরে এসে যদি সে গাছের ডালা বাঁধা অবস্থায় দেখতো, তবে মনে করতো যে, তার স্ত্রী কারো সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়নি। আর যদি ডালা খোলা দেখতো, তবে মনে করতো যে, তার স্ত্রী ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছে।

নবী করীম (সা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি তাঁর জনৈক সাহাবীকে সূতা বাঁধতে আদেশ করেছিলে। আর এজন্য তা জাইয যে, এ কাজ নিরর্থক নয়। কারণ এর মধ্যে সঠিক উদ্দেশ্য নিহিত আছে। আর তা হলো ভুলে যাওয়ার সময় স্মরণ হওয়া।

পরিচ্ছেদ : সঙ্গম, তাকানো এবং স্পর্শ করা প্রসংগে

ইমাম কুদূরী (র) বলেন : পর স্ত্রীর মুখ মন্ডল এবং উভয় হাতের কব্জা ছাড়া দেহের অন্য কোন অঙ্গের প্রতি তাকানো পুরুষের জন্য জাইয নেই।

কেননা, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন :

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا .

আর তারা যেন যা সাধারণত: প্রকাশ থাকে, তা ব্যতীত তাদের আভরণ প্রদর্শন না করে। (২৪ঃ৩১)

হযরত আলী এবং হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) مَا ظَهَرَ مِنْهَا এর ব্যাখ্যায় বলেন : এর মর্ম হলো সুরমা ও আংটি। তবে এখানে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সুরমা ও আংটির স্থানকে বুঝানো। আর তা হচ্ছে মুখ মন্ডল ও হাতের কব্জি। যেমনিভাবে আয়াতে উল্লেখিত زِيْنَةٌ (আভরণ) দ্বারা زِيْنَةٌ (আভরণ) এর স্থান বুঝানো উদ্দেশ্য। আর মুখ মন্ডল এবং কব্জি পর্যন্ত উভয় হাত খোলা রাখার যৌক্তিক কারণ হলো এই যে, পুরুষদের সাথে মহিলাদের লেন-দেন তথা দেওয়া-নেওয়ার আবশ্যকতা রয়েছে। কাজেই মুখ মন্ডল এবং কব্জি পর্যন্ত উভয় হাত খোলা রাখারও বিশেষ জরুরত রয়েছে। (কারণ এই দুই অঙ্গ খোলা রাখা ব্যতীত লেন-দেন সম্ভব নয়।) এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মহিলার পায়ের দিকে তাকানো জাইয নয়। ইমাম আবু হানীফা (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, মহিলার পায়ের দিকে তাকানো মুবাহ। কেননা, এতেও কিছু কিছু প্রয়োজন রয়েছে। ইমাম আবু ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, মহিলার হাতের দুই বাহুর দিকে তাকানো জাইয। কেননা, হাতের বাহু স্বাভাবিক ভাবেই খুলে যায়।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন : যদি কোন ব্যক্তি কাম-ভাব উদ্রেকের সম্ভাবনা থেকে নিরাপদ না থাকে, তবে সে বেগানা মহিলার মুখ মন্ডলের প্রতি নযর করবে না। অবশ্য প্রয়োজন হলে করতে পারবে।

কেননা রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন :

مَنْ نَظَرَ اِلَى مَحَاسِنِ اِمْرَأَةٍ اَجْنَبِيَّةٍ عَنْ شَهْوَةٍ صُبَّ فِى عَيْنَيْهِ الْاَنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

যদি কোন ব্যক্তি বেগানা মহিলার সৌন্দর্যের প্রতি কামোদ্দীপনার সাথে নযর করে, তবে কিয়ামতের দিন তার চোখে সিসা ঢেলে দেওয়া হবে। সুতরাং কাম-ভাবের আশংকা থাকলে প্রয়োজন ব্যতীত তার প্রতি নযর করবে না, হারাম থেকে বেঁচে

থাকার উদ্দেশ্যে। ইমাম কুদূরী (র)-এর বক্তব্য لَا يَأْمَنُ (নিরাপদ না হলে) থেকে বুঝা যায় যে, কাম-ভাব উদ্রেকের ব্যাপারে সন্দেহ হলে বেগানা মহিলার দিকে তাকানো বৈধ হবেনা, যেমন বৈধ হয়না নিশ্চিতভাবে কাম-ভাব উদ্রেকের সময়। এমনিভাবে কাম–ভাব উদ্রেকের প্রবল সম্ভাবনা হলেও বেগানা মহিলার প্রতি তাকানো বৈধ হবে না। উল্লেখ্য যে, কাম-ভাব উদ্রেকের ব্যাপারে আশংকামুক্ত হলেও বেগানা মহিলার মুখ মন্ডল এবং তার হাতের কব্জি স্পর্শ করা হালাল হবে না। কেননা, একাজ হচ্ছে হারাম এবং এ ক্ষেত্রে কোন আবশ্যকতা নেই এবং নেই এমন কোন জটিলতা, যা থেকে বাঁচা দুষ্কর। হারাম হওয়ার দলীল হলো রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিম্নোক্ত বাণী :

مَنْ مَسَّ كَفَّ امْرَأَةٍ لَيْسَ مِنْهَا بِسَبِيْلٍ وُضِعَ عَلَى كَفِّهِ جَمْرٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ٠

যদি কেউ কোন মহিলার হাত স্পর্শ করে,যার উপর তার কোন অধিকার নেই, তাহলে কিয়ামতের দিন তার হাতে জ্বলন্ত আগুনের কয়লা রাখা হবে।

এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে, যদি মহিলা এমন যুবতী হয়, যার প্রতি কাম-ভাবের উদ্রেক হয়। আর মহিলা যদি এমন বৃদ্ধা হয়, যার প্রতি কামোদ্দীপনা সৃষ্টি হয়না, তবে তার সাথে মুসাফাহা করা এবং তার হাত স্পর্শ করাতে কোন দোষ নেই। কেননা, এ ক্ষেত্রে ফিতনা বা ব্যভিচারের কোন আশংকা নেই। অধিকন্তু বর্ণিত আছে যে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) এমন কোন কোন গোত্রের মহিলাদের নিকট গমন করতেন, যাদের মধ্যে শিশুদের দুধ পান করানোর মত মহিলা ছিল। আর তিনি বৃদ্ধা মহিলাদের সাথে মুসাফাহাও করতেন। অনুরূপভাবে হযরত আবদুল্লাহ (রা) জনৈকা বৃদ্ধাকে তার সেবা করার জন্য অর্থের বিনিময়ে নিয়োগ করেছিলেন। সে তার পা চিপে দিত এবং মাথার উকুন বেছে দিত। অনুরূপভাবে যদি কোন বৃদ্ধ ব্যক্তি নিজের ব্যাপারে আশংকামুক্ত থাকে, এবং মহিলার ব্যাপারেও আশংকামুক্ত থাকে, তবে এ ক্ষেত্রেও উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে, ঐ যুক্তিতে যা আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। আর যদি মহিলার ব্যাপারে সে আশংকামুক্ত না থাকে, তাহলে তার জন্য সে মহিলার সাথে মুসাফাহা করা জাইয হবে না। কেননা, এতে নিজেকে ফিতনার মধ্যে ফেলা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়াবে। না-বালিগা কন্যা যদি এমন হয় যে, তার প্রতি কামোদ্দীপনা সৃষ্টি হয় না, তাহলে তাকে স্পর্শ করা এবং তার প্রতি তাকানো উভয়ই জাইয হবে। কেননা, এ ক্ষেত্রে ফিতনার কোন আশংকা নেই।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন : বিচারপতি কোন মহিলার ব্যাপারে আদেশ জারী করার ইচ্ছা করলে এবং সাক্ষী তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদানের ইচ্ছা করলে, তাদের জন্য তার চেহারার প্রতি তাকানো জাইয আছে। যদিও তারা এক্ষেত্রে তার প্রতি কাম-ভাব সৃষ্টি হওয়ার আশংকা করে, বিচার এবং সাক্ষ্য প্রদানের মাধ্যমে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার কারণে। তবে বাঞ্ছনীয় হলো এর দ্বারা সাক্ষ্য দান বা রায়দানের ইচ্ছা করা, নিজের কাম-ভাব চরিতার্থ করা নয়, বেঁচে থাকার লক্ষ্যে এমন জিনিস থেকে, যা থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব। আর তা হলো খারাপ ইচ্ছা। تحمل

شَهَادَتْ তথা সাক্ষী হওয়ার প্রয়োজনে আসক্তি সৃষ্টি হলেও কোন মহিলার প্রতি নযর করা যাবে কি-না, এ সম্পর্কে কেউ কেউ বলেন যাবে। কিন্তু বিশুদ্ধতম মতানুসারে এ অবস্থায় বেগানা মহিলার প্রতি নযর করা জাইয হবে না। কেননা, এ ক্ষেত্রে এমন লোকও পাওয়া সম্ভব, যাদের কামোদ্দীপনা সৃষ্টি হয় না। কাজেই তা প্রয়োজনের আওতায় পড়ে না। সাক্ষ্য দান বা সাক্ষ্য আদায়ের বিষয়টি এর থেকে ব্যতিক্রম।

কেউ যদি কোন মহিলাকে বিয়ে করার ইচ্ছা করে, তবে তার জন্য ঐ মহিলার প্রতি নযর করাতে কোন দোষ নেই; যদিও তার নিশ্চিত জানা থাকে যে, এতে তার কামোদ্দীপনার উদ্রেক ঘটবে।

কেননা, রাসূলুল্লাহ্ (সা) এ সম্বন্ধে বলেছেন :

اَبْصِرْهَا فَاِنَّهُ اَحْرٰى اَنْ يُّؤْدَمَ بَيْنَكُمَا ‐

তাকে দেখে নাও। এটাই হবে তোমাদের মাঝে স্থায়িত্বের উত্তম ব্যবস্থা। অধিকন্তু এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সুন্নাত কায়েম করা, কাম-ভাব চরিতার্থ করা নয়।

প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে চিকিৎসকের জন্য জাইয আছে বেগানা মহিলার রোগের স্থানের প্রতি নযর করা। তবে এ ক্ষেত্রে সমীচীন হলো কোন মহিলাকে মহিলা বিষয়ক চিকিৎসার পন্থা-পদ্ধতি শিখিয়ে দেওয়া। কেননা, নারী জাতির প্রতি নারী জাতির দৃষ্টিপাত অনেকটা সহজ ব্যাপার।

যদি মহিলার পরিবারের লোকেরা এমন মহিলা জোগাড় করতে সক্ষম না হয় তবে রোগের জায়গাটুকু ছাড়া দেহের অন্য সব অঙ্গ ঢেকে দেবে। তারপর তাকে দেখবে এবং যথা সম্ভব চোখের দৃষ্টি নীচু করে রাখবে।

কেননা, প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে যতটুকু দেখা জাইয সাব্যস্ত হয়েছে, ততটুকুর মধ্যেই দৃষ্টিকে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। এ হিসাবে ডাক্তারের দেখাটা খতনাকারী নারী ও পুরুষের খতনার স্থান দেখার মত হলো। এমনিভাবে জাইয আছে পুরুষের জন্য পুরুষের ডুশের স্থানের প্রতি নযর করা। কেননা, ডুশ দেওয়া চিকিৎসার অন্তর্ভুক্ত বিষয়। ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে আরো জাইয আছে রোগ নির্ণয়ের জন্য রোগীর দেহের প্রতি নযর করা। এমনিভাবে অতিরিক্ত শুষ্ক দেহের অধিকারী ব্যক্তির দেহের প্রতি নযর করাও জাইয। কেননা, এরূপ হওয়া রোগের পূর্ব লক্ষণ।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন : পুরুষ অন্য পুরুষের নাভী হতে হাঁটু পর্যন্ত ছাড়া সমস্ত শরীর দেখতে পারবে।

কেননা, নবী করীম (সা) ইরশাদ করেছেন :

عَوْرَةُ الرَّجُلِ مَا بَيْنَ سُرَّتِهٖ اِلٰى رُكْبَتَيْهِ ‐

–পুরুষের গোপন স্থান নাভী হতে হাঁটু পর্যন্ত।

কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে যে, নাভীর নীচ হতে হাঁটুর শেষ সীমা পর্যন্ত গোপন স্থান। এতে প্রমাণিত হয় যে, নাভী গোপন স্থানের অন্তর্ভুক্ত নয়। পক্ষান্তরে ইমাম আবু

ইসমা এবং শাফিঈ (র) এর থেকে ভিন্নমত পোষণ করেন, হাঁটু গোপন স্থান। কিন্তু ইমাম শাফিঈ এর থেকে ভিন্নমত পোষণ করেন, উরু গোপন স্থান; কিন্তু আসহাবে যাওয়াহিরের অভিমত এর থেকে বিপরীত। নাভীর নীচ থেকে পশম উঠার স্থান পর্যন্তও গোপন স্থান। কিন্তু ইমাম আবু বক্র মুহাম্মদ ইব্ন ফযল আল কুমারী (র)-এর অভিমত এর থেকে ব্যতিক্রম। তিনি মানুষের সাধারণ অভ্যাসের উপর ভিত্তি করে এ কথা বলেছেন। কিন্তু তার মতের বিপরীতে স্পষ্ট বর্ণনা থাকা অবস্থায় তার কথা বিবেচ্য নয়। হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, হাঁটু সতরের অন্তর্ভুক্ত। একদা হযরত হাসান ইব্ন আলী (রা) তাঁর নিজের নাভী খুললে হযরত আবু হুরায়রা (রা) তাতে চুমু খেলেন। এমনিভাবে নবী করীম (সা) হযরত জারহাদ (রা) কে বলেন : তুমি তোমার উরু ঢেকে রাখো। তুমি কি জান না, উরু সতরের মধ্যে গণ্য।

হাঁটু পর্দার স্থানের মধ্যে গণ্য হওয়ার যুক্তি হলো উরু এবং পায়ের নলার হাড়ের মিলনস্থল হাঁটু। সুতরাং যেহেতু হাঁটুর ব্যাপারে مُحَرِّمْ ও مُبِيْحٌ দুই রকমের হাদীস একত্রিত হয়েছে। তাই (مُحَرِّمْ নিষেধাজ্ঞা) এর হাদীসকেই প্রাধান্য দেওয়া হবে। এ ছাড়া হাঁটুকে পর্দার স্থানের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত করা, উরুকে পর্দার স্থানের অন্তর্ভুক্ত করার চাইতে হালকা। আর উরুকে পর্দার স্থান হিসাবে গণ্য করা লজ্জাস্থানকে পর্দার স্থান হিসাবে গণ্য করার চাইতে অধিক হালকা। সুতরাং কেউ যদি হাঁটু খুলে রাখে, তবে তাকে নরম ভাষায় সতর্ক করা হবে, যদি কেউ উরু খুলে রাখে, তবে তাকে অপেক্ষাকৃত কঠিনভাবে সতর্ক করা হবে। আর যদি কেউ লজ্জাস্থান খুলে রাখে, তবে তাকে কড়াকড়িভাবে শাস্তি প্রদান করা হবে যদি সে এ কাজ বারংবার করে। পুরুষের যে অংশের প্রতি অন্য পুরুষের দৃষ্টিপাত করা জাইয, সে অঙ্গ স্পর্শ করাও জাইয। কেননা যে অঙ্গ পর্দার অন্তর্ভুক্ত নয়, তা দেখা ও ছোঁয়া উভয়ই হচ্ছে সমান।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ এক পুরুষ অন্য পুরুষের যতটুকু দেখতে পারে, মহিলাগণও পুরুষের ততটুকু অঙ্গ দেখতে পারবে, যদি সে কামোদ্দীপনা থেকে মুক্ত হয়। কেননা, শরীরের যে অঙ্গটি পর্দার অন্তর্ভুক্ত নয়, এর প্রতি তাকানোর ব্যাপারে পুরুষ ও মহিলা সবই সমান। যেমন কাপড় ও চতুষ্পদ প্রাণী দেখার ব্যাপারে তারা সমান। মাবসূত গ্রন্থের خُنْثٰى (হিজড়া) সম্পর্কিত অধ্যায়ে এ কথা উল্লেখ আছে যে, পর পুরুষের প্রতি নারীর দৃষ্টিপাত হলো তেমন, যেমন পুরুষের দৃষ্টিপাত মাহ্রাম মহিলার প্রতি।[১] কেননা বিপরীত লিঙ্গের প্রতি দৃষ্টিপাত অপেক্ষাকৃত ভয়াবহ হয়ে থাকে। যদি মহিলার মনে কামোদ্দীপনার ভাব বা কামোদ্দীপনার প্রবলতা থাকে; কিংবা কামোদ্দীপনার সন্দেহ থাকে, তাহলে সে ক্ষেত্রে তার জন্য মুস্তাহাব হলো নিজের দৃষ্টিকে নীচু করে রাখা। এই ধরনের মনোভাব যদি পুরুষের মধ্যে সৃষ্টি হয় এবং সে যদি কোন

---

১. অর্থাৎ যেমন পুরুষ তার মাহ্রাম কোন মহিলার পেট-পিঠ দেখতে পারে না, তেমনিভাবে পর পুরুষের পেট-পিঠ দেখাও কোন নারীর জন্য জাইয নয়।

মহিলার দিকে তাকায়, তবে তার এ তাকানো জাইয হবে না। এতে এ কথার প্রতি ইংগিত রয়েছে যে, এরূপ করা হারাম।

এই পার্থক্যের কারণ হলো এই যে, মহিলাদের মধ্যে কামোদ্দীপনা হচ্ছে প্রবল। তাই একে নিশ্চিত ধরে নেওয়া যায়। এ অবস্থায় যদি পুরুষের মধ্যেও কাম-ভাব থাকে, তবে দুই দিক থেকেই কামোদ্দীপনা পাওয়া যাবে। পক্ষান্তরে যদি শুধুমাত্র মহিলার মধ্যে কাম-ভাব পাওয়া যায়, তবে এ ক্ষেত্রে হুকুম ভিন্ন ধরনের হবে। কেননা এ ক্ষেত্রে পুরুষের মধ্যে কাম-ভাব অবিদ্যমান; বাস্তবেও না এবং তা ধরেও নেওয়া যায় না। সুতরাং বলা যায় যে, এ ক্ষেত্রে কেবলমাত্র একপক্ষ থেকে কাম-ভাব পাওয়া গেছে। হারাম কাজে জড়ানোর ক্ষেত্রে উভয় দিকের কাম-ভাবের বাস্তবতা একদিকের কাম-ভাবের বাস্তবতা হতে অধিক মারাত্মক।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ এক পুরুষের জন্য অন্য পুরুষের দেহের যতটুকু দেখা জাইয, এক মহিলার জন্য অন্য মহিলার দেহের সেপরিমাণ দেখা জাইয। এর কারণ লিঙ্গের অভিন্নতা এবং সাধারণত কাম-ভাবের অনুপস্থিতি। যেমন পুরুষের প্রতি পুরুষের নযরের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। আরও কারণ হলো নারীদের পরস্পরের মধ্যে কাপড় খোলার বাস্তবতা। ইমাম আবূ হানীফা (র) হতে বর্ণিত আছে যে, নারীদের পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করা পুরুষের আপন মাহ্‌রাম আত্মীয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করার অনুরূপই। কিন্তু পুরুষের প্রতি নারীদের নযর করার বিষয়টি এর থেকে ব্যতিক্রম। কেননা, কাজে লিপ্ত হওয়ার কারণে পুরুষের কাপড় খোলার প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশী। প্রথমোক্ত মতটি বিশুদ্ধতম।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ পুরুষ তার হালাল ক্রীতদাসী এবং নিজ স্ত্রীর গুপ্তাঙ্গের প্রতি নযর করতে পারবে। এ কথার দ্বারা সাধারণভাবে তাদের সর্বাঙ্গের প্রতি নযর করার অনুমতি বুঝা যায়। চাই পুরুষের মধ্যে কাম-ভাব থাকুক বা না থাকুক। এর দলীল হলো নবী (সা) এর বাণী ঃ

غُضَّ بَصَرَكَ اِلاَّ عَنْ اَمَتِكَ وَامْرَاَتِكَ ۔

–তোমরা ক্রীতদাসী এবং নিজ স্ত্রী ব্যতীত অন্যদের হতে নিজ দৃষ্টি অবনমিত করে রাখ।

এ ব্যাপারে যুক্তি হলো নযরের চাইতেও মারাত্মক হলো স্পর্শ করা এবং সঙ্গম করা। যেহেতু তাদের সাথে এ সব কাজও মুবাহ, তাই নযর করা তো সহজেই মুবাহ হবে। তবে উত্তম হলো একে অপরের গুপ্তাঙ্গের প্রতি নযর না করা।

কেননা, নবী করীম (স) ইরশাদ করেছেন ঃ

اِذَا اَتَى اَحَدُكُمْ اَهْلَهُ فَلْيَسْتَتِرْ مَا اسْتَطَاعَ وَلاَ يَتَجَرَّدَانِ تَجَرُّدَ الْعَيْرِ ۔

তোমাদের কেউ যখন নিজ স্ত্রীর সাথে সহবাস করার জন্য আসে, তখন সে যেন যথাসম্ভব পর্দা করে। বন্য গাধার মত উভয়েই যেন উলঙ্গ না হয়।

দ্বিতীয়ত: হাদীসে আছে যে, স্ত্রীর গুপ্তাঙ্গের প্রতি নযর করার ফলে স্মরণ শক্তি কমে যায়। এ মর্মে হাদীসও আছে। পক্ষান্তরে হযরত উমর (রা) বলতেন ঃ স্ত্রীর গুপ্তাঙ্গের প্রতি নযর করা উত্তম, যাতে সহবাসে অধিক স্বাদ পাওয়া যায়।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ পুরুষ তার মাহরাম মহিলাদের মুখমন্ডল, মাথা, বক্ষ, উভয় পায়ের নলা এবং উভয় বাহুর প্রতি নযর করতে পারবে; কিন্তু তার পিঠ, পেট ও রানের প্রতি নযর করবে না।

এ ব্যাপারে দলীল হলো মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَلَا يُبْدِينَ زِيْنَتَهُنَّ اِلاَّ لِبُعُوْلَتِهِنَّ ٠

–আর তারা যেন তাদের নিজেদের স্বামী ব্যতীত অন্য কারো সামনে নিজেদের আভরণ না খোলে। (২৪ ঃ ৩১)

এর অর্থ হলো আভরণের জায়গা । এ সম্বন্ধে আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত। আর তা হচ্ছে ঐ সমস্ত জায়গা, যা আমরা মূল কিতাবে উল্লেখ করেছি। হাতের বাহু, কান, ঘাড় এবং পা সবই এর মধ্যে দাখিল। কেননা এগুলো সবই সৌন্দর্যের স্থান। পক্ষান্তরে পিঠ, পেট এবং উরু এ হুকুম থেকে ব্যতিক্রম। কেননা, এগুলো সৌন্দর্যের স্থান নয়।

মাহ্‌রাম মহিলার সৌন্দর্যের স্থানগুলো দেখা জাইয হওয়ার কারণ হলো, মাহ্‌রাম আত্মীয়-স্বজন পরস্পর একে অপরের কাছে অনুমতি ও লজ্জাবোধ ব্যতীত যাতায়াত করে থাকে। আর মহিলারা তাদের বাসস্থানে স্বভাবত:ই কাজের পোশাকে থাকে। সুতরাং যদি উল্লেখিত স্থানসমূহের প্রতি নযর করা হারাম হয়, তাহলে এতে অসুবিধার সৃষ্ট হবে। আরো যুক্তি হলো এই যে, তারা যেহেতু সর্বাবস্থায় তাদের জন্য হারাম, তাই তাদের প্রতি আশক্তিও কম হওয়ার কথা। উল্লেখিত অঙ্গসমূহ ছাড়া অন্যান্য অঙ্গের বিষয়টি হচ্ছে এর থেকে ব্যতিক্রম। কেননা, মহিলাগণ সাধারণত: সেগুলো খোলা রাখে না। (তাই তৎপ্রতি নযর করা জাইয হবে না।)

মাহ্‌রাম এমন আত্মীয়কে বলা হয়, যাদের পরস্পরের মধ্যে সর্বাবস্থায় বিবাহ-শাদী না-জাইয। চাই তা বংশের কারণে হোক বা অন্য কোন কারণে হোক। যেমন দুগ্ধপান ও শ্বশুর -জামাতা সম্পর্ক। যেহেতু এতে দুটি কারণই[১] বিদ্যমান। আর বিশুদ্ধত মতানুসারে মুসাহারা তথা শ্বশুর-জামাতা সম্পর্ক চাই বৈবাহিক সুত্রে হোক বা ব্যভিচারের কারণে হোক, সবই সমান ঐ কারণে, যা আমরা বর্ণনা করেছি।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ **মাহ্‌রাম মহিলার যে অঙ্গের প্রতি নযর করা জাইয, তা স্পর্শ করাতে কোন দোষ নেই।** কেননা সফরের অবস্থায় এসব অঙ্গ স্পর্শ করার প্রয়োজন হয় এবং মাহ্‌রাম হওয়ার কারণে কাম-ভাবও কম হয় (থাকে না)। পক্ষান্তরে বেগানা মহিলার মুখমন্ডল এবং তার হাতের কব্জি স্পর্শ করা বৈধ নয়। যদিও এ দুয়ের প্রতি নযর করা জাইয। কেননা এ জাতীয় মহিলার প্রতি কাম-ভাব পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান থাকে।

---

১. অর্থাৎ প্রয়োজনীয়তা এবং এ জাতীয় মহিলাদের প্রতি আশক্তি কম হওয়া।

উল্লেখ্য যে, মাহ্‌রাম আত্মীয় যদি নিজের ব্যাপারে অথবা মাহ্‌রাম মহিলার ব্যাপারে কোন রূপ কামোদ্দীপনা সৃষ্টির আশংকা করে, তবে সে তার প্রতি নযর করবে না এবং তাকে স্পর্শও করবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ

اَلْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ وَزِنَاهُمَا النَّظَرُ وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ وَزِنَاهُمَا الْبَطْشُ ٠

দুই চোখ যিনা করে আর এদের যিনা হলো দৃষ্টিপাত করা। এমনিভাবে দুই হাতও যিনা করে আর এর যিনা হল স্পর্শ করা।

আর মাহ্‌রাম মহিলার সাথে যিনা করা সব চাইতে শক্ত হারাম। কাজেই এর থেকে বেঁচে থাকা চাই।

মাহ্‌রাম মহিলাদের সাথে নির্জনে বসা এবং তাদের সাথে সফর করাতে কোন দোষ নেই। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ

لاَتُسَافِرُ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ وَلَيَالِيْهَا اِلاَّ وَمَعَهَا زَوْجُهَا اَوْ ذُوْ رَحْمٍ مَحْرَمٍ ٠

মহিলাগণ তিন দিন ও তিন রাতের উর্ধ্বে স্বামী অথবা কোন মা্রাম ব্যতীত সফরে যাবে না।

তিনি আরো বলেছেন ঃ

اَلاَلاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ لَيْسَ مِنْهَا بِسَبِيْلٍ فَاِنَّ ثَالِثَهَا الشَّيْطَانُ ٠

–সাবধান! যে নারীর উপর কোন অধিকার নেই, এমন নারীর সাথে যেন কোন পুরুষ নির্জনে না বসে। কেননা (বসলে) তাদের উভয়ের সাথে তৃতীয়জন হবে শয়তান।

উক্ত হাদীসে পুরুষ বলে এমন ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে, যে ঐ মহিলার মাহ্‌রাম আত্মীয় নয়।

যদি সে মাহ্‌রাম মহিলা সওয়ারীর উপর আরোহণ করানো এবং সোয়ারী থেকে নামানোর প্রতি মুখাপেক্ষী হয়, তবে কাপড়ের উপর দিয়ে তাকে স্পর্শ করাতে কোন দোষ নেই। এমনিভাবে তার পিঠ এবং পেট ধরাতেও কোন দোষ নেই, যদি তারা কাম-ভাব থেকে মুক্ত থাকে। যদি তাদের উভয়ের কারো মধ্যে কামোদ্দীপনার নিশ্চিত আশংকা থাকে বা প্রবল আশংকা থাকে কিংবা এ বিষয়ে সন্দেহ থাকে, তবে যথাসাধ্য তাকে স্পর্শ করা হতে বেঁচে থাকবে। যদি মাহ্‌রাম মহিলা নিজেই সওয়ারীর উপর আরোহণ করতে সক্ষম হয়, তবে পুরুষ ব্যক্তি তাকে স্পর্শ করা হতে নিবৃত্ত থাকবে। আর যদি নিজে নিজে সওয়ার হওয়া তার পক্ষে সম্ভব না হয়, তবে কাপড়ের উপর দিয়ে স্পর্শ করবে, যাতে মহিলার শরীরের উষ্ণতা তার অনুভূত না হয়। যদি পুরুষ ব্যক্তি এমন কোন কাপড় না পায়, তবে যথাসম্ভব মন থেকে আসক্তি দূর করে তাকে স্পর্শ করবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ পুরুষের জন্য মাহ্‌রাম মহিলার যে পরিমাণ অঙ্গ দেখা জাইয, অন্যের ক্রীতদাসীর ক্ষেত্রে ঐ পরিমাণ অঙ্গ দেখা তার জন্য জাইয।

কেননা, ক্রীতদাসীকে কাজের পোশাক পরিধান করে মুনীবের প্রয়োজন পূরণে বের হতে হয় এবং মুনীবের মেহমানদের খিদমত করতে হয়। সুতরাং পর পুরুষের ক্ষেত্রে ঘরের বাইরে তার অবস্থা, ঘরের ভিতরে মাহ্‌রাম আত্মীয় স্বজনের কাছে মাহ্‌রাম মহিলার অবস্থার মত। হযরত উমর (রা) কোন ক্রীতদাসীকে মাথা ঢাকা অবস্থায় দেখলে তার উপরের অংশে (অর্থাৎ মাথায়) দুররা তথা চাবুক মারতেন এবং বলতেন ঃ হে দাফার ! ওড়না ফেলে দাও। তুমি কি আযাদ মহিলাদের অনুরূপ হতে চাও। ক্রীতদাসীর পেট ও পিঠের দিকে নযর করা জাইয নয়। কিন্তু ফকীহ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুকাতিল (র) এর থেকে ভিন্ন মত পোষণ করে বলেন ঃ ক্রীতদাসীর নাভীর নীচ হতে হাঁটু পর্যন্ত ছাড়া অন্য সব অঙ্গ দেখা জাইয। পেট ও পিঠ দেখা জাইয না হওয়ার কারণ হলো এর প্রতি নযর করার কোন প্রয়োজন নেই। যেমন মাহ্‌রাম মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রয়োজন নেই। বরং মাহ্‌রাম মহিলাদের প্রতি আসক্তির স্বল্পতা এবং ক্রীতদাসীর প্রতি আসক্তির পূর্ণতা হেতু অন্যের ক্রীতদাসীর পেট ও পিঠের প্রতি নযর না করাই শ্রেয়। কিতাবে উল্লেখিত মামলূকা বা ক্রীতদাসী শব্দের মধ্যে মুদাববারা (যে দাসীকে মুনীব এ কথা লিখে দিয়েছে যে, আমার মৃত্যুর পর তুমি আযাদ); মুকাতাবা (যে দাসীকে মুনীব লিখে দিয়েছে যে, এই পরিমাণ মাল পরিশোধ করতে পারলে তুমি আযাদ হয়ে যাবে) এবং উম্মেওয়ালাদ (মুনীবের সহবাসের কারণে যে দাসী মা হয়) সবই শামিল। কেননা তাদের ক্ষেত্রে সাধারণ দাসীর ন্যায় প্রয়োজন রয়েছে। ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে মুস্তা'আত (অর্থাৎ যে ক্রীতদাসীর আংশিক মুনীব আযাদ করে দিয়েছে এবং বাকী অংশ আযাদের জন্য তাকে উপার্জন করার অনুমতি দিয়েছে) এর হুকুমও প্রচলিত নিয়ম অনুসারে মুকাতাবার অনুরূপ। অন্যের ক্রীতদাসীর সাথে নির্জনে বসা এবং তাকে নিয়ে সফরে যাওয়া কারো কারো মতে মাহ্‌রাম মহিলার ন্যায় মুবাহ (বৈধ)। আবার কেউ কেউ বলেন ঃ প্রয়াজন না থাকায় তা বৈধ হবে না। ইমাম মুহাম্মদ (র) আসল তথা মাবসূত কিতাবে অন্যের ক্রীতদাসীকে সওয়ারীর উপর উঠা-নামা করানোর বিষয়ে জরুরত[১] এর কথা বিবেচনায় এনেছেন। আর মাহ্‌রাম মহিলার ক্ষেত্রে শুধু প্রয়োজনই বিবেচ্য বিষয়।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ ক্রীতদাসী ক্রয়ের ইচ্ছা করলে তার দেখার যোগ্য দেহের অংশ বিশেষ স্পর্শ করাতে কোন দোষ নেই। যদিও ক্রেতা নিজের মধ্যে কাম-ভাব সৃষ্টি হওয়ার আশংকা করে। মুখতাসারুল কুদূরী গ্রন্থে মাসআলাটি এভাবেই বর্ণিত রয়েছে। 'জামে সগীর' গ্রন্থেও মাসআলাটি ব্যাপকভাবেই বর্ণনা করা হয়েছে। কোন ব্যাখ্যা করা হয়নি। কিন্তু আমাদের মাশায়িখে কিরাম বলেছেন ঃ উপরোক্ত অবস্থায় দাসীর দিকে দৃষ্টিপাত করা বৈধ, যদিও কাম-ভাবের উদ্রেক হয়, প্রয়োজনের কারণে। কিন্তু যদি কাম-ভাব সৃষ্টি হয় বা কাম-ভাব সৃষ্টি হওয়ার ব্যাপারে প্রবল আশংকা হয়, তবে স্পর্শ করা জাইয হবে না। কেননা স্পর্শ করাও এক ধরনের ভোগ করার অন্তর্ভুক্ত। আর ক্রয়ের ইচ্ছা না থাকলে স্পর্শ করা এবং দৃষ্টিপাত করা উভয়ই জাইয হবে, যদি কাম-ভাব না থাকে। (কাম-ভাব থাকলে মাকরূহ হবে।)

---

১. জরুরত অর্থ তীব্র প্রয়োজন।

ইমাম মুহাম্মদ (র) 'জামে সগীর' গ্রন্থে বলেছেন ঃ ক্রীতদাসী ঋতুমতী হলে তাকে একই ইযার (কাপড়) পরিয়ে (বিক্রয়ের জন্য) উপস্থিত করা যাবে না। এখানে ঋতুমতী হওয়ার অর্থ হলো বালিগা হওয়া। এর করণ আমরা পূর্বেই বর্ণনা করেছি যে, তার পিঠ ও পেট পর্দার অন্তর্ভুক্ত। ইমাম মুহাম্মদ (র) হতে এ কথাও বর্ণিত আছে যে, তাকে দেখলে কাম-ভাব সৃষ্টি হয় এবং তার মত বয়সীদের সাথে সঙ্গম করা যায়, তবে সে বালিগার অনুরূপ বলে গণ্য হবে। এ সময় আর তাকে এক কাপড় পরিয়ে বাজারে উপস্থিত করা যাবে না, তার মধ্যে কাম-ভাব বিদ্যমান থাকার কারণে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ যে পুরুষকে খাসি করা হয়েছে (অর্থাৎ যার অন্ডকোষ কেটে ফেলা হয়েছে), সে অপর মহিলার প্রতি নযর করার ক্ষেত্রে স্বাভাবিক পুরুষের অনুরূপ বলে গণ্য হবে। কেননা, হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) বলেছেন খাসি করাও এক প্রকারের মুসলা (আকৃতি বিকৃত করা)। সুতরাং পূর্বে যা হারাম ছিল, তা এখন হালাল হবে না। অধিকন্তু সে তো স্বাভাবিক পুরুষের মতই সহবাস করতে সক্ষম। এমনিভাবে যার পুরুষাঙ্গ কর্তিত, তার ক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম হবে। কেননা, সে কাম-ভাবসহ ঘষাঘষি করে বীর্যপাত করতে সক্ষম। অনুরূপ হুকুম নপুংশকের ক্ষেত্রেও, যে নিকৃষ্ট কাজে লিপ্ত হয়। কেননা, সে ফাসিক পুরুষ। মোদ্দা কথা হলো উপরোক্ত তিন শ্রেণীর মানুষের ব্যাপারে হুকুম আল্লাহর অবতীর্ণ কিতাব অনুযায়ী গ্রহণ করা হবে। নাবালিগ শিশু পবিত্র কুরআনের হুকুম মুতাবিক উক্ত নির্দেশের আওতাভুক্ত নয়।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ মালিকানাভুক্ত গোলামের জন্য তার মহিলা মুনীবের দেহের ততটুকু দেখা জাইয, যতটুকু দেখা অন্য পুরুষের জন্য জাইয। ইমাম মালিক (র) বলেন : সে মাহ্‌রাম পুরুষের মত হবে। এটি ইমাম শাফিঈর (র) ও একটি অভিমত। কেননা, কুরআন মজীদে ইরাশাদ হয়েছে : أَوْمَامَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ

–এবং তাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীগণের ব্যাপারে তা (হিজাব) পালন না করা অপরাধ নয়। (৩৩:৫৫)

অধিকন্তু অনুমতি ছাড়া গোলামের তার মুনীব মহিলার নিকট যাওয়ারও প্রয়োজন হয় অনেক সময়। (কাজেই গোলামও মাহ্‌রাম পুরুষের ন্যায় তার অঙ্গসমূহ দেখতে পারবে)।

আমাদের দলীল হলো : এ ক্রীতদাস একজন পুরুষ; যে তার (মহিলা মুনীবের) মাহ্‌রাম নয়, স্বামীও নয়, সর্বোপরি তাদের মধ্যে কাম-ভাবও বিদ্যমান আছে, যেহেতু তাদের মধ্যে কোন এক সময় (আযাদীর পর) বিবাহও হতে পারে। আর মুনীব মহিলার নিকট গোলামের আগমনের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি খুবই সীমিত। কারণ সে তো ঘরের বাইরে কাজ করে।[১] আর কুরআন মজীদে উল্লেখিত : مَا' শব্দের দ্বারা দাসীকে বুঝানো (পুরুষ নয়।) কেননা, হযরত সাঈদ, হাসানসহ অন্যান্য মনীষিগণ বলেছেন:

---

১. কাজেই এ জাতীয় গোলামের ঘরে প্রবেশের বিষয়টি তেমন জরুরী নয়। অতএব সে মাহ্‌রাম পুরুষের মত গণ্য হবে না।

সূরায়ে নূর যেন তোমাদেরকে ধোঁকায় না ফেলে। কেননা, এ সূরায় ما দ্বারা মহিলাদেরকে বুঝানো হয়েছে; পুরুষদেরকে নয়। **ইমাম কুদূরী (র) বলেন : ক্রীতদাসীর সাথে সহবাস কালে মুনীব তার অনুমতি ব্যতিরেকেই তার যোনির বাইরে বীর্যপাত করতে পারবে। কিন্তু স্ত্রীর সাথে সহবাসকালে তার অনুমতি ছাড়া বীর্যপাত যোনির বাইরে করতে পারবে না।** কেননা, নবী করীম (সা) আযাদ স্ত্রীর সাথে সহাবাসকালে তার অনুমতি ছাড়া তার যোনির বাইরে বীর্যপাত করতে নিষেধ করেছেন। এমনিভাবে তিনি ক্রীতদাসীর মুনীবকে বলেছেন: তুমি ইচ্ছা করলে তার (দাসীর) সাথে আযল (যোনির বাইরে বীর্যপাত) করতে পারবে।

অধিকন্তু সহবাস আযাদ স্ত্রীর হক তার কাম-ভাব চরিতার্থ করাও সন্তান লাভ করার নিমিত্তে। আর এ কারণেই স্বামীর লিঙ্গ কাটা হলে এবং স্বামী পুরুষত্বহীন হলে স্ত্রীকে বিবাহ ছিন্ন করার ব্যাপারে ইখতিয়ার দেওয়া হয়। কিন্তু সহব্যসে দাসীর কোন অধিকার নেই। সুতরাং স্বামী আযাদ স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া তার অধিকার খর্ব করতে পারবে না।

পক্ষান্তরে মুনীব দাসীর যোনীর বাইরে বীর্যপাত করার ব্যাপারে স্বাধীন। কারো নিকাহতে অন্যের দাসী থাকলে তার হুকুম কি হবে? এ সম্পর্কিত বিধি-বিধান আমরা বিবাহ অধ্যায়ে বর্ণনা করেছি।

পরিচ্ছেদ ঃ গর্ভাশয় পবিত্রকরণ ইত্যাদি প্রসঙ্গে

ইমাম মুহাম্মদ (র) 'জামে সগীর' গ্রন্থে বলেনঃ কেউ যদি দাসী ক্রয় করে; তবে তার গর্ভাশয়কে পবিত্র না করা পর্যন্ত সে তার সাথে সহবাস করতে, তাকে স্পর্শ করতে, চুমু খেতে এবং কামোদ্দীপনার সাথে তার যৌনাঙ্গের প্রতি নযর করতে পারবে না। (অথ্যাৎ ইদ্দত পালন শেষ না হওয়া পর্যন্ত তার সাথে কিছুই করা যাবে না) দলীল রাসূলুল্লাহ (সা) এর বাণীঃ তিনি আওতাস (হুনাইন) যুদ্ধের মহিলা কয়েদীদের সম্পর্কে বলেছেন ঃ

اَلَا لَاتُوْطَأُ الْحَبَالىٰ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَلَا الْحَيَالىٰ حَتّٰى يَسْتَبْرِئْنَ بِحَيْضَةٍ.

তাদের মধ্যে যারা অন্ত:সত্ত্বা; তাদের সাথে সহবাস করা যাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা বাচ্চা প্রসব করে। এমনিভাবে যারা অন্ত:সত্ত্বা নয়, তাদের সাথেও সহবাস করা যাবে না, যতক্ষণ না তারা হায়িযের দ্বারা নিজেদের পবিত্রতা প্রমাণ করবে।

এ হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, মুনীবের উপর দাসীর اِسْتِبْرَاءُ তথা তার জরায়ু অন্যের সন্তান হতে পবিত্র কিনা; তা জেনে নেওয়া ওয়াজিব। এমনিভাবে এ হাদীস থেকে এও প্রমাণিত হয় যে, গ্রেফতারকৃত দাসীর ক্ষেত্রে اِسْتِبْرَاءُ ওয়াজিব হওয়ার কারণ কি? اِسْتِبْرَاءُ ওয়াজিব হওয়ার কারণ হলো মালিকানা ও দখলের নবায়ন বা এর

পরিবর্তন। **আর এ নবায়ন** যে ক্ষেত্রে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে, এর মধ্যে পুরাপুরি বিদ্যমান।

উল্লেখ্য যে, জরায়ু পবিত্র ওয়াজিব হওয়ার হিকমত হলো এর দ্বারা জরায়ু অন্যের সন্তান হতে পাক কিনা তা জানা যাবে। এতে সন্তানযোগ্য পানি (বৈধবীর্য) অন্যের পানির (বীর্যের) সাথে মিশ্রিত হয়ে যাওয়া থেকে সংরক্ষিত থাকবে এবং বংশ ধারাও সন্দেহযুক্ত হয়ে যাওয়া থেকে হিফাযত হয়ে যাবে। আর এই হিফাযত প্রমাণিত হবে প্রকৃতপক্ষে জরায়ুতে অন্যের বীর্য থাকা অবস্থায় বা অন্যের বীর্য সম্ভাবনার অবস্থায়। সম্মানযোগ্য পানি (বীর্য) এর অর্থ হলো (এ পানি বা বীর্য, ব্যভিচারের পানি নয়) এ পানি দ্বারা সন্তানের নসব সাব্যস্ত হবে। (আর তখনই এ পানি সম্মানযোগ্য পানি বলে প্রমাণিত হবে।) স্মর্তব্য যে, اِسْتِبْرَاءُ ক্রেতার উপর ওয়াজিব, বিক্রেতার উপর ওয়াজিব নয়। কেননা, দাসীর জরায়ুকে পাক করার মূল উদ্দেশ্য হলো তার সাথে সহবাসের ইচ্ছা করা। আর সহবাসের ইচ্ছাকারী হচ্ছে ক্রেতা, বিক্রেতা নয়। কাজেই দাসীর জরায়ুকে পাক করা তার উপরই ওয়াজিব হবে। তবে যেহেতু সহবাসের ইচ্ছা করা একটি গোপন বিষয়, সুতরাং হুকুম আবর্তিত হবে দলীলের উপর। আর সে দলীল হলো সহবাসের বৈধ ক্ষমতা। সহবাসের বৈধ ক্ষমতা অর্জিত হয় মালিকানা এবং দখলের দ্বারা। কাজেই মালিকানা এবং দখলকে (اِسْتِبْرَاءِ رَحْمٍ এর) কারণ গণ্য করে সুবিধার্থে এর উপরই হুকুমকে প্রয়োগ করা হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে اِسْتِبْرَاءُ رَحْمٍ; এর মূল কারণ হলো দাসীর সত্তার মালিকানা, যা দখলের মাধ্যমে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ হুকুম মালিকানার সকল উৎসের প্রতি সংক্রমিত হবে। যেমন-ক্রয়-বিক্রয়, হিবা, অসিয়ত,মীরাস, খুলা, কিতাবাত[১] ইত্যাদি।

অনুরূপভাবে ক্রেতার উপর اِسْتِبْرَاءُ رَحْمٍ ওয়াজিব হবে; যদি সে নাবালিগের মাল হতে, মহিলা থেকে বা কোন দাস থেকে দাসী খরীদ করে কিংবা এমন ব্যক্তি থেকে খরীদ করে, যার জন্য ঐ দাসীর সাথে সহবাস করা হালাল নয়। এমনিভাবে اِسْتِبْرَاءُ رَحْمٍ, ওয়াজিব হবে, যদি ক্রয়কৃত দাসী এমন কুমারী হয়, যার সাথে সহবাস করা হয় নি। কেননা, এসব ক্ষেত্রে اِسْتِبْرَاءُ ওয়াজিব হওয়ার কারণ পাওয়া গেছে। আর হুকুম কারণের উপরই আবর্তিত হয়, হিকমত বা রহস্যের উপর নয়। কেননা, হিকমত বা রহস্য তো গোপন থাকে। সুতরাং সহবাসের ক্ষীণ সম্ভাবনা থাকলেও কারণ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে ধর্তব্য হবে। (গর্ভাশয়কে পবিত্র করা ওয়াজিব) তবে এক্ষেত্রে ঐ হায়েয যথেষ্ট নয়, যে হায়যের মধ্যে দাসীকে ক্রয় করা হয়েছে। এমনিভাবে ঐ হায়যও যথেষ্ট নয়, যা ক্রয় বা মালিকানার অন্যান্য সূত্রসমূহের (যেমন দান সাদাকা ইত্যাদি) পরে হয়েছে, কিন্তু দখলের পূর্বে। এমনিভাবে ঐ সন্তান প্রসবও এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়, যা ক্রয়ের পর কিন্তু দখলের আগে হাসিল হয়েছে।

---

১. যেমন মুনীব তার গোলামকে বললোঃ তুমি একটি দাসী খরীদ করে আমার কাছে তাকে হস্তান্তর করে দাও, তাহলে আমি তোমাকে আযাদ করে দিব। এ অবস্থায়ও মুনীবের উপর দাসীর اِسْتِبْرَاءُ ওয়াজিব হবে।

পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর থেকে ভিন্ন মত পোষণ করেন। কেনেনা, اِسْتِبْرَاءْ এর মূল কারণ হলো মালিকানা এবং দখলের নবায়ন বা পটপরিবর্তন, আর হুকুম তো কারণের আগে হতে পারে না, এমনিভাবে ফুযুলী ব্যক্তির বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ঐ হায়যও যথেষ্ট নয়, যা হাসিল হয়েছে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতির পূর্বে। যদিও ক্রীতদাসী ক্রেতার হাতেই থাকুক না কেন। আর এমনিভাবে এ ক্ষেত্রে ঐ হায়যও যথেষ্ট নয়, যা ফাসিদ ক্রয়ের ক্ষেত্রে দখলের পর, কিন্তু সহীহভাবে পুন: ক্রয়ের পূর্বে হাসিল হয়েছে; ঐ দলীলের ভিত্তিতে, যা আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি।

এক ব্যক্তি কোন দাসীর আংশিক মালিক। এ অবস্থায় সে যদি বাকী অংশ খরীদ করে, তবে তার উপর এর اِسْتِبْرَاءْ করা ওয়াজিব হবে। কেননা, মালিকানার কারণ এখন পূর্ণ হয়েছে। আর হুকুম কারণ পূর্ণ হওয়ার পরই প্রযোজ্য হয়ে থাকে, (কাজেই মালিকানা হাসিলের পরই ইস্‌তিবরা ওয়াজিব হবে।)

ইস্‌তিবরার জন্য ঐ হায়যই যথেষ্ট, যা হাসিল হয়েছে দাসী খরীদ করে তাকে হস্তগত করার পর। অথচ সে ছিল অগ্নিপূজক; পরে মুসলমান হয়েছে। এমনিভাবে কোন দাসী খরীদ করে দখলে আনার পর যদি তাকে মুকাতাবা বানানো হয় এবং এ অবস্থায় তার হায়য আসে এবং সে যদি কিতাবাতের বিনিময় আদায় করতে অক্ষম হয়ে যায়, তবে ঐ হায়যই ইসতিবরার জন্য যথেষ্ট হবে। কেননা, উপরোক্ত দুই অবস্থাতেই কারণের পর হায়য এসেছে। আর কারণ হলো মালিকানা ও হস্তগত হওয়ার নবায়ন। আর এই কারণ সহবাসকে হালাল করতে চায়, কিন্তু তা হালাল না হয়ে হারামই রয়ে গেছে, অন্য একটি প্রতিবন্ধকতার কারণে। যেমন প্রতিবন্ধকতা থাকে হায়যের অবস্থায়। (এখন যেহেতু সে প্রতিবন্ধকতা শেষ হয়ে গেছে এবং ঐ মহিলাও মুসলমান হয়েছে, তাই এই হায়যের পরই তার সাথে সহবাস জাইয হবে।)

পলাতক দাসী মালিকের কাছে ফিরে আসলে অথবা অপহৃত দাসী কিংবা শ্রমে দেওয়া দাসী ফিরে আসলে অথবা বন্ধক রাখা দাসী বন্ধক থেকে মুক্ত হয়ে গেলে, তাদের[১] গর্ভাশয় পবিত্রকরণ ওয়াজিব হবে না। (এ ক্ষেত্রে) গর্ভাশয় পবিত্রকরণ ওয়াজিব হওয়ার কারণ না পাওয়া যাওয়ার কারণে। আর সে কারণটি হলো, মালিকানা ও দখলের নবায়ন। আর এই কারণটি সুনির্দিষ্ট। কাজেই গর্ভাশয় পবিত্রকরণ ওয়াজিব হওয়া বা না হওয়ার বিষয়টিকে এর উপরই আবর্তিত করা হয়েছে। এ মাসআলার বহু দৃষ্টান্ত আছে, সেগুলোকে আমি কিফায়াতুল মুনতাহী কিতাবে লিপিবদ্ধ করেছি।

যে যে ক্ষেত্রে اِسْتِبْرَاءْ ওয়াজিব এবং সহবাস হারাম, সে সে ক্ষেত্রে সহবাসের উত্তেজনা সৃষ্টিকারী কাজ (যেমন চুমা খাওয়া, স্পর্শ করা ইত্যাদি)ও হারাম। কেননা, এগুলো মানুষকে সহবাসের দিকে পৌঁছিয়ে দেয় বা এগুলো অধিকারভুক্ত নয়, এমন স্থানে হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। এই হিসাবে যে, এ অবস্থায় পেটে সন্তান থাকা প্রকাশ পেতে পারে এবং বিক্রেতা তার সন্তান বলে দাবী করতে পারে। (তখন সে

---

১. অর্থাৎ যে যে ক্ষেত্রে কারণ পাওয়া যাবে, সে সে ক্ষেত্রে اِسْتِبْرَاءْ ওয়াজিব। আর যে যে ক্ষেত্রে এ কারণ পাওয়া যাবে না, সে সে ক্ষেত্রে اِسْتِبْرَاءْ ওয়াজিব হবে না।

উম্মেওয়ালাদ তথা মুনীবের সন্তানের মা হিসাবে তার বেচা-কেনা বাতিল হয়ে যাবে।) কিন্তু ঋতুমতী মহিলার বিষয়টি এর থেকে ব্যতিক্রম। কেননা, তার সাথে সহবাসে উত্তেজনা সৃষ্টিকারী কিছু করা হারাম নয়। কারণ এই ক্ষেত্রে এসব আচরণ অধিকারভুক্তহীন স্থানে হওয়ার সম্ভাবনা নেই। এছাড়া ঋতুমতী মহিলার এ সময়টি হচ্ছে একটি ঘৃণিত সময়। এ কারণে যৌন উত্তেজনা সৃষ্টিকারী ভূমিকামূলক কর্মকে মুবাহ করাতে তা মানুষকে সহবাস পর্যন্ত পৌছাবে না। পক্ষান্তরে সদ্য খরীদকৃত দাসীর প্রতি সহবাসের পূর্বে পূর্ণ আসক্তি থাকে। কাজেই, তার ক্ষেত্রে دَوَاعِىْ وَلْحِرْ তথা যৌন উত্তেজনা সৃষ্টিকারী প্রাথমিক কর্মসমূহ সহবাস পর্যন্ত নির্ঘাত পৌছিয়ে দিবে। (তার ক্ষেত্রে এগুলো হচ্ছে হারাম।) কিন্তু যাহিরী রিওয়ায়েতে কয়েদকৃত দাসীর সাথে এ জাতীয় কোন আচরণ করা যাবে কিনা, তার কোন উল্লেখ নেই তবে ইমাম মুহাম্মদ (র) হতে বর্ণিত আছে যে, তার ক্ষেত্রে এগুলো হারাম নয়। কেননা, এ আচরণ তার বেলায় অনধিকার ক্ষেত্রে সংঘটিত হবে না। কারণ তার পেটে সন্তান আছে বলে যদি প্রকাশ পায়, তাহলে হরবী (অমুসলিম রাষ্ট্রের কাফির নাগরিক) ব্যক্তি এ সন্তানের দাবী করতে পারবে না। কিন্তু পূর্ব বর্ণিত কারণে ক্রয়কৃত দাসীর ক্ষেত্রে বিক্রেতার এ ধরনের দাবী গ্রহণযোগ্য হবে।

গর্ভবতী মহিলার ক্ষেত্রে গর্ভাশয়ের পবিত্রতা অর্জিত হবে সন্তান প্রসবের দ্বারা ঐ বর্ণনার ভিত্তিতে, যা আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। আর যে মহিলাদের হায়য হয় না তাদের اِسْتِبْرَاءْ হবে মাসের গণনা অনুপাতে।[১] কেননা, তাদের ক্ষেত্রে মাসকে হায়যের স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। যেমন ইদ্দত পালনকারী মহিলার ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হয়ে থাকে।

মাসের গণনা হিসাবে গর্ভাশয় পবিত্র করা শুরু করার পর যদি কোন মহিলার পুনরায় হায়য আরম্ভ হয়, তবে দিন (মাস) গুণে পবিত্রতা হাসিলের এ প্রক্রিয়া বাতিল হয়ে যাবে। বদলের দ্বারা উদ্দেশ্য হাসিলের পূর্বেই আসল তথা হায়য দ্বারা اِسْتِبْرَاءْ অর্জনের ক্ষমতা প্রাপ্তির কারণে। যেমন ইদ্দত পালনের ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে যদি হায়য চলা অবস্থায় হায়য বন্ধ হয়ে যায়, তবে অন্তসত্ত্বা নয়, এ কথা প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত আর তার সাথে সহবাস করবে না। অবশ্য সে গর্ভবতী নয়, এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেল তার সাথে সহবাস করতে পারবে। যাহিরী রিওয়ায়েত মতে গর্ভ স্পষ্ট হওয়ার জন্য কোন নির্দিষ্ট সময়সীমা নেই। তবে কোন কোন ফকীহ্ এর সময় সীমা দুই মাস বা তিন মাসের কথা উল্লেখ করেছেন। ইমাম মুহাম্মদ (র) হতে বর্ণিত আছে যে, এর সময়সীমা হচ্ছে চার মাস দশ দিন। আবার তার থেকে দুই মাস পাঁচ দিনের কথাও বর্ণিত রয়েছে। আযাদ বা দাসী মহিলার ইদ্দতে, ওফাতের উপর কিয়াস করে, তিনি এ হুকুম বর্ণনা করেছেন। পক্ষান্তরে ইমাম যুফার (র) হতে দুই বছরের কথা বর্ণিত রয়েছে। এটি ইমাম আবু হানীফা (র) এর একটি অভিমতও বটে।

গ্রন্থকার বলেন ঃ ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর মতে গর্ভাশয় পবিত্র করণের বিষয়টিকে রহিত করার জন্য কৌশল অবলম্বন করাতে কোন দোষ নেই। কিন্তু

---

১. যেমন নাবালিগা বা অতি বৃদ্ধা।

ইমাম মুহাম্মদ (র) এর থেকে ভিন্ন মত পোষণ করেন। শুফ'আর বিবরণে উভয়বিধ কারণই আমরা বর্ণনা করেছি। ইমাম আবু ইউসুফ (র)- এর মতটি গৃহীত হয়েছে ঐ ক্ষেত্রে, যখন নিশ্চিত জানা যাবে যে, বিক্রেতা তার সাথে তার এ তুহরের (পবিত্রতার) অবস্থায় সহবাস করেনি। আর ইমাম মুহাম্মদ (র) এর মতটি গৃহীত হবে ঐ ক্ষেত্রে, যখন বিক্রেতা তার সাথে তার এ তুহরের অবস্থায় সহবাস করে থাকে।

কৌশলটি হলো ঃ যদি ক্রেতার কোন আযাদ স্ত্রী না থাকে, তবে সে তাকে ক্রয়ের পূর্বে বিয়ে করে নেবে। তারপর তাকে ক্রয় করবে। (এ অবস্থায় তার গর্ভাশয়কে পবিত্র করণের প্রয়োজন হবে না।)

আর যদি তার আযাদ স্ত্রী থাকে, তবে কৌশলটি হলো ঃ ক্রয়ের পূর্বে বিক্রেতা অথবা দখলের পূর্বে ক্রেতা তাকে এমন এক ব্যক্তির কাছে বিয়ে দেবে যে তালাক দিয়ে দেবে বলে তার আস্থা আছে। এরপর ক্রেতা তাকে খরীদ করে হস্তগত করে নেবে, (প্রথম ক্ষেত্রে) অথবা শুধু হস্তগত করে নেবে (দ্বিতীয় ক্ষেত্রে)। তারপর তার স্বামী তাকে তালাক দিয়ে দেবে। (এ অবস্থায় তার গর্ভাশয়কে পবিত্র করা অপরিহার্য হবে না।) কেননা, হস্তগত হওয়া দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত মালিকানা নবায়নের সময় (স্বামী বিদ্যমান থাকার দরুণ) তার গুপ্তাঙ্গ তার জন্য হালাল ছিল না। কাজেই তার উপর গর্ভাশয়কে পবিত্র করা ওয়াজিব হবে না। যদিও সে হালাল হয়(তালাকের কারণে) এরপরে। কেননা, গর্ভাশয় পবিত্র করণের কারণ পাওয়া যাওয়ার সময়টিই হল ধর্তব্য বিষয়। যেমন অন্য পুরুষের ইদ্দত পালনকারী নারীর ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। (অর্থাৎ তাকে ক্রয় করলে পবিত্রকরণের প্রয়োজন হয় না।)

ইমাম মুহাম্মদ (র) 'জামে সগীর' গ্রন্থে বলেন ঃ যিহারকারী[১] ব্যক্তি যিহারের কাফ্ফারা আদায় না করা পর্যন্ত তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে, তাকে স্পর্শ করতে, চুমু খেতে এবং তার গুপ্তাঙ্গের প্রতি কামোদ্দীপনার সাথে নযর করতে পারবে না। কেননা, কাফ্ফারা আদায়ের পূর্বে যেহেতু সহবাস হারাম, তাই সহাবাসের পূর্বে উত্তেজনা সৃষ্টিকারী যৌনাচারও হারাম বলে গণ্য হবে। কেননা, এ সব আচরণ ব্যক্তিকে সহবাস পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়। এ ক্ষেত্রে মূলনীতি হলোঃ হারামের কারণও হারাম। যেমনটি দেখা যায় ই'তিকাফ ও হজ্জের ইহরামের অবস্থায় এবং বিবাহিতা স্ত্রীর ক্ষেত্রে যখন সন্দেহ জনিত কারণে তার সাথে সহবাস করা হয়। (এসব ক্ষেত্রে সহবাস হারাম এবং সহবাসের পূর্বাচরণও হারাম।)

পক্ষান্তরে হায়য ও রোযার অবস্থা এর থেকে ব্যতিক্রম। কেননা, হায়য মহিলাদের জীবনের এক বিরাট অংশ নিয়ে পরিব্যাপ্ত হয়ে থাকে। আর ফরয রোযা একমাস দীর্ঘায়িত হয় এবং নফল রোযাও জীবনের অনেক সময় ব্যাপী হয়ে থাকে। এ অবস্থায় যদি সহবাসের পূর্বাচরণ নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়, তবে এতে এক ধরনের জটিলতা সৃষ্টি হবে। তবে এর পূর্বে যেগুলোর কথা আমরা গণনা করে আসছি, সেগুলোর মেয়াদ সংকীর্ণ হওয়ার কারণে তথায় তেমন অসুবিধা হয় না। সর্বোপরি সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সা) রোযা অবস্থায় স্ত্রীদের চুমু খেতেন এবং হায়য (চলাকালীন) অবস্থায় নিজ স্ত্রীদের সাথে একত্রে শয়ন করতেন।

১. দ্বিতীয় খন্ড, যিহার অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

ইমাম মুহাম্মদ (র) 'জামে সগীর' গ্রন্থে বলেন ঃ যদি কারো এমন দুজন দাসী থাকে, যারা পরস্পর বোন। এ অবস্থায় সে যদি তাদের উভয়কে কামোদ্দীপনার সাথে চুম্বন করে; তবে সে আর তাদের কারো সাথেই সহবাস করতে পারবে না, কাউকে চুমু খেতে পারবে না, কামোদ্দীপনার সাথে কাউকে স্পর্শ করতে পারবে না এবং কারো গুপ্তাঙ্গের প্রতি কামোদ্দীপনার সাথে নযর করতে পারবে না, যতক্ষণ না অন্য কাউকে (মালিকানা বিবাহ সূত্রে) তাদের কোন এক জনের গুপ্তাঙ্গের মালিক বানিয়ে দিবে অথবা কোন একজনকে আযাদ করে দেবে। এ ব্যাপারে মূলনীতি হলো দুই দাসী যারা পরস্পর বোন, তাদেরকে একত্রে রেখে সহবাস করা জাইয নেই।

কেননা আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

وَاَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ .

−তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে দুই বোনকে একত্রিত করা। (৪ঃ২৩)

("এখানে দুই বোনকে একত্রে জমা করা হারাম" কথাটি ব্যাপক অর্থে বলা হয়েছে। তাই আযাদ মহিলা এবং দাসী সকলেই এ হুকুমের অন্তর্ভুক্ত।) উল্লেখ্য যে, উক্ত আয়াত এবং اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ (অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীগণ) আয়াতের মাঝে কোন বৈপরীত্য নেই। কেননা, হালাল-হারামের দলীলের মধ্যে বৈপরীত্য দেখা দিলে হারামের দলীলকে প্রাধান্য দেয়া হয়। অনুরূপভাবে সহবাসের পূর্বে যে যৌনাচার করা হয়, সে ক্ষেত্রেও দুই বোনকে একত্রিত করা জাইয নয়। কেননা, আয়াত হচ্ছে ব্যাপক। অধিকন্তু হারামের ক্ষেত্রে সহবাস পূর্ববর্তী যৌনাচারও সহবাসের অনুরূপই। ইতিপূর্বে আমরা এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। কাজেই যদি কেউ তাদের (দুই বোন) উভয়ের সাথে চুমু খায়, তবে সে যেন তাদের উভয়ের সাথে সহবাস করলো। আর উভয়ের সাথে সহবাস করার পর তাদের কারো সাথেই আর সহবাস করতে পারবে না। অনুরূপভাবে তাদের কারো সাথেই আর সহবাস পূর্ববর্তী যৌনচারও করতে পারবে না। অনুরূপভাবে যদি তাদের উভয়কে চুম্বন করে অথবা যদি তাদের উভয়কে কামোদ্দীপনার সাথে স্পর্শ করে, কামোদ্দীপনার সাথে তাদের গুপ্তাঙ্গের প্রতি নযর করে, (তাহলেও উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে) ঐ কারণে, যা আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। অবশ্য যদি মালিকানা বা বিবাহের সূত্রে তাদের একজনের যৌনাঙ্গকে অন্যের মালিকানায় দিয়ে দেওয়া হয় কিংবা একজনকে আযাদ করে দেওয়া হয় (তবে অবশিষ্ট জনের সাথে সহবাস এবং পূর্ববর্তী আরচরণসমূহ জাইয হবে।) কেননা, যখন অপর জনের গুপ্তাঙ্গ তার জন্য হারাম হয়ে গেল, তখন আর সে দুই বোনকে একত্রকারী হিসাবে বাকী থাকলো না। মূল বক্তব্যে উল্লেখিত মালিকানা দ্বারা অন্য কারো দাসীর মালিক হয়ে যাওয়াকে বুঝানো হয়েছে। কাজেই মালিক বানানোর যত উৎস আছে সবই এর মধ্যে শামিল হয়ে যাবে। যেমন বিক্রয়,(দান, সাদাকা, খুলা সুলেহ) ইত্যাদি। এ ক্ষেত্রে দাসীর অংশ বিশেষের মালিকানা হস্তান্তর পূর্ণ অংশের মালিকানা হস্তান্তরের মতই। কেননা, এর দ্বারাও সহবাস হারাম হয়ে যায়। এমনিভাবে

দুই জনের কোন একজনের কিয়দংশ আযাদ করাও পূর্ণ আযাদ করার মতই, কিতাবাতও আযাদ করার অনুরূপই। কেননা, এই সব গুলোর দ্বারাই সহবাস হারাম হয়ে যায়। অবশ্য তাদের একজনকে বন্ধক রাখার দ্বারা, ইজারা দেওয়ার দ্বারা বা মুদাব্বারা বানানোর দ্বারা অপরজন হালাল হবে না। কেননা, এতে তার মালিকানা শেষ হয় না।

ইমাম মুহাম্মদ (র) এর বক্তব্য ঃ أَوْ نِكَاحٍ (বিবাহ সূত্রে) এর দ্বারা সহীহ ও বৈধ বিবাহকে বুঝানো হয়েছে। যদি মালিক তাদের কোন একজনকে ফাসিদ পদ্ধতিতে বিবাহ দেয়, তবে অপর জনের সাথে সহবাস বৈধ হবে না। অবশ্য এ অবস্থায় স্বামী যদি তার সাথে সহবাস করে, তবে মুনীবের জন্য দ্বিতীয় জনের সাথে সহবাস করা বৈধ হবে। কেননা, স্বামীর সহবাসের কারণে স্ত্রীর উপর ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব হয়। আর কোন জিনিসকে হারাম করার ক্ষেত্রে ইদ্দতও সহীহ বিবাহের মতই। যদি মুনীব তাদের দুই জনের কোন এক জনের সাথে সহবাস করে নেয়, তবে সহবাসকৃত মহিলার সাথেই তার সহবাস বৈধ থাকবে, অন্য জনের সাথে নয়। কেননা, এ অবস্থায় সে যদি অপর জনের সাথে সহবাস করে, তবে সে দুই বোনকে একত্রকারী বলে গণ্য হবে। অবশ্য সহবাসকৃতের সাথে সহবাস করলে একত্রকারী বলে গণ্য হবে না। উল্লেখ্য যে, যে দুই মহিলাকে একত্রে বিবাহ করা জাইয নয়, তারাও উপরোক্ত বিধি-বিধান, যা আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি, এর ক্ষেত্রে দুই বোনের মত বলেই গণ্য হবে।

ইমাম মুহাম্মদ (র) 'জামে সগীর' গ্রন্থে বলেন ঃ এক পুরুষের জন্য অন্য পুরুষের মুখে, হাতে বা তার শরীরের অন্য কোন অংশে চুমু খাওয়া কিংবা মু'আনাকা করা মাকরূহ।

ইমাম তাহাভী (র) উল্লেখ করেছেন যে, এটি ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র) এর অভিমত। পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন ঃ চুমু খাওয়া এবং মু'আনাকা করাতে কোন দোষ নেই। কেননা, নবী করীম (সা) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত জা'ফর (রা) যখন আবিসিনিয়া থেকে ফিরে আসেন, তখন তিনি তার সাথে মু'আনাকা করেন এবং তার দুই চোখের মাঝখানে চুমু খান।

আর সাহেবাইনের দলীল হলো ঃ নবী করীম (সা) মুকামাআ অর্থাৎ মুআনাকা এবং মুকাআমা তথা চুমু খেতে নিষেধ করেছেন।

আর পূর্বোক্ত হাদীসটি নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা করার পূর্বের অবস্থার সাথে সম্পর্কিত। ফকীহগণ উপরোক্ত হাদীস দুটির মধ্যে সমন্বয় বিধান করতে গিয়ে বলেছেন ঃ মু'আনাকার ক্ষেত্রে এ মতভেদ তখনই প্রযোজ্য হবে, যদি দুই পুরুষ একই চাদরের ভেতরে থেকে মু'আনাকা করে। বস্তুত: যদি জামা বা জুববা গায়ে মু'আনাকা করে, তবে ফকীহগণের সর্বসম্মত রায় অনুপাতে এতে কোন দোষ হবে না। আর এটিই বিশুদ্ধ মত।

ইমাম মুহাম্মদ (র) 'জামে সগীর' গ্রন্থে বলেন ঃ মুসাফাহা করাতে কোন দোষ নেই। কেননা, এটি পূর্ব হতেই চলে আসছে।

অধিকন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ

مَنْ صَافَحَ اَخَاهُ الْمُسْلِمَ وَحَرَّكَ يَدَهُ تَنَا ثَرَتْ ذُنُوْبُهُ ٠

কেউ যদি তার অপর মুসলমান ভাইয়ের সাথে মুসাফাহা করে নিজের হাত নাড়া দেয়, তবে এতে তার সমুদয় গুনাহ্ ঝরে পড়ে যায়।

পরিচ্ছেদ ঃ ক্রয়-বিক্রয়ের বিষয় সম্পর্কে

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন ঃ গোবর বিক্রি করাতে কোন দোষ নেই। কিন্তু মানুষের পায়খানা বিক্রি করা মাক্রূহ। পক্ষান্তরে ইমাম শাফিঈ (র) বলেন ঃ গোবর বিক্রি করাও জাইয নেই। কেননা, গোবর মূলগত দিক থেকেই নাপাক। এই হিসাবে এটি পায়খানার মতই এবং মৃত জানোয়ারের চামড়ার ন্যায়। (যা এখনো দাবাগত করা হয়নি এর মত) হয়ে গেল।

আমাদের দলীল হলো ঃ গোবর উপকারী বস্তু। কেননা, তা ফসল বৃদ্ধির জন্য কৃষি ভূমিতে দেওয়া হয়। সুতরাং এটি মাল তথা সম্পদ বলে গণ্য। আর মাল তথা সম্পদ মাত্রই ক্রয়- বিক্রয়ের বস্তু। কিন্তু মানুষের পায়খানার-বিষয়টি এর থেকে ব্যতিক্রম। কেননা, পায়খানা উপকারে আসে তা মাটির সাথে মিশ্রিত হলে। আর এ মিশ্রিত পায়খানা বিক্রি করাও জাইয। এটি ইমাম মুহাম্মদ (র) হতে বর্ণিত রয়েছে। আর এটিই সহীহ্ অভিমত। অনুরূপভাবে মিশ্রিত পায়খানা দ্বারা উপকৃতও হওয়া জাইয আছে। কিন্তু মাটির সাথে মিশ্রিত না হলে সহীহ্ মতে তা ব্যবহার করা জাইয হবে না। বস্তুত: মিশ্রিত পায়খানা ঐ তেলের ন্যায়, যার সাথে অপবিত্র বস্তু মিশ্রিত হয়েছে।

ইমাম মুহাম্মদ (র) 'জামে সগীর' গ্রন্থে বলেন ঃ কোন ব্যক্তি একটি দাসী সম্পর্কে জানে যে, এটি অমুক ব্যক্তির মালিকানাধীন দাসী। এরপর সে দেখলো যে, ঐ দাসীকে অন্য কেউ বিক্রি করছে এবং সে বলছে যে, এর মালিক আমাকে এটি বিক্রি করার জন্য উকীল বানিয়েছে, এ অবস্থায় সে (দর্শক) তাকে ক্রয় করে সহবাস করতে পারবে। কেননা, এ লোকটি সঠিক সংবাদ দিয়েছে এবং তার সংবাদের ব্যাপারে কোন বিতর্ক নেই। আর লেন-দেনের ক্ষেত্রে এক ব্যক্তির কথাও গ্রহণযোগ্য হয়, সে যেমনই হোক না কেন, ঐ দলীলের ভিত্তিতে, যা পূর্বে আলোচিত হয়েছে। অনুরূপভাবে যদি সে ব্যক্তি বলে, "আমি একে তার থেকে খরীদ করে নিয়েছি" অথবা সে আমাকে এটি হিবা করেছে, অথবা বলে যে, "সে একে আমার জন্য সাদাকা করে দিয়েছে।" ঐ কারণে যা আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। উপরোক্ত হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে, যদি লোকটি নির্ভরযোগ্য হয়। আর সে যদি নির্ভরযোগ্য নাও হয়, কিন্তু তাকে সত্যবাদী বলে মনে প্রবল ধারণা হয়, তাহলেও এতে উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে। কেননা,লেন-দেনের ক্ষেত্রে সংবাদদাতার মধ্যে আদালত ও বিশ্বস্ততা থাকা অপরিহার্য নয়। কারণ হচ্ছে জরুরত ও প্রয়োজনীয়তা-ঐ বাখ্যা অনুসারে, যা আলোচিত

হয়েছে। আর যদি তার প্রবল ধারণা হয় যে, সংবাদদাতা মিথ্যাবাদী, তাহলে তার কথার ভিত্তিতে উপরোক্ত বিষয়াদির কোনটিই তার জন্য জাইয হবে না। কেননা, প্রবল ধারণা ইয়াকীনের স্থলাভিষিক্ত বলে গণ্য হয়ে থাকে।

এমনিভাবে এটি কার দাসী যদি একথা কারো জানা না থাকে, কিন্তু যার দখলে আছে সে বলে,'এ দাসীটি অমুকের–' সে আমাকে তা বিক্রি করার জন্য উকীল বানিয়েছে; অথবা উক্ত ব্যক্তি যদি বলে যে, সে একে অমুক ব্যক্তির নিকট হতে খরীদ করেছে, এ অবস্থায় যদি সংবাদদাতা নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি হয়, তাহলে তার কথা গ্রহণ করা হবে। আর যদি সে নির্ভরযোগ্য না হয়, তবে এ ক্ষেত্রে প্রবল ধারণার বিষয়টি ধর্তব্য হবে। কেননা, যার দখলে দাসী আছে, তার কথা তার নিজের ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য দলীল। যদি সে (যার হাতে দাসী আছে) কিছু না বলে, কিন্তু ক্রেতা দাসীকে চিনে যে, এই দাসী প্রথমোক্ত ব্যক্তির, তাহলে সে তাকে ক্রয় করবে না, যতক্ষণ না সে তার দ্বিতীয় ব্যক্তির মালিকানায় হস্তান্তরিত হওয়া সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে জানবে। কেননা, প্রথম ব্যক্তির হাতে থাকা এটা তার মালিকানার প্রমাণ। আর যদি সে তাকে না চিনে তবে তাকে খরীদ করতে পারবে না। যদিও সে যার কাছে ছিল সে ব্যক্তি ফাসিক হয়। কেননা, ফাসিকের হাতে থাকা এটাই তার মালিকানার প্রমাণ। যেমন- আদিল (বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি) এর হাতে থাকা তার মালিকানার প্রমাণ। আর এ ক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধকতাও নেই। সর্বোপরি স্পষ্ট কোন দলীল পাওয়া যাওয়ার সময় প্রবল ধারণার বিষয়টি ধর্তব্য হয় না। কিন্তু যদি এ ধরনের ফাসিক ব্যক্তি এ জাতীয় বস্তুর মালিকানা লাভ করার যোগ্য না হয়, তবে তা খরীদ করা থেকে বেঁচে থাকা মুস্তাহাব। এতসত্ত্বেও উক্ত ব্যক্তি যদি তা খরীদ করে নেয়, তাহলে আশা করা যায় যে, এরূপ করার তার জন্য অবকাশ থাকবে। কেননা, সে শরয়ী দলীলের উপর ভিত্তি করেই এরূপ করেছে।

যদি দাস বা দাসী কোন দাসীকে তার কাছে নিয়ে আসে (বিক্রির জন্য) তবে জিজ্ঞাসাবাদের পূর্বে সে তাকে গ্রহণ করবে না এবং ক্রয় করবে না। কেননা, দাস বা দাসীর কোন মালিকানা নেই। এতে বুঝা যাচ্ছে যে, এর মালিকানা অন্যের। যদি সে এ মর্মে তাকে সংবাদ দেয় যে, তার মুনীব তাকে এ ব্যাপারে অনুমতি প্রদান করেছে এবং সে যদি বিশ্বস্ত ব্যক্তি হয়, তবে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি বিশ্বস্ত না হয়, তবে এ ব্যাপারে তার প্রবল রায় কি, তা ধর্তব্য হবে। আর যদি তার কোন রায়ই না থাকে, তবে সে এই দাসীকে ক্রয় করবে না। যেহেতু এ ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক রয়েছে। কাজেই দলীল অপরিহার্য।

ইমাম মুহাম্মদ (র) 'জামে সগীর' গ্রন্থে বলেন ঃ **যদি কোন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি কোন মহিলাকে এমর্মে সংবাদ দেয় যে, তার অনুপস্থিত (প্রবাসী) স্বামী মারা গেছে অথবা তাকে তিন তালাক দিয়ে দিয়েছে অথবা সে লোকটি নির্ভরযোগ্য নয়, কিন্তু তার স্বামীর পক্ষ হতে পত্র নিয়ে এসেছে, যার মধ্যে তালাকের কথা উল্লেখ রয়েছে, অথচ সে মহিলা জানে না যে, এটি তার চিঠি কি না। এ অবস্থায় চিন্তা-ভাবনা করার পর যদি তার প্রবল ধারণা হয় যে, এটি ঠিক, তাহলে ইদ্দত পালন করার**

পর তার অন্য স্বামীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়াতে কোন দোষ নেই। কেননা, বিবাহ বিচ্ছেদকারী বিষয়টি স্পষ্ট এবং এর বিপরীত কোন কিছু নেই। অনুরূপভাবে কোন মহিলা যদি অপর কোন পুরুষকে বলে ঃ আমার স্বামী আমাকে তালাক দিয়েছে এবং আমার ইদ্দতও অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, এ অবস্থায় উক্ত পুরুষ লোকটি যদি তাকে বিয়ে করে, তবে এতে কোন দোষ নেই। এমনিভাবে তিন তালাক প্রাপ্ত কোন মহিলা যদি বলে ঃ আমার ইদ্দত শেষ হওয়ার পর আমি অন্য স্বামী গ্রহণ করেছিলাম এবং সে আমার সাথে সহবাসও করেছে, তারপর সে আমাকে তালাক দিয়েছে এবং আমার ইদ্দতও (দ্বিতীয় বার) অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। এ অবস্থায় প্রথম স্বামী তাকে বিবাহ করাতে কোন দোষ নেই। ঠিক তদ্রূপ কোন দাসী যদি বলে আমি অমুকের দাসী ছিলাম, তিনি আমাকে আযাদ করে দিয়েছেন (তাহলে তাকে বিবাহ করাতে কোন দোষ নাই) কেননা, দাসত্ব ছিন্নকারী স্পষ্ট।

যদি কোন সংবাদদাতা কোন মহিলাকে এ মর্মে সংবাদ দেয় যে, তার মূল বিবাহটাই সঠিক ছিল না, অথবা বিবাহের সময় তার স্বামী মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) ছিল অথবা স্বামী তার দুধ ভাই ছিল, তবে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না, যতক্ষণ না এ ব্যাপারে দুইজন পুরুষ অথবা একজন পুরষ ও দুই জন মহিলা সাক্ষ্য দেবে। এমনিভাবে সংবাদদাতা যদি কোন স্বামীকে এ মর্মে সংবাদ দেয় যে, তুমি মুরতাদ(ধর্মত্যাগী) মহিলাকে বিবাহ করেছো, অথবা যাকে বিবাহ করেছো সে ছিল তোমার দুধ বোন, তাহলে এই স্বামী উক্ত মহিলার বোনকে বিবাহ করতে পারবে না এবং সে ব্যতীত আরো চারজন মহিলাকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করতে পারবে না, যতক্ষণ না এ সম্বন্ধে দুই জন ন্যায়পরায়ণ বিশুস্ত ব্যক্তি সাক্ষ্য প্রদান করবে। কেননা, সে বিবাহ ভঙ্গের এমন সংবাদ দিয়েছে, যা বিবাহের বিবাহ বন্ধনের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল। এ অবস্থায় বিবাহ বন্ধনের ব্যাপারে পদক্ষেপ নেওয়া বিবাহ বন্ধনের বিশুদ্ধতার প্রমাণ বহন করে। আরো প্রমাণ বহন করে বিবাহ ফাসিদ বা নষ্ট হওয়ার সংবাদের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করার। এতে বাহ্যিক দৃষ্টিতে বিতর্ক সাব্যস্ত হয়ে যায়। (আর বিতর্কিত বিষয়ে দুই জনের সাক্ষ্য অপরিহার্য।) পক্ষান্তরে যদি বিবাহিতা স্ত্রী নাবালিকা হয়, আর স্বামীকে সংবাদ দেওয়া হয় যে, সে তার মায়ের বা বোনের দুধ পান করেছে, তবে এ ক্ষেত্রে এক ব্যক্তির কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা, এখানে বিবাহ ছিন্নকারী বিষয় পাওয়া গেছে। আর বিবাহ পূর্ব পদক্ষেপ দুধ পানের অস্বীকৃতি প্রদান করে না। কাজেই এ ক্ষেত্রে কোন বিতর্ক নেই বিধায় তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। উল্লেখ্য যে,এই মূলনীতির উপরই পার্থক্য তথা সংবাদ গ্রহণযোগ্য হওয়া না হওয়ার হুকুম আবর্তিত হতে থাকবে।

নিজের কথা ব্যক্ত করতে পারে না এমন নাবালিকা দাসী যদি কারো অধীনে থাকে এবং সে দাবী করে যে, সে তার দাসী। তারপর সে বড় হয়ে যদি অন্য শহরে চলে গিয়ে অপর কোন ব্যক্তির সাক্ষাতে বলে যে, আমি মূলত:ই আযাদ; তাহলে এ পুরুষের জন্য তাকে বিয়ে করার কোন অবকাশ নেই। কেননা, এ ক্ষেত্রে বিতর্ক এবং আপত্তি আছে এমন ব্যক্তির পক্ষ হতে, যার অধীনে ও তত্ত্বাধানে সে ছিল। কিন্তু প্রথমোক্ত মাসআলাটি এর ব্যতিক্রম।

ইমাম মুহাম্মদ (র) 'জামে সগীর' গ্রন্থে বলেন ঃ যদি কোন মুসলিম ব্যক্তি মদ বিক্রি করে এর মূল্য গ্রহণ করে, এর দ্বারা নিজের ঋণ পরিশোধ করে, তবে ঋণদাতা ব্যক্তির জন্য তার থেকে এ টাকা গ্রহণ করা মাকরূহ। অবশ্য ঋণদাতা যদি খৃষ্টান হয়, তবে এ টাকা গ্রহণ করাতে কোন দোষ নেই। পার্থক্যের কারণ হলো ঃ প্রথমোক্ত অবস্থায় বিক্রয় বাতিল হয়ে গেছে। কেননা, মুসলিম ব্যক্তির ক্ষেত্রে মদ কোন মূল্যমান সম্পন্ন বস্তু নয়। কাজেই (বিক্রীত) মদের মূল্য ক্রেতার মালিকানায়ই রয়ে গেছে। অতএব বিক্রেতার নিকট হতে এ মূল্য (টাকা) গ্রহণ করা তার জন্য হালাল নয়। আর শেষোক্ত অবস্থায় বিক্রয় সহীহ হয়েছে। কেননা, যিম্মীর ক্ষেত্রে এটি মূল্যমান সম্পন্ন বস্তু; কাজেই বিক্রেতা এ টাকার মালিক হবে এবং তার থেকে এ টাকা গ্রহণ করাও হালাল হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ মানুষ এবং চতুষ্পদ জন্তুর খাদ্য (মূল্য বৃদ্ধির অপেক্ষায়) জমা করে রাখা মাকরূহ। যদি তা এমন শহরে (এলাকায়) হয় যে, এ জমা রাখার কারণে শহরবাসী লোকদের ক্ষতি সাধিত হয়। এমনিভাবে শহরের বাইরে গিয়ে বাণিজ্যিক কাফেলার সাথে সাক্ষাৎ করে তাদের থেকে মালামাল খরীদ করে রাখাও মাকরূহ। তবে এতে শহর (বা এলাকা)-বাসী লোকদের ক্ষতি না হলে কোন দোষ নেই। এ বিষয়ে দলীল হলো ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর বাণী।

তিনি ইরশাদ করেছেন ঃ

اَلْجَالِبُ مَرْزُوْقٌ وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُوْنٌ.

যে ব্যক্তি শহরের বাইরে থেকে মালামাল খরীদ করে শহরে এনে তা বিক্রি করে, সে রিয্কপ্রাপ্ত হয় এবং গুদামজাতকারী ব্যক্তি হয় অভিশপ্ত।

মালামাল জমা করে রাখা নিষিদ্ধ হওয়ার যৌক্তিক কারণ হল এই যে, খাদ্য-দ্রব্যের সাথে সর্বসাধারণের অধিকার সংশ্লিষ্ট। অতএব বিক্রি না করে তা আটকে রাখলে তাদের অধিকার খর্ব করা হয় এবং তাদের উপর খাদ্যের ব্যাপারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করা হয়। সুতরাং এতে তাদের ক্ষতি হলে এরূপ করা মাকরূহ বলে গণ্য হবে। যেমন শহরটি ছোট। (এতে এ জাতীয় মালে ব্যাপাকতা নেই।) পক্ষান্তরে যদি তাদের ক্ষতি না হয়, যেমন শহরটি খুব বড় (এবং এ জাতীয় মালামালও সেখানে প্রচুর পাওয়া যায়), তবে মাকরূহ হবে না। কেননা সে অন্যকে ক্ষতি না করে নিজের মালামাল আটকে রেখেছে। (এরূপ করার অধিকার তার রয়েছে) এমনিভাবে বাণিজ্যিক কাফেলার সাথে সাক্ষাৎ করার বিষয়টিও উক্ত ব্যাখ্যার উপর নির্ভরশীল। কেননা নবী করীম (স) শহরের বাইরে গিয়ে একচেটিয়া মালামাল খরীদ করতে এবং বাণিজ্যিক কাফেলার সাথে সাক্ষাৎ করে মাল ক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

ফকীহগণ বলেন ঃ এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে, যদি সাক্ষাৎকারী ব্যক্তি আগমনকারী কাফেলার নিকট স্বীয় এলাকায় স্বাভাবিক দর গোপন না করে (তবে মাকরূহ হবে না)। কিন্তু যদি বাজার দর গোপন করে, তবে স্থানীয় লোকদের ক্ষতি হোক বা না হোক; উভয় অবস্থাতেই তা মাকরূহ হবে। কেননা সে তাদের সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করেছে।

গুদামজাত করণের বিষয়টিকে খাদ্যদ্রব্য যেমন গম, যব, ভূমি, শুকনা বা নরম খাদ্য এর সাথে খাস করা, এটি ইমাম আবু হানীফা (র) এর অভিমত। পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন ঃ সর্বসাধারণের ক্ষতি হয় এমন যে কোন জিনিস গুদামজাত করাই ইহ্তিকারের মধ্যে গণ্য। চাই তা স্বর্ণ হোক বা রৌপ্য হোক বা কাপড় হোক। ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন ঃ কাপড়ের মধ্যে ইহ্তিকার হয় না। ইমাম আবু ইউসুফ (র) প্রকৃত ক্ষতির কথা বিবেচনা করেছেন। কেননা এটিই মাকরূহ হওয়ার কার্যকর কারণ। আর ইমাম আবু হানীফা (র) ঐ ক্ষতির বিষয়টি বিবেচনা করেছেন, যা সর্বজন বিদিত। স্বল্পকালের জন্য গুদামজাত করণে তেমন ক্ষতি হয় না বিধায় একে ইহ্তিকার হিসাবে গণ্য করা হয় না। কিন্তু দীর্ঘ সময়ের জন্য গুদামজাত করা হলে, এতে যেহেতু ক্ষতি হয়, তাই এটি ইহ্তিকার হিসাবে গণ্য হবে, যা মাকরূহ। কারো কারো মতে এ দীর্ঘ মেয়াদ হলো চল্লিশ দিন।

কেননা নবী করীম (স) ইরশাদ করেছেন ঃ

مَنْ اِحْتَكَرَ طَعَامًا اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً فَقَدْ بَرِئَ مِنَ اللّٰهِ وَبَرِئَ اللّٰهُ مِنْهُ ·

কেউ যদি চল্লিশদিন পর্যন্ত খাদ্যদ্রব্য গুদামজাত করে রাখে, তবে আল্লাহর সাথে তার কোন সম্পর্ক থাকে না। এবং তার সাথেও আল্লাহর কোন সম্পর্ক থাকে না।

কেউ কেউ বলেন ঃ দীর্ঘ মেয়াদ হলো এক মাস। কেননা এর চেয়ে কম সময় স্বল্প সময়ের মধ্যে গণ্য। আর এক মাস ও এক মাসের অধিক সময় দীর্ঘ সময় হিসাবে গণ্য। এ কথা একাধিক স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, গুদামজাত করণের দ্বারা মূল্য বৃদ্ধির অপেক্ষা করা এবং দুর্ভিক্ষের অপেক্ষা করাতে গুনাহের মধ্যে তারতম্য হবে। নাউযুবিল্লাহ। কোন কোন ফকীহ বলেন ঃ দুনিয়াতে শাস্তি বিধানের ক্ষেত্রে এ মেয়াদের কথা প্রযোজ্য হবে।[১] আর গুনাহের বিষয়টি মেয়াদ কম হলেও তার উপর আপতিত হবে। মোদ্দা কথা হচ্ছে, কৃত্রিম মূল্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্য গুদাম জাত করে খাদ্য দ্রব্যের ব্যবসা করা প্রশংসনীয় এবং পসন্দনীয় কোন কাজ নয়। **ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ কেউ যদি নিজের জমির উৎপাদিত ফসল জমা করে রাখে অথবা অন্য শহর হতে আমদানী কৃত দ্রব্যাদি জমা করে রাখে, তবে এতে তাকে মুহ্তাকির (গুদামজাতকারী) বলা যাবে না।** প্রথমোক্ত অবস্থায় এ জন্য হবে না যে, এ মাল একান্তই তার নিজের হক তথা মালিকানাধীন জিনিস। এতে সর্বসাধারণের কোন হক নেই। এটা কি লক্ষণীয় নয় যে, এই ব্যক্তির অধিকার আছে তাতে ফসল না করার ? এমনিভাবে তার অধিকার আছে তার ফসল বিক্রি করারও। আর শেষোক্ত অবস্থায় মাকরূহ হওয়ার কথাটি বলেছেন ইমাম আবু হানীফা (র)। কেননা সর্ব সাধারণের অধিকার ঐ খাদ্য দ্রব্যের সাথে সংশ্লিষ্ট, যা শহরে জমা করা হয় এবং জমা করা হয় শহরতলীতে। ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন ঃ এ সবই মাকরূহ। কেননা যে হাদীসটি

১. অর্থাৎ এক মাস বা এক মাসের বেশী মালামাল গুদামজাত করে রাখলে সরকার ইচ্ছা করলে তার বিরুদ্ধে শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

আমরা বর্ণনা করেছি, তা ব্যাপক অর্থে বর্ণনা করা হয়েছে। ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন ঃ যেখান থেকে সাধারণত: ফসল শহরে আনা হয়, তা শহরতলীর মধ্যে গণ্য। সেখানেও ফসল গুদামজাত করা মাকরূহ। কেননা, এর সাথেও সর্বসাধারণের হকের সম্পর্ক রয়েছে। পক্ষান্তরে শহর যদি এমন দূরে হয় যে, সেখান থেকে সাধারণতঃ মালামাল আমদানী করা হয় না, তাহলে সেখানে গুদামজাত করা মাকরূহ হবে না। কেননা এ জাতীয় মালামালের সাথেও জনগণের হক সম্পর্কিত নয়।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য উচিত নয় মানুষের মালামালের মূল্য ধার্য করে দেওয়া।

কেননা নবী করীম (স) ইরশাদ করেন ঃ

لَاتُسَعِّرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ ٠

তোমরা বস্তুর মূল্য ধার্য করে দেবে না। কেননা আল্লাহ তা'আলাই মূল্য নিয়ন্ত্রণ করেন, তা হ্রাস করেন, বৃদ্ধি করেন এবং রিয্ক প্রদান করেন। আর এর যৌক্তিক কারণ হলো এই যে, মূল্য হচ্ছে বিক্রেতার হক। কাজেই এর পরিমাণ নির্ধারণও তার ইখতিয়ারে থাকবে। সুতরাং রাষ্ট্রপ্রধানের উচিত নয় তার অধিকারে হস্তক্ষেপ করা। কিন্তু যদি এর সাথে সর্বসাধারণের অসুবিধা দূরীকরণের সম্পর্ক থাকে, (তবে মূল্য সাব্যস্ত করে দেওয়া জাইয হবে)। আমরা পরে এ সম্পর্কে আলোচনা করবো।

গুদামজাত করণের বিষয়টি যদি বিচারকের আদালতে পেশ করা হয়, তবে বিচারক গুদামজাতকারী ব্যক্তিকে আদেশ দিবেন যেন সে তার এবং তার পরিবারের সঙ্গতি পরিমাণ খোরাকী রেখে উদ্বৃতাংশ বিক্রি করে দেয়। আর তাকে গুদামজাত করতে নিষেধ করে দেবেন, যদি দ্বিতীয়বার এ মুকাদ্দমা বিচারকের আদালতে উপস্থাপিত হয়, তাহলে বিচারক তাকে বন্দী করে রাখবেন। এরপর তাকে সতর্ক করার লক্ষ্যে এবং মানুষের কষ্ট দূর করার জন্য তাকে যে পরিমাণ শাস্তি সমীচীন মনে করেন, দেবেন। যদি খাদ্যের মালিকগণ স্বেচ্ছাচার হয় এবং সীমা লংঘন করে অধিক চড়া মূল্যে ফসল বিক্রি করে, এ অবস্থায় মূল্য নির্ধারণ করা ব্যতিরেকে বিচারক যদি মুসলমানদের অধিকার রক্ষা করতে অক্ষম হন, তাহলে বিশেষজ্ঞ ও জ্ঞানীজনদের পরামর্শক্রমে দ্রব্য মূল্য নির্ধারণ করে দেওয়াতে কোন দোষ নেই। মূল্য নির্ধারণের পর কেউ যদি এ ব্যাপারে সীমালংঘন করে এবং নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে অধিক মূল্যে মালামাল বিক্রি করে, তবে বিচারক তার বিক্রয় বহাল রাখবেন। এটাই আবু হানীফা (র) এর স্পষ্ট অভিমত। কেননা, তার মতে কোন আযাদ মানুষের উপর বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা জাইয নয়। সাহেবাইনও অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তবে তাদের মতে নির্দিষ্ট কওম বা গোত্রের উপর ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা জাইয আছে। খাদ্যদ্রব্য গুদামজাতকারী ব্যক্তিদের কেউ যদি রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে মালামাল বিক্রি করে, তবে তা সহীহ হবে। কেননা তাকে বিক্রয়ের ব্যাপারে বাধ্য করা হয়নি।

বিচারক গুদামজাতকারী ব্যক্তির সম্মতি ব্যতিরেকে তার মালামাল বা খাদ্যদ্রব্য বিক্রি করতে পারবেন কিনা? ফকীহদের কেউ কেউ বলেনঃ এ সম্বন্ধে ইমামগণের ঠিক তদ্রূপ মতভেদ রয়েছে, যেমন মতভেদ রয়েছে তাদের ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির মালামাল বিক্রি করা সম্পর্কে[১]। কেউ কেউ বলেনঃ বিক্রি করতে পারবেন। কেননা, সর্বসাধারণের অসুবিধা দূরীকরণার্থে কারো উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে বৈধ। এখানেও ঠিক তদ্রূপই হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেনঃ বিশৃংখলা চলাকালে অস্ত্র বিক্রি করা মাকরূহ।

অর্থাৎ যারা ফিতনা সৃষ্টিকারী তাদের কাছে। কেননা, এ কাজ অপরাধ প্রবণতার সহযোগিতা করার শামিল। এ সম্বন্ধে সিয়ার (জিহাদ) অধ্যায়ে আমরা বিস্তারিত বিবরণ পেশ করেছি। যদি ক্রেতা বিশৃংখলা সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত বলে পরিচিত না হয়, তবে তার কাছে অস্ত্র বিক্রি করাতে কোন দোষ নেই। কেননা, সম্ভাবনা আছে যে, এগুলো সে বিশৃংখলার কাজে, ফিতনার কাজে ব্যবহার করবে না, কাজেই সন্দেহের বশীভূত হয়ে একে মাকরূহ বলা যায় না।

ইমাম কুদূরী (র) বলেনঃ আঙ্গুরের রস এমন ব্যক্তির নিকট বিক্রি করাতে কোন দোষ নেই, যার সম্বন্ধে নিশ্চিত জানা আছে যে, সে এর দ্বারা মদ তৈরী করবে।

কেননা, হুবহু আঙ্গুরের রস দ্বারা গুনাহের কাজ হয় না, হয় পরিবর্তনের পর। ফিতনা চলাকালে অস্ত্র বিক্রি করার বিষয়টি এর থেকে ব্যতিক্রম। কেননা, হুবহু এই অস্ত্র দ্বারা অপরাধমূলক কাজ সংঘটিত হয়ে থাকে।

ইমাম মুহাম্মদ (র) 'জামে সগীর' গ্রন্থে বলেনঃ যদি কোন ব্যক্তি গ্রামে ঘর ভাড়া দেয় অগ্নি পূজকদের উপাসনালয় বানানোর জন্য, গীর্জা হিসাবে ব্যবহারের জন্য অথবা ইয়াহুদীদের ইবাদতখানা বানানোর জন্য অথবা মদ বিক্রি করার জন্য, তাহলে এতে কোন দোষ নেই।

এটি ইমাম আবু হানীফা (র) এর অভিমত। সাহেবাইনের মতে উপরোক্ত কোন কাজের জন্য ঘর ভাড়া দেওয়া জাইয নেই। কেননা, যে ভাড়া দিল, সে পাপের কাজে তাকে সাহায্য করলো।

ইমাম আবু হানীফা (র) এর দলীল হলোঃ ইজারা বা ভাড়া আবর্তিত হয় ঘরের লাভালাভের উপর। এ জন্যই শুধুমাত্র হস্তান্তরের কারণে ভাড়া ওয়াজিব হয়ে যায়। আর এই ইজারা প্রদানের মধ্যে কোন পাপ নেই। পাপ তো হলো ভাড়া গ্রহণকারী ব্যক্তির কাজের মধ্যে। আর এ ব্যাপারে সে হচ্ছে স্বাধীন। সুতরাং ভাড়াদাতার সাথে এ কাজের কোন সম্পর্ক নেই।

---

১. ফকীহগণের মতে ঋণগ্রস্ত গরীব ব্যক্তির সম্পদ বিক্রি করে ঋণ পরিশোধ করার অধিকার বিচারকের আছে কিনা, সে ব্যাপারে তাঁদের মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেনঃ ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে বিক্রি করতে পারবেন এবং সাহেবাইনের মতে পারবেন না। আবার কেউ কেউ বলেন, ইমামত্রয়ের সর্ববাদী সিদ্ধান্ত হলো বিচারক তা করতে পারবেন।

গ্রামের শর্ত আরোপ করার কারণ হলোঃ শহরে যেহেতু শা'আইরে ইসলাম তথা ইসলামের বিধি-বিধানসমূহ সমুজ্জ্বল থাকে; তাই এখানে ইয়াহুদীদের ইবাদতখানা ও গীর্জা তৈরী করা এবং মদ ও শূকর বিক্রির প্রদর্শনী করা সম্ভব নয়। কিন্তু গ্রামে এগুলো করা সম্ভব। এ কারণে গ্রামের কথা বলা হয়েছে। ফকীহগণের মতে এখানে কুফার গ্রামের কথা বলা হয়েছে। কেননা, সেখানকার অধিকাংশ নাগরিক হচ্ছে যিম্মী। কিন্তু আমাদের গ্রামসমূহে যেহেতু ইসলামের নিদর্শনসমূহ স্পষ্ট, তাই আমাদের গ্রামেও তারা এসব কিছু করতে পারবে না। এটিই বিশুদ্ধতম অভিমত।

ইমাম মুহাম্মদ (র) 'জামে সগীর' গ্রন্থে বলেনঃ কেউ যদি যিম্মী ব্যক্তির শরাব বহন করে, তবে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে তার জন্য এর বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জাইয হবে। পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেনঃ এ পারিশ্রমিক গ্রহণ করা তার জন্য মাকরূহ হবে। কেননা, এ কাজ গুনাহের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করার শামিল। সর্বোপরি সহীহ সনদে নবী করীম (সা) থেকে প্রমাণীত আছে যে, তিনি মদের কারণে দশ ব্যক্তির প্রতি লা'নত করেছেন। তাদের মধ্যে বহনকারী এবং যার কাছে বহন করে নেওয়া হয়েছে উভয়ে এতে শামিল।

ইমাম আবু হানীফা (র) -এর দলীল হলো ঃ শরাব পান করা হচ্ছে গুনাহের কাজ। আর পান করার কাজ হলো–পানকারীর, সে তার নিজের কর্মের ব্যাপারে স্বাধীন। পান করা বহন কাজের জন্য অপরিহার্য নয় এবং বহনকারীর ইচ্ছাও তা নয়। আর উপরে যে হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে তার ক্ষেত্র হলো, বহন করা,যা গুনাহের সংকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট।

ইমাম মুহাম্মদ (র) জামে সগীর গ্রন্থে বলেন ঃ মক্কা শরীফে অবস্থিত বাড়ী -ঘর ইমারত বিক্রি করাতে কোন দোষ নেই। কিন্তু মক্কা শরীফের ভূমি বিক্রি করা মাকরূহ। এটি ইমাম আবু হানীফা (র) -এর অভিমত। কিন্তু সাহেবাইন বলেন ঃ মক্কা শরীফের ভূমি বিক্রি করাতেও কোন দোষ নেই। এটিও ইমাম আবু হানীফা (র) -এর একটি বর্ণনা। কেননা, এ ভূমি তাদের মালিকানাভুক্ত সম্পত্তি। কারণ মালিকানার শরীয়তসম্মত বৈশিষ্ট্য তাতে স্পষ্টভাবে বিদ্যমান। কাজেই ভূমির বিষয়টিও ইমারতের অনুরূপ।

ইমাম আবু হানীফা (র) এর দলীল হলো ঃ নবী করীম (সা) এর বাণী ঃ

اَلَا اِنَّ مَكَّةَ حَرَامٌ لَاتُبَاعُ رِبَاعُهَا وَلَا تُوْرَثُ ‎.

সাবধান! জেনে রাখ, মক্কা হরম এলাকা হিসাবে স্বীকৃত। এখানকার ভূমি বিক্রি করা যাবে না এবং এতে উত্তরাধিকারও প্রতিষ্ঠিত হবে না।

অধিকন্তু মক্কার ভূমি হচ্ছে আযাদ ও সম্মানিত স্থান। কেননা, এ হচ্ছে কা'বার আঙ্গিনা। এ কারণেই এখানকার ভূমির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের বিষয়টি স্পষ্ট। ফলে এর শিকার প্রাণীকে তাড়ানো যায় না, এর কাঁচা ঘাস কাটা যায় না এবং কর্তন করা যায় না

এর কাঁটাদার বৃক্ষ। জমি বিক্রয়ের ক্ষেত্রেও উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে। ইমারতের বিষয়টি এর থেকে ব্যতিক্রম। কেননা, ইহা একান্তভাবে নির্মাতারই মালিকানাভুক্ত বিষয়।

উল্লেখ্য যে, মক্কা শরীফের ভূমি ভাড়া দেওয়া মাক্রূহ। যেমন রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ

مَنْ اٰجَرَ اَرْضَ مَكَّةَ فَكَاَنَّمَا اَكَلَ الرِّبٰوا ٠

–যে ব্যক্তি মক্কা শরীফের ভূমি ভাড়া দিল, সে যেন সুদ খেলো।

এছাড়া রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর যুগে মক্কা শরীফের জমিকে সায়িবা (যার উপর কারো আধিপত্য নেই) বলা হতো। যার প্রয়োজন হতো, সে সেখানে বসবাস করতো। আর যে এর থেকে মুখাপেক্ষীহীন, সে অন্যকে এখানে বসবাসের ব্যবস্থা করে দেবে।

যদি কেউ একটি দিরহাম (রৌপ্য মুদ্রা) কোন তরকারি বিক্রেতার নিকট এই উদ্দেশ্যে রাখে যে, সে তার নিকট হতে যা দরকার ইচ্ছামত তরকারী নিয়ে নেবে, তবে তার জন্য মাক্রূহ হবে। কেননা, সে তরকারী বিক্রেতাকে এমন ঋণের মাধ্যমে এ টাকার মালিক বানিয়েছে, যা মুনাফাকে টেনে আনছে। আর তা হচ্ছে সে তার নিকট থেকে যখন তখন যা ইচ্ছা গ্রহণ করবে। অথচ রাসুলুল্লাহ্ (সা)-এমন ঋণ দান করতে নিষেধ করেছেন, যা মুনাফাকে টেনে আনে। কাজেই সমীচীন হলো ঃ সে তার নিকট এ টাকা আমানত হিসাবে রাখবে। তারপর ধীরে ধীরে যা ইচ্ছা কিছু কিছু গ্রহণ করবে। কেননা, এ হচ্ছে আমানত, ঋণ নয়। তাই এ টাকা নষ্ট হয়ে গেলে গ্রহণকারীর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলাই সর্বাধিক জ্ঞাত।

পরিচ্ছেদ ঃ বিবিধ মাসাইল

ইমাম মুহাম্মদ (র) 'জামে সগীর' গ্রন্থে বর্ণনা করেন ঃ কুরআন মজীদের দশ দশ আয়াতের পর বিশেষ চিহ্ন লাগানো এবং নুকতা ব্যবহার করা মাক্রূহ।

কেননা, হযরত ইবৃন মাসউদ (রা) বলেছেন ঃ جَرِّدُوا الْقُرْاٰنَ - কুরআনকে খালী কর। অপর এক বর্ণনায় রয়েছে ঃ جَرِّدُوا الْمَصَاحِفَ -মহাগ্রন্থসমূহ খালী কর।

বস্তুত: দশদশ আয়াতের পর বিশেষ চিহ্ন ব্যবহার করা এবং নুকতা লাগানো খালী করার বিপরীত কাজ। অধিকন্তু দশদশ আয়াতের পর বিশেষ চিহ্ন লাগানো কুরআন মজীদের আয়াতসমূহ সংরক্ষণের জন্য ক্ষতিকারক কাজ। আর নকুতা লাগানো اِعْرَابْ হিফাযতের জন্য ক্ষতিকারক। কেননা, এরূপ অবস্থায় এগুলোর উপর নির্ভরশীলতা সৃষ্টি হয়ে যায়। কাজেই এ কাজ মাক্রূহ হিসাবে গণ্য হবে।

ফকীহগণ বলেন ঃ আমাদের যমানায় অনারব লোকদের জন্য اِعْرَابْ **বুঝাবার সংকেত প্রয়োজন।** اِعْرَابْ এর সংকেত বর্জন করলে কুরআনের হিফাযতে ত্রুটি আসবে

---২৫

এবং অনারব লোকেরা কুরআন তিলাওয়াত ছেড়ে দেবে। অতএব নুকতা ইত্যাদি ব্যবহার করা ভাল কাজ।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ কুরআন মজীদকে সুসজ্জিত করার মধ্যে কোন দোষ নেই। কেননা, এর দ্বারা কুরআন মজীদের প্রতি সম্মান প্রকাশ পায়। কুরআন মজীদকে সুসজ্জিত করার বিষয়টি মসজিদকে স্বর্ণ দ্বারা নকশা খচিত করা এবং সুসজ্জিত করার মতই। এ সম্পর্কে ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন ঃ যিম্মী লোকদের মসজিদে হারামে প্রবেশ করাতে কোন দোষ নেই। পক্ষান্তরে, ইমাম শাফিঈ (র) বলেন ঃ যিম্মীদের মসজিদে প্রবেশ করা মাক্‌রূহ। ইমাম মালিক (র) বলেন ঃ যে কোন মসজিদে যিম্মীদের প্রবেশ করা মাক্‌রূহ। ইমাম শাফিঈ (র) এর দলীল হলো আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ

اِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا ٠

–মুশরিকরা তো অপবিত্র! সুতরাং এ বছরের পর তারা যেন মসজিদুল হারামের নিকটে না আসে। (৯ঃ২৮)

অধিকন্তু কাফির লোকেরা সাধারণত: অপবিত্রই থাকে। এর থেকে খালী থাকে না। কারণ তারা এমনভাবে গোসল করে না, যদ্দারা তারা অপবিত্রতা হতে মুক্ত হতে পারে। আর অপবিত্র মানুষ মসজিদে প্রবেশ করলে মসজিদও অপবিত্র হয়ে যাবে।

উল্লেখ্য যে, ইমাম মালিক (র)-ও উক্ত আয়াতকে দলীল হিসাবে পেশ করেন। আর নাপাকীর কারণটি যেহেতু ব্যাপক; কাজেই দুনিয়াতে যত মসজিদ আছে, সবই এর অন্তর্ভুক্ত হবে।

আমাদের দলীল হলো ঃ নবী করীম (সা) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি সকীফ বংশের প্রতিনিধি দলকে মসজিদে নববীতে স্থান দিয়েছিলেন। অথচ তখনও তারা ছিল কাফির। অধিকন্তু তাদের অপবিত্রতা তাদের আকীদা বিশ্বাসের মধ্যে। কাজেই তাদের মসজিদে প্রবেশ করাতে মসজিদ অপবিত্র হওয়ার কোন কারণ নেই। স্মর্তব্য যে, উপরোক্ত আয়াত প্রভাব-প্রতিপত্তিসহ মুশরিকদের মসজিদে হাযির হওয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। অথবা উলঙ্গ অবস্থায় তওয়াফ করার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। যেমন জাহিলী যুগে তাদের অভ্যাস ছিল। (স্বাভাবিক প্রবেশের সাথে এ আয়াতের কোন সম্পর্ক নেই।)

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ খাসী লোকদের থেকে খিদমত গ্রহণ করা মাক্‌রূহ। কেননা, তাদের থেকে খিদমত নেওয়ার আগ্রহের মধ্যে এ কাজে মানুষকে উৎসাহিত করা হয়। অথচ এ কাজ মুসলা (مُثْلَة) তথা আল্লাহ্‌র সৃষ্টিতে বিকৃতি সাধন করার মধ্যে গণ্য, যা হারাম।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ চতুষ্পদ জন্তুকে খাসী করানো এবং ঘোড়ার সাথে গাধার প্রজনন কর্ম করানোর মধ্যে কোন দোষ নেই। কেননা, প্রথমোক্ত কাজে চতুষ্পদ জন্তুর এবং মানুষের সকলেরই উপকার নিহিত আছে।[১]

আর সহীহ সনদে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সা) খচ্চরের উপর আরোহণ করেছিলেন। যদি উক্ত কাজ (ঘোড়ার সাথে গাধার সঙ্গমের ব্যবস্থা, যার ফলে খচ্চরের জন্ম) নিষিদ্ধ হতো, তাহলে রাসূলুল্লাহ (সা) এর উপর আরোহণ করতেন না। কেননা, এই আরোহণ দ্বারা উক্ত কাজের দ্বার উন্মুক্ত করা হয়।

ইমাম মুহাম্মদ (র) 'জামে সগীর' গ্রন্থে বলেন ঃ ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের শুশ্রূষা করাতে কোন দোষ নেই। কেননা, এটি তাদের ক্ষেত্রে একপ্রকারের সদাচার। আর সদাচার করতে আমাদেরকে নিষেধ করা হয়নি। সহীহ সনদে নবী করীম (সা) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সা) জনৈক ইয়াহুদী রোগগ্রস্ত প্রতিবেশীর পরিচর্যায় গিয়েছিলেন।

ইমাম মুহাম্মদ (র) 'জামে সগীর' গ্রন্থে বলেন ঃ দু'আর মধ্যে ঃ أَسْئَلُكَ بِمَقْعَدِ الْعِزِّ مِنْ عَرْشِكَ **—হে আল্লাহ্! আমি আপনার আরশের গদীর ইয্যতের দোহাই দিয়ে প্রার্থনা করছি—এরূপ বলা মাক্রূহ।** এখানে দুটি বিষয় রয়েছে। (১) একটি হলো ঃ اَلْعِزُّ مِنْ عَرْشِكَ -(তোমার ইয্যতের দোহাই)

(২) আর দ্বিতীয় হলো ঃ مَقْعَدُ (সম্মানের আসন) দ্বিতীয়টি মাক্রূহ হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। কেননা, مَقْعَدُ বা আসন শব্দটি قُعُوْدُ বা উপবেশন করা- ধাতু হতে নির্গত হয়েছে।[২]

অনুরূপভাবে প্রথমটিও মাক্রূহ। কেননা, এর দ্বারা বুঝায় যে, আল্লাহ্র সম্মান আরশের সাথে সম্পৃক্ত। অথচ আরশ হচ্ছে সৃষ্ট ও ক্ষণস্থায়ী বস্তু। আর আল্লাহ হলেন, তার সমস্ত গুণাবলীসহ চিরস্থায়ী ও চিরন্তন।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) হতে বর্ণিত আছে যে, এতে কোন দোষ নেই। ফকীহ আবুল লায়স সমরকান্দী (র)-ও এ মতটি গ্রহণ করেছেন। কেননা, এ দুআ রাসূলুল্লাহ্ (সা) হতে বর্ণিত হয়েছে। উল্লেখ রয়েছে যে, তার দু'আটি ছিল নিম্নরূপ ঃ

اَللّٰهُمَّ اَسْئَلُكَ بِمَقْعَدِ الْعِزِّ مِنْ عَرْشِكَ وَمُنْتَهَى الرَّحْمَةِ مِنْ كِتَابِكَ وَبِاسْمِكَ الْاَعْظَمِ وَجَدِّكَ الْاَعْلٰى وَكَلِمَاتِكَ التَّامَّةِ .

---

১. খাসী করা হলে জন্তু মোটা-তাজা হয়-এবং গোশত সুস্বাদু হয়ে থাকে।

২. আর উপবেশনের জন্য আসন এবং দেহ আবশ্যক। অথচ আল্লাহর জাত শরীরী তথা দেহ বিশিষ্ট হওয়া এবং কোন স্থানে আবদ্ধ হওয়া থেকে উর্ধ্বে।

"হে আল্লাহ ! আমি তোমার আরশের সম্মানিত আসন, তোমার কিতাবের চূড়ান্ত রহমত, তোমার মহান নাম, তোমার শ্রেষ্ঠ মহত্বের এবং তোমার পূর্ণাঙ্গ বাণীর অসীলা দিয়ে তোমার নিকট প্রার্থনা করছি।"

উপরোক্ত দু'আ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য হলো ঃ এটি খবরে ওয়াহিদ (خَبَرُ وَاحِدْ) দ্বারা প্রমাণিত। কাজেই এ ধরনের দু'আ হতে বিরত থাকার মধ্যে সাবধানতা রয়েছে। দু'আর মধ্যে ঃ بِحَقِّ فُلَانٍ وَرُسُلِكَ - بِحَقِّ اَنْبِيَائِكَ বলা মাকরূহ। কেননা, খালিক তথা স্রষ্টার উপর মাখলুক তথা সৃষ্টির কোন হক নেই।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেনঃ দাবা,নরদ, চৌদ্দ তাসের খেলা এবং সকল প্রকার খেলা মাকরূহ। কেননা, কেউ যদি এর দ্বারা জুয়া খেলে, তাহলে জুয়া তো কুরআন মজীদের আয়াত দ্বারাই হারাম প্রমাণিত। আর সর্বপ্রকার জুয়াকেই مَيْسِرْ (মায়সির) বলা হয়। আর কেউ যদি এ সবের দ্বারা জুয়া না খেলে, তবে এটি একটি অহেতুক ও অনর্থক কাজ হিসাবে গণ্য হবে। আরো গণ্য হবে ক্রীড়া-কৌতুক হিসাবে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইরশাদ করেন ঃ

لَهْوُ الْمُؤْمِنِ بَاطِلٌ اِلاَّ الثَّلْثُ تَادِيْبُهُ لِفَرَسِهِ وَمُنَاضَلَتُهُ عَنْ قَوْسِهِ وَمُلَاعَبَتُهُ مَعَ اَهْلِهِ ·

মুমিনের খেলাধূলা সবই বাতিল বলে গণ্য হবে। অবশ্য তিন প্রকারের খেলা বৈধ আছে। নিজ অশ্বকে প্রশিক্ষণ প্রদান, ধনুক হতে তীর নিক্ষেপ করা এবং স্বীয় স্ত্রীর সাথে খেল-তামাশা করা।

কোন কোন ফকীহ্ বলেন ঃ দাবা খেলা জাইয। কেননা, এতে বুদ্ধির প্রখরতা বৃদ্ধি পায় এবং মেধা তীক্ষ্ণ হয়। এ অভিমতটি ইমাম শাফিঈ (র) হতেও বর্ণিত আছে।

আমাদের দলীল হলো– নবী করীম (সা)-এর বাণী ঃ

مَنْ لَعِبَ بِالشَّطْرَنْجِ وَالنَّرْدَشِيْرِ فَكَاَنَّمَا غَمَسَ يَدَهُ فِىْ دَمِ الْخِنْزِيْرِ ·

যে ব্যক্তি দাবা ও নরদশীর খেললো, সে যেন তার হাত শূকরের রক্তের মধ্যে ডুবিয়ে দিল।

বস্তুত: এ হচ্ছে এমন এক প্রকারের খেলা, যা-মানুষকে আল্লাহ্র যিক্র,দীনি মাহফিল এবং জামা'আত থেকে নিবৃত্ত রাখে। কাজেই তা হারাম হিসাবে গণ্য হবে। কেননা, নবী করীম (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ

مَا اَلْهَاكَ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ فَهُوَ مَيْسِرٌ ·

যে জিনিস তোমাকে আল্লাহ্র যিক্র হতে উদাসীন করে দেয়, তাই হচ্ছে জুয়া। আর যদি এ সব খেলা দ্বারা জুয়া উদ্দেশ্য হয়, তবে খেলোয়াড়ের আদালত (বিশ্বস্ততা ও

ন্যায়পরায়ণতা) রহিত হয়ে যাবে। আর যদি জুয়া উদ্দেশ্য না হয়, তবে আদালত রহিত হবে না। কেননা, সে তো এ ক্ষেত্রে তাবীলের আশ্রয় গ্রহণ করেছে।

ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র) এর মতে এ জাতীয় খেলোয়াড়কে সালাম করা মাক্রূহ, এ বিষয়ে তাদেরকে সতর্ককরণের লক্ষ্যে। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানীফা (র) তাদেরকে সালাম প্রদান করাতে কোন দোষ মনে করেন না, যদি এর দ্বারা তাদেরকে তাদের ঐ খেলা থেকে নিবৃত্ত করা উদ্দেশ্য থাকে।

ইমাম মুহাম্মদ (র) 'জামে সগীর' গ্রন্থে বলেন ঃ ব্যবসায়ী গোলামের হাদিয়া কবুল করা, তার দাওয়াতে সাড়া দেওয়া এবং তার সওয়ারী ধারে গ্রহণ করাতে কোন দোষ নেই। তবে তার কাপড় পরিধান করা এবং দিরহাম ও দীনার হাদিয়া স্বরূপ প্রদান করা মাকরূহ। এটি সূক্ষ্ম কিয়াসের কথা। কিয়াসের দৃষ্টিতে (গোলাম কর্তৃক) উপরোক্ত যাবতীয় কর্মকান্ডই বাতিল বলে গণ্য হবে। কেননা, এগুলো হলো নফল কাজ। আর গোলাম নফল কাজের উপযুক্ত নয়। সূক্ষ্ম কিয়াসে এসব কাজ বৈধ হওয়ার দলীল হলো ঃ নবী করীম (স) সালমান ফারসী (র) এর হাদিয়া গ্রহণ করেন, আর তখন তিনি গোলাম ছিলেন। এমনিভাবে তিনি মুকাতাবা দাসী হযরত বারীরা (রা) এর হাদিয়াও গ্রহণ করেছিলেন। অনুরূপভাবে একদল সাহাবী হযরত আবু উসায়দ (রা) এর গোলামের দাওয়াত কবুল করেছিলেন।

অধিকন্তু এগুলো এমন জরুরী জিনিস, যা ব্যবসায়ী ব্যক্তি না করে পারে না। আর যে ব্যক্তি কোন জিনিসের অধিকার লাভ করে, সে আনুষঙ্গিক জিনিসের ক্ষেত্রেও অধিকারপ্রাপ্ত হয়ে থাকে। কিন্তু দিরহাম হাদিয়া প্রদান করা ব্যবসায়ীর জন্য জরুরী নয়। সুতরাং তা কিয়াসের সূত্র হিসাবে অবৈধ থেকে যাবে। ইমাম মুহাম্মদ (র) 'জামে সগীর' গ্রন্থে বলেন ঃ যার হাতে লা-ওয়ারিস পিতৃ পরিচয়হীন সন্তান আছে, তার জন্য সে হিবা এবং সাদাকা গ্রহণ করতে পারবে। এ সম্পর্কে মূলনীতি হলো, না-বালক সন্তানের ব্যাপারে তিন ধরনের ক্ষমতা প্রয়োগ হতে পারে ঃ

(১) এক প্রাকার বিলায়েত বৈধ অভিভাবকত্ব সূত্রে, যা শুধু বৈধ ওলী যেমন পিতা, পিতামহ, ভাই ও চাচা পর্যায়ক্রমে ছাড়া অন্য কেউ করতে পারে না। যেমন বিবাহ করানো এবং যে মালামাল সংরক্ষণযোগ্য, তা বেচা-কেনা করা। কেননা ওলীই তার স্থলাভিষিক্ত; যেহেতু শরী'আত তাকে প্রতিনিধিত্ব দান করেছে।

(২) দ্বিতীয় প্রকার হলো ঃ নাবালক অবস্থায় শিশুর জন্য যা করা অপরিহার্য হয়, তা করা। যেমন নাবালকের পক্ষ হতে এমন ক্রয়-বিক্রয় করা, যা না করে কোন উপায় নেই। তেমনিভাবে তার দুধ পানের জন্য দাইয়ের ব্যবস্থা করা। এই কাজ জাইয এমন ব্যক্তির জন্য, যে তাকে লালন-পালন করবে এবং যার উপর তার ব্যয় নির্বাহের দায়িত্ব থাকবে। যেমন ভাই, চাচা ও মাতা এবং এমন ব্যক্তি, যে তাকে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনেছে। এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে, যদি বাচ্চা তাদের তত্ত্বাবধানে থাকে। উপরোক্ত

ব্যক্তিদের যেহেতু এ জাতীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করার অধিকার রয়েছে, তাই ওলীর জন্যও এ জাতীয় অধিকার থাকবে, তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। তবে ওলীর ক্ষেত্রে নাবালক সন্তান তাদের তত্ত্বাবধানে থাকা শর্ত নয়।

(৩) তৃতীয় প্রকার হলো ঃ যাতে শুধু লাভই রয়েছে। যেমন হিবা, সাদাকা ইত্যাদি গ্রহণ করে তা হস্তগতও করা। এ ধরনের ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী হবে ঐ ব্যক্তি, যে শিশুকে কুড়িয়ে এনেছে, ভাই, চাচা এবং শিশু নিজে যদি সে জ্ঞানসম্পন্ন হয়। শিশুর কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রেখে এ ধরনের ক্ষমতা প্রয়োগের দ্বার উন্মুক্ত রাখাই হিকমতের দাবী। কাজেই আকল ও বিবেকের ভিত্তিতে (নাবালক নিজে) অভিভাকত্বের দায়িত্ব পালনকারী এবং লালন-পালনের দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তি এ জাতীয় ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী হবে। এ মাসআলাটি মূলত: শিশুর জন্য খরচ করার মতই।

ইমাম মুহাম্মদ (র) 'জামে সগীর' গ্রন্থে বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন শিশুকে কুড়িয়ে পেয়েছে, তার জন্য জাইয নেই শিশুকে ইজারা প্রদান করা। তবে মায়ের জন্য জাইয আছে, নিজ সন্তানকে ইজারা দেওয়া, যদি সে তার তত্ত্বাবধানে থাকে। কিন্তু চাচার জন্য এরূপ করা জাইয নেই। কেননা পুত্রের লব্ধ সম্পদ মা নিজের খিদমতের জন্য খরচ করতে পারে। কিন্তু শিশুকে কুড়িয়ে আনা ব্যক্তি এবং চাচা তা করতে পারে না। নাবালক সন্তান যদি নিজেই নিজেকে ইজারা দেয়, তবে তা জাইয হবে না। কেননা, এটা ক্ষতির সাথে সংযুক্ত। কিন্তু নাবালক সন্তান যদি কাজ থেকে মুক্ত হয়ে যায়, তবে তা জাইয হবে। কেননা এতে তার কেবল লাভই হয়। অতএব এ অবস্থায় তার উপর নির্ধারিত মজুরী ওয়াজিব হবে। বস্তুত: এ বিষয়টি মালিকের পক্ষ হতে ব্যবসা বাণিজ্যের ব্যাপারে অনুমতি না পাওয়া গোলামের মাসআলার মতই, যে গোলাম নিজেকে অন্যের কাছে ইজারা দেয়। মাসআলাটি ইতিপূর্বে আমরা বিস্তারিত বর্ণনা করেছি। ইমাম মুহাম্মদ (র) 'জামে সগীর' গ্রন্থে বলেন ঃ ক্রীতদাসের গলায় গলাবদ্ধ লটকিয়ে দেওয়া মাক্রূহ। কিতাবে الرَّايَةُ বলা হয়েছে। কিন্তু কোন কোন সংস্করণে الرَّايَةُ এর স্থলে الدَّايَةُ উল্লেখ রয়েছে। এর অর্থ হলো ঃ লোহার শৃংখল, যার কারণে (শৃংখলাবদ্ধ ব্যক্তি) নিজের মাথা নাড়তে পারে না। যালিম লোকদের নিকটে এই নীতির প্রচলন রয়েছে। মাকরূহ হওয়ার কারণ হলো এটি হচ্ছে হাজান্নামীদের শাস্তি প্রদানের প্রক্রিয়া। কাজেই অগ্নিদগ্ধ করে শাস্তি দেওয়া যেমন মাকরূহ, অনুরূপভাবে গলায় গলাবদ্ধ লটকিয়ে দেওয়াও মাক্রূহ। কিন্তু পায়ে শৃংখল পরানো মাক্রূহ নয়। কেননা নির্বোধ ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদেরকে শৃংখলাবদ্ধ রাখার নিয়ম মুসলমানদের মধ্যে ছিল। সুতরাং পলায়ন হতে রক্ষা করা এবং নিজের মালের হিফাযত করার লক্ষ্যে গোলামের পায়ে শৃংখল পরিয়ে দেওয়া মাক্রূহ হবে না।

ইমাম মুহাম্মদ (র) 'জামে সগীর' গ্রন্থে বলেন ঃ হুক্না তথা গুহ্যদ্বার দিয়ে পিচকারী দেওয়াতে কোন দোষ নেই; যদি এর দ্বারা চিকিৎসা উদ্দেশ্য হয়। কেননা,

চিকিৎসা **সর্বসম্মতিক্রমে** মুবাহ বা জাইয। অধিকন্তু চিকিৎসার বৈধতার ব্যাপারে হাদীসও বর্ণিত রয়েছে। এ ক্ষেত্রে পুরুষ ও মহিলার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তবে চিকিৎসার ক্ষেত্রে হারাম জিনিস ব্যবহার না করা সমীচীন, যেমন মদ ইত্যাদি। কেননা হারাম বস্তু দ্বারা রোগ মুক্তির চেষ্টা করা হারাম।

ইমাম মুহাম্মদ (র) 'জামে সগীর' গ্রন্থে বলেন ঃ বিচারকের জন্য রিয্ক বা ভাতা নির্ধারণ করাতে কোন দোষ নেই। কেননা নবী করীম (স) হযরত আত্তাব ইব্ন উসায়দ (র) কে মক্কা প্রেরণ করে তার জন্য ভাতা নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। এমনিভাবে তিনি হযরত আলী (রা)-কে ইয়ামান পাঠিয়ে তার জন্যও ভাতা নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন।

এই ক্ষেত্রে যুক্তি হলো বিচারক মুসলমানদের অধিকার সংরক্ষণের কাজে ব্যাপৃত থাকে। কাজেই তাদের মাল থেকেই তার ব্যয় নির্বাহ করতে হবে। তাদের মাল বা সম্পদ হলো বায়তুল মাল বা রাষ্ট্রীয় কোষাগারের সম্পদ। উল্লেখ্য যে, এটি এই কারণে যে, حَبْس (বন্দী বা ব্যাপৃত থাকা) এমন বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত, যা ব্যয় নির্বাহের কারণ হিসাবে গণ্য। যেমন অসীয়তপ্রাপ্ত ব্যক্তির খোরপোষ দিতে হয় এবং মুযারিব (অংশীদার ব্যবসায়ী) ব্যক্তি যখন মুযারাবার মাল নিয়ে ব্যবসার উদ্দেশে বিদেশ সফরে যায়, তখন তাকে এ মাল থেকে খোরপোষ দিতে হয়। আর এই ভাতা হবে শুধু প্রয়োজন পরিমাণ। যদি ভাতার শর্ত করা হয়, তবে তা হারাম হয়ে যাবে। কেননা তখন তা নেক কাজের উপর পারিশ্রমিক গ্রহণ করার অন্তর্ভুক্ত হবে। কেননা বিচার কার্য নেক আমল হিসাবে গণ্য, বরং তা উত্তম আমল। সর্বোপরি বিচারক যদি গরীব হন তবে তার জন্য উত্তম বরং ওয়াজিব হচ্ছে ভাতা গ্রহণ করা। কেননা ভাতা গ্রহণ ছাড়া তার পক্ষে বিচার কার্যের দায়িত্ব পালন সম্ভব নয়। কারণ জীবিকা অন্বেষণে তার ব্যস্ততা তাকে দায়িত্ব পালনে অক্ষম করে দেবে। আর যদি তিনি ধনী হন, তবে কোন কোন ফকীহ এর মতে উত্তম হলো ঃ বায়তুল মালের প্রবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তার ভাতা গ্রহণ না করা। কেউ কেউ বলেন ঃ বিচার কার্যকে তুচ্ছতা হতে রক্ষা করার লক্ষ্যে এবং পরবর্তী সময়ে অর্থাভাবী কাউকে উক্ত পদে নিয়োগ দানের পথ খোলা রাখার উদ্দেশ্যে, তার জন্য উত্তম হলো ভাতা গ্রহণ করা। আর এটিই বিশুদ্ধতম অভিমত। কেননা ভাতা প্রথা কিছু দিন বন্ধ থাকলে, তা আবার পুনঃবহাল করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। ভাতাকে রিয্ক বলা হয়েছে, এর থেকে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, ভাতা প্রয়োজন পরিমাণে হবে।

ভাতা বছরের শুরুতে দিয়ে দেওয়ার প্রথা চালু রয়েছে। কেননা খারাজ বা কর বছরের শুরুতেই গ্রহণ করা হয়ে থাকে। আর ভাতা প্রদান করা হয় এই খারাজের টাকা থেকেই। আমাদের বর্তমান যুগে কর উসূল করা হয় বছরের শেষে এবং যা উসূল করা হয়, তাও বিগত বছরের কর (চলতি বছরের নয়।) এটাই সহীহ অভিমত। যদি

বিচারক এক বছরের ভাতা বছরের শুরুতেই নিয়ে নেন এবং বছর শেষ না হওয়ার আগেই তাকে এ পদ থেকে অপসারণ করা হয়, তবে এ অবস্থায় তাকে ভাতা ফেরৎ দিতে হবে কিনা, এ বিষয়ে মতভেদ আছে, যেমন মতভেদ আছে মহিলার খোর-পোষের ব্যাপারে। যদি সে অগ্রিম এক বছরের খোর-পোষ নিয়ে বছরের মাঝখানে মারা যায়, বিশুদ্ধতম মতানুসারে ফেরৎ দেওয়া ওয়াজিব।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন ঃ মাহ্‌রাম ব্যক্তি ব্যতীত ক্রীতদাসী এবং উম্মে ওয়ালাদের সফরে যাওয়াতে কোন দোষ নেই। কেননা ক্রীতদাসীদের জন্য পর পুরুষ মাহ্‌রাম আত্মীদের মতই নযর ও স্পর্শ করার ক্ষেত্রে, যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। উম্মে ওয়ালাদও ক্রতিদাসীর মতই, যেহেতু তার মধ্যে মনীবের মালিকানা আছে। যদিও তাকে বিক্রয় করা নিষিদ্ধ। সঠিক বিষয় সম্বন্ধে আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

كِتَابُ اِحْيَاءِ الْمَوَاتِ
অধ্যায় ঃ অনাবাদ জমি আবাদ করা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ اِحْيَاءِ الْمَوَاتِ

অধ্যায় ঃ পতিত ও অনাবাদ জমি আবাদ করা

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ مَوَاتٌ বা পতিত ভূমি এমন ভূমিকে বলা হয়, যা দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় না, পানির সরবরাহ থেকে স্থানটি বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে কিংবা জলমগ্ন হওয়ার কারণে অথবা চাষাবাদে বিঘ্ন সৃষ্টি করে এ জাতীয় কোন কারণে। এ ধরনের জমি থেকে যেহেতু উপকৃত হওয়া যায় না, এ কারণে এ জাতীয় ভূমিকে مَوَاتٌ বা মৃত ভূমি বলা হয়।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ যে ভূমি পূর্ব হতে অনাবাদ —যার নির্দিষ্ট কোন মালিক নেই; অথবা দারুল ইসলামে এর মালিক তো আছে বটে, কিন্তু মালিক কে, তা সুনির্দিষ্টভাবে জানা নেই, আর তা গ্রাম থেকে এত বেশী দূরে যে, কোন ব্যক্তি যদি আবাদীর শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে, তবে সে স্থান থেকে ঐ আওয়াজ শুনা যায় না, তাহলে এ জাতীয় ভূমিও পতিত ভূমি হিসাবে গণ্য হবে।

হিদায়া গ্রন্থকার শায়খ বুরহানউদ্দীন (র) বলেন ঃ ইমাম কুদূরী (র) মাসআলাটি এভাবেই বর্ণনা করেছেন। কিতাবে উল্লেখিত "عَادِى"-শব্দের মর্ম হলো ঃ তা এমন ভূমি, যা পূর্ব হতেই অনাবাদ ও পতিত।

ইমাম মুহাম্মদ (র) হতে বর্ণিত আছে যে, ভূমি পতিত হওয়ার জন্য শর্ত হলো ঃ ঐ ভূমি উপকারযোগ্য না হওয়ার সাথে সাথে তা কোন মুসলিম বা যিম্মী ব্যক্তির মালিকানাধীন না হওয়া। তাহলে তা পুরাপুরিভাবে মৃত ভূখণ্ড-হিসাবে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে যে ভূমি কোন মুসলিম বা যিম্মী ব্যক্তির মালিকানাধীন, তা পতিত ভূমি হিসাবে গণ্য হবে না। এ জাতীয় ভূমির যদি সুনির্দিষ্ট মালিক জানা না থাকে, তবে তা মুসলিম জনসাধারণের ভূমি হিসাবে গণ্য হবে। এ অবস্থায় যদি উক্ত ভূমির কোন মালিক আছে বলে প্রকাশ পায়, তবে তা মালিকের নিকট ফেরৎ দিয়ে দিতে হবে এবং চাষাবাদের কারণে ভূমির যে ক্ষতি হয়েছে, চাষীর উপর এর ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে।

গ্রাম হতে দূরে হওয়ার যে কথা ইমাম কুদূরী (র) উল্লেখ করেছেন, তা মূলত: ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর আরোপিত শর্ত। কেননা, যে ভূমি জনপদের নিকটে অবস্থিত, তা থেকে সাধারণত: জনপদবাসী সর্বদাই উপকৃত হয়ে থাকে। তাদের উপকৃত হওয়া কখনো বন্ধ হয় না। কাজেই নিকটে হওয়া না হওয়ার উপরই হুকুমটি নির্ভরশীল হবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র) প্রকৃতভাবেই ঐ ভূমি থেকে গ্রামবাসী লোকদের উপকৃত না হতে পারার বিষয়টি বিবেচনা করে থাকেন। যদিও ভূমিটি জনপদ থেকে একেবারেই নিকটবর্তী হয় না কেন। ইমাম খাহারযাদা (র) অনুরূপ উল্লেখ করেছেন। আর ইমাম শামসুল আইম্মা সারাখ্সী (র) ও ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর পসন্দনীয় অভিমতটির উপর নির্ভর করেছেন।

আর শাসনকর্তার অনুমতি সাপেক্ষে যে ব্যক্তি পতিত ভূমি আবাদ করবে, সেই এর মালিক বলে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে কেউ যদি রাষ্ট্র প্রধানের অনুমতি ব্যতিরেকে পতিতভূমি আবাদ করে, তবে সে এর মালিক হবে না। এটি ইমাম আবু হানীফা (র) এর অভিমত। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন ঃ এ অবস্থায় সে এর বৈধ মালিক বলে গণ্য হবে। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ

مَنْ اَحْيٰى اَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ ٠

যে ব্যক্তি পতিত ভূমি আবাদ করবে, সেই এর মালিক বলে গণ্য হবে।

এ সম্বন্ধে যৌক্তিক দলীল হলো এই যে, এটি হচ্ছে মুবাহ সম্পদ, যার ব্যাপারে সে অগ্রগামী হয়েছে। কাজেই সে-ই এর মালিক বলে গণ্য হবে। যেমন লাকড়ি এবং শিকার পশুর ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। আর ইমাম আবু হানীফা (র) এর দলীল হলো ঃ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বাণী ঃ তিনি ইরশাদ করেছেন,

لَيْسَ لِلْمَرْءِ اِلاَّ مَاطَابَتْ بِهِ نَفْسُ اِمَامِهِ ٠

–রাষ্ট্রপ্রধান স্বতঃস্ফূর্তভাবে যা কাউকে প্রদান করেন, ব্যক্তি তারই অধিকারী (মালিক) হয়ে থাকে।

আর সাহেবায়ন যে হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন, এতে সম্ভাবনা রয়েছে যে, এতে হয়তো নবী করীম (সা) কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য অনুমতি প্রদান করেছেন। তিনি শরী'আতের কোন বিধানকে সাব্যস্ত করার জন্য এ কথা বলেননি।[১] অধিকন্তু এ ভূমি হলো গনীমতের মালতুল্য। কেননা, এ ভূমি মুসলমানদের হাতে পৌঁছেছে অশ্বে এবং উষ্ট্রে আরোহণ করে যুদ্ধ করার মাধ্যমে। কাজেই শাসনকর্তার অনুমতি ছাড়া কারো পক্ষেই এ ভূমি নিজের জন্য খাস করে নেওয়ার অধিকার নেই। যেমন অন্যান্য গনীমতের মালের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

---

১. অর্থাৎ এটি কোন মূলনীতি নয়, বরং এতে হয়তো তিনি পতিত ভূমি আবাদ করার জন্য বিশেষ কোন সম্প্রদায়কে উৎসাহিত করার জন্য একথা বলেছেন। কাজেই উক্ত হাদীস শরী'আতের মূলনীতি হিসাবে গ্রহণযোগ্য হবে না। অবশ্য যদি সে ভূমিতে খারাজী পানি সিঞ্চন করা হয়, তবে এর উপর খারাজই ওয়াজিব হবে। কেননা সিঞ্চিত পানির উপর ভিত্তি করে এ অবস্থায় খারাজ বা খাজনাকে বাকী রাখা হয় (খারাজ ধার্য করা হয় না।)

উল্লেখ্য যে, এ জাতীয় ভূমির উপর 'উশর ওয়াজিব হবে। কেননা মুসলমানদের উপর প্রথমেই খারাজ ধার্য করা জায়েয নয়।

পতিত ভূমি আবাদ করার পর যদি আবাদকারী ব্যক্তি তা এমনিই ফেলে রাখে, আর অপর কোন ব্যক্তি তাতে চাষাবাদ করে তাহলে কোন কোন ফকীহ বলেন ঃ এ অবস্থায় দ্বিতীয় ব্যক্তিই এই ভূমির অধিক হকদার বলে গণ্য হবে। কেননা প্রথম আবাদকারী ব্যক্তি এর উৎপাদিত ফসলের মালিক হয়েছে, মূল ভূমির মালিক হয়নি। কাজেই সে যদি ভূমিটি আবাদ না করে ফেলে রাখে, তবে দ্বিতীয় ব্যক্তিই এর অধিক হকদার বলে গণ্য হবে। কিন্তু বিশুদ্ধতম অভিমত হলো এই যে, প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তির নিকট হতে এই ভূমি ছিনিয়ে নিতে পারবে। কেননা, হদীসের মর্মানুসারে এই ভূমি আবাদ করে সে-ই এর বৈধ মালিকরূপে গণ্য হয়েছে। কারণ হাদীসে উক্ত 'لَهُ' শব্দে اِضَافَتْ -لَامُ تَمْلِيْكْ - এর সাথে করা হয়েছে।[১] কাজেই তার এ মালিকানা ভূমি আবাদ না করে ফেলে রাখার কারণে নিঃশেষ হবে না।

কোন ব্যক্তি যদি মৃত (পতিত ভূমি) ভূ-খণ্ডকে আবাদ করে, তারপর চার ব্যক্তি পর্যায়ক্রমে এর চার কোণে আরো কিছু ভূমি আবাদ করে, তবে ইমাম মুহাম্মদ (র) এর মতে প্রথম আবাদকারী ব্যক্তির রাস্তা চতুর্থ জনের জমির উপর দিয়ে হবে। কেননা, এটিই রাস্তার জন্য সুনির্দিষ্ট হয়ে গেছে। আর এ ব্যক্তি (চতুর্থ জন) তার (প্রথমজনের) হককে বাতিল করার ইচ্ছা পোষণ করছে। (কাজেই তার এ অন্যায় ইচ্ছা গ্রহণযোগ্য হবে না।)

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ পতিত ভূমি আবাদ করার দ্বারা যিম্মী ব্যক্তিও এর মালিক হিসাবে গণ্য হবে, যেমন মুসলিম ব্যক্তি পতিত ভূমি আবাদ করার দ্বারা এর মালিক হয়ে থাকে। কেননা, আবাদ করাই মালিকানা হাসিলের কারণ। তবে ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে, মালিকানা লাভের জন্য প্রশাসকের অনুমতি হচ্ছে শর্ত। কাজেই এ (আবাদ করার) ক্ষেত্রে মুসলিম ও যিম্মী উভয়ই সমান হবে, যেমন অন্যান্য মালিকানা লাভের কারণসমূহের মধ্যে তারা সমান-সমান গণ্য হয়ে থাকে। এমনকি বিজয়ী হওয়ার ক্ষেত্রেও আমাদের মূলনীতি অনুসারে।[২]

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ (পতিত ভূমি আবাদ করার নিদর্শন হিসাবে) কেউ যদি ভূমিতে পাথর গেড়ে তা চিহ্নিত করে রাখে, কিন্তু তিন বছর পর্যন্ত ভূমি আবাদ না করে তা ফেলে রাখে, তবে প্রশাসক তার থেকে এ ভূমি ছিনিয়ে নিয়ে তা অন্য কাউকে দিয়ে দেবেন। কেননা, এ ভূমি প্রথম ব্যক্তিকে এজন্যই দেওয়া হয়েছিল, যেন সে তা আবাদ করে, এতে মুসলমানদের উপকার হতো। হয়তো তারা 'উশর প্রাপ্ত হতো অথবা খারাজ প্রাপ্ত হতো। যখন তা হাসিল হলো না, কাজেই রাষ্ট্রপ্রধান এ

---

১. এতে প্রতীয়মান হয় যে, আবাদকারী ব্যক্তিই এই ভূমির বৈধ মালিকরূপে গণ্য হবে।

২. অর্থাৎ মুসলিম সম্প্রদায় যদি কাফিরদের মালামাল তাদের উপর বিজয়ী হওয়ার পর ছিনিয়ে নেয়, তবে তারাই এ মালের বৈধ মালিকরূপে গণ্য হবে। আর যদি কাফিররা জয়যুক্ত হয়ে মুসলমানদের মালামাল ছিনিয়ে নেয়, তবে তারাও এ মালের মালিক বলে গণ্য হবে।

সম্পত্তি অন্য ব্যক্তিকে দিয়ে দেবেন, যাতে উদ্দেশ্য পরিপূর্ণভাবে হাসিল হয়। অধিকন্তু পাথর গেড়ে জমি চিহ্নিত করার নাম জমি আবাদ করা নয় যে, এ সূত্রে সে এ জমির মালিক হবে। কেননা মৃত ভূখণ্ডকে জীবিত করার অর্থ হলো,তা আবাদ করা। আর পাথর তো প্রোথিত করা হয় (পতিত ভূমি সম্পর্কে) লোকেদেরকে জ্ঞাত করার জন্য। এই জ্ঞাত করাকে এজন্যই তাহজীর (পাথর প্রোথিত করে চিহ্নিত করা) বলা হয়েছে। যেহেতু এ পাথর প্রোথিত করার দ্বারা আশেপাশের লোকদেরকে এ কথা জানিয়ে দেওয়া হয় যে, এটি পতিত ভূমি অথবা এর দ্বারা অবগত করা হয় যে, এটি পতিত ভূমি, যাতে অন্য কেউ তা আবাদ করার জন্য এগিয়ে না আসে। অতএব এ ভূমি মালিকানাহীন অবস্থায়ই রয়ে গেল, যেমনটি আগে ছিল। এটিই সহীহ্ অভিমত।[১]

গ্রন্থকার (র) 'তিন বছর ফেলে রাখার' শর্ত এজন্য আরোপ করেছেন যে, হযরত 'উমর (রা) বলেছেন, পাথর প্রোথিত করে জমি চিহ্নিতকারী ব্যক্তির (জমি অনাবাদী রাখলে) তিন বছর পর তাতে আর কোন অধিকার থাকবে না।

এ কথার একটি যৌক্তিক দিকও রয়েছে যে, জমি চিহ্নিত করার পর উক্ত ব্যক্তির এমন একটি সময়ের প্রয়োজন, যে সময়ের মধ্যে সে নিজ দেশে ফিরে যেতে পারে, এমন একটি সময়েরও প্রয়োজন, যে সময়ের মধ্যে সে জমি আবাদ করা সংক্রান্ত যাবতীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করতে সক্ষম হয়, এমনিভাবে এমন একটি সময়েরও প্রয়োজন, যে সময়ের মধ্যে সে ঐ চিহ্নিত ভূমির নিকট ফিরে আসতে পারে। এর জন্য আমরা তিন বছর সময় ধার্য করেছি। কেননা তিন বছরের কম সময়টি মূলত: এমন কতগুলো ঘন্টা, দিন এবং মাস-যা তার উল্লেখিত কর্মকাণ্ড সম্পাদনের জন্য যথেষ্ট নয়। বস্তুত: তিন বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর যদি সে না আসে, তাহলে এর দ্বারা সুস্পষ্টভাবে একথাই প্রতীয়মান হবে যে, উক্ত ব্যক্তি এই ভূমির দাবী ছেড়ে দিয়েছে। ফকীহগণ বলেন ঃ উপরে যা কিছু আলোচনা করা হয়েছে, তা হচ্ছে নৈতিকতার কথা। কিন্তু আইনের কথা হলো ঃ কেউ যদি উক্ত সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই ঐ জমিটি আবাদ করে, তবে সে-ই এর বৈধ মালিক বলে বিবেচিত হবে। কেননা, আবাদ করার কাজটি তার দ্বারাই সংঘটিত হয়েছে, প্রথম ব্যক্তির দ্বারা নয়। এ হিসাবে এটি একজনের মূল্য বলার পর অপরজনের মূল্য বলার ন্যায় হয়ে গেল। অথচ এভাবে দাম করা মাক্রূহ। তারপরও যদি এরূপ করা হয় তবে 'আকদ বা বেচা-কেনা জাইয হয়ে যাবে।

উল্লেখ্য যে, পাথর ছাড়া অন্য কিছুর দ্বারাও 'তাহ্জীর' হতে পারে। যেমন কেউ জমির চতুর্পার্শ্বে শুকনা ডাল গেড়ে দিল অথবা জমি পরিষ্কার করে এর মধ্যস্থিত কাঁটাদার বনলতা সব জ্বালিয়ে দিল, অথবা জমির মধ্যকার কাঁটার বন-তলা কেটে সাফ করে তা জমির চতুর্পার্শ্বে রেখে এর উপর মাটি দিয়ে দিল, কিন্তু বাঁধ তৈরীর কাজ সম্পন্ন করলো না লোকদেরকে তাতে অনুপ্রবেশ করা থেকে নিবৃত্ত করার লক্ষ্যে; অথবা

১. কাজেই শুধু পাথর প্রোথিত করার দ্বারা মালিকানা সাব্যস্ত হবে না। মালিকানা তখনই সাব্যস্ত হবে, যদি ভূমি আবাদ করা হয়।

জমিতে এক-দুই হাত পরিমাণ গর্ত করে কূয়া খনন করে দিল ইত্যাদি। শেষোক্ত পদ্ধতিটির ব্যাপারে হাদীসেরও নির্দেশনা রয়েছে।

যদি জমি চাষ করে তাতে পানি সিঞ্চন করা হয়, তবে ইমাম মুহাম্মদ (র) এর মতে এতেও জমি আবাদ হয়েছে বলে গণ্য হবে। আর যদি উক্ত কাজ দু'টির কোন একটি করা হয়, তবে এটি 'তাহ্জীর' বলে গণ্য হবে। এমনিভাবে যদি জমিতে নহর খনন করা হয়, কিন্তু পানি সিঞ্চন না করা হয়, তবে এটিও 'তাহ্জীর' বলে গণ্য হবে। আর যদি নহর খনন করার সাথে সাথে জমিতে পানিও সিঞ্চন করা হয়, তবে তা আবাদ করা বলে গণ্য হবে, উভয় কাজ একত্রে পাওয়া যাওয়ার কারণে। এমনিভাবে যদি জমির চারদিকে দেয়াল তৈরী করা হয় অথবা এমনভাবে বাঁধ তৈরী করা হয়, যাতে পানি থেকে হিফাযত হয়ে যায়, তবে এটিও আবাদ করা বলে বিবেচিত হবে। কেননা একাজ নির্মাণ কাজের অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপভাবে যদি জমিতে ফসল বপণ করা হয়, তবে তা-ও আবাদ করা বলে ধর্তব্য হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ জনপদের নিকটবর্তী জমি আবাদ করা জাইয নেই; বরং এ জাতীয় জমি গ্রামবাসীদের চারণভূমি এবং কর্তিত ফসল উঠানোর মাঠ হিসাবে রেখে দেওয়া হবে। কেননা, গ্রামবাসীদের এ জাতীয় জিনিসের প্রকৃতভাবেই প্রয়োজন রয়েছে; অথবা প্রয়োজন হতে পারে বলে এতে দলীল বিদ্যমান রয়েছে, ঐ বর্ণনার ভিত্তিতে, যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। কাজেই এ জাতীয় ভূমি পতিত ভূমি হিসাবে গণ্য হবে না, যেমন রাস্তা ও নহর গণ্য হয় না। কেননা এর সাথে গ্রামবাসীদের হক সংশ্লিষ্ট রয়েছে। এ মূলনীতির উপর ভিত্তি করে ফকীহগণ বলেন ঃ প্রশাসকের জন্য এমন ভূমিখণ্ড কাউকে জায়গীর দেওয়া জাইয নয়, যা থেকে সাধারণ মুসলমানগণ মুখাপেক্ষীহীন নয় (অর্থাৎ যা সর্বসাধারণের সকলের জন্য আবশ্যকীয়) যেমন লবণের খনি বা এমন কূয়া, যা থেকে লোকেরা সকলেই পরিতৃপ্ত হয়। (অর্থাৎ নিজেরা পানি পান করে এবং গবাদি পশুকে পানি পান করায়)। এর কারণ আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ কেউ যদি মাঠের মধ্যে কূপ খনন করে, তবে এর হারীম[১]ও তার জন্য সংরক্ষিত থাকবে। এর অর্থ হলো, ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে কেউ যদি পতিত ভূমিতে শাসনকর্তার অনুমতি নিয়ে কূপ খনন করে অথবা সাহেবাইনের মতে কেউ যদি রাষ্ট্র প্রধানের অনুমতি নিয়ে বা অনুমতি ছাড়া কূপ খনন করে। কেননা, কূপ খনন করা আবাদ করা রূপে গণ্য।

১. হারীম হলো ঃ কূয়ার আশপাশের ঐ সব জায়গা, যা ছাড়া কূয়ার হক সংরক্ষণ করা যায় না এবং এর থেকে উপকারও হাসিল করা যায় না।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ যদি পশুকে পানি পান করানোর জন্য কূপ খনন করা হয়, তবে এর হারীম হবে চল্লিশ হাত। কেননা নবী করীম (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ

مَنْ حَفَرَ بِئْرًا فَلَهُ مِمَّا حَوْلَهَا اَرْبَعُوْنَ ذِرَاعًا عَطَنًا لِمَاشِيَتِهِ ‏.

অর্থাৎ কেউ যদি কূপ খনন করে, তবে এর আশে-পাশে সে চল্লিশ হাত পর্যন্ত প্রাপ্ত হবে তার গবাদি পশুকে বসানোর জন্য।

এরপর ফকীহদের কেউ কেউ বলেছেন ঃ চতুর্দিক থেকে সে সর্বসাকুল্যে চল্লিশ হাত প্রাপ্ত হবে। কিন্তু সহীহ অভিমত অনুসারে প্রত্যেক দিক থেকেই সে চল্লিশ হাত করে প্রাপ্ত হবে, (সর্বসাকুল্যে চল্লিশ হাত নয়।) কেননা, জমি হচ্ছে নরম, এ অবস্থায় যদি চল্লিশ হাতের কমের মধ্যে কূপ খনন করা হয় তবে পানি সেদিকেই চলে যাবে। আর যদি জমিতে পানি সিঞ্চন করার জন্য কূপ খনন করা হয়, তবে এ কুয়ার হারীম হবে ষাট হাত। এটি সাহেবাইনের অভিমত। আর ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে এ অবস্থায়ও এর হারীম হবে চল্লিশ হাত।

সাহেবায়নের দলীল হলো নবী করীম (সা) এর হাদীস ঃ

حَرِيْمُ الْعَيْنِ خَمْسُ مِائَةِ ذِرَاعٍ وَحَرِيْمُ بِئْرِ الْعَطَنِ اَرْبَعُوْنَ ذِرَاعًا وَحَرِيْمُ بِئْرِ النَّاضِحِ سِتُّوْنَ ذِرَاعًا ‏.

অর্থাৎ ঝর্ণা ও প্রস্রবণের হারীম হবে পাঁচশত হাত, গবাদি পশুর পানি পান করানোর কুয়ার হারীম হবে চল্লিশ হাত, আর পানি সিঞ্চন করার কুয়ার হারীম হবে ষাট হাত।

অধিকন্তু পানি সিঞ্চন করার জন্য কখনো পশু চালনা করার প্রয়োজন হয় এবং অনেক সময় এগুলোর রশি লম্বাও হয়ে থাকে।[১] আর পশুকে পানি পান করানোর কুয়া থেকে হাত দ্বারাই পানি উঠানো হয়। এখানে বেশী জায়গার প্রয়োজন হয় না। কাজেই উভয় কুয়ার হারীমের মধ্যে ব্যবধান থাকা অপরিহার্য।

ইমাম আবু হানীফা (র) এর দলীল হলো ঐ হাদীস, যা আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। এ হাদীসের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করা হয়নি। আর ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে ব্যাপক (عَامٌ) অর্থবোধক হাদীস-যার গ্রহণযোগ্যতা এবং যার উপর আসল সর্বজন স্বীকৃত ও বিধিত; তা উত্তম হল ঐ খাস (বিশেষ) হাদীসের তুলনায়, যার গ্রহণযোগ্যতা বিতর্কিত এবং আমলের বিষয়টিও বিতর্কিত। অধিকন্তু কিয়াস হারীম প্রাপ্তির বিপক্ষে। কেননা তার কর্মতো খননকৃত স্থানে সীমাবদ্ধ। অথচ হক কর্ম

১. কাজেই এজাতীয় কুয়ার হারীম হবে ষাট হাত। আর পশুকে পানি পান করানোর কুয়ার হারীম হবে চল্লিশ হাত।

হিসাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়। কাজেই যে পরিমাণের ব্যাপারে উভয় হাদীসের মধ্যে একই অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে, সে হাদীসের কারণে আমরা কিয়াস ছেড়ে দেব। আর যে ক্ষেত্রে উভয় হাদীসের মধ্যে বৈপরিত্য রয়েছে, সেক্ষেত্রে আমরা কিয়াসকে সংরক্ষণ করবো।

সর্বোপরি গবাদি পশুকে পানি পান করানোর কুয়া থেকেও কখনো উটের দ্বারা পানি উঠানো হয়, আবার পানি সিঞ্চন করার কুয়া থেকেও কখনো হাত দ্বারা পানি উঠানো হয়। কাজেই উভয় ধরনের কুয়ার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়তা সমপর্যায়ের। আর এক্ষেত্রে এও সম্ভাবনা রয়েছে যে, কুয়ার আশেপাশে উটকে ঘুরানো হবে। অতএব এক্ষেত্রে বেশী জায়গার প্রয়োজন হবে না।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ ঝর্ণা বা প্রস্রবণ হলে সেক্ষেত্রে এর হারীম হবে পাঁচশত হাত, ঐ হাদীসের ভিত্তিতে, যা আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। দ্বিতীয় কথা হলো ঝর্ণার ক্ষেত্রে একটু বেশী জায়গার প্রয়োজন। কেননা ঝর্ণার পানি চাষাবাদের জন্য উত্তোলন করা হয়ে থাকে। কাজেই এক্ষেত্রে এমন স্থানের প্রয়োজন, যাতে পানি প্রবাহিত হতে পারে এবং এমন হাউসের প্রয়োজন–যার মধ্যে পানি জমা হতে পারে। আর এমন জায়গার প্রয়োজন, যে জায়গা দিয়ে পানি প্রবাহিত হয়ে তা জমিতে গিয়ে পতিত হবে। এ কারণেই ঝর্ণার ক্ষেত্রে অধিক জায়গা নির্ধারণ করা হয়েছে। আর ঝর্ণার হারীম পাঁচশত হাত হওয়ার বিষয়টি تَوْقِيْفِيْ -অর্থাৎ শরী'আত প্রণেতার পক্ষ হতে যা শ্রুত হয়েছে, এর উপর নির্ভরশীল। বিশুদ্ধতম মতানুসারে চারদিক থেকেই ঝর্ণার হারীম পাঁচশত হাত করে সাব্যস্ত হবে; (সর্বসাকুল্যে পাঁচশত হাত নয়।) যেমনিভাবে গবাদি পশুকে পানি পান করানোর কুয়ার ক্ষেত্রে আমরা উল্লেখ করেছি। আর এখানে হাত দ্বারা كِسْرَوِيْ (কিস্‌রুবী) বা কিরবাসী হাত উদ্দেশ্য। এ সম্পর্কে আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। কোন কোন ফকীহ বলেছেন ঃ ঝর্ণা এবং কুয়ার হারীমের ক্ষেত্রে যে পরিমাণের কথা আমরা উল্লেখ করেছি, তা আরবদেশীয় জমির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যেহেতু সে দেশীয় জমি শক্ত। আর আমাদের দেশীয় জমি হচ্ছে নরম; কাজেই এ দেশীয় জমিতে হারীমের পরিমাণ বেশী হওয়া চাই; যাতে এক ঝর্ণার পানি অপর ঝর্ণাতে এবং এক কুয়ার পানি অপর কুয়াতে চলে না যায়। যদি যায়, তবে প্রথমটি বেকার হয়ে যাবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ কেউ যদি অপরের হারীমের মধ্যে কুয়া খনন করতে চায়, তবে তাকে একাজে বাধা প্রদান করা হবে। যাতে এ কারণে অপরের হক বিনষ্ট হওয়ার উপক্রম না হয় এবং তা বিঘ্নিতও না হয়। কেননা, যে ব্যক্তি প্রথমে কূপ খনন করেছে, সে এ খনন কার্যের কারণে হারীমের সাহয্যে কুয়া থেকে উপকৃত হওয়ার স্বার্থরক্ষা প্রয়োজনীয়তার প্রেক্ষিতে এই হারীমেরও মালিক হয়ে গেছে। কাজেই অপর ব্যক্তির জন্য তার মালিকানায় হস্তক্ষেপ করা জাইয হবে না। তা সত্ত্বেও দ্বিতীয় ব্যক্তি যদি প্রথমে খননকৃত কুয়ার হারীমের সীমানায় কুয়া খনন করে, তবে প্রথম ব্যক্তি

নিজের থেকে তা ভরাট করে ফেলতে পারবে। আর যদি প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তিকে এ ব্যাপারে পাকড়াও করতে চায়, তবে কোন কোন ফকীহ্ এর মতে সে তাকে এ ব্যাপারে বাধ্য করতে পারবে, যেন সে নিজেই তা ভরাট করে দেয়। কেননা, এ খনন কার্যের অপরাধের সুরাহা এভাবেই সম্ভব । যেমনিভাবে কেউ যদি কারো বাড়ীতে আবর্জনা ফেলে, তবে তাকে বাধ্য করা হয়ে থাকে তা উঠিয়ে নেয়ার জন্য। আবার কোন কোন ফকীহ বলেন ঃ দ্বিতীয় ব্যক্তি কর্তৃক কুয়া খনন করায় যে ক্ষতি হয়েছে, সে এর ক্ষতিপূরণ আদায় করে দেবে। এরপর প্রথম ব্যক্তি নিজেই ঐ কুয়ায় মাটি ভরাট করে নেবে। যেমন কেউ যদি অপরের দেয়াল ধ্বসিয়ে দেয় (তবে ধ্বংসকারী ব্যক্তির উপর এর ক্ষতিপূরণ প্রদান করা ওয়াজিব হয়ে থাকে।) এটিই বিশুদ্ধ মত। ইমাম খাস্সাফ (র) 'আদাবুল কাযীতে' এ কথাই উল্লেখ করেছেন এবং সেখানে তিনি ক্ষতির পরিমাণ নিরুপণের পদ্ধতির কথাও বর্ণনা করেছেন।

আর প্রথমে যে কুয়াটি খনন করা হয়েছে, তাতে পতিত হয়ে যদি কোন কিছু ধ্বংস হয়, তাহলে প্রথম ব্যক্তির উপর কোন ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না। কেননা সে তো কোনরূপ সীমালংঘন করেনি। যদি এ খননকার্য প্রশাসকের অনুমতি সাপেক্ষে হয়ে থাকে, তবে তা তো একেবারেই স্পষ্ট কথা। আর যদি তা রাষ্ট্র প্রধানের অনুমতি ছাড়াও হয়ে থাকে তাহলেও সাহেবাইনের মতে সে সীমালংঘনকরী হবে না। আর ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে তার সীমালংঘনকারী না হওয়ার ওযর হলো, তাঁর মতে কুয়া খনন করা তাহজীর হিসাবে বিবেচিত। তাঁর মতে প্রশাসকের অনুমতি ছাড়াই তাহজীর হতে পারে। যদিও রাষ্ট্র প্রধানের অনুমতি ছাড়া সে এর মালিক হতে পারে না।

পক্ষান্তরে দ্বিতীয় কুপের মধ্যে পতিত হয়ে যদি কোন কিছু ধ্বংস হয় বা কেউ মারা যায়, তাহলে তার উপর ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে। কেননা সে অপরের মালিকানাধীন স্থানে কূপ খনন করে সীমা লংঘন করেছে।

যদি প্রথমে খননকৃত কুয়ার সীমানার বাইরে দ্বিতীয় ব্যক্তি কুয়া খনন করে এবং এতে প্রথম কুয়ার পানি দ্বিতীয় কুয়াতে চলে যায়, তাহলে তার উপর কোন ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না। কেননা সে এ কুপ খনন করে সীমালংঘনকারী বলে গণ্য হয়নি। আর এ অবস্থায় দ্বিতীয় ব্যক্তি তিন দিক থেকে হারীমপ্রাপ্ত হবে। প্রথম ব্যক্তির দিকে সে কোন হারীম পাবে না। কেননা তাতে প্রথম ব্যক্তির মালিকানা আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।[১]

কানাত বা এমন নহর, যার উপরের মুখ সর্বদা বন্ধ থাকে; এর হারীম ঐ পরিমাণ হবে, যা এর জন্য সমীচীন বা আবশ্যক। ইমাম মুহাম্মদ (র) হতে বর্ণিত আছে যে, হারীম প্রাপ্তির ব্যাপারে কানাতের বিষয়টি কূপের মতই। ফকীহগণ বলেন ঃ এটি সাহেবাইনের অভিমত। অবশ্য ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে মাটির উপর পানি

১. কাজেই তার মালিকানায় দ্বিতীয় ব্যক্তির হস্তক্ষেপ করার কোন ইখতিয়ার নেই।

প্রকাশমান বা প্রবাহিত না হওয়া পর্যন্ত এ জাতীয় নহরের জন্য হারীম সাব্যস্ত হবে না। কেননা প্রকৃতপক্ষে কানাতও নহরের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই نَهْرٌ ظَاهِرٌ বা এমন নহর, যার নহর হওয়ার ব্যাপারে কোন অস্পষ্টতা নেই; এর উপরই একে কিয়াস করা হবে। ফকীহগণ বলেন ঃ নহরের মাটির উপর পানি প্রকাশমান হলে এটি প্রস্রবণের অনুরূপ বলে গণ্য হবে। তখন এর হারীম হবে পাঁচশত হাত।

পতিত ভূমিতে যদি বৃক্ষ রোপণ করা হয়, তবে এর জন্যও হারীম সাব্যস্ত হবে। অতএব তার হারীমে অন্য কারো জন্য বৃক্ষ রোপণ করা জাইয হবে না। কেননা বৃক্ষ রোপণকারী ব্যক্তির জন্য এমন হারীম (পার্শ্ববর্তী স্থান) এর প্রয়োজন, যেখানে সে ফল-ফলাদি কাটতে ও রাখতে পারে। আর তা হলো—চতুর্দিক থেকে পাঁচ হাত জায়গা। আর এ সম্পর্কে হাদীসেও বিবরণ রয়েছে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ ফুরাত ও দজলা যে জায়গা ছেড়ে দিয়েছে, অর্থাৎ ফুরাত ও দজলার যে স্থানে চর পড়েছে এবং যে স্থান থেকে পানির গতি ফিরে গেছে, সে স্থানে যদি পুনরায় পানির প্রবাহ জারী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তবে ঐ জায়গা আবাদ করা জাইয হবে না। কেননা দেশে পানির নহর থাকা সকলেরই প্রয়োজন। আর যদি সে স্থানে পানির প্রবাহ পুনরায় জারী হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে, তবে তা পতিত ভূমির মত বলেই গণ্য হবে; যদি তা কোন আবাদীর হারীম না হয়। কেননা এটি কারো মালিকানাধীন ভূমি নয়। আর পানির প্রাবল্য অন্যের প্রাধান্যকে প্রতিহত করে দেয়। বর্তমানে এ ভূমি রাষ্ট্র প্রধানের নিয়ন্ত্রণে। (কাজেই এ জাতীয় ভূমি আবাদ করা জাইয হবে।)

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ যদি অপরের জমিতে কারো নহর থাকে, তবে ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে সে হারীম পাবে না। অবশ্য সে যদি এ বিষয়ে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে পারে যে, এই হারীমের মালিক সে-ই, তবে সে হারীম প্রাপ্ত হবে। কিন্তু সাহেবাইনের মতে সে ব্যক্তি নহরের আইলপ্রাপ্ত হবে, যার উপর দিয়ে সে চলতে পারবে এবং জমির অপ্রয়োজনীয় মাটি তাতে ফেলতে পারবে। কোন কোন ফকীহ বলেন ঃ উপরোক্ত মাসআলাটি নিম্নোক্ত মাসআলার উপর নির্ভরশীল। "কেউ যদি শাসনকর্তার অনুমতিক্রমে পতিত ভূমিতে নহর খনন করে, তবে ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে সে হারীমের হকদার হবে না। কিন্তু সাহেবাইনের মতে সে হকদার হবে। কেননা হারীম ছাড়া নহর থেকে উপকৃত হওয়া যায় না।" আর এটা এ কারণে যে, পানি প্রবাহিত করার জন্য হাঁটা-চলা করা আবশ্যক এবং নহরের ভিতরকার স্থান দিয়ে হাঁটা-চলা করা সাধারণত: সম্ভব নয়। এমনিভাবে নহরের অতিরিক্ত মাটিও কোন সময় এদিক-ওদিক ফেলার প্রয়োজন দেখা দেয়। আর

এ মাটি দূরে নিয়ে ফেলা খুবই কষ্টসাধ্য কাজ। কাজেই কুয়ার উপর কিয়াস করে নহর খননকারী ব্যক্তিও হারীম প্রাপ্ত হবে।

আর ইমাম আবু হানীফা (র) এর দলীল হলো ঃ কিয়াস তো হারীমের বিষয়টিকে সমর্থন করে না। যেমন আমরা তা পূর্বে বর্ণনা করেছি। তবে কুয়া খননকারী ব্যক্তি যে হারীম প্রাপ্ত হবে, তা আমরা হাদীসের মাধ্যমে জানতে পেরেছি। আর নহরের ক্ষেত্রে হারীমের আবশ্যকতার তুলনায় কুয়ার হারীমের আবশ্যকতা অনেক বেশী। কেননা হারীম ছাড়াও নহরের পানি থেকে উপকৃত হওয়া যায়। কিন্তু কুয়া থেকে পানি উঠিয়ে উপকৃত হতে হয়। আর হারীম ছাড়া পানি উঠোনো সম্ভব নয়। অতএব নহরের বিষয়টিকে কুয়ার উপর কিয়াস করা মুশকিল।

(আলোচ্য মাসআলাটি নিম্নোক্ত মাসআলার উপর নির্ভরশীল হওয়ার যে কথা বলা হয়েছে) এ নির্ভরশীলতার কারণ হলো, হারীমের হকদার হওয়ার দ্বারা এর উপর দখল সাব্যস্ত হয় নহরের অধীনে হওয়ার ভিত্তিতে। আর যার দখল স্বত্ব আছে, তার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে।

আর নহর খননকারী ব্যক্তি যদি হারীমের হকদার না হয়, তবে তার দখলও নিঃশেষ হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে বাহ্যিক অবস্থা ভূমি মালিকের পক্ষেই সাক্ষ্য দিচ্ছে; (খননকারী ব্যক্তির প্রতি নয়।) এ সম্বন্ধে সামনে আমরা আলোচনা করবো ইন্‌শাআল্লাহ।

আর কুদূরী গ্রন্থের মাসআলাটিকে যদি স্বতন্ত্র মাসআলা বিবেচনা করা হয়, তাহলে সাহেবাইনের দলীল হলো ঃ নহরের মালিক যেহেতু হারীমের মাধ্যমে পানি আটকিয়ে রাখে, তাই হারীম তার দখলেই আছে, এ কথা মেনে নিতে হবে। এ কারণেই ভূমি মালিক তা ভেঙ্গে দেওয়ার অধিকার রাখে না।

ইমাম আবু হানীফা (র) এর দলীল হলো ঃ হারীমটি বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় দিক থেকেই জমির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বাহ্যিক দিক থেকে তো এ হিসাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ যে, উভয়টিই হচ্ছে সমান। অভ্যন্তরীণ দিক থেকে এ হিসেবে সামঞ্জস্যপূর্ণ যে, উভয়টির মধ্যেই বৃক্ষ রোপণ এবং চাষাবাদের উপযুক্ততা রয়েছে। আর বাহ্যিক অবস্থা দ্বারা ঐ ব্যক্তির প্রতি সমর্থন পাওয়া যায়, যার দখলে রয়েছে এমন জিনিস, যা হারীমের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যেমন দুই ব্যক্তি পরস্পর বিবাদে লিপ্ত হলো দরজার একটি কপাট নিয়ে; অথচ এটি তাদের কারোরই দখলে নেই। কিন্তু অপর কপাটটি তাদের দুইজনের কোন একজনের দরজার সাথে সংশ্লিষ্ট। তাহলে ঐ ব্যক্তির অনুকূলেই ফয়সালা দেওয়া

হবে, যার হাতে রয়েছে এমন একটি জিনিস যেটি বিতর্কিত বিষয়টির সাথে সামঞ্জস্য-পূর্ণ। উল্লেখ্য যে, বিতর্কিত বিষয়ে বিচারকের ফয়সালা হয় قضاء ترك -হিসাবে।[১]

স্মর্তব্য যে, যে অংশের দ্বারা পানি আটকিয়ে রাখা হচ্ছে, তা নিয়ে তো কোন বিতর্ক নেই। বিতর্ক তো হলো, এর বাইরের জায়গা সম্বন্ধে, যা বৃক্ষ রোপণের জন্য উপযোগী। অধিকন্তু যদি বলা হয় যে, হারীমের দ্বারা নহর খননকারী ব্যক্তি নিজের পানি আটকিয়ে রাখছে, তবে এর জবাবে একথা বলা হবে যে, তাহলে তো অপর ব্যক্তি এর মাধ্যমেই নিজের ভূমি থেকে পানিকে বাধা দিয়ে রাখছে। আর হারীম ভেঙ্গে দেওয়া নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ হলো, নহর খননকারী ব্যক্তির হক, তার মালিকানা নয়। যেমন এক ব্যক্তির দেয়ালের উপর অপর ব্যক্তির খেজুরের ডাল রক্ষিত আছে; এ অবস্থায় দেয়ালের মালিক দেয়ালটি ভেঙ্গে দিতে পারবে না, যদিও সে এর মালিক।

'জামে সগীর' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, এক ব্যক্তির একটি নহর আছে। নহরের পাশেই আছে একটি আইল। আইলটির বাইরে এর সাথেই সংযুক্ত রয়েছে এক ব্যক্তির একটি জমি। আইলটি উপরোক্ত দুই ব্যক্তির কারোই দখলে নেই। এ অবস্থায় ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে জমির মালিক আইলটির হকদার হবে। আর সাহেবাইনের মতে নহরের মালিক এর হকদার হবে। এটি তার নহরের হারীম হিসাবে বিবেচিত হবে—এতে সে তার নহরের অতিরিক্ত মাটি ইত্যাদি ফেলতে পারবে।

"আইলটি কারোই দখলে নেই"—জামে সগীর গ্রন্থের এ বক্তব্যের অর্থ হলো ঃ এতে কেউ বৃক্ষ রোপণ করেনি এবং কারো মাটিও এতে ফেলা হয়নি। এর দ্বারা বিতর্কিত স্থানটি স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। পক্ষান্তরে যদি এতে তাদের কারো কোন কিছু থাকে, তবে যার কোন কিছু এতে রক্ষিত বা লাগানো থাকবে, সেই এর হকদার হওয়ার ব্যাপারে অগ্রগণ্য হবে। কেননা দখল তারই। যদি আইলের উপর বৃক্ষ রোপণ করা থাকে, কিন্তু কে রোপণ করেছে তা জানা না থাকে, তবে এ ক্ষেত্রেও ইমামগণের মতভেদ রয়েছে। এ মতভেদের ফলাফল হলো এই যে, ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে বৃক্ষ রোপণের অধিকার ভূমি মালিকের। আর সাহেবাইনের মতে বৃক্ষ রোপণের অধিকার নহরের মালিকের। আর মাটি ফেলা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এতেও মতভেদ রয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, আইলের উপর মাটি ঠেলার অধিকার নহর খননকারী ব্যক্তির, যদি তা অনেক বেশী না হয়। আর আইলের উপর দিয়ে যাতায়াত

---

১. قَضَاءٌ (বিচার) দুই প্রকার। (১) قَضَاءُ تَرْكٍ (২) قَضَاءُ مِلْكٍ . قَضَاءُ تَرْكٍ এর মধ্যে ফয়সালার পরিবর্তন ঘটতে পারে। কিন্তু قَضَاءُ مِلْكٍ এর মধ্যে এমনটি হয় না।

সম্পর্কে বলা হয় যে, ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে নহর খননকারী ব্যক্তিকে এর উপর দিয়ে যাতায়াত করতে নিষেধ করা হবে। আবার কেউ কেউ বলেন যে, নিষেধ করা হবে না। কেননা, এটি তার বিশেষ প্রয়োজন। ফকীহ আবু জা'ফর (র) বলেন ঃ বৃক্ষ রোপণের ক্ষেত্রে আমি ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতকে গ্রহণ করি, আর মাটি ফেলার ব্যাপারে আমি সাহেবাইনের মতকে গ্রহণ করে থাকি। ইমাম আবু ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, নহরের প্রস্থ যে পরিমাণ হবে, এর অর্ধেক পরিমাণ হবে নহরের হারীম এবং তা চারদিক থেকেই সম-পরিমাণ করে হবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, নহরের প্রস্থ যে পরিমাণ হবে, চতুর্দিক থেকে সর্বসাকুল্যে এ পরিমাণই হবে এর হারীম। মানুষের আমলের জন্য এটিই সহজ পন্থা।

পরিচ্ছেদ : পানি সম্পর্কিত মাসাইল

যদি কারো কোন নহর, কূয়া বা কানাত (উপর দিয়ে ঢাকনা দেওয়া নহর) থাকে, তবে ঠোঁট দিয়ে পানি পান করার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করা তার জন্য জাইয নেই। ঠোঁট দিয়ে পানি পান করে মানুষ এবং চতুস্পদ প্রাণী।

জেনে রাখা উচিত, পানি কয়েক প্রকার। (চার প্রকার) ঃ

(১) সাগরের পানি। এ জাতীয় পানি পান করার এবং জমিতে পানি সিঞ্চন করার ব্যাপারে সমস্ত মানুয়ের অধিকার রয়েছে। এমনকি কেউ যদি এর থেকে কোন নহর খনন করে নিজ জমি পর্যন্ত নিয়ে যেতে চায়, তবে এ ক্ষেত্রে তাকে বাধা দেওয়া যাবে না। বস্তুত: সাগরের পানি দ্বারা উপকৃত হওয়ার বিষয়টি চন্দ্র, সূর্য এবং বাতাসের দ্বারা উপকৃত হওয়ার মতই। কাজেই এর দ্বারা যে কোন ভাবেই উপকৃত হওয়া যাবে; বাধা দেওয়া যাবে না।

(২) বড় বড় নদীর পানি। যেমন সাইহুন, জাইহুন, দজলা, ফুরাত ইত্যাদি। এ জাতীয় নদীর পানি ব্যবহার করার ব্যাপারে বাধা মুক্ত অধিকার রয়েছে। এমনিভাবে এ জাতীয় পানি জমিতে নিঞ্চন করার ব্যাপারেও সকলের অধিকার রয়েছে। যেমন কেউ এর দ্বারা মৃত ভূখন্ড আবাদ করলো অথবা জমিতে পানি সিঞ্চন করার জন্য এর থেকে কোন নহর (খাল) খনন করলো। যদি এতে সর্বসাধারণের কোনরূপ ক্ষতি না হয়। আর এ খাল কারো ব্যক্তি মালিকানাধীন হবে না। কেননা, এ নদী মূলগত দিক থেকে সকলের ব্যবহার করাই বৈধ। কারণ পানির প্রাবল্য অন্যের প্রাধান্য বিস্তার করাকে প্রতিহত করে থাকে। আর যদি খাল ইত্যাদি খনন করার কারণে সর্বসাধারণের ক্ষতি হয়, তবে তা করা যাবে না। কেননা, জনসাধারণের উপর থেকে ক্ষয়-ক্ষতির বিষয়টিকে বিদুরীত করা ওয়াজিব। ক্ষতির বিষয়টি হল এইযে, যদি নদীর পাড় ভেঙ্গে যায়, তবে পানি এ দিক দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গ্রাম এবং জমি সব ডুবিয়ে দেবে। নদীর পাড়ে চাক্কি বা পাম্প মেশিন বসানোর বিষয়টিও অনুরূপই।[১]

কেননা, চাক্কি বসানোর জন্য নদীর পাড় কাটা পানি সিঞ্চন করার জন্য নদীর পার কাটার অনুরূপই।

---

১. অর্থাৎ সর্বসাধারণের ক্ষতি না হলে জাইয হবে, আর ক্ষতি হলে জাইয হবে না।

(৩) তৃতীয় প্রকার হলো ঐ পানি, যা ব্যক্তির বণ্টনের অর্থাৎ মালিকানার অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। এ জাতীয় পানি সকলের জন্যই পান করার হক রয়েছে। এ বিষয়ে মূল দলীল হলো রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর বাণী।

তিনি ইরশাদ করেছেন:

اَلنَّاسُ شُرَكَاءُ فِى ثَلْثٍ فِى الْمَاءِ وَالْكَلَاءِ وَالنَّارِ .

তিনটি বিষয়ে সমস্ত মানুষ সমভাবে অংশীদার। তা হলো পানি, ঘাস এবং আগুন।

উল্লেখ্য যে, شِرْب (পানি সেচ করা) ও شُرْب (পানি পান করা) উভয়টিই এ হাদীসের মধ্যে শামিল ছিল। কিন্তু সেচের বিষয়টিকে (ইজমার ভিত্তিতে) এর থেকে খাস (আলাদা) করে দেওয়া হয়েছে। এখন বাকী রয়েগেছে দ্বিতীয়টি অর্থাৎ পান করার বিষয়টি। অধিকন্তু পানি সংরক্ষণ করার জন্যই কুয়া ইত্যাদি খনন করা হয়ে থাকে। আর সংরক্ষণ করা ব্যতীত মুবাহ বস্তুর মালিক হওয়া যায় না। যেমন হরিণ যদি কারো জমিতে থাকে।[১] সর্বোপরি পানি পান করার অধিকার বাকী রাখা মানুষের মৌলিক প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, সব জায়গায় পানি সাথে নিয়ে যাওয়া মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। অথচ নিজের জন্য এবং নিজের বাহনের জন্য পানির প্রয়োজন সর্বদা। তা সত্ত্বেও যদি পানি থেকে মানুষকে নিবৃত্ত রাখা হয়, তবে তাদেরকে বিরাট কষ্টের মধ্যে পড়তে বাধ্য করবে।

যদি কোন ব্যক্তি এ পানি দ্বারা নিজের আবাদকৃত জমি সিঞ্চন করতে চায়, তবে নহরের মালিকগণ তাদেরকে এ কাজ থেকে নিবৃত্ত করতে পারবে। চাই এর দ্বারা সর্বসাধারণের ক্ষতি হোক বা না হোক। কেননা, এটি তাদের বিশেষ হক (অধিকার)। আর এতে তাদের তেমন প্রয়োজনও নেই।

অধিকন্তু যদি আমরা এ পানিকে সর্বসাধারণের জন্য বৈধ করে দেই তবে এর থেকে পানি পান করার লাভ তথা সুবিধা নিঃশেষ হয়ে যাবে।

(৪) পাত্রে সংরক্ষিত পানি। সংরক্ষণ করার কারণে এ পানি সংরক্ষণকারীর মালিকানাভুক্ত হয়ে গেছে এবং এর থেকে অপরাপর লোকদের হক নিঃশেষ হয়ে গেছে। যেমন শিকারকৃত প্রাণীর ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। কিন্তু উপরোক্ত দলীলের দৃষ্টিতে এতেও شُبْهَةُ الشَّرِكَةِ বা অংশীদারীত্বের সন্দেহ- এখনো রয়ে গেছে। আর সে দলীলটি হলো ঐ হাদীস, যা আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। অতএব যদি কোন মানুষ এমন স্থানে এ জাতীয় পানি চুরি করে নিয়ে যায়, যেখানে পানির প্রাপ্তি খুব কম এবং তা নিসাব পরিমাণ হয়।[২] তাহলেও এতে চোরের হাত কর্তন করা হবে না।

যদি কূয়া, ঝর্ণা, হাউস বা নহর কারো মালিকানাধীন থাকে, তবে সে ঐ ব্যক্তিকে তার মালিকানায় অনুপ্রবেশ করা থেকে বাধা দিতে পারবে, যে এর থেকে পানি পান

১. তবে জমির মালিক এর মালিক বলে গণ্য হবে না। অবশ্য সে যদি তা ধরে নিজ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে যায়, তবে মালিক বলে গণ্য হবে।

২. অর্থাৎ এমন পরিমাণ পানি, যার মূল্য দশ দিরহাম বা তার চেয়ে অধিক হয়, তবুও সন্দেহ থাকার কারণে চোরের হাত কাটা যাবে না।

করার ইচ্ছা পোষণ করছে। যদি সে এর নিকটে এমন পানি পায়, যা সে এমন কারো মালিকানাধীন নয়। আর যদি সে এমন পানি না পায়, তবে নহরের মালিককে বলা হবে যে, হয়তো তুমি তাকে পানি পান করিয়ে দাও অথবা পানি পান করার জন্য তাকে ছেড়ে দাও। অর্থাৎ সুযোগ দিয়ে দাও এই শর্তে যে, সে এর পাড় ভাংতে পারবে না। এ অভিমতটি ইমাম তাহাভী (র) হতে বর্ণিত রয়েছে। কেউ কেউ বলেন : অভিমত তখনই সহীহ্ তথা প্রযোজ্য হবে, যখন সে নিজ মালিকানাধীন ভূমিতে নহর খনন করবে। কিন্তু সে যদি কোন পরিত্যক্ত ভূমিতে নহর খনন করে থাকে, তাহলে সে বাধা দিতে পারবেনা। কেননা, পতিত ভূমিতে সকলেরই অংশীদারীত্ব রয়েছে। আর শরীকানা সম্পত্তি আবাদ করার জন্য খনন কার্য করা হলে, তা পানি পান করার অংশীদারীত্বকে শেষ করে না। এতদ্বসত্ত্বেও খননকারী ব্যক্তি যদি তাকে পানি পান করা থেকে বাধা দান করে, অথচ সে (পানকারী ব্যক্তি) তার নিজের ব্যাপারে এবং নিজের বাহনের ব্যাপারে পিপাসার্ত থাকার আশংকা রয়েছে, তাহলে সে তার সাথে সশস্ত্র লড়াই করতে পারবে। কেননা, সে তাকে তার হক তথা পানি পান করার অধিকার থেকে বাধা দান করে মারার সংকল্প করেছে। অথচ কুয়ার পানি সকলের জন্যই মুবাহ্, তা কারো মালিকানা ভুক্ত নয়। কিন্তু পাত্রে সংরক্ষিত পানির বিষয়টি এর থেকে ব্যতিক্রম। তাই এ জাতীয় পানি পান করতে বাধা প্রদান করা হলে বাধাপ্রাপ্ত (আশংকাকারী) ব্যক্তি তার সাথে লড়াই করতে পারবে, তবে তা হবে অস্ত্র ছাড়া। কেননা, সে এ পানির মালিক হয়ে গেছে। এমনিভাবে কেউ যদি ক্ষুধার কারণে অনন্যোপায়[১] হয়ে যায়, তবে খাদ্য দ্রব্যের ক্ষেত্রেও এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। কোন কোন ফকীহ বলেন : কুয়া ইত্যাদির ক্ষেত্রেও উত্তম হল অস্ত্র ছাড়া লাঠি দ্বারা লড়াই করা। কেননা, বাধা দানকারী ব্যক্তি (পানি নিতে বাধা প্রদান করে) একটি গুনাহের কাজ করেছে। কাজেই তার সাথে অস্ত্র ছাড়া লাঠি দিয়ে লড়াই করা تَعْزِيْر বা এমন দন্ড, যা শরী'আত কর্তৃক নির্ধারিত নয়– এর স্থলাভিষিক্ত বলে গণ্য হবে।

যদি পানি পান করার কারণে সমস্ত পানি নিঃশেষ হয়ে যায়; যেমন একটি ছোট নালা এবং এতে যে পরিমাণ উট ও গবাদিপশু আসে, তার সংখ্যা এত বেশী যে, এগুলোর পানি পান করার কারণে পানি নিঃশেষ হয়ে যায়, তবে এ অবস্থায় সে ব্যক্তি বাধা প্রদান করতে পারবে কি-না—এ সম্বন্ধে কোন কোন ফকীহ বলেন : বাধা দিতে পারবে না। কেননা, উট এ জাতীয় নালার পানি পান করার জন্য সর্বদা আসা -যাওয়া করে না। কাজেই এটি পানি পান করার পালা নির্ধারণের ন্যায় হয়ে গেল। আর এটিও (পানি) পান করার পালা বণ্টনের একটি পদ্ধতি। আর কেউ কেউ শস্যক্ষেত এবং বৃক্ষের মধ্যে পানি সিঞ্চন করার উপর কিয়াস করে বলেন যে, এতে বাধা প্রদান করতে পারবে। এ কিয়াসের ক্ষেত্রে جَامِعْ عِلَّتْ বা মূল কারণ - যা উভয় মাসআলায় বিদ্যমান হলো তার হক বিনষ্ট করা।

বিশুদ্ধ মতানুসারে লোকেরা এ জাতীয় নালা থেকে উযু করা এবং কাপড় ধৌত করার জন্য (প্রয়োজন পরিমাণ) পানি নিতে পারবে। কেননা, নালাতে উযু করা এবং

১. অর্থাৎ অনন্যোপায় ব্যক্তির জন্য জাইয আছে খাদ্য মালিক থেকে তা জোর করে নিয়ে আহার করা। অবশ্য তা অস্ত্র ছাড়া হতে হবে এবং পরে ফেরত দিতে হবে।

কাপড় ধৌত করার হুকুম দেওয়া হলে, যেমন বলা হয়েছে, বিরাট জটিলতার দিকে লোকদেরকে ঠেলে দেওয়া হবে। অথচ ইসলামে এ জাতীয় কঠোরতা ও জটিলতা দূর করা হয়েছে। কেউ যদি এ জাতীয় নালা থেকে কলস ভরে পানি বহন করে নিয়ে নিজের বাড়ীর গাছ-গাছালি এবং শাক-সব্জিতে পানি সিঞ্চন করতে চায়, তবে বিশুদ্ধতম মতানুসারে সে তা করতে পারবে। কেননা, মানুষ এ জাতীয় ব্যাপারে উন্মুক্ত থাকে এবং সুযোগ দিয়ে থাকে। আর মানা করাকে ইতরামী বলে গণ্য করে। তবে তার জন্য জাইয নেই উক্ত ব্যক্তির খাল, কূয়া এবং ঢাকনা বিশিষ্ট নহর থেকে নিজের জমি, খেজুর বাগান এবং অন্যান্য বাগানে পানি সিঞ্চন করা। অবশ্য স্পষ্ট অনুমতি দিলে জাইয হবে। আর মালিকের জন্য ইখতিয়ার আছে মানা করার। জাইয না হওয়ার কারণ হলো এই যে, পানি যখন ব্যক্তিগত বণ্টনের আওতায় এসে যায়, তখন সে পানি থেকে সিঞ্চনের অংশীদারীত্ব সর্বোতভাবে শেষ হয়ে যায়। কেননা, যদি তার জন্য সেচের অধিকার বাকী রাখা হয়, তবে নহরের মালিকের পানি পান করার অধিকার ক্ষুণ্ন হয়ে যায়। অধিকন্তু পানি প্রবাহিত করার স্থানটি খালের মালিকের হক। আর খালের পাড়ের সাথে খালের মালিকের হক সংশ্লিষ্ট। কাজেই অপর ব্যক্তির জন্য ঐ مسيل প্রবাহিত করার স্থান দিয়ে পানি বহিয়ে নেওয়া জাইয হবেনা। এমনিভাবে নদীর পাড় ভাংগাও তার জন্য জাইয হবে না। অবশ্য এ বিষয়ে মালিক যদি অনুমতি প্রদান করে এবং খালটি উক্ত ব্যক্তির নিকট ধার দিয়ে দেয়, তবে এতে কোন দোষ নেই। কেননা, এটি তারই হক। অতএব এ খাল এবং এর পানি অন্যের জন্য বৈধ করে দেওয়া তার পক্ষ থেকে হতে পারে। যেমন নিজ পাত্রের সংরক্ষিত পানি কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করলে অন্যের জন্য বৈধ করে দিতে পারে।

পরিচ্ছেদ : খাল খনন করা

হিদায়া গ্রন্থকার শায়খ বুরহান উদ্দীন (র) বলেন : খাল তিন প্রকার (১) এমন খাল, যা কারো মালিকানাধীন নয় এবং এখনো পর্যন্ত এর পানি কারো বণ্টনের আওতায় আসেনি,যেমন ফুরাত ইত্যাদি। (২) কারো মালিকানাধীন খাল-যার পানি বণ্টন হয়ে গেছে; কিন্তু ব্যবহারিক ভাবে তা সকলের জন্য 'আম'। (৩) ব্যক্তি মালিকানাধীন এমন খাল, যার পানি বণ্টন হয়ে গেছে এবং তা হচ্ছে খাস। উল্লেখ্য যে, আম (ব্যাপক অনুমতি প্রদত্ত) এবং খাস খালের মধ্যে পার্থক্য হলো এর দ্বারা শুফ'আর হক হাসিল হওয়া এবং না হওয়া।[১]

প্রথমোক্ত খাল খনন করা রাষ্ট্র প্রধানের দায়িত্ব। তিনি এ কাজ বায়তুল মালের অর্থ দ্বারা সম্পাদন করবেন। কেননা এ খাল খনন করার ফায়দা জনসাধারণের। কাজেই তা খনন করার দায়-দায়িত্বও তাদের উপর বর্তাবে। স্মর্তব্য যে, এ কাজে খারাজ এবং

১. অর্থাৎ যদি এর ভিত্তিতে খালের পাড়ের জমিতে শুফ'আর হক হাসিল হয়, তবে তা খাস খাল হিসাবে গণ্য হবে। আর শুফ'আ হাসিল না হলে তা আম খাল হিসাবে গণ্য হবে।

জিযয়ার অর্থ ব্যয় করা হবে, উশর এবং সাদাকার অর্থ ব্যয় করা যাবে না। কেননা, সাদাকা তো ফকীর লোকদের জন্য নির্ধারিত। আর উশরের অর্থ-সম্পদ ব্যয় করা হবে বিপদকালীন প্রয়োজনের মুহূর্তে। অতএব যদি বায়তুল মালে কোন প্রকার টাকা-পয়সা এবং অর্থ-সম্পদ না থাকে তাহলে রাষ্ট্র প্রধান লোকদেরকে খাল খননের কাজে বাধ্য করবে–সর্বসাধারণের জন্য যে কাজটি কল্যাণকর, তা যেন তাদের মধ্যে জারী এবং চালু থাকে। কেননা, তারা নিজেরা এ কাজ আঞ্জাম দিতে সক্ষম নয়। এ জাতীয় কাজের প্রসংঙ্গেই হযরত উমর (রা) বলেছেন ; "যদি তোমাদেরকে তোমাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দেওয়া হয়, তবে তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে বিক্রি করে ফেলবে।" তবে শাসকরা এ কাজের জন্য সে সমস্ত লোকদের বাধ্য করবেন, যারা এ কাজ করতে শক্তি-সামর্থ্য রাখে। আর তাদের ব্যয়–ভার ঐ সমস্ত বিত্তশালী লোকদের উপর আরোপ করবেন, যারা নিজেরা এ জাতীয় কায়িক পরিশ্রম করতে সক্ষম নয়। দ্বিতীয় প্রকারের খাল খনন করার দায়িত্ব এর মালিকের উপর; বায়তুল মালের উপর নয়। কেননা, হক তাদের এবং এ জাতীয় খাল খননের ফায়দাও বিশেষভাবে তাদেরই। যদি মালিকদের কেউ এ জাতীয় খাল খননের ব্যাপারে অসম্মতি প্রকাশ করে, তবে তাকে এ কাজের ব্যাপারে বাধ্য করা হবে,সর্ব সাধারণের ক্ষয়-ক্ষতি দূর করার লক্ষ্যে। আর তা হলো অপরাপর শরীক ব্যক্তিদের-ক্ষতি সাধিত হওয়া। কেননা, এ ক্ষেত্রে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী ব্যক্তির ক্ষতিটি তার নিজের বাপারে খাস। এর প্রতিবিধান করা সম্ভব বিনিময়ের মাধ্যমে। কিন্তু বিশেষ ব্যক্তির ক্ষতি সর্বসাধারণের ক্ষতির মুকাবিলা করতে পারবে না এবং হতে পারবে না একটি অপরটির বিনিময়।

খালের পাড় ভেঙ্গে গেলে সর্বসাধারণের ক্ষতি হবে, যেমন জমি জলমগ্ন হয়ে যাবে এবং রাস্তা নষ্ট হয়ে যাবে, এ জাতীয় আশংকায় মালিকগণ যদি এর পাড় মজবুতভাবে তৈরী করার সংকল্প করে, তবে অসম্মতি প্রকাশকারী ব্যক্তিকে এ কাজের ব্যাপারে বাধ্য করা যাবে, অন্যথায় বাধ্য করা যাবে না। কেননা, দ্বিতীয় অবস্থাটি একটি সন্দেহযুক্ত বিষয়। পক্ষান্তরে খাল খননের বিষয়টি এর থেকে ব্যতিক্রম। কেননা, এটি একট সুনিশ্চিত বিষয়। তৃতীয় প্রকার খাল হচ্ছে সর্বদিক থেকেই খাস। এর খননের বিষয়টি মালিকদের উপরই ন্যাস্ত থাকবে। এর কারণ আমরা পূর্বেই বর্ণনা করেছি। ফকীহদের কেউ বলেন : এ ক্ষেত্রে যদি মালিকের কেউ তা খনন করতে অসম্মতি প্রকাশ করে তবে অস্বীকারকারী ব্যক্তিকে তা খননের ব্যাপারে বাধ্য করা হবে। যেমন দ্বিতীয় প্রকারের খাল খননের ব্যাপারে অস্বীকারকারী ব্যক্তিকে বাধ্য করা হয়ে থাকে। আবার কেউ কেউ বলেন : না তাকে বাধ্য করা হবে না। কেননা, এ ক্ষেত্রে তাদের উভয়ের ক্ষতির বিষয়টিই খাস, তথা ব্যক্তি বিশেষের সাথে সম্পর্কিত। এ ক্ষতির প্রতিবিধান করা সম্ভব-তারা এ কাজে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেছে, তা হারাহারিভাবে অস্বীকারকারী ব্যক্তির নিকট থেকে উশুল করার মাধ্যমে। যদি তা আদালতের নির্দেশের মাধ্যমে হয়ে থাকে । এ হিসাবে উভয় দিকই সমান-সমান। কিন্তু পূর্বোক্ত মাসআলাটি এর থেকে ব্যতিক্রম। উল্লেখ্য যে, যদি শরীকদের সকলেই খাল খনন করার ব্যাপারে অসম্মতি

প্রকাশ করে,তবে পানি পানকারীর হকের কারণে তাদেরকে নহর খনন করার জন্য বাধ্য করা যাবে না।

শরীকী খালের খনন কাজের ব্যয় সকল অংশীদারের উপর বর্তাবে। তবে তা উপরের দিক থেকে আরম্ভ হবে। যদি খনন কাজ কারো জমি ছাড়িয়ে যায়, তবে তার থেকে ব্যয়-নির্বাহ স্থগিত হয়ে যাবে। এটি ইমাম আবু হানীফা (র) এর অভিমত। পক্ষান্তরে সাহেবাইন বলেন : ব্যয়-সকলের উপরই বর্তাবে।

আর তা খালের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকলের উপর তাদের পানির অংশ ও ভূমির মালিকানার আনুপাতিক হারে সাব্যস্ত হবে। কেননা, উপরিভাগের মালিকের জন্য খালের নিম্নাংশেও হক রয়েছে, খালের উপরিভাগের অবশিষ্ট পানি নিম্নাংশ দিয়ে প্রবাহিত করার প্রয়োজনীয়তার প্রেক্ষিত। আর ইমাম আবু হানীফা (র) এর দলীল হলো– খাল খনন করার উদ্দেশ্যে পানি সেচের উপকারিতা হাসিল করা। আর তা তো উপরিভাগের মালিকের অর্জিত হয়েই গেছে। এ অবস্থায় তার উপর অপরিহার্য নয় অন্যের উপকার করা। মাসীল (ড্রেন) এর হকদার ব্যক্তির উপর তা সংস্কার করা জরুরী নয়। যেমনিভাবে যদি অপর কোন ব্যক্তির ছাদের উপর কারো মাসীল (مسيل) থাকে, তবে এর সংস্কার করা তার উপর অপরিহার্য হয় না। আর তা হবেই বা কেমন করে? কেননা, জমির উপরিভাগে বাঁধ নির্মাণ করে তার জমি থেকে পানি প্রতিহত করা অর্থাৎ পানি থেকে জমি সংরক্ষণ করা সম্ভব। এরপর খনন কার্য তার জমি ছাড়িয়ে গেলে তার উপর থেকে এর ব্যয়- স্থগিত হয়ে যাবে। যেমন আমরা পূর্বে এ সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। কেউ কেউ বলেন: যখন খনন কার্য তার নালার মুখ ছাড়িয়ে যাবে তখনই তার থেকে এ ব্যয় স্থগিত হয়ে যাবে। এটি ইমাম মুহাম্মদ (র) হতে বর্ণিত রয়েছে। তবে প্রথমোক্ত অভিমতটি বিশুদ্ধতম। কেননা, সে তো তার অংশের উপরিভাগ এবং নিম্ন ভাগ উভয় অংশেই ড্রেন তৈরী করতে পারে। খনন কার্য তার জমি ছাড়িয়ে যাওয়ায় তার থেকে ব্যয়ের বিষয়টি স্থগিত হয়ে যাবে এবং এ অবস্থায় কোন কোন ফকীহ এর মতে তার জন্য জাইয হবে খালের মুখে নালা তৈরী করে নিজের জমিতে পানি সিঞ্চন করা। কেননা, তার ক্ষেত্রে খনন কার্য সমাপ্তিতে পৌছে গেছে। কিন্তু কেউ কেউ বলেন : এ অবস্থায় সে নালার মুখ খুলে নিজ জমিতে পানি সিঞ্চন করতে পারবে না, যতক্ষণ না অপরাপর শরীকদের খনন কার্য সমাপ্ত হবে। খালটি তার জন্য খাস–এ সম্ভাবনাকে নাকচ করার লক্ষ্যে এ খাল থেকে যারা পানি পান করবে তাদের উপর খাল খনন বাবত কোন দায়-দায়িত্ব বর্তাবে না। কেননা, এ জাতীয় মানুষের সংখ্যা তো অসংখ্য ও অগণিত। আর তারা তো হলো– تَابِعٌ বা প্রাসঙ্গিক, মূল ব্যক্তি নয়।

পরিচ্ছেদ : পানির পালা প্রাপ্তির দাবী, এ সংক্রান্ত মতভেদ -এর ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করা

সূক্ষ্ম কিয়াসের দৃষ্টিতে জমি ছাড়াও পানির পালা প্রাপ্তির দাবী করা সহীহ আছে। কেননা. উত্তরাধিকারী সূত্রেও এ জাতীয় ভূমি বিহীন পানির পালা হাসিল হয়ে থাকে।

কখনো এমনও হয় যে, কোন বক্তি বিক্রি করে দিয়ে পানির পালা নিজের জন্য সংরক্ষণ করে। আর এটি একটি আকর্ষণীয় বিষয়। কাজেই এ ব্যাপারে দাবী-দাওয়া করা সহীহ হবে।

এক ব্যক্তির একটি নহর, যা অন্যের ভূমির উপর প্রবাহিত হচ্ছে, এ অবস্থায় ভূমির মালিক যদি চায় যে, এখন থেকে আর এই নহর তার ভূমির উপর দিয়ে প্রবাহিত হতে পারবে না, তাহলে এটিকে এই অবস্থায়ই রেখে দেওয়া হবে। কেননা, পানি প্রবাহিত করেই কেবলমাত্র সে এ নহর ব্যবহার করতে পারে। কাজেই মতভেদ দেখা দেওয়ার সময় তার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি উক্ত নহরে তার কোন দখল না থাকে এবং এর পানি প্রবাহিতও না থাকে, তবে তার উপর ওয়াজিব হবে এই মর্মে প্রমাণ পেশ করা যে, এ নহরটি তার অথবা এ নহর দিয়ে পানি প্রবাহিত করে নেওয়ার তার হক আছে। কাজেই এর পানি দিয়ে আমি আমার জমি সিঞ্চন করতে পারবো। এরূপ প্রমাণ পেশ করার পর তার অনুকূলে ফয়সালা দেওয়া হবে। যেহেতু সে দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে তার মালিকানা এবং হক সাব্যস্ত করেছে। নহর কিংবা ছাদের উপর দিয়ে পানি প্রবাহিত করা অথবা অন্যের বাড়ীর ভেতর দিয়ে বয়ে যাওয়া প্রনালা বা রাস্তার ক্ষেত্রেও এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। আর এ জাতীয় বিষয়ের ক্ষেত্রে মতভেদ হলে এর হুকুম পানির পালার বিষয়ে মতভেদের হুকুমের অনুরূপই হবে।

কতিপয় লোক একটি নহরের মালিক। এ জাতীয় নহরের ক্ষেত্রে যদি পরস্পরের মধ্যে ভূমির আনুপাতিক হারে পানির পালা প্রাপ্তির বিষয়ে তাদের পরস্পরের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়, তবে তারা তাদের ভূমির আনুপাতিক হারে পানির পালা প্রাপ্ত হবে। কেননা, তাদের উদ্দেশ্য হলো নিজ নিজ ভূমিতে পানি সিঞ্চন করে উপকৃত হওয়া। কাজেই ভূমির আনুপাতিক হারেই তা সাব্যস্ত হবে। তবে রাস্তার বিষয়টি এর থেকে ব্যতিক্রম। কেননা, রাস্তার উদ্দেশ্য হলো শুধুমাত্র পথ চলা। আর তা প্রশস্ত ও সংকীর্ণ উভয় ধরনের বাড়ীর ক্ষেত্রে একইভাবেই প্রয়োজনীয়।

অংশীদারদের যার জমি উপরিভাগে, সে যদি খালে বাঁধ না দিয়ে তার জমিতে পানি সিঞ্চন করতে না পারে, তবুও তার জন্য খালে বাঁধ দেওয়া জাইয হবে না। কেননা, এতে অন্যান্য শরীকদের হক বাতিল করা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়াবে। তবে সে তার অংশ অনুসারে পানির ন্যায্য হিসসা প্রাপ্ত হবে এবং সে অনুসারে তার জমিতে পানি সিঞ্চন করতে পারবে। তবে অংশীদারগণ সকলেই যদি এ ব্যাপারে সম্মত হয় যে, উপরিভাগে (উচুঅংশে) যে ব্যক্তি আছে, সে খালে বাঁধ তৈরী করে তার অংশে পানি সিঞ্চন করতে পারবে, তাহলে তা জাইয হবে। এমনিভাবে তারা যদি এ কথার উপর আপোষ-মীমাংসা করে নেয় যে, প্রত্যেক অংশীদার তার জমিতে পানি সিঞ্চন করার সময় খালে বাঁধ দিয়ে নিতে পারবে, তবে তাও জাইয হবে। কেননা, হক তো তাদেরই। কিন্তু যদি কাঠ দ্বারা এ কাজ সম্পাদন করা সম্ভব হয়, তাহলে অংশীদারদের সম্মতি ছাড়া খালে এমন কোন বাঁধ তৈরী করা যাবে না, যদ্দরুণ পুরো খাল বন্ধ হয়ে যায়। কেননা, এরূপ করা হলে অপরাপর অংশীদারদের ক্ষতি সাধিত হবে। এহেন খালের মালিকদের কারো জন্যই অপরাপর অংশীদারদের সম্মতি ব্যতিরেকে এ খাল

থেকে কোন শাখা খাল খনন করা বা এর পাড়ে কোন চাক্কি বা পাম্প মেশিন বসানোর অধিকার নেই। কেননা, এতে খালের পাড় ভেঙ্গে যাবে এবং একাধিক ব্যক্তি মালিকাধীন স্থানকে ইমারত নির্মাণ করে আটকে রাখা অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়াবে। (আর এটি অন্যান্য অংশীদারদের জন্য ক্ষতিকর হবে।) কিন্তু চাক্কি বসানোর কারণে যদি নহর এবং পানির কোন ক্ষতি সাধিত না হয়, আর এটি যদি ভূমি মালিকের নিজ জায়গায় স্থাপন করা হয়, তবে তা জাইয হবে। কেননা, এটি নিজ মালিকানাধীন স্থানে হস্তক্ষেপ, অন্যের হকের ব্যাপারে কোন ক্ষতিকারক কাজ নয়। খালের জন্য ক্ষতিকর হওয়ার অর্থ তো আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। আর তা হলো খালের পাড় ভেঙ্গে যাওয়া। আর পানির জন্য ক্ষতিকারক হওয়ার অর্থ হলো, পানি পূর্বে যে পথে বা যেভাবে প্রবাহিত হতো, তা পরিবর্তিত হয়ে যাওয়া। চাক্কির যে হুকুম, পানি উঠানোর চরকি এবং বড় বালতির হুকুমও তা-ই।

শরিকী খালের উপর পুল ইত্যাদি তৈরী করা যাবে না। এটি একাধিক ব্যক্তির শরীকানাধীন রাস্তার মতই। অবশ্য কেউ যদি কোন এলাকার লোকদের মালিকানাধীন খাল থেকে একটি শাখা খাল খনন করে এর উপর মজবুত পুল তৈরী করতে চায়, তাহলে তা জাইয হবে। অথবা যদি ঐ খালের উপর মজবুত কোন পুল থাকে এবং সে তা ভেঙ্গে ফেলতে চায়, আর এতে বর্ধিত পানি অর্জন করারও কোন সম্ভাবনা নেই, তাহলেও সে তা করতে পারবে। কেননা, পুল তৈরী করা বা পুল ভাঙ্গাতে নিজস্ব মালিকানাধীন সম্পদের মধ্যেই কেবল হস্তক্ষেপ হয়।

এতে অতিরিক্ত পরিমাণ পানি লাভ করে অপরাপর শরীকদের কোন ক্ষতি সাধন করা হয় না।

শরীকদের কেউ যদি খালের মুখ বড় করতে চায়, তবে তাকে এর থেকে বারণ করা হবে। কেননা, এতে খালের পাড় ভেঙ্গে যাবে এবং পানি গ্রহণের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত পরিমাণ পানি তার জমিতে এসে যাবে। যদি পানির বণ্টন ড্রেনের মাধ্যমে হয়ে থাকে, তাহলেও উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে। এমনিভাবে কেউ যদি ড্রেনটিকে খালের মুখ থেকে আরো চার হাত পেছনে সরিয়ে নিতে চায় তবে এ কাজ তার জন্য জাইয হবে না। কেননা, এতে পানি আটকিয়ে গিয়ে বেশী পানি তার অংশে ঢুকে যাবে। কিন্তু সে যদি ড্রেনটি নীচের দিকে বা উপরের দিকে সরিয়ে নিতে চায়, তবে সহীহ মতানুসারে সে তা করতে পারবে। কেননা, মৌলিকভাবে ড্রেনের প্রশস্ততা ও সংকীর্ণতার ভিত্তিতেই সাধারণত: পানি বণ্টন করা হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে উপর-নীচের বিষয়টি ধর্তব্য হয় না। কাজেইএতে পানি বণ্টনের স্থানে পরিবর্তন সাধন করা অপরিহার্য হয় না।

যদি ড্রেনের হিসাবের ভিত্তিতে পানি বণ্টনের বিষয়টি সাব্যস্ত হয়ে থাকে এবং এ অবস্থায় শরীকদের কেউ যদি দিনের হিসাবে পানি বণ্টন করতে চায়, তবে সে তা করতে পারবে না। কেননা, পূর্বের অবস্থাকে আগের অবস্থাতেই রেখে দিতে হবে। কেননা, এ ক্ষেত্রে তার হক প্রকাশ (সাব্যস্ত) হয়ে গেছে। যদি ব্যক্তি বিশেষের- মালিকানাধীন খালে শরীকদের প্রত্যেকের জন্যই একটি করে ড্রেন থাকে, তাহলে তাদের কেউই এটিকে বাড়াতে পারবে না। যদিও এতে কারো কোনরূপ ক্ষতি সাধিত

না হয়। কেননা, এ অংশীদারীত্ব হচ্ছে বিশেষ ধরনের অংশীদারীত্ব। পক্ষান্তরে যদি বড় ধরনের খালের মধ্যে ড্রেন তৈরী করা হয়ে থাকে, তবে এর হুকম হবে ভিন্ন ধরনের। কেননা, এ জাতীয় খাল থেকে শরীকদের জন্য প্রথমেই ছোট ছোট নহর খনন করা জাইয। কাজেই ড্রেন বাড়িয়ে নেওয়াও তাদের জন্য জাইয হবে। মালিকানাধীন খালের অংশীদারদের কারো জন্যই জাইয নেই খালের পানি তার এমন জমিতে নিয়ে সিঞ্চন করা, যাতে এই পানি সিঞ্চন করার কোন বৈধ অধিকার নেই। কেননা, যদি এভাবে বেশ কিছু দিন অতিক্রান্ত হয়ে যায়, তবে সে এর ভিত্তিতে এ মর্মে দলীল পেশ করবে যে, এটি তার হক। (তা না হলে সে কেমন করে তাতে পানি সিঞ্চন করলো।)

এমনিভাবে কেউ যদি ইচ্ছা করে যে, সে তার পালার পানি প্রথমোক্ত ভূমির উপর দিয়ে অপর ভূমিতে নিয়ে যাবে, তবে তা জাইয হবে না। কেননা, এতে তার হকের চেয়েও অধিক প্রাপ্তি ঘটবে। আর এতে দ্বিতীয় ভূমিতে পানি সিঞ্চন করার আগে প্রথম ভূমির কিছু পানি অবশ্যই চুষে নেবে। বস্তুত; এটি শরিকী রাস্তার অনুরূপ একটি বিষয়। অর্থাৎ যদি কয়েক ব্যক্তি একটি রাস্তার মধ্যে শরীক থাকে এবং তাদের কোন একজন এই রাস্তার মধ্যে দরজা খুলতে চায় ঐ বাড়ীর দিকে, যে বাড়ীতে এ বাড়ীর লোক বসবাস করছে না, যাদের বাড়ীর দরজা এ রাস্তার দিকে আছে; তবে তার জন্য এভাবে দরজা খোলা জাইয হবে না।[১]

দুই ব্যক্তির মালিকানাধীন একটি শরিকী খাল–যাতে পয়: প্রণালী তৈরী করা আছে, এ জাতীয় খালের শরীক ব্যক্তিদের থেকে যে উপরি অংশে আছে, সে যদি তার জমি থেকে পানির প্রবাহকে বন্ধ করে একে লবনাক্ত হওয়া থেকে রক্ষা করার লক্ষ্যে কোন একটি পয়ঃপ্রণালী বন্ধ করে দিতে চায়, তাহলে সে তা করতে পারবেনা। কেননা, এতে অপরের ক্ষতি নিশ্চিত। এমনিভাবে অংশীদার দ্বয়ের কেউ যদি তার পানির পালাকে আধাআধি করে বণ্টন করে নিতে চায়, তাহলে তাও জাইয হবে না।

কেননা, পয়:প্রণালীর ভিত্তিতে বণ্টন করার বিষয়টি আগে সম্পাদিত হয়ে গেছে। অবশ্য তারা উভয়েই যদি এ ব্যাপারে সম্মত থাকে, তাহলে তা জাইয হবে। কেননা, হক তো তাদেরই। তারা পরস্পর সম্মত হওয়ার পর এই নিম্নাংশের মালিক ব্যক্তি ইচ্ছা করলে এই (শেষোক্ত) চুক্তিটি বাতিল করে দিতে পারবে। এমনিভাবে তার ওয়ারিসগণও তা করতে পারবে।

কেননা, এটি হলো পানির পালাকে ধার দেওয়ার শামিল। আর পালার সাথে পালার বিনিময় চুক্তি করা বাতিল।

পানির পালা বণ্টনের বিষয়টি এমন একটি বিষয়, যা উত্তরাধিকার সূত্রে বণ্টন করা যায় এবং এর মূল বস্তু দ্বারা উপকৃত হওয়ার ব্যাপারে অসিয়তও করা যায়। কিন্তু তা

১. যেমন রাস্তার মধ্যে যারা অংশীদার, তাদের কারো দুটি বাড়ী আছে। একটির প্রবেশ পথ এ রাস্তার সাথে সংশ্লিষ্ট । কিন্তু অপরটির প্রবেশ পথ এ রাস্তার উপর দিয়ে নয়। বরং ভিন্ন দিক দিয়ে। আর এতে বসবাস করে অন্য কোন মানুষ। এ অবস্থায় বাড়ীর মালিক যদি এই বাড়ীর পথও ঐ রাস্তার ভেতর দিয়ে খুলে দিতে চায়, তবে সে তা করতে পারবে না। কেননা, এতে ঐ রাস্তার যাতায়াত কারীদের ভিড় বেড়ে যাবে।

ক্রয়-বিক্রয় করা, হিবা করা বা সাদাকা করা জাইয নয়। এমনিভাবে উপরোক্ত কাজের ব্যাপারে অসিয়ত করা হলে তাও জাইয হবে না। কেননা, এখানে অজ্ঞতা ও অস্পষ্টতা রয়েছে। অথবা ধোঁকার সম্ভাবনা রয়েছে অথবা এটি কোন মূল্যমান সম্পন্ন বস্তু নয়। এ কারণেই কেউ যদি অন্যের পালার পানি দ্বারা নিজের জমি সিঞ্চন করে, তবে তার উপর ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হয় না। যেহেতু পানির পালার ব্যাপারে উপরোক্ত বিষয়গুলো জাইয নয়, সেহেতু এ ব্যাপারে অসিয়ত করাও জাইয হবে না, বরং বাতিল বলে গণ্য হবে। এমনিভাবে পানির পালা বিবাহের মহরও হতে পারে না। কাজেই এ অবস্থায় (পানির পালাকে মহর ধার্য করা হলে) মহরে মিছিল ওয়াজিব হবে। পানির পালা খুলার বিনিময়ও হতে পারে না। তা সত্ত্বেও যদি একে খুলার বিনিময় সাব্যস্ত করা হয়, তবে হস্তগতকৃত মহর তাকে ফেরৎ দিতে হবে। কেননা, এর মধ্যে জাহালাত ও অস্পষ্টতা অনেক বেশী। এমনিভাবে পানির পালা সুলেহ(সন্ধি) এর বিনিময়ও হতে পারে না। কেননা, উপরোক্ত কোন আকদ বা চুক্তির দ্বারা শিরক তথা পানির পালার মালিকানা হাসিল করা যায় না। অনুরূপভাবে অংশীদারদের কোন একজনের মৃত্যুর পর তার ঋণের কারণে এই পানির পালাকে জমি ব্যতিরেকে বিক্রি করা যাবে না, যেমনিভাবে তা তার জীবদ্দশায় এভাবে বিক্রি করা যায় না। এ অবস্থায় শাসনকর্তা কি করবেন এবং কিভাবে তার ঋণ পরিশোধ করা হবে, এ সম্বন্ধে হিদায়া গ্রন্থকার (র) বলেন : বিশুদ্ধতম মতানুসারে রাষ্ট্রপ্রধান তার পানির পালাকে (অধিকারকে) এমন কোন ব্যক্তির ভূমির সাথে মিলিয়ে দেবেন, যার শিরব (পানির পালা প্রাপ্তির অধিকার) নেই। এরপর জমি মালিকের অনুমতি নিয়ে শিরব ও জমি উভয়টি একত্রে বিক্রি করে দেবেন। তারপর বিবেচনা করবেন যে, শিরব সহ জমির মূল্য কত এবং শিরব ছাড়া জমির মূল্য কত। যে পরিমাণ বেশ-কম বের হবে, তা দ্বারা ঋণ পরিশোধ করা হবে। (আর বাকী টাকা জমির মালিককে দিয়ে দেওয়া হবে।) যদি এমন কোন জমি না পাওয়া যায়, তবে মৃত ব্যক্তির পরিত্যাজ্য সম্পদ দ্বারা শিরব ছাড়া কোন জমি খরীদ করবে, তারপর এর সাথে শিরবকে মিলিযে উভয়টিকে একত্রে বিক্রি করে দেবেন। তারপর জমির মূল্য আলাদা করে তা ঐ খাতে রেখে দেবেন, যেখান থেকে টাকা নিয়ে জমি খরীদ করা হয়েছিল। আর অতিরিক্ত টাকা দ্বারা ঋণ পরিশোধ করবেন।

কেউ নিজের জমিতে পানি সিঞ্চন করার পর অথবা পানি ভর্তি করার পর, তা যদি অপরের জমিতে প্রবাহিত হয়ে গিয়ে তা ডুবিয়ে দেয় অথবা এতে যদি প্রতিবেশীর জমি লবণাক্ত হয়ে যায়, তাহলে উক্ত ব্যক্তিকে এর ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। কেননা, সে তো নিজের জমিতে পানি দিয়ে সীমা লংঘন করেনি। এ সম্বন্ধে আল্লাহ্ তা'আলাই সর্বাধিক জ্ঞাত।

كِتَابُ الْاَشْرِبَةِ
অধ্যায় ঃ মদ ও মাদকদ্রব্য

بِسمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْاَشْرِبَةِ

অধ্যায় : মদ ও মাদকদ্রব্য

আল্লামা বুরহান উদ্দীন (র) বলেন : মূল কিতাবে এ অধ্যায়টিকে কিতাবুল আশরিবা (كِتَابُ الْاَشْرِبَةِ) নামে উল্লেখ করা হয়েছে। বস্তুত: اَشْرِبَةٌ শব্দটি شَرَابٌ (শরাব) এর বহুবচন।[১] যেহেতু এ অধ্যায়ে শরাব এর বিধি বিধান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, তাই একে 'কিতাবুল আশরিবা' নামে নামকরণ করা হয়েছে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন: হারাম মাদকদ্রব্য চার প্রকার (১) اَلْخَمْرُ (মদ)। আঙ্গুরের কাঁচা রস উথলানোর পর যখন তা ফুলে উঠে এবং যখন তাতে ফেনা সৃষ্টি হয় তখন একে اَلْخَمْرُ (খামর) বলা হয়, (২) আঙ্গুরের কাঁচা রস পাকানোর পর যদি দুই তৃতীয়াংশের কম শুকিয়ে যায় তবে একে 'তিলা' বলা হয়। এ কথাটি 'জামে সগীর' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে; (৩) **নাকীউত তামার** (نَقِيْعُ التَّمْرِ)। একে সাকারও বলা হয়– অর্থাৎ পাকা শুকনা খেজুরের শরাব, যা পানিতে ভিজিয়ে তৈরী করা হয়। (৪) **'নাকীউয - যাবীব'** (نَقِيْعُ الزَّبِيْبِ) অর্থাৎ শুকনা কিস্‌মিস কয়েকদিন পর্যন্ত পানিতে ভিজিয়ে রাখার পর যখন তাতে ভাপ সৃষ্টি হয়, তখন একে 'নাকীউয যাবীব' বলা হয়।

মদের (اَلْخَمْرُ) ব্যাপারে দশ রকমের আলোচনা রয়েছে :

প্রথম আলোচনা হলো : মদের প্রকৃতি সম্পর্কিত আলোচনা। কিন্তু মদ তো হলো আঙ্গুরের কাঁচা রস, যা নেশা সৃষ্টি করে। এটিই আমাদের মাযহাবের ইমামগণের কথা এবং এটিই অভিধান শাস্ত্রের পন্ডিত লোকদের সুপ্রসিদ্ধ অভিমত। আলিমগণও তাই বলেন। কিন্তু কেউ কেউ বলেন : নেশা সৃষ্টি করে এ জাতীয় সব কিছুকেই খামর (মদ) বলা হয়।

---

১. শরাব (شَرَابٌ) শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো : পানীয় বস্তু। যেমন পানি, শরবত,মধু ইত্যাদি। পরিভাষায় শরাব এমন বস্তুকে বলা হয়, যা পান করলে ব্যক্তি মাতাল ও বেঁহুশ হয়ে যায়। শরাব যেহেতু বহু প্রকারের হয়ে থাকে; তাই এখানে বহু বচনের শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

কেননা, নবী করীম (সা) ইরশাদ করেছেন : كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ —নেশা সৃষ্টিকারী সব কিছুই খাম্‌র বা মদ।

একদা তিনি আঙ্গুর ও খেজুর গাছের দিকে ইংগিত করে বলেন : খাম্‌র (মদ) এই দুই গাছ থেকে সৃষ্টি হয়ে থাকে। অধিকন্তু খাম্‌র (اَلْخَمْرُ) শব্দটি مُخَامَرَةُ الْعَقْلِ বা আকলকে আচ্ছন্ন করে নেওয়া থেকে উদগত হয়েছে। আর এ অর্থটি প্রত্যেক নেশা জাতীয় বস্তুর মধ্যেই বিদ্যমান। (কাজেই নেশা জাতীয় সব কিছুই খামর হিসাবে পরিগণিত হবে।)

আমাদের দলীল হলো: অভিধান শাস্ত্রের পন্ডিত লোকদের ঐক্যমতের ভিত্তিতে এটি (خَمْرٌ) হলো, একটি বিশেষ জাতীয় বস্তুর নাম,যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। এ কারণেই খামরের মধ্যে এর ব্যবহার সুবিদিত। আর অন্য বিষয়ের ক্ষেত্রে অন্য শব্দের ব্যবহার সুবিদিত। অধিকন্তু খামর (মদ) হারাম হওয়ার বিষয়টি অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত । আর খাম্‌র ব্যতীত অন্যান্য মাদক দ্রব্যের হারাম হওয়ার বিষয়টি অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত নয়।

উল্লেখ্য যে, খাম্‌র (خَمْرٌ) কে খাম্‌র বলে নামকরণ করা হয়েছে, তার শক্তির কারণে। مُخَامَرَةُ الْعَقْلِ তথা আকলকে আচ্ছন্ন করে নেওয়ার কারণে নয়। যদি তাদের বক্তব্য মেনেও নেওয়া হয়, তবে আমরা বলবো যে, আপনারা যা উল্লেখ করেছেন এ কথা "খামর একটি বিশেষ ধরনের বস্তুর নাম" এই বক্তব্যের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। যেমন اَلنَّجْمُ (নাজ্‌ম) শব্দটি اَلنُّجُوْمُ থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে। এর অর্থ প্রকাশ হওয়া। তারপর তা এক নির্দিষ্ট নক্ষত্রের নাম পরিগ্রহ করেছে। এখন আর প্রকাশমান প্রত্যেক বস্তুকে نَجْمٌ বলা যায় না। এ জাতীয় বহু নজীর আমাদের সামনে বিদ্যমান রয়েছে।

(ভিন্ন মতাবলম্বী লোকেরা দলীল হিসাবে যে হাদীসটি প্রথমে উল্লেখ করেছেন, এই) প্রথমোক্ত হাদীসটির ব্যাপারে প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন মাঈন (র) আপত্তি করেছেন। আর দ্বিতীয় হাদীসটি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো- হুকুম বর্ণনা করা, (প্রকৃতি বর্ণনা করা নয়)। কেননা, এটিই রিসালতের পদের জন্য যথার্থ কাজ।

দ্বিতীয় আলোচ্য বিষয়টি হলো : এই খাম্‌র নামটি কখন প্রযোজ্য হবে? সে সম্পর্কে কুদূরী গ্রন্থে যে বক্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে, তা হচ্ছে ইমাম আবু হানীফা (র) এর অভিমত। আর ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র) এর মতে উথলানোর পর যখন তা ফুলে উঠবে, তখনই তা খাম্‌র রূপে গণ্য হবে। ফেনা সৃষ্টি হওয়া শর্ত নয়। কেননা, এতটুকুর দ্বারাই اِسْمُ الْخَمْرِ (মদ নাম করণ) সাব্যস্ত হয়ে যাবে। এমনিভাবে এ اِشْتِدَادٌ বা তেজ হওয়ার পরই তা হারাম বলেও গণ্য হবে। আর এ জিনিসই আকল বিনষ্ট করার ক্ষেত্রে কার্যকরী হয়ে থাকে। ইমাম আবু হানীফা (র) এর দলীল হলো - আঙ্গুরের রস জোশ মারা তথা উথলিয়ে উঠা, এটিই হলো তেজ হওয়ার

সূচনা। আর তা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় ফেনা সৃষ্টি হয়ে পুনরায় তা নিস্তেজ ও স্তিমিত হয়ে যাওয়ার মাধ্যমে। কেননা, ফেনা সৃষ্টি হওয়ার দ্বারাই স্বচ্ছ বস্তু এবং ময়লাযুক্ত বস্তুর মধ্যে পার্থক্য সুচিত হয়। আর শরী'আতের বিধান হলো- অকাট্য। কাজেই তা চূড়ান্ত অবস্থার উপর নির্ভরশীল হওয়াই বাঞ্চনীয়। যেমন মদ্যপায়ীর উপর দণ্ড ওয়াজিব হওয়া, যে ব্যক্তি মদকে হালাল মনে করবে তাকে কাফির সাব্যস্ত করা এবং এর বেচা-কেনা হারাম হওয়া ইত্যাদি। (এ গুলো চূড়ান্ত অবস্থার উপরই নির্ভরশীল হবে।) কোন কোন ফকীহ বলেন : সতর্কতা অবলম্বনের লক্ষ্যে আঙ্গুরের রস যদি ফুলে উঠে, তবে এ অবস্থায়ই তা পান করা হারাম বলে গণ্য হবে।

তৃতীয় আলোচনা হলো : মূলগত দিক থেকেই খাম্‌র হারাম। এ হুকুম নেশা সৃষ্টিকারী হওয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট নয় এবং এর উপর তা নির্ভর শীলও নয়। কোন কোন লোক খাম্‌র মূলত:ই হারাম হওয়ার বিষয়টিকে অস্বীকার করেন এবং তারা বলেন : নেশা সৃষ্টিকারী খাম্‌র হচ্ছে হারাম। কেননা, নেশা সৃষ্টিকারী পরিমাণের দ্বারাই জ্ঞানের মধ্যে ভ্রম সৃষ্টি হয়ে থাকে।

আর তা হলো- আল্লাহর স্মরণ থেকে নিবৃত্ত রাখা। বস্তুত: এ জাতীয় কথা বলা কুফ্‌রী। কেননা, এটি কুরআন মজীদকে অস্বীকার করার নামান্তর। কেননা, কুরআন মজীদে খাম্‌রকে رِجْسٌ (অপবিত্র) বলা হয়েছে। আর অপবিত্র তো এমন বস্তুই হয়ে থাকে যা মূলগত দিক থেকেই নাপাক। মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, নবী করীম (সা) খাম্‌রকে হারাম ঘোষণা করেছেন। আর এর উপর ইজমাও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সর্বোপরি এর স্বল্প পরিমাণ (পান) অধিক পানের দিকে আকৃষ্ট করে। আর এটি খাম্‌রেরই বৈশিষ্ট্য। একারণেই দেখা যায় যে, মদ্যপায়ী ব্যক্তির মধ্যে আরো অধিক পান করার নেশা ক্রমেই বাড়তে থাকে। কিন্তু অন্যান্য খাদ্য-দ্রব্যের বিষয়টি এর থেকে ব্যতিক্রম।

আমাদের ইমামগণের মতে খাম্‌র হারাম হওয়া সম্পর্কিত হাদীসটি কারণ নির্ভরশীল নয়। কাজেই এর হুকুম অন্যান্য মাদক দ্রব্যের দিকে প্রযোজ্য হবে না। পক্ষান্তরে ইমাম শাফিঈ (র) এর হুকুমকে অন্যান্য মাদক দ্রব্যের দিকে প্রযোজ্য করে থাকেন। কিন্তু ইমাম শাফিঈ (র) এর কিয়াস গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, এ কিয়াস মশহুর হাদীসের পরিপন্থী। অধিকন্তু এ تَعْلِيْل বা কারণ দর্শানো শুধুমাত্র নাম প্রয়োগ করার জন্য। অথচ تَعْلِيْل বা কারণ দর্শানো হয় হুকুমকে প্রয়োগ করার জন্য; নামকে প্রয়োগ করার জন্য নয়।

চতুর্থ আলোচনা হলো ; খাম্‌র পেশাবের ন্যায় গুরু নাপাক (نَجَاسَةٌ غَلِيْظَةٌ)। কেননা, এর নাপাকী অকাট্য দলীল দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। যেমন আমরা তা পূর্বে বর্ণনা করেছি।

পঞ্চম আলোচনা হলো : কেউ যদি খাম্‌রকে হালাল মনে করে, তবে তাকে কাফির সাব্যস্ত করা হবে, অকাট্য দলীলকে অস্বীকার করার কারণে।

ষষ্ঠ আলোচনা হলো : মুসলিম ব্যক্তির ক্ষেত্রে খাম্‌র কোন মূল্যমানসম্পন্ন বস্তু নয়। কাজেই কোন মুসলিম ব্যক্তি যদি খাম্‌র নষ্ট করে বা আত্মসাৎ করে,তা তার উপর ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না। আর খাম্‌র ক্রয়-বিক্রয় করাও জাইয নয়। কেননা, আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজীদে খাম্‌রকে অপবিত্র ঘোষণা করে এর প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করেছেন। পক্ষান্তরে একে যদি মূল্যমানসম্পন্ন সাব্যস্ত করা হয়,তবে তা এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের ইংগিত বহন করবে।

রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন :

إِنَّ الَّذِىْ حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا وَأَكْلَ ثَمَنِهَا

যে বস্তু পান করা হারাম, তা বেচা-কেনা করা এবং এর বেচা-কেনা লব্ধ অর্থ ভক্ষণ করা সবই হারাম। তবে এর মালিয়াত (مَالِيَّتْ) অর্থাৎ এটি মাল কিনা? এ সম্বন্ধে ফকীহ গণের মতভেদ রয়েছে। বিশুদ্ধতম মতে এটি (خَمْرٌ) মাল। কেননা, মানুষের স্বভাব ও প্রকৃতি এদিকে (مَائِلْ) বা আকৃষ্ট হয় (যা এর মাল হওয়ার আলামত) এবং এ ব্যাপারে কৃপণতা প্রদর্শন করে। যদি কোন মুসলমানের নিকট কারো পাওনা থাকে এবং ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি মদের মূল্য দ্বারা তার পাওনা পরিশোধ করে, তবে পাওনাদার ব্যক্তির জন্য তা গ্রহণ করা জাইয হবে না। কেননা, এটি বাতিল ক্রয়-বিক্রয় লব্ধ মূল্য। এ টাকা-পয়সা বিক্রেতার নিকট হয়তো জবর দখল বা আত্মসাৎকৃত টাকা-পয়সা অথবা আমানতী টাকা-পয়সা—ফকীহগণের বিতর্কিত অভিমত অনুসারে। এটি মৃত পশু বিক্রিলব্ধ অর্থের অনুরূপই। আর পাওনা যদি কোন জিম্মী ব্যক্তির নিকট থাকে, তবে সে খাম্‌র বিক্রীত অর্থ দ্বারা তা পরিশোধ করতে পারবে এবং মুসলিম পাওনাদার ব্যক্তিও তা গ্রহণ করতে পারবে। কেননা, জিম্মী লোকদের পরস্পরের মধ্যে মদের বেচ-কেনা জাইয আছে।

সপ্তম আলোচনা হলো : মদের দ্বারা উপকৃত হওয়া হারাম। কেননা, নাপাক বস্তু দ্বারা উপকৃত হওয়া হারাম। অধিকন্তু মদ থেকে দূরে থাকা ওয়াজিব। অথচ মদের দ্বারা উপকৃত হওয়ার অর্থ হলো এর কাছাকাছি চলে যাওয়া।

অষ্টম আলোচনা হলো : মদ্যপায়ী ব্যক্তির উপর দন্ড প্রয়োগ করা হবে; যদিও তা নেশা সৃষ্টিকারী না হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন :

مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوْهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوْهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوْهُ فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوْهُ .

কেউ যদি মদ পান করে, তবে তাকে বেত্রাঘাত করবে, যদি সে পুনরায় পান করে, তবে পুনরায় বেত্রাঘাত করবে। যদি আবারো সে পান করে,তবে আবারো তাকে বেত্রাঘাত করবে। সে যদি এর পরও পান করে,তবে তাকে হত্যা করবে।

তবে হত্যার হুকুমটি রহিত হয়ে গেছে। আর বেত্রাঘাতের হুকুমটি এখনো পর্যন্ত বলবৎ আছে। সাহাবায়ে কিরামের ইজমাও এর উপর অনুষ্ঠিত হয়েছে। আর মদ্যপ ব্যক্তির উপর কি পরিমাণ দণ্ড প্রয়োগ করা হবে, তা আমরা কিতাবুল হুদূদ এর মধ্যে বর্ণনা করেছি। (তা হলো: আযাদ ব্যক্তির ক্ষেত্রে আশিটি বেত্রাঘাত এবং গোলামের ক্ষেত্রে চল্লিশটি।)

নবম আলোচনা হলো : পাকানোর কারণে খাম্‌র এর মধ্যে কোনরূপ প্রভাব পড়বে না। কেননা, পাকানোর বিষয়টি হারাম সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক। কিন্তু হারাম সাব্যস্ত হওয়ার পর তা (পাকানো) একে আর দূর করতে পারে না। তবে কাঁচা এবং পাকানো রসের মধ্যে পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, পাকানোর পর ফকীহ গণের মতে নেশা সৃষ্টিকারী না হওয়া পর্যন্ত পানকারী ব্যক্তির উপর হদ (দন্ড) ওয়াজিব হবেনা। কেননা স্বল্প পরিমাণ শুরা পান করলেও হদ ওয়াজিব হয়- কাঁচা রসের ক্ষেত্রে, যেমন আমরা উল্লেখ করেছি । আর এটি তো হলো পাকানো মদের বিধান।

দশম আলোচনা হলো খাম্‌র সিরকা বানানো জাইয। কিন্তু ইমাম শাফিঈ (র)-এর থেকে ভিন্নমত পোষণ করেন। পরে এ সম্পর্কে আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ। খামর সম্পর্কে এই হলো মোটামুটি আলোচনা।

আঙ্গুরের রস পাকানোর পর যদি এর দুই তৃতীয়াংশের কম শুকিয়ে যায় এবং হালকাভাবে তা পাকানো হয়ে থাকে, তবে একে 'বাযক' (بَاذِقْ) বলা হয়। আর পাকানোর কারণে যদি অর্ধেক শুকিয়ে যায় তবে একে বলা হয় মুনসসাফ (مُنَصَّفْ)। আমাদের ইমামগণের মতে এগুলো সবই হারাম। যদি তা উথলানোর পর ফুলে উঠে এবং তাতে ফেনা সৃষ্টি হয়। আর যদি শুধুমাত্র ফুলে হয়(ফেনা সৃষ্টি না হয়) তবে তাতে পূর্বে উল্লেখিত মতভেদ রয়েছে।

ইমাম আওযাঈ (র) বলেন : এ জাতীয় শরাব পান করা মুবাহ। কোন কোন মু'তাযিলা আলিমও এ মত পোষণ করেন। কেননা, এটি পাক- পবিত্র শরবত, খাম্‌র নয়। আর আমাদের দলীল হলো: এই শরাব খুব হালকা শরাব এবং সুস্বাদু বস্তু। এ কারণেই ফাসিদ লোকেরা এর চারদিকে খুব ভিড় করে থাকে। কাজেই এ জাতীয় শরাব পান করা হারাম, ঐ ফাসাদকে দূর করার লক্ষ্যে, যা এর সাথে সংশ্লিষ্ট। 'নাকীউত তামার' অর্থাৎ পাকা শুকনা খেজুর ভিজানো কাঁচা পানি একে সাকারও বলা হয়। এ জাতীয় শরাব পান করা হারাম-মাকরূহ। পক্ষান্তরে শরীফ ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র) বলেন : এ শরাব পান করা মুবাহ।

আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজীদে ইরশাদ করেছেন :

تَتَّخِذُوْنَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا .

—আঙ্গুর হতে তোমরা মাদক ও উত্তম খাদ্য গ্রহণ করে থাক। (১৬-৬৭)

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আমাদের উপর বর্ষিত তার অনুগ্রহের কথা বর্ণনা করেছেন। আর হারাম বস্তুর দ্বারা অনুগ্রহ প্রকাশ করা যায় না।

আমাদের দলীল হলো : সাহাবায়ে কিরামের ইজমা। আর আমরা পূর্বে যে হাদীস বর্ণনা করেছি, তা এ দিকেই ইংগিত করে। শরীক ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র) যে আয়াতটি এখানে উল্লেখ করেছেন, সে সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য হল, এটি ইসলামের প্রাথমিক অবস্থার সাথে সম্পর্কিত। তখন সকল প্রকার মদ ও মাদক দ্রব্য মুবাহ ছিল। কেউ কেউ বলেন : উক্ত আয়াতটি সতর্ক করা ও ধমক দেওয়ার উদ্দেশ্যে নাযিল করা হয়েছিল। এর অর্থ হলো : (আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক জ্ঞাত) তোমরা আঙ্গুর হতে মাদক তৈরী করছো আর উত্তম রিযিককে তোমরা পরিত্যাগ করছো । অর্থাৎ কিসমিস ভিজানো কাঁচা পানি, এ পানিও যদি উথলানোর পর ফুলে উঠে, তবে তা পান করা হারাম। এ ক্ষেত্রেও ইমাম আওযাঈ (র) -এর মতাপার্থক্য প্রযোজ্য হবে এবং এর জবাবও তাই যা আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। মোদ্দাকথা হলো : খাম্‌র, তিলা, নকীউত তামার ও নাকীউয যাবীব এই চার প্রকার মাদক দ্রব্য সবই হারাম। তবে শেষোক্ত তিন মাদক দ্রব্যের হারাম হওয়ার বিষয়টি খাম্‌র হারাম হওয়ার বিষয়ের থেকে কিছু নিম্নমানের। একারণেই এগুলোকে যদি কেউ হালাল মনে করে, তবে তাকে কাফির বলা হবে না। কিন্তু খাম্‌রকে যে হালাল জানবে, তাকে কাফির বলা যাবে। কেননা,এ গুলোর হারাম সাব্যস্ত হওয়ার বিষয়টি ইজ্‌তিহাদী । আর খাম্‌র হারাম হওয়ার বিষয়টি অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত। 'খাম্‌র' এক ফোটা পান করলেও দন্ড ওয়াজিব হবে। কিন্তু ঐ গুলো নেশা সৃষ্টি করে পরিমাণ পান না করা পর্যন্ত দন্ড ওয়াজিব হবে না। আর শেষোক্ত তিন প্রকারের মাদক দ্রব্য এক বর্ণনা মতে নাজাসাতে খফীফা বা হালকা নাপক, আর অপর বর্ণনা মতে 'নাজাসাতে গলীযা' গুরু নাপাক। কিন্তু খাম্‌র এর ব্যাপারে একটিই মাত্র বর্ণনা আর তা হলো : এটি নাজাসাতে গলীযা গুরু নাপাক।

ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে তিলা, নাকীউত তামার এবং নাকীউয যাবীবের ক্রয়-বিক্রয় জাইয এবং কেউ যদি তা নষ্ট করে, তবে তার উপর ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে। কিন্তু সাহেবাইন এর থেকে ভিন্নমত পোষণ করেন। কেননা, এগুলো মূল্যমান মাল এবং এগুলো যে মূল্যমান সম্পন্ন বস্তু নয়, এ ব্যাপারে কোন অকাট্য দলীলের সমর্থন নেই। কিন্তু 'খাম্‌র' এর বিষয়টি এর থেকে ব্যতিক্রম । তবে ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে (নষ্ট অবস্থায়) এ সব মাদক দ্রব্যের মূল্য ওয়াজিব হবে। তার অনুরূপ বস্তু ওয়াজিব হবেন না, ঐ ব্যাখ্যা মুতাবিক, যা পূর্বে উক্ত হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত তিন প্রকার মাদক দ্রব্যের দ্বারা কোনভাবেই উপকৃত হওয়া যাবে না। কেননা, এগুলো সবই হারাম। ইমাম আবু ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, পাকানোর পর যদি অর্ধেক থেকে বেশী, কিন্তু দুই তৃতীয়াংশের কম শুকিয়ে যায়, তবে তা বেচা-কেনা করা জাইয হবে।

ইমাম মুহাম্মদ (র) 'জামে সগীর' গ্রন্থে বলেন : উপরোক্ত মাদক দ্রব্য ব্যতীত আর যতপ্রকারের মাদক দ্রব্য আছে, তা পান করাতে কোন দোষ নেই। মাশায়িখে কিরাম বলেন : এ বিষয়টি 'জামে সগীর' গ্রন্থে যত ব্যাপকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, অন্য কোন গ্রন্থে তা এত ব্যাপাকভাবে বর্ণনা করা হয়নি। এতে এ কথা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে গম, যব, মধু এবং জোয়ার দ্বারা যে মাদক দ্রব্য তৈরী করা হয়,তা হালাল। আর তার মতে যে ব্যক্তি এ জাতীয় মাদক দ্রব পান করবে, তার উপর দন্ড প্রয়োগ করা হবে না, এতে নেশা সৃষ্টি হলেও। এমনিভাবে এ জাতীয় মাদক দ্রব্য পান করে কেউ যদি মাতাল হয়ে যায় এবং এ অবস্থায় সে তার স্ত্রীকে তালাক দেয়, তবে তার তালাক প্রযোজ্য হবে না। যেমন ঘুমন্ত ব্যক্তির তালাক প্রযোজ্য হয়না। ভাং খাওয়ার কারণে বা মাদী ঘোড়ার দুধ পান করার কারণে যদি কারো জ্ঞান হারিয়ে যায়, তবে তার প্রদত্ত তালাকও প্রযোজ্য হবে না।

ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে এগুলো সবই হারাম। আর এ জাতীয়-জিনিস পান করার কারণে কেউ যদি মাতাল হয়ে যায়,তবে তার উপর হদ বা দন্ড প্রয়োগ করা হবে। এমনিভাবে এগুলো পান করে মাতাল অবস্থায় যদি কেউ তার স্ত্রীকে তালাক দেয়, তবে তালাকও প্রয়োজ্য হবে। যেমন অন্যান্য হারাম মাদক দ্রব্য পান করে তালাক দিলে তালাক প্রযোজ্য হয়ে যায়।

ইমাম মুহাম্মদ (র) 'জামে সগীর' গ্রন্থে এ কথাও উল্লেখ করেছেন যে, যে সব মাদক দ্রব্য উথলানোর পর দশ দিন পর্যন্ত অক্ষুণ্ন অবস্থায় থাকে, নষ্ট হয়না, ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলতেন: আমার মতে এগুলো পান করাও মাকরূহ (হারাম) । কিন্তু পরবর্তী সময়ে তিনি এ কথার থেকে ইমাম হানীফা (র)-এর মতের দিকে রুজু করেছেন। মূলত: তার প্রথমদিকের বক্তব্য ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর বক্তব্যের অনুরূপ। তা হলো : প্রত্যেক নেশা সৃষ্টিকারী বস্তু হারাম। তবে এ শর্ত আরোপ করার ক্ষেত্রে তিনি একক।

কিতাবে উল্লেখিত ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর বক্তব্য يَبْلَغْ অর্থ يَغْلِى وَيَشْتَدُّ উথলানো এবং ফুলে উঠা আর وَلَايَفْسُدُ অর্থ وَلَايَحْمَضُ টক না হওয়া। তার এ বক্তব্যের যুক্তি হলো এই যে, কোন বস্তু টক হওয়া ব্যতিরেকে এতদিন পর্যন্ত ঠিক থাকা এর শক্তিমান হওয়ার প্রমাণ বহন করে। আর এটি তার হারাম হওয়ার নিদর্শন । হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) থেকে অনুরূপ অভিমত বর্ণিত রয়েছে। বস্তুত : ইমাম আবু হানীফা (র) প্রকৃত ফুলে উঠা অর্থাৎ ঐ পরিমাণ ফুলে উঠা জরুরী মনে করেন, যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি, সে সব বস্তুর ক্ষেত্রে, যা মূলত:ই পান করা হারাম এবং সে সব বস্তুর ক্ষেত্রে, যা নেশা সৃষ্টি করে পরিমাণ পান করা হারাম। এ সববিষয়াদি সম্পর্কে সামনে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করবো- ইনশাআল্লাহ। উল্লেখ্য যে, ইমাম আবু

ইউসুফ (র) ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতের দিকে ফিরে গেছেন। এরপর তিনি আর"প্রত্যেক নেশাসৃষ্টিকারী বস্তু হারাম" বলে ফাতওয়া প্রদান করেননি। **এমনিভাবে ঐ** শর্ত থেকেও তিনি ফিরে গেছেন ।

ইমাম কুদূরী (র) 'মুখতাসারুল কুদূরী' গ্রন্থে এ কথা বলেছেন যে, খেজুর এবং কিসমিসের নাবীয যদি হালালভাবে জাল দেওয়া হয়, তবে তা ফুলে উঠা সত্ত্বেও হালাল হিসাবেই বাকী থাকবে। এ হুকুম ঐ ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য হবে, যদি কেউ তা আমোদ প্রমোদের উদ্দেশ্যে পান করে এবং তার প্রবল ধারণা থাকে যে, এ পরিমাণ পান করার দ্বারা তার মধ্যে নেশা সৃষ্টি হবে না। এটি ইমাম আবু হানীফা এবং ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর অভিমত। পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মদ এবং ইমাম শাফিঈ (র) এর মতে এটিও হারাম। আর مُثَلَّث عِنَبِي (আঙ্গুরের রস জাল দেওয়ার পর যদি এর দুই তৃতীয়াংশ শুকিয়ে যায়, তবে একে مُثَلَّث عِنَبِي বলা হয়) এর ক্ষেত্রে যে আলোচনা রয়েছে, এ সম্বন্ধে সামনে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করবো-ইনশাআল্লাহ।

ইমাম কুদুরী (র) বলেন : খেজুর ও আঙ্গুর মিলিয়ে এর দ্বারা শরবত তৈরী করে পান করাতে কোন দোষ নেই। কেননা, ইব্ন যিয়াদ (র) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন : একদা হযরত ইব্ন উমর (রা) আমাকে এমন শরবত পান করান, যদ্দরুণ আমার জন্য বাড়ী পর্যন্ত পৌছা দুষ্কর হয়ে পড়ে। পরের দিন তার নিকট এসে তাঁকে এ সম্বন্ধে আমি জানালাম। আমার কথা শুনে তিনি বললেন : আমি তো 'আজওয়া খেজুর এবং কিসমিস ভিজানো পানি ছাড়া তোমাকে অতিরিক্ত আর কিছু পান করাইনি।

خَلِيطَيْنِ(খেজুর ও আঙ্গুর বা কিসমিস ভিজানো পানি)– একেই বলা হয়।[১] আর এ পানি ফুটানো এবং জাল দেওয়া ছিল। কেননা, নকীউয যাবীব (نَقِيعُ الزَّبِيبِ) হারাম হওয়ার কথা হযরত ইব্ন উমর (রা) হতে বর্ণিত রয়েছে। আর তা হলো কিসমিসের কাঁচা পানি। উল্লেখ্য যে," খেজুর ও কিসমিস, কাঁচা কিসমিস ও পাকা খেজুর অথবা পাকা ও কাঁচা খেজুর একত্রে মিলিয়ে খাওয়া নিষিদ্ধ হওয়া সম্পর্কিত যে হাদীসটি রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণিত রয়েছে" তা অভাব-অনটন ও দুর্ভিক্ষের অবস্থার উপর প্রযোজ্য এবং এটি ইসলামের প্রথম যুগের কথা।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন : মধু ও ডুমুর ফলের নাবীয এবং গম, জোয়ার ও যবের নাবীয জাল দেওয়া না হলেও (কাঁচা হলেও) তা পান করা হালাল। এটি ইমাম আবু হানীফা এবং ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর অভিমত। এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে, যদি তা আমোদ প্রমোদের উদ্দেশ্যে পান না করা হয়। কেননা, একদা নবী করীম (সা) আঙ্গুর ও খেজুর গাছের দিকে ইংগিত করে বলেন : খাম্র এই দুই ধরনের গাছ থেকেই তৈরী হয়ে থাকে। এ হাদীসের মাধ্যমে তিনি হারাম হওয়ার

---

১. কাজেই এতে প্রমাণিত হচ্ছে যে, এভাবে খেজুর ও আঙ্গুর বা খেজুর ও কিসমিস ভিজিয়ে সে পানি পান করাতে কোন দোষ নেই। যদি তা গুনাহের কাজ হতো তবে ইব্ন উমর (রা) কখনো এরূপ করতেন না।

বিষয়টিকে এই দুই গাছের সাথে খাস করে দিয়েছেন। আর এ হাদীসের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো হুকুম বর্ণনা করা, (খামর এর প্রকৃতি বর্ণনা করা নয়।) কোন কোন ফকীহ বলেন : এ জাতীয় নাবীয মুবাহ হওয়ার জন্য শর্ত হলো; তা আগুনে জাল দিতে হবে। কেউ কেউ বলেন : না জাল দেওয়া শর্ত নয়। আর এ অভিমতই কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা, এর স্বল্প পরিমাণ পান করা অধিক পরিমাণের দিকে টেনে নিয়ে যায় না। তা যে অবস্থায়ই হোক না কেন; চাই ফুটানো হোক বা না হোক।

এ জাতীয় নাবীয পান করে কেউ যদি মাতাল হয়ে যায়, তবে তার উপর দন্ডাদেশ কার্যকর করা হবে কিনা এ সম্বন্ধে ফকীহদের মধ্যে মতভেদ রেয়েছে। কেউ কেউ বলেন : তার উপর দন্ড প্রয়োগ করা হবে না। এর কারণ আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। কিন্তু অধিকাংশ ফকীহ বলেন : বিশুদ্ধতম মতানুসারে তার উপর দন্ড কার্যকর করা হবে। কেননা, ইমাম মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে,কোন ব্যক্তি যদি (খামর ছাড়া অন্যান্য) মাদক দ্রব্য পান করে মাতাল হয়ে যায়, তবে তার উপর দন্ড প্রয়োগ করা হবে। তবে এ ব্যাপারে বিস্তারিত ব্যাখ্যা তাঁর থেকে বর্ণিত নেই। দন্ড প্রয়োগ করার কারণ হলো : বর্তমান কালে এ জাতীয় শরাবের চারপাশেও ফাসিক লোকদের সমাবেশ ঘটে, যেমন অন্যান্য মাদক দ্রব্যের পাশে হয়ে থাকে। বরং এর আশে-পাশে আরো বেশী ভিড় হয়ে থাকে।

এমনিভাবে দুধ থেকে বানানো শরবতের ক্ষেত্রেও উক্ত মত ভিন্নতা প্রযোজ্য হবে, যদি তাতে নেশার সৃষ্টি হয়। কেউ কেউ বলেন : যে শরাব মাদী ঘোড়ার দুধ থেকে তৈরী করা হয়েছে, তা সম্পর্কে ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন : এটি হালাল নয়। ইমাম আবু হানীফা (র) এটিকে এর গোশতের উপর কিয়াস করেছেন। কেননা, দুধ তো গোশত থেকেই সৃষ্টি হয়ে থাকে। মাশায়িখে কিরাম বলেন : বিশুদ্ধতম মতে তা হালাল বলে গণ্য হবে। কেননা, ঘোড়ার গোশত মাকরূহ হওয়ার কারণ হলো : যদি ঘোড়ার গোশত খাওয়াকে মুবাহ সাব্যস্ত করা হয়, তবে জিহাদের উপকরণ নিঃশেষ হয়ে যাবে -অথবা ঘোড়ার প্রতি সম্মান প্রদশর্নের লক্ষ্যে এ হুকুম প্রদান করা হয়েছে। কাজেই ঘোড়ার গোশতের হুকুম এর দুধের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না। অর্থাৎ মাকরূহ হবে না।

ইমাম কুদুরী (র) বলেন : আঙ্গুরের রস পাকানোর পর যদি এর দুই তৃতীয়াংশ শুকিয়ে যায় এবং এক তৃতীয়াংশ বাকী থাকে, তবে তা উথলিয়ে উঠা সত্ত্বেও হালাল বলে গণ্য হবে। এটি ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর অভিমত। পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মদ, ইমাম মালিক ও ইমাম শাফিঈ (র) এর মতে এটি হারাম বলে গণ্য হবে। ইমাম গণের এ মতভিন্নতা তখনই প্রযোজ্য হবে, যদি এর দ্বারা শক্তি হাসিল করা উদ্দেশ্য হয়। কিন্তু যদি আমোদ- প্রমোদ ও খেল-তামাশা উদ্দেশ্য হয়, তবে তা পান করা কোন ইমামের মতেই হালাল হবে না। ইমাম মুহাম্মদ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তার অভিমতটি শায়খাইনের অভিমতের অনুরূপই। ইমাম

মুহাম্মদ (র) থেকে অপর এক বর্ণনায় আছে যে, এটি মাকরূহ বলে গণ্য হবে। অপর এক বর্ণনায় আছে যে, তিনি এ ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করেছেন। হারাম সাব্যস্ত করার ব্যাপারে তাদের দলীল হলো : নবী করীম (সা) এর নিম্নোক্ত বাণী। তিনি ইরশাদ করেছেন: كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ —নেশা সৃষ্টিকারী সমস্ত বস্তুই খামর অর্থাৎ হারাম।

তিনি আরো ইরশাদ করেন :

مَا اَسْكَرَ كَثِيْرُهُ فَقَلِيْلُهُ حَرَامٌ ·

যে বস্তু অধিক পরিমাণে পান করলে নেশা সৃষ্টি করে, তা স্বল্প পরিমাণ পান করাও হারাম।

রাসলুল্লাহ (সা) থেকে আরো বর্ণিত আছে :

مَا أَسْكَرَ الْجَرَّةُ مِنْهُ فَالْجُرْعَةُ مِنْهُ حَرَامٌ ·

যে বস্তু এক কলস পরিমাণ পান করলে নেশা সৃষ্টি করে, তা এক ঢোক পরিমাণ পান করাও হারাম। আর যুক্তির কথা হলো এই যে, নেশা সৃষ্টিকারী বস্তু মানুষের জ্ঞানকে বিনষ্ট করে দেয়, তাই খাম্‌র এর ন্যায় কম-বেশী সবই হারাম হবে।

ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর দলীল হলো নবী করীম (সা)এর বাণী। তিনি ইরশাদ করেছেন:

حُرِّمَتِ الْخَمْرُ لِعَيْنِهَا

খাম্‌র মূলগত দিক থেকেই হারাম।

কোন কোন বর্ণনায় لِعَيْنِهَا এর স্থলে بِعَيْنِهَا উল্লেখ রয়েছে। (উভয় শব্দের অর্থ একই)। এরপর হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, قَلِيْلُهَا وَكَثِيْرُهَا وَالسُّكْرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ অর্থাৎ খাম্‌র এর অল্প-বেশী সবই হারাম। আর অন্যান্য মাদক দ্রব্যের নেশা সৃষ্টিকারী পরিমাণ হচ্ছে হারাম।

উক্ত হাদীসে খাম্‌র ব্যতীত অন্যান্য মাদক দ্রব্যের হারাম হওয়ার- বিষয়টিকে নেশা সৃষ্টি করার সাথে সম্পর্কিত করা হয়েছে।

কেননা, عَطْفٌ (আতফ) - مُغَايَرَةٌ (ভিন্নতা বুঝানো) এর জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অধিকন্তু নেশা সৃষ্টিকারী পেয়ালা হচ্ছে আকল বিনষ্টকারী। আর তা-ই আমাদের মাযহাবে হারাম।

স্বল্প পরিমাণ খাম্‌রও হারাম। কেননা, খামর এর প্রকৃতি হচ্ছে পাতলা ও সূক্ষ্ম। এ কারণে তা অধিক পরিমাণ পান করার দিকে আকৃষ্ট করে। এ জন্যই স্বল্প পরিমাণের উপর অধিক পরিমাণ পান করার হুকুম প্রয়োগ করা হয়েছে। আর مُثَلَّث[১] গাঢ় হয়ে

১. যে আঙ্গুরের রস জ্বাল দেয়ার পর দুই তৃতীয়াংশ শুকিয়ে যায়।

থাকে। এ কারণে তা অধিক পরিমাণের দিকে আকৃষ্ট করে না। সর্বোপরি তা (مثلث) খাদ্য জাতীয় বস্তুও বটে। কাজেই তা মুবাহ হিসাবেই বলবৎ থাকবে। আর প্রথমোক্ত হাদীসটি সহীহ সনদে বিদ্যমান নেই, যা আমরা পূর্বেই বর্ণনা করেছি। আর যদি হাদীসটি বিদ্যমান আছে বলে মেনে নেওয়া হয়, তবে আমরা বলবো যে, এর দ্বারা শেষ পেয়ালাটিকে বুঝানো হচ্ছে উদ্দেশ্য। এটিই মূলত: নেশা সৃষ্টিকারী।

আগুন দিয়ে জাল দেওয়ার পর যে শরাবের দুই তৃতীয়াংশ শুকিয়ে গিয়েছে, তাতে যদি পানি ঢেলে পুনরায় আবার তা হালকাভাবে জাল দেওয়া হয়, তবে এর হুকুম مثلث শরাবের হুকুমের অনুরূপ হবে। কেননা, পানি ঢালার কারণে দুর্বলতাই কেবল বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। অবশ্য প্রথমেই যদি আঙ্গুরের রসে পানি ঢালা হয় এবং এরপর তা জাল দেওয়া হয়, আর এতে পুরাটাই থাকে এবং দুই তৃতীয়াংশ শুকিয়ে যায়, তবে তা হালাল হবে না। কেননা, পানি তো হালকা এবং সূক্ষ্ম হয়ে থাকে। এ কারণে প্রথমেই তা জ্বালে শুকিয়ে যায়, অথবা উভয়টি থেকেই সমভাবে চলে যায়। এ হিসাবে আঙ্গুরের রস দুই তৃতীয়াংশ নিঃশেষ হয় না। (অতএব তা হালাল হবে না।) যদি গোটা আঙ্গুর (রস নয়) আগুনে জ্বাল দেওয়ার পর তা নিংড়ানো হয় তবে এ সম্বন্ধে ইমাম আবু হানীফা (র) থেকে দুই ধরনের বর্ণনা রয়েছে। এক বর্ণনা মতে তা হালকাভাবে জাল দেওয়া হবে। ইমাম আবু হানীফা (র) এর অপর বর্ণনা মতে পাকানোর কারণে দুই তৃতীয়াংশ নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত তা পান করা হালাল হবে না। এটিই বিশুদ্ধতম অভিমত। কেননা, রস আঙ্গুরের ভেতরে পরিবর্তন হীন অবস্থায় পূর্ববৎ বহাল আছে। কাজেই নিংড়ানোর পর জাল দিলে যে অবস্থা হয় এ ক্ষেত্রেও সে হুকুম প্রযোজ্য হবে।

যদি আঙ্গুর ও খেজুর অথবা খেজুর ও কিসমিস মিলিয়ে একত্রিত করে আগুনে জাল দেওয়া হয়, তবে এর দুই তৃতীয়াংশ নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত তা খাওয়া -পান করা হালাল হবে না। কেননা, খেজুরের ক্ষেত্রে যদিও হালকাভাবে জাল দেওয়া যথেষ্ট। কিন্তু আঙ্গুরের রস তো এমনভাবে জাল দেওয়া আবশ্যক, যাতে এর দুই তৃতীয়াংশ জ্বলে শুকিয়ে যায়। এখানে সতর্কতার লক্ষ্যে আঙ্গুরের বিষয়টিই বিশেষভাবে ধর্তব্য হবে। এমনিভাবে যদি আঙ্গুরের রস এবং 'নাকীউত- তামার' একত্রিত করা হয়, তবে এক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম হবে ঐ কারণে, যা আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি।

যদি নাকীউত তামার ও নাকীউয যাবীব হালকাভাবে জ্বাল দেওয়া হয়, এরপর তাতে খেজুর অথবা কিসমিস ফেলা হয় এবং পরে যা ফেলা হয়েছে তা যদি এমন স্বল্প পরিমাণ হয়, যদ্বারা নবীয বানানো যায় না, তবে এ জাতীয় বস্তু পান করাতে কোন দোষ নেই। আর যদি এমন পরিমাণ হয়, যদ্বারা নবীয তৈরী করা যায়, তাহলে তা পান করা হালাল হবে না। যেমন জ্বাল দেওয়া নবীযে-তামারের মধ্যে যদি এক পেয়ালা নাকীউত তামার ফেলে দেওয়া হয়, তবে তা পান করা হালাল হয় না। কারণ হলো এক্ষেত্রে হারাম হওয়ার দিকটিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

উল্লিখিত শরাব পান করার কারণে পানকারীর উপর দণ্ড ওয়াজিব হবে না। কেননা এগুলোর হারাম হওয়ার কথা সতর্কতাহেতু বলা হয়েছে। আর এই সতর্কতা দণ্ডবিধির ক্ষেত্রে দণ্ডকে রহিত করে দেয়। মদ বা অন্যান্য মাদকদ্রব্য ঝাঁঝ হয়ে যাওয়ার পর তা যদি আগুনে জ্বাল দেওয়া হয় এবং এতে যদি এর দুই তৃতীয়াংশ শুকিয়ে যায়, তবে তা পান করা আর হালাল হবে না। কেননা এগুলোতে হারাম হওয়ার বিষয়টি সাব্যস্ত হয়ে গেছে। জাল দেওয়ার কারণে তা রহিতও হবে না।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ কদুর বাউশ, সবুজ বর্ণের মাটির কলস এবং আলকাতরার প্রলেপ দেওয়া পাত্রে নবীয তৈরী করাতে কোন দোষ নেই। কেননা নবী করীম (সা) এক দীর্ঘ হাদীসে এসব পাত্র সম্পর্কে আলোচনা করার পর বলেছেন ঃ এখন থেকে তোমরা সকল প্রকার পাত্রে নবীয তৈরী করে তা পান করবে। (অর্থাৎ পান করতে পারবে।) কেননা পাত্র কোন জিনিসকে হালাল করে না এবং হারামও করে না। তবে নেশা সৃষ্টিকারী কোন কিছু পান করবে না। উল্লেখ্য যে, নবী করীম (সা) নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত হাদীস বর্ণনা করায় এসব কথা বলেছেন। কাজেই এ বক্তব্য পূর্বের বক্তব্যের জন্য রহিতকারীরূপে গণ্য হবে। তবে এগুলো পবিত্র করে নেওয়ার পর এতে নবীয তৈরী করা যাবে। পাত্রটি যদি পুরাতন হয়, তবে তিনবার ধৌত করে নিলেই তা পবিত্র হয়ে যাবে। কিন্তু নতুন পাত্র হলে, তা যেহেতু মদকে চুষে নেয়, এ কারণে তা ইমাম মুহাম্মদ (র) এর মতে আর পাক হবে না। অবশ্য পুরাতন পাত্রের বিষয়টি এ থেকে ব্যতিক্রম। আর ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে পাত্রটি যদি নতুন হয়, তবে তা একবার ধৌত করে ভালভাবে শুকাতে হবে। এভাবে তিনবার করলে তা পবিত্র হয়ে যাবে। যেসব জিনিস নিংড়ানো যায় না, এ জাতীয় জিনিস পাক করার বিধান এটিই। কেউ কেউ বলেন ঃ ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে নতুন পাত্র পাক করার পদ্ধতি হলো, পাত্রের মধ্যে বার বার পানি ভর্তি করে নেবে। এভাবে করতে করতে যখন পরিষ্কার অবিকৃত পানি বের হয়ে আসবে, তখন তা পবিত্র হয়েছে বলে হুকুম দেওয়া হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ মদ যখন সিরকা হয়ে যাবে, তখন তা হালাল হয়ে যাবে। চাই তা নিজে নিজে সিরকা হোক বা কোন কিছু তাতে ফেলার কারণে সিরকা হোক। মদকে সিরকা বানানো মাকরূহ নয়। ইমাম শাফিঈ (র) বলেন ঃ মদকে সিরকা বানানো মাকরূহ এবং যদি মদকে সিরকা বানানো হয়, তবে তা খাওয়া হালাল হবে না। যদি কোন কিছু ফেলে একে সিরকা বানানো হয়, তবে এক্ষেত্রে একটিই অভিমত অর্থাৎ এ সিরকা খাওয়া হালাল হবে না। আর মদের মধ্যে কোন কিছু ফেলা ছাড়াই যদি সিরকা তৈরী করা হয়, তবে এক্ষেত্রে তাঁর দুই ধরনের অভিমত রয়েছে।

ইমাম শাফিঈ (র) এর দলীল হলো ঃ সিরকা বানানো মূলত: খামর এর কাছাকাছি চলে যাওয়ারই নামান্তর। অর্থাৎ (تَمَوُّل) -প্রাচুর্যের অধিকারী হওয়ার দিক থেকে। অথচ শরাব থেকে দূরে থাকার নির্দেশ এ কাজের সাথে সাংঘর্ষিক।

আর আমাদের দলীল হলো রাসূলুল্লাহ (সা) এর হাদীস। তিনি ইরশাদ করেছেন ঃ نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ —সিরকা কতইনা উত্তম তরকারি।

অধিকন্তু সিরকা বানানোর দ্বারা (মদের) জ্ঞান নষ্ট করার গুণটি নিঃশেষ হয়ে যায় এবং এর মধ্যে সালাহ ও শুদ্ধতার গুণাগুণ এসে যায়। অর্থাৎ তখন এর দ্বারা পিত্তরোগ নিরাময় হয়, কামোত্তেজনা অবদমিত হয় এবং তা খাদ্যের কাজেও আসে। আর এ জাতীয় ইসলাহ শরী'আতে মুবাহ। এমনিভাবে এ জাতীয় সিরকা মানুষের বহু কল্যাণে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কাজেই তা হালাল এবং পবিত্র বলে গণ্য হবে-যেমন কোন মেডিসিন প্রয়োগ করা ব্যতিরেকে যে খাম্‌র সিরকা হয়ে যায়, তা হালাল এবং যেমন দাবাগাত করার দ্বারা চামড়া পাক হয়ে যায়। আর সিরকা বানানোর অবস্থায় মদের কাছাকাছি যাওয়া হয় এর ফাসাদ (ক্ষতি)-কে দূর কারার জন্য। কাজেই এটি মদ ঢেলে তা প্রবাহিত করার অনুরূপই হয়ে গেল।

সর্বোপরি মদকে সিরকা বানানোই উত্তম। কেননা এটি করা হলে এমন মালকে নিজের কাছে সংরক্ষণ করা হবে, যা ভবিষ্যতে হালাল হয়ে যাবে।[১] কাজেই কারো -নিকট যদি খাম্‌র থাকে, তবে তার এ পদ্ধতিই অবলম্বন করা উচিত। খাম্‌র সিরকা হয়ে যাওয়ার পর-পাত্রের মধ্যে যে পরিমাণ তা থাকবে, পাত্রের ঐ পরিমাণ পাক-পবিত্র হয়ে যাবে। আর উপরের বাকী অংশের কি হুকুম হবে, এ সম্পর্কে কেউ কেউ বলেন ঃ বাকী অংশ 'تَبعا'-অর্থাৎ এর সাথে সংশ্লিষ্ট হিসাবে তাও পবিত্র বলে গণ্য হবে। আবার কেউ কেউ বলেন ঃ তা পবিত্র হিসাবে গণ্য হবে না। কেননা এর গায়ে যা লেগে আছে, তা তো শুকনা খাম্‌র। কিন্তু সিরকা দ্বারা যদি এ অংশটি ধুয়ে দেওয়া হয়, তবে তাও সে মুহূর্তে সিরকা হয়ে যাবে এবং পাত্রটিও সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে যদি পাত্র থেকে খামর ফেলে দিয়ে তাতে সিরকা ভর্তি করা হয়, তাহলেও ফকীহগণের মতে তা তৎক্ষণাৎ পবিত্র হয়ে যাবে।

ইমাম মুহাম্মদ (র) 'জামে সগীর' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, মদের তলানি পান করা এবং একে মাথার চুলের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার কাজে ব্যবহার করাও মাকরূহ। কেননা এতে মদের অংশ বিশেষ রয়েছে। আর হারাম জিনিস ব্যবহার করাও হারাম। এ কারণেই এর দ্বারা কোন রোগের চিকিৎসা করা এবং পশুর খুরা রোগে ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করা জাইয নয়। এমনিভাবে তা ঔষধ হিসাবে কোন যিম্মী বা নাবালিগ বাচ্চাকে পান করানোও জাইয নয়। এক্ষেত্রে গুনাহ ঐ ব্যক্তির হবে, যে কাফেরকে এ জাতীয় জিনিস পান করাবে। অনুরূপভাবে জীব-জানোয়ারকে এ জাতীয় তলানি পান

১. অন্যথায় হারাম মাল নিজের নিকট সংরক্ষণ করা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়াবে।

করানোও জাইয নয়। ফকীহদের কেউ কেউ বলেন ঃ জীব-জানোয়ারের নিকট এ জাতীয় জিনিস বহন করে নিয়ে যাওয়াও জাইয নয়। অবশ্য জীব-জানোয়ারকে হাঁকিয়ে যদি এসবের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়, তবে তাতে কোন দোষ নেই। যেমন কুকুর ও মৃত জানোয়ারের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। যদি তলানি সিরকার মধ্যে ঢেলে দেওয়া হয়, তবে এতে কোন ক্ষতি নেই। কেননা এ অবস্থায় এটিও সিরকায় পরিণত হয়ে যাবে। তবে মুবাহ হলো সিরকা তলানির নিকট নিয়ে যাওয়া, এর বিপরীতটি নয়, ঐ দলীলের ভিত্তিতে যা আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন ঃ তলানি পান করার পর তাতে যদি নেশা সৃষ্টি না হয়, তবে পানকারীর উপর দণ্ড প্রয়োগ করা হবে না। কিন্তু ইমাম শাফিঈ (র) এর মতে তার উপর দণ্ড প্রয়োগ করা হবে। কেননা সে খাম্‌র এর অংশবিশেষ পান করেছে।

আমাদের দলীল হলো স্বল্প পরিমাণ তলানি পান করা, অধিক পরিমাণ পান করার প্রতি আকৃষ্ট করে না। কেননা মানুষের প্রকৃতি এ জাতীয় জিনিস পান করা থেকে দূরে থাকাকেই পসন্দ করে। কাজেই এটি অসম্পূর্ণ মাদকদ্রব্য হিসাবে গণ্য। এ হিসাবে এটি খাম্‌র ছাড়া অন্যান্য মাদক দ্রব্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বস্তু। আর এক্ষেত্রে নেশা সৃষ্টি করা ছাড়া দণ্ড ওয়াজিব হয় না। অধিকন্তু তলানিতে গাদই বেশী পরিমাণে থাকে। কাজেই তলানির বিষয়টি পানি মিশ্রিত খাম্‌র এর মত হয়ে গেল, যার মধ্যে পানির পরিমাণ বেশী। (অতএব নেশা না হওয়া পর্যন্ত পানকারীর উপর দণ্ড প্রযোজ্য হবে না।)

খাম্‌র এর দ্বারা ডুশ গ্রহণ করা মাক্‌রূহ। এমনিভাবে তা পুরুষের জননেন্দ্রীয়ের ছিদ্রে বিন্দু বিন্দু করে ঢালাও মাক্‌রূহ। কেননা এটি হারাম বস্তু দ্বারাই উপকৃত হওয়ার নামান্তর। তবে পান না করার কারণে দণ্ড ওয়াজিব হবে না। আর পান করাই দণ্ড ওয়াজিব হওয়ার মূল কারণ। যদি তরকারির ঝোলের মধ্যে খাম্‌র ঢেলে দেওয়া হয়, তবে তা আর খাওয়া যাবে না। কেননা খাম্‌র মিশ্রিত হওয়ার কারণে তরকারির ঝোল নাপাক হয়ে গেছে। তবে নেশা সৃষ্টি না করা পর্যন্ত তা ভক্ষণ করলে হদ ওয়াজিব হবে না। কেননা জ্বাল দেওয়ার বিষয়টি এর সাথে যোগ হয়ে গেছে। খাম্‌র দ্বারা আটার খামিরা তৈরী করার পর এর রুটি ভক্ষণ করা মাকরূহ। কেননা, এতে খাম্‌র এর অংশ বিশেষ রয়ে গেছে।

পরিচ্ছেদ ঃ আঙ্গুর জ্বাল দেওয়ার মাসাইল

এ সম্বন্ধে মূলনীতি হলো ঃ আঙ্গুরের কাচা রস আগুনে জ্বাল দিয়ে ফুটানো এবং তাতে ফেনা সৃষ্টি হওয়ার পর যে পরিমাণ কমবে, তা 'ছিলনা' বলে ধর্তব্য হবে। তারপর অবশিষ্টাংশের দুই তৃতীয়াংশ শুকিয়ে গেলে তবেই বাকী অংশ পান করা হালাল হবে। যেমন দশ পেয়ালা আঙ্গুরের রস জ্বাল দেওয়ার পর ফেনা সৃষ্টি হয়ে তা থেকে এক পাত্র খতম হয়ে গেছে। এরপর বাকীগুলোকে আবার হালকাভাবে জ্বাল দেওয়া হবে, যাতে আরো ছয় পাত্র শুকিয়ে নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং এক তৃতীয়াংশ মাত্র বাকী

থাকবে। তাহলে এ শরাব পান করা হালাল হবে। কেননা যা ফেনা হয়ে খতম হয়ে গেছে, তা হয়তো আঙ্গুরের রস অথবা আঙ্গুরের রসের সাথে মিশ্রিত কোন বস্তু। মোদ্দা কথা হচ্ছে ঃ আঙ্গুরের রস ছিল নয় পাত্র। এর এক তৃতীয়াংশ হচ্ছে তিন পাত্র।

দ্বিতীয় মূলনীতি হলো ঃ যদি জ্বাল দেওয়ার পূর্বে আঙ্গুরের রসের মধ্যে পানি ঢালা হয়, এরপর পানিসহ তা জ্বাল দেওয়া হয় এবং পানি যদি এর সূক্ষ্মতার কারণে আগে শুকিয়ে যায়, তবে যে পরিমাণ পানি দেওয়া হয়েছে, সে পরিমাণ পানি শুকানোর পর অবশিষ্টগুলোকে পুনরায় এমনভাবে জ্বাল দেওয়া হবে, যাতে এর দুই তৃতীয়াংশ শুকিয়ে যায়। কেননা প্রথমে যা শুকিয়েছে, তা ছিল পানি। তারপর দ্বিতীয় পর্যায়ে যা শুকিয়েছে তা ছিল আঙ্গুরের রস। অতএব আঙ্গুরের রসের দুই তৃতীয়াংশ শুকানো আবশ্যক। যদি পানি ও আঙ্গুরের রস একত্রে শুকিয়ে যায়, তবে পানি ও আঙ্গুরের রস একত্রে এমনভাবে জ্বাল দেওয়া হবে, যাতে এর দুই তৃতীয়াংশ শুকিয়ে যায় এবং এক তৃতীয়াংশ বাকী থাকে। তাহলে তা হালাল হয়ে যাবে। কেননা পানি এবং আঙ্গুর উভয়টি থেকেই দুই তৃতীয়াংশ শুকিয়ে গিয়েছে এবং উভয়টির থেকেই এক-তৃতীয়াংশ বাকী রয়েছে। এ হিসাবে এ বিষয়টি এমন হলো ঃ যেমন জ্বাল দেওয়ায় আঙ্গুরের রস দুই তৃতীয়াংশ খতম হয়ে যাওয়ার পর তাতে পানি ঢালা হলো। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যেমন দশ পেয়ালা আঙ্গুরের রস এবং বিশ পেয়ালা পানি একত্রে মিশানো হয়েছে। তারপর প্রথমোক্ত প্রক্রিয়ায় তা এমনভাবে জ্বাল দেওয়া হয়েছে যে, এখন পুরাটার নয় ভাগের এক ভাগ বাকী রয়েছে। (তাহলে তা হালাল হয়ে যাবে।) কেননা এই পরিমাণই আঙ্গুরের রসের এক তৃতীয়াংশ। আর দ্বিতীয় প্রক্রিয়ায় তা এমনভাবে জ্বাল দিতে হবে, যাতে পুরাটার দুই-তৃতীয়াংশ শুকিয়ে যায়, এর কারণ আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি।

উল্লেখ্য যে, একবার উথলানো এবং কয়েকবার উথলানো সবই সমান, যদি তা হারাম সাব্যস্ত হওয়ার আগে হয়ে থাকে। অগ্নি নির্বাপিত হয়ে যাওয়ার পর যদি আঙ্গুরের রস উথলাতে উথলাতে এর দুই-তৃতীয়াংশ খতম হয়ে যায়, তবে তা হালাল বলে গণ্য হবে। কেননা আগুনের প্রভাবেই এমনটি হয়েছে।

তৃতীয় মূলনীতি হলো ঃ আঙ্গুরের রস জ্বাল দেওয়ার পর যদি এর কিছু অংশ শুকিয়ে যায় এবং আর কিছু অংশ ফেলে দেওয়া হয় তাহলে এ অবস্থায় বাকী আঙ্গুরের রস কি পরিমাণ জ্বাল দিতে হবে এবং কি পরিমাণ জাল দিলে এর দুই-তৃতীয়াংশ শেষ হবে, এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারো ঃ প্রথমে পূর্ণ রসের এক-তৃতীয়াংশ বের করতে হবে। তারপর ফেলে দেওয়ার পর যে পরিমাণ বাকী থাকবে, তাতে ঐ তৃতীয়াংশকে পূরণ দিতে হবে। এরপর আগুনে জ্বাল দিয়ে শুকানোর পর কিছু অংশ মাটিতে ফেলার পূর্বে এর পরিমাণ যা ছিল, তার দ্বারা পূর্বের অংশকে ভাগ করতে হবে। ভাগের দ্বারা যে অংশ বের হয়ে আসবে, তা খাওয়া হালাল হবে। যেমন দশ রিত্‌ল

আঙ্গুরের রস। একে জ্বাল দেওয়ার পর এক রিত্‌ল শুকিয়ে গেছে। তারপর তিন রিত্‌ল রস ফেলে দেওয়া হয়েছে। এখন দশ রিত্‌লের এক তৃতীয়াংশ বের করা হবে। আর তাহলো ৩১/৩ রিতল। এরপর একে ছয় রিত্‌লের মধ্যে গুণ করা হবে। গুণের পর হবে বিশ অংশ। তারপর এ বিশ অংশকে ভাগ করা হবে ঐ অংশ দ্বারা, যা জ্বাল দেওয়ার পর এবং ফেলার আগে বাকী ছিল। তাহলো নয় রিতল। নয় দ্বারা বিশকে ভাগ দেওয়ার পর প্রত্যেক অংশে আসবে ২২/৯ রিত্‌ল। এতে প্রতীয়মান হয় যে, ২২/৯ রিত্‌ল পরিমাণই হালাল। (এর বেশী নয়)।

উপরোক্ত মূলনীতির উপর ভিত্তি করে আরো বহু মাসআলা উদ্ভাবন করা যাবে। এখানে হিসাবের অপর একটি পদ্ধতিও হতে পারে। তবে এখানে আমি যা উল্লেখ করেছি, তাতে অপরাপর মাসআলাসমূহ উদ্ভাবনের প্রতি যথেষ্ট হিদায়েত ও দিক নির্দেশনা রয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলাই এ সবের বিশুদ্ধতার ব্যাপারে সর্বাধিক জ্ঞাত।

كِتَابُ الصَّيْدِ
অধ্যায় ঃ শিকার

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

كِتَابُ الصَّيْدِ

অধ্যায় ঃ শিকার

হিদায়া গ্রন্থকার শায়খ বুরহান উদ্দীন (র) বলেন ঃ اَلصَّيْدُ। অর্থাৎ শিকার করা। শিকারকৃত পশুকেও اَلصَّيْدُ। বলা হয়। মুহরিম নয়–এ জাতীয় ব্যক্তির জন্য হরমের এলাকার বাইরে শিকার করা মুবাহ্।

কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا

–যখন তোমরা ইহরামমুক্ত হবে, তখন শিকার করতে পারবে। (৫ ঃ২)

আরো ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَحُرِمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِمَا دُمْتُمْ حُرُمًا ٠

–আর যতক্ষণ তোমরা ইহরাম অবস্থায় থাকবে ততক্ষণ স্থলের শিকার তোমাদের জন্য হারাম। (৫ঃ ৯৬) রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত 'আদী ইব্ন হাতিম (রা)-কে বলেন ঃ

اِذَا اَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ وَذَكَرْتَ اِسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ فَكُلْ وَاِنْ اَكَلَ مِنْهُ فَلاَ تَأْكُلْ لِاَنَّهُ اِنَّمَا اَمْسَكَهُ عَلٰى نَفْسِهِ وَاِنْ شَارَكَ كَلْبَكَ كَلْبٌ اٰخَرُ فَلاَ تَأْكُلْ فَاِنَّكَ اِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلٰى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلٰى كَلْبِ غَيْرِكَ ٠

যদি তুমি আল্লাহ্র নাম নিয়ে তোমার প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কুকুর পাঠিয়ে থাক, তবে তুমি তা খাবে। আর কুকুর যদি শিকারের কিছুটা খেয়ে ফেলে, তাহলে খাবে না। কেননা, সে তো নিজের জন্যই ধরেছে। যদি তোমার কুকুরের সাথে অন্য কোন কুকুর শরীক

হয়, তবে তা খাবে না। কেননা, তুমি তো তোমার কুকুর আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে পাঠিয়েছো। কিন্তু অন্যের কুকুর তো আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে পাঠাওনি।

শিকারকৃত পশু খাওয়া মুবাহ হওয়ার ব্যাপারে ইজ্‌মা সংঘটিত হয়েছে। অধিকন্তু এটি এক প্রকারের উপার্জন এবং এতে পশুকে এমন কাজে ব্যবহার করা হয়, যে কাজের জন্য একে সৃষ্টি করা হয়েছে। সর্বোপরি এতে مُكَلَّف কে স্থায়ী রাখা হয় এবং এতে تَكْلِيْفُ এর বিধি-বিধান কায়েম করার জন্য তাকে ক্ষমতা প্রদান করা হয়। কাজেই যেমন কাঠ সংগ্রহ করা মুবাহ, তেমনি শিকার করাও মুবাহ।

এ অধ্যায়ে বর্ণিত বিধি-বিধানসমূহ দুই অনুচ্ছেদে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম অনুচ্ছেদ শিকারী পশুর মাধ্যমে শিকার করার মাসাইল সম্পর্কে। আর দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ তীর ইত্যাদি দ্বারা শিকার করার মাসাইল সম্পর্কে।

পরিচ্ছেদ ঃ শিকারী পশুর বিবরণ

ইমাম কুদুরী (র) বলেন ঃ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর, চিতা বাঘ, বাজপাখি এবং অন্যান্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পশুর দ্বারা শিকার করা জাইয। জামে সগীর গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, দাঁত বিশিষ্ট হিংস্র প্রাণী এবং থাবা বিশিষ্ট হিংস্র পাখি যদি প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয়, তবে এ সবের শিকার করাতে কোন দোষ নেই। এ ছাড়া অন্যান্য পশুর দ্বারা শিকার করার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই। কিন্তু শিকার করার পর যদি তা যবাহ করা সম্ভব হয়, তাহলে তা হালাল বলে গণ্য হবে।

এ সম্বন্ধে মূল দলীল হলো আল্লাহ্ তা'আলার বাণী

وَمَا عَلَّمْتُمْ مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِيْنَ تُعَلِّمُوْنَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّٰهُ ـ

আর শিকারী পশু-পাখি যাদেরকে তোমরা শিকার শিক্ষা দিয়েছো, যেভাবে আল্লাহ্ তোমাদের শিক্ষা দিয়েছেন। (৫ঃ ৪)

এখানে جَوَارِحْ শব্দটি এক ব্যাখ্যা অনুসারে كَوَاسِبْ বা উপার্জনকারী এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আর مُكَلِّبِيْنَ অর্থ مُسَلِّطِيْنَ অর্থাৎ শিকার কার্যে নিয়োজিত পশু-পাখি। উপরোক্ত ব্যাখ্যা অনুসারে আয়াতের ব্যাপকতার ভিত্তিতে সর্ব প্রকার جَوَارِحْ তথা শিকারী পশু-পাখিই এর মধ্যে শামিল হয়ে যাচ্ছে। হযরত আদী ইব্‌ন হাতিম (রা) এর উক্ত হাদীসও এ দাবীর প্রতি ইংগিত করে। উল্লেখ্য যে, كَلْبٌ (কালব) শব্দটি সকল প্রকার হিংস্র পশুর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, এমনকি সিংহের ক্ষেত্রেও এ শব্দটির প্রয়োগ বিদ্যমান রয়েছে।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি সিংহ ও ভল্লুককে এ হুকুম থেকে প্রভেদ করে থাকেন। কেননা, এই দুই ধরনের পশু অপরের জন্য কোন কাজ করে না। সিংহ তো তার বীরত্বের জন্য করে না। আর ভল্লুক করে না নিজের হীনতা ও

নীচুতার কারণে। কোন কোন্ ফকীহ চিলকেও এ দুটির সাথে শামিল করেছেন। কেননা, এর প্রকৃতির মাঝেও নীচুতা রয়েছে। আলোচ্য আয়াতের হুকুম থেকে শূকরের বিষয়টিও ব্যতিক্রম। কেননা, শূকর মূলগত দিক থেকেই নাপাক। কাজেই শূকরকে কোন কাজে ব্যবহার করা এবং এর দ্বারা উপকৃত হওয়া জাইয হবে না। মোদ্দাকথা হল, উপরোক্ত প্রাণী সমূহের শিকার বৈধ হওয়ার জন্য প্রশিক্ষণ আবশ্যক। কেননা, আলোচ্য আয়াত থেকে প্রশিক্ষণের শর্তটি স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়।

আর হযরত আদী ইব্ন হাতিম (রা) এর উপরোল্লেখিত হাদীস থেকে প্রশিক্ষণ এবং ইরসাল (إرْسَالٌ প্রেরণ করা) তথা উভয়টির শর্ত হওয়ার কথা পরিষ্কারভাবে প্রতিভাত হয়। অধিকন্তু শিকারী পশু প্রশিক্ষণের দ্বারাই آلَةُ ذَكَاةٍ (যবাহ এর উপকরণ) রূপে গণ্য হয়ে مُرْسِلٌ (প্রেরণকারী) এর পক্ষ হতে শিকার কার্য সম্পাদন করে থাকে। কাজেই শিকারী ব্যক্তির পক্ষ হতে শিকারী পশু পাঠানো আবশ্যক। তবে তা শিকারের জন্য রওয়ানা করবে এবং তার জন্য শিকারকৃত পশুটিকে ধরে রাখবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ কুকুরের প্রশিক্ষণ হল, তিনবার শিকারকৃত পশুকে না খাওয়া।[১] আর বাজের প্রশিক্ষণ হলো ফিরে আসা এবং ডাকলে সে ডাকে সাড়া দেওয়া। এ কথাটি হযরত ইব্ন 'আব্বাস (রা) হতেও বর্ণিত রয়েছে। অধিকন্তু বাজ পাখির শরীর কোনরূপ প্রহারকে বরদাশত করতে পারে না। কিন্তু কুকুরের শরীর তা বরদাশ্‌ত করতে পারে। তাই পশু-ধরার পর তা ছেড়ে দেওয়ার (না খাওয়ার) জন্য কুকুরকে প্রহার করা হবে। সর্বোপরি–প্রশিক্ষণের নিদর্শন হলো ঃ যা সাধারণত: পসন্দনীয় ও আকর্ষণীয়,তা বর্জন করা। আর বাজ হলো বন্য পাখি। মানুষ থেকে তা সর্বদাই পালিয়ে থাকতে চায়। এ অবস্থায় এর পুনরায় ফিরে আসা এবং ডাকে সাড়া দেওয়াই প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হওয়ার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু কুকুরের বিষয়টি এর থেকে ব্যতিক্রম। কেননা, কুকুর পোষ্য প্রাণী এবং তা লুটে পুটে খাওয়ার ব্যাপারে অভ্যস্ত। কাজেই কুকুরের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হওয়ার নিদর্শন হলো আকর্ষণীয় বস্তু বর্জন করা। অর্থাৎ তা খাওয়া ও কেড়ে নেওয়া বর্জন করা।

ইমাম কুদূরী (র) তিনবার এভাবে খাওয়া বর্জন করার শর্ত আরোপ করেছেন। এটি সাহেবাইনের অভিমত। আর এটি ইমাম আবু হানীফা (র) এর একটি বর্ণনাও বটে। কেননা, এর চেয়ে কম পরিমাণ বর্জন করার ক্ষেত্রে সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। যদি এক দুই বার খাওয়া বর্জন করে তবে মনে করা যেতে পারে যে, হয়তো পেট ভরা থাকার কারণে খায়নি। কিন্তু যদি তিন তিনবার খাওয়া এড়িয়ে যায়, তবে মনে করতে হবে যে, এরূপ করা তার অভ্যাসে পরিণত হয়েগেছে। সর্বোপরি তিনের সংখ্যাটি এমন, যা কোন কিছুকে মনোনীত করা এবং ওযর যাচাই করার ক্ষেত্রে শরী'আত কর্তৃক অনুমোদিত। যেমন খিয়ারের মুদ্দতের ব্যাপারে তিন দিনের বিষয়টি স্বীকৃত। এমনিভাবে নবী- রাসূলগণের ঘটনাবলীতেও তিন সংখ্যার উল্লেখ পাওয়া যায়। আরো

---

১. কুকুর যদি এভাবে তিন তিনবার শিকার করে শিকারকৃত পশু না খায়, তবে একে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বলে গণ্য করা হবে।

একটি যুক্তি হলো এই যে, অধিক সংখ্যাই কোন কিছু **সম্বন্ধে নিশ্চিত** জানার উপর আলামত বা নিদর্শন হতে পারে, কম সংখ্যা নয়। আর **বহুবচনই অধিক হিসাবে** গণ্য হয়ে থাকে এবং এর নিম্নতম সংখ্যা হলো তিন। এ কারণেই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হওয়ার জন্য তিনবার শিকারকৃত পশু খাওয়াকে বর্জন করার শর্ত আরোপ করা হয়েছে।

মাবসূত গ্রন্থের বর্ণনা মতে ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতানুসারে শিকারী পশু বা প্রাণী তখনই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বলে সাব্যস্ত হবে, যখন শিকারী ব্যক্তির প্রবল ধারণা হবে যে, এটি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়ে গেছে। বস্তুত: এ বিষয়টি তিন সংখ্যার সাথে খাস নয় এবং হতেও পারে না। কেননা, সংখ্যার বিষয়টি ইজ্‌তিহাদ করে জানার বিষয় নয়; বরং এতো হলো কুরআন-হাদীস থেকে জেনে এবং শুনে শুনে অবগত হওয়ার বিষয়। অথচ রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে এ বিষয়ে কোন কিছু শ্রুতও হয়নি। কাজেই বিষয়টিকে مُبْتَلٰى بِهٖ (সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি) এর মতামতের উপর ছেড়ে দেওয়া হবে। এটিই এ জাতীয় মাসআলার ক্ষেত্রে মূলনীতি।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন ঃ প্রথম বর্ণনা মতে ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতানুসারে ঐ শিকার জন্তুও খাওয়া হালাল, যাকে কুকুর তৃতীয়বারে শিকার করেছে। কিন্তু সাহেবাইনের মতে তা খাওয়া হালাল হবে না। কেননা, তিনবার এভাবে করার দ্বারাই একটি পশু বা পাখি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বলে গণ্য হয়ে থাকে। প্রশিক্ষণ পূর্ণ হওয়ার আগে কোন প্রাণী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হতে পারে না। এ হিসাবে তৃতীয়বারে যে শিকার জন্তুটি শিকার করা হয়েছে, তা জাহিল-(অপ্রশিক্ষণ প্রাপ্ত) কুকুরের শিকার। এ হিসাবে এটি ঐ কার্যকলাপের অনুরূপ বলে গণ্য হবে, যা মুনীবের নীরবতার অবস্থায় নিষ্পন্ন করা হয়ে থাকে। ইমাম আবু হানীফা (র) এর দলীল হলো ঃ তৃতীয়বার শিকারের সময় শিকার জন্তুটি না খাওয়া কুকুরের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হওয়ার সুস্পষ্ট আলামত। কাজেই এই তৃতীয় বারের শিকারকৃত পশুটি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরের শিকার হিসাবে গণ্য হবে। কিন্তু গোলামের মাসআলাটি এ মাসআলা থেকে ব্যতিক্রম। কেননা, অনুমতি অর্থ হলো– অবগত করা। আর অবগত করা দাসের জ্ঞাত হওয়া ব্যতিরেকে সম্ভব নয় এবং তার জ্ঞান হাসিল হয় সংশ্লিষ্টতার পর।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ কেউ যদি (শিকারের উদ্দেশ্যে)তার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর বা বাজ পাখি পাঠায় অর্থাৎ ছাড়ে এবং ছাড়ার সময় আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করে, তারপর তা গিয়ে যদি কোন পশুকে শিকার করে, জখম করে আর সে জখমে পশুটি মারা যায়, তবে ঐ পশুটি খাওয়া হালাল হবে। এ ব্যাপারে আমাদের দলীল হলো হযরত আদী ইব্‌ন হাতিম (রা) এর বর্ণিত হাদীস।

উপরোক্ত বক্তব্যের যৌক্তিক কারণ হলো এই যে, কুকুর অথবা বাজপাখি হচ্ছে যবাহের উপকরণ। তবে শুধু উপকরণ বা অস্ত্র দ্বারা যবাহ সম্পন্ন হয়না, যতক্ষণ না কেউ তা ব্যবহার করে। আর এ দুটো প্রাণীর ব্যবহার হয় প্রেরণ করার দ্বারা। কাজেই এ প্রেরণ করাকে তীর নিক্ষেপ এবং ছুরি চালানোর স্থলাভিষিক্ত হিসাবে গণ্য করা হয়েছে।

এ কারণে শিকারী পশু ছাড়ার সময় আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে ছাড়া অপরিহার্য। যদি ভুলক্রমে কেউ বিস্‌মিল্লাহ না বলে, তবুও তা খাওয়া হালাল হবে ঐ যুক্তি ও দলীলের ভিত্তিতে, যা আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। আর যদি ইচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ করা ছেড়ে দেয়, তবে তা খাওয়া হালাল হবে না। এ সম্পর্কে যবাহ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। যাহিরী রিওয়ায়েত মতে জখম হওয়া আবশ্যক, যাতে অনন্যোপায় অবস্থায় যবাহ সাব্যস্ত হয়। আর তা হলো শিকারকৃত পশুর শরীরের যে কোন স্থানে জখম হওয়া ঐ পশুর দ্বারা, যাকে শিকারের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে বা পাঠানো হয়েছে।

সর্বোপরি কুরআন মজীদের আয়াত ঃ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ —এর মধ্যেও জখম হওয়ার শর্তের প্রতি ইশারা বিদ্যমান রয়েছে।

কেননা, جَوَارِحُ শব্দটি جَرْحٌ থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে। কোন এক ব্যাখ্যা অনুসারে এর অর্থ হলো- জখম। কাজেই এ আয়াত প্রযোজ্য হবে ঐ শিকারী পশু বা পাখির ক্ষেত্রে, যা নিজের দাঁত বা খাবার দ্বারা উপার্জন করে অর্থাৎ শিকার করে। আর جَوَارِحُ এর যে দুই অর্থ এখানে উক্ত হয়েছে كَوَاسِبُ ও اَلْجَرَاحَةُ এই দুই অর্থের মধ্যে মূলত: কোন বৈপরিত্য নেই। কাজেই তা একত্রিতও হতে পারে। বরং সমন্বয় করা হলেই ইয়াকীনী অর্থের উপর আমল হয়ে যাবে। (কোনটাই বাদ পড়বেনা।) ইমাম আবু ইউসুফ (র) হতে বর্ণিত আছে যে, জখম করা শর্ত নয়। প্রথমোক্ত অর্থের মর্মানুসারে তিনি একথা বলেছেন। এর জবাব তাই, যা আমরা পূর্বে বলেছি।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ কুকুর বা চিতা বাঘ যদি শিকারকৃত পশুর কোন অংশ খেয়ে ফেলে, তাহলে এ শিকার জন্তু খাওয়া যাবে না। আর যদি বাজপাখি শিকারকৃত পাখির কোন অংশ খেয়ে ফেলে, তাহলে তা খাওয়া যাবে। এ পার্থক্যের কারণ আমরা কুকুর ও বাজের প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়ায় উল্লেখ করেছি। হযরত আদী ইব্‌ন হাতিম (রা) এর হাদীসে উক্ত মতের প্রতি সমর্থন বিদ্যমান রয়েছে। এ হাদীসটি ইমাম মালিক (র)-এর মতের বিপরীত আমাদের পক্ষে দলীল। এমনিভাবে তা ইমাম শাফিঈ (র)-এর আগের অভিমতের বিপরীত আমাদের জন্য দলীল। তাঁরা বলেন ঃ কুকুরে খাওয়ার পরও শিকারকৃত পশু ভক্ষণ করা জাইয আছে।

কোন কুকুর যদি অনেকগুলো পশু শিকার করার পর তা থেকে কিছু না খায়, কিন্তু এর পরক্ষণেই আবার একটি শিকার করে তা থেকে কিছু খেয়ে নেয়, তবে এর শিকারকৃত পশুগুলো খাওয়া জাইয হবে না। কেননা, তার এ খাওয়া প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত না হওয়ার আলামত। অনুরূপভাবে এ শিকারী পশু এরপর যত শিকার করবে, তাও খাওয়া জাইয হবে না। যতক্ষণ না তা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সাব্যস্ত হবে ঐ মতভিন্নতার ভিত্তিতে, যা আমরা এ অনুচ্ছেদের প্রথম দিকে বর্ণনা করেছি। উল্লেখ্য যে, উক্ত শিকারী পশু পূর্বে যে সব প্রাণী শিকার করেছিল, সেগুলো থেকে যা খেয়ে ফেলা হয়েছে, তাতে হারাম হওয়ার বিষয়টি প্রকাশ পাবে না। কেননা, এ অবস্থায় হারাম সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্র শেষ

হয়ে গেছে। আর শিকারকৃত যে পশু এখনো আয়ত্তাধীন আসেনি, যেমন তা মাঠে ময়দানে পতিত অবস্থায় আছে এবং শিকারী এখনো তা ধরতে পারেনি,তাহলে এ জাতীয় পশু হারাম বলে সাব্যস্ত হবে। এতে ইমামগণ সকলেই একমত। শিকার করার পর যে পশু এখানো খাওয়া হয়নি, বরং বাড়ীতে সংরক্ষিত অবস্থায় আছে,তা সম্বন্ধে ইমামত্রয়ের মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে তা হারাম বলে গণ্য হবে। আর সাহেবাইনের মতে তা হারাম বলে গণ্য হবে না।

সাহেবাইনের দলীল হলো- শিকারী পশু শিকারকৃত পশুর কিয়দংশ খেয়ে ফেলা পূর্ববর্তী শিকারের ক্ষেত্রে জাহালাত বা অজ্ঞতা প্রমাণ করে না। কেননা, পেশা অনেক সময় ভুলিয়েও দেওয়া হয়। (অর্থাৎ ভুলেও যায়)। অধিকন্তু শিকারী ব্যক্তি শিকারকৃত যে পশু সংরক্ষণ করে নিয়েছে, তার ব্যাপারে ইজ্‌তিহাদের বা গবেষণার ভিত্তিতে একবার এক হুকুম জারী করা হয়েছে। অতএব অপর ইজ্‌তিহাদের ভিত্তিতে এ হুকুমকে নাচক করা যাবে না। কেননা, সংরক্ষণ, যা উদ্দেশ্য, তা তো প্রথম ইজ্‌তিহাদের মাধ্যমে হাসিল হয়ে গেছে। অবশ্য অসংরক্ষিত শিকারকৃত পশুর বিষয়টি এ হুকুম থেকে ব্যতিক্রম। কেননা, সার্বিক বিবেচনায় শিকারের উদ্দেশ্য হাসিল হয়নি। কারণ এটি এখনো বন্য পশু হিসাবেই আছে, কোন কোন দিক থেকে। কেননা, এটিকে এখনো হিফাযতে আনা যায়নি। তাই সতর্কতা অবলম্বনের লক্ষ্যে একে আমরা হারাম সাব্যস্ত করেছি।

আর ইমাম আবু হানীফা (র) এর দলীল হলো ঃ শিকারকৃত পশুকে খাওয়া এ কথার প্রমাণ যে, এটি সূচনা লগ্ন থেকেই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছিল না। কেননা, পেশা মূল থেকেই কেউ ভুলে যায় না। কাজেই শিকারী পশু যখন শিকারকৃত পশুর কিয়দংশ খেয়ে ফেলবে, তখন এতে এ কথা প্রমাণিত হবে যে, ইতিপূর্বে এর না খাওয়ার কারণ ছিল পেট ভর্তি থাকা। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হওয়া নয়। আর ইজ্‌তিহাদ পরিবর্তন হয়েছে উদ্দেশ্য হাসিল হওয়ার আগে। কেননা, উদ্দেশ্য তো হল খাওয়া। তাই এই (ইজ্‌তিহাদের পরিবর্তনের) বিষয়টি ফয়সালা দেওয়ার আগে বিচারকের ইজতিহাদ পরিবর্তনের ন্যায় হয়ে গেল, (এবং এমনটি হওয়া সম্ভব)।

যদি কোন 'সকর' (এক প্রকার) পাখি শিকারী ব্যক্তির নিকট থেকে কিছু সময় পালিয়ে থাকে এবং এরপর কোন কিছু শিকার করে, তবে তার শিকারকৃত প্রাণী খাওয়া জাইয হবে না। কেননা, সে (সকর) ঐ বিষয়টিকে বাদ দিয়েছে, যার দ্বারা সে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত বলে গণ্য হয়েছিল। কাজেই এ জাতীয় প্রাণীকেও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নয় বলে হুকুম দেওয়া হবে ঐ কুকুরের ন্যায়,যে কুকুর শিকারকৃত পশুর থেকে কিয়দংশ খেয়েছে।

কুকুর যদি শিকারকৃত পশুর রক্ত চুষে খায়, গোশ্‌ত না খায়, তবে ঐ শিকারকৃত পশুর গোশত খাওয়া জাইয হবে। কেননা, এ শিকারী পশু শিকারী ব্যক্তির জন্যই এটিকে ধরে এনেছে। আর এভাবে রক্ত চুষে খাওয়া বিরাট চাতুর্যের পরিচায়ক।

কেননা, সে ঐ বস্তুর (রক্ত) পান করে নিয়েছে, যা তার মনীবের জন্য জাইয নয় এবং রেখে দিয়েছে এমন জিনিস, যা তার মনীবের জন্য খাওয়া জাইয।

মনীব যদি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিকারী পশুর নিকট থেকে শিকারকৃত প্রাণী নিয়ে যায় এবং এরপর এর থেকে একটি অংশ কেটে শিকারী পশুর সামনে ছুড়ে দেয়, আর অমনি সে তা খেয়ে ফেলে, এ অবস্থায় শিকার জন্তুর অবশিষ্ট অংশ খাওয়া জাইয হবে। কেননা, এ অবস্থায় এটি আর শিকার জন্তু হিসাবে বাকী থাকলো না। এখন এটি এমন হয়ে গেল, যেন মনীব ঐ শিকারী পশুর সামনে অন্য কোন খাদ্য পরিবেশন করলো। এমনিভাবে কুকুর যদি দৌড়িয়ে এসে মনীবের হাত থেকে তা ছো মেরে নিয়ে গিয়ে এর থেকে কিছু অংশ খেয়ে ফেলে, তাহলেও উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে। কেননা, কুকুর তো শিকার জন্তুর কোন অংশ ভক্ষণ করেনি। (কাজেই তা খাওয়া হালাল হবে।) মূলত: খাওয়া হালাল হওয়ার জন্য শর্ত ছিল শিকার পশুর গোশত না খাওয়া। (তা তো এখানে পাওয়া গেছে।) এ হিসাবে বিষয়টি এমন হলো- যেন কুকুর তার মনীবের কোন একটি ছাগল ধরে নিয়ে ফেড়ে ফেললো। বস্তুত: শিকার জন্তুটিকে শিকারী পশুর নিকট থেকে মালিক তার নিজ হিফাযতে নিয়ে নেওয়ার আগে যদি তা করা হয়, তবে এর হুকুম হবে ভিন্ন। অর্থাৎ তখন তা আর খাওয়া হালাল হবে না। কেননা, তখন সামগ্রীকতার বিচারে এর মধ্যে صَيْدٌ (শিকার জন্তু) হওয়ার বিষয়টি বিদ্যমান।

যদি শিকারী কুকুর শিকার জন্তুকে কামড় দিয়ে তার থেকে এক টুকরা গোশ্ত কেটে নিয়ে আসে(কিন্তু তাকে ধরতে পারেনি) এবং তা ভক্ষণ করে, এরপর শিকারের পেছনে দৌড়িয়ে তাকে ধরে মেরে ফেলে; কিন্তু শিকারী পশু তা থেকে পুনরায় কিছু খায়, তবে এ প্রাণীটি খাওয়া যাবে না। কেননা, শিকারী পশু যেহেতু তা থেকে খেয়েছে, তাই এটি অপ্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরের শিকার বলে গণ্য হবে।

যদি শিকারী পশু কামড় দিয়ে কেটে আনা অংশটি ফেলে দিয়ে শিকারের পেছনে দৌড়ায় এবং তা মেরে ফেলে, কিন্তু এর থেকে কোন কিছু না খায়, আর এ অবস্থায় তা ধরে মালিকের কাছে নিয়ে আসে, এরপর ঐ অংশটির নিকটে গিয়ে তা ভক্ষণ করে তবে ঐ শিকার জন্তুটি খাওয়া যাবে। কেননা, এ অবস্থায় যদি শিকার পশুর থেকেও কিছু খায়, তাহলেও কোন ক্ষতি নেই। কাজেই যে অংশটি ঐ পশুর দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, যা এর মুনীবের জন্য খাওয়া হালাল নয়, তা খাওয়া প্রশ্নাতীত ভাবে জাইয। কিন্তু প্রথমোক্ত অবস্থাটি এর থেকে ব্যতিক্রম । কেননা, এখানে শিকার করা অবস্থায় শিকারী পশু শিকার জন্তু থেকে ভক্ষণ করেছে। কাজেই এতে শিকারী পশুটি অপ্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বলে বিবেচিত হবে এবং সে নিজের জন্য পশুটি ধরে এনেছে বলে মনে করা হবে। অধিকন্তু শিকারের শরীরে কামড় দেওয়া নিজে খাওয়ার জন্যও হয়ে থাকে। আবার কখনো তা এই কৌশলের জন্যও হয়ে থাকে, যাতে কিয়দংশ কর্তনের কারণে পশুটি দূর্বল হয়ে পড়ে এবং সহজে তাকে ধরা যায়। অতএব শিকার ধরার আগে খাওয়া হলে তা থেকে প্রথমোক্ত বিষয়টি প্রমাণিত হয়। আর ধরার পর খাওয়া

হলে, তা থেকে শেষোক্ত বিষয়টি প্রমাণিত হয়। আর এ অবস্থায় শিকারী পশুর অজ্ঞতা বা অপ্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হওয়া প্রমাণিত হবে না।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ শিকারী পশু প্রেরণকারী ব্যক্তি যদি শিকারটিকে জীবিত অবস্থায় পায়,তবে তার উপর ওয়াজিব হবে এটিকে যবাহ্ করা। যদি যবাহ না করে এবং তা মরে যায়, তাহলে এটিকে খাওয়া জাইয হবে না। বাজপাখি এবং তীরের শিকারের ক্ষেত্রেও এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। কেননা, বদলের দ্বারা উদ্দেশ্য হাসিলের আগে সে আসলের উপর সক্ষম হয়েছিল। কেননা, উদ্দেশ্য হলো- খাওয়া বৈধ হওয়া। আর তা মারা যাওয়ার আগে সাব্যস্ত হয় না। কাজেই বদলের হুকুম বাতিল হয়ে যাবে।

উল্লেখ্য যে, উক্ত পশু খাওয়া হালাল না হওয়ার উপরোক্ত বিধান তখনই প্রযোজ্য হবে, যদি শিকারী ব্যক্তি তা যবাহ্ করতে সক্ষম হয়। পক্ষান্তরে শিকার শিকারী ব্যক্তির হাতে পৌঁছার পর, সে যদি তা যবাহ্ করতে সক্ষম না হয়, অথচ ঐ পশুর মধ্যে যবাহকৃত পশুর হায়াতের চেয়েও অধিক সময় হায়াত বিদ্যমান ছিল, তবে যাহিরী রিওয়ায়েত অনুসারে এ পশুটি খাওয়া জাইয হবে না। আর ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে পশুটি খাওয়া হালাল হবে। এটি ইমাম শাফিঈ (র) এর অভিমত বটে। কেননা, সে মূল যবাহ এর উপর সক্ষম হয়নি। এ হিসাবে বিষয়টি এমন হলো, যেন কোন ব্যক্তি পানি দেখেছে, কিন্তু সে তা ব্যবহার করতে সক্ষম হয়নি। কাজেই তার তায়াম্মুম বাতিল হবে না। যাহিরী রিওয়ায়েতের যুক্তি হলো- এই যে, হুকুমের দিক থেকে সে (শিকারী ব্যক্তি) তার শিকারকে যবাহ করতে সক্ষম হয়েছে। কারণ مذبح (যবাহ এর ক্ষেত্রে) অর্থাৎ পশুর উপর তার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর এ নিয়ন্ত্রণ হলো যবাহ এর স্থলাভিষিক্ত বিষয়। বস্তুত: প্রকৃত সক্ষমতার বিষয়টি এখানে বিবেচনায় আনা খুবই দুস্কর ব্যাপার। কেননা, এর জন্য একটি বিশেষ সময়ের প্রয়োজন। অথচ যবাহ এর ব্যাপারে পারদর্শী হওয়া এবং বুদ্ধিমত্তার ব্যবধানের ফলে এই সময়টির ব্যাপারেও মানুষের মধ্যে বিরাট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এ কারণেই নিয়ন্ত্রণের উপরে সক্ষম হওয়া না হওয়ার বিষয়টিকে নির্ভরশীল করা হয়েছে, যেমন আমরা বিষয়টিকে পূর্বে বর্ণনা করেছি। কিন্তু যদি শিকারের মধ্যে ঐ পরিমাণ হায়াত থাকে, যে পরিমাণ হায়াত যবাহকৃত পশুতে থাকে, তবে এর বিষয়টি উক্ত হুকুম থেকে ভিন্নতর হবে। কেননা, এটি হুকুমের দিক থেকে মৃত বলে গণ্য। উল্লেখ্য যে, যদি এ অবস্থায় কোন পশু পানিতে গিয়ে পতিত হয়, তবে তা হারাম বলে গণ্য হবেনা। যেমন মৃত অবস্থায় পতিত হলে তা হারাম হিসাবে গণ্য হয় না। স্মর্তব্য যে, মৃত পশু যবাহ-এর ক্ষেত্র নয়। (তাই তাকে যবাহ করতে হবে না।)

কোন কোন ফকীহ এ মাসআলাটি আরো বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। তা হলো ঃ শিকারী ব্যক্তি যদি যবাহ্ করার অস্ত্র না থাকার কারণে পশুটি যবাহ্ করতে সক্ষম না হয়, তবে তা খাওয়া যাবে না। আর যদি সময়ের সংকীর্ণতার কারণে যবাহ্ করতে

সক্ষম না হয়, তবে আমাদের মাযহাব অনুসারে তা খাওয়া যাবে না । কিন্তু ইমাম শাফিঈ (র)-এর থেকে ভিন্নমত পোষণ করেন। কেননা, এটি তার কবজায় এসে যাওয়ার পর, আর তা শিকার হিসাবে বহাল থাকেনি। কাজেই এ ক্ষেত্রে اضطراری বা অনন্যোপায় অবস্থায় যবাহ এর হুকুম বাতিল হয়ে যাবে। আর এ হালাল না হওয়ার বিষয়টি তখনই প্রযোজ্য হবে, যদি ঐ প্রাণীটির বেঁচে থাকার সম্ভাবনা থাকে। যদি শিকারী পশু (কুকুর) শিকার কৃত প্রাণীর পেট ফেড়ে এর নাড়িভুড়ি বের করে ফেলে, তারপর তা শিকারীর হস্তগত হয়, তাহলে এটি খাওয়া হালাল হবে। কেননা, এতে (প্রাণ নেই), যা কিছু আছে তা হলো ঃ যবাহকৃত পশুর নড়াচড়ার নড়াচড়া করা। কাজেই এ নড়াচড়া করা ধর্তব্য হবে না। যেমন যবাহ করার পর কোন বকরী যদি পানিতে পতিত হয়, তবে তাতে কোন ক্ষতি হয়না। কেউ কেউ বলেন ঃ এটি সাহেবাইনের অভিমত। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে এ জাতীয় প্রাণীও খাওয়া যাবে না। কেননা, এটি জীবিত অবস্থায় শিকারীর হস্তগত হয়েছে। কাজেই ইখতিয়ারী যবাহ অর্থাৎ স্বাভাবিক অবস্থায় যে যবাহ প্রযোজ্য ব্যতীত তা হালাল হবে না। مُتَرَدِّيَةٌ (পতনে মৃত) পশুর উপর কিয়াস করে এ বিধান দেওয়া হয়েছে, যা পরে আমরা বর্ণনা করবো ইনশাআল্লাহ্। খাওয়া হালাল না হওয়ার যে বিধান আমরা বর্ণনা করেছি, তা তখনই প্রযোজ্য হবে, যদি শিকারী ব্যক্তি যবাহ করা বর্জন করে। আর শিকারী যদি সেটিকে যবাহ করে নেয়, তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে তা খাওয়া হালাল হবে। পতনে মৃতজন্তু, প্রহারে মৃতজন্তু শৃংগাঘাতে মৃতজন্তু আর নেকড়ে বাঘ যে পশুর পেট ফেড়ে দিয়েছে এবং এর মধ্যে এখনো সূক্ষ্ম হায়াত বা প্রকাশ্য হায়াত বিদ্যমান আছে। এ জাতীয় পশুর ক্ষেত্রেও উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে। (অর্থাৎ যবাহ করা গেলে তা খাওয়া হালাল হবে, অন্যথায় হারাম হবে।) আর এর উপরই ফাত্ওয়া।

কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ—তবে তোমরা যা যবাহ করতে পেরেছো, তা ব্যতীত। (৫-৩)।

এখানে যবাহ্ কৃত পশুকে আগের হুকুম থেকে পৃথক করা হয়েছে এবং এতে কোনরূপ ব্যাখ্যা ও ব্যবধান রাখা হয়নি। ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর মতে প্রাণিটি যদি এ পর্যায়ে গিয়ে পৌছে থাকে-যে, এ অবস্থায় প্রাণী বেঁচে থাকে না, তবে তা খাওয়া হালাল হবে না। কেননা, এর মৃত্যু যবাহ এর দ্বারা সংঘটিত হয়নি। আর ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন ঃ কোন প্রাণী যদি এ অবস্থায় পতিত হওয়ার পরও যবাকৃত প্রাণীর চেয়ে অধিক সময় বেঁচে থাকে, তাহলে তা খাওয়া হালাল হবে। অন্যথায় হালাল হবে না। কেননা, এ সামান্য হায়াত ধর্তব্য হবে না। যেমন আমরা পূর্বেও বর্ণনা করেছি।

যদি শিকারী ব্যক্তি শিকারকৃত জন্তুকে পাওয়া সত্ত্বেও তা না ধরে এবং এ অবস্থায় সে এমন সময় পায়, যে সময়ের মধ্যে এটিকে ধরে যবাহ করা তার জন্য সম্ভব ছিল, তাহলে এ প্রাণীকে খাওয়া যাবে না। কেননা, এটিকে যবাহ করার উপর সে সক্ষম হয়েছিল। আর ঐ সময়ের মধ্যে তার পক্ষে যবাহ করা সম্ভব না হলে, পশুটি খাওয়া জাইয হবে। কেননা, এখানে নিয়ন্ত্রণ সাব্যস্ত হয়নি এবং যবাহ

করার উপর সক্ষমতাও পাওয়া যায়নি। **যদি শিকারী ব্যক্তি শিকার জন্তুকে পাওয়ার পর তা হস্তগত করে যবাহ সম্পাদন করে নেয়, তবে তা তার জন্য খাওয়া হালাল হবে।** কেননা, যদি তার মধ্যে প্রকাশ্যভাবে বাকী থাকে তাহলে তো যবাহ যথাস্থানেই নিষ্পন্ন হয়েছে, এ বিষয়ে ফকীহগণ সকলেই একমত। আর যদি এর মধ্যে সূক্ষ্মভাবেও হায়াত বাকী থাকে তাহলেও এ অবস্থায় ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে এর হালাল হওয়ার প্রক্রিয়া হলো যবাহ করা, যা আমরা পূর্বেও উল্লেখ করেছি। আর তা পাওয়া গেছে। আর সাহেবাইনের মতে এ অবস্থায় যবাহ করা নিষ্প্রয়োজন। (কাজেই তা খাওয়া হালাল হবে।)

শিকারী ব্যক্তি তার কুকুরটিকে একটি নির্দিষ্ট শিকারের উদ্দেশ্যে ছেড়েছিল, কিন্তু শিকারী জন্তু শিকার করেছে অপর একটিকে, তাহলে সেটিকে খাওয়া হালাল হবে। ইমাম মালিক (র) বলেন ঃ হালাল হবে না। কেননা, কুকুরটি প্রেরণ করা ব্যতিরেকে শিকার করেছে। কেননা, যে পশুর দিকে ইশারা করা হয়েছে, তার জন্যই তাকে প্রেরণ করা হয়েছে।

আমাদের দলীল হলো ঃ নির্দিষ্ট পশু শিকার করার বিষয়টি এমন একটি শর্ত -যা অনর্থক–যাতে কোন ফায়দা নেই। কেননা, তার উদ্দেশ্য হলো, পশু শিকার করা। কারণ শিকারী কুকুর ঐ শর্ত পূরা করতে সক্ষম নয়। কেননা, শিকারী পশুকে এ ভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া আদৌ সম্ভব নয় যে, সে কেবল নির্দিষ্ট পশুকেই শিকার করবে। কাজেই এ জাতীয় শর্ত ধর্তব্য হবে না।

কেউ যদি একবার বিস্‌মিল্লাহ পড়ে অনেকগুলো শিকার জন্তুর উদ্দেশ্যে শিকারী কুকুর ছাড়ে এবং এই কুকুর যদি ঐ সবগুলো শিকার জন্তুকেই মেরে ফেলে, তাহলে এই একবার বিস্‌মিল্লাহ পড়ার দ্বারাই ঐ সবগুলো খাওয়া হালাল হবে। কেননা, এই ছাড়া বা প্রেরণ করার দ্বারাই যবাহ নিষ্পন্ন হয়ে যায় ঐ বর্ণনা মুতাবিক, যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। এ কারণেই প্রেরণ করার সময় বিস্‌মিল্লাহ বলা শর্ত। আর এই প্রেরণ করা যেহেতু ক্রিয়া হিসাবে একটিই, কাজেই একবার বিস্‌মিল্লাহ বলাই যথেষ্ট হবে। কিন্তু একবার বিস্‌মিল্লাহ বলে বকরী যবাহ করার বিষয়টি এর থেকে ব্যতিক্রম। কেননা, দ্বিতীয় বকরীটি যবাহকৃত হয়েছে এমন ক্রিয়ার দ্বারা, যা প্রথমটি থেকে ভিন্নতর। অতএব এ ক্ষেত্রে আরেকবার বিস্‌মিল্লাহ পড়া আবশ্যক। এ কারণেই কেউ যদি একটি বকরীর উপর আরেকটিকে শুইয়ে একবার বিস্‌মিল্লাহ বলে উভয়টিকে একত্রে যবাহ করে দেয়, তবে এক বিস্‌মিল্লাহ দ্বারাই উভয়টি হালাল হয়ে যাবে।

কেউ যদি শিকার করার উদ্দেশ্যে চিতাবাঘ ছাড়ে, এরপর তা কিছুক্ষণ ওঁত পেতে থেকে শিকার করতে সক্ষম হয় এবং শিকার জন্তুকে ধরে সেটিকে মেরে ফেলে, তাহলে এটিকে খাওয়া যাবে। কেননা, এর এভাবে কিছু সময় থেমে থাকা শিকার ধরার একটি কৌশল। এটি আরাম হাসিল করা নয়। কাজেই এটি প্রেরণ থেকে বিচ্ছিন্নতা বলে গণ্য হবে না। এমনিভাবে কুকুরও যদি চিতা বাঘের অভ্যাসে অভ্যস্ত হয়ে যায়, তবে এ ক্ষেত্রেও উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে।

কুকুর যদি কোন একটি শিকার ধরে তাকে মেরে ফেলে আর তার মালিকই তাকে শিকারের উদ্দেশ্যে ছেড়েছিল, তাহলে উভয় পশুকেই খাওয়া হালাল হবে। কেননা, মালিক কর্তৃক তাকে ছাড়ার বিষয়টি এখনো অবশিষ্ট আছে, শেষ হয়নি। মূলত এটি এমন হলো যে, কোন ব্যক্তি শিকারের উদ্দেশ্যে কোন তীর নিক্ষেপ করলো, এর পর ঐ তীর নির্দিষ্ট পশুর গায়ে গিয়ে বিদ্ধ হল এবং আরো একটির গায়ে বিদ্ধ হলো(তাহলে উভয়টিই খাওয়া যাবে।)

কুকুর যদি কোন একটি শিকার জন্তুকে মারার পর দিনের দীর্ঘ সময় সেটির উপর জেঁকে বসে থাকে, তারপর যখন আরেকটি শিকার তার নিকট দিয়ে যেতে আরম্ভ করে, তখন অমনি সে এর উপর আক্রমণ করে তাকেও মেরে ফেলে, তাহলে দ্বিতীয় টিকে খাওয়া যাবে না। কেননা, দীর্ঘক্ষণ থেমে থাকার কারণে পূর্ববর্তী প্রেরণ বিছিন্ন হয়ে গেছে। কারণ এটিকে শিকার ধরার কৌশল হিসাবে গণ্য করা যায় না, বরং এটি আরাম হাসিল করার মধ্যে গণ্য। কিন্তু পূর্ববর্তী মাসআলাটি এর থেকে ব্যতিক্রম।

শিকারের উদ্দেশ্যে কেউ যদি তার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বাজপাখি ছাড়ে, এরপর তা যদি কোন কিছুর উপর পতিত হয় অর্থাৎ কোন কিছুর উপর বসে, এরপর শিকারের পেছনে ছুটে এবং তাকে মেরে ফেলে,তবে তা খাওয়া যাবে। এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে, যদি সে আরাম হাসিলের জন্য এভাবে দীর্ঘ সময় বসে না থাকে; বরং শিকারের উদ্দেশ্যে সামান্য কিছু সময় এভাবে ওঁত পেতে থাকে। কুকুরের আলোচনার ক্ষেত্রে এ সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

যদি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কোন বাজপাখি শিকার জন্তুকে ধরে একে মেরে ফেলে, কিন্তু এর সম্পর্কে একথা নিশ্চিত জানা না থাকে যে, এটিকে কোন মানুষ প্রেরণ করেছে কি-না, তাহলে এর শিকারকৃত বস্তুটি খাওয়া যাবে না। কেননা এর প্রেরণের ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে। অথচ প্রেরণ ছাড়া কোন পশু খাওয়া বৈধ হয় না।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ কুকুর যদি কোন পশুকে ধরে একে শ্বাসরোধ করে মেরে ফেলে, কিন্তু জখম না করে, তবে তা খাওয়া জাইয হবে না। কেননা যাহিরী রিওয়ায়েত অনুসারে জখম করা হচ্ছে শর্ত—যেমন আমরা এ সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করেছি। উপরোক্ত আলোচনা থেকে একথা প্রমাণিত হয় যে, যদি পশুর কোন অঙ্গ ভেঙ্গে ফেলা হয়, তবে এতে তা হালাল হবে না। ইমাম আবু হানীফা (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, শিকারী পশু যদি শিকার জন্তুর কোন অঙ্গ ভাঙ্গে, এরপর তাকে হত্যা করে তবে, তা খাওয়াতে কোন দোষ নেই। কেননা এটি বাতিনী জখমী। আর হুকুমের দিক থেকে বাতিনী জখমও যাহিরী জখমের অনুরূপ।

যাহিরী রিওয়ায়েতের যুক্তি হলো ঃ শরীআতে এমন জখম করাই ধর্তব্য, যা রক্ত প্রবাহিত করার কারণ হিসাবে গণ্য হয়ে থাকে। আর এটি অঙ্গ ভাঙ্গার মাধ্যমে হাসিল হয় না। কাজেই এটি শ্বাসরোধে মারার অনুরূপ বলে গণ্য হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ যদি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরের সাথে অপ্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর অথবা অগ্নিপূজকের কুকুর অথবা যে কুকুরের উপর বিস্‌মিল্লাহ বলা হয়নি

এমন কোন কুকুর শরীক হয়, তবে শিকারকৃত পশু খাওয়া যাবে না। এক্ষেত্রে বিস্‌মিল্লাহ না বলার মর্ম হলো—ইচ্ছাকৃতভাবে বিস্‌মিল্লাহ না বলা। খাওয়া জাইয না হওয়ার দলীল হলো ঐ হাদীস, যা আমরা হযরত 'আদী ইব্‌ন হাতিম (রা) এর সূত্রে বর্ণনা করেছি। অধিকন্তু এক্ষেত্রে মুবাহ সাব্যস্তকারী ও হারাম সাব্যস্তকারী বিষয় একত্রিত হয়েছে। কাজেই হারামের বিষয়টিকে প্রাধান্য দেওয়া হবে দলীলের কারণে এবং সতর্কতাহেতু।

যদি দ্বিতীয় কুকুরটি শুধুমাত্র শিকারজন্তুকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরের নিকট হাঁকিয়ে নিয়ে যায়, প্রশিক্ষণপ্রাপ্তটির সাথে শিকারকে জখম না করে, বরং পশুটি প্রথমটির জখমের কারণে মারা যায়, তবে তা খাওয়া মাকরূহ হবে। কেননা শিকার জন্তুকে ধরার মধ্যে অংশীদারীত্ব আছে, কিন্তু জখম করার মধ্যে কোন অংশীদারীত্ব নেই। পক্ষান্তরে যদি কোন অগ্নিপূজক ব্যক্তি শিকার জন্তুকে হাঁকিয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরের নিকট নিয়ে যায়, তবে তা খাওয়া মাক্‌রূহ হবে না। কেননা অগ্নিপূজক ব্যক্তির কাজ কুকুরের কর্ম জাতীয় কোন কাজ নয়। কাজেই এক্ষেত্রে অংশীদারীত্ব সাব্যস্ত হবে না। কিন্তু যদি দুই কুকুর শিকার কার্য সম্পন্ন করে, তবে এরা যেহেতু সমজাতীয় জন্তু, এ কারণে এক্ষেত্রে অংশীদারীত্ব সাব্যস্ত হবে।

যদি দ্বিতীয় কুকুরটি প্রথমটির দিকে শিকার জন্তুকে হাঁকিয়ে নিয়ে না যায় বরং সে প্রথমটির দিকে দ্রুত ছুটে যায়,[১] এরপর প্রথমটি দ্রুত দৌড়িয়ে শিকার জন্তুকে ধরে তা মেরে ফেলে, তাহলে ঐ শিকারকৃত পশু খাওয়াতে কোন দোষ নেই। কেননা দ্বিতীয় কুকুরটির কর্মকাণ্ড শিকারের উদ্দেশ্যে প্রেরিত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরটির মধ্যে তো প্রভাব সৃষ্টি করেছে, কিন্তু শিকার জন্তুর মধ্যে কোন পভবাব সৃষ্টি করেনি। কেননা দ্বিতীয় কুকুরের দ্রুত দৌড়ানোর কারণে প্রথমটির মধ্যে পাওয়ার চাহিদা অধিক বেড়ে গেছে। কাজেই দ্বিতীয় কুকুরটির দ্রুত দৌড়ানোর বিষয়টি প্রথমটির অনুগামী বলে গণ্য হবে। কারণ দ্বিতীয়টির এ দ্রুত দৌড়ানো প্রথমটির উপর ভিত্তি করে সূচিত হয়েছে। কাজেই শিকার জন্তুকে ধরে আনার বিষয়টি অনুগামী পশুর দিকে সম্বন্ধযুক্ত হবে না। পক্ষান্তরে দ্বিতীয়টি যদি শিকার জন্তুকে প্রথমটির দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যায়, তবে এ বিষয়টি উপরোক্ত মাসআলা থেকে ব্যতিক্রম হবে। কেননা এ অবস্থায় এটি আর অনুগামী থাকবে না, বরং এ অবস্থায় শিকার কর্ম উভয়টির সাথে সম্বন্ধযুক্ত হবে।

ইমাম মুহাম্মদ (র) 'জামে সগীর' গ্রন্থে বলেন ঃ কোন ব্যক্তি শিকারের উদ্দেশ্যে তার কুকুরটি ছাড়ার পর কোন অগ্নিপূজক ব্যক্তি যদি একে তাড়া দেয় এবং তাড়া খেয়ে তা যদি আরো দৌড়ায় (এরপর কোন পশু শিকার করে) তবে তার শিকারকৃত পশু খাওয়াতে কোন দোষ নেই। এখানে زَجْر বা তাড়া দেওয়া দ্বারা

১. যেমন কেউ তার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরটি শিকারের উদ্দেশ্যে ছাড়লো। এরপর তা দৌড়াতে আরম্ভ করলে আরেকটি অপ্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর তার পেছনে ছুটলো। ফলে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরটি আরো দ্রুত দৌড়িয়ে গিয়ে শিকারটিকে ধরে ফেললো।

উদ্দেশ্য হলো, হাঁক দিয়ে কুকুরকে উসকিয়ে দেওয়া এবং إِنْزِجَارْ। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, আরো বিপুল উৎসাহে শিকারজন্তু তালাশ করা।

উপরোক্ত বিধানের যুক্তি হলো এই যে, একটি কর্ম রহিত হয় অপর কোন শক্তিশালী বা এর সম পর্যায়ের অপর কোন কর্মের দ্বারা। যেমন কুরআন মজীদের কোন আয়াত রহিত হওয়ার ক্ষেত্রে বিধান রয়েছে। আর তাড়া দেওয়ার বিষয়টি প্রেরণ করা থেকে নিম্নমানের কাজ। কেননা তাড়া দেওয়ার বিষয়টি প্রেরণ করার উপর নির্ভরশীল।

ইমাম মুহাম্মদ (র) 'জামে সগীর' গ্রন্থে বলেন ঃ যদি কোন অগ্নিপূজক ব্যক্তি শিকারের উদ্দেশ্যে কুকুর প্রেরণ করার পর, অপর কোন মুসলিম ব্যক্তি ঐ কুকুরকে তাড়া করে এবং তাড়া খেয়ে ঐ কুকুর দৌড়াতে আরম্ভ করে (এবং পরে কোন পশু শিকার করে); তবে এর শিকারকৃত পশু খাওয়া যাবে না। কেননা তাড়া করা প্রেরণ করার থেকে নিম্নমানের কাজ। এ কারণেই এর দ্বারা কোন কিছু হারাম হওয়ার সন্দেহ সাব্যস্ত হয় না। কাজেই এর দ্বারা হালাল হওয়ার বিষয়টিও সাব্যস্ত হবে না। যে ব্যক্তির যবাহ জাইয নয়, সে এক্ষেত্রে অগ্নিপূজকের অনুরূপ। যেমন মুরতাদ, মুহরিম এবং ইচ্ছাকৃতভাবে বিসমিল্লাহ বর্জনকারী ব্যক্তি।

শিকারের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তি কুকুর ছাড়েনি (বরং কুকুর নিজে নিজেই ছুটে গিয়েছে), এ জাতীয় কোন কুকুরকে কোন মুসলিম ব্যক্তি যদি তাড়া করে এবং তাড়া খেয়ে সেটি যদি আরো দ্রুত দৌড়িয়ে যায় এবং শিকার ধরে নিয়ে আসে, তবে তা খাওয়াতে কোন দোষ নেই। কেননা তাড়া করা নিজে নিজে ছুটে যাওয়ার মতই। কেননা তাড়া করা যদিও নিজে নিজে ছুটে যাওয়া থেকে নিম্ন পর্যায়ের কাজ, এ হিসাবে যে, তাড়া করা, নিজে নিজে ছুটে যাওয়ার উপর নির্ভরশীল, কিন্তু এটি আবার নিজে নিজে ছুটে যাওয়ার থেকে উঁচু পর্যায়ের কাজও বটে এ হিসাবে যে, তাড়া করা মূলত: শরী'আতের বাধ্য-বাধকতার আওতাভুক্ত ব্যক্তির কাজ। এই হিসাবে তাড়া করা, নিজে নিজে ছুটে যাওয়া উভয়টি সম-পর্যায়ের কর্মরূপে গণ্য। কাজেই তাড়া করা নিজে নিজে ছুটে যাওয়ার জন্য রহিতকারী হতে পারে।

যদি কোন মুসলমান বিস্‌মিল্লাহ্ বলে শিকারের উদ্দেশ্যে তার কুকুরটি ছাড়ে, এরপর তা শিকারজন্তুকে ধরে একে আঘাত করে দুর্বল করে দেয়। তারপর একে পুনরায় আঘাত করে মেরে ফেলে, তাহলে সেটিকে খাওয়া জাইয হবে। এমনিভাবে কেউ দু'টি কুকুর ছাড়ার পর যদি প্রথমে একটি গিয়ে শিকার জন্তুকে ধরে এনে একে দুর্বল করে, তারপর দ্বিতীয়টি গিয়ে একে মেরে ফেলে, তাহলেও তা খাওয়া যাবে। কেননা একবার জখম করার পর পুনরায় জখম করা থেকে নিবৃত্ত থাকা প্রশিক্ষণ দানের আওতাভুক্ত নয়। কাজেই একে ওযর হিসাবে গণ্য করা হবে।

যদি দুই ব্যক্তির প্রত্যেকেই একটি করে কুকুর ছাড়ে এবং এদের একটি গিয়ে প্রথমে শিকারজন্তুকে দুর্বল করে, তারপর অন্যটি গিয়ে সেটিকে মেরে ফেলে, তাহলেও তা খাওয়া জাইয হবে, এর কারণ আমরা পূর্বেই বর্ণনা করেছি। তবে

এক্ষেত্রে মালিকানা প্রথমজনের জন্য সাব্যস্ত হবে। কেননা মূলত: **প্রথম** ব্যক্তি একে শিকারজন্তু হওয়া থেকে বের করে দিয়েছে। তবে দ্বিতীয় ব্যক্তির পক্ষ থেকেও শিকারের প্রতি প্রেরণ করা পাওয়া গেছে। কিন্তু বৈধতা ও অবৈধতার ক্ষেত্রে প্রেরণ করার অবস্থাটিই ধর্তব্য হয়ে থাকে। কাজেই পশুটি হারাম বলে সাব্যস্ত হবে না। পক্ষান্তরে প্রথম কুকুর কর্তৃক জখমের কারণে পশু শিকার জন্তু হওয়া থেকে বের হয়ে যাওয়ার পর, যদি দ্বিতীয় ব্যক্তির পক্ষ থেকে প্রেরণ করা পাওয়া যায়, তবে এর হুকুম হবে ভিন্নতর।

পরিচ্ছেদ ঃ তীর নিক্ষেপ করার মাসাইল

হিদায়া গ্রন্থকার শায়খ বুরহান উদ্দীন (র) বলেন ঃ কেউ যদি কোন কিছুর আওয়াজ শুনতে পেয়ে মনে করে যে, এটি শিকারের আওয়াজ; এরপর এর প্রতি তীর নিক্ষেপ করে বা নিজের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর অথবা বাজপাখি ছাড়ে, তারপর সেটি গিয়ে শিকার জন্তু পায়, এরপর একথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, এটি শিকারের আওয়াজই ছিল, তাহলে শিকারকৃত পশু হালাল বলে গণ্য হবে। তা যেকোন পশুই হোক না কেন। কেননা সে শিকারের উদ্দেশ্যেই এগুলো করেছে।

হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (র) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি এ হুকুম থেকে শূকরের বিষয়টিকে পৃথক করে দেখেন। কেননা এর হারাম হওয়ার বিষয়টি খুবই মারাত্মক ও জঘন্য। উল্লেখ্য যে, কোন অবস্থাতেই এর কোন অংশে বৈধতা সাব্যস্ত হয় না। কিন্তু হিংস্র প্রাণীর বিষয়টি এর থেকে ব্যতিক্রম। কেননা শিকার কর্ম হিংস্র প্রাণীর চামড়ায় প্রভাব বিস্তার করে।

আর ইমাম যুফার (র) যে সব প্রাণীর গোশত খাওয়া জাইয নেই সেগুলোকেও এর থেকে খাস করে (ভিন্ন করে) থাকেন। কেননা যেসব পশুর গোশত খাওয়া জাইয নয়, তার প্রতি শিকারী পশু খাওয়া বৈধ করার জন্য ছাড়া হয় না।

যাহিরী রিওয়ায়েতের যুক্তি হলো ঃ 'শিকার করা' শব্দটি যে সব প্রাণী খাওয়া বৈধ তার সাথে খাস নয়। বরং যে কোন প্রাণীই শিকার করা হোক, একে শিকার করা বলা হবে। আর এ কাজটি মূলত: মুবাহ। তবে খানা মুবাহ হওয়ার বিষয়টি ক্ষেত্র বা শিকারকৃত পশুর সাথে সংশ্লিষ্ট হবে। গোশত এবং চামড়ার ব্যাপারে ক্ষেত্র যতটুকুকে কবুল করবে, ততটুকুই মুবাহ বলে গণ্য হবে। আর ক্ষেত্র কবুল না করলে বৈধতা এর সাব্যস্ত হবে না। যখন এ কাজটি শিকার হিসাবে গণ্য হবে, তখন এটি এমন হবে, যেন কেউ কোন শিকারের প্রতি তীর নিক্ষেপের পর তা অন্য কোন শিকারের গায়ে গিয়ে পড়লো।

পরে যদি এ কথা প্রকাশ পায় যে, এটি মানুষের আওয়াজ বা গৃহপালিত কোন পশুর আওয়াজ ছিল, তবে শিকারকৃত পশু খাওয়া হালাল হবে না। কেননা উপরোক্ত কাজ শিকার হিসাবে গণ্য হবে না। যেসব পাখি ঘরে বাসা তৈরী করে ঘরেই থাকে, সেগুলো গৃহপালিত পাখি হিসাবে গণ্য হবে। এমনিভাবে যে হরিণ ঘরের মধ্যে বাঁধা থাকে, তাও গৃহপালিত পশু হিসাবে গণ্য হবে। এর কারণ আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি।

কেউ কোন পাখির দিকে তীর নিক্ষেপ করার পর, তা অন্য পাখির গায়ে গিয়ে পড়লো; আর যেটির দিকে তীর নিক্ষেপ করা হয়েছিল, সেটি উড়ে গেল; কিন্তু এটি বন্য পাখি ছিল কি-না তা জানা নেই, তাহলে শিকারকৃত পাখিটি খাওয়া হালাল হবে। কেননা বাহ্যিক দৃষ্টিতে একথাই ধরে নেওয়া হবে যে, এটি বন্য পাখিই ছিল। উটের প্রতি তীর নিক্ষেপ করার পর, তীর যদি কোন শিকার জন্তুর গায়ে গিয়ে বিদ্ধ হয়; এ অবস্থায় যদি এ কথা জানা না থাকে যে, উটটি পালিয়ে গিয়েছিল কিনা, তাহলে শিকার জন্তুটি খাওয়া হালাল হবে না। কেননা উটের ক্ষেত্রে আসল হলো তা পোষা হওয়া। মাছ অথবা পঙ্গপালের উদ্দেশ্যে তীর নিক্ষেপ করার পর তা যদি শিকারের গায়ে যেয়ে বিদ্ধ হয়, তবে ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর এক বর্ণনা মতে তা খাওয়া হালাল হবে। কেননা এটিও একটি শিকার জন্তু। তাঁর অন্য বর্ণনা মতে হালাল হবে না। কেননা এগুলো যবাহ করা যায় না।

কেউ কোন কিছুর আওয়াজ শুনার পর এটিকে মানুষের আওযাজ মনে করেছিল। তা সত্ত্বেও সে এর প্রতি তীর নিক্ষেপ করে পরে দেখলো যে, এটি একটি শিকার জন্তু, তবে শিকার করার পর তা খাওয়া হালাল হবে। কেননা শিকার নির্দিষ্ট হয়ে যাওয়ার পর ধারণার বিষয়টি ধর্তব্য হবে না।

কেউ যদি বিস্‌মিল্লাহ বলে তীর নিক্ষেপ করে, তবে এর মাধ্যমে যা কিছু শিকার হবে; তা খাওয়া জাইয হবে—যদি এই তীরের দ্বারা **শিকার জন্তুর শরীরে জখম হয় এবং এতে তা মারা যায়।** কেননা সে তীর নিক্ষেপ করে যবেহকারী হয়েছে। কারণ তীরও যবাহ করার অস্ত্র। কাজেই তীর নিক্ষেপের সময় বিস্‌মিল্লাহ বলা শর্ত। উল্লেখ্য যে, এ জাতীয় যবাহ এর জন্য পশুর গোটা শরীরই হচ্ছে ক্ষেত্র। আরো উল্লেখ্য যে, এক্ষেত্রে পশুর শরীরে জখম হওয়া অপরিহার্য, যাতে যবাহ এর অর্থ (দিকটি) পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হয় ঐ ব্যাখ্যার ভিত্তিতে, যা আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ শিকারী ব্যক্তি যদি শিকার জন্তুকে জীবিত অবস্থায় পায়, তবে সে তা যবাহ করবে। এ মাসআলাটি আমরা প্রথম অনুচ্ছেদে বিস্তারিতভাবে ইমামগণের মতভেদসহ বর্ণনা করেছি। সুতরাং এখানে আর এর পুনরুল্লেখ করবো না।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ শিকার জন্তুর গায়ে তীর পতিত হওয়ার পর, তা যদি তীরসহ পালিয়ে দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়, এদিকে শিকারী ব্যক্তি যদি সর্বদা এর তালাশে থাকে, তারপর এটিকে মৃত অবস্থায় পায়, তাহলে তা খাওয়া যাবে। আর যদি সে তালাশ না করে বসে থাকে, তারপর মৃত অবস্থায় পায়, তবে তা খাওয়া যাবে না। কেননা নবী করীম (সা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তীর নিক্ষেপকারী শিকারী থেকে যদি শিকার জন্তু অদৃশ্য হয়ে যায় (এরপর তা পাওয়া যায়), তবে তিনি তা খাওয়াকে অপসন্দ করেছেন এবং বলেছেন ঃ সম্ভবত: যমীনের কীট-পতঙ্গ অথবা জীব-জানোয়ার একে হত্যা করেছে।

অধিকন্তু অন্য কারণেও পশুটি মারা যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কাজেই তা খাওয়া হালাল হবে না। কেননা এ ক্ষেত্রে সন্দেহযুক্ত বিষয়টি নিশ্চিত বিষয়ের অনুরূপ বলে গণ্য

হবে না। এর কারণ সেটিই, যা আমরা বর্ণনা করেছি। **তবে শিকারী ব্যক্তি যতদিন পর্যন্ত এর তালাশে থাকবে, ততদিন পর্যন্ত এ সন্দেহযুক্ত বিষয়টি ধর্তব্য হবে না;** এই প্রয়োজনীয়তার কারণে যে, কোন শিকার কর্মই এর থেকে খালি হয় না। **পক্ষান্তরে শিকারী ব্যক্তি যদি পশুটি তালাশ করা বাদ দিয়ে বসে থাকে; তবে এ ক্ষেত্রে কোন প্রয়োজন নেই বিধায় এ অবস্থায় শিকারকৃত পশুটি হালাল হবে না।** কেননা ঐ আত্মগোপন থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব, যার সুযোগ শিকারীর কর্মের দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে। আর যে হাদীসটি আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছিঃ لَعَلَّ هَوَامَّ الْاَرْضِ قَتَلَتْهُ তা ইমাম মালিক (র) এর বিপরীতে আমাদের জন্য দলীল। তিনি বলেনঃ শিকারকৃত পশু যদি শিকারী ব্যক্তির থেকে অদৃশ্য হয়ে যায় এবং এ অবস্থায় যদি এক রাত অতিবাহিত না হয়, তবে তা খাওয়া হালাল হবে। আর যদি রাত অতিবাহিত হয়ে যায়, তবে তা হালাল হবে না। **যদি শিকার পশুর মধ্যে তীরের জখম ছাড়া ভিন্ন কোন জখম পাওয়া যায়, তবে তা খাওয়া হালাল হবে না।** কেননা এটি সন্দেহযুক্ত বিষয়। এর থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব। কাজেই তা হারাম বলে গণ্য হবে। আর জীব-জানোয়ার কর্তৃক শিকার পশুকে মারার সন্দেহের বিষয়টি পূর্ববর্তী মাসআলা থেকে ব্যতিক্রম। পূর্বোক্ত যাবতীয় মাসআলায় তীর নিক্ষেপের যে বিধি-বিধান, কুকুর ছাড়ার ক্ষেত্রেও বিধি বিধান তাই।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ শিকার জন্তুর প্রতি তীর নিক্ষেপের পর (তীর বিদ্ধ হয়ে) তা যদি পানিতে পতিত হয় অথবা ঘরের ছাদ কিংবা পাহাড়ে যেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে, তারপর সেখান থেকে মাটিতে পতিত হয়, তবে এ পশু খাওয়া জাইয হবে না। কেননা এটি পতনে মৃত পশু, যা কুরআন মজীদে স্পষ্টভাবে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। অধিকন্তু এতে সম্ভাবনা আছে যে, এটি তীর ছাড়া অন্য কোন কারণে মারা গেছে। কেননা পানিও কোন কোন ক্ষেত্রে জীবন বিনাশকারী হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে কোন পশু যদি উপর থেকে নীচে পতিত হয়ে মারা যায়, তবে এ ক্ষেত্রেও উক্ত বিধান প্রযোজ্য হবে। হযরত আদী ইব্‌ন হাতিম (রা) কর্তৃক বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীসেও এর প্রতি সমর্থন রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন ঃ

وَاِنْ وَقَعَتْ رَمِيَّتُكَ فِى الْمَاءِ فَلاَ تَأْكُلْ فَاِنَّكَ لاَتَدْرِى اَنَّ الْمَاءَ قَتَلَهُ اَوْ سَهْمُكَ ـ

–যদি তোমার তীর বিদ্ধ শিকার গিয়ে পানিতে পতিত হয়, তবে তুমি তা খেতে পারবে না। কেননা তোমার জানা নেই যে, এটিকে পানি মেরেছে, না-কি তোমার তীর মেরেছে।

যদি তীর বিদ্ধ শিকার প্রথমেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ে, তবে তা খাওয়া জাইয হবে। কেননা এর থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে যদি মাটিয়ে লুটিয়ে পড়তে পারবে না এর শর্ত আরোপ করা হয়, তবে শিকার করার বিষয়টি মূলেই বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু পূর্বোক্ত মাসআলাটি এর থেকে ব্যতিক্রম। কেননা এ সবের থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব।

আর এ সম্বন্ধে মূলনীতি হলো যদি হালাল হওয়া এবং হারাম হওয়া উভয়টির কারণ কোন অবস্থায় যুগপৎ ভাবে পাওয়া যায় এবং এ ক্ষেত্রে হারাম হওয়ার বিষয়টি থেকে যদি বেঁচে থাকা সম্ভব হয়, তাহলে সতর্কতা হেতু হারাম হওয়ার দিকটিকে প্রধান্য দেওয়া হবে। আর যদি এমন হয় যে, এর থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়, তবে এর হওয়াকে না হওয়া গণ্য করা হবে। (তখন শিকার পশুটি খাওয়া জাইয হবে।) কেননা সামর্থ্য ও সাধ্য অনুপাতেই বান্দার উপর শরী'আতের বিধি-বিধান আরোপ করা হয়।

যে যে অবস্থা থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব (সে সে ক্ষেত্রে পশুটি হারাম বলে গণ্য হবে)। যেমন কোন শিকার পশুর প্রতি তীর নিক্ষেপের পর যদি তা প্রথমে কোন গাছ বা দেয়াল কিংবা কোন পাকা ইটের উপর পতিত হয়, তারপর পুনরায় মাটির উপর লুটিয়ে পড়ে, অথবা শিকারী ব্যক্তি পাহাড়ের উপর থেকে তীর নিক্ষেপ করলো, এরপর শিকার জন্তুটি এক স্থান থেকে অন্য স্থানে এবং সেখান থেকে মাটিতে গিয়ে পতিত হলো অথবা শিকারী ব্যক্তি কোন পশুর দিকে তীর নিক্ষেপ করার পর তা কোন দাঁড় করানো বর্শা বা খাড়া করা বাঁশ অথবা ইটের এক প্রান্তের উপর গিয়ে পড়লো। (উপরোক্ত অবস্থাসমূহে পশুটি হারাম বলে গণ্য হবে।) কেননা (উপরোক্ত অবস্থা সমূহে) সম্ভাবনা রয়েছে যে, এ সব জিনিসের ধারাল অংশ পশুটিকে মেরে ফেলেছে।

আর যে যে অবস্থা থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়, যেমন শিকার পশু জমির উপর গিয়ে পতিত হলো, যেমনটি আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি অথবা এমন জিনিসের উপর গিয়ে পতিত হলো, যা জমির অনুরূপ; যেমন পাহাড়, ঘরের ছাদ, মাটিতে রক্ষিত কাঁচা ইট অথবা বড় কোন পাথরস এবং এরপর পশুটি এর উপরই স্থির থাকলো (তাহলে এ অবস্থায় পশুটি খাওয়া হালাল হবে)। কেননা পশুর এ সব জিনিষের উপর পতিত হওয়া এবং মাটির উপর পতিত হওয়া উভয়ই সমান।

'মুন্‌তাকা' গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, তীর নিক্ষেপের পর যদি পশুটি কোন পাথরের উপর গিয়ে পতিত হয় এবং এতে এর পেট ফেটে যায়, তবে তা খাওয়া জাইয হবে না। কেননা এটি অন্য কারণে মরারও সম্ভাবনা রয়েছে। হাকিম শহীদ (র) এর মতটিকে সহীহ অভিমত হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি মাবসূত গ্রন্থের শর্তহীন বর্ণনাকে পেট না ফাটার অবস্থার উপর প্রয়োগ করেছেন। আর শামসুল আইম্মা সারাখ্‌সী (র) বলেনঃ হাকিম শহীদ (র) এর অভিমতটি ঐ অবস্থায় প্রযোজ্য যখন পাথরের ধারাল অংশ পশুর গায়ে লেগে এর পেট ফেটে যায়। আর সারাখ্‌সী (র) বলেনঃ মাবসূতের বর্ণনাটি ঐ অবস্থায় প্রযোজ্য হবে, যদি পশুর গায়ে ঐ পরিমাণ আঘাত লাগে যেরূপ আঘাত লাগে মাটিতে পতিত হলে, যদি তা মাটিতে পতিত হয়। এ পরিমাণ আঘাত মাফ। আর এটিই বিশুদ্ধতম অভিমত।

জলচর পাখির প্রতি তীর নিক্ষেপের পর এর জখমকৃত অংশ যদি পানিতে ডুবে না যায়, তবে তা খাওয়া যাবে। আর যদি ডুবে যায়, তবে খাওয়া যাবে না। যেমন ভূচর পাখি আঘাত প্রাপ্ত হয়ে পানিতে পড়ে গেলে তা খাওয়া যায় না।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ তীরের পার্শ্বের আঘাতে যে শিকার আঘাত প্রাপ্ত হয় তা খাওয়া যাবে না। কিন্তু এতে যদি পশুর শরীর ক্ষত হয়ে যায়, তাহলে তা খাওয়া যাবে। কারণ নবী করীম (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ

مَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْ وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلْ ·

–তীরের ধারাল অংশের দ্বারা যেটি নিহত হয়েছে, সেটি খাও। আর ফলকের বাটের আঘাতে যেটি নিহত হয়েছে, তা খেয়ো না।

অধিকন্তু শিকারকৃত পশুর মধ্যে জখম হওয়া অবশ্যক যাতে যবাহ এর অর্থ প্রমাণিত হয়। যেমন আমরা পূর্বেও তা বর্ণনা করেছি।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ বন্দুকের গুলীতে শিকার করার পর পশুটি যদি মারা যায়, তবে তা খাওয়া জাইয হবে না। কেননা, গুলী পশুকে ছিন্নভিন্ন করে দেয় এবং এর হাড় ইত্যাদি ভেঙ্গে দেয়; কিন্তু জখম করে না। কাজেই বন্দুকের গুলীতে নিহত পশু, তীরের বাঁটের আঘাতে নিহত পশুর মত বলেই গণ্য হবে, যদি তা ভেতরে না ঢোকে। এমনিভাবে (খাওয়া যাবে না) যদি পাথর নিক্ষেপ করে শিকার জন্তুকে মারা হয়। অনুরূপভাবে (খাওয়া যাবে না) যদি প্রস্তর নিক্ষেপ করে শিকারকে জখম করা হয়। ফকীহগণ বলেনঃ এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে, যদি পাথরটি ভারী হয় এবং ধারালও হয়। কেননা, এ ক্ষেত্রে সম্ভাবনা রয়েছে যে, হয়তো পশুটি এর ভারের দ্বারা নিহত হয়েছে। পক্ষান্তরে যদি পাথরটি হালকা-পাতলা হয় এবং ধারালও হয়, তবে তা খাওয়া হালাল হবে। কেননা, এ ক্ষেত্রে জখমের কারণেই পশুটি মারা গেছে এবং এটি সুনির্দিষ্ট। পাথরটি যদি হালকা-পাতলা হয় এবং ঐটিকে যদি লম্বা করে বানানো হয়, আর এটি ধারালও হয়, তবে এ অবস্থায়ও পশুটি খাওয়া হালাল হবে। কেননা পাথরের আঘাতে জখমের মাধ্যমেই এটিকে হত্যা করা হয়েছে।

কেউ যদি ধারাল মারওয়া (এক প্রকার সাদা) পাথর কোন শিকারের প্রতি নিক্ষেপ করে এবং এতে যদি কোন অঙ্গ না কাটা যায়, তাহলে তা খাওয়া হালাল হবে না। কেননা, সেটি শিকার পশুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চূর্ণ করে একে হত্যা করেছে। এমনিভাবে যদি কেউ শিকারের প্রতি মারওয়া পাথর নিক্ষেপ করে এর মাথা আলাদা করে ফেলে অথবা এর রগসমূহ কেটে ফেলে, তাহলেও উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে (হালাল হবে না।) কেননা রগসমূহ যেমনিভাবে কাটার কারণে বিচ্ছিন্ন হয়, এমনিভাবে পাথরের ভারের কারণেও তা বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে। এ হিসাবে বিষয়টিতে সন্দেহ এসে যায়। অথবা এ ক্ষেত্রে এও সম্ভাবনা থাকে যে, পশুটি হয়তো রগসমূহ কাটার আগেই মারা গেছে।

কেউ যদি শিকার জন্তুর প্রতি লাঠি অথবা কাঠ নিক্ষেপ করে সেটিকে মেরে ফেলে, তবে তা খাওয়া হালাল হবে না। কেননা সে তাকে জখম করে হত্যা করেনি, বরং কাঠ বা লাঠির ভারের কারণে তা নিহত হয়েছে। অবশ্য যদি কাঠ বা লাঠি ধারাল হয় এবং এর দ্বারা পশুর কোন অঙ্গ কাটা যায়, তাহলে সেটি খাওয়াতে কোন দোষ নেই। কেননা তখন এটি তরবারি বা বর্শার ন্যায় বলে গণ্য হবে।

উল্লিখিত মাসআলাসমূহের ক্ষেত্রে মূলনীতি হলোঃ যদি জখমের কারণে মৃত্যু সংঘটিত হয় এবং একথা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয় তাহলে শিকার প্রাণী হালাল বলে গণ্য হবে। আর যদি পশুটি ভারের কারণে নিশ্চিতভাবে মারা যায় তাহলে তা হারাম বলে গণ্য হবে। আর যদি এ ব্যাপারে সন্দেহ দেখা দেয় এবং পশুটি জখমের কারণে মারা গেছে, না ভারের কারণে মারা গেছে, তা জানা না যায়, তবে তা সতর্কতা হেতু হারাম বলে গণ্য হবে।

যদি শিকার জন্তুর প্রতি তরবারি বা ছুরি নিক্ষেপ করার পর এর ধারাল অংশের আঘাতে তাতে জখম হয়ে যায়, তবে তা খাওয়া হালাল হবে। যদি ছুরি উল্টা পিঠ বা তরবারির বাঁটের আঘাতে পশুটি মারা যায়, তবে তা খাওয়া হালাল হবে না। কেননা সেটিকে চূর্ণ করে মেরে ফেলেছে। এ ক্ষেত্রে লোহা এবং অন্যান্য বস্তু সবই সমান।

শিকারের প্রতি তীর নিক্ষেপের পর যদি শরীরে জখম হয়ে তা মারা যায় এবং জখম থেকে যদি রক্তক্ষরণ ঘটে, তাহলে তা খাওয়া ইমামগণের সকলের মতেই হালাল হবে। যদি জখম থেকে রক্ত ক্ষরণ না হয়, তাহলেও পরবর্তীকালের ইমামগণের কারো কারো মতে এই একই হুকুম প্রযোজ্য হবে। চাই জখম ছোট হোক বা বড় হোক, তাতে কোন পার্থক্য হবে না। কেননা, জখমের ছিদ্র ছোট হওয়ার কারণে কোন কোন সময় রক্ত আটকে থাকে, আবার রক্ত গাঢ় হওয়ার কারণেও তা আটকে যায়। (কাজেই তা প্রবাহিত হওয়া অবশ্যক নয়।) কিন্তু কোন কোন ইমামের মতে রক্ত প্রবাহিত হওয়া শর্ত। কারণ, নবী করীম (স) ইরশাদ করেছেন ঃ

مَا اَنْهَرَالدَّمَ وَاَفْرَى الْاَوْدَاجَ فَكُلْ .

যা রক্ত প্রবাহিত করে এবং রগসমূহ কেটে দেয়, তার দ্বারা যবাহকৃত পশু খাও।

এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) যবাহকৃত পশুর গোশত খাওয়া হালাল হওয়ার জন্য রক্ত প্রবাহিত করার শর্ত আরোপ করেছেন। কেউ কেউ বলেনঃ ক্ষত যদি বড় হয়, তবে রক্ত ক্ষরণ ছাড়াও পশুটি হালাল হবে। আর যদি ছোট হয়, তবে রক্ত প্রবাহিত করা অপরিহার্য।

বকরী যবাহ করার পর যদি এর থেকে রক্ত প্রবাহিত না হয়, তবে কোন কোন ফকীহ এর মতে এটি খাওয়া হালাল হবে না। কারো কারো মতে হালাল হবে। আমরা পূর্বে যে আলোচনা পেশ করেছি, তাতে উভয় মতামতের যুক্তিই রয়েছে।

শিকারের প্রতি তীর নিক্ষেপের পর শিকারের খুর বা শিং আঘাত প্রাপ্ত হয়ে যদি এর থেকে রক্ত ক্ষরণ হয়, তাহলে পশুটি খাওয়া হালাল হবে। অন্যথায় হালাল হবে না। এর থেকে আমাদের পূর্ব বর্ণিত বিষয়ের কিছু কিছু মাসআলার প্রতি সমর্থন পাওয়া যায়।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ শিকারের প্রতি তীর নিক্ষেপ করে কেউ যদি এর কোন অঙ্গ কেটে ফেলে (আর তা মারা যায়) তবে সে শিকারটি খাওয়া যাবে ঐ দলীলের ভিত্তিতে, যা আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। তবে যে অঙ্গটি কেটে আলাদা করে ফেলা হয়েছে, তা খাওয়া যাবে না।

ইমাম শাফিঈ (র) বলেনঃ উভয় অংশই খাওয়া জাইয হবে, যদি এ কর্তনের কারণেই পশুটি মরে গিয়ে থাকে। কেননা ذَكَاةُ اِضْطِرَارِيٌّ অনন্যোপায় অবস্থায় যে যবাহ প্রযোজ্য হয় এর কারণে এ অংশটি আলাদা হয়ে গেছে। কাজেই যে অংশটি আলাদা হয়েছে এবং যার থেকে আলাদ হয়েছে, উভয়টিই খাওয়া হালাল হবে। যেমন ইখতিয়ারী যবাহ এর অবস্থায় মাথা যদি পশুর শরীর থেকে আলাদা হয়ে যায়, তবে তা খাওয়া জাইয হয়। পক্ষান্তরে যদি এ অবস্থায় পশু না মরে থাকে, তবে তা খাওয়া জাইয হবে না। কেননা (কর্তিত এ আলাদাকৃত) এ অংশটি যবাহ এর মাধ্যমে আলাদা হয়নি।

আমাদের দলীল হলো রাসূলুল্লাহ (সা) এর বাণী ঃ

مَا اُبِيْنَ مِنَ الْحَيِّ فَهُوَمَيِّتٌ —জীবিত পশুর যে অংশটি আলাদা করা হয়েছে, তা মৃত হিসাবে গণ্য হবে।

এখানে জীবিত শব্দটিকে সাধারণ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। কাজেই প্রকৃত জীবিত এবং হুকুমগত জীবিত উভয়ই এর মধ্যে শামিল হবে। আর পশুর দেহ থেকে আলাদাকৃত অংশটি এই অবস্থায় বিদ্যমান। কেননা যে পশুর শরীর থেকে অংশটি আলাদা করা হয়েছে তা হাকীকী তথা প্রকৃতভাবে জীবিত। আর এতে প্রাণ বিদ্যমান আছে। এমনিভাবে হুকুমগতভাবেও তা জীবিত। কেননা এ জাতীয় আঘাত প্রাপ্ত হওয়ার পরও এর বেঁচে থাকার আশা করা যায়। এ কারণেই শরী'আত একে জীবন হিসাবে গণ্য করেছে। অতএব শিকারকৃত পশু যদি পানিতে গিয়ে পতিত হয় এবং তাতে এ পরিমাণ জান বাকী থাকে, তবে সেটি খাওয়া হারাম বলে গণ্য হবে।

ইমাম শাফিঈ (র) এর দলীলঃ এটিকে যবাহ এর মাধ্যমে আলাদা করা হয়েছে। এর জবাবে আমাদের বক্তব্য হলোঃ যখন সে অঙ্গটিকে শরীর থেকে আলাদা করা হয়েছে, তখন তো একে যবাহ বলে গণ্য করা যায় না। কেননা অবশিষ্ট পশুতে এখনো প্রাণ বাকী আছে। আর এর 'রূহ' যখন চলে যাবে, তখন তো আলাদাকৃত অংশের মধ্যে যবাহ এর কোন প্রভাব বা প্রতিক্রিয়াই যাহির হবে না। কেননা এতে কোন প্রাণই নেই। আর এ অংশটি যেহেতু পশুর দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে কাজেই এটিকে মূল পশুর সংশ্লিষ্ট সাব্যস্ত করারও কোন অবকাশ নেই। কেননা তা তো নিঃশেষ হয়ে গেছে।

মোটকথা এটিই হচ্ছে আসল বা মূলনীতি যে, যে প্রাণ হাকীকী এবং হুকমী উভয় দিকে থেকে জীবিত; এর থেকে যে অঙ্গটি আলাদা হয়ে যাবে, সেটিকে খাওয়া হালাল হবে না। আর যে পশু বাহ্যিকভাবে জীবিত, কিন্তু হুকমীভাবে জীবিত নয়, সেটি থেকে যে অঙ্গ আলাদা হয়ে যাবে, তা খাওয়া জাইয হবে। যেমন যে পশু থেকে গোশতের টুক্‌রা আলাদা করা হয়েছে, তাতে যবাহকৃত পশুর অনুরূপ প্রাণ বাকী রয়েছে। বস্তুত: এটি হুক্‌মীভাবে জীবন না হলেও বাহ্যিকভাবে অবশ্যই জীবন। এ কারণেই যদি এ পরিমাণ প্রাণ স্পন্দন বাকী থাকা অবস্থায় শিকারকৃত পশু পানিতে গিয়ে পতিত হয় অথবা পাহাড় কিংবা ছাদের উপর থেকে গড়িয়ে মাটিতে গিয়ে পড়ে তবে তা খাওয়া

হারাম হবে না। এ মূলনীতির উপর আরো বহু মাসআলা উদ্ভাবিত হয়। সে হিসাবেই আমরা বলি : কেউ যদি শিকার জন্তুর হাত-পা উরু অথবা হাত-পায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট এক তৃতীয়াংশ কিংবা মাথার অর্ধাংশের থেকেও কম কেটে ফেলে, তবে এ কর্তিত ও আলাদাকৃত অংশ খাওয়া হারাম বলে গণ্য হবে। আর যার থেকে আলাদা করা হয়েছে তা খাওয়া হালাল হবে। কেননা বাকী অংশে হায়াত অবশিষ্ট থাকার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। আর শিকারী যদি পশুটিকে দুই টুকরা বা তিন টুকরা করে ফেলে এবং পেছনের দিকের অংশটি তুলনামূলকভাবে একটু বেশী হয় অথবা সে যদি পশুটির মাথার অর্ধাংশ বা এর চেয়ে বেশী অংশ কেটে ফেলে, তাহলে যেটি কাটা হয়েছে এবং যার থেকে কাটা হয়েছে, সবই হালাল বলে গণ্য হবে। কেননা যার থেকে অঙ্গটি আলাদা করা হয়েছে, তা বাহ্যিকভাবে জীবিত হলেও হুকমীভাবে জীবিত নয়। কেননা এ জাতীয় জখমের পর কোন পশুর বেঁচে থাকার কল্পনাই করা যায় না।

পূর্বে যে হাদীসটি উল্লেখ করা হয়েছে, তাতে যদিও মাছের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত এবং সে হিসাবে মাছের কর্তিত অংশও মৃত বলে গণ্য হওয়ার কথা। কিন্তু মাছের বিষয়টি এ হুকুম থেকে ব্যতিক্রম। অর্থাৎ তা মৃত হলেও হালাল হিসাবেই গণ্য হবে ঐ হাদীসের ভিত্তিতে, যা আমরা আগে উদ্ধৃত করেছি।

বকরীর ঘাড়ে আঘাত করার পর যদি এর মাথা আলাদা হয়ে যায় তবে রগসমূহ কাটা যাওয়ার কারণে তা খাওয়া হালাল হবে। আর এরূপ করা মাকরূহ। কেননা এতে হারাম মগজ পর্যন্ত ছুরির আঘাত পৌঁছে যায়। বকরীকে পেছনের দিক থেকে আঘাত করার পর রগসমূহ কর্তনের আগেই তা যদি মারা যায়, তবে তা খাওয়া হালাল হবে না। আর যদি মারা না যায় এবং পরে রগসমূহ কাটা হয় তাহলে সেটি খাওয়া হালাল হবে।

কেউ যদি শিকার জন্তুকে আঘাত করে এর হাত বা পা এমনভাবে কেটে দেয় যে, তা এখনো এর শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়নি, এ অবস্থায় তা জোড়া লাগা এবং ভাল হওয়ার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও যদি মারা যায়, তাহলে ঐ প্রাণীটি (খাওয়া) হালাল হবে। কেননা এ অংশটিও অন্যান্য অংশের অনুরূপই। আর যদি জখমটি ভাল হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে, যেমন এটি চামড়ার সাথে লটকানো অবস্থায় ঝুলে আছে; তাহলে এ অংশটি ছাড়া বাকী প্রাণীটি খাওয়া হালাল হবে। কেননা আভ্যন্তরীণ ভাবে (معنى) কর্তিত এ অংশটি ঐ পশুর শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। আর আভ্যন্তরীণ (معانى) এর বিষয়টিও ধর্তব্য হয়ে থাকে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ অগ্নিপূজক, মোরতাদ এবং প্রতিমা পূজারী ব্যক্তির শিকারকৃত পশু খাওয়া জাইয নয়। কেননা তারা যবাহ করার উপযুক্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত নয়। যেমন আমরা যবাহ অধ্যায়ে বিষয়টি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি। অথচ শিকার পশু খাওয়া বৈধ হওয়ার জন্য শিকারী ব্যক্তিদের মধ্যে যবাহ করার উপযুক্ততা বিদ্যমান থাকা আবশ্যক। কিন্তু খৃস্টান ও ইয়াহুদীদের বিষয়টি এর থেকে

ব্যতিক্রম। কেননা তারা ইখতিয়ারী যবাহ এর উপযুক্ত। কাজেই তারা ইখতিয়ারী যবাহ এর উপযুক্ত বলেও বিবেচিত হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ কেউ শিকার জন্তুর প্রতি তীর নিক্ষেপের পর তা যদি পশুর শরীরে গিয়ে বিদ্ধ হয়, কিন্তু এতে তেমন জখম না হয় এবং এতে পশুটি যদি আত্মরক্ষা করার ক্ষমতা না হারায়, এ অবস্থায় অপর কোন ব্যক্তি যদি এর প্রতি তীর নিক্ষেপ করে সেটিকে মেরে ফেলে, তাহলে দ্বিতীয় ব্যক্তি এর মালিক বলে গণ্য হবে এবং এটি খাওয়াও জাইয হবে। কেননা সে-ই এটিকে ধরেছে। আর হাদীসে আছে; রাসূলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ

اَلصَّيْدُ لِمَنْ اَخَذَ ٠

–যে শিকার ধরেছে, সেই এর মালিক হবে।

আর যদি প্রথম ব্যক্তি শিকার জন্তুকে আঘাত করে একে প্রচণ্ডভাবে জখম করে দেয়, এরপর দ্বিতীয় ব্যক্তি এর প্রতি তীর নিক্ষেপ করে একে মেরে ফেলে, তাহলে প্রথম ব্যক্তিই এর মালিক হবে। আর তা খাওয়াও জাইয হবে না। কেননা এটি দ্বিতীয় ব্যক্তির তীরের আঘাতে মারা যাওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। বস্তুত: এটি যবাহ হিসাবে গণ্য হবে না। কেননা তার তো ইখতিয়ারী যবাহ এর উপরই ক্ষমতা ছিল। কিন্তু প্রথমোক্ত মাসআলাটি এর থেকে ব্যতিক্রম। এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে, যদি প্রথম তীরটি এ পর্যায়ের হয় যে, এর থেকে শিকার জন্তুর বেঁচে যাওয়া সম্ভব। কেননা, এহেন অবস্থায় মৃত্যুর বিষয়টি দ্বিতীয় তীর নিক্ষেপের দিকে সম্পর্কিত হবে, অর্থাৎ এ কথা ধরে নেওয়া হবে যে, মৃত্যু দ্বিতীয় তীরের দ্বারা সংঘটিত হয়েছে। আর প্রথম তীর নিক্ষেপের অবস্থায় যদি এমন হয়.যে, এর থেকে শিকারের নিরাপদ থাকা সম্ভব নয়, যেমন শিকার জন্তুর মধ্যে এই পরিমাণ হায়াত (স্পন্দন) বাকী রইলো. যে পরিমাণ স্পন্দন বাকী থাকে যবাহকৃত প্রাণীর মধ্যে। যেমন শিকারী ব্যক্তি তীর নিক্ষেপ করে এর মাথাটি বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে, তাহলে এটি খাওয়া হালাল হবে। কেননা এ অবস্থায় মৃত্যুর বিষয়টি দ্বিতীয় ব্যক্তির তীর নিক্ষেপের দিকে সম্পর্কিত হবে না। কেননা দ্বিতীয় তীরটি নিক্ষেপ করা এবং না করা উভয়টিই সমান।

যদি প্রথম তীরটির অবস্থা এমন হয় যে, তা বিদ্ধ হওয়ার পর শিকার জন্তুটি আর বেঁচে থাকতে পারে না এবং এর মধ্যে যদি যবাহকৃত প্রাণী থেকে কিছুটা বেশী স্পন্দন বাকী থাকে অর্থাৎ আঘাত প্রাপ্ত হওয়ায় এটির অবস্থা এমন হয় যে, এ অবস্থায় প্রাণীটি শুধুমাত্র একদিন বা এর চেয়েও কম পরিমাণ সময় বেঁচে থাকতে পারে; তাহলে ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর মতে দ্বিতীয় তীরের কারণে পশুটি হারাম হবে না। কেননা তাঁর মতে এ পরিমাণ হায়াত ধর্তব্য নয়। পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মদ (র) এর মতে পশুটি হারাম বলে গণ্য হবে। কেননা তাঁর মতে এতটুকু হায়াতও ধর্তব্য হয়ে থাকে। যে ক্ষেত্রে তীর থেকে শিকার জন্তু বেঁচে থাকতে পারে না, সে ক্ষেত্রে যে বিধান, এ ক্ষেত্রেও ঠিক একই বিধান প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ এ অবস্থায় পশুটি খাওয়া হালাল হবে না।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ এ অবস্থায় প্রথম ব্যক্তির জন্য পশুটির মূল্য ক্ষতিপূরণ হিসাবে আদায় করা দ্বিতীয় ব্যক্তির উপর ওয়াজিব হবে। তবে প্রথম ব্যক্তির জখমের কারণে এর যে পরিমাণ মূল্য হ্রাস পেয়েছে, তা বাদ যাবে। কেননা দ্বিতীয় ব্যক্তি এর প্রতি তীর নিক্ষেপ করে একজনের মালিকানা যোগ্য শিকার জন্তুকে বরবাদ করে দিয়েছে। বস্তুত: এমনভাবে তীর নিক্ষেপ করা, যা দ্বারা অবিরত রক্ত ক্ষরণ হতে থাকে এর মাধ্যমে প্রথম ব্যক্তি তো এর মালিক হয়েই গেছে। অবশ্য প্রথম ব্যক্তি কর্তৃক জখমের কারণে এটি কিছু ত্রুটিপূর্ণ হয়ে গেছে। (কাজেই এ কারণে এর যে পরিমাণ মূল্য হ্রাস পাবে, তা বাদ যাবে)। উল্লেখ্য যে, যে দিন পশুটিকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়েছে, সে দিনের মূল্য ধর্তব্য হবে (এবং হিসাবেই মূল্য বাদ দিতে হবে)। হিদায়া গ্রন্থকার শায়খ বুরহান উদ্দীন (র) বলেনঃ উপরোক্ত মাসআলা তখনই প্রযোজ্য হবে, যদি জানা যায় যে, পশুটি দ্বিতীয় ব্যক্তির তীরের আঘাতে মারা গেছে। অর্থাৎ প্রথম ব্যক্তির তীরটির অবস্থা এমন ছিল যে, এর থেকে শিকার জন্তুর বেঁচে যাওয়া সম্ভব ছিল। আর দ্বিতীয় ব্যক্তির তীরটির অবস্থা এমন ছিল যে, এর থেকে শিকার জন্তুর বেঁচে যাওয়া সম্ভব ছিল না। এতে প্রমাণিত হয় যে, পশুটি দ্বিতীয় ব্যক্তির তীরের আঘাতেই মারা গেছে। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তির মালিকানাধীন একটি পশুকে এমন অবস্থায় হত্যা করেছে, যখন এটি তার জখমের কারণে কিছুটা ত্রুটিপূর্ণ অবস্থায় ছিল। কাজেই তার উপর পূর্ণ ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না। যেমন কেউ যদি কোন অসুস্থ গোলামকে হত্যা করে, তবে অসুস্থ গোলামের যে পরিমাণ মূল্য হয়, ঐ পরিমাণ জরিমানা তার উপর ওয়াজিব হবে।

যদি জানা যায় যে, উভয় জখমের দ্বারা পশুটি মারা গেছে, অথবা কোন্ আঘাতের কারণে মারা গেছে, তা জানা না যায়, তবে এর সমাধান সম্বন্ধে ইমাম মুহাম্মদ (র) 'যিয়াদাত' গ্রন্থে বলেন যে, দ্বিতীয় ব্যক্তির আঘাতে যে পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে, প্রথমে সে এর ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করবে। তারপর উভয় জখমে আঘাত প্রাপ্ত হওয়া অবস্থায় এর গোশতের যে মূল্য হবে; সে মূল্যের অর্ধেক সে ক্ষতিপূরণ হিসাবে আদায় করবে।

লোকসানের ক্ষতিপূরণ তো এ জন্য পরিশোধ করতে হবে যে, অপর এক ব্যক্তির মালিকানাধীন প্রাণীকে সে জখম করেছে এবং এতে তার মূল্য কিছুটা হ্রাস পেয়েছে কাজেই সে এ আঘাতের দ্বারা যে পরিমাণ লোকসান পৌঁছিয়েছে, প্রথমে এর ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করতে হবে। মূল্যের ক্ষতিপূরণ এ জন্য দিতে হবে যে, পশুটি উভয় জখমের দ্বারা নিহত হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, সে এর অর্ধেক নষ্ট করেছে। অথচ এটি হলো অন্যের মালিকানাধীন একটি শিকার জন্তু। কাজেই উভয় জখমের দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত অবস্থায় এর যে মূল্য হবে, সে মূল্যের অর্ধেক পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দেওয়া তার উপর ওয়াজিব হবে। কেননা, প্রথম জখম তো দ্বিতীয় ব্যক্তির আঘাতের কারণে হয়নি। তার আঘাতের কারণে দ্বিতীয় জখমটি সাধিত হলেও সে তো একবার এর ক্ষতিপূরণ আদায় করে দিয়েছে। অতএব দ্বিতীয়বার তার উপর এ লোকসানের ক্ষতিপূরণ দেওয়া ওয়াজিব হবে না।

আর তৃতীয় বিষয়টি অর্থাৎ পশুটির গোশতের যে মূল্য, এর অর্ধেকের জরিমানা তাকে পরিশোধ করতে হবে এ কারণে যে, প্রথম বারে তীর নিক্ষেপের পর এটিকে ইখতিয়ারী পদ্ধতিতে যবাহ্ করা হলে তা হালাল হতো যদি এর প্রতি দ্বিতীয় তীরটি নিক্ষেপ না করা হতো। এ হিসাবে দ্বিতীয় ব্যক্তি দ্বিতীয় তীরটি নিক্ষেপ করে প্রথম ব্যক্তির অর্ধেক গোশতকে বিনষ্ট করে দিয়েছে। কাজেই এ পরিমাণ গোশতের ক্ষতিপূরণ দেওয়া তার উপর ওয়াজিব হবে। কিন্তু অপর অর্ধেকের ক্ষতিপূরণ তার উপর ওয়াজিব হবে না। কেননা, সে তো একবার এর ক্ষতিপূরণ আদায় করেছে। আর গোশতের জরিমানাও এর মধ্যে শামিল হয়ে গেছে। যদি প্রথম ব্যক্তিই এর প্রতি দ্বিতীয়বার তীর নিক্ষেপ করে, তাহলে তীর নিক্ষেপকারী অন্য ব্যক্তি হলে যে বিধান, এ ক্ষেত্রেও সে বিধান প্রযোজ্য হবে। এ বিষয়টি এমনই হবে, যেমন কেউ পাহাড়ের চূড়ায় বিদ্যমান শিকার জন্তুর প্রতি তীর নিক্ষেপ করে একে দুর্বল করে দিল, তারপর এর প্রতি দ্বিতীয়বার তীর নিক্ষেপ করে এটিকে মাটিতে নামিয়ে দিল, তাহলে এটিকে খাওয়া হালাল হবে না। কেননা দ্বিতীয়বার তীর নিক্ষেপ করাতে তা হারাম হয়ে গিয়েছে। এখানকার বিষয়টিও ঠিক তদ্রূপই।

ইমাম কুদূরী (র) বলেনঃ যে সব প্রাণীর গোশ্‌ত খাওয়া জাইয এবং যে সব প্রাণীর গোশ্‌ত খাওয়া না-জাইয নয়, তা সবই শিকার করা যাইয। কেননা ঐ আয়াতটি ব্যাপক অর্থবোধক যা আমরা পূর্বে তিলাওয়াত করেছি : وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا সর্বোপরি صَيْدٌ (সায়দ) শব্দটি ঐ প্রাণীর সাথে খাস নয়, যার গোশ্‌ত খাওয়া হালাল। জনৈক কবি বলেছেন :

صَيْدُ الْمُلُوْكِ اَرَانِبُ وَثَعَالِبُ وَاِذَا رَكِبْتُ فَصَيْدِىَ الاَبْطَالُ ۰

রাজা-বাদশাহ্‌দের শিকার হচ্ছে খরগোশ এবং খেকশিয়াল। আর আমি যখন সওয়ারীর উপর আরোহণ করি, তখন আমার শিকার হচ্ছে বাহাদুর ও বীর পুরুষগণ।[১]

অধিকন্তু যে সব পশুর গোশত খাওয়া হালাল নয়, সেগুলোকেও শিকার করা হয় এর চামড়া, পশম ও পাখ-পাখালি দ্বারা উপকৃত হওয়ার নিমিত্তে, এমনিভাবে এ সবের অকল্যাণকে প্রতিহত করার জন্যও এগুলোকে শিকার করা হয়। উপরোক্ত উদ্দেশ্যে এ জাতীয় প্রাণী শিকার করা শরী'আত অনুমোদিত। এ মাসআলার বিশুদ্ধতার ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলাই সর্বাধিক জ্ঞাত।

---

১. এখানে 'বীর বাহাদুর' মানুষের ক্ষেত্রে صَيْدٌ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। অথচ মানুষের গোশত খাওয়া কোন সময়ই জাইয ছিল না। এতে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, শিকার করার বিষয়টি যে সব পশুর গোশত খাওয়া হালাল, কেবল তার সাথে খাস নয়।

كِتَابُ الرَّهْنِ
অধ্যায় ঃ বন্ধক

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الرَّهْنِ

অধ্যায় ঃ বন্ধক

রাহন (رَهْنٌ) শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে যে কোন কারণে কোন বস্তুকে আটকে রাখা। শরী'আতের পরিভাষায় রাহন বলা হয় হকের পরিবর্তে কোন বস্তুকে এমনভাবে আটকে রাখা, যাতে এ বন্ধকী বস্তুর দ্বারা তার হক উসূল করা সম্ভব হয়। যেমন ঋণ ইত্যাদি।

বন্ধক রাখার বিষয়টি শরী'আত অনুমোদিত। কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে ঃ فَرِهٰنٌ مَّقْبُوْضَةٌ —তবে হস্তান্তরকৃত বন্ধক রাখবে। (২:২৮৩)

রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে বর্ণিত রয়েছে ঃ

اَنَّهُ اِشْتَرٰى مِنْ يَهُوْدِيٍّ طَعَامًا وَرَهَنَهُ بِهَا دِرْعَهُ

একদা নবী করিম(সা) এক ইয়াহুদী থেকে কিছু খাদ্য খরিদ করেছিলেন এবং এর মূল্যের বিনিময়ে তিনি তাঁর বর্মটি সে ইয়াহুদীর নিকট বন্ধক রেখেছিলেন। এমনিভাবে বন্ধক রাখা বৈধ হওয়ার ব্যাপারে ইজমা রয়েছে। সর্বোপরি রাহন হচ্ছে নিজের পাওনা উসূল করার বিষয়টিকে পাকা-পোক্ত করার একটি 'আকদ' বা চুক্তি। কাজেই এটিকে ওয়াজিব হওয়ার দিক থেকে কাফালা তথা জামিন হওয়ার উপর কিয়াস করা হবে। অর্থাৎ কাফালা যেমনিভাবে জাইয অনুরূপভাবে রাহনও জাইয।

ইমাম কুদুরী (র) বলেন ঃ রাহন সংঘটিত হয় ঈজাব (প্রস্তাব)ও কবুল (প্রস্তাব গ্রহণ) দ্বারা। আর তা পূর্ণ হয় কব্‌য তথা হস্তগত করার দ্বারা।

ফকীহগণ বলেন ঃ রাহনের রুকন হলো শুধুমাত্র ঈজাব। কেননা এটি একটি عَقْدُ تَبَرُّعٍ অর্থাৎ এমন 'আক্‌দ' যা বাধ্যতামূলক নয়। কাজেই مُتَبَرِّعٌ (নফল কাজ সম্পাদন কারী) এর দ্বারাই এটি পূর্ণ হয়ে যাবে। যেমন হিবা সাদাকা ইত্যাদির ক্ষেত্রে

হয়ে থাকে। আর হস্তগত করা হলো বিষয়টি অপরিহার্য হওয়ার জন্য শর্ত। এ বিষয়ে পরবর্তীতে আমরা আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ। ইমাম মালিক (র) বলেন ঃ শুধুমাত্র 'আকদের দ্বারাই 'রাহন' অপরিহার্য হয়ে যায়। কেননা (বন্ধক দাতা ও গ্রহীতা) উভয়ের পক্ষ হতে প্রদত্ত মালের সাথে এটি খাস। কাজেই বন্ধকের বিষয়টি বেচা-কেনার অনুরূপই। অধিকন্তু এটি একটি মযবুত এ পরিপক্ক চুক্তি। কাজেই এটি 'কাফালার' অনুরূপ হয়ে গেল। (সুতরাং কাফালার ন্যায় এ ক্ষেত্রেও এর অপরিহার্যতার জন্য কব্‌য তথা হস্তগত করা শর্ত নয়।)

আমাদের দলীল হলো ঐ আয়াত, যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। আর তা হলো ঃ فَرِهٰنٌ مَّقْبُوْضَةٌ আয়াতে رِهٰنٌ শব্দটি مَصْدَرٌ (ক্রিয়ামূল), এর শুরুতে রয়েছে فَاءٌ এবং এটি جَزَاءٌ এর স্থানে অবস্থিত। এ জাতীয় مَصْدَرٌ - اَمْرٌ বা আদেশ সূচক ক্রিয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। (এর থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে, বন্ধক হস্তান্তরকৃত হতে হবে।)

অধিকন্তু রাহন হচ্ছে عَقْدُ تَبَرُّعٍ -অর্থাৎ এমন 'আকদ' যা স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে মানুষ করে থাকে। কেননা, বন্ধকদাতা বন্ধকের বিনিময়ে বন্ধক গ্রহীতার নিকট কোন কিছুর হকদার হয় না। এ কারণেই বন্ধকদাতা ব্যক্তিকে এ ব্যাপারে বাধ্য করা যায় না। কাজেই রাহনকে কার্যকরী করা অপরিহার্য। যেমন অসিয়্যতের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। আর এটি (কার্যকরী করা) পূর্ণ হয় হস্তগত করার দ্বারা। উল্লেখ্য যে, যাহিরী রিওয়ায়েত মতে এ ক্ষেত্রে তাখ্‌লিয়া তথা বন্ধকী মালের উপর থেকে নিজের নিয়ন্ত্রণ তুলে নেওয়াই যথেষ্ট। কেননা, শরী'আত অনুমোদিত এক 'আকদের হুকুমের কারণেই এ হস্তগত করার বিধান দেওয়া হয়েছে। কাজেই এ হস্তগত করা বিক্রীত পণ্য হস্তগত করারই অনুরূপ হয়ে গেল।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) হতে বর্ণিত আছে যে, অস্থাবর মালের ক্ষেত্রে তা স্থানান্তরিত না করা পর্যন্ত হস্তগত হওয়া, সাব্যস্ত হবে না। কেননা প্রথম এটি এমন কবযা, যা ক্ষতিপূরণকে ওয়াজিব করে গসবের ন্যায়। কিন্তু বেচা-কেনার বিষয়টি এর থেকে ব্যতিক্রম। কেননা বেচা-কেনার মধ্যে দায়-দায়িত্বকে স্থানান্তর করা হয় বিক্রেতার নিকট থেকে ক্রেতার দিকে। আর এতে প্রথমত: কোন কিছু ওয়াজিব হয় না। অবশ্য প্রথমোক্ত অভিমতটি বিশুদ্ধতম।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ বন্ধক গ্রহীতা যখন সম্পূর্ণ আলাদা ও পৃথক করে বন্ধকের মাল কবযা বা হস্তগত করে নেয়, তখনই বন্ধকী লেন-দেন পূর্ণ হয়ে যায়। কেননা এ ক্ষেত্রে কবযা পূর্ণাঙ্গভাবে পাওয়া গেছে। কাজেই 'আকদও' অপরিহার্য হয়ে যাবে। আর যদি বন্ধক গ্রহীতা বন্ধকের মালামাল হস্তগত না করে, তাহলে বন্ধকদাতার ইখতিয়ার থাকবে যে, ইচ্ছা করলে এ মাল তার নিকট হস্তান্তর করবে। আর যদি ইচ্ছা করে তাহলে বন্ধক রাখা থেকে রুজুও করতে পারবে। এর

কারণ আমরা পূর্বেই বর্ণনা করেছি যে, হস্তগত করার দ্বারা বন্ধক অপরিহার্য হয়। কেননা হস্তগত করার পূর্বে বন্ধকের উদ্দেশ্য হাসিল হয় না।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ বন্ধকদাতা ব্যক্তি যদি বন্ধকী বস্তু বন্ধক গ্রহীতার নিকট হস্তান্তর করে দেয় এবং সেও তা হস্তগত করে নেয়, তাহলে তা তার দায়-দায়িত্বে চলে যাবে।

ইমাম শাফিঈ (র) বলেনঃ বন্ধকী বস্তু বন্ধক গ্রহীতার নিকট আমানত স্বরূপ থাকে। তা নষ্ট হয়ে গেলে ঋণের কিছু পরিমাণও রহিত হবে না।

নবী করীম (সা) ইরশাদ করেছেন ঃ

لَايَغْلَقُ الرَّهْنُ قَالَهَا ثَلٰثًا لِصَاحِبِهِ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ ٠

রাহ্ন ঋণের পরিবর্তে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ হয় না। এর ফায়দা রাহ্নদাতার জন্য এবং ক্ষয়-ক্ষতিও তার উপরই বর্তাবে। হাদীসের প্রথমোক্ত বাক্যটি রাসূলুল্লাহ (সা) তিনবার বলেছেন।

অধিকন্তু রাহ্ন হচ্ছে ঋণের পরিবর্তে এক পরিপক্ক দলীল। কাজেই তা নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে ঋণ রহিত হবে না। যেমন ঋণ সংক্রান্ত দলীল দস্তাবেজ নষ্ট হয়ে গেলে তাতে ঋণ রহিত হয় না। ঋণ রহিত না হওয়ার কারণ হচ্ছে; ঋণ গ্রহণের পর যদি এ ব্যাপারে দলীল দাস্তাবেজ লিখিত হয়, তখন ঋণের হিফাযতের দিকটি আরো ময়বুত এবং সুদৃঢ় হয়ে যায়। অথচ দলীল বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার ফলে ঋণ রহিত হয়ে যাওয়ার বিষয়টি হচ্ছে বন্ধকী-চুক্তির পরিপন্থী বিষয়। কেননা হক রহিত হওয়ার অর্থ হলো তা ধ্বংস ও নষ্ট হয়ে যাওয়া। আর এটি হিফাযতের পরিপন্থী ব্যাপার। আমাদের দলীল হলো রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বাণী। তিনি বন্ধকী ঘোড়া বন্ধকগ্রহীতার নিকট থেকে হালাক ও নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর তাকে লক্ষ্য করে বলেনঃ ذَهَبَ حَقُّكَ তোমার হক খতম হয়ে গেছে।

তিনি আরো বলেনঃ রাহ্নের বিষয়টি যদি অস্পষ্ট হয়ে পড়ে; তবে এটিকে সে জিনিসের বিনিময় গণ্য করা হবে, যার পরিবর্তে এ বন্ধক রাখা হয়েছে। ফকীহগণ বলেন, হাদীসের মর্ম হলো ঃ রাহনের মাল বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার পর যদি এর মূল্য সন্দেহযুক্ত হয়ে পড়ে।

অধিকন্তু সাহাবা এবং তাবেঈনে কিরামের এ ব্যাপারে ইজমা রয়েছে যে, রাহনের বিষয়টি ঋণের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ হয়ে থাকে। অবশ্য এর ধরন এবং অবস্থাদির ব্যাপারে তাদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। কাজেই রাহন আমানতী বস্তু বলা ইজমার পরিপন্থী কথা।

উল্লেখ্য যে ফকীহগণের মতে নবী করীম (সা) এর বাণী ঃ لَايَغْلَقُ الرَّهْنُ এর মর্ম হলোঃ বন্ধকী মাল আটকিয়ে রাখা যাবে না। অর্থাৎ বন্ধক গ্রহীতা ব্যক্তি এ মালের মালিক হবে না। ইমাম কারখী (র) পূর্ববর্তী ফকীহদের থেকে এই অভিমতটি বর্ণনা করেছেন।

সর্বোপরি বন্ধক গ্রহীতার জন্য পাওনা উসূল করার অধিকার রয়েছে। আর তা হলোঃ হস্তগত করা ও আটকিয়ে রাখার মালিকানা। কেননা রাহ্‌ন শব্দের মধ্যেই এই সব সময়ের জন্য আটকিয়ে রাখার কথা বিদ্যমান রয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ·

প্রত্যেক মানুষ নিজ কর্মের দায়ে আবদ্ধ । (৭৪ঃ৩৮)

জনৈক কবি বলেছেন ঃ

وَفَارَقَتْكَ بِرَهْنٍ لاَ فِكَاكَ لَهُ - يَوْمَالوِدَاعِ فَأَمْسَى الرَّهْنُ قَدْ غَلِقَا ·

বিদায়ের দিন আমি তোমার নিকট থেকে এমন অবস্থায় বিদায় হচ্ছি যে, আমার দিল তোমার নিকট বন্ধক অর্থাৎ চিরদিনের জন্য দায়বদ্ধ, যা কখনও-বিচ্ছিন্ন হবার নয়।

এখানেও رَهْنُ (রাহন) শব্দটি চিরদিনের জন্য আবদ্ধ থাকার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এমনিভাবে শরী'আতের বিধি-বিধান সর্বদা শব্দের আভিধানিক অর্থের সাথে সামঞ্জস্য-শীলই হয়ে থাকে। কখনো শব্দের আভিধানিক অর্থের থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না।

এ ব্যাপারে আরো যুক্তি হলো এই যে, মূলত: 'রাহ্‌ন' হচ্ছে পাওনা উসূল করার একটি পাকাপোক্ত দলীল দাস্তাবেজ। অর্থাৎ এমন দলীল, যদ্দরুণ পাওনা উসূল হয়েই যায়। আর তা সাব্যাস্ত হয় চিরস্থায়ী অধিকার ও দায়বদ্ধতার দ্বারা। এহেন অবস্থায় বন্ধকদাতা ঋণের বিষয়টিকে অস্বীকার করতে পারবেন না। কেননা সে তা অস্বীকার করলে বন্ধক গ্রহীতাও বন্ধকী বস্তুর ব্যাপারে তার অস্বীকৃতি প্রকাশ করে দিতে পারে বলে আশংকা রয়েছে। এমনিভাবে এ অবস্থায় বন্ধকদাতা বন্ধকী বস্তুর থেকে কোনরূপ ফায়দাও হাসিল করতে পারবেনা। কাজেই সে নিজের প্রয়োজনে এবং মানসিক চাপের কারণে দ্রুত ঋণ পরিশোধ করতে চেষ্টা করবে। বিষয়টি যেহেতু এমনই, তাই এক দিক থেকে তার পাওনা উসুল হওয়া সাব্যস্ত হয়ে গেছে। এ অবস্থায় বন্ধকী বস্তু যদি নষ্ট হয়ে যায়, তবে তার প্রাপ্তি আরো সুদৃঢ় হয়ে যাবে। এতদসত্ত্বেও সে যদি পুনরায় তা উসুল করে, তাহলে এটি সুদের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে। কিন্তু বন্ধকের মাল নষ্ট না হয়ে বিদ্যমান থাকলে, এর বিধান হবে ভিন্নতর। কেননা বন্ধক গ্রহীতা যখন বন্ধকের মাল বন্ধকদাতার নিকট ফেরৎ দিয়ে দিবে, তখন তার পূর্বপ্রাপ্তি নাকচ হয়ে যাবে। সুতরাং এ অবস্থায় পুনঃ পুনঃ পাওনা উসূল করা সাব্যস্ত হবে না।

আর হস্তগত ব্যতীত বাকী পাওনা উসূল করা সম্ভব নয়। কেননা এটি গ্রহীতা বন্ধকী বস্তুর মূল্যমান থেকে নিজের পাওনা উসূল করে থাকে। আর عَيْنُ مَالٍ (মূলবস্তু) তার নিকট আমানত স্বরূপ থাকে। কাজেই বন্ধকী বস্তু যদি জীবিত থাকে (যেমন জীবিত গোলাম), তাহলে তার খোরপোশ বন্ধকদাতার উপর বর্তাবে। অনুরূপভাবে সে মরে

যাওয়ার পর, তার কাফনের দায়-দায়িত্বও তার উপরই বর্তাবে। এমনিভাবে বন্ধক গ্রহীতা যদি বন্ধকী মাল খরীদ করে, তবে বন্ধক সূত্রে হস্তগত করা, ক্রয়সূত্রে হস্তগত করার স্থলাভিষিক্ত হবে না। কেননা বন্ধকের ক্ষেত্রে এর মূলবস্তু আমানতস্বরূপ থাকে। অতএব তা ক্ষতিপূরণের হস্তগত করার স্থলাভিষিক্ত হতে পারবে না, যথেষ্ট হতে পারবে না।

বন্ধক চুক্তির হুকুম হলো ঃ বন্ধক গ্রহীতা ব্যক্তির পাওনা উসূল করার অধিকার সাব্যস্ত হওয়া। এতেই বন্ধকী বস্তুর হিফাযত প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। যদিও বন্ধকী বস্তু ধ্বংস হয়ে যাওয়ার অবস্থায় বন্ধকদাতা ব্যক্তি ঋণের দায়-দায়িত্ব হতে স্বাভাবিক কারণেই মুক্ত হয়ে যায়। যেমন 'হাওয়ালার'[১] ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

মুলকথা, আমাদের মাযহাবে বন্ধকের হুকম হলো ঃ বন্ধকী বস্তু বন্ধক গ্রহীতা ব্যক্তির নিকট দায়বদ্ধ থাকবে, যাতে সে বন্ধকদাতার নিকট হতে তার পাওনা উসূল করতে পারে। আর ইমাম শাফিঈ (র)-এর মতে মূল বস্তুর সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়া, যাতে এই মূল বস্তুকে বিক্রি করে সে ঋণকে উসূল করা যায়। এই দুই মূলনীতির উপর বহু এমন মাসআলা উদ্ভাবিত হয় -যাতে আমাদের এবং ইমাম শাফিঈ (র)-এর মাঝে মত পার্থক্য রয়েছে। এ সবগুলো আমরা একে একে 'কিফায়াতুল মুনতাহী' গ্রন্থে উল্লেখ করেছি। সে সব বিষয়ের থেকে একটি বিষয় হলো এই যে, বন্ধকী বস্তু থেকে ফায়দা হাসিল করার জন্য বন্ধকদাতা ব্যক্তি বন্ধকী বস্তু ফেরৎ নিতে পারবেনা। কেননা এতে বন্ধক চুক্তির হুকুম নষ্ট হয়ে যাবে। আর তা হলো চিরস্থায়ী দায়বদ্ধতা। কিন্তু ইমাম শাফিঈ (র) এর মতে এরূপ করা নিষিদ্ধ নয়। কেননা এটি বন্ধক চুক্তির পরিপন্থী কোন বিষয় নয়। কারণ তার মতে বন্ধক চুক্তির হুকুম হলো, বিক্রয়ের জন্য তা নির্দিষ্ট হওয়া। পরবর্তী আলোচনার মধ্যে এ সম্পর্কিত বাকী মাসআলাসমূহ পর্যায়ক্রমে আসবে ইন্‌শাআল্লাহ।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ যে ঋণের কারণে ক্ষতিপূরণ অপরিহার্য হয়, সে জাতীয় ঋণের মুকাবিলায়ই কেবল বন্ধক রাখা সহীহ হবে।

কেননা বন্ধকের হুকুম হলো নিজের পাওনা উসূল করার অধিকার সাব্যস্ত হওয়া। আর উসূল করার বিষয়টি কোন কিছু ওয়াজিব হওয়ার পর পরই আসে।

হিদায়া গ্রন্থকার শায়খ বুরহান উদ্দীন (র) বলেন, ইমাম কুদূরী (র) বর্ণিত بِدَيْنٍ مَضْمُوْنٍ অর্থাৎ যে ঋণের কারণে ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হয়, ঐ বাক্যাংশের উপর চরম আপত্তি রয়েছে। কেননা এতে বুঝা যায় যে, دَيْنٌ مَضْمُوْنٌ এর মুকাবিলায়ই কেবলমাত্র বন্ধক রাখা সহীহ। অথচ যে মূলবস্তুর কারণে ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হয়, সে ক্ষেত্রেও বন্ধক রাখা সহীহ। যেমন জোরপূর্বক ছিনতাইকৃত বস্তু। এটি তো ঋণ নয় অথচ এর বিনিময়ে বন্ধক রাখা জাইয। এ আপত্তির জবাবে বলা যায় যে, উক্ত মূলবস্তুর ক্ষেত্রে হুকুম হলো এর মূল্য ফেরৎ দেওয়া আর মূলবস্তু ফেরৎ দিলেও অধিকাংশ মাশায়িখের

---

১. গ্রন্থের 'হাওয়ালা' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

মতে অব্যাহতি পাওয়া যাবে। আর এর মূল্য হচ্ছে মূলত: ঋণ। (কাজেই এটি ঋণ নয়, একথা বলা সহীহ হবে না)। এ কারণেই এ ক্ষেত্রে কাফালা সহীহ হয়। উল্লেখ্য যে, যদিও গসব বা ছিনতাইকৃত বস্তুর মূল্য ওয়াজিব হয় মূলবস্তুটি ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর। কিন্তু পূর্বে হস্তগত হওয়ার দ্বারা মূলবস্তু ধ্বংস হয়ে যাওয়ার সময়ও এর মূল্য ওয়াজিব হয়। এ কারণেই ছিনতাইকৃত বস্তু হস্তগত করার দিন এর যে মূল্য ছিল, মূল্য পরিশোধের সময় সে মূল্যই ধর্তব্য হয়ে থাকে। কাজেই ছিনতাইকৃত বস্তুর পরিবর্তে এটি রাহন হিসাবে ধর্তব্য হবে, তা ওয়াজিব বা (কারণ) পাওয়া যাওয়ার ভিত্তিতে। অতএব এর মুকাবিলায় রাহন সহীহ হবে, যেমন 'কাফালার' ক্ষেত্রে তা সহীহ হয়ে থাকে। (মূলবস্তুর মূল হুকুম হচ্ছে মূল্য পরিশোধ করা) এ কারণেই ঐ হাওয়ালা বাতিল হয় না, যা মূল গসবকৃত বস্তুর সাথে সংশ্লিষ্ট, তা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কারণে। কিন্তু আমানতের বিষয়টি এর থেকে ব্যতিক্রম।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ বন্ধকীবস্তু ক্ষতিপূরণ হিসাবে ধর্তব্য হয় বন্ধক ও ঋণ এতদুভয়ের মধ্যে যেটি কম তার পরিবর্তে। কাজেই বন্ধকীবস্তু যদি বন্ধক গ্রহীতার হাতে ধ্বংস হয়ে যায় এবং এর মূল্য ও ঋণের পরিমাণ যদি সমান সমান হয়, তাহলে এ কথা ধরে নেওয়া হবে যে, বন্ধক গ্রহীতা তার দেওয়া ঋণ বুঝে পেয়েছে। আর যদি বন্ধকী বস্তুর মূল্য বেশী হয়, তবে অতিরিক্ত অর্থ বন্ধক গ্রহীতার নিকট আমানতরূপে গণ্য হবে। কেননা ক্ষতিপূরণ তো ঐ পরিমাণই হবে, যে পরিমাণের দ্বারা পাওনা উসূল করা সম্ভব। আর তা হলো ঋণের সম পরিমাণ। যদি বন্ধকী বস্তুর মূল্য ঋণের তুলনায় কম হয়, তবে এ পরিমাণ ঋণ বিয়োগ হয়ে যাবে। অতঃপর বন্ধক গ্রহীতা ব্যক্তি তার পাওনার অবশিষ্ট অর্থ বন্ধকদাতার নিকট থেকে উসূল করে নেবে। কেননা মাল অনুপাতেই পাওনা উসূল করা হয়ে থাকে।

ইমাম যুফার (র) বলেন ঃ বন্ধকী জিনিসের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় এর মূল্য হিসাবে। অতএব যদি বন্ধকী বস্তু বন্ধক গ্রহীতার নিকট নষ্ট বা ধ্বংস হয়ে যায় এবং রাখার দিন এর মূল্য থাকে পনেরশত টাকা, আর ঋণ থাকে এক হাজার টাকা, তাহলে বন্ধকদাতা ব্যক্তি বন্ধক গ্রহীতার নিকট থেকে পাঁচশত টাকা ফেরৎ নিয়ে নিবে। তার দলীল হল হযরত আলী (র)-এর হাদীস। তিনি বলেন, বন্ধকের ক্ষেত্রে বন্ধকদাতা ও গ্রহীতা অতিরিক্ত পরিমাণ অর্থ বারবার লেন-দেন করে নিবে।

অধিকন্তু ঋণ হতে অতিরিক্ত পরিমাণ অর্থ দায়বদ্ধ অবস্থায় থাকে। কেননা, এ অর্থ তো ঋণের মুকাবিলায় আটকানো অবস্থায় থাকে। কাজেই ঋণ পরিমাণ অর্থ যেমনভাবে ক্ষতিপূরণের বস্তু হিসাবে থাকে, এমনিভাবে এই অতিরিক্ত পরিমাণ অর্থও ক্ষতিপূরণের বিষয় হিসাবে থাকবে।

আর আমাদের মাযহাবের বিষয়টি হযরত উমর এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (র) থেকে বর্ণিত আছে। অধিকন্তু বন্ধকী মাল গ্রহীতার অধিকার হচ্ছে নিজের পাওনা উসূল করার অধিকার। কাজেই যে পরিমাণ উসূল করার যোগ্য, সে পরিমাণ

জামানতই ওয়াজিব হবে। যেমন বাস্তবভাবে উসূল করার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। আর অতিরিক্ত অর্থও দায়বদ্ধ থাকবে। কেননা এ অংশ ছাড়া মূল বন্ধকী বস্তু আটকিয়ে রাখা অসম্ভব। বস্তুত: জামানতের ক্ষেত্রে এ প্রয়োজনীয়তা বিদ্যামান নেই। আর বর্ণিত হাদীসে বারবার একে অপরের থেকে নিজের পাওনা ফেরত নেওয়ার কথা উদ্ধৃত হয়েছে, তা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো বেচা-কেনার। কেননা হযরত আলী (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন ঃ বন্ধক গ্রহীতা ব্যক্তি অতিরিক্ত অর্থের ব্যাপারে আমানতদার।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ বন্ধক গ্রহীতা ব্যক্তির অধিকার রয়েছে, বন্ধকদাতার নিকট তার প্রদত্ত ঋণের দাবী করা এবং এ ঋণের কারণে তাকে বন্দী করানো।

কেননা বন্ধক প্রদানের পরও তার হক বাকী থাকে। বস্তুত বন্ধক তো হলো ঃ অতিরিক্ত হিফাযতের জন্য। কাজেই এতে নিজ পাওনার দাবী করা নিষিদ্ধ হবে না। আর বন্দী করা হলো যুলমের শাস্তি হিসাবে। অতএব বিচারকের নিকট যখন তার টাল বাহানা প্রকাশ পাবে, এখন সে তাকে বন্দী করে রাখতে পারবে। যেমন পূর্বে আমরা এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

বন্ধক গ্রহীতা ব্যক্তি যখন তার পাওনা ঋণের দাবী করবে, তখন তাকে বন্ধকী মাল হাযির করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হবে।

কেননা বন্ধকী মাল হস্তগত করা নিজের পাওনা উসূল করার জন্যই হয়ে থাকে। কাজেই পাওনা উসূল যোগ্য বন্ধকী বস্তুও নিজের হাতে রাখা জাইয নেই। কেননা যদি এ অধিকারকে বহাল রাখা হয় তাহলে এতে বন্ধক গ্রহীতা হাতে বন্ধকের মাল ধ্বংস হয়ে যাওয়ার অবস্থায় পুনঃপুনঃ পাওনা উসূল করা সাব্যস্ত হয়ে যায়। আর বন্ধক গ্রহীতার হাতে বন্ধকের মাল ধ্বংস হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

বন্ধক গ্রহীতা যখন বন্ধকের মাল হাজির করবে, তখন বন্ধকদাতাকে প্রথমে তার ঋণ পরিশোধের জন্য হুকুম করা হবে, যাতে বন্ধক গ্রহীতার হক সুনির্দিষ্ট হয়ে যায়। যেমন বন্ধকদাতার হক সুনির্দিষ্ট রয়েছে। যাতে উভয়ের মধ্যে সমতা বিধান হয়ে যায়। যেমন বিক্রীত পণ্য ও এর মূল্য হস্তান্তর করার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। অর্থাৎ প্রথমে বিক্রি পণ্য হাজির করা হয় তারপর প্রথমে মূল্য হস্তান্তর করা হয়। (এর পর পণ্য।)

যে শহরে বন্ধক চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে, সে শহরের বাইরে অন্য কোন শহরে বন্ধক গ্রহীতা যদি বন্ধকদাতার নিকট তার পাওনা পরিশোধের দাবী করে, আর বন্ধকী বস্তু যদি এমন কিছু হয়, যা বহন করতে বাহনের প্রয়োজন হয় না এবং বহন করতে কষ্টও হয় না, তবে এ ক্ষেত্রেও পূর্বোক্ত বিধান প্রযোজ্য হবে। কেননা যে জিনিস বহন করতে বাহনের প্রয়োজন হয় না, এবং যা বহন করা কষ্টসাধ্য কোন কাজও নয়, সে ক্ষেত্রে বন্ধকী বস্তু হস্তান্তর করার বিষয়ে সব জায়গায়ই এক ধরনের। এ

কারণেই এ জাতীয় মালামালের বায়য়ে সালামের[১] ক্ষেত্রে মাল কোন স্থানে হস্তান্তর করা হবে, তা বর্ণনা করা শর্ত নয়। এ ব্যাপারে ফকীহগণের ইজমা রয়েছে।

যদি বন্ধকী মাল এমন বস্তু হয়, যা বহন করার জন্য বাহনের প্রয়োজন এবং যা বহন করা কষ্টসাধ্য কাজ, তবে বন্ধকদাতা ব্যক্তি সে স্থানেই তার ঋণ পরিশোধ করে দিবে। কিন্তু বন্ধক গ্রহীতা ব্যক্তিকে বন্ধকী মাল হাযির করার জন্য বাধ্য করা হবে না। কেননা বন্ধকী মাল হাযির করা এক প্রকার স্থানান্তর। অথচ বন্ধক গ্রহীতার উপর ওয়াজিব হলো, বন্ধকের মাল হস্তান্তর করে দেওয়া। হস্তান্তর অর্থ হলো তা নিয়ন্ত্রণ মুক্ত করে দেওয়া। এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তর করা নয়। কেননা এতে বন্ধক গ্রহীতা ব্যক্তিকে অতিরিক্ত কষ্টের সম্মুখীন হতে হবে। অথচ সে এ কষ্ট সহ্য করাকে নিজের উপর অপরিহার্য করে নেয়নি।

যদি বন্ধকদাতা ব্যক্তি বন্ধকী মাল বিক্রি করার জন্য কোন ন্যায়পরায়ণ বিশ্বস্ত ব্যক্তির প্রতি দায়িত্ব প্রদান করে, তবে সে তা নগদ-বাকী উভয়ভাবেই বিক্রি করতে পারবে। কেননা তার আদেশটি হচ্ছে ব্যাপক। যদি বন্ধক গ্রহীতা ব্যক্তি ঋণ পরিশোধের জন্য বন্ধকদাতার নিকট দাবী করে, তবে বন্ধক গ্রহীতা ব্যক্তিকে বন্ধকী মাল হাযির করার জন্য বাধ্য করা যাবে না।

কেননা এ অবস্থায় মাল হাযির করার ব্যাপারে সে সক্ষম নয়।

এমনিভাবে যদি বন্ধকদাতা বন্ধক গ্রহীতা ব্যক্তিকে বন্ধকের মাল বিক্রি করার জন্য হুকুম করে এবং সে ঐ মাল বিক্রি করে দেয়, কিন্তু মূল্য হস্তগত না করে।

তবে এ ক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম হবে। কেননা বন্ধকদাতার হুকমে ঐ মাল বিক্রি করাতে, তা তার ঋণ হয়ে গেছে। এ অবস্থায় এটি এমন হবে, যেন বন্ধকদাতা ব্যক্তি তার পাওনা টাকা-পয়সা তার নিকট বন্ধক রেখেছে।

যদি বন্ধক গ্রহীতা ব্যক্তি বিক্রীত পণ্যের মূল্য হস্তগত করে নেয়, তবে তাকে বাধ্য করা হবে মূল্য হাযির করার জন্য।

কেননা এ ক্ষেত্রে বিনিময়ে প্রাপ্ত অর্থ যার বিনিময় স্বরূপ প্রদত্ত হয়েছে। এর স্থলাভিষিক্ত হয়ে গেছে। তবে যে ব্যক্তি বিক্রীত পণ্যের মূল্য হস্তগত করার দায়িত্বপ্রাপ্ত হবে, সেই বন্ধক গ্রহীতা রূপে গণ্য হবে। কেননা সেই হচ্ছে বিক্রি-চুক্তি সম্পাদন কারী। কাজেই অপরাপর লোকদের অধিকারের দায়-দায়িত্ব তার উপরই বর্তাবে। পূর্ণ-ঋণ উসূল করার ক্ষেত্রে যেমনিভাবে বন্ধকগ্রহীতা ব্যক্তিকে বন্ধকী মাল হাযির করার জন্য বাধ্য করা যায়, এমনিভাবে কোন এক মিস্ত্রীর টাকা, যা পরিশোধের সময় হয়েছে, তা উসূল করার ক্ষেত্রেও তাতে বন্ধকী মাল হাযির করার জন্য বাধ্য করা যাবে। কেননা তা ধ্বংস ও নষ্ট হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। এরপর যখন সে পণ্যের মূল্য হস্তগত করে নিবে, তখন তাকে বন্ধকী মাল হাযির করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হবে। কেননা সে তার পাওনা ঋণ উসূল করে নিয়েছে, মূল বস্তুর স্থলাভিষিক্ত হওয়ার কারণে।

---

১. এক ধরনের বেচা-কেনা, এ সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

এটি নিম্নোক্ত মাসআলার পরিপন্থী। অর্থাৎ ব্যক্তি গোলাম ভুল বশত: হত্যা কারীর যার তার আকিলা (অভিভাবক) কে এ নিহত গোলামের মূল্য তিন বছরের মধ্যে পরিশোধের হুকুম দেওয়া হলো। এ অবস্থায় হত্যাকারীর আকিলা কর্তৃক গোলামের পূর্ণ মূল্য পরিশোধ না করা পর্যন্ত বন্ধকদাতা ব্যক্তিকে তার ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে বাধ্য করা যাবে না। কেননা এ ক্ষেত্রে মূল্য বন্ধকী মালের স্থলাভিষিক্ত সাব্যস্ত হয়েছে। তাই পূর্ণ মূল্য হাযির করা আবশ্যক, যেমন বন্ধকী মাল নষ্ট না হওয়া অবস্থায় এ মালের পূরাই হাযির করা আবশ্যক হয়। এখানে বন্ধকী মাল বন্ধকদাতা ব্যক্তির কর্মের কারণে মূল্যামান সম্পন্ন বস্তুতে পরিণত হয়নি। আর পূর্ববর্তী মাসআলায় বন্ধকদাতার কর্মের কারণেই বন্ধকী বস্তুটি ঋণে পরিণত হয়েছে। কাজেই উভয় মাসআলার মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট।

বন্ধকদাতা ব্যক্তি বন্ধকী মাল কোন ন্যায়পরায়ণ বিশ্বস্ত ব্যক্তির নিকট রেখে, তাকে এ মাল অন্য কোন ব্যক্তির নিকট আমানত রাখার জন্য নির্দেশ দিল, আর সে ব্যক্তি তাই করলো, এরপর বন্ধক গ্রহীতা ব্যক্তি তার পাওনা দাবী করতে লাগল; এ অবস্থায় তাকে বন্ধকী মাল উপস্থিত করার জন্য বাধ্য করা যাবে না।

কেননা বন্ধকদাতা ব্যক্তি বন্ধক গ্রহীতার উপর এ ব্যাপারে নির্ভর করেনি। একারণেই তো সে তা অন্যের নিকট আমানত রেখেছে। কাজেই এ মাল হস্তান্তর করা বন্ধক গ্রহীতা ব্যক্তির ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত নয়।

যদি সেই বিশ্বস্ত ব্যক্তি বন্ধকী মাল তার পরিবারের কোন ব্যক্তির নিকট আমানত রাখে এবং পরে সে (ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি) অদৃশ্য হয়ে যায়, এ অবস্থায় বন্ধক গ্রহীতা ব্যক্তি যদি তার পাওনা দাবী করে, আর যার হাতে এ মাল রয়েছে সে বলেঃ এ মাল অমুক ব্যক্তি আমার নিকট আমানত রেখেছে- তবে এ মাল কার তা আমি জানি না, তাহলে বন্ধকদাতা ব্যক্তিকে ঋণ পরিশোধ করার জন্য বাধ্য করা হবে।

কেননা বন্ধকী মাল হাযির করা বন্ধক গ্রহীতার উপর ওয়াজিব নয়। অর্থাৎ এটি তার দায়িত্ব নয়। কেননা সে বন্ধকী কোন মাল হস্তগত করেনি।

অনুরূপ ভাবে যদি সে ন্যায়পরায়ণ বিশ্বস্ত ব্যক্তি বন্ধকের মাল নিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায় এবং সে কোথায় আছে, তা জানা না যায়, তবে এ ক্ষেত্রেও সে হুকুম প্রযোজ্য হবে। এর কারণ আমরা পূর্বেই বর্ণনা করেছি। ন্যায়পরায়ণ বিশ্বস্ত ব্যক্তি যার নিকট বন্ধকের মাল আমানত রেখেছে, সে যদি বন্ধকী মালের কথা অস্বীকার করে এবং বলেঃ এটি আমারই মাল, তাহলে বন্ধক গ্রহীতা ব্যক্তি বন্ধকদাতার নিকট থেকে কোন কিছু ফেরত পাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না বন্ধক গ্রহীতা ব্যক্তি এর বন্ধকী মাল হওয়ার বিষয়টি সাব্যস্ত করবে।

কেননা আমানতদার ব্যক্তি যখন বন্ধকের বিষয়টিকে অস্বীকার করেছে, তখনই তা ধ্বংস হয়ে গেছে বলে ধর্তব্য হবে। আর মাল ধ্বংস হয়ে গেলে এর দায়-দায়িত্ব বন্ধক

গ্রহীতার উপরই বর্তাবে। এ হিসাবে সাব্যস্ত হবে যে, সে তার পাওনা উসূল করে নিয়েছে। অতএব সে আর তার পাওনার দাবী করতে পারবে না।

ইমাম কুদূরী (র) বলেনঃ বন্ধকের মাল যদি বন্ধক গ্রহীতার নিয়ন্ত্রণে থাকে, তবে বন্ধকদাতাকে এ মাল বিক্রি করার অধিকার দেওয়া তার উপর অপরিহার্য নয়, যতক্ষণ না বন্ধকদাতা তার পাওনা পরিশোধ করে দেবে।

কেননা বন্ধকী মালের হুকুম হলোঃ যতক্ষণ না ঋণ পরিশোধ করা হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তা দায়বদ্ধ থাকবে। যেমন আমরা পূর্বেও এ কথা বর্ণনা করেছি।

যদি বন্ধকদাতা ব্যক্তি তার ঋণের কিছু অংশ পরিশোধ করে, তাহলে অবশিষ্ট পাওনা পরিশোধ না করা পর্যন্ত বন্ধক গ্রহীতা ব্যক্তি পূর্ণ বন্ধকী বস্তুই তার নিকট আটকিয়ে রাখতে পারবে।

বিক্রীত পণ্য আটকিয়ে রাখার ন্যায় (মূল্য পরিশোধ না করা অবস্থায়) কিন্তু ঋণ পরিশোধ করে দেওয়ার পর বন্ধক গ্রহীতা ব্যক্তিকে বলা হবেঃ তুমি বন্ধকী বস্তু তার নিকট হস্তান্তর করে দাও। কেননা হকদারের নিকট তার হক পৌঁছে যাওয়ার পর, বন্ধকী মাল হস্তান্তরে যে প্রতিবন্ধকতা ছিল, তা শেষ হয়ে গেছে।

বন্ধকী মাল হস্তান্তর করার আগেই তা যদি বিনাশ হয়ে যায়, তবে বন্ধকদাতা ব্যক্তি যে পরিমাণ ঋণ পরিশোধ করেছে, তা ফেরত নিয়ে নিবে।

কেননা সাবেক হস্তগত করার ভিত্তিতে মালামাল বন্ধক গ্রহীতার নিকট বিনাশ হওয়ার কারণে ধরে নেওয়া হবে যে, সে তার পাওনা বুঝে পেয়েছে। কাজেই দ্বিতীয়বার উসূল করার বিষয়টি পুনঃ পুনঃ উসূল করা বলে গণ্য হবে। অতএব তার উপর ওয়াজিব হবে তা ফেরত দিয়ে দেওয়া।

এমনিভাবে যদি বন্ধকদাতা ও বন্ধক গ্রহীতা বন্ধকচুক্তিকে বাতিল করে দেয়, তবে প্রদত্ত ঋণ হস্তগত না করা বা ঋণ থেকে দায়মুক্ত না করা পর্যন্ত বন্ধক গ্রহীতা ব্যক্তি বন্ধকী মাল আটকিয়ে রাখতে পারবে।

উল্লেখ্য যে, বন্ধক গ্রহীতা যদি বন্ধকদাতার নিকট বন্ধকী মাল, তা বাতিল করার প্রক্রিয়ায় ফেরত দিয়ে দেয়, তবেই কেবল বঙ্গক চুক্তি বাতিল হয়ে থাকে। কেননা বন্ধকী মাল হস্তগত ও ঋণ বাকী থাকা অবস্থায়, বন্ধকীবস্তু দায়বদ্ধ হিসাবেই বাকী থাকে।

যদি বন্ধকী মাল বন্ধক গ্রহীতার নিয়ন্ত্রণে থাকা অবস্থায় বিনাশ হয়ে যায়, তবে ঋণ রহিত হয়ে যাবে, যদি এর দ্বারা ঋণ পুরাপুরি পরিশোধ হয়ে যায়। কেননা এখনো বন্ধক চুক্তি বাকী রয়েছে। বন্ধক গ্রহীতা ব্যক্তির জন্য জাইয নেই বন্ধকী মাল দ্বারা উপকৃত হওয়াঃ খিদমত হাসিল করে বসবাস করে বা যা পরিধান করে , কোন ভাবেই তা জাইয হবেনা। অবশ্য মালিক অনুমতি দিলে তা জাইয হবে।

কেননা বন্ধক গ্রহীতা ব্যক্তির জন্য এ মাল আটকিয়ে রাখার তো অধিকার আছে। কিন্তু এর দ্বারা উপকৃত হবার তার কোন অধিকার নেই।

এমনিভাবে তা বিক্রি করারও তার অধিকার নেই। অবশ্য বন্ধকদাতা যদি তাকে এ দায়িত্ব প্রদান করে, তাহলে জাইয হবে। অনুরূপভাবে বন্ধকী মাল ইজারা বা ধার দেওয়াও তার জন্য জাইয নেই।

কেননা বন্ধকী মাল দ্বারা সে নিজেই উপকৃত হওয়ার অধিকার রাখেনা। কাজেই অন্য কাউকে এর দ্বারা উপকৃত হওয়ার জন্যও সে সুযোগ দিতে পারবে না। যদি এরূপ করে, তবে সে সীমালংঘনকারী বলে গণ্য হবে। কিন্তু সীমালংঘনের কারণে বন্ধক চুক্তি বাতিল হবে না।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ বন্ধক গ্রহীতার জন্য জাইয আছে বন্ধকের মাল নিজে হিফাযত করা বা নিজের স্ত্রী সন্তান ও পরিবারস্থ খাদিম দ্বারা হিফাযতের ব্যবস্থা করা।

হিদায়া **গ্রন্থকার শায়খ বুরহান উদ্দিন (র) বলেন ঃ এখানে সন্তান থেকে ঐ সন্তান উদ্দেশ্যে।**

যে তার সাথে একই ঘরে বসবাসও করে। কেননা বন্ধকের মূলবস্তুটি বন্ধক গ্রহীতার নিকট আমানত স্বরূপ। এ হিসাবে বন্ধকের বিষয়টি আমানতের অনুরূপ হয়ে গেল।

যদি বন্ধক গ্রহীতা ব্যক্তি এমন ব্যক্তির মাধ্যমে বন্ধকী মালের হিফাযতের ব্যবস্থা করে, যে তার সাথে একই ঘরে বসবাস করে না এবং যে তার পরিবার ভুক্তও নয় অথবা অন্য কারো নিকট তা আমানত রাখে, তবে বন্ধক গ্রহীতা ব্যক্তি এর যামিন বলে গণ্য হবে। তবে দ্বিতীয় ব্যক্তিকে এর ক্ষতিপূরণের দায় দায়িত্ব বহন করতে হবে কিনা, এ সম্বন্ধে মতভেদ রয়েছে।

এ সম্পর্কিত সমুদয় মাসআলা আমরা দলীল প্রমাণসহ বিস্তারিতভাবে আমানত অধ্যায়ে উল্লেখ করেছি।

যদি বন্ধকী মালের ব্যাপারে বন্ধকগ্রহীতা ব্যক্তি সীমালংঘন করে, তবে আত্মসাতের ক্ষতিপূরণের ন্যায় তাকে এর পূর্ণ মূল্যের ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করতে হবে।

কেননা ঋণের অতিরিক্ত পরিমাণ অর্থ বন্ধক গ্রহীতার নিকট আমানত স্বরূপ। আর আমানতের ক্ষেত্রে সীমালংঘনের কারণে ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হয়ে থাকে।

কোন ব্যক্তি কারো নিকট আংটি বন্ধক রাখার পর সে যদি তা তার কনিষ্ঠাঙ্গুলে ব্যবহার করে, তবে তাকে ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করতে হবে। কেননা আংটিটি ব্যবহার করে সে সীমালংঘন করেছে। কারণ তাকে আংটি ব্যবহারের জন্য অনুমতি দেওয়া হয়নি। তাকে তো শুধুমাত্র হিফাযতের অনুমতি প্রদান করা হয়েছিল। ব্যবহারের ক্ষেত্রে ডান হাত এবং বাম হাত উভয়ই সমান। কেননা আংটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে মানুষের অভ্যাস বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে।

আর যদি আংটিটি অন্যান্য আঙ্গুলে ব্যবহার করে, তবে এটি বন্ধক হিসাবেই গণ্য হবে ঐ পরিমাণ অর্থের মুকাবিলায়, যার বিনিময়ে আংটিটি বন্ধক রাখা হয়েছে।

কেননা সাধারণত: এ সব আঙ্গুলে আংটি ব্যবহার করা হয় না।[১] কাজেই হিফাযতের জন্যই এভাবে পরিধান করা হয়েছে বলে গণ্য করা হবে। চাদরের হুকুমও অনুরূপই অর্থাৎ যদি স্বাভাবিক নিয়মে তা ব্যবহার করা হয়।

তবে তার উপর ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে। আর যদি কাঁধের উপর রেখে দেয়, তাহলে ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না।

দুটি অথবা তিনটি তরবারি বন্ধক রাখার পর, বন্ধক গ্রহীতা ব্যক্তি যদি তা শরীরে ঝুলিয়ে চলে, তাহলে তিনটি ঝুলালে তার উপর ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না। কিন্তু দুটি ঝুলালে ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে।

কেননা বাহাদুর লোকেরা সাধারণত যুদ্ধের ময়দানে দু'টি তরবারি লটকিয়ে চলে। কিন্তু তিনটি লটকিয়ে চলার রেওয়াজ তাদের মধ্যে নেই। কেউ যদি আংটির উপর আংটি পরিধান করে এবং সে যদি ঐ সমস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়, যারা সৌন্দর্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্য দুই আংটি ব্যবহার করে থাকে, তবে তার উপর ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে। আর যদি সৌন্দর্য বৃদ্ধি তার উদ্দেশ্য না হয়, তবে সে হিফাযতকারী হিসাবে গণ্য হবে। এতে তার উপর ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ বন্ধকী মাল যে ঘরে হিফাযত করা হবে, ঐ ঘরের ভাড়া বন্ধক গ্রহীতার উপর বর্তাবে। এমনিভাবে হিফাযতকারী ব্যক্তির পারিশ্রমিকও বন্ধক গ্রহীতা ব্যক্তির উপর বর্তাবে। আর রাখালের পারিশ্রমিক এবং বন্ধকী বস্তুর খরচা বন্ধকদাতার উপর বর্তাবে।

এ ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো বন্ধকী বস্তুর কল্যাণার্থে এবং এর স্থায়িত্বের জন্য খরচাদিসহ যা কিছুর প্রয়োজন হবে, এর দায়-দায়িত্ব বন্ধকদাতার উপর বর্তাবে। চাই ঋণের তুলনায় বন্ধকী মালের পরিমাণ বেশী হোক বা না হোক। কেননা মূল বস্তুটিতো তার মালিকানাধীনই রয়েছে এবং এর লাভালাভের মালিকও সেই। কাজেই এর ইসলাহ ও সংশোধনী এবং একে বাঁচিয়ে ও টিকিয়ে রাখার যাবতীয় দায়িত্ব তার উপর বর্তাবে। কেননা এ তো তার মালিকানাধীন বস্তুরই খরচাদি। যেমন আমানতের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। এ জাতীয় খরচাদি হলো বন্ধকী বস্তুর পালাহার জাতীয় খরচা। রাখালের পারিশ্রমিকের বিষয়টিও অনুরূপই। কেননা তার মূল কাজ হচ্ছে বস্তুর দানা-পানির ব্যবস্থা করা। বন্ধকী গোলামের লেবাস পোশাক, বন্ধকী শিশুর স্তন্যদানকারী মহিলার পারিশ্রমিক, বাগানে পানি সিঞ্চন করা, নহর ও খাল খনন করা, খেজুর গাছের মধ্যে প্রজনন কর্ম সম্পাদন করা, গাছের ফল-ফলাদি কাটা, এ সবের কল্যাণ সাধন করা

১. যে দেশে আংটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে এ রেওয়াজ আছে, সব দেশে এ হুকুম প্রযোজ্য হবে : আর যে দেশে সর্ব আঙ্গুলে আংটি ব্যবহারের রেওয়াজ রয়েছে সে দেশে যে কোন আঙ্গুলেই আংটি ব্যবহার করা হোক না কেন, সর্বাবস্থায় ব্যবহারকারী ব্যক্তির উপর ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে।

ইত্যাদি বিষয়গুলোও বন্ধকী বস্তুর ইসলাহ, বেঁচে থাকা ও টিকে থাকার সাথে সম্পর্কিত। কাজেই এসবের দায়-দায়িত্ব বন্ধকদাতার উপর বর্তাবে।

আর যে সমস্ত কাজ বন্ধকী বস্তুর হিফাযতের সাথে সংশ্লিষ্ট, অথবা বন্ধক গ্রহীতার হাতে পূর্ণ মাল বা মালের কিয়দংশ পৌঁছিয়ে দেওয়ার সাথে সম্পর্কিত, এর দায়-দায়িত্ব বন্ধক গ্রহীতার উপর বর্তাবে। যেমন হিফাযতকারী ব্যক্তির পারিশ্রমিক। কেননা বন্ধকের মাল আটকিয়ে রাখা তার দায়িত্ব এবং ঐ মালের হিফাযত করাও তার উপর ওয়াজিব। কাজেই এই হিফাযতের পারিশ্রমিক প্রদানের দায়িত্ব তার উপরই বর্তাবে। অনুরূপভাবে যে ঘরে বন্ধকের মাল হিফাযত করা হবে, সে ঘরের ভাড়াও বন্ধক গ্রহীতাকেই প্রদান করতে হবে। এটি হচ্ছে যাহিরী রিওয়ায়েতের কথা।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, খোর-পোষের ন্যায় বাড়ীর ভাড়াও বন্ধক গ্রহীতার উপর বর্তাবে। কেননা এটিও বন্ধকী মাল বাকী রাখা বা টিকিয়ে রাখার প্রচেষ্টারই অন্তর্ভুক্ত। বন্ধক গ্রহীতার উপর যে সব দায়-দায়িত্ব বর্তায়, এর মধ্যে একটি অন্যতম বিষয় হলো পলায়নকারী গোলাকে ফিরিয়ে আনার খরচ।

এটি বন্ধক গ্রহীতার উপর ওয়াজিব। কেননা প্রদত্ত ঋণ উসুল করার হৃত ক্ষমতা ফিরে পাওয়া তার জন্য অপরিহার্য, যাতে সে বন্ধকী বস্তুটি বন্ধক দাতার নিকট ফেরৎ দিতে সক্ষম হয়। এটি ফেরৎ আনার খরচের মধ্যে শামিল। কাজেই এ খরচ তার উপরই অপরিহার্য হবে।

এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে, যখন বন্ধকী বস্তুর মূল্য এবং ঋণের পরিমাণ সমান সমান হয়। যদি ঋণের তুলনায় বন্ধকী মালের মূল্য বেশী হয় তবে বন্ধক গ্রহীতার উপর তার দায়-অনুপাতে যিম্মাদারী বর্তাবে। আর অতিরিক্ত যা আছে, সে অনুপাতে দায়িত্ব বন্ধক দাতার উপর বর্তাবে।[১] কেননা অতিরিক্ত মাল বন্ধক গ্রহীতার নিকট আমানতী বস্তু। আর বন্ধকী বস্তু ফেরত দেওয়া হয় কবজাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করার জন্য। অথচ অতিরিক্ত পরিমাণের ক্ষেত্রে বন্ধক গ্রহীতার কবজা মালিকের কবজার অনুরূপই। কেননা এ মালের ব্যাপারে সে একজন আমানতদার ব্যক্তি। অতএব অতিরিক্ত মাল অনুপাতে খরচা প্রদান করা মালিকের দায়িত্ব হিসাবেই সাব্যস্ত হবে।

ঘরের ভাড়া দেওয়ার বিষয়টি, যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি, তা এর থেকে ব্যতিক্রম। কেননা ঘরের পূর্ণ ভাড়াই বন্ধক গ্রহীতার উপর ওয়াজিব হবে, যদিও বন্ধকী বস্তুর মূল্য ঋণের তুলনায় বেশী হয়। কেননা ঘরের ভাড়া ওয়াজিব হয় মাল আটকিয়ে রাখার কারণে। আর মাল আটকিয়ে রাখার হক বন্ধক গ্রহীতার জন্য পূর্ণ মালের মধ্যেই সাব্যস্ত হয়ে থাকে। (কাজেই এর পূর্ণ ভাড়া বন্ধক গ্রহীতাকেই দিতে হবে।) আর খরচের বিষয়টি যামানত বা দায়-হিসাবে তার উপর অপরিহার্য হয়ে থাকে। কাজেই যামানত অনুপাতেই তার উপর দায়িত্ব বর্তাবে।

---

১. যেমন বন্ধকী এক গোলাম, যে পালিয়ে অন্যত্র চলে গেছে। তার মূল্য দুই শত টাকা। আর ঋণের পরিমাণ হলো দেড় শত টাকা। তাকে ফেরৎ আনতে মজুরী লাগে চল্লিশ টাকা। তাহলে ত্রিশ টাকা দিবে বন্ধক গ্রহীতা এবং দশ টাকা দেবে বন্ধকদাতা ব্যক্তি।

জখম, ফোঁড়া এবং অন্যান্য রোগ-ব্যাধির চিকিৎসা, এমনিভাবে জিনায়াত তথা অপরাধের ফিদ্‌য়া বা মুক্তিপণ, যামানত ও আমানত হিসাবে উভয়ের উপর বর্তাবে। খারাজ শুধু মাত্র বন্ধকদাতা ব্যক্তির উপর বর্তাবে। কেননা এটি হলো মালিকানার ট্যাক্স। উৎপন্ন ফসলের উশ্‌রের বিষয়টি বন্ধক গ্রহীতা ব্যক্তির হকের উপর অগ্রগণ্য হবে। কেননা উশরের সম্পর্ক হলো মূল মালের সাথে। এ অবস্থায় অবশিষ্ট বস্তুতে বন্ধক-চুক্তি বাতিল হবে না। কেননা তা অপরিহার্য হওয়ার বিষয়টি বন্ধক দাতার মালিকানা সাব্যস্ত হওয়ার পরিপন্থী নয়। কিন্তু হক প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বিষয়টি এর থেকে ব্যতিক্রম।

এক জনের উপর যা ওয়াজিব হয়েছিল, তা যদি অপর জন আদায় করে দেয়, তাহলে এটি নফল কাজ হিসাবে গণ্য হবে। একজনের উপর যে ব্যয় ওয়াজিব হয়েছিল, তা যদি অপর জন বিচারকের নির্দেশে নির্বাহ করে তবে সে এ টাকা পয়সা তার থেকে ফেরৎ নিয়ে নেবে। যেন এ ব্যয়ের ব্যাপারে তার অপর সাথী তাকে নির্দেশ দিয়েছে। কেননা বিচারকের অধিকার হলো ব্যাপক সর্বজন ব্যাপৃত। ইমাম আবু হানীফা (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, অপর ব্যক্তি যদি উপস্থিত থাকে, তবে এ অবস্থায় বিচারকের নির্দেশে ব্যয় করে থাকলেও এ টাকা পয়সা সে ফেরত নিতে পারবেনা। ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন ঃ উভয় অবস্থায়ই সে, ফেরৎ নিতে পারবে। মৌলিকভাবে এ মাসআলাটি, 'حَجْرٌ' বা বিচারক কর্তৃক কারো প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার মাসআলা থেকে উদ্ভাবিত একটি শাখা মাসআলা। বস্তুত: আল্লাহ তা'আলাই এ সম্বন্ধে সর্বাধিক জ্ঞাত।

যে যে জিনিস বন্ধক রাখা জাইয এবং যে যে জিনিস বন্ধক রাখা জাইয নয়

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ যে বস্তু বিভাজনকৃত নয়, এ জাতীয় বস্তু বন্ধক রাখা জাইয নয়।

ইমাম শাফিঈ (র) এর মতে এরূপ জিনিস বন্ধক রাখা জাইয। এ পর্যায়ে আমাদের দুই ধরনের দলীল রয়েছে ঃ

(১) প্রথম দলীলটি বন্ধাকের হুকুমের উপর নির্ভরশীল । কেননা আমাদের মতে বন্ধকের হুকুম হলো পাওনা উসুল করার অধিকার সাব্যস্ত হওয়া। আর এ বিষয়টি অভিভাজ্য বস্তুর মধ্যে হাসিল হয় না। ইমাম শাফিঈ (র) এর মতে অভিভাজ্য বস্তুতেও বন্ধকের হুকুম প্রযোজ্য হয়। আর, তা হলো-বন্ধকী মাল বিক্রির জন্য নির্ধারিত হওয়া।

(২) আমাদের দ্বিতীয় দলীল হলোঃ বন্ধকের হুকুম হচ্ছে চিরস্থায়ীভাবে দায়বদ্ধ হওয়া। কেননা বন্ধক চুক্তি শরী'আত কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে হস্তান্তরকৃত অবস্থায়। এ বিষয়টি কুরআন মজীদের আয়াত দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে অথবা বন্ধকের উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে তা নির্ধারণ করা হয়েছে। আর তা হচ্ছে নিজের পাওনাকে পাকা-পোক্ত করা ঐ পদ্ধতিতে, যে পদ্ধতির কথা আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। এই সবগুলো বিষয়ই সর্বদা বা চিরস্থায়ী অবস্থার সাথে সম্পর্কিত। আর বন্ধকী মাল আটকিয়ে রাখার অধিকারই কেবল সর্বদার জন্য কোন মাল আটকিয়ে রাখা পর্যন্ত পৌছিয়ে দেয়। তাই যদি আমরা বিভাজনকৃত নয় এমন বস্তু বন্ধক রাখার অনুমতি দেই, তাহলে স্থায়ীত্ব নষ্ট হয়ে যাবে। কেননা এ অবস্থায় পালা বণ্টন করা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়াবে। ফলে এটি এমন হবে, যেন কেউ বললো ঃ এ জিনিসটি আমি তোমার নিকট এক দিনের জন্য বন্ধক রাখলাম, কিন্তু অন্য দিনের জন্য রাখলাম না। এ কারণেই এমন জিনিস বন্ধক রাখা জাইয নয়, যা বণ্টনযোগ্য এবং যা বণ্টনযোগ্য নয়। কিন্তু হিবার বিষয়টি এর থেকে ব্যতিক্রম। কেননা এমন জিনিসও হিবা করা জাইয, যা বণ্টনযোগ্য নয়। কেননা বন্টনের ক্ষয়-ক্ষতি হিবার জন্য প্রতিবন্ধক। আর তা ঐ জিনিসের মধ্যে পাওয়া যায়, যা বন্টনযোগ্য। উল্লেখ্য যে, হিবার উদ্দেশ্য হলো অন্যকে মালিক বানিয়ে দেওয়া। আর যে জিনিস বিভাজনকৃত নয়, তাও মালিকানাকে কবুল করে। যদিও তা বন্টনযোগ্য না হয়। বন্ধকের ক্ষেত্রে হুক্‌ম হলো ঃ নিজের পাওনা উসুল করার ক্ষমতা সাব্যস্ত হওয়া। আর যে জিনিস বিভাজনকৃত নয়, তা একে কবুল করে না। যদিও তা বন্টনযোগ্য না হয়।

যে বস্তু বিভাজনকৃত নয়, তা অপর শরীকের নিকট বন্ধক রাখা জাইয নয়। কেননা বিভাজনকৃত নয় এমন বস্তুর বন্ধক, বন্ধকের হুকুমকে কবুল করে না, অর্থাৎ বন্ধক রাখা যায় না। প্রথম দলীলের ভিত্তিতেও কবুল করে না এবং দ্বিতীয় দলীলের ভিত্তিতেও কবুল করে না। কেননা এরূপ অবস্থায় বন্ধক গৃহীতা ব্যক্তি তাতে একদিন মালিকানার ভিত্তিতে বসবাস করবে এবং অপর একদিন বসবাস করবে বন্ধকের ভিত্তিতে। আর এটি এমন হলো-যেন সে একদিনের জন্য বন্ধক রাখল আবার আরেক দিনের জন্য রাখলনা। মাবসূত গ্রন্থের বর্ণনা মতে شُيُوْعٌ طَارِئٌ (যে অংশীদারীত্ব পরে যাহির হয়েছে প্রথমে ছিলনা) বন্ধকের স্থায়িত্বের জন্য প্রতিবন্ধক।[১] কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর বর্ণনা মতে এটি প্রতিবন্ধক হতে পারে না। কেননা প্রথম পর্যায়ের, হুকুম থেকে স্থায়িত্বের হুকুম সহজ। কাজেই এটি বিযার অনুরূপ হয়ে গেল।

মাব্‌সূতের বর্ণনার দলীল হলো ঃ বিভাজনকৃত নয়-এমন বস্তুর বন্ধক জাইয হয় না, বন্ধকের ক্ষেত্র না থাকার কারণে। আর যে জিনিস কোন ক্ষেত্রের সাথে সম্পর্কিত, তাতে সূচনা ও স্থায়িত্ব উভয়ই সমান।। যেমন বিবাহের ক্ষেত্রে মুহাররমাতের বিষয়ে সূচনা ও স্থায়িত্ব উভয়ই সমান। হিবার বিষয়টি বন্ধক থেকে ব্যতিক্রম। কেননা বিভাজনকৃত নয়, এমন বস্তু হিবার হুক্‌মকে কবুল করে নেয়। আর তা হলো অন্যকে মালিক বানিয়ে দেওয়া। আর সূচনাতে দখলী স্বত্ব থাকা এ জন্য জরুরী, যাতে বন্টনের ক্ষয়-ক্ষতি তার উপর না বর্তায়। যেমন আমরা এ সম্পর্কে পূর্বে বর্ণনা করেছি। কিন্তু স্থায়িত্বের অবস্থায় দখলী স্বত্ব জরুরী নয়। এ কারণেই হিবার মধ্যে এর কিয়দংশ প্রত্যাহার করে নেওয়া জাইয। কিন্তু বন্ধকী বস্তুর কিয়দংশের ক্ষেত্রে বন্ধক চুক্তি বাতিল করা জাইয নেই।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ খেজুর বৃক্ষ ব্যতিরেকে শুধুমাত্র খেজুর গাছের খেজুর এবং জমি বাদ দিয়ে শুধুমাত্র জমির ফসল বন্ধক রাখা জাইয নেই। এমনিভাবে জমি বাদ দিয়ে শুধুমাত্র খেজুর গাছ বন্ধক রাখাও জাইয নেই। কেননা এ ক্ষেত্রে বন্ধকী বস্তু সৃষ্টিগতভাবেই এমন জিনিসের সাথে সংযুক্ত, যা বন্ধকী বস্তু নয়। এ হিসাবে এ বন্ধকী বস্তু-যে জিনিস বিভাজনকৃত নয় এর অনুরূপ হয়ে গেল। **এমনিভাবে কেউ যদি খেজুর গাছ বা জমির ফসলাদি বাদ দিয়ে, শুধুমাত্র জমি বন্ধক রাখে, অথবা ফল-ফলাদি বাদ দিয়ে শুধুমাত্র খেজুর গাছ বন্ধক রাখে, তবে এর হুকুমও অনুরূপ হবে।** কেননা সংযুক্তি দুই দিক থেকেই হয়ে থাকে। এ হিসাবে এখানে মূলনীতি এই দাঁড়ায় যে, বন্ধকী বস্তু যদি এমন জিনিসের সাথে সংযুক্ত থাকে, যা বন্ধকী বস্তু হতে পারেনা, তাহলে এ জাতীয় বস্তু বন্ধকী বস্তু হতে পারে না। কেননা এ অবস্থায় বন্ধকী বস্তু স্বতন্ত্রভাবে হস্তগত করা সম্ভব নয়।

পক্ষান্তরে হযরত ইমাম আবু হানীফা (র) হতে বর্ণিত আছে যে, গাছ ব্যতীত শুধু জমি বন্ধক রাখাও জাইয আছে। কেননা গাছ তো এমন উদ্ভিদের নাম, যা কোন স্থানে

১. অর্থাৎ এ অবস্থায় বন্ধক চুক্তি নষ্ট হয়ে যাবে।

উদগত হয়। **কাজেই গাছ নিজ স্থানসহ** হুকুম থেকে আলাদা-হবে. অর্থাৎ বাদ যাবে। **কিন্তু কেউ যদি অট্টালিকা ছাড়া শুধু বাড়ী** বন্ধক রাখে. তবে এর হুকুম ব্যতিক্রম হবে। কেননা অট্টালিকা এমন জিনিসের নাম, যা ভূমির উপর তৈরী করা হয়। কাজেই তার এ বন্ধক এমন হলো যে. সে সম্পূর্ণ ভূমি বন্ধক রাখলো বটে, আর এতে বন্ধক দাতার মালিকানাও জড়িত রয়েছে। **খেজুর গাছ উদগত হওয়ার স্থানসহ কেউ যদি খেজুর গাছ বন্ধক রাখে, তবে তা জাইয হবে।** কেননা এ সংযুক্তি প্রতিবেশীসুলভ সংযুক্তি। এ জাতীয় সংযুক্তি বন্ধক বৈধ হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হতে পারে না।

যদি এ জাতীয় গাছে খেজুরের ফল-ফলাদি থাকে, তবে তাও বন্ধকের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে। কেননা খেজুর ফল বৃক্ষের সাথে সংযুক্ত হওয়ায় এটি গাছেরই সংশ্লিষ্ট বস্তু। কাজেই সংশ্লিষ্ট হিসাবেই এটি বন্ধকের অন্তর্ভুক্ত হবে-এতে উদ্দেশ্য হচ্ছে বন্ধক চুক্তিকে সহীহ রাখা। পক্ষান্তরে বেচা-কেনার বিষয়টি এর থেকে ব্যতিক্রম। কেননা খেজুর ছাড়াও খেজুর গাছ বিক্রি করা জাইয। অতএব ফলের কথা উল্লেখ না করা অবস্থায় ফলকে বন্ধক চুক্তির অন্তর্ভুক্ত করাতে কোন ক্ষতি নেই। এমনিভাবে বাড়ীতে রক্ষিত মাল-সামানও এ হুকুমের ব্যতিক্রম। এ কারণেই এ সব সামান উল্লেখ করা ছাড়া বাড়ী বন্ধক রাখার মধ্যে শামিল হয় না। কেননা এক হিসাবে এ সামান বাড়ীর সংশ্লিষ্ট কোন বস্তু নয়। অনুরূপভাবে জমি বন্ধক দিলে জমির ফসল এবং তাজা খেজুর **এর মধ্যে শামিল** বলে গণ্য হয়ে থাকে। কিন্তু ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এ গুলো অন্তর্ভুক্ত হয় না। এর কারণ ফল সম্পর্কিত আলোচনায় আমরা উল্লেখ করেছি।

জমি, বাড়ী ও গ্রাম বন্ধক দিলে এর মধ্যে ঘর-দুয়ার এবং গাছ-পালাও অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। এর কারণও আমরা উল্লেখ আগে করেছি। **যদি কেউ বাড়ীর সামানসহ বাড়ী বন্ধক দেয়, তবে তা জাইয হবে।** যদি বন্ধকী বস্তুর কিয়দংশের ক্ষেত্রে কেউ মালিকানা দাবী করে, তাহলে অবশিষ্ট অংশ যদি এমন হয় যে, সূচনাতেই এই অংশটিকে কেবল বন্ধক হিসাবে রাখা জাইয ছিল, তবে এই অংশটি বন্ধক হিসাবেই থাকবে। **অন্যথায় প্রদত্ত বস্তুর পুরাটার ক্ষেত্রেই বন্ধক চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে।** কেননা এ ক্ষেত্রে এ কথাই ধর্তব্য হবে যে. এই অবশিষ্ট বস্তুটিই বন্ধক হিসাবে প্রদত্ত হয়েছিল। বন্ধক দেওয়া বাড়ীতে যদি বন্ধকদাতা ব্যক্তি নিজে বা তার সামান থাকে, তবে বন্ধকী বস্তু হস্তান্তর হয়নি বলে গণ্য হবে। এমনিভাবে যদি বন্ধকী পাত্রে বন্ধকদাতার সামান থাকে, তবে এটিও হস্তান্তর হয়নি বলে বিবেচিত হবে। বন্ধক দেওয়া সওয়ারীর উপর বোঝা থাকাও হস্তান্তরে প্রতিবন্ধক। কাজেই বোঝা না ফেলা পর্যন্ত হস্তান্তর পূর্ণ হবে না। কেননা এ বোঝা পশুটিকে কাজে নিয়োজিত করে রেখেছে। পক্ষান্তরে কেউ যদি চতুষ্পদ প্রাণী ছাড়া শুধুমাত্র মালভর্তি বোঝা বন্ধক রাখে. তবে এর হুকুম ভিন্ন হবে। অর্থাৎ এ অবস্থায় বন্ধকী মাল নিয়ে সওয়ারী বাহন বন্ধক গ্রহীতার নিকট পৌছার সাথে সাথেই বন্ধক পূর্ণ হয়ে যাবে। কেননা বাহনটি মাল বহনে নিয়োজিত রয়েছে। এ মাসআলাটি এমন হলো. যেন কেউ ঘর এবং পাত্র ছাড়া শুধুমাত্র এমন আসবাব পত্র বন্ধক রাখলো, যা কোন ঘরে বা পাত্রে আছে। এ অবস্থায়ও হস্তান্তর

পূর্ণ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে কেউ যদি বাহনের উপরের গদি অথবা বাহনের মাথার লাগাম বন্ধক রাখে, এরপর গদি ও লাগামসহ ঐ বাহন বন্ধক গ্রহীতার নিকট দিয়ে দেয়, এ অবস্থায় এ গুলো বাহনের উপর থেকে খুলে হস্তান্তর না করা পর্যন্ত বন্ধক পূর্ণ হবে না। কেননা এগুলো বাহনের সংশ্লিষ্ট বস্তু। যেমন খেজুর গাছের ফল খেজুর গাছের সাথে সংশ্লিষ্ট। এ কারণেই ফকীহগণ বলেছেন ঃ বাহন বন্ধক রাখার ক্ষেত্রে গদি ও লাগামের কথা উল্লেখ না করলেও তা বন্ধকী বস্তুর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ আমানতী মাল আরিয়াত (ধার), মুযারাবাত[১] এবং অংশীদারী মালের বিনিময়ে বন্ধক রাখা সহীহ নয়। কেননা বন্ধকের ক্ষেত্রে মাল হস্তগত করার বিষয়টি ক্ষতিপূরণ উসূলের জন্য হস্তগতকরারূপে বিবেচিত হয়ে থাকে। কাজেই এ ক্ষেত্রে যামানত সাব্যস্ত হওয়া অপরিহার্য, যাতে হস্তগত করাটি দায়বদ্ধ হিসাবে গণ্য হয় এবং এর মাধ্যমে বন্ধক গ্রহীতা ব্যক্তি তার পাওনা উসূল করতে সক্ষম হয়। এমনিভাবে যে সমস্ত মাল مَضْمُوْنٌ بِغَيْرِهَا[২] –হয়ে থাকে; এর বিনিময়েও বন্ধক গ্রহণ করা সহীহ নয়। যেমন বিক্রেতার হাতে বিক্রীত পণ্য। কেননা এ অবস্থায় ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না। অর্থাৎ বিক্রেতার হাতে যদি বিক্রীত মাল বিনাশ হয়ে যায়, তবে তার উপর কোনরূপ ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবেনা, কিন্তু মূল্য রহিত হয়ে যাবে। এ হুকুম তো বিক্রেতার ক্ষেত্রে। কাজেই বন্ধক সহীহ হবে না। আর যে সব বস্তু বিনষ্ট হয়ে গেলে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হয়, ذَوَاتُ الْأَمْثَالِ তা হলো এমন বস্তু, যার অনুরূপ বস্তু রয়েছে, তার ক্ষতিপূরণ হিসাবে অনুরূপ বস্তু দিতে হয়, অথবা ক্ষতিপূরণ হিসাবে মূল্য দিতে হয়, যেমন জোরপূর্বক আত্মসাৎকৃত বস্তু, খুলার বিনিময় এবং ইচ্ছাকৃত হত্যার অর্থ দন্ড; এগুলোর বিনিময়ে বন্ধক গ্রহণ করা সহীহ আছে। কেননা এসবের ক্ষতিপূরণ নির্ধারিত আছে। কারণ এসব ক্ষেত্রে বিধান হলো এই যে, যদি মূলবস্তু বহাল থাকে, তবে তাই হস্তান্তর করা ওয়াজিব। আর যদি তা বিনষ্ট হয়ে গিয়ে থাকে, তবে এর মূল্য পরিশোধ করা ওয়াজিব হবে। কাজেই এই বন্ধক ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হয়, এমন বস্তুর বিনিময়ে বন্ধক হলো। সুতরাং তা সহীহ হবে।

ইমাম মুহম্মদ (র) 'জামে সগীর' গ্রন্থে বলেন ঃ رَهْنٌ بِالدَّرْكِ বাতিল। কিন্তু كفالة بالدرك জাইয।[৩] এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য হলো এই যে, বন্ধক রাখা হয় নিজের

---

১. এমন ব্যবসা, যেখানে মূলধন থাকে একজনের এবং শ্রম থাকে অপরজনের।

২. مَضْمُوْنٌ بِغَيْرِهَا এমন মালকে বলা হয় ,যা বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হয় না। আর এ মালের বিনিময়ে যে মূল্য প্রাপ্তির কথা ছিল, তা এখন আর পাবেনা। যেমন বিক্রীত পণ্য যদি বিক্রয়কারী ব্যক্তির দখলে থাকে এবং এ অবস্থায় তা যদি ধ্বংস হয়ে যায়, তবে তার উপর জরিমানা ওয়াজিব হবে না এ অবস্থায় ক্রয়-বিক্রয় বাতিল যায়ে থাকে। ফলে সে তার মূল্যও প্রপ্যি হবে না।

৩. درك অর্থ ক্ষতি এবং লোকসান। যেমন কেউ কারো নিকট থেকে কোন কিছু খরীদ করার ইচ্ছা করার পর আশঙ্কা করছে যে, না জানি তা নষ্ট হয়ে যায়। এ অবস্থায় অপর কোন ব্যক্তি ক্রেতাকে বললো ঃ আপনার কোন আশঙ্কা নেই; যদি এই মাল ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায়, তবে আমি এর মূল্য আপনার নিকট ফেরৎ প্রদানের ব্যবস্থা করে দিব। এ ব্যাপারে আপনার দায়িত্ব নিলাম, একে كَفَالَةٌ بِالدَّرْكِ বলে। কিন্তু তৃতীয় ব্যক্তি যদি এই ক্ষতির সম্ভাবনার কারণে ক্রেতার নিকট কোন বস্তু বন্ধক রাখে, তবে তা জাইয হবে না। একেই رَهْنٌ بِالدَّرْكِ বলা হয়।

পাওনা উসূল করার জন্য। আর হক সাব্যস্ত হওয়ার পূর্বে তা উসূল করার কোন প্রশ্নই আসে না। সর্বোপরি ভবিষ্যত কালের দিকে মালিকানার সম্পর্ক করা জাইয নয়। পক্ষান্তরে দায়িত্ব গ্রহণের উদ্দেশ্য হলো চাওয়া অপরিহার্য হওয়া। আর এ জাতীয় কাজের অপরিহার্য ভবিষ্যতের ভিত্তিতেও হতে পারে। যেমন নামায, রোযায় ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। এ কারণেই এক জনের জন্য অপর জনের উপর যে হক সাব্যস্ত হয়ে, এর ব্যাপারে যিম্মাদার হওয়া সহীহ আছে। কিন্তু বন্ধক রাখা সহীহ হয় না। সুতরাং ক্রেতা যদি ওয়াজিব হওয়ার পূর্বেই বন্ধকের মাল হস্তগত করে নেয়, এর উপর সে মাল তার নিকট নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে তা আমানতী মাল হিসাবে নষ্ট হবে। কেননা এখানে কোন চুক্তিই হয়নি, কাজেই যা হয়েছে তা বাতিল হিসাবে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে প্রতিশ্রুত ঋণের বিনিময়ে যে বন্ধক রাখা হয়, তার বিষয়টি এর থেকে ব্যতিক্রম। যেমন কেউ বললো ঃ আমি তোমার নিকট এটি বন্ধক রাখলাম; যাতে তুমি আমাকে এক হাজার টাকা ঋণ দাও। এ অবস্থায় যদি বন্ধক গ্রহীতার নিকট বন্ধকী মাল বিক্রয় হয়ে যায়, তবে চুক্তিতে উল্লেখিত মালের মুকাবিলায় তা বিনাশ হয়েছে বলে ধর্তব্য হবে। কেননা প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে প্রতিশ্রুত বিষয়কে মজুদ বিষয়ের মত গণ্য করা হয়েছে। অধিকন্তু যে ঋণকে মজুদ ধরে বন্ধক সহীহ সাব্যস্ত হয়েছে, সে বন্ধক তো হস্তগত হয়েই আছে। কাজেই এর উপর বন্ধকের বিধান প্রদান করা হবে। যেমন পণ্য সামগ্রীর দাম সাব্যস্ত করে তা হস্তগত করা হলে সে ক্ষেত্রে অনুরূপ হুকুম প্রদান করা হয়ে থাকে। কাজেই বন্ধক গ্রহীতা ব্যক্তি এ মালের ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবে।

ইমাম কুদুরী (র) বলেন ঃ বাইয়ে সালামের মূলধনের বিনিময়ে, বাইয়ে সরফের মূল্যের বিনিময়ে এবং মাসলাম ফীহ (مُسْلَمٌ فِيْهِ) অর্থাৎ যে পণ্যের ব্যাপারে বাইয়ে সালাম করা হয়েছে এর বিনিময়ে বন্ধক রাখা জাইয।

কিন্তু ইমাম যুফার (র) বলেন ঃ জাইয নয়। কেননা বন্ধকের হুকুম হলো নিজের পাওনা উসুল করতে সক্ষম হওয়া। আর এটি উসূল করা নয়, বরং এটি হচ্ছে বিনিময় করা। কেননা এ ক্ষেত্রে সমজাতীয় নেই। আর বিনিময় করার দরজাটি এখানে রুদ্ধ।

আমাদের দলীল হলো ; আর্থিক দিক থেকে এখানে সমজাতীয়তা বিদ্যমান আছে। কাজেই আর্থিক দিক থেকে নিজের পাওনা উসূল করার বিষয়টি এখানে প্রতিষ্ঠিত। আর পূর্বোক্ত আলোচনা অনুসারে এখানে মালই ক্ষতিপূরণ হিসাবে হস্তগত হচ্ছে।

ইমাম কুদুরী (র) বলেন ঃ বিক্রীত পণ্যের বিনিময় বন্ধক রাখা বাতিল। কেননা বিক্রীত পণ্য এমন বিষয়, যার কারণে ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হয় না, আর এ কথাটি আমরা পূর্বেই বর্ণনা করেছি। **কাজেই যদি বন্ধকী মাল ক্রেতার নিকটে নষ্ট হয়ে যায়; তাহলে তা এমনিই নষ্ট হয়েছে বলে গণ্য হবে।** অর্থাৎ এতে কোন ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না। কেননা বাতিল চুক্তি কোন বিবেচনাযোগ্য বিষয় নয়। এ হিসাবে এটি এমন হলো, যেন বিক্রেতার অনুমতিতেই ক্রেতা এ মাল হস্তগত করেছে।[১]

১. কাজেই এ মাল আমানতী মাল হিসাবে গণ্য হবে। আর আমানতের মাল নষ্ট হয়ে গেলে তাতে জরিমানা ওয়াজিব হয় না।

যদি বাইয়ে সরফের মূল্য এবং বাইয়ে সালামের মূলধনের বিনিময়ে রক্ষিত বন্ধকী মাল চুক্তির মজলিসেই নষ্ট হয়ে যায়; তবে বাইয়ে সরফ ও বাইয়ে সালাম পূর্ণ হয়ে যাবে। আর বন্ধক গ্রহীতা ব্যক্তি তার পাওনা বুঝে পেয়েছে বলে গণ্য হবে। কেননা হুকুমের দিক থেকে তার দখল সাব্যস্ত হয়ে গেছে। আর যদি বন্ধকী মাল ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আগেই তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তাহলে উভয় চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। কেননা এক্ষেত্রে প্রকৃত ও হুকুমগত কোনভাবেই দখল পাওয়া যায়নি। যদি মাসলাম ফীহ বা যে মালের ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে বাইয়ে সালামের যে চুক্তি হয়েছে এর বিনিময়ে রক্ষিত বন্ধকী মাল ধ্বংস হয়ে যায়, তবে এর ধ্বংসের কারণে বাইয়ে সালাম বাতিল হয়ে যাবে। এর অর্থ হলো: এ অবস্থায় পুঁজিদাতা ব্যক্তি তার নিজের পাওনা উসূল করে নিয়েছে। কাজেই বাইয়ে সালাম আর বাকী থাকবে না।

বাইয়ে সালামের ক্ষেত্রে মাসলাম-ফীহ-এর বিনিময়ে কোন বস্তু বন্ধক রাখা হয়েছিল: পরে ক্রেতা ও বিক্রেতা পরস্পর সম্মত হয়ে বাইয়ে সালাম ভেঙ্গে দিল। তাহলে মূলধনের পরিবর্তে এটি বন্ধক হিসাবে গণ্য হবে। তাই পুঁজিদাতা ব্যক্তি এই বন্ধকী বস্তুটিকে নিজের নিকট আটকে রাখেবেন। কেননা এ মূলধন 'মাসলাম ফীহ' এর বিনিময় বস্তু। এটি জোরপূর্বক আত্মসাৎকৃত বস্তুর মত হলো, যা বিনষ্ট হয়ে যায় এবং এর পরিবর্তে মাল বন্ধক রাখা থাকে, তবে এটি এর মূল্যের পরিবর্তে বন্ধক বলে গণ্য হবে।

বাইয়ে সালামের চুক্তি ভেঙ্গে দেওয়ার পর যদি বন্ধকী বস্তু ধ্বংস হয়ে যায়; তাহলে যে খাদ্য দ্রব্যের ব্যাপারে সালাম চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে, এর বিনিময়েই তা ধ্বংস হয়েছে বলে গণ্য হবে। কেননা এটি এই 'মাসলাম ফীহ'[১] এর বিনিময়েই বন্ধক হিসাবে ছিল; যদিও তা আটক ছিল অন্য কারণে অর্থাৎ পুঁজি দাতার পুঁজির কারণে। যেমন কেউ কোন গোলাম বিক্রি করে তা হস্তান্তর করে দিল এবং এর মূল্যের বিনিময়ে কোন কিছু বন্ধক হিসাবে নিয়ে নিল। তারপর ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ে মিলে উক্ত ক্রয়-বিক্রয় বাতিল করে দেয়, তাহলে বন্ধক গ্রহীতা ব্যক্তি বিক্রীত পণ্য হস্তগত করার লক্ষ্যে বন্ধকী পণ্য আটকিয়ে রাখতে পারবে। কেননা মূল্য হচ্ছে বন্ধকী বস্তুর বিনিময়। যদি এ অবস্থায় বন্ধকী বস্তু ধ্বংস হয়ে যায়, তবে তা মূল্যের পরিবর্তেই ধ্বংস হয়েছে বলে মনে করা হবে; ঐ কারণে, যা আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। এমনিভাবে কেউ যদি ফাসিদ তরীকায় গোলাম খরীদ করার পর এর মূল্যও পরিশোধ করে দেয়, তাহলে সে প্রদত্ত মূল্য উসুল করার নিমিত্তে ঐ গোলামটিকে আটকে রাখতে পারবে। তারপর খরীদকৃত গোলাম যদি ক্রেতার নিকটে ধ্বংস হয়ে যায়, তবে তা এর মূল্যের বিনিময়েই ধ্বংস হয়েছে বলে ধরা হবে।

---

১. এ অবস্থায় অর্থের যোগানদাতা ব্যক্তি মাসলাম ইলায়হি এর নিকট আর খাদ্য সামগ্রীর দাবী করতে পারবে না।

গ্রন্থকার (র) বলেন; আযাদ, মুদাব্বার, মুকাতাব এবং উম্মে ওয়ালাদকে বন্ধক রাখা জাইয নয়। কেননা বন্ধক রাখার হুকুম হল, নিজের পাওনা উসুল করার ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হওয়া। আর এসবের দ্বারা নিজের পাওনা উসুল করার সুযোগ হাসিল হয় না। কারণ আযাদ মানুষ তো মাল নয়। আর বাকীদের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা বিদ্যমান রয়েছে।

كَفَالَةٌ بِالنَّفْسِ যেমন কেউ যদি কারো যামিন হয়, তাহলে এর **বিনিময়ে বন্ধক গ্রহণ করা জাইয নয়। এমনিভাবে ব্যক্তি বা এর চেয়ে ছোট কোন জিনিসের কিসাসের বিনিময়ে বন্ধক গ্রহণ করা জাইয নয়।** কেননা এ বন্ধক গ্রহণের দ্বারা নিজের পাওনা উসুল করা সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে ভুলবশত: কোন অপরাধ সংঘটিত হয়ে সে গেলে বিষয়টি এর থেকে ব্যতিক্রম হবে। কেননা এ ক্ষেত্রে বন্ধকী বস্তুর মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ উসুল করা সম্ভব।

শুফ'আর বিনিময়ে বন্ধক গ্রহণ জাইয নয়। কেননা বিক্রীত জমি এমন জিনিস যার কারণে ক্রেতার উপর ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হয় না। **এমনিভাবে অপরাধী গোলাম বা ঋণগ্রস্ত গোলাম যাকে লেন-দেন করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, তাদের বিনিময়েও বন্ধক গ্রহণ করা জাইয নয়।** কেননা গোলামের কারণে মুনীবের উপর ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হয় না। কারণ গোলাম মরে গেলে মুনীবের উপর কিছু ওয়াজিব হয় না। অনুরূপভাবে বিলাপকারী ও গায়িকা মহিলার বিনিময়েও বন্ধক রাখা জাইয নয়। **কাজেই এই বন্ধক** যদি নষ্ট হয়ে যায়; তাহলে এ কারণে ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না।

কোন **মুসলিম ব্যক্তির জন্য মদ বন্ধক রাখা জাইয নয়। এমনিভাবে অপর** কোন **মুসলিম বা যিম্মী ব্যক্তির নিকট থেকে মদ বন্ধক গ্রহণ করাও জাইয নয়।** কেননা মুসলিম ব্যক্তির ক্ষেত্রে মদের লেনদেন করা সম্ভব নয়। যদি বন্ধকদাতা ব্যক্তি যিম্মী হয় তবে মদ নষ্ট হয়ে গেলে যিম্মির জন্য মুসলিম ব্যক্তির উপর ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে। যেমন কোন মুসলমান যদি যিম্মী ব্যক্তির শরাব জোরপূর্বক আত্মসাৎ করে, তবে এ অবস্থায়ও মুসলমান ব্যক্তির উপর ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে বন্ধক গ্রহীতা যদি যিম্মী হয়, তাহলে কোন মুসলমানের (মদ নষ্ট করার কারণে) তার উপর ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না। যেমন মুসলমানের শরাব আত্মসাৎ করলে ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হয় না। অবশ্য এ চুক্তি যদি দুই যিম্মী ব্যক্তির মাঝে সম্পাদিত হয়, তবে উভয় অবস্থাতেই বন্ধক সহীহ হবে। কেননা তাদের ক্ষেত্রে মদ মূল্যমান বস্তু। মৃত পশু তাদের ক্ষেত্রেও মাল নয়, তাই মৃত পশু বন্ধক রাখা এবং বন্ধক দেওয়া কোনটাই জাইয নয়-যেমন মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে জাইয নয়।

কেউ যদি গোলাম খরীদ করে এর মূল্যের বিনিময়ে অপর কোন গোলাম বা সিরকা কিংবা যবাহকৃত বকরী বন্ধক রাখে, এরপর একথা প্রকাশ হয় যে, এটি গোলাম নয় বরং আযাদ মানুষ, এটি সিরকা নয়, বরং শরাব বা এটি যবাহকৃত বকরী নয়, বরং মৃত বকরী, তবে এ রাহন দায়বদ্ধ হবে অর্থাৎ এর কারণে ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে। কেননা দৃশ্যত: ওয়াজিব ঋণের বিনিময়ে সে বন্ধক রেখেছে।

এমনিভাবে কেউ যদি কোন গোলামকে হত্যা করার পর এর মূল্যের বিনিময়ে কোন কিছু বন্ধক রাখে, তারপর প্রকাশ পায় যে, এ নিহত ব্যক্তি গোলাম ছিলনা, বরং এ ছিল আযাদ মানুষ; তাহলেও ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে। উপরে যা কিছু বর্ণনা করা হয়েছে, এগুলো সবই হলো যাহিরী রিওয়ায়েত অনুসারে। **অনুরূপভাবে** (ঋণ বা অন্য কিছু) **অস্বীকৃতির** পর যদি সন্ধি করা হয় এবং যে বস্তুর উপর সন্ধি করা হয়েছে, এর বিনিময়ে যদি কোন বস্তু বন্ধক রাখা হয় এরপর বন্ধকদাতা ও বন্ধক গ্রহীতা যদি এ ব্যাপারে একমত হয় যে, মূলত: এখানে কারো কোন পাওনাই ছিল না, তবে এ বন্ধকও দায়বদ্ধ বলে গণ্য হবে, অর্থাৎ এ ক্ষেত্রেও ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে। ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর থেকে এর বিপরীত অভিমত বর্ণিত রয়েছে। আর পূর্বোক্ত এ জাতীয় মাসআলার ক্ষেত্রেও তাঁর কিয়াস এরকমই।

ইমাম মুহম্মদ (রা)' জামে সগীর' গ্রন্থে বলেন ঃ পিতার জন্য জাইয আছে নিজের ঋণের বিনিময়ে তার নাবালিগ পুত্রের গোলামকে বন্ধক রাখা। কেননা সন্তানের মালের হিফাজতের জন্য পিতার অধিকার আছে তা আমানত রাখার। বস্তুত: আমানত রাখার তুলনায় বন্ধক রাখাতে সন্তানের প্রতি অনেক বেশী দয়া ও মমতা প্রদর্শিত হয়। কেননা জরিমানার ভয়ে বন্ধক গ্রহীতা ব্যক্তি বন্ধকী মালের তত্ত্বাবধানে অধিক যত্নবান হয়ে থাকে । যদি বন্ধকী মাল বিনষ্ট হয়, তবে তা দায়বদ্ধভাবে নষ্ট হবে। অর্থাৎ এতে ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে। আর আমানতের মাল যদি বিনষ্ট হয়, তবে তা আমানতী মাল হিসাবে বিনষ্ট হয়েছে বলে গণ্য হবে। এই মাসআলার ক্ষেত্রে অসী অর্থাৎ অসিয়্যত বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি পিতার স্থলাভিষিক্ত হিসাবে গণ্য হয়ে থাকে। ঐ চুক্তির ভিত্তিতে, যা আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। ইমাম আবু ইউসুফ ও যুফার (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, পিতা এবং অসীর জন্য এরূপ করা জাইয নয়। কিয়াসের যুক্তিও তাই। এখানে নাবালিগের মাল দ্বারা ঋণ পরিশোধ না-জাইয হওয়ার উপর উপরোক্ত বিষয়টিকে কিয়াস করা হয়েছে যাহিরী রিওয়াতে অনুসারে। এতদুভয়ের মধ্যে যে পার্থক্য বর্ণনা করা হয়েছে, এটি সূক্ষ্ম কিয়াসও বটে। সেই সূক্ষ্ম কিয়াস হলো এই যে, যদি বাস্তবেই নাবালিগ বাচ্চার মাল দ্বারা ঋণ পরিশোধ করা হয়, তবে এতে বর্তমানে কোন প্রকার বিনিময় ছাড়াই নাবালিগের মাল থেকে তার মালিকানাকে নিঃশেষ করে দেওয়া হয়। আর বন্ধকের ক্ষেত্রে নাবালিগের মালের হিফাযতের জন্য তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করা হয় এবং এতে তার মালিকানাও বাকী থাকে। কাজেই উভয় মাসআলার পার্থক্য সুস্পষ্ট। **যেহেতু পিতা ও অসীর জন্য নাবালিগের মাল বন্ধক রাখা জাইয; এই হিসাবে বন্ধক গ্রহীতা ব্যক্তি এর দ্বারা তার পাওনা পরিশোধ করে নিতে সক্ষম হবে। সুতরাং বন্ধক গ্রহীতার নিকটে মাল নষ্ট হয়ে গেলে পিতা বা অসী যেহেতু তা পরিশোধ করেছে, তাই সে-ই নাবালিগের মালের যামিন হবে।** কেননা সেই তার (বাচ্চার) মাল দ্বারা নিজের ঋণ পরিশোধ করেছে। **এমনিভাবে তারা যদি বন্ধক গ্রহীতা ব্যক্তিকে তার মাল বিক্রি করার জন্য সুযোগ প্রদান করে, তবে** এক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম হবে। কেননা মূলত: এটি বিক্রির জন্য উকীল নিয়োগ করার

অনুরূপ। আর তাদের উকীল নিয়োগ করারও অধিকার রয়েছে। ফকীগণ বলেন: এ মাসআলার মূল হলো বেচাকেনা করার মাসআলা। কেননা ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র) এর মতে পিতা বা অসী যদি নাবালিগের মাল নিজের ঋণদাতা ব্যক্তির হাতে বিক্রি করে দেয়, তবে তা জাইয হবে এবং মালের মূল্য ঋণের বদলা হয়ে যাবে। আর তাদের কোন একজন নাবালিগের মালের যামিন বলে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর মতে মালের মূল্য ঋণের বদলা হবে না। এমনিভাবে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিক্রেতার উকীলের জন্য এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। আর পরিণামে ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হওয়ার দিক থেকে বন্ধকের বিষয়টি বেচাকেনার মত। পিতা যদি নাবালিগ সন্তানের মাল নিজের নিকট অথবা নিজের অন্য কোন নাবালিগ সন্তানের নিকট; অথবা নিজের এমন কোন ব্যবসায়ী গোলামের নিকট; যার উপর কোন ঋণ নেই, বন্ধক রাখে, তবে তা জাইয হবে। কেননা সন্তানের প্রতি পিতার অফুরন্ত দয়ার কারণে সে দুই ব্যক্তি স্থলাভিষিক্ত বলে গণ্য হবে এবং তার বক্তব্যকে এই জাতীয় চুক্তির ক্ষেত্রে দুই বক্তব্যের স্থলাভিষিক্ত হিসাবে গণ্য করা হবে। যেমন পিতা যদি তার নাবালিগ সন্তানের মাল নিজের নিকট বিক্রি করে অর্থাৎ নিজেই তা খরীদ করে, তবে সে চুক্তির ঈজাব কবুল উভয় দিকেরই অভিভাবক রূপে গণ্য হয়ে থাকে।

পক্ষান্তরে অসী যদি নাবালিগের মাল নিজের নিকট; অথবা নিজের বাচ্চার নিকট অথবা নিজের ঋণমুক্ত ব্যবসায়ী গোলামের নিকট বন্ধক রাখে, অথবা অসী যদি তার নিকট ইয়াতীম ব্যক্তির পাওনা কোন হকের কারণে ইয়াতীম ব্যক্তির নিকট নিজের কোন মাল বন্ধক রাখে, তবে তা জাইয হবে না। কেননা সে (অসী) শুধুমাত্র একজন উকীল। আর একই ব্যক্তি চুক্তির উভয় বিষয়ের (ঈজাব-কবুল) অভিভাবক হতে পারে না। যেমন একই ব্যক্তি বেচাকেনার-ক্ষেত্রে ঈজাব কবুল উভয়টির অভিভাবক হতে পারে না। সর্বোপরি নাবালিগের প্রতি অসীর দয়া ও মমতা অপূর্ণাঙ্গ। কাজেই অসীকে পিতার হুকুমের অন্তর্ভুক্ত করে বাস্তবতা থেকে ভিন্ন দিকে ফিরে যাওয়া যাবে না। নিজের নাবালিগ সন্তানের নিকট এবং ঋণমুক্ত ব্যবসায়ী গোলামের নিকট বন্ধক রাখা নিজের কাছে বন্ধক রাখার মতই। কিন্তু নিজের বালিগ সন্তান, নিজের পিতা এবং ঋণগ্রস্ত গোলামের নিকট বন্ধক রাখার বিষয়টি এর থেকে ব্যতিক্রম। কেননা তাদের উপর তার কোন কর্তৃত্ব নেই। বিক্রয়ের ব্যাপারে কাউকে উকীল নিয়োগ করা হলে সে বিষয়টিও এর থেকে ব্যতিক্রম হবে; যদি সে উকিল তাদের কারো নিকট ঐ মাল বিক্রি করে। কেননা এ বিক্রয়ের ব্যাপারে সে সন্দেহ মুক্ত; কিন্তু বন্ধকের ক্ষেত্রে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। কেননা বন্ধকের হুকুম তো একটিই।

ইয়াতীমের লেবাস পোশাক এবং খাওয়া-দাওয়ার জন্য যদি অসী ব্যক্তি ঋণগ্রহণ করে এবং এর বিনিময়ে যদি ইয়াতীমের কোন মাল ঋণদাতার নিকট বন্ধক রাখে, তবে তা জাইয হবে। কেননা প্রয়োজনে ঋণ গ্রহণ করা জাইয। আর হকদারের হক দেওয়ার জন্যই বন্ধক রাখা হয়ে থাকে। কাজেই তা জাইয হবে।

এমনিভাবে অসী যদি ইয়াতীমের কল্যাণার্থে তার মাল দ্বারা ব্যবসা করে এবং এতদুদ্দেশ্যে বন্ধকের লেন-দেন করে, তবে তা জাইয হবে। কেননা ইয়াতীমের মাল বৃদ্ধি করার জন্য ব্যবসা হলো উত্তম পন্থা। কাজেই বন্ধকের লেনদেন করা ছাড়া তার কোন উপায় নেই। কেননা বন্ধকের অর্থই হলো লেন-দেন করা।

পিতা নাবালিগের মাল বন্ধক রেখেছিল। তারপর ঐ বাচ্চা বালিগ হলো এবং পিতা মারা গেল। তাহলে ঋণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত পুত্র বন্ধকের সে মাল ফেরৎ আনতে পারবে না। কেননা বাচ্চার পক্ষ হতে এ বন্ধক অপরিহার্য হয়ে গেছে। কারণ পিতার হস্তক্ষেপ বালিগ হওয়ার পর সন্তানের হস্তক্ষেপের অনুরূপ হিসাবেই গণ্য। যেহেতু পিতা সন্তানের স্থলাভিষিক্ত।

পিতা নিজের ঋণের কারণে সন্তানের মাল বন্ধক রাখার পর, পুত্র যদি সে ঋণ পরিশোধ করে (নিজের মাল খালাস করে নিয়ে আসে); তাহলে পুত্র এ পরিমাণ মাল তার পিতার মাল থেকে উসুল করে নিতে পারবে। কেননা সে তার মালিকানাকে বাঁচিয়ে রাখার লক্ষ্যে পিতার মাল থেকে নিজের পাওনা উসুল করে নিতে বাধ্য হয়েছে। তাই তার বিষয়টি বন্ধকী বস্তু ধার দেওয়ার অনুরূপ হলো। এমনিভাবে বন্ধকী মাল খালাস করার পূর্বেই তা যদি বিনষ্ট হয়ে যায়; তবে এ ক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম প্রযোজ্য হবে। কেননা পিতা নাবালিগের মাল দ্বারা নিজের ঋণ পরিশোধ করেছে। কাজেই সে পিতার নিকট হতে এ-পরিমণ মাল ফেরত নিতে পারবে।

যদি পিতা নিজের ঋণ এবং নাবালিগের ঋণের কারণে নাবালিগের মাল বন্ধক রাখে, তবে তা জাইয হবে। কেননা এখানে দুটি জাইয বিষয় রয়েছে। যদি বন্ধকী বস্তু নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে পিতা নিজ অংশের আনুপাতিক হারে সন্তানকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে। কেননা সে সন্তানের মাল দ্বারাই এ পরিমাণ নিজের ঋণ পরিশোধ করতে সক্ষম হয়েছে। অসীর হুকুম এবং দাতা হুকুমও এরূপই, যদি পিতার অথবা পিতার অসী না থাকে।

অসী ইয়াতীমের কল্যাণার্থে কিছু ঋণ নিল এবং ঋণের পরিবর্তে ইয়াতীমের কিছু মাল সে বন্ধক রাখলো, তারপর এ বন্ধকী মাল বন্ধক গ্রহীতা ব্যক্তি হস্তগতও করে নিল। এরপর ইয়াতীমের প্রয়োজনের কারণে অসী সে বন্ধকী মাল পুনরায় হাওলাত নিয়ে নিল। এমতাবস্থায় যদি এ মাল অসীর হাতে বিনাশ হয়ে যায়, তবে বন্ধক চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। এবং এ মাল ইয়াতীমের মাল থেকে বিনষ্ট হয়েছে বলে গণ্য হবে। কেননা অসীর কর্মকাণ্ড বালিগ হওয়ার পর ইয়াতীমের কর্মকাণ্ডের অনুরূপ বলেই গণ্য হয়ে থাকে। কারণ সে তো নাবালিগের প্রয়োজনের কারণেই ধার গ্রহণ করেছে। এ ক্ষেত্রে হুকুম এটিই, যা আমরা সামনে বর্ণনা করবো ইন্‌শাআল্লাহ।

আর ঋণ হিসাবে প্রদত্ত এ মাল অসীর উপর ঋণ হিসাবে ধর্তব্য হবে। এর অর্থ হলোঃ অসীর নিকটই এ মালের তাগাদা করা হবে। তারপর অসী নাবালিগের

নিকট হতে এ মাল উসুল করে নেবে। কেননা এ ধার গ্রহণ করে সে সীমালংঘন করেনি। কেননা নাবালিগের প্রয়োজনেই সে এ ঋণ গ্রহণ করেছে। **আর অসী যদি নিজ প্রয়োজনে ঋণ গ্রহণ করে থাকে, তবে সে নাবালিগের মালের যামিন হিসাবে গণ্য হবে**। কেননা এ কাজ করে সে সীমালংঘন করেছে। কারণ নিজের প্রয়োজনে নাবালিগের মাল ব্যবহার করার তার কোন কর্তৃত্ব নেই।

কোন বস্তু কারো নিকট বন্ধক রাখার পর অসী যদি তা জোরপূর্বক আত্মসাৎ করে নিজ প্রয়োজনে ব্যবহার করে, অবশেষে তা তার নিকটেই বিনষ্ট হয়ে যায়, তবে অসী এর মূল্যের যামিন হবে। কেননা সে জোরপূর্বক আত্মসাৎ করে এবং ব্যবহার করে বন্ধক গ্রহীতার বেলায় সীমা লংঘন করেছে। এমনিভাবে সে নাবালিগের উপরও সীমালংঘন করেছে। এরপর এ ক্ষতিপূরণের টাকা দ্বারা ঋণ পরিশোধ করা হবে যদি ঋণ পরিশোধের সময় এসে থাকে।

যদি বন্ধকী বস্তুর মূল্য ঋণের সমান-সমান হয়, তবে অসী তা বন্ধক গ্রহীতার নিকট পৌঁছিয়ে দেবে এবং সে ইয়াতীম থেকে কোন কিছু ফেরৎ নেতে পারবে না। কেননা ইয়াতীমের জন্য অসীর উপর ঠিক তাই ওয়াজিব, যা অসীর জন্য ইয়াতীমের উপর ওয়াজিব। তাই তাদের পরস্পরের পাওনার মধ্যে কাটাকাটি হবে। যদি বন্ধকী **মালের মূল্য ঋণের তুলনায় কম হয়, তবে অসী এর মূল্য পরিমাণ বন্ধক গ্রহীতাকে প্রদান করবে**। এবং আরো যা অতিরিক্ত বাকী থাকবে; তা ইয়াতীমের মাল থেকে অসী পরিশোধ করে দেবে। কেননা বন্ধকী মালের মূল্য হিসাবেই ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হয়ে থাকে, এর চেয়ে বেশী নয়। **আর যদি বন্ধকী মালের মূল্য ঋণের তুলনায় বেশী হয়; তবে অসী ঋণ পরিমাণ মূল্য বন্ধক গ্রহীতাকে পরিশোধ করে অতিরিক্ত অর্থ ইয়াতীমের জন্য রেখে দেবে। যদি ঋণ পরিশোধের সময় না এসে থাকে; তবে বন্ধকী মালের মূল্য বন্ধক হিসাবেই গণ্য হবে**। কেননা অসী বন্ধক গ্রহীতার হক বিশিষ্ট করার কারণে সেই বন্ধক গ্রহীতার পাওনার যামিন বলে গণ্য হবে। কাজেই বন্ধকী মালের মূল্য বন্ধক গ্রহীতার নিকট বন্ধক হিসাবে বিবেচিত হবে। তারপর যখন ঋণ পরিশোধের সময় আসবে, তখনকার বিধান সেই ব্যাখ্যা অনুপাতে প্রযোজ্য হবে; যা আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি।

যদি অসী ব্যক্তি বন্ধকী মাল জোরপূর্বক এনে নাবালিগের প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহার করে, তারপর তা অসীর হাতে নষ্ট হয়ে যায় তবে তাকেই বন্ধক গ্রহীতা ব্যক্তির হকের যামিন হতে হবে। সে নাবালিগের হকের যামিন হবে না। কেননা নাবালিগের প্রয়োজনে তা ব্যবহার করাটা কোনরূপ সীমালংঘন নয়। এমনিভাবে বন্ধক গ্রহীতা লোক বন্ধকী মাল নিয়ে আসাও সীমা লংঘনের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা ইয়াতীমের মাল গ্রহণ করার তার অধিকার রয়েছে। এ কারণেই كتاب الاقرار বা স্বীকারোক্তি অধ্যায়ে ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেছেন যে, যদি পিতা বা অসী নাবালিগের মাল জোরপূর্বক আত্মসাৎ করার ব্যাপারে স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করে তবে তাদের কারো

উপর কোন কিছুই অপরিহার্য হবে না। কেননা তাদের পক্ষ হতে নাবালিগের মাল জোরপূর্বক আত্মসাৎ করার কল্পনাই করা যায় না। কেননা তাদের তো নাবালিগের মাল গ্রহণ করার বৈধ কর্তৃত্বই আছে। কাজেই বন্ধকী মাল যদি অসীর হাতে নষ্ট হয়, তবে অসী বন্ধক গ্রহীতার দেয় ঋণের যামিন হবে। এবং ঋণের পরিবর্তে সে অসীর থেকে তা নিয়ে নিবে; যদি ঋণ আদায়ের সময় এসে থাকে। তারপর অসী নাবালিগের নিকট থেকে তার পাওনা নিয়ে নেবে। কেননা সেতো সীমালংঘন করেনি; বরং সে তো নাবালিগের কল্যাণে কাজ করেছে। আর যদি ঋণ পরিশোধের সময় না এসে থাকে, তবে এ ক্ষতিপূরণের টাকা বন্ধক গ্রহীতার নিকট বন্ধক হিসাবে গণ্য হবে। তারপর যখন ঋণ পরিশোধের সময় হবে তখন বন্ধক গ্রহীতা এ দেয় মূল্য থেকে নিজের পাওনা উসুল করে নেবে। এরপর অসী নাবালিগের নিকট থেকে তার দেয় অর্থ উসুল করে নেবে ঐ চুক্তির ভিত্তিতে, যা আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ দিরহাম, দীনার, পরিমাপযোগ্য বস্তু এবং **ওজনযোগ্য বস্তু বন্ধক রাখা জাইয।** কেননা এর দ্বারাও পাওনা উসুল করা সম্ভব। কাজেই উল্লেখিত বস্তুগুলো বন্ধক রাখার জন্য।

সমজাতীয় কোন বস্তুর মুকাবিলায় এসবের কোন একটি বন্ধক রাখার পর যদি তা ধ্বংস হয়ে যায়, তবে ঋণের অনুরূপ পরিমাণের পরিবর্তে তা ধ্বংস হয়েছে বলেই গণ্য হবে। যদিও এতদুভয়ের মধ্যে গুণগত দিক থেকে কোন পার্থক্য থাকে। কেননা সমজাতীয় বস্তুর পরস্পর মুকাবিলার ক্ষেত্রে গুণগত বিষয়টি ধর্তব্য হয় না। এটি ইমাম আবু হানীফা (র) এর অভিমত। আর ইমাম আবুহানীফা (র) এর মতানুসারে বন্ধক গ্রহীতা ব্যক্তি ওজন হিসাবে নিজের পাওনা পরিশোধ করে নেবে; মূল্য হিসাবে নয়। আর সাহেবাইনের মতে বন্ধকগ্রহীতা ব্যক্তি বিপরীত জাতীয় জিনিসের মূল্যর আমানত গ্রহণ করবে[১] এবং এটিই বন্ধক হিসাবে গণ্য হবে।

'জামে সগীর' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, যদি দশ দিরহামের পরিবর্তে একটি রূপার লোটা বন্ধক রাখা হয়, যার ওযন দশ দিরহামের সমান; তারপর যদি তা নষ্ট হয় বা হরিয়ে যায়, তবে-ঐ দিরহামের পরিবর্তে এটি ধ্বংস হয়েছে বলে গণ্য হবে। হিদায়া গ্রন্থকার শায়খ বুরহান উদ্দীন (রা) বলেন, এর অর্থ হলো; যদি লোটার মূল্য ঐ দশ দিরহামের সমান বা এর চেয়ে বেশী হয়, তবে উভয় অবস্থাতেই উক্ত জবাব প্রযোজ্য হবে। আর এ ব্যাপারে ইমামগণ সকলেই একমত। কেননা ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতানুসারে পাওনা উসুল করা হবে ওজন হিসাবে এবং সাহেবাইনের মতে পাওনা উসুল করা হবে মূল্য হিসাবে। আর প্রথম অবস্থায় মূল্য ঋণের অনুরূপ এবং দ্বিতীয় অবস্থায় ঋণের তুলনায় অতিরিক্ত। কাজেই বন্ধক গ্রহীতা ব্যক্তি প্রদত্ত ঋণ অনুপাতেই পাওনা উসুল করে নেবে। যদি লোটার মূল্য ঋণের তুলনায় কম হয়, তবে তাতে উল্লেখিত মতভেদ প্রযোজ্য হবে।

---

১. বন্ধকদাতা যদি বন্ধকগ্রহীতার নিকট হতে একশত দিরহাম ঋণ গ্রহণ করে তবে এর সমপরিমাণ মূল্যের দীনার, যেমন দশ দীনার বন্ধক রাখতে হবে।

সাহেবাইনের উক্তি হলো; এ অবস্থায় ওজনের মাধ্যমে পাওনা উসুল করার কোন সুযোগ নেই। কেননা এতে বন্ধক গ্রহীতা ব্যক্তির সমূহ ক্ষতি রয়েছে। এমনিভাবে মূল্য দ্বারাও নিজের পাওনা উসুল করার সুযোগ নেই। কেননা এটি রিবা বা সুদের পর্যায়ে পৌছে দেয়। এ কারণে আমরা বিপরীত জাতীয় জিনিস যামানত রাখার কথা বলছি। যাতে পূর্ব দখল ভেঙ্গে যায় এবং এটিকে বন্ধকী বস্তুর স্থানে রাখা যায়। তারপর বন্ধকদাতা ব্যক্তি ঋণ পরিশোধ করে এর মালিক হয়ে যাবে।

ইমাম আবু হানীফা (র) এর দলীল হলো; যে সব মালে সূদ হয়, এ জাতীয় মালের পরস্পর বিনিময়কালে গুণগত দিক থেকে উন্নতমানের হওয়ার বিষয়টি ধর্তব্য হয় না। এ কারণেই নিরস বস্তুর বিনিময়ে সরস বস্তু গ্রহণ করা জাইয আছে। যেমন 'বাইয়ে সরফ' এর বদল এবং 'বাইয়ে সালামের' মধ্যে না দেখার ভান করে উত্তম মুদ্রার পরিবর্তে ত্রুটিপূর্ণ মুদ্রা গ্রহণ করা জাইয আছে। এ ক্ষেত্রে ইমামগণ সকলেই একমত যে, এতে তার হক আদায় হয়ে যাবে। এ কারণেই তা ভেঙ্গে দেওয়ার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। তবে ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব করে তা ভেঙ্গে দেওয়া সম্ভব নয়। কেননা ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য তো একজন দাবীদার দরকার। আরো দরকার এমন ব্যক্তি; যার নিকটে তা দাবী করা হবে। এমনিভাবে ব্যক্তি তার নিজের মালিকানাধীন বস্তুর যামিন হতে পারে না। আর এ ক্ষেত্রে যেহেতু ক্ষতিপূরণের যামিন বানানো অসম্ভব, তাই استيفاء (উসুল করা) কে ভেঙ্গে দেওয়াও অসম্ভব।

বলা হয়, এ মাসআলাটি নিম্নোক্ত মাসআলা থেকে উদ্ভাবিত একটি শাখামাসআলা। মূল মাসআলা হলো: কেউ যদি নিখুঁত দিরহামের স্থলে ভেজাল দিরহাম গ্রহণ করে তারপর তা বিনষ্ট হয়ে যায়।[১] এরপর সে জানতে পারে যে এটি ভেজাল দিরহাম ছিল। তাহলে এর হুকুম সর্বজন বিদিত।[২] তবে প্রসিদ্ধ অভিমত অনুসারে এ মাসআলার উপর ভিত্তি করা সহীহ নয়। কেননা ইমাম মুহাম্মদ (র) এ মাসআলায় ইমাম আবু হানীফা (র) এর সাথে আছেন। আর পূর্বের মাসআলায় তিনি ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর সাথে রয়েছেন।

ইমাম মুহম্মদ (র) এর মতে এতদুভয় মাসআলার মধ্যে পার্থক্যের কারণ হলো সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ভেজাল মুদ্রা হস্তগত করেছে এর থেকে তার হক অর্থাৎ নিখুঁত মুদ্রা হাসিল করার জন্য। ভেজাল হওয়া হক উসুল করার ক্ষেত্রে কোনরূপ প্রতিবন্ধক নয়। আর এ হক উসুল করা পুরা হয়ে গেছে তা ব্যয়িত হওয়ার কারণে। আর বন্ধকী মাল হস্তগত করা হয় (বন্ধকী মাল থেকে নয়, বরং) অন্য মাল থেকে নিজের পাওনা উসুল করার জন্য। কাজেই এ ক্ষেত্রে কবযা ভেঙ্গে (বাতিল করে) দেওয়া অপরিহার্য। আর ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে বন্ধক গ্রহীতা ব্যক্তিকে এর মূল্য পরিশোধের যামিন

১. অর্থাৎ কোন কাজে ব্যয় করে ফেলে।

২. অর্থাৎ ইমাম আবুহানীফা (র) এর মতে তার পাওনা রহিত হয়ে যাবে। এবং তার মতে তার উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। ইমাম আবু ইউসুফ (র). এর মতে তার পাওনা অনুসারে সে গ্রহণ করবে এবং যা দখল করেছে তা ফেরত দিয়ে দেবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র) থেকে দুই ধরনের মতামত বর্ণিত রয়েছে।

বানিয়ে এ কবযাকে বাতিল করে দেওয়া সম্ভব। যদি লোটাটি ভেঙ্গে যায়, তবে প্রথমোক্ত অবস্থায় অর্থাৎ যদি লোটার মূল্য এর ওজনের সমান সমান হয়, তাহলে ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর মতে বন্ধকদাতা ব্যক্তিকে বন্ধক গ্রহীতার প্রদত্ত পাওনা পরিশোধ করে বন্ধকী মাল ছাড়িয়ে নেওয়ার জন্য বাধ্য করা যাবে না। কেননা (সামান্য পরিমাণ) ঋণ কমিয়ে দেওয়ার কোন যুক্তি নেই। কেননা বন্ধকদাতা ব্যক্তি যদি বন্ধক গ্রহীতাকে নিখুঁত মুদ্রা দিয়ে দেয়, তবে তো তার ঋণ পরিশোধ হয়ে যাবে। আর লোটা ভেঙ্গে যাওয়ার পর পূর্ণ টাকা দিয়ে তা ছাড়িয়ে নেওয়ার হুকুম দেওয়াও কোন যুক্তি সংগত কথা নয়। কেননা এতে বন্ধকদাতা ব্যক্তির ক্ষতি নিহিত রয়েছে। এ কারণেই আমরা বন্ধকদাতা ব্যক্তিকে ইখতিয়ার দিয়েছি, সে ইচ্ছা করলে এ অবস্থায়ই তা ছাড়িয়ে নেবে। আর যদি ইচ্ছা করে তবে সে বন্ধক গ্রহীতা ব্যক্তিকে এর মূল্যে যামিন বানাবে। চাই তা বন্ধকী মালের সমজাতীয় বস্তু হোক বা ভিন্ন জাতীয় বস্তু হোক। তারপর এ মূল্য বন্ধক গ্রহীতার নিকট বন্ধক হিসাবে থাকবে। আর ক্ষতিপূরণ আদায় করার কারণে ঐ ভাঙ্গা লোটাটি বন্ধক গ্রহীতা ব্যক্তির হয়ে যাবে।

.পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মদ (র) এর মতে বন্ধকদাতা ব্যক্তি ইচ্ছা করলে লোটাটি ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায়ই ছাড়িয়ে নেবে (অর্থাৎ ঋণ পরিশোধ করে) আর ইচ্ছা করলে একে ঋণের বিনিময়ও সাব্যস্ত করতে পারবে। বন্ধকী ভাঙ্গা বস্তুটিকে নষ্ট জিনিসের উপর বা ব্যয়িত জিনিসের উপর কিয়াস করে এ হুকুম প্রদান করা হয়েছে। এর কারণ হলো বন্ধকী বস্তু যেহেতু ঋণ পরিশোধ করা ব্যতীত ছাড় করানো অসম্ভব; তাই এটিকে বিনাশ সাধিত হওয়ার স্থলাভিষিক্ত সাব্যস্ত করা হয়েছে। আর প্রকৃতভাবে বন্ধকী বস্তু বিনাশ হয়ে গেলে যেমনিভাবে তা ঋণের মুকাবিলায় দায়বদ্ধ হিসাবে গণ্য হয় সর্বসম্মতভাবে এ ক্ষেত্রেও এর অনুরূপ হুকুম হবে।এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য হলো ঃ বন্ধকী বস্তু নষ্ট হয়ে গেলে এর মালিয়াত দ্বারা নিজের পাওনা উসুল করা হবে। এটাই বিধান।

এর তরীকা হলোঃ বন্ধকী বস্তু মূল্যের পরিবর্তে তা দায়বদ্ধ হিসাবে গণ্য হবে, এরপর কাটাকাটি হবে। পক্ষান্তরে যদি বন্ধকী মালকে ঋণের বিনিময় সাব্যস্ত করা হয়, তাহলে এই মাল বন্ধক গ্রহীতার হাতে বন্দী হয়ে যাবে অর্থাৎ সে এর মালিক হয়ে যাবে। অথচ এটি হচ্ছে জাহিলী যুগের কথা। কাজেই মূল্যের ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণ সাব্যস্ত করাই উত্তম।

আর তৃতীয় অবস্থায় অর্থাৎ যদি লোটার মূল্য এর ওজন থেকে কম হয় অর্থাৎ আট দিরহাম পরিমাণ হয়, তাহলে বন্ধক গ্রহীতা ব্যক্তি এর (লোটার) মূল্যের যামিন হবে। যদি বিপরীত জাতীয় বস্তু দ্বারা এর যামানত আদায় করে, তবে নিখুঁত মুদ্রা যামানত হিসাবে দিতে হবে। আর যদি সমজাতীয় মুদ্রা দ্বারা তা আদায় করে, তবে এ ক্ষেত্রে ভেজাল মুদ্রাও দিতে পারবে। আর নিজের পাওনা উসুলের আগ পর্যন্ত এ মূল্য তার নিকট বন্ধক হিসাবে থাকবে। এ বিষয়ে ইমামগণের কারোই দ্বিমত নেই। শায়খাইনের

অভিমতটি তো খুবই স্পষ্ট। এমনিভাবে ইমাম মুহাম্মদ (র) এর অভিমতটিও স্পষ্ট কেননা তিনি ভাঙ্গা অবস্থাকে নষ্ট বা ব্যয়িত হওয়ার অবস্থার উপর কিয়াস করেন। আর ইমাম মুহাম্মদ (র) এর মতে বন্ধকী মাল নষ্ট হলে মূল্যের দ্বারাই এর ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করতে হয়।

দ্বিতীয় অবস্থায়-তথা লোটার মূল্য যদি এর ওযন থেকে বেশী হয়, যেমন বার দিরহাম, তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে বন্ধক গ্রহীতা ব্যক্তিকে এর পূর্ণ মূল্যের যামিন হতে হবে। আর তার মতে এ মূল্য বন্ধক গ্রহীতা ব্যক্তির নিকট বন্ধক হিসাবে থাকবে। কেননা ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে ওজনের বিষয়টি ধর্তব্য হয়। মুদ্রা সরস ও নিরস হওয়ার বিষয়টি ধর্তব্য হয় না। যদি ওজন হিসাবে বন্ধকী বস্তুর ক্ষতিপূরণ সাব্যস্ত করা হয়, তবে পুরাটাই এ হিসাবে ক্ষতিপূরণ যোগ্য হবে। আর যদি বন্ধকী বস্তুর কিছু অংশ ওজন হিসাবে ক্ষতিপূরণ সাব্যস্ত করা হয়, তবে অবশ্যই বাকী অংশের মূল্য হিসাবে ক্ষতিপূরণ প্রদান সাব্যস্ত হবে। কেননা গুণগত দিক থেকে উন্নতমানের হওয়া মূল বস্তুর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়। কাজেই যে ক্ষেত্রে মূল বস্তুতে ক্ষতিপূরণ আসছে, সে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বস্তু কখনো আমানতী বস্তু হতে পারবে না।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর মতে বন্ধক গ্রহীতা ব্যক্তি লোটার মূল্যের $\frac{৫}{৬}$ ভাগের ক্ষতিপূরণ আদায় করবে এবং লোটার মুল্যের $\frac{৫}{৬}$ অংশ যামানত হিসাবে বন্ধক গ্রহীতার মালিকানাধীন থাকবে; আর $\frac{১}{৬}$ অংশ পৃথক করে রাখবে। এতে যে বস্তু বিভাজনকৃত নয়, তা বন্ধক হিসাবে আর বাকী থাকবে না। এ অবস্থায় ভাঙ্গা লোটার $\frac{৫}{৬}$ মূল্যের সাথে ঐ ষষ্ঠাংশও বসুক হিসাবে থাকবে। ইমাম আবু ইউসূফ (র) এর মতে খাঁটি ও ভেজাল মুদ্রা উভয়টিই ধর্তব্য হবে। আর অতিরিক্ত মূল্য অতিরিক্ত ওজনের অনুরূপ বলে গণ্য হবে। যেমন এর ওজন বার দিরহাম।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর দলীলের যুক্তি হলো এই যে, নির্ভেজাল মুদ্রা মূলতঃ মূল্যমান সম্পন্ন বস্তু। এ কারণেই বিপরীত জাতীয় মুদ্রার মুকাবিলার সময় এটি ধর্তব্য হয়ে থাকে। এমনিভাবে অসুস্থ ব্যক্তির হস্তক্ষেপের ক্ষেত্রেও তা ধর্তব্য হয়ে থাকে। যদিও সমজাতীয় বস্তুর মুকাবিলার সময় কুরআন হাদীসের ভিত্তিতে তা ধর্তব্য হয় না। অতএব বন্ধকের ক্ষেত্রে মুদ্রা নির্ভেজাল বিবেচিত হওয়া সম্ভব।

উল্লেখ্য যে, ইমাম মুহাম্মদ (র) এর অভিমতের ক্ষেত্রে কিছুটা ব্যাখ্যা রয়েছে, যা মাবসূত ও যিয়াদাত গ্রন্থে যথাস্থানে আলোচিত হয়েছে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ কেউ যদি গোলাম বিক্রি করে এই শর্তের উপর যে, ক্রেতা তার নিকট কোন নির্দিষ্ট বস্তু বন্ধক রাখবে, তবে সূক্ষ্ম কিয়াসের দৃষ্টিতে তা জাইয হবে। কিন্তু কিয়াসের দৃষ্টিতে তা জাইয নয়। এমনিভাবে যদি কোন ব্যক্তি এই শর্তে কোন বস্তু বিক্রি করে যে, ক্রেতা ক্রয়-বিক্রয়ের মজলিসেই কোন এক কফীল (যামিনদার) ব্যক্তিকে উপস্থিত করবে এবং কফদীলও তার দায়িত্ব কবুল করে নেয়, তাহলে এ ক্ষেত্রেও কিয়াস এবং সূক্ষ্ম কিয়াসের মধ্যে বিরোধ রয়েছে।

কিয়াসের যুক্তি হলো, এ জাতীয় ক্রয়-বিক্রয় এক চুক্তির মধ্যে অপরেক চুক্তিকে ঢুকানোর নামান্তর, আর এরূপ করা নিষিদ্ধ। অধিকন্তু এটি এমন এক অপ্রয়োজনীয় শর্ত, বিক্রয় চুক্তি যার দাবী করে না। সর্বোপরি এতে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের কোন একজনের ফায়দা নিহিত আছে। আর এ জাতীয় জিনিসই ক্রয়-বিক্রয়কে নষ্ট করে দেয়।

আর সূক্ষ্ম কিয়াসের যুক্তি হলোঃ এটি এমন একটি শর্ত, যা চুক্তির সাথে সামঞ্জস্য পূর্ণ। কেননা কাফালা (যামিন হওয়া) ও বন্ধক রাখা, এই দুটি কাজই নিজের পাওনাকে পাকাপোক্ত ও মজবুত করার জন্য সম্পাদন করা হয়ে থাকে। কাজেই এ কাজটি নিজের পাওনা (মূল্য)ওয়াজিব হওয়ার সাথে সামঞ্জস্যশীল বলে গণ্য হবে। যখন কফীল ব্যক্তি মজলিসে হাজির থাকবে এবং বন্ধকী বস্তুও সুনির্দিষ্ট হবে, তখন এর অন্তর্নিহিত বিষয়টিকে আমরা পর্যলোচনা করে দেখেছি যে, এটি আকদের সাথে সামঞ্জস্যশীল; অতএব চুক্তি সহীহ হবে। পক্ষান্তরে যদি বন্ধকী বস্তু এবং কফীল সুনির্দিষ্ট না হয় অথবা কফীল অনুপস্থিত থাকে, এ অবস্থায় যদি ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয় বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তবে অজ্ঞতা ও অজানার কারণে কাফালাত ও বন্ধক রাখার চুক্তি অর্থহীন হয়ে পড়বে। এ অবস্থায় শুধুমাত্র শর্তের বিষয়টিই বাকী থাকবে। কাজেই চুক্তি নষ্ট হয়ে যাবে। আর কফীল যদি অনুপস্থিত থাকে, কিন্তু পরে সে মজলিসে এসে উপস্থিত হয় এবং কাফালাতও কবুল করে নেয়, তাহলে চুক্তি সহীহ বলে গণ্য হবে।

শর্ত আরোপের পর ক্রেতা যদি বন্ধকী বস্তু হস্তান্তর করা হতে নিবৃত্ত থাকে, তবে তাকে এ ব্যাপারে বাধ্য করা যাবে না। পক্ষান্তরে ইমাম যুফার (র) বলেনঃ তাকে বাধ্য করা যাবে। কেননা বিক্রয়ের চুক্তিতে যদি বন্ধকের কথা শর্ত করা হয়, তবে তা বিক্রয় চুক্তির সংশ্লিষ্ট বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। যেমন বন্ধকের ক্ষেত্রে ওয়াকালাতের শর্ত করা হলে ক্রেতার জন্য ক্রয় অপরিহার্য হওয়ার কারণে বন্ধকও অপরিহার্য হয়ে যাবে।

আমাদের যুক্তি হলো: বন্ধকের বিষয়টি বন্ধকদাতার পক্ষ হতে একটি নফল কাজ অর্থাৎ অপরিহার্য নয় এমন একটি চুক্তি। যেমন আমরা এ কথা পূর্বেও বর্ণনা করেছি। আর নফল কাজ বা চুক্তির ক্ষেত্রে কোন বাধ্যবাধকতা নেই। তবে বিক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে, সে ইচ্ছা করলে বন্ধক বর্জনের উপর রাজী থাকতে পারবে, আবার ইচ্ছা করলে বিক্রয় চুক্তিটি বাতিলও করে দিতে পারবে। কেননা এ জাতীয় বিক্রেয়ের ক্ষেত্রে বন্ধকী বস্তুটিই মূলতঃ আকর্ষণীয় বিষয়। যেহেতু বিক্রেতা বন্ধকী বস্তু ছাড়া বিক্রয় করতে রাজি হচ্ছে না, তাই এটি বর্জন করার বিষয়টি তার ইখতিয়ারাধীন থাকবে। কিন্তু ক্রেতা যদি তার মূল্য নগদ পরিশোধ করে দেয়, তবে এ অবস্থায় বিক্রেতার আর ইখতিয়ার থাকবে না। কেননা তার উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে গেছে। অথবা ক্রেতা বন্ধকী মালের পরিবর্তে এর মূল্য বন্ধক হিসাবে রাখবে (এ অবস্থায়ও বিক্রেতার আর কোন ইখতিয়ার থাকবেনা।) কেননা নিজের পাওনা উসুল করার ক্ষমতা বন্ধকী মালের মূল্যের উপরও সাব্যস্ত হয়।

ইমাম মুহম্মদ (র) 'জামে সগীর' গ্রন্থে বলেনঃ এক ব্যক্তি কিছু দিরহামের বিনিময়ে একটি কাপড় খরীদ করার পর বিক্রেতাকে বললোঃ আপনার পাওনা মূল্য পরিশোধ না করা পর্যন্ত এ কাপড়টি আপনার কাছেই রেখে দিন, তাহলে কাপড়টি বন্ধক হিসাবে গণ্য হবে। কেননা এ ক্ষেত্রে সে এমন বাক্য ব্যবহার করেছে, যা থেকে বন্ধকের অর্থ-প্রতীয়মান হয়। আর, তা হলোঃ পাওনা পরিশোধ করা পর্যন্ত মাল আটকে রাখা। বস্তুত: চুক্তির মধ্যে বস্তুর অন্তর্নিহিত বিষয়টি ধর্তব্য হয়ে থাকে। এ কারণেই মূল দেনাদার ব্যক্তির দেনা মুক্ত হওয়ার শর্তে কাফালা বা জামিন হওয়া, তা হাওয়ালায় পরিণত হয়ে যায়। আর যদি মূল দেনাদার ব্যক্তি দেনা মুক্ত হবে না-এর শর্তে হাওয়ালা করা হয়, তবে তা কাফালায় পরিণত হবে।

ইমাম যুফার (র) বলেনঃ ঐ বিক্রীত পণ্য বন্ধকী বস্তু হিসাবে গণ্য হবে না। ইমাম আবু ইউসুফ (র) থেকেও অনুরূপ অভিমত বর্ণিত রয়েছে। কেননা ক্রেতার বক্তব্য-"আপনার নিকট রেখে দিন," কথাতে যেমন বন্ধকের সম্ভাবনা রয়েছে, তেমনি ভাবে এতে আমানত রাখারও সম্ভাবনা রয়েছে। আর এ দুয়ের মধ্যে দ্বিতীয়টি হচ্ছে সহজতর। কাজেই আমানতের পক্ষেই ফয়সালা দেওয়া হবে। পক্ষান্তরে ক্রেতা যদি বলেনঃ আপনার পাওনা ঋণের বা মালের পরিবর্তে তা রেখে দিন, তবে এটি ইমাম যুফার (র) এর মতেও বন্ধক হিসাবে গণ্য হবে। কেননা, ক্রেতা কাপড়টি ঋণের বিনিময় সাব্যস্ত করে এটিকে বন্ধক হিসাবে সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছে।

আর আমাদের যুক্তি হলোঃ ক্রেতা যখন মূল্য পরিশোধ করা পর্যন্ত কাপড়টি আটকে রাখার কথা বলে সময়টিকে দীর্ঘায়িত করে দিয়েছে, এতে এ কথাই প্রতিভাত হচ্ছে যে, ক্রেতার বক্তব্যের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে একে বন্ধক হিসাবে রাখা, অন্য কিছু নয়।

পরিচ্ছেদ ঃ বন্ধকী বস্তু, বন্ধকদাতা ও বন্ধক গ্রহীতা একাধিক হলে এর বিধান

কেউ যদি এক হাজার দিরহামের পরিবর্তে দু'জন গোলাম বন্ধক রাখে, তারপর সে তাদের একজনের অংশের সমপরিমাণ পাওনা পরিশোধ করে দেয়, তবে পূর্ণ পাওনা পরিশোধ না করা পর্যন্ত বন্ধকদাতা ব্যক্তি তা নিজ দখলে আনতে পারবে না। এই দুই গোলামের মূল্য নির্ধারণ করে এর উপর ঋণকে বন্টন করার পর একএক জনের ভাগে যা পড়বে, তাই একএক গোলামের অংশ বলে সাব্যস্ত হবে।

উপরোক্ত হুকুমের কারণ হচ্ছে ঃ বন্ধক পূর্ণ ঋণের মুকাবিলায় দায়বদ্ধ থাকে, তাই বন্ধকী বস্তু পূরাটা ঋণের প্রতিটি অংশের মুকাবিলায় আটক থাকবে। বন্ধকদাতা ব্যক্তিকে ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে বিপুলভাবে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে এ হুকুম প্রদান করা হয়েছে। এটি বিক্রেতার হাতে বিক্রীত পণ্য মজুদ থাকার অনুরূপ।[১] যে মালের

---

১. অর্থাৎ ক্রেতা যদি বিক্রেতাকে মূল্য আংশিকভাবে পরিশোধ করে, আর কিছু বাকী রাখে, এ অবস্থায় সে যদি ক্রয়কৃত পণ্যের কিয়দংশ নিয়ে নিতে চায়, তবে তা করতে পারবে না। এখানকার মাসআলাটিও ঠিক তদ্রূপ।

বিনিময়ে বন্ধক রাখা হয়েছে, সে মালের কি পরিমাণের বিনিময়ে কোন্টা বন্ধক রাখা হয়েছে, তা যদি বন্ধকদাতা ব্যক্তি স্পষ্ট ভাবে বলে দেয়, তাহলে মাব্সূত গ্রন্থের বর্ণনা অনুসারে এ ক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম্ প্রযোজ্য হবে। কিন্তু যিয়াদাত গ্রন্থে উল্লেখ আছে, যে গোলামের ক্ষেত্রে যে পরিমাণের কথা সে বর্ণনা করেছে, সে পরিমাণ আদায় করার পর সে ঐ গোলাম হস্তগত করতে পারবে।

মাবসূতের বর্ণনার যুক্তি হলো ঃ এখানে চুক্তি একটি; কাজেই প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণের কথা উল্লেখ করার কারণে উক্ত চুক্তি 'একাধিক চুক্তি' হিসাবে গণ্য হবে না। যেমন বেচা-কেনার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। আর যিয়াদাত গ্রন্থে যে বর্ণনা রয়েছে-এর যুক্তি হলো ঃ এটিকে একটি চুক্তি গণ্য করার কোন প্রয়োজন নেই। কেননা দুইটি চুক্তির একটি অপরটির ক্ষেত্রে শর্তরূপে পরিগণিত হয় না। এ বিষয়টি লক্ষণীয় নয় যে, যদি বন্ধক গ্রহীতা ব্যক্তি একটির ক্ষেত্রে বন্ধককে কবুল করে নেয়, তবে তাও জাইয আছে। (এতে প্রতীয়মান হয় যে, এখানে চুক্তি একটি নয়, বরং দুটি।)

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ যদি দুই ব্যক্তির প্রদত্ত ঋণের বিনিময়ে একটি বস্তুকে দুই ব্যক্তির নিকট বন্ধক রাখা হয়, তবে তা জাইয হবে এবং পুরাটাই প্রত্যেকের নিকট বন্ধকী বস্তু হিসাবে গণ্য হবে। পূর্ণ বস্তুটির প্রতি একই চুক্তির মধ্যে বন্ধকের সম্বন্ধ করা হয়েছে। আর এতে যে বস্তু বিভাজনকৃত নয়, তা বন্ধকী বস্তু ' হওয়াও অপরিহার্য হয় না। আর বন্ধকের হুকুম হলোঃ ঋণের পরিবর্তে বন্ধকী বস্তু দায় বদ্ধ থাকা। আর এ জিনিসটি ভাগাভাগিকে কবুল করে না। কাজেই বন্ধকী বস্তুটি তাদের প্রত্যেকের নিকটই পরিপূর্ণভাবে দায়বদ্ধ বলে গণ্য হবে। এ বিষয়টি 'হিবার' মাসআলা থেকে ভিন্নতর; অর্থাৎ কেউ যদি দুই ব্যক্তিকে কোন একটি বস্তু হিবা করে, তবে তা ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে জাইয হবে না।

যদি ঋণদাতা ব্যক্তিদ্বয় বন্ধকী বস্তুটির ক্ষেত্রে পালা বন্টন করে নেয়, তবে তাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ পালার সময় অপরের পক্ষে একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তিরূপে গণ্য হবে।[১] **ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ (বন্ধকী বস্তুটির কোন ক্ষয়-ক্ষতি হলে) তাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ পাওনার অংশ অনুসারে এর ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে।** কেননা বন্ধকী বস্তুটি বিনষ্ট হয়ে গেলে তাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ পাওনা উসুল করে দিয়েছে বলে ধরা হবে। কেননা উসুল করা এমন একটি বিষয়, যা ভাগাভাগিকে কবুল করে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ যদি বন্ধকদাতা ব্যক্তি পাওনাদারের কোন একজনের পাওনা পরিশোধ করে দেয়; তবে গোটা বস্তুটিই অপরজনের হাতে বন্ধক হিসাবে দায়বদ্ধ থাকবে। কেননা, ঋণদাতা উভয় ব্যক্তির নিকটই পূর্ণ বস্তুটি বন্ধক হিসাবে রেখেছে কোন রূপ পার্থক্য ব্যতিরেকে বলে বিবেচিত হবে। এমনিভাবে

১. অর্থাৎ বন্ধক গ্রহীতা ব্যক্তির জন্য যেমনিভাবে বন্ধকী বস্তু কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তির নিকট রাখা জাইয, অনুরূপভাবে এভাবে পালা বন্টন করাও জাইয।

দুই জন ক্রেতার কোন একজন যদি তার নিকট বিক্রীত পণ্য আটক করে রাখার ব্যাপারে এ ক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম প্রযোজ্য হবে।

ইমাম কারখী (র) বলেন, ঋণগ্রস্ত দুই ব্যক্তি যদি কোন এক ব্যক্তির নিকট একটি বস্তু বন্ধক রাখে, তবে তা জাইয হবে। উল্লেখ্য যে, এ অবস্থায় বস্তুটি পূর্ণ ঋণের পরিবর্তে বন্ধকী বস্তু হিসাবে গণ্য হবে। আর বন্ধক গ্রহীতা ব্যক্তির জন্য জাইয আছে[১] নিজের পূর্ণ পাওনা পরিশোধ না পাওয়া পর্যন্ত সে বস্তুটি নিজের নিকট আটকিয়ে রাখা। কেননা এ ক্ষেত্রে পূর্ণ বস্তুতে বন্ধক হস্তগত হয় (অংশীদারীত্ব) ব্যতিরেকেই।

যদি দুই ব্যক্তির প্রত্যেকই বাদী হয়ে অপর কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে এমর্মে সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করে যে, তার (বিবাদীর) নিকটে যে গোলামটি আছে, তাকে সে তার নিকট বন্ধক রেখেছিল এবং সে তা দখলও করে নিয়েছিল, তা হলে তাদের এ সাক্ষ্য-প্রমাণ বাতিল বলে গণ্য হবে।[২] কেননা তাদের (বাদীদের) প্রত্যেকেই দলীল প্রমাণের মাধ্যমের একথা সাব্যস্ত করার চেষ্টা করছে যে, ঐ ব্যক্তি তার পূর্ণ গোলাম তার নিকট বন্ধক রেখেছে। অথচ দুই ব্যক্তির প্রত্যেকের জন্য পূর্ণ গোলামের ফয়সালা প্রদান করার কোনই অবকাশ নেই। কেননা একই গোলাম পরিপূর্ণভাবে একজনের নিকট বন্ধক রাখা অবস্থায়, আবার তাকেই পূর্ণাঙ্গ ভাবে অন্যজনের নিকট বন্ধ রাখা আদৌ সম্ভব নয়। এমনিভাবে অগ্রাধিকার না থাকার ভিত্তিতে কোন একজনের পক্ষে পূর্ণ গোলামের ফয়সালা দেওয়া সম্ভব নয়। অনুরূপভাবে আধাআধি করেও উভয়জনের পক্ষে ফয়সালা দেওয়া সম্ভব নয়। কেননা এরূপ করার দ্বারা বিভাজনকৃত নয় বস্তুকে বন্ধক রাখা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়াবে। (অথচ এরূপ করা জাইয নয়)। কাজেই উভয়ের সাক্ষ্য- প্রমাণের উপর আমল করা অসম্ভব বিধায়, একে অপরকে মিথ্যাবাদী বলা নির্ধারিত হয়ে গেল। উপরোক্ত মাসআলার ক্ষেত্রে এ কথা বলা ঠিক নয় যে, গোলামটি উভয় ব্যক্তির নিকটেই বন্ধক হিসাবে থাকবে। যেন তারা উভয়ে এটিকে একই সাথে বন্ধক হিসারে রেখেছে। আর এটি তখনই হবে যদি তাদের বন্ধক গ্রহণের তারিখ অজ্ঞাত থাকে। ইমাম মুহাম্মদ (র) একেই মাবসুত গ্রন্থের শাহাদাত অধ্যায়ে ইস্‌তিহসানের দলীল হিসাবে উল্লেখ করেছেন। উক্ত বক্তব্য যথার্থ না হওয়ার কারণ হলো; কেউ যদি এরূপ বলে তাহলে তার বক্তব্যের জবাবে আমরা বলব যে, এটি এমন একটি আমল, যা দলীল-প্রমাণের দাবীর পরিপন্থী বিষয়। কেননা তাদের (বাদীদের) উভয়েই নিজ নিজ দলীল প্রমাণ দ্বারা এমন আটক রাখা সাব্যস্ত করেছে, যা অনুরূপ পরিমাণ অর্থ-হাসিল করার অসীলা। আর এ ফয়সালার দ্বারা এমন আটক রাখা সাব্যস্ত হচ্ছে, যা বন্ধকী মালের অর্ধেক হাসিল করার উপায় স্বরূপ। এতে

১. অর্থাৎ দ্বিতীয় ব্যক্তি পণ্যের মূল্য পরিশোধ না করা পর্যন্ত বিক্রেতা ঐ পণ্যটি নিজের কাছে আটক রাখতে পারবে।

২. অর্থাৎ যদি বাদীদের দাবী ভিন্ন ভিন্ন হয় এবং প্রত্যেকেই নিজ দাবীর সমর্থনে সাক্ষ্য- প্রমাণ পেশ করে, তবে বিচারক কোন দিকেই ফয়সালা দিবেন না।

দলীল মতে আমল করা সম্ভব হচ্ছে না। মতনের মধ্যে আমরা যা উল্লেখ করেছি, এটি যদিও কিয়াস, কিন্তু যুক্তি-প্রমাণের দিক থেকে এটি যেহেতু অধিক শক্তিশালী, তাই ইমাম মুহাম্মদ (র) এটিকে গ্রহণ করেছেন।

এভাবে বন্ধক রাখলে, তা যেহেতু বাতিল হিসাবে গণ্য হয়, কাজেই এ জাতীয় বন্ধকী মাল যদি নষ্ট হয়ে যায়, তবে আমানতী মাল নষ্ট হঁয়েছে বলে গণ্য হবে। কেননা শরী'আতে বাতিল জিনিসের কোন বিধান নেই।

ইমাম মুহম্মদ (র) 'জামে সগীর' গ্রন্থে বলেন ঃ যদি বন্ধকদাতা ব্যক্তি মারা যায় এবং গোলাম তাদের (বাদীদের) উভয়ের হাতে থাকে আর তারা উভয়ে উপরে বর্ণিত নিয়ম অনুসারে সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে, তবে তাদের প্রত্যেকের কবযায় অর্ধেক গোলাম বন্ধক হিসাবে গণ্য হবে এবং সূক্ষ্ম কিয়াসের দৃষ্টিতে প্রত্যেকেই নিজ নিজ অংশ বিক্রি করতে পারবে। এটি ইমাম আবু হানীফা এবং ইমাম মুহাম্মদ (র) এর অভিমত। আর কিয়াস অনুসারে তা বাতিল বলে গণ্য হবে। এটি ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর অভিমত। কেননা নিজের পাওনা উসূল করার জন্যই বন্ধক চুক্তি সম্পাদন করা হয়। আর এটিই এর মূল হুকুম। কাজেই নিজের পাওনা উসুল করার জন্য সম্পদ আটকিয়ে রাখার ফয়সালা দেওয়া বন্ধক চুক্তির ফয়সালা দেওয়ারই নামান্তর। বিভাজনকৃত না হওয়ার কারণে তা বাতিল হিসাবে গণ্য হবে; যেমন বন্ধকদাতা ব্যক্তির জীবদ্দশায় এরূপ হুকুম দেওয়া হয়ে থাকে।

সূক্ষ্ম কিয়াসের যুক্তি হলো ঃ বন্ধক চুক্তি মূলগত দিক থেকে প্রতিপাদ্য বিষয় নয়, বরং এর হুকুমই হচ্ছে মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। আর বন্ধকদাতা ব্যক্তির জীবদ্দশায় বন্ধকের হুকুম হলো বন্ধকী মাল আটকিয়ে রাখা। যে মাল বিভাজনকৃত নয়, তা বন্ধকের ক্ষেত্রে ক্ষতিকর। পক্ষান্তরে মৃত্যুর পরে বন্ধকের হুকুম হলো– তা বিক্রি করে নিজ পাওনা উসুল করা। এ ক্ষেত্রে বিভাজনকৃত না হওয়া ক্ষতিকর নয়। বিষয়টি এমন হলোঃ যেমন দুই ব্যক্তি কোন এক মহিলাকে বিবাহ করার দাবী করলো, অথবা দুই বোন কোন এক পুরুষকে বিবাহ করার দাবী করলো এবং তারা তাদের দাবীর পক্ষে সাক্ষ্য-প্রমাণও পেশ করলো, তাহলে জীবদ্দশায় তাদের সাক্ষ্য-প্রমাণ অগ্রহণযোগ্য হবে। কিন্তু মৃত্যুর পর তাদের পরস্পরের ক্ষেত্রে উত্তরাধিকার সম্পদ প্রাপ্তির ফয়সালা দেওয়া হবে। কেননা উত্তরাধিকার বিষয়টি ভাগাভাগিকে কবুল করে। আল্লাহ তা'আলাই এ বিষয়ে সর্বাধিক জ্ঞাত।

বন্ধকী মাল কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তির নিকটে রাখা

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ যদি বন্ধকদাতা ও বন্ধক গ্রহীতা ব্যক্তি বন্ধকী মাল কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তির হাতে রাখার ব্যাপারে একমত হয় (এবং রাখে), তবে তা জাইয আছে।

ইমাম মালিক (র) এর মতে জাইয নয়। বস্তুত: ইমাম মালিক (র) এর এ অভিমত কোন কোন সংস্করণে উল্লেখ রয়েছে। কেননা বিশ্বস্ত ব্যক্তির হাত মূলত: মালিকেরই হাত। এ কারণেই বন্ধকী বস্তুর কোন পাওনাদার বের হয়ে আসলে বিশ্বস্ত ব্যক্তি বন্ধকদাতার নিকট হতেই নিজের পাওনা উসুল করে নিয়ে থাকে। এই হিসাবে এখানে বন্ধক গ্রহীতার দখল অবর্তমান।

আমাদের দলীলের যুক্তি হলো বাহ্যত: বন্ধকী মালের হিফাজতের ক্ষেত্রে এর উপর বিশ্বস্ত ব্যক্তির দখল মূলত: মালিকেরই দখল। কেননা মূলবস্তু তার নিকট আমানত। আর আর্থিক ক্ষেত্রে বন্ধকী মালের উপর বিশ্বস্ত ব্যক্তির দখল, প্রকৃতপক্ষে তা বন্ধক গ্রহীতারই দখল। কেননা বিশ্বস্ত ব্যক্তির কবযা মূলত: যামানতের কবযা হিসাবে গণ্য। আর আর্থিক বিষয়েই ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হয়ে থাকে। (যাহিরী বস্তুর নয়।) অতএব উভয় পক্ষের বন্ধকচুক্তি সম্পাদনের ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে দুই ব্যক্তির স্থলাভিষিক্ত গণ্য করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, বন্ধকী বস্তুর হকদার বের হয়ে আসার অবস্থায় বিশ্বস্ত ব্যক্তি মালিকের নিকট হতে নিজের পাওনা এ জন্য উসুল করে নেয় যে, আমানত গ্রহীতা ব্যক্তির ন্যায় মূল মালের হিফাজতের ক্ষেত্রে সেও মালিকের প্রতিনিধি।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ বন্ধক গ্রহীতা ও বন্ধকদাতা কারো জন্যই জাইয নেই বন্ধকী মাল বিশ্বস্ত ব্যক্তির নিকট হতে নিয়ে নেওয়া। কেননা বিশ্বস্ত ব্যক্তির দখল ও আমানতের ভিত্তিতে এ মাল যেহেতু তার হিফাজতে আছে, এ হিসাবে সাথে বন্ধকদাতা ব্যক্তির হকের সম্পর্ক রয়েছে। এমনিভাবে এর দ্বারাই বন্ধক গ্রহীতা ব্যক্তি যেহেতু নিজের পাওনা উসুল করবে, তাই এর সাথে তার হকেরও সম্পর্ক রয়েছে। সুতরাং তাদের কেউই বন্ধকী মাল নিজ দখলে নিয়ে অন্যের অধিকার বাতিল করার ক্ষমতা রাখেন। যদি এ বন্ধকী মাল বিশ্বস্ত ব্যক্তি দখলে থাকা অবস্থায় নষ্ট হয়ে যায় তবে তা বন্ধক গ্রহীতার দায়-দায়িত্বেই নষ্ট হয়েছে বলে গণ্য হবে। কেননা আর্থিক ক্ষেত্রে বিশ্বস্ত ব্যক্তির দখল মূলত: তা বন্ধক

গ্রহীতারই দখল। আর মূলত: আর্থিক ভিত্তিতেই ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হয়ে থাকে। **আর যদি বিশ্বস্ত ব্যক্তি সে মাল বন্ধকদাতা বা বন্ধক গ্রহীতার নিকট ফেরত দিয়ে দেয়, তবে সে এর ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে।** কেননা, সে মূল বস্তুর ক্ষেত্রে বন্ধকদাতার পক্ষ হতে আমানতদার। আর আর্থিক ক্ষেত্রে বন্ধক গ্রহীতার পক্ষ হতে আমানতদার। আর তাদের একজন অপরজনের বেলায় অপরিচিতের মত। এমতাবস্থায় আমানতদার ব্যক্তি যদি বন্ধকী মাল কোন অপরিচিত ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করে, তবে তাকেই এর যামানত দিতে হবে।

বিশ্বস্ত ব্যক্তি বন্ধকী বস্তু তাদের (বন্ধকদাতা ও গ্রহীতা) কোন একজনের নিকট হস্তান্তর করার কারণে; বন্ধকী বস্তুর মূল্যের যামিন সাব্যস্ত হওয়ার পর ঐ বস্তু যদি সে ব্যক্তি, যার নিকট তা হস্তান্তর করা হয়েছে নষ্ট করে দেয়া, বা তা তার হাতে নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে বন্ধকী বস্তুর মূল্য তার নিকট আর বন্ধক হিসাবে বাকী থাকবে না। কেননা এরূপ করা হলে বিশ্বস্ত ব্যক্তি এককভাবেই পরিশোধকারী এবং আদায়কারী উভয়টি হয়ে যাবে। অথচ এ দুয়ের মধ্যে রয়েছে বৈপরিত্য। অবশ্য চুক্তি সম্পাদনকারী উভয় পক্ষ যদি এ ব্যাপারে একমত হয়ে যায় যে, তারা বস্তুটির মূল্য বিশ্বস্ত ব্যক্তির নিকট থেকে নিয়ে তা তার নিকট বা অন্য কারো নিকট বন্ধক হিসাবে রাখবে, তবে তা জাইয আছে। যদি তাদের একমত হওয়া সম্ভবপর না হয়, তবে তাদের কোন একজন বিষয়টি বিচারকের আদালতে উপস্থাপন করবে, যাতে তিনি এ ব্যাপারে অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। যদি বিচারক এমনটি করেন অর্থাৎ আদিল ব্যক্তির নিকট থেকে বন্ধকী বস্তুর মূল্য উসুল করে নিয়ে তা তার নিকটই বন্ধক হিসাবে রেখে দেন, তারপর বন্ধকদাতা ঋণ পরিশোধ করে দেয় অথচ বন্ধকদাতার নিকট বন্ধকী বস্তুটি হস্তান্তর করার কারণেই সে এর মূল্যের যামিন সাব্যস্ত হয়েছিল, তাহলে বন্ধকী বস্তুর মূল্য তার নিকট নিরাপদে সংরক্ষিত থাকবে। কেননা বন্ধকী বস্তু বন্ধকদাতার নিকট এবং ঋণ বন্ধক গ্রহীতার নিকট পৌছে গেছে। কাজেই একই মালিকানায় বিনিময় বস্তু এবং যার বিনিময় প্রদত্ত হয়েছে, তা একত্রিত হবে না।

যদি বন্ধকী বস্তু বন্ধক গ্রহীতার নিকট হস্তান্তর করার কারণে বিশ্বস্ত ব্যক্তি এর মূল্যের যামিন হয়ে থাকে, তবে বন্ধকদাতা ব্যক্তি তার থেকে সে মূল্য নিয়ে নেবে। কেননা ঋণ পরিশোধ করে দেওয়ার পর যদি বন্ধকী বস্তুটি তার হাতে হুবহু বাকী থাকতো, তবে সে তার হাত থেকেই তা নিয়ে নিত; কাজেই এ অবস্থায়ও সে তার নিকট থেকেই এর বিনিময় বস্তুটি নিয়ে নেবে। এরূপ করাতে বিনিময় বস্তু এবং যার বিনিময় দেওয়া হয়েছে তা এক হাতে জমা হবে না।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ **যদি বন্ধকদাতা ব্যক্তি বন্ধক গ্রহীতাকে, বিশ্বস্ত কোন ব্যক্তিকে অথবা তাদের ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তিকে ঋণ পরিশোধের সময় বন্ধকী বস্তু বিক্রি করার জন্য উকীল নিয়োগ করে, তবে এ উকীল নিয়োগ করা জাইয হবে।** কেননা, সে তো নিজের মাল বিক্রি করার জন্য উকীল নিয়োগ করেছে। **যদি বন্ধক চুক্তির মধ্যে উকীল নিয়োগের শর্ত করা হয়, তবে বন্ধকদাতা**

ব্যক্তি উকীলকে তার দায়িত্ব থেকে অপসারণ করতে পারবে না। তা **সত্ত্বেও যদি সে তাকে অপসারণ করে, তবে সে অপসারিত হবে না।** কেননা, বন্ধক চুক্তির অভ্যন্তরে এরূপ শর্ত করা হলে, তা বন্ধক চুক্তির একটি অপরিহার্য গুণ এবং হক এ পরিণত হয়ে যায়। বস্তুত: উকীল নিয়োগ করাই হয়ে থাকে চুক্তিকে পাকাপোক্ত ও মজবুত করার জন্য। কাজেই ওকালত চুক্তির মূল তথা বন্ধক চুক্তি অপরিহার্য হওয়ার সাথে সাথে এটিও অপরিহার্য হয়ে যাবে। অধিকন্তু ওকালত চুক্তির সাথে বন্ধক গ্রহীতার হক সংশ্লিষ্ট । আর উকীলকে বরখাস্ত করার মধ্যে সে হককে নষ্ট করা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। কাজেই বন্ধকের ক্ষেত্রে উকীল নিয়োগের বিষয়টি বাদীর দাবীর প্রেক্ষিতে মামলা পরিচালনার জন্য উকীল নিয়োগ করার বিষয়ের মতই হলো।

আর যদি বন্ধকদাতা ব্যক্তি তাদের (বন্ধক গ্রহীতা, আদিল বা অন্য কোন ব্যক্তি) কাউকে বন্ধকী মাল বিক্রির জন্য সাধারণভাবে উকীল নিয়োগ করে, তবে উকীল ব্যক্তি নগদ বা বাকী উভয় ভাবেই মালামাল বিক্রি করার অধিকারী বলে গণ্য হবে। এরপর বন্ধকদাতা ব্যক্তি যদি উকীলকে বাকীতে মাল বিক্রি করতে নিষেধ করে, তবে তার এ নিষেধাজ্ঞা কার্যকরী হবে না। কেননা ওকালত চুক্তি মূলগত দিক থেকে যেহেতু অপরিহার্য হয়ে গেছে, তাই এটি গুণগত দিক থেকেও অপরিহার্য বলে গণ্য হবে। (অর্থাৎ এর সাধারণ হুকুমকে পরবর্তীতে কোন শর্তের দ্বারা আবদ্ধ করে দেওয়া যাবে না।) এর কারণ আমরা পূর্বেই বর্ণনা করেছি।

এমনিভাবে যদি বন্ধক গ্রহীতা ব্যক্তি উকীলকে অপসারণ করে, তবে তার এ অপসারণ কার্যকর হবে না। কেননা, সে তো উকীল নিয়োগ করেনি। উকীল তো অন্য ব্যক্তি নিয়োগ করেছে। **যদি বন্ধকদাতা ব্যক্তি মারা যায়, তবে এতেও সে (উকীল) বরখাস্ত হবে না।** কেননা, বন্ধকদাতা ব্যক্তির মৃত্যুর কারণে বন্ধক চুক্তি বাতিল হয় না। অধিকন্তু ওকালত বাতিল হলে তা ওয়ারিসদের হকের কারণেই বাতিল হতো। (কিন্তু এখানে এটিরও সুযোগ নেই)। কেননা এ পর্যায়ে বন্ধক গ্রহীতার হক ওয়ারিসদের হকের উপর অগ্রগণ্য হয়ে থাকে।

ইমাম মুহম্মদ (র) 'জামে সগীর' গ্রন্থে বলেন ঃ উকীলের অধিকার রয়েছে ওয়ারিসদের উপস্থিতি ব্যতিরেকে বন্ধকী বস্তু বিক্রি করে দেওয়া; যেমন সে বন্ধকদাতা ব্যক্তির জীবদ্দশায় ওয়ারিসদের উপস্থিতি ছাড়াই তা বিক্রি করার অধিকার রাখে। যদি বন্ধক গ্রহীতা ব্যক্তি মারা যায়, তবে এ অবস্থায়ও উকীল ব্যক্তি তার ওকালতের দায়িত্বে বহাল থাকবে। কেননা বন্ধক চুক্তি বন্ধকদাতা ও গ্রহীতার মৃত্যুর কারণে, অথবা তাদের কোন একজনের মৃত্যুর কারণে বাতিল হয় না। কাজেই বন্ধক চুক্তি তার হক ও গুণাগুণসহ বাকী থাকবে।

যদি উকীল ব্যক্তি মারা যায়, তবে ওকালাত চুক্তি শেষ হয়ে যাবে। এ অবস্থায় তার ওয়ারিশ বা অসী তার স্থলাভিষিক্ত হবে না। কেননা, ওকালাতের ক্ষেত্রে মীরাসের বিধান প্রযোজ্য হয় না। এছাড়া উকীল নিয়োগকারী ব্যক্তি উকীলের রায়ের উপর তো রাজি, কিন্তু অন্যের রায়ের উপর রাজি এবং সন্তুষ্ট নয়। ইমাম আবু ইউসুফ

(র) হতে বর্ণিত আছে যে, উকীলের অসী বন্ধকী মাল বিক্রি করতে **পারবে**। কেননা ওকালাত হচ্ছে একটি অপরিহার্য চুক্তি (যা ভেঙ্গে দেওয়া যায় না)। **কাজেই অসী** এর মালিক হবে। যেমন মুযারিব (শ্রম বিনিয়োগ করে ব্যবসাকারী) ব্যক্তি যদি মারা যায়, মূল পুঁজির দ্বারা কোন বস্তু খরীদ করার পর, তবে মুযারিবের অসী ঐ বস্তু বিক্রি করে দিতে পারবে। কেননা মূল পুঁজি স্থূলবস্তুতে পরিণত হওয়ার পর, মুযারাবা চুক্তি অপরিহার্য হয়ে গেছে, যা এখন আর ভেঙ্গে.দেওয়ার কোন সুযোগ নেই।

উপরোক্ত যুক্তির মুকাবিলায় আমাদের জবাব হলো ঃ উকীল নিয়োগ করা একটি আনিবার্য হক । তবে তা উকীলের উপর, উকীলের জন্য নয়। অথচ উত্তরাধিকার বিষয়টি প্রযোজ্য হয় এমন ক্ষেত্রে, যা উকীলের কল্যাণের জন্য করা হয়ে থাকে। মুযারাবাতের বিষয়টি এর পরিপন্থি। কেননা এ হচ্ছে মুযারিবের হক।

বন্ধক গ্রহীতা ব্যক্তির জন্য জাইয নেই বন্ধকদাতা ব্যক্তির সম্মতি ছাড়া বন্ধকী মাল বিক্রি করা। কেননা এটি বন্ধকদাতা ব্যক্তির মালিকানাধীন বস্তু এবং সে এ ব্যাপারে সম্মত নয়।

এমনিভাবে বন্ধকদাতা ব্যক্তির জন্যও জাইয নেই বন্ধক গ্রহীতা ব্যক্তির সম্মতি ছাড়া বন্ধকী মাল বিক্রি করা। কেননা বন্ধক গ্রহীতা ব্যক্তি বন্ধকী মালের আর্থিক দিক দিয়ে বন্ধকদাতার তুলনায় অধিক হকদার। কাজেই বন্ধকদাতা ব্যক্তি বন্ধকী মাল বিক্রি করে তা ক্রেতার নিকট হস্তান্তর করতে সক্ষম নয়।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন ঃ যদি ঋণ পরিশোধের সময় এসে যায় এবং উকীল ব্যক্তি যার দখলে বন্ধকী বস্তু রয়েছে, সে বন্ধকী মাল বিক্রি করতে অস্বীকার করে, এ দিকে বন্ধকদাতা ব্যক্তি অনুপস্থিত থাকে, তাহলে উকীলকে তা বিক্রি করার জন্য বাধ্য করা হবে; ঐ দুই দলীলের ভিত্তিতে, যা ওকালাত অপরিহার্য হওয়ার বর্ণনায় আমরা উল্লেখ করেছি।

এমনিভাবে কোন ব্যক্তি যদি অপর কোন ব্যক্তিকে মামলা মুকদ্দমা পরিচালনা করার জন্য উকীল নিয়োগ করে, তারপর উকীল নিয়োগকারী ব্যক্তি যদি অদৃশ্য হয়ে যায়, এ অবস্থায় উকীল যদি তার পক্ষে মামলা পরিচালনা করতে অস্বীকার করে, তবে তাকে মামলা পরিচালনার জন্য বাধ্য করা হবে; দ্বিতীয় দলীলের কারণে। আর তা হলোঃ এতে অপরের হক বিনষ্ট করা অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু বিক্রয়ের ব্যাপারে উকীল নিয়োগ করার বিষয়টি এর থেকে ব্যতিক্রম। কেননা উকীল নিয়োগকারী ব্যক্তি নিজেও তা বিক্রি করতে পারে। কাজেই তার হক নষ্ট হওয়ার কোন আশংকা নেই। পক্ষান্তরে বাদী নিজের দাবী বাস্তবায়নে সক্ষম নয়, এমনিভাবে বন্ধক গ্রহীতা ব্যক্তিও নিজে তা বিক্রি করার অধিকারী নয়। যদি বন্ধক চুক্তি সম্পাদনকালে উকীল নিয়োগের শর্তটি উল্লেখ না করা হয়, বরং পরে এর শর্ত আরোপ হয়, তবে কারো কারো মতে এ ক্ষেত্রে উকীলকে বাধ্য করা যাবে না প্রথমোক্ত দলীলের ভিত্তিতে। আবার কেউ কেউ বলেনঃ বাধ্য করা যাবে দ্বিতীয় দলীলের ভিত্তিতে। আর এটিই বিশুদ্ধতম কথা।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) হতে বর্ণিত আছে যে, উভয় অবস্থাতে জবাব একটিই হবে। 'জামে সগীর' এবং 'মাবসূত' গ্রন্থে জবাবটি শর্তহীনভাবে উল্লেখ করার দ্বারাও এ কথার প্রতি সমর্থন পাওয়া যায়।

বিশ্বস্ত ব্যক্তি বন্ধকী মাল বিক্রি করার পর তা (ঐ বস্তুটি) বন্ধকী বস্তু হওয়া থেকে বের হয়ে যাবে এবং মূল্য এর স্থলাভিষিক্ততা হিসাবে গণ্য হবে। আর এটিই বন্ধকী বস্তু হিসাবে গণ্য হবে। যদিও মূল্য এখনো তার নিয়ন্ত্রণে আসেনি। কেননা এটি এমন জিনিসের স্থলাভিষিক্ততা, যা তার দখলে ছিল। যদি মূল্য নষ্ট হয়ে যায় তবে তা বন্ধক গ্রহীতার মাল হিসাবে গণ্য হবে। কারণ মূল্য যেহেতু বিক্রীত পণ্যের স্থলাভিষিক্ত হয়েছে, সেহেতু মূল্যের ক্ষেত্রে বন্ধক চুক্তি বাকী রয়েছে। অনুরূপভাবে যদি বন্ধকী গোলাম হত্যা করা হয় এবং হত্যাকারী ব্যক্তি জরিমানা হিসাবে এর মূল্যও পরিশোধ করে দেয়, তবে এ মূল্যই বন্ধক হিসাবে গণ্য হবে।

কেননা মালিক এ জরিমানার হকদার হয় আর্থিক দিক দিয়ে। যদিও এ জরিমানা খুনের বিনিময় হিসাবে সাব্যস্ত হয়েছে। কাজেই এ জরিমানা মালিক তথা বন্ধকদাতার ক্ষেত্রে মালের জরিমানার হুকুম পরিগ্রহ করবে। অতএব বন্ধক চুক্তিও বাকী থাকবে। এমনিভাবে যদি বন্ধকী গোলামকে অন্য কোন গোলাম হত্যা করে; এরপর হত্যাকারী গোলামকে নিহত গোলামের মুনীবের হাওয়ালা করা হয় হত্যার বিনিময় হিসাবে (তবে এ গোলামকে বন্ধকী বস্তুরূপে রেখে দেওয়া হবে।) কেননা গোশত ও রক্ত উভয় দিক থেকেই এ গোলাম, নিহত প্রথম গোলামের স্থলাভিষিক্ত।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন ঃ **ন্যায়পরায়ণ বিশ্বস্ত ব্যক্তি বন্ধকী মাল বিক্রি করার পর সে যদি এর মূল্য বন্ধক গ্রহীতার নিকট হস্তান্তর করে দেয়, তারপর বন্ধকী মালের কোন হকদার বের হয়ে আসে, তাহলে এই বিশ্বস্ত ব্যক্তিই এর যামিন হবে। তার ইখতিয়ার থাকবে, সে ইচ্ছা করলে বন্ধকদাতাকে এর মূল্যের যামিন সাব্যস্ত করতে পারবে। আবার ইচ্ছা করলে বন্ধক গ্রহীতাকেও ঐ মূল্যের (ثمن) যামিন সাব্যস্ত করতে পারবে, যা সে তাকে দিয়েছে। তবে অন্য কোন ব্যক্তিকে সে এর যামিন সাব্যস্ত করতে পারবে না।** উপরোক্ত বক্তব্যের ব্যাখ্যা হলো ঃ বন্ধকী মাল বিক্রি করার পর যদি এর কোন হকদার বের হয়ে আসে, তবে এর দুই অবস্থা হতে পারে। হয়তো বস্তুটি বিনষ্ট (বা ব্যয়িত) হয়ে যাবে অথবা তা মজুদ থাকবে। প্রথম অবস্থায় হকদার ব্যক্তির ইখতিয়ার থাকবে। সে ইচ্ছা করলে বন্ধকদাতা ব্যক্তিকে এর মূল্যের যামিন সাব্যস্ত করতে পারবে। কেননা সে তার হক আত্মসাৎ করেছে। আর ইচ্ছা করলে বিশ্বস্ত ব্যক্তিকেও এর যামিন সাব্যস্ত করতে পারবে। কেননা সে তার হক বিক্রি ও হস্তান্তর করে সীমা লংঘন করেছে।

যদি ঐ হকদার ব্যক্তি বন্ধকদাতা ব্যক্তিকে যামিন সাব্যস্ত করে,তবে বিক্রয় কার্যকরী হয়ে যাবে এবং বন্ধকগ্রহীতা ব্যক্তির জন্য মূল্য উসুল করাও দুরুস্ত হয়ে যাবে। কেননা বন্ধকদাতা ব্যক্তি জরিমানা আদায় করে বন্ধকী বস্তুর মালিক হয়ে গেছে। কাজেই এতে এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, সে (বন্ধকদাতা) তার নিজের মালিকানাধীন বস্তুই বিক্রি

করেছে। আর যদি হকদার ব্যক্তি বিক্রেতা তথা আদিল ব্যক্তিকে এর যামিন সাব্যস্ত করে; তবে এ অবস্থায়ও বেচা-বিক্রি কার্যকর হয়ে যাবে। কেননা সে ও জরিমানা আদায় করে এ মালের মালিক হয়ে গেছে। কাজেই এ অবস্থায়ও একথা পরিষ্কার যে, সে নিজের মালিকানাভুক্ত বস্তুই বিক্রি করেছে।

যদি হকদার ব্যক্তি বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে যামিন সাব্যস্ত করে, তবে বিশ্বস্ত ব্যক্তির ইখতিয়ার থাকবে; সে ইচ্ছা করলে বন্ধকদাতা ব্যক্তির নিকট হতে এর মূল্য উসুল করে নিতে পারবে। কেননা বিশ্বস্ত ব্যক্তি বন্ধকদাতা ব্যক্তির উকীল এবং তার পক্ষ হতে তার কর্ম সম্পাদক। কাজেই যে দায়-দায়িত্ব তার উপর বর্তাবে; সে তা তার (বন্ধকদাতা) থেকে উসূল করে নিতে পারবে। আর এ অবস্থায়ও তার বিক্রি কার্যকরী হবে এবং বন্ধক গ্রহীতা ব্যক্তির মূল্য উসুল করে নেওয়া সহীহ হবে। কাজেই বন্ধক গ্রহীতা ব্যক্তি বন্ধক দাতার নিকট হতে আর কিছুই ফেরত নিতে পারবে না।

এমনিভাবে বিশ্বস্ত ব্যক্তি ইচ্ছা করলে বন্ধক গ্রহীতা ব্যক্তির নিকট থেকেও তার প্রদত্ত মূল্য আদায় করে নিতে পারবে। কেননা দলীল-প্রমাণ দ্বারা এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, বন্ধকগ্রহীতা ব্যক্তি অন্যায়ভাবে মূল্য উসুল করেছিল। কেননা সে তো জরিমানা পরিশোধ করে গোলামের মালিক হয়েছে। কাজেই তার বিক্রয় কার্যকরী হবে। অতএব এ মূল্য তারই পাওনা হবে। বিশ্বস্ত ব্যক্তি তো এই ধারণায় বন্ধক গ্রহীতাকে মূল্য পরিশোধ করেছিল যে, বন্ধকদাতা ব্যক্তিই এই বস্তুর মূল মালিক। তারপর যখন এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, বন্ধকী বস্তু, তারই মালিকানাভুক্ত বস্তু তখন সে আর বন্ধক গ্রহীতা ব্যক্তিকে নিজের হক প্রত্যর্পণ করতে রাজি হবে না। কাজেই বিশ্বস্ত ব্যক্তি বন্ধকগ্রহীতার নিকট হতে নিজের হক উসুল করে নিতে পারবে। আর যখন সে তা উসুল করে নেবে, তখন বন্ধক গ্রহীতার মূল্য উসুল করা বাতিল হয়ে যাবে। সুতরাং বন্ধক গ্রহীতা ব্যক্তি তার প্রদত্ত ঋণ বন্ধকদাতার নিকট হতে আদায় করে নেবে। আর দ্বিতীয় অবস্থায় অর্থাৎ বন্ধকী মাল বিক্রি করার পর তা যদি ক্রেতার হাতে বিদ্যমান থাকে, তবে হকদার ব্যক্তি তার হাত থেকে তা নিয়ে নিতে পারবে। কেননা সে তার মাল হুবহু পেয়ে গেছে। এরপর ক্রেতা বিশ্বস্ত ব্যক্তির নিকট থেকে তার প্রদত্ত মূল্য উসুল করে নেবে। কেননা বিশ্বস্ত ব্যক্তিই মূল চুক্তি সম্পাদনকারী। কাজেই চুক্তির যাবতীয় হক তার সাথেই সংশ্লিষ্ট হবে। আর এ মূল্য প্রত্যাহার করে নেওয়াও চুক্তির হকসমূহের অন্তর্ভুক্ত বিষয়। কেননা এ মূল্য বেচাকেনার চুক্তির কারণেই ওয়াজিব হয়েছে। ক্রেতা বিশ্বস্ত ব্যক্তির নিকট মূল্য হস্তান্তর করেছিল, যাতে সে তার নিকট বিক্রীত পণ্য হস্তান্তর করে, অথচ সে তা তার নিকট হস্তান্তর করেনি। (কাজেই সে তার প্রদত্ত মূল্য ফেরত নিয়ে নেবে।)

এরপর বিশ্বস্ত ব্যক্তির ইখতিয়ার থাকবে। সে ইচ্ছা করলে বন্ধকদাতা ব্যক্তির নিকট হতে বন্ধকী মালের মূল্য ফেরৎ নিয়ে নিতে পারবে। কেননা বন্ধকদাতা ব্যক্তিই বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে এ দায়-দায়িত্বে অন্তর্ভুক্ত করেছে। কাজেই তাকে মুক্ত করে আনা তার

উপরই ওয়াজিব হবে। যখন বিশ্বস্ত ব্যক্তি বন্ধকদাতার নিকট হতে তার পাওনা নিয়ে নেবে, তখন বন্ধক গ্রহীতার মূল্য হস্তগত করাও সহীহ হয়ে যাবে। কেননা বিশ্বস্ত ব্যক্তি থেকে উসুলকৃত মূল্য তার জন্যই সংরক্ষিত আছে।

আর বিশ্বস্ত ব্যক্তি ইচ্ছা করলে তার পাওনা বন্ধক গ্রহীতার নিকট থেকেও ফেরৎ নিতে পারবে। কেননা চুক্তি বাতিল হওয়ার সাথে সাথে মূল্যও বাতিল হয়ে গেছে। অথচ বন্ধক গ্রহীতা ব্যক্তি তা মূল্য হিসাবেই হস্তগত করেছিল। অতএব বাধ্যতামূলকভাবেই তার এ হস্তগত করাকে নাকচ করে দিতে হবে। বন্ধক গ্রহীতার নিকট থেকে আদিল ব্যক্তি পাওনা নিয়ে বন্ধক গ্রহীতার নিকট থেকে পাওনা নিয়ে নেওয়া এবং বন্ধক গ্রহীতার কবযা নাকচ হয়ে যাওয়ার পর, ঋণের ব্যাপারে বন্ধক গ্রহীতার হক পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসবে। কাজেই সে তার পাওনা বন্ধকদাতার নিকট হতে উসুল করে নেবে।

আর ক্রেতা যদি বস্তুর মূল্য বন্ধক গ্রহীতার নিকট হস্তান্তর করে দেয়, তাহলে ক্রেতা বিশ্বস্ত ব্যক্তির নিকট হতে আর কোন কিছু দাবী করতে পারবে না। কেননা বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিশ্বস্ত ব্যক্তি হলো বন্ধকদাতার জন্য আমিল বা উকীল। সে যদি মূল্য হস্তগত করতো , তবে তা তার থেকে উসুল করা যেত; কিন্তু সে তো তা হস্তগত করেনি। কাজেই জামানতের দায়-দায়িত্ব মুয়াক্কিল তথা বন্ধক গ্রহীতার উপরই থাকবে।

আর যদি বন্ধক চুক্তি সম্পাদনের পর উকীল নিয়োগ করা হয় এবং চুক্তির মধ্যে এর শর্ত না থাকে; তবে বিশ্বস্ত ব্যক্তির উপর যে দায়-দায়িত্ব বর্তাবে; এ সব সে বন্ধকদাতার নিকট হতে উসুল করে নেবে। চাই বন্ধক গ্রহীতা ব্যক্তি বস্তুর মূল্য হস্তগত করুক বা না করুক। কেননা এ উকীল নিয়োগ করার সাথে বন্ধক গ্রহীতার হকের কোন সম্পর্ক নেই। কাজেই বন্ধক গ্রহীতার নিকট হতে কোন কিছু আদায় করা যাবে না। যেমন বন্ধক ছাড়া অন্যান্য বিষয়ের ওকালাতের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। যেমন, উকীল কোন বস্তু বিক্রি করে এর মূল্য এমন ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করে দিল, যার নিকট হস্তান্তরের জন্য মুয়াক্কিল তাকে নির্দেশ দিয়েছিল। এরপর উকীলের উপর কিছু দায়-দায়িত্ব বর্তালে সে এর জন্য মূল্য গ্রহণকারী থেকে কোন কিছু উসুল করতে পারবে না।

কিন্তু ওকালতের বিষয়টি যদি চুক্তির মধ্যে শর্ত হিসাবে উল্লেখ থাকে, তবে এর হুকুম এর থেকে ভিন্নতর হবে। কেননা এর সাথে বন্ধক গ্রহীতার হক সংশ্লিষ্ট আছে। কাজেই বেচা-বিক্রি বন্ধক গ্রহীতার হক হিসাবেই গণ্য হবে। হিদায়া গ্রন্থকার শায়খ বুরহান উদ্দীন (র) বলেন ঃ ইমাম কারখী (র) মাসআলাটি এরূপ বর্ণনা করেছেন। আর এই বর্ণনাতে ঐ ব্যক্তির মতামতের প্রতি পূর্ণ সমর্থন রয়েছে, যিনি এ জাতীয় উকীলকে বেচা-বিক্রির জন্য ধার্য করাকে জাইয মনে করেন না।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন ঃ যদি বন্ধকী গোলাম বন্ধক গ্রহীতার হাতে মারা যায়, তারপর অপর কোন ব্যক্তি এর মালিকানার দাবী করে, তাহলে তার (হকদার

ব্যক্তির) ইখতিয়ার থাকবে; সে ইচ্ছা করলে বন্ধকদাতাকে এর মূল্যের যামিন সাব্যস্ত করবে; আবার ইচ্ছা করলে বন্ধকগ্রহীতাকেও এর জামিন সাব্যস্ত করতে পারবে। কেননা তাদের উভয়েই গোলাম হস্তান্তর করে বা হস্তগত করে, তার হকের মধ্যে সীমালংঘন করেছে।

আর যদি হকদার ব্যক্তি বন্ধকদাতাকে এর জামিন সাব্যস্ত করে, তবে বন্ধকী গোলাম তার ঋণের পরিবর্তে মারা গেছে বলে ধর্তব্য হবে। কেননা (দেয়) ক্ষতিপূরণ আদায়ের মাধ্যমে বন্ধকদাতা এ গোলামের মালিক হয়ে গেছে। আর বন্ধক গ্রহীতা তার পাওনা পেয়ে গেছে।

আর হকদার ব্যক্তি যদি বন্ধক গ্রহীতার নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করে নেয়, তাহলে বন্ধক গ্রহীতা ব্যক্তি বন্ধকদাতার নিকট থেকে তার আদায়কৃত জামানতের মূল্য এবং নিজের প্রদত্ত ঋণ উভয়ই উসুল করে নেবে।

জামানতের মূল্য এ জন্য উসুল করবে, যেহেতু বন্ধকদাতার পক্ষ হতে সে প্রতারিত হয়েছে। আর ঋণ উসুল করে নিবে এ জন্য যে, তার দখল (কবযা) শেষ হয়ে গেছে। সুতরাং তার পাওনা পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসবে। (অর্থাৎ সে তার থেকে এ ঋণ উসুল করে নেবে।) যদি প্রশ্ন করা হয় যে, বন্ধক গ্রহীতা ব্যক্তি বন্ধকদাতার নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ উসুল বন্ধকদাতার নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ উসুল করে নেওয়াতে ক্ষতিপূরণের দায়ভার বন্ধকদাতার নিকট এসে স্থির হল। আর ক্ষতিপূরণ যার উপর এসে স্থির হয়, যে বস্তুর ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে, সে বস্তুতে তারই মালিকানা সাব্যস্ত হয়। এতে এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, বন্ধকদাতা ব্যক্তি নিজের মালিকানাভুক্ত বস্তুই বন্ধক রেখেছে। এই হিসাবে উক্ত মাসআলার বিধান এমনই হওয়া উচিত, যেমন হকদার ব্যক্তি প্রথমেই বন্ধকদাতার নিকট থেকে জরিমানা আদায় করে নিলে হয়ে থাকে। আমাদের মতে এটি কাজি আবু খাযিম (র) এর উত্থাপিত একটি আপত্তি।

এর জবাব হচ্ছে ঃ বন্ধকদাতা যেহেতু বন্ধকগ্রহীতাকে ধোঁকা দিয়েছে, তাই বন্ধক গ্রহীতা বন্ধকদাতার নিকট হতে ক্ষতিপূরণ আদায় করে নিচ্ছে। আর সে তার নিকট অন্যের মাল হস্তান্তর করে তাকে (বন্ধকগ্রহীতাকে) ধোঁকা দিয়েছে। যেমন আমরা পূর্বেও এ কথা উল্লেখ করেছি। অথবা বন্ধকগ্রহীতা থেকে বন্ধকদাতার দিকে স্থানান্তরের মাধ্যমে সে তাকে ধোঁকা দিয়েছে। যেন বন্ধক গ্রহীতা বন্ধকদাতার উকীল। অথচ তাদের উভয়ের মালিকানা বন্ধক চুক্তির পর সাব্যস্ত হচ্ছে। কিন্তু প্রথমোক্ত মাসআলাটি এর থেকে ব্যতিক্রম। কেননা এ ক্ষেত্রে হকদার ব্যক্তি বন্ধক গ্রহীতার নিকট হতে জামানত উসুল করেছে সাবেক দখলের ভিত্তিতে। কাজেই মালিকানার সম্বন্ধ এর দিকেই হবে। এতে এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, সে নিজের মালিকানাভুক্ত বস্তুই বন্ধক রেখেছে। আমি 'কিফায়াতুল মুনতাহী' গ্রন্থে এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছি। আল্লাহ তা'আলাই এ সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞাত।

বন্ধকী মালের মধ্যে হস্তক্ষেপ করা, বন্ধকী মালে জিনায়াত[১] করা বা বন্ধকী বস্তু কর্তৃক অন্যের উপর জিনায়াত করা

ইমাম কুদূরী (র) বলেন, বন্ধক গ্রহীতা ব্যক্তির অনুমতি ছাড়াই যদি বন্ধকদাতা ব্যক্তি বন্ধকী মাল বিক্রি করে দেয়, তবে এ বিক্রয় স্থগিত থাকবে। কেননা এর সাথে অন্যের হক সংশ্লিষ্ট রয়েছে। আর সে হচ্ছে বন্ধক গ্রহীতা ব্যক্তি। কাজেই এ বিক্রয় তার অনুমতির উপর স্থগিত থাকবে। যদিও বন্ধকদাতা ব্যক্তি তার মালিকানাভুক্ত সম্পদের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করেছে; যেমন কোন ব্যক্তি তার সমুদয় সম্পদের ক্ষেত্রে অসিয়ত করলো। তবে এক তৃতীয়াংশের অধিক সম্পদের ক্ষেত্রে তার অসিয়ত ওয়ারিসদের অনুমতির উপর স্থগিত থাকবে। কেননা (এক তৃতীয়াংশের অধিক) এর সাথে তাদের হক সংশ্লিষ্ট রয়েছে। **যদি বন্ধকগ্রহীতা ব্যক্তি অনুমতি প্রদান করে, তবে তা জাইয হবে**। কেননা তার হকের কারণেই এ হস্তক্ষেপ স্থগিত ছিল। আর এখন সে নিজেই তার হক রহিত করে দেওয়ার ব্যাপারে সম্মত হয়ে গেছে। **যদি বন্ধকদাতা ব্যক্তি বন্ধক গ্রহীতার ঋণ পরিশোধ করে দেয়, তবে তাও জাইয আছে**। কেননা বিক্রয় কার্যকর হওয়ার ব্যাপারে যে জিনিস প্রতিবন্ধক ছিল, তা দূর হয়ে গেছে। আর এক্ষেত্রে প্রেক্ষিতও বিদ্যমান আছে। আর তা হলো ঐ হস্তক্ষেপ সংঘটিত হয় উপযুক্ত ব্যক্তি থেকে যথার্থ ক্ষেত্রের মধ্যে।[২]

বেচা-কেনা বন্ধকগ্রহীতার অনুমতির পর যখন কার্যকরী হয়ে যাবে তখন বন্ধকগ্রহীতার হক বন্ধকী বস্তুর বিনিময়ের দিকে স্থানান্তরিত হবে। এটিই বিশুদ্ধ অভিমত। কেননা বন্ধক গ্রহীতার হক বন্ধকী বস্তুর আর্থিক দিকের সাথে সম্পর্কিত। আর বিনিময়ের হুকুম যার বিনিময় দেওয়া হয়েছে, এর হুকুমের অনুরূপ হয়ে থাকে। কাজেই বন্ধকী বস্তুর বিষয়টি ঋণগ্রস্ত গোলামের অনুরূপ হয়ে গেল। যখন তা পাওনাদার ব্যক্তিদের অনুমতিক্রমে বিক্রি করা হয়, তখন তাদের হক বিনিময়ের দিকে স্থানান্তরিত হয়ে যায়। কেননা তারা তাদের হক স্থানান্তরিত করার উপরে রাজি, রহিত করার উপর রাজি নয়। এ ক্ষেত্রেও ঠিক তদ্রূপ হুকুম হবে।

যদি বন্ধকগ্রহীতা ব্যক্তি বিক্রয়ের অনুমতি না দেয়, বরং তা বাতিল করে দেয়, তবে এক বর্ণনা মতে তা বাতিল হয়ে যাবে। বন্ধকদাতা ব্যক্তি যদি বন্ধকী মাল

১. জিনায়াত অর্থ অন্যায় -অপরাধ করা।

২. কেননা বন্ধকী বস্তু হচ্ছে বিক্রয়ের যথার্থ ক্ষেত্র। কারণ এটি বন্ধকদাতার মালিকানাধীন বস্তু। সর্বোপরি বন্ধকদাতা ব্যক্তিও আক্বিল-বালিগ ব্যক্তি। কাজেই এক্ষেত্রে যেটি প্রতিবন্ধক ছিল, তা দূরীভূত হয়ে গেছে।

ছাড় করিয়ে নিয়ে যায়, তবে বন্ধকী মালের ব্যাপারে ক্রেতার আর কোন হাত থাকবে না। কেননা বন্ধক গ্রহীতার যে হক সাব্যস্ত আছে, তা মালিকানার মতই। এই হিসাবে বন্ধকগ্রহীতা ব্যক্তি মালিকের মতই হয়ে গেল। কাজেই সে এ বেচা-বিক্রির ব্যাপারে অনুমতি দিতে পারবে। আবার ইচ্ছা করলে তা ভঙ্গও করে দিতে পারবে।

কিন্তু বিশুদ্ধতম বর্ণনা মতে তার (বন্ধক গ্রহীতার) এ বাতিল করার কারণে বেচাকেনা বাতিল হবে না (বরং তা স্থগিত হয়ে থাকবে)। কেননা তার নিজের হকের হিদায়তের জন্যই তার বেচাকেনা ভঙ্গ করে দেওয়ার অধিকার হাসিল হওয়ার কথা। অথচ তার হক হলো বন্ধকী বস্তু আটক করে রাখা। বেচা-কেনা সংঘটিত হওয়ায় এ আটক রাখা বাতিল হবে না। কাজেই উক্ত ক্রয়-বিক্রয় মওকুফ (স্থগিত) হিসাবে সংঘটিত হবে। যদি ক্রেতা ইচ্ছা করে তবে সে সবর করবে, যতক্ষণ না বন্ধক দাতা ব্যক্তি বন্ধকী মাল ছাড় করে আনবে। (তখন সে এ বস্তু বন্ধকদাতার নিকট থেকে নিয়ে নেবে।) কেননা বন্ধকদাতা ব্যক্তির হাস্তান্তরে অক্ষম হওয়ার বিষয়টি অস্থায়ী। আর সে (ক্রেতা) যদি ইচ্ছা করে তবে বিষয়টি বিচারকের নিকট উপস্থাপন করবে। বিচারক ইচ্ছা করলে এ ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ করে দিতে পারবে। কেননা বন্ধকদাতা ব্যক্তি এ মালামাল হাস্তান্তর করতে সক্ষম নয়। উল্লেখ্য যে, ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ করার অধিকার বিচারকের, বন্ধক গ্রহীতার নয়। এটি এমন হলো ঃ যেমন দখলের আগেই খরীদকৃত গোলাম পালিয়ে গেল। এ অবস্থায় ক্রেতাকে ইখতিয়ার দেওয়া হবে। (সে ইচ্ছা করলে সবর করবে। অন্যথায় বিষয়টি বিচারকের আদালতেও উপস্থাপন করতে পারবে, ঐ দলীলের ভিত্তিতে, যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। এখানেও ঠিক তদ্রূপই হবে।

যদি বন্ধকদাতা ব্যক্তি বন্ধকগ্রহীতার অনুমতি ছাড়া বন্ধকী বস্তু প্রথমে এক ব্যক্তির নিকট বিক্রি করে। তারপর তা আবার অপর ব্যক্তির নিকট বিক্রি করে, তবে দ্বিতীয় বিক্রিটাও বন্ধকগ্রহীতার অনুমতির উপর স্থগিত থাকবে। কেননা প্রথম বিক্রি কার্যকরী হয়নি। আর এক স্থগিত বিক্রয় দ্বিতীয়টির স্থগিত হওয়াকে বারণ করে না। (অর্থাৎ এ অবস্থায় উভয়টিই স্থগিত থাকবে।) যদি বন্ধকগ্রহীতা ব্যক্তি দ্বিতীয় বিক্রয়ের অনুমতি দিয়ে দেয় তবে তা জাইয হবে।

যদি বন্ধকদাতা ব্যক্তি বন্ধকী বস্তু বিক্রি করার পর তা অন্য কারো নিকট ইজারা দিয়ে দেয়, অথবা অন্য কাউকে হিবা করে দেয়, অথবা অন্য কারো নিকট তা বন্ধক রাখে, আর বন্ধক গ্রহীতা ব্যক্তিও এ সব চুক্তির ব্যাপারে অনুমতি দিয়ে দেয়, তাহলে প্রথম বিক্রয় যাইয হবে। উপরে উল্লেখিত মাসআলা দুটোর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এই যে, প্রথমোক্ত মাসআলায় দ্বিতীয় বিক্রির সাথে বন্ধকগ্রহীতার হক সংশ্লিষ্ট। কেননা বন্ধকী বস্তুর বদলের মূল্যের সাথে তার হক সম্পর্কিত। কাজেই তার নির্দিষ্টকরণের বিষয়টি সহীহ হবে। কারণ এর সাথে তার ফায়দা জড়িত রয়েছে। কিন্তু শেষোক্ত মাসআলায় উল্লেখিত চুক্তিসমূহের মধ্যে তার কোন হক নেই। কেননা হিবা ও বন্ধকের কোন বিনিময় নেই। আর ইজারার মধ্যে যে বিনিময় আছে, তা হচ্ছে লাভের বিনিময়।

মূল বস্তুর বিনিময় নয়। অথচ বন্ধক গ্রহীতার হকের সম্পর্ক হলো মূলবস্তুর আর্থিক দিকের সাথে, লাভের সাথে নয়। এ হিসাবে তার অনুমতি প্রদান তার হকের ক্ষেত্রে রহিতকরণ বলে গণ্য হবে। কাজেই এখানে যা প্রতিবন্ধক ছিল, তা শেষ হয়ে গেছে। অতএব প্রথম বেচা-বিক্রি কার্যকর হবে। এভাবেই উভয় মাসআলার মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে যায়।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন যদি বন্ধকদাতা ব্যক্তি বন্ধকী গোলাম আযাদ করে দেয়, তবে তার এ আযাদকরণ কার্যকর হবে। ইমাম শাফিঈ (র) এর কোন কোন মতামতের মধ্যে এ কথা উল্লেখ রয়েছে যে, যদি আযাদকারী ব্যক্তি অভাবগ্রস্ত হয়, তবে তা কার্যকরী হবে না। কেননা এ আযাদকরণ কার্যকর করতে বন্ধকগ্রহীতার হক বাতিল করা অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। এ হিসাবে এটিও বেচা-কেনার মতই হয়ে গেল। অবশ্য আযাদকারী ব্যক্তি যদি ধনী হয়, তবে এর হুকুম ব্যতিক্রম হবে। অর্থাৎ এ অবস্থায় তার কোন কথা অনুযায়ী আযাদ করা কার্যকর হয়ে যাবে। কেননা জরিমানা ওয়াজিব হওয়ার কারণে অর্থগত দিক থেকে বন্ধকগ্রহীতার হক বাতিল হবে না। এমনিভাবে ইজারা দেওয়া গোলাম আযাদ করার বিষয়টিও পূর্বোক্ত মাসআলা থেকে ব্যতিক্রম, (অর্থাৎ এ আযাদকরণও কার্যকর হবে।) কেননা ইজারা এর শেষ মুদ্দত পর্যন্ত বাকী থাকবে। আর আযাদ হওয়া ইজারার সাথে সাংঘর্ষিক নয়। বরং তা ইজারাকেও কবুল করে, তবে রাহ্‌নকে কবুল করে না। (অর্থাৎ আযাদ ব্যক্তি বন্ধক রাখা যায় না।) কাজেই আযাদ করার পর বন্ধক বাকী থাকবে না।

আমাদের দলীল হলো বন্ধকদাতা ব্যক্তি তো আকিল ও বালিগ এবং সে তার মালিকানাধীন গোলাম আযাদ করেছে। কাজেই বন্ধকগ্রহীতার অনুমতি না থাকার কারণে তার কর্ম বাতিল হবে না। যেমনিভাবে কেউ যদি তার খরীদকৃত গোলামকে হস্তগত করার পূর্বে আযাদ করে বা পলায়নকারী গোলামকে আযাদ করে, অথবা জোর পূর্বক দখলকৃত গোলামকে আযাদ করে (তবে এ আযাদ করা জাইয হবে। ঠিক তদ্রূপ বন্ধকের ক্ষেত্রেও অনুরূপ বিধান প্রযোজ্য হবে।) উল্লেখ্য যে, বন্ধকী গোলামের মধ্যে বন্ধকদাতার মালিকানা বিদ্যমান আছে, এ কথাতে কোনরূপ অস্পষ্টতা নেই। কেননা, যে জিনিস মালিকানাকে চায়, তা এখানে পুরাপুরিভাবেই আছে। বন্ধকের কারণে সে মালিকানা নিঃশেষ হয়ে যায়নি। অবশ্য আযাদ করার কারণে যখন বন্ধকী গোলাম হতে বন্ধকদাতার মালিকানা নিঃশেষ হয়ে যাবে, তখন এর উপর ভিত্তি করে বন্ধক গ্রহীতার দখল সত্ত্বও শেষ হয়ে যাবে। যেমন কেউ যদি শরীকী গোলামকে আযাদ করে তবে তা কার্যকর হয়ে যায়। কাজেই বন্ধকী গোলামের ক্ষেত্রে আযাদ করার বিষয়টি আরো ভালভাবে কার্যকর হবে। কেননা গোলামের সত্ত্বার মালিকানার বিষয়টি গোলামের দখলী স্বত্ত্বের মালিকানার চেয়ে অধিক প্রবল। অতএব শক্তিশালী এবং প্রবল জিনিস যখন আযাদ করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয় না, তখন দুর্বল মালিকানার বিষয়টিও এ ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হতে পারবে না। বন্ধকী গোলাম বিক্রি করা এবং তা হিবা করা

কার্যকর হয় না, বন্ধকদাতা কর্তৃক তা হস্তান্তর করতে সক্ষম না হওয়ার কারণে। কিন্তু আযাদ করার ক্ষেত্রে হস্তান্তরের কোন প্রশ্ন নেই। কাজেই আযাদ করা জাইয হয়ে যাবে। উল্লেখ্য যে, যদি মুনীব তার কোন একটি গোলাম কাউকে দিয়ে দেওয়ার জন্য অসিয়ত করে যায়, এমতাবস্থায় (সে মারা যাওয়ার পর) কোন ওয়ারিস যদি এ গোলামটি আযাদ করে দেয়, তবে ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে এ কাজ বাতিল বলে গণ্য হবে না। বরং সে কামাই করে তার মূল্য পরিশোধ করা পর্যন্ত আযাদ করার বিষয়টি বিলম্বিত হবে। যখন আযাদ করা কার্যকর হবে, তখন বন্ধকও বাতিল হয়ে যাবে। কেননা বন্ধকের ক্ষেত্র নিঃশেষ হয়ে গেছে। এরপর দেখতে হবে যদি বন্ধকদাতা ব্যক্তি বিত্তশালী হয় এবং ঋণ তৎক্ষণাৎ আদায়যোগ্য হয়, তবে তাকে ঋণ পরিশোধ করে দেওয়ার জন্য বলা হবে। কেননা যদি বন্ধকদাতা ব্যক্তিকে গোলামের মূল্য পরিশোধ করতে বলা হয় এবং ঋণের সাথে তা কাটাকাটি করা হয়, তাহলে এতে কোন ফায়দা হবে না। আর ঋণ যদি বিলম্বে আদায়যোগ্য হয়, তবে তার থেকে গোলামের মূল্য আদায় করে নেওয়া হবে। এবং এটিই গোলামের স্থলে বন্ধক হিসাবে থাকবে ঋণ পরিশোধের সময় আসা পর্যন্ত। কেননা এখানে ক্ষতিপূরণ আরোপ করার কারণ বিদ্যমান আছে এবং ক্ষতিপূরণ আরোপ করাতে উপকার নিহিত আছে। এরপর যখন ঋণ পরিশোধের সময় আসবে তখন বন্ধকগ্রহীতা ব্যক্তি এর থেকেই তার হক উসুল করে নেবে, যদি ক্ষতিপূরণ এবং বন্ধকগ্রহীতার হক এক জাতীয় জিনিস হয়। আর ঋণের অতিরিক্ত পরিমাণ বন্ধকদাতা তার নিকট ফেরত দেয়ে দিবে।

আর যদি বন্ধকদাতা ব্যক্তি দরিদ্র হয়, তবে গোলাম তার নিজের মূল্য পরিশোধ করার ব্যাপারে কাজ করবে এবং যা উপার্জন হবে, এর দ্বারা সে ঋণ পরিশোধ করবে। কিন্তু গোলামের উপার্জিত অর্থ যদি বন্ধকগ্রহীতার হকের সমজাতীয় না হয় তবে এর দ্বারা ঋণ পরিশোধ করবে না। (বরং গোলাম কাজ করে ঋণ পরিশোধ করবে)। কেননা যখন আযাদকারী ব্যক্তির পক্ষ হতে তার (বন্ধকগ্রহীতার) মূল পাওনা উসুল করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে, তখন সে বাধ্য হয়েই ঐ ব্যক্তির প্রতি রুজু করবে, যে এ আযাদ করার দ্বারা লাভবান হয়েছে। আর সে হলো ঐ গোলাম। কেননা বিধান রয়েছে যে, ক্ষতিপূরণ অনুপাতেই খারাজ অর্থাৎ মুনাফা অর্জিত হবে। (অর্থাৎ মুনাফা যার, ভর্তুকিও তাকেই দিতে হবে।)

হিদায়া গ্রন্থকার শায়খ বুরহান উদ্দীন (র) বলেন, উপরোক্ত বক্তব্যের ব্যাখ্যা হলোঃ যদি গোলামের মূল্য ঋণের তুলনায় কম হয়, তবেই এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। আর যদি ঋণের পরিমাণ কম হয়, তবে এ সম্পর্কিত বিধান সামনে বর্ণনা করবো ইনশাআল্লাহ।

এরপর গোলাম উপার্জন করে যে পরিমাণ ঋণ পরিশোধ করেছে, সে এ পরিমাণ অর্থ তার মুনীব থেকে উসুল করে নেবে, যখন সে সচ্ছল হবে। কেননা সে তার (মুনীবের) ঋণই পরিশোধ করেছে। আর শরঈ বিধানের কারণে এ ক্ষেত্রে সে (গোলাম) অনন্যোপায় ছিল। কাজেই সে তার পক্ষ হতে যা বহন করেছে, তা তার থেকেই উসুল করে নেবে। কিন্তু আযাদ করার জন্য যে গোলামকে অর্থ উপার্জনে

নিয়োগ করা হয়েছে, তার বিষয়টি এর থেকে ব্যতিক্রম।[১] (অর্থাৎ সে এ অবস্থায় আযাদকারী ব্যক্তি থেকে নিজের প্রদত্ত অর্থ উসুল করে নিতে পারবে না। কেননা সে তো তার নিজের উপর বর্তানো জামানত আদায় করছে। কারণ ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে সে তার নিজের দাসত্ব মুক্তির জন্য মেহনত করছে। পক্ষান্তরে সাহেবাইনের মতে সে তার নিজের আযাদীর পূর্ণতা বিধানের জন্য প্রচেষ্টা করছে। আর আলোচ্য মাসআলার ক্ষেত্রে সে এ জামানতের ব্যাপারে চেষ্টা করছে, যা পূর্ণভাবে আযাদী হাসিল হওয়ার পর অপরের উপর আরোপিত হয়েছিল। এই হিসাবে নিজের বাকী মূল্য পরিশোধের লক্ষ্যে উপার্জনে লিপ্ত গোলামের বিষয়টি, বন্ধকী মাল যে ধার হিসাবে প্রদান করে, তার মত হয়ে গেল।

ইমাম আবু হানীফা (র) বলেনঃ শরীকী গোলাম যার এক অংশ আযাদ করা হয়েছে এবং অপর অংশ এখনো আযাদ করা হয়নি, তার উপর সর্বাবস্থায় কামাই করা ওয়াজিব; চাই আযাদকারী ব্যক্তি বিত্তশালী হোক বা না হোক। কিন্তু বন্ধকী গোলামের ক্ষেত্রে তিনি (ইমাম আবু হানীফা (র) অভাবগ্রস্ত হওয়ার শর্ত আরোপ করেছেন। কেননা বন্ধক গ্রহীতা ব্যক্তির মালিকানার হক সাব্যস্ত আছে এবং এটি ঐ হক থেকে নিম্ন মানের, যে হক নীরব শরীক ব্যক্তির জন্য সাব্যস্ত আছে। সুতরাং এখানে (বন্ধকের ক্ষেত্রে) একই অবস্থায় কামাই করা ওয়াজিব হবে, এর স্তরটি ত্রুটিপূর্ণ এ কথাটি প্রকাশ করার লক্ষ্যে। কিন্তু খরীদকৃত গোলাম যাকে ক্রেতা হস্তগত করার পূর্বেই আযাদ করে দিয়েছে, তার হুকুম এর থেকে ভিন্নতর। কেননা ক্রেতার জন্য তার কামাই করা জরুরী নয়। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর এক বর্ণনা মতে উপার্জন করা তার উপরও ওয়াজিব। এমনিভাবে বন্ধকদাতা যদি অভাবগ্রস্ত হয়, তবে বন্ধকী গোলামও তার জন্য কামাই করবে। কেননা মালামাল আটক করে রাখার ক্ষেত্রে বিক্রেতার হক; বন্ধক গ্রহীতার হকের তুলনায় খুবই দুর্বল। কারণ বিক্রেতা ব্যক্তি তার মালিক হতে পারবে না, এ মালের মূল থেকে তার পাওনা উসুল করতে পারবে না। এমনিভাবে বিক্রেতা যদি তার মাল ক্রেতার নিকট (ধার) রাখে, তবে এতেও মাল আটক রাখার তার অধিকার বাতিল হয়ে যায়। পক্ষান্তরে বন্ধক গ্রহীতার হক মালিকানা হকে রূপান্তরিত হয়ে যায় এবং বন্ধকদাতা ব্যক্তিকে ধার দেওয়ার কারণে তার হক বাতিল হয় না। এ কারণেই সে তা পুনরায় ফেরত নিতে পারে। উপরোক্ত দুই অবস্থায়ও যদি আমরা গোলামের উপর কামাই করাকে ওয়াজিব করে দেই তবে আমরা উভয় হককে সমান করে দিলাম। অথচ এরূপ করা জাইয নেই।

আর যদি মুনীব তার গোলামকে বন্ধক রেখেছে বলে স্বীকার করে অর্থাৎ সে যদি তার গোলামকে সম্বোধন করে বলে যে, আমি তোমাকে অমুক ব্যক্তির নিকট বন্ধক

১. অর্থাৎ দুই ব্যক্তি কোন এক গোলামের মালিকানায় শরীক ছিল। তাদের একজন তাকে আযাদ করে দিল। এরপর দ্বিতীয় জনের অংশকে আযাদ করানোর জন্য তাকে উপার্জনে নিয়োগ করা হলো এবং সে উপার্জন করে তার পাওনা পরিশোধ করে দিল। এ অবস্থায় গোলাম তার প্রদত্ত টাকা-পয়সা প্রথম মুনীব থেকে চাইতে পারবে না।

রেখেছি এবং গোলাম তা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তারপর সে তাকে আযাদ করে দেয়, তবে আমাদের মাযহাব অনুসারে উপার্জন করা তার উপর ওয়াজিব হবে। কিন্তু ইমাম যুফার (র) এর থেকে ভিন্নমত পোষণ করেন। এ বিষয়টিকে তিনি আযাদ করার পরবর্তী সময়ের স্বীকারোক্তির উপর কিয়াস করেন।

আর আমাদের বক্তব্য হলো ঃ মুনীব অপরের হকের ব্যাপারে এমন অবস্থায় তার স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করেছে, যে অবস্থায় সে এতে অন্যের হককে সংশ্লিষ্ট করার অধিকার রাখে। কেননা এতে তার মালিকানা বিদ্যমান রয়েছে। কাজেই তার এ স্বীকারোক্তি সহীহ হবে। কিন্তু গোলাম আযাদ করার পরবর্তী সময়ে যে স্বীকারোক্তি ব্যক্ত করা হয়, সেটি এর থেকে ব্যতিক্রম। কেননা, এটি কর্তৃত্ব খতম হওয়ার অবস্থা।

যদি বন্ধকদাতা ব্যক্তি বন্ধকী গোলামকে মুদাব্বার বানিয়ে দেয়, তবে ফকীহগণের সর্বসম্মত রায় অনুসারে তাও সহীহ হবে। আমাদের মাযহাব অনুসারে এর কারণ তো সুস্পষ্ট। আর ইমাম যুফার (র) এর মতেও তা অত্যন্ত স্পষ্ট। কেননা তার মূলনীতি অনুসারেও মুদাববার বানানো বেচা-কেনার জন্য প্রতিবন্ধক নয়। যদি বন্ধকী বস্তু দাসী হয় এবং বন্ধকদাতা তাকে উম্মে ওয়ালাদ বানিয়ে নেয়, তাহলে ইমামগণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুসারে এ উম্মে ওয়ালাদ বানানো সহীহ হবে। কেননা দুই হকের মধ্যে নিম্নমানের হকের ভিত্তিতেও উম্মেওয়ালাদ বানানো সহীহ আর তা হলো, এমন হক, যা ছেলের দাসীর মধ্যে পিতার জন্য থাকে। কাজেই উন্নততর হকের ভিত্তিতে উম্মে ওয়ালাদ বানানো নিঃসন্দেহে সহীহ হবে। যেহেতু মুদাববার এবং উম্মে ওয়ালাদ বানানো সহীহ আছে, তাই মুদাববার এবং উম্মে ওয়ালাদ হওয়ার পর বন্ধকী দাসদাসী বন্ধক থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। কেননা এ পর্যায়ে বন্ধকের ক্ষেত্র বাতিল হয়ে গেছে। আর মুদাববার এবং উম্মে ওয়ালাদ থেকে নিজের পাওনা পরিশোধ করা সহীহ নয়।

এ অবস্থায় যদি বন্ধকদাতা ব্যক্তি ধনী হয়, তবে তাকে জরিমানা স্বরূপ এদের মূল্য পরিশোধ করতে হবে ঐ ব্যাখ্যা অনুসারে, যা আযাদ করার ক্ষেত্রে আমরা উল্লেখ করেছি। আর বন্ধকদাতা ব্যক্তি যদি অভাবগ্রস্ত হয়, তবে বন্ধকগ্রহীতা ব্যক্তি সমস্ত ঋণের ব্যাপারে মুদাববার ও উম্মেওয়ালাদকে শ্রম বিনিয়োগে নিয়োজিত করবে। কেননা তাদের উপার্জন মুনীবেরই মাল। কিন্তু আযাদকৃত গোলামের হুকুম এর থেকে ভিন্নতর। কেননা সে ঋণ এবং তার মূল্যের মধ্যে যেটি তুলনামূলকভাবে কম, কামাই করে সেটি আদায় করা তার দায়িত্ব। কারণ তার উপার্জন তারই পাওনা হক। উল্লেখ্য যে গোলামের নিকট শুধুমাত্র তার মূল্য পরিমাণ মাল আটক আছে, তাই মূল্য থেকে অধিক পরিমাণ কাজ তার থেকে নেওয়া যাবে না। এমনিভাবে ঋণের সমপরিমাণ পাওনা উসুল করা বন্ধক গ্রহীতার হক। কাজেই এর থেকে অতিরিক্ত পরিমাণ তার উপর ওয়াজিব হবে না। স্মর্তব্য যে, মুদাববার এবং উম্মেওয়ালাদ যে ঋণ পরিশোধ করেছে, মুনীব সচ্ছল হওয়ার পরও তারা তার থেকে তা আর ফেরত নিতে পারবে না। কেননা তারা তো মনিবের মাল থেকেই তা পরিশোধ করেছে। কিন্তু আযাদকৃত ব্যক্তি

তা উসুল করে নিতে পারবে। কেননা সে তো মুনীবের পক্ষে তারই মালিকানাভুক্ত অর্থ দ্বারা তার ঋণ পরিশোধ করেছে। আর পূর্বোক্ত ব্যাখ্যা মতে এ ব্যাপারে সে ছিল অনন্যোপায়। (কাজেই সে তার প্রদত্ত অর্থ উসুল করে নিতে পারবে।)

কোন কোন ফকীহ্ বলেনঃ যদি ঋণ নগদ আদায়যোগ্য না হয়, তবে মুদাববার তার মূল্য পরিশোধের জন্য চেষ্টা করবে। কেননা এ মূল্য হচ্ছে বন্ধকের বিনিময়বস্তু। এ কারণেই বন্ধকী বস্তুর স্থলে মূল্য আটককৃত অবস্থায় রাখা হয়। কাজেই যার পরিবর্তে বিনিময় প্রদত্ত হচ্ছে তার আনুপাতিক হার অনুসারেই সেটি ধার্য হবে। পক্ষান্তরে ঋণ যদি নগদ আদায়যোগ্য হয়, তবে এর হুকুম ভিন্ন হবে। কেননা এ অবস্থায় উপার্জন দ্বারা ঋণ পরিশোধ করা হবে।

আর যদি বন্ধকদাতা ব্যক্তি মুদাববার গোলামকে আযাদ করে দেয়, চাই তার উপর উপার্জন করে তার মূল্য আদায়ের ফয়সালা দেওয়া হোক বা না হোক, উভয় অবস্থাতেই মূল্য পরিমাণ মেহনত করা তার উপর অপরিহার্য হবে। কেননা আযাদ হওয়ার পর তার কামাই তারই মালিকানাধীন সম্পদ। আর আযাদ হওয়ার আগে সে যা আদায় করেছে, তা মুনীবের নিকট হতে ফেরত নিতে পারবে না। কেননা এ অবস্থায় সে যা আদায় করেছে, তা মুনীবের মাল থেকেই আদায় করেছে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ অনুরূপভাবে (বন্ধকদাতার উপর জামানত ওয়াজিব হবে) যদি বন্ধকদাতা ব্যক্তি বন্ধকী মাল নিজে ধ্বংস করে দেয়। কেননা এটি এমন মূল্যবান সম্পদ; যা ধ্বংস করার কারণে ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করতে হয়। আর এ ক্ষতিপূরণ যেহেতু মূল বন্ধকী বস্তুর পরিবর্তে প্রদান করা হয়, তাই এটি বন্ধক গ্রহীতার নিকট বন্ধকী বস্তু হিসাবে গণ্য হবে। আর যদি অপরিচিত তৃতীয় কোন ব্যক্তি বন্ধকী মাল ধ্বংস করে, তবে তার উপর ক্ষতিপূরণ অপরিহার্য করার ক্ষেত্রে বন্ধকগ্রহীতা ব্যক্তি বাদী হিসাবে গণ্য হবে। কাজেই সে তার থেকে মূল্য উসুল করে নেবে এবং এটি তার নিকট বন্ধক হিসাবে দায়বদ্ধ থাকবে। কেননা মূল বন্ধক বস্তু অক্ষুণ্ন থাকা অবস্থায় সে-ই এর অধিক হকদার। কাজেই এর স্থলাভিষিক্ত বস্তুটি ফেরত নিয়ে তা নিজের কাছে রাখার ব্যাপারেও সে অধিক হকদার হিসাবে গণ্য হবে। উল্লেখ্য যে, বন্ধকী মাল যে দিন ধ্বংস হবে, সেদিন এর যা মূল্য হবে, তা-ই ধ্বংসকারী ব্যক্তির উপর ওয়াজিব হবে। যেমন বন্ধক রাখার দিন কোন বস্তুর মূল্য ছিল এক হাজার টাকা, আর ধ্বংসের দিন এর মূল্য হয়েছে পাঁচশত টাকা, তবে জরিমানা স্বরূপ তার উপর পাঁচশত টাকাই ওয়াজিব হবে। এ পাঁচশত টাকা তার নিকট বন্ধক হিসাবে থাকবে। আর অবশিষ্ট পাঁচশত টাকা ঋণ থেকে বাদ হয়ে যাবে। বস্তুত: বর্তমান মূল্য হতে এ অতিরিক্ত পাঁচশত টাকা এমন হয়ে গেল, যেন তা কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে নষ্ট হয়ে গেছে। উল্লেখ্য যে, (বন্ধক গ্রহীতা ব্যক্তির উপর) বন্ধকী মালের ক্ষতিপূরণ হিসাবে যে মূল্য প্রদান করা ওয়াজিব হয়, এ ক্ষেত্রে গ্রহণ করার দিনের মূল্য ধর্তব্য হবে। ছাড় করিয়ে নেওয়ার দিনের মূল্য ধর্তব্য হবে না। কেননা সাবেক দখল হিসাবেই তার

(বন্ধক গ্রহীতার) উপর জামানত ওয়াজিব হবে। কারণ তার দখল হচ্ছে নিজের পাওনা উসুল করার দখল। তবে বন্ধকী বস্তু ধ্বংস হওয়ার সময়ই তার উপর জামানত ওয়াজিব হবে। (এর আগে নয়।)

ঋণ বিলম্বে আদায়যোগ্য; এমতাবস্থায় যদি বন্ধকগ্রহীতা ব্যক্তি বন্ধকী মাল ধ্বংস করে দেয় তবে ক্ষতিপূরণ হিসাবে এর মূল্য আদায় করা তার উপর ওয়াজিব হবে। কেননা সে অন্যের মালিকানাধীন বস্তু ধ্বংস করেছে। আর ঋণ পরিশোধের সময় না আসা পর্যন্ত এ মূল্য তার নিকট বন্ধক হিসাবে থাকবে। কেননা ক্ষতিপূরণ মূল বস্তুর পরিবর্তে ওয়াজিব হয়ে থাকে। কাজেই মূল বস্তুর যা হুকুম হবে, এর হুকুমও তাই হবে। **যখন ঋণ পরিশোধের সময় হবে; তখন দেখতে হবে ঋণটি মূল্যের সমজাতীয় বস্তু কিনা? যদি একই জাতীয় বস্তু হয়, তবে বন্ধক গ্রহীতা ব্যক্তি এই মূল্য থেকেই তার হক অনুপাতে বুঝে নেবে।** কেননা এটিও তার হকের সমজাতীয় বস্তু। নিজের পাওনা বুঝে নেওয়ার পর যদি আরো কিছু অতিরিক্ত থেকে যায়, তবে সে তা বন্ধকদাতার নিকট ফেরত দিয়ে দেবে। কেননা এটি (মূল্য) তার মালিকানাভুক্ত বস্তুরই বিনিময়। অথচ বন্ধকগ্রহীতার পাওনাও পরিশোধ করা হয়ে গেছে। (কাজেই তা ফেরতযোগ্য বস্তু।) আর মূল্য যদি ঋণের তুলনায় কম হয়। যেমন বন্ধকী বস্তুর পড়তা মূল্য পাঁচশত টাকা হয়ে গেল, অথচ বন্ধক রাখার দিন এর মূল্য ছিল এক হাজার টাকা তবে এ জাতীয় মাল ধ্বংস করার কারণে ধ্বংস কারীর উপর পাঁচশত টাকাই ওয়াজিব হবে। আর বাকী পাঁচশত টাকা ঋণ থেকে বাদ পড়ে যাবে। কেননা যে পরিমাণ মূল্য হ্রাস পেয়েছে, সে পরিমাণ মূল্য (কারো স্বেচ্ছায় ধ্বংস করা ব্যতিরেকে) নিজে নিজেই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে বলে ধর্তব্য হবে। কাজেই এ পরিমাণ ঋণ রহিত হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে বন্ধক গ্রহণের দিনের মূল্য ধর্তব্য হবে। আর যাকে দখলের ভিত্তিতেই বন্ধক গ্রহীতার উপর ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে। পড়তা মূল্যের জন্য হ্রাস পাওয়ার কারণে তার উপর যামানত ওয়াজিব হবে না। বন্ধকী মাল ধ্বংস করার কারণে বন্ধক গ্রহীতার উপর যে বাকী মূল্য ওয়াজিব হবে এ ক্ষেত্রে ধ্বংস করার দিনের মূল্য ধর্তব্য হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ বন্ধক গ্রহীতা ব্যক্তি যদি বন্ধকী মাল বন্ধকদাতা ব্যক্তিকে ধার দেয় তার খিদমত করার জন্য বা অন্য কোন কাজ করে দেওয়ার জন্য আর সেও যদি তা হস্তগত করে নেয়, তবে এ মাল বন্ধকগ্রহীতার দায় দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। কেননা ধার ও বন্ধকী দখলের মধ্যে বৈপরিত্য রয়েছে। এমতাবাস্থায় যদি বন্ধকী মাল বন্ধকদাতার নিকট ধ্বংস হয়ে যায়, তবে এতে বন্ধকগ্রহীতার উপর কোন কিছুই ওয়াজিব হবে না। কেননা যে দখলের ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হয়, তা এখানে নেই। এ ক্ষেত্রে বন্ধকগ্রহীতার জন্য জাইয আছে বন্ধকী মাল বন্ধকদাতার নিকট থেকে তার নিকটে নিয়ে যাওয়া। কেননা বন্ধক চুক্তি এখনো বাকী আছে। অবশ্য ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রে বাকী নেই। উল্লেখ্য যে, বন্ধকদাতা বন্ধকী মাল বন্ধকগ্রহীতার নিকট ফেরত দেওয়ার পূর্বেই যদি মারা যায়, তবে অপরাপর

পাওনাদারদের তুলনায় সে-ই এ মালের ব্যাপারে অধিক হকদার বলে গণ্য হবে। এর মূল কারণ হলো এই যে, ধারমূলক দখল অপরিহার্য কোন দখল নয়। আর ক্ষতিপূরণ কোন অবস্থাতেই বন্ধকের অনিবার্য কোন বিষয় নয়। লক্ষ্যণীয় যে, বন্ধকের হুকুম বন্ধকী বস্তুর (দাসীর) সন্তানের মধ্যেও সাব্যস্ত হয়ে থাকে। যদিও সে বাচ্চা ধ্বংস করার কারণে ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হয় না। যখন বন্ধক চুক্তি বাকী আছে এবং বন্ধকী বস্তু বন্ধকগ্রহীতা নিয়ে নিয়েছে, তখন জামানতের বিষয়টিও তার উপর বর্তাবে। কেননা বন্ধক চুক্তিতে দখলীসত্ত্ব যখন পুনরায় ফিরে এসেছে, তখন তা তার গুণাগুণ (জামানত) সহই ফিরে আসবে।

অনুরূপভাবে বন্ধকদাতা বা বন্ধকগ্রহীতা উভয়ের কোন একজন যদি বন্ধকী বস্তুর তৃতীয় অপর কোন ব্যক্তির নিকট অপরের অনুমতিক্রমে ধার রাখে, তবে ক্ষতিপূরণের হুকুম রহিত হয়ে যাবে। এর কারণ আমরা পূর্বেই বর্ণনা করেছি। এ ক্ষেত্রে তাদের (বন্ধকদাতা ও গ্রহীতা) প্রত্যেকের জন্য জাইয আছে ধার গ্রহণকারীর নিকট থেকে একে ফেরত নিয়ে বন্ধক হিসাবে রাখা, যেমনটি আগে ছিল। কারণ এতে তাদের উভয়েরই হক রয়েছে। উল্লেখ্য যে, ধারের এ মাসআলা তৃতীয় ব্যক্তির নিকট বন্ধকী মাল ইজারা দেওয়া, বিক্রি করা অথবা হিবা করার পরিপন্থী। যদিও এ কাজ তাদের কোন একজন অপরজনের অনুমতিক্রমে সম্পাদন করে। কেননা এ অবস্থায় এটি আর বন্ধকী বস্তু হিসাবে বাকী থাকবে না। এবং নতুনভাবে চুক্তি না করা পর্যন্ত তা আর বন্ধকী বস্তুরূপে গণ্য হবে না।

বন্ধকী মাল বন্ধক গ্রহীতার নিকট ফেরত দেওয়ার আগেই যদি বন্ধকদাতা মারা যায়, তাহলে বন্ধকগ্রহীতা ব্যক্তি অপরাপর পাওনাদারদের সমান বলে গণ্য হবে। কেননা উপরোক্ত বিষয়গুলো বন্ধকী বস্তুর সাথে এমন হক সংশ্লিষ্ট হয়ে গেছে, যা অপরিহার্য। কাজেই এর দ্বারা বন্ধকের হুকুম বাতিল হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে ধারের কারণে বন্ধকী মালের সাথে এমন কোন হক সংশ্লিষ্ট হয় না, যা অপরিহার্য। এই হিসাবে উভয় প্রকার লেনদেনের মধ্যে পার্থক্যের বিষয়টি খুবই সুস্পষ্ট।

আর বন্ধক গ্রহীতা তার নিজের কোন কাজের উদ্দেশ্যে বন্ধকী মাল বন্ধক দাতার নিকট থেকে ধার হিসাবে নেওয়ার পর সে (গোলাম) ঐ কাজ শুরু করার পূর্বেই যদি মারা যায়, তবে তা বন্ধকের জামানত তথা ক্ষতিপূরণের উপরই মারা গেছে বলে গণ্য হবে। কেননা বন্ধক এখনো বাকী আছে। **এমনিভাবে ঐ কাজ সমাধা করার পর যদি সে মারা যায়, তবে ঐ ক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম হবে।** কেননা এ ক্ষেত্রে ধারের দখলী স্বত্ব শেষ হয়ে গেছে। আর যদি সে কাজ করা অবস্থায় মারা যায়, তবে ক্ষতিপূরণ ছাড়াই মারা যাবে। কেননা কাজে নিয়োজিত রাখার কারণে এখনো ধারের দখল বাকী আছে। আর এটি বন্ধকী দখল হতে ভিন্নতর। কাজেই এ অবস্থায় ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না। **এমনিভাবে বন্ধকদাতা যদি বন্ধক গ্রহীতাকে তাকে কাজে ব্যবহার করার অনুমতি প্রদান করে তবে এ ক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম হবে,** ঐ দলীলের ভিত্তিতে যা আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি।

আর কেউ যদি অপর কোন ব্যক্তির নিকট থেকে কাপড় ধার নেয় বন্ধক রাখার জন্য; এরপর সে তা কোন কিছুর বিনিময়ে বন্ধক রাখে, চাই ঐ মাল পরিমাণে কম হোক বা বেশী; তা জাইয হবে। কেননা ধারদাতা ব্যক্তি অপরের জন্য দখলীস্বত্ব বুঝিয়ে দিয়ে একটি নফল কাজ করেছে, কাজেই এটিকে মূল বিষয়ে মালিকানা সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে নফল করার উপর কিয়াস করা হবে। উল্লেখ্য দখলী স্বত্বের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো নিজের পাওনা আদায় করা। বন্ধক গ্রহীতা ব্যক্তির ক্ষেত্রে দখলী স্বত্ব মালিকানা স্বত্ব থেকে পৃথকও হতে পারে। (যেমন তার দখলীস্বত্ব আছে, কিন্তু মালিকানা স্বত্ব নেই।) আর বিক্রেতার ক্ষেত্রে দখলী স্বত্ব পৃথক হতে পারে মালিকানা স্বত্ত্ব থেকে। ধারদাতা ব্যক্তির কোন কিছু না বলাটাও ধর্তব্য হবে; বিশেষভাবে ধার দেওয়ায় ক্ষেত্রে তো তা হবেই। কেননা এ ক্ষেত্রে অজ্ঞতা ঝগড়া বিবাদকে অপরিহার্য করে না।

যদি ধারদাতা ব্যক্তি কোন পরিমাণ নির্ধারিত করে দেয়, তবে ধার গ্রহণকারী ব্যক্তির জন্য এরচেয়ে অধিক পরিমাণের বিনিময়ে বা কম পরিমাণের বিনিময়ে তা বন্ধক রাখা জাইয হবে না। কেননা কোন শর্ত আরোপ করা একটি ফলপ্রসূ বিষয়। আর এ আরোপিত শর্ত অধিক পরিমাণের বিনিময়ে এটিকে বন্ধক রাখতে নিষেধ করে। কেননা ধারদাতা ব্যক্তির উদ্দেশ্য হলো যে পরিমাণ টাকা পয়সা আদায় করা সহজ, এর বিনিময়ে এটিকে আটক রাখা। এমনিভাবে তার কাংখিত পরিমাণের চেয়ে কম পরিমাণের বিনিময়েও তা বন্ধক রাখা জাইয হবে না। কেননা ধারদাতা ব্যক্তির উদ্দেশ্য হচ্ছে বন্ধক গ্রহীতার অর্থ সম্পদ নষ্ট হয়ে যাওয়ার অবস্থায় এর পরিবর্তে সে যেন অধিক পরিমাণ উসুল করতে সক্ষম হয়, যাতে সে তার থেকে এ পরিমাণ ফেরত নিতে পারে।

এমনিভাবে বিশেষ জাতীয় বস্তুর শর্ত আরোপ করা, নির্দিষ্ট বন্ধকগ্রহীতার শর্তারোপ করা এবং নির্দিষ্ট শহরের শর্তারোপ করা সবই জাইয আছে এবং তা ধর্তব্যও হবে। কেননা এগুলো সবই উপকারী শর্ত। কারণ কোন কোন জিনিস সহজলভ্য হয়, আবার কোন কোন জিনিস সহজ লভ্য হয় না। এমনিভাবে বন্ধকী বস্তুর আমানতদারী এবং হিফাযতের ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। যদি ধার গ্রহীতা ব্যক্তি ধারদাতার হুকুমের বিরুদ্ধাচরণ করে, তবে বন্ধকী বস্তু ধ্বংস হয়ে গেলে সে এর ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে। উল্লেখ্য যে, ধারদাতা ইচ্ছা করলে ধার গ্রহীতা ব্যক্তির নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করতে পারবে। এ অবস্থায় ধার গ্রহীতা (বন্ধকদাতা) এবং বন্ধকগ্রহীতার মাঝে সম্পাদিত বন্ধক চুক্তি পূর্ণাঙ্গ চুক্তি বলেই গণ্য হবে। কেননা বন্ধকদাতা (ধার গ্রহীতা) ব্যক্তি ক্ষতিপূরণ আদায় করে এ মালের মালিক হয়ে গেছে। এতে স্পষ্টভাবে এ কথা প্রতীয়মান হচ্ছে যে, সে তার মালিকানাধীন বস্তুই বন্ধক রেখেছে। আর ধারদাতা ব্যক্তি চাইলে বন্ধক গ্রহীতা ব্যক্তির নিকট থেকেও জামানত উসুল করতে পারবে। তারপর বন্ধক গ্রহীতা ব্যক্তি তার আদায়কৃত জামানত এবং প্রদত্ত ঋণ উভয়টিই বন্ধকদাতা ব্যক্তির নিকট থেকে আদায় করে নেবে। এ সম্পর্কিত বিস্তারিত মাসআলা তৃতীয় কোন মালিক বের হয়ে আসার অধ্যায় আমরা উল্লেখ করেছি।

যদি ধার গ্রহীতা ব্যক্তি তার ধারদাতা ব্যক্তির নির্দেশের অনুরূপ কাজ করে, যেমন সে তার নির্দেশিত বস্তুর বিনিময়েই একে বন্ধক রাখলো, এ অবস্থায় যদি বন্ধকী বস্তুর মূল্য ঋণের সমপরিমাণ বা এর চেয়ে বেশী হয়, আর তা বন্ধকগ্রহীতার নিকট ধ্বংস হয়ে যায়, তবে বন্ধকদাতার উপর থেকে ঋণ রহিত হয়ে যাবে। কেননা বন্ধকী মাল ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কারণে বন্ধক গ্রহীতা ব্যক্তি তার পাওনা পুরাপুরি বুঝে পেয়েছে। আর বন্ধকদাতার ধার গ্রহীতার উপর কাপড়ের মালিকের জন্য অনুরূপ পরিমাণ ওয়াজিব হবে। কেননা সে ধারদাতা ব্যক্তির মাল দ্বারা তার এ পরিমাণ ঋণ পরিশোধ করেছে। আর এটিই ধারদাতার জন্য ধার গ্রহীতার নিকট হতে নিজের পাওনা উসুল করে নেওয়া ওয়াজিব হওয়ার মূল কারণ। শুধুমাত্র হস্তগত করা এর কারণ নয়। কেননা, ধার গ্রহণকারী তো ধারদাতার সম্মতি ক্রমেই এটি হস্তগত করেছে। এমনিভাবে যদি বন্ধকী মালে কোন ক্ষয়ক্ষতি হয়ে যায়, তবে ঋণ থেকেও এই পরিমাণ হ্রাস হয়ে যাবে। এবং বন্ধকদাতার উপর কাপড়ের মালিকের জন্যও অনুরূপ পরিমাণ অর্থ বা বস্তু ওয়াজিব হবে ঐ দলিলের ভিত্তিতে, যা আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। যদি বন্ধকী বস্তুর মূল্য ঋণ থেকে কম হয়, তবে মূল্য পরিমাণ পরিশোধ হয়েছে বলে ধর্তব্য হবে। এ অবস্থায় বন্ধকদাতা ব্যক্তির উপর ওয়াজিব হবে বন্ধকগ্রহীতা ব্যক্তির অবশিষ্ট ঋণ পরিশোধ করে দেওয়া। কেননা মূল্যের অতিরিক্ত অংশ (পাওনা) এখনো সে বুঝে পায়নি। আর বন্ধকদাতা (ধার গ্রহীতা) ব্যক্তির উপর অপরিহার্য হবে কাপড়ের মালিককে ঐ পরিমাণ প্রদান করা, যে পরিমাণের দ্বারা সে বন্ধক গ্রহীতার ঋণ পরিশোধ করেছে,[১] ঐ যুক্তির ভিত্তিতে যা আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। বন্ধকী মালের মূল্য ঋণের সমপরিমাণ। এ অবস্থায় যদি ধারদাতা ব্যক্তি বন্ধকদাতার নিকট থেকে তার মাল জোরপূর্বক ছাড়িয়ে নিতে চায়, তবে বন্ধক গ্রহীতা ব্যক্তি এ ব্যাপারে তাকে বারণ করতে পারবে না। যদি তার প্রদত্ত ঋণ পরিশোধ করে দেওয়া হয়ে থাকে। কেননা সে তো তার মাল সাদাকা করে দেয়নি। সে তো তার থেকে নিজের মাল ছাড়িয়ে নিচ্ছে। এ কারণেই বন্ধকদাতা ব্যক্তি তার মাল দ্বারা যে পরিমাণ ঋণ পরিশোধ করেছে, ধারদাতা ব্যক্তি সে পরিমাণ তার থেকে উসুল করে নিতে পারে। কাজেই তার চাওয়ার পর বন্ধক গ্রহীতা ব্যক্তিকে তার মালামাল হস্তান্তর করার জন্য বাধ্য করা হবে। তৃতীয় ব্যক্তির বিষয়টি এর থেকে ব্যতিক্রম, যদি তার পাওনা পরিশোধ করে দেওয়া হয়। কেননা, সে তো স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে এ কাজ সম্পাদন করছে। আর সে তার মালিকানাধীন বস্তু ছাড়িয়ে দিচ্ছ না এবং নিজে দায়িত্ব মুক্তির জন্যও এ কাজ করছে না। কাজেই বন্ধক গ্রহীতা ব্যক্তির জন্য তার এ চাওয়াকে গ্রহণ না করে প্রত্যাখ্যান করা জাইয আছে। যদি ধার নেওয়া কাপড় বন্ধক রাখার আগে বন্ধকদাতার নিকটই নষ্ট হয়ে

---

১. যেমন কেউ একশত টাকা দামের একটি কম্বল বন্ধক রেখে পাঁচশত টাকা ধার নিল। তারপর বন্ধকী মাল বন্ধকগ্রহীতার নিকট ধ্বংস হয়ে গেল। এ অবস্থায় বন্ধক গ্রহীতার পাওনা থেকে একশত টাকা রহিত হয়ে যাবে। বাকী চারশত টাকা তাকে পরিশোধ করতে হবে। আর ধার গ্রহীতা ব্যক্তি ধারদাতাকে কেবলমাত্র একশত টাকা পরিশোধ করবে; এর বেশী নয়।

যায়, অথবা বন্ধক ছাড়িয়ে আনার পর তা ধ্বংস হয়ে যায়, তবে এ অবস্থায় তার উপর জামানত ওয়াজিব হবে না। কেননা, এর দ্বারা সে তার ঋণ পরিশোধ করেনি। বস্তুত: এটিই হলো যামানত ওয়াজিব হওয়ার মূল কারণ; যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি।

যদি এ বিষয়ে ধার গ্রহীতা ও ধার দাতার মধ্যে মতভেদ হয়ে যায়, তবে বন্ধকদাতা (ধার গ্রহীতা) এর কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা বন্ধকদাতা ব্যক্তি বন্ধকী মাল বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার দাবী করে উভয় অবস্থাতেই এর দ্বারা ঋণ পরিশোধের বিষয়টিকে অস্বীকার করছে। কাজেই তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। যেমনিভাবে তারা উভয়ে যদি ঐ পরিমাণের ব্যাপারে মতভেদ করে, যে পরিমাণের বিনিময়ে ধারদাতা তাকে এ মাল বন্ধক রাখার হুকুম দিয়েছিল, তবে এ অবস্থায় ধারদাতার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা মূল বিষয় ধার অস্বীকার করার ক্ষেত্রে তার বক্তব্যই গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে। কাজেই ধার সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অস্বীকৃতির অবস্থায়ও তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। যদি ধার গ্রহীতা ব্যক্তি ধারের মাল কোন প্রতিশ্রুত ঋণের পরিবর্তে বন্ধক রাখে, অর্থাৎ এই জন্য সে তার নিকটে বন্ধক রাখে, যাতে বন্ধক গ্রহীতা ব্যক্তি তাকে নির্ধারিত পরিমাণ ঋণ প্রদান করে, এ অবস্থায় ঋণ প্রদানের আগেই যদি বন্ধকী বস্তু বন্ধক গ্রহীতার হাতে ধ্বংস হয়ে যায়, আর প্রতিশ্রুত ঋণ এবং বন্ধকী বস্তুর মূল্যও যদি সমান সমান হয় তবে বন্ধকগ্রহীতা ব্যক্তিকে প্রতিশ্রুত নির্ধারিত অর্থের জামানত দিতে হবে এ কারণে, যা আমরা পূর্বেও বর্ণনা করেছি যে, প্রতিশ্রুত বস্তু মজুদ বস্তুর অনুরূপই। এরপর ধারদাতা ব্যক্তি বন্ধকদাতা ব্যক্তি থেকে অনুরূপ পরিমাণ অর্থ উসুল করে নেবে। কেননা বন্ধকগ্রহীতা ব্যক্তির নিকট থেকে বন্ধকদাতা ব্যক্তির পাওনা উসুল করার দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, বন্ধকী বস্তুর আর্থিক অবস্থা সঠিক আছে। এটি বন্ধকদাতা ব্যক্তির ঋণ থেকে মুক্ত হওয়ার দ্বারা বন্ধকী মালের আর্থিক অবস্থা সঠিক থাকা প্রমাণিত হওয়ার মতই একটি বিষয়।

আর যা ধার রাখা হয়, তা যদি দাস হয় এবং ধারদাতা ব্যক্তি তা আযাদ করে দেয়, তবে তা জাইয হবে। কেননা বন্ধকের পরেও দাসের মূলের মধ্যে তার মালিকানা বাকী আছে। এ অবস্থায় বন্ধক গ্রহীতা ব্যক্তির ইখতিয়ার থাকবে: সে ইচ্ছা করলে তার প্রদত্ত ঋণ বন্ধকদাতার থেকে আদায় করতে পারবে। কেননা, সে তার পাওনা বুঝে পায়নি। আর ইচ্ছা করলে সে ধারদাতা ব্যক্তিকেও এর মূল্যের জামিন সাব্যস্ত করতে পারবে। অর্থাৎ তার থেকে এর মূল্যের জামানত আদায় করতে পারবে। কেননা তার সম্মতিতেই তার গোলামের সত্ত্বার সাথে বন্ধক গ্রহীতার হককে সংশ্লিষ্ট করা হয়েছে। অথচ সে আযাদ করার দ্বারা বন্ধকগ্রহীতার উক্ত অধিকারকে বিনষ্ট করে দিয়েছে। বন্ধক গ্রহীতা ব্যক্তি তার পাওনা হস্তগত না করা পর্যন্ত এ মূল্য তার নিকট বন্ধক হিসাবে বাকী থাকবে। তারপর যখন তা হস্তগত হবে, তখন সে এ মূল্য ধারদাতা ব্যক্তির নিকট ফেরত দিয়ে দেবে। কেননা মূল্য ফেরত দেওয়ার বিষয়টি মূল বস্তু ফেরত দেওয়ার মতই।

যদি কোন ব্যক্তি বন্ধক রাখার জন্য গোলাম বা বাহনের জন্তু ধার নেয় এবং বন্ধক রাখার পূর্বে গোলাম থেকে খিদমত গ্রহণ করে বা বাহনের জন্তুর উপর সওয়ার হয়, তারপর এগুলোর মূল্য পরিমাণ মালের বিনিময়ে এগুলোকে বন্ধক রাখে। এরপর বন্ধকদাতা ব্যক্তি তাকে তার পাওনা পরিশোধ করে দেয়, কিন্তু এখনো সে (বন্ধকদাতা) বন্ধকী মাল হস্তগত করেনি, এ অবস্থায় যদি এগুলো বন্ধক গ্রহীতার নিকট ধ্বংস হয়ে যায়, তবে বন্ধকদাতার উপর কোনরূপ ক্ষতি পূরণ ওয়াজিব হবে না। কেননা, বন্ধক রেখে সে এর ক্ষতিপূরণ থেকে মুক্ত হয়ে গেছে। অধিকন্তু সে ছিল আমানতদার। কিন্তু পরে আমানতের খেলাফ কাজ করেছে। তারপর আবার আমানতের সাথে যে কাজ সামঞ্জস্যপূর্ণ তা করেছে। কাজেই তার উপর জামানত ওয়াজিব হবে না। এমনিভাবে যদি ধার গ্রহণকারী ব্যক্তি বন্ধকী মাল ছাড়িয়ে আনার পর বাহনের জন্তুর উপর সওয়ার হয় বা গোলাম থেকে খিদমত গ্রহণ করে এবং এতে সেগুলো ধ্বংশ না হয়, কিন্তু পরে তার কোন হস্তক্ষেপ ছাড়াই যদি এগুলো ধ্বংশ হয়ে যায়, তবে এ অবস্থায়ও ধারগ্রহণকারী ব্যক্তির উপর ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না। কেননা, বন্ধকী মাল ছাড়িয়ে আনার পর ধার গ্রহণকারী আমানতদার হয়ে যায়। তখন সে আর ধারগ্রহণকারী থাকে না। কারণ, ছাড়িয়ে আনার পর ধার গ্রহণের হুকুম শেষ হয়ে যায়। তারপর সে আবার যেহেতু পূর্বোক্ত চুক্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আচরণের দিকে ফিরে এসেছে, তাই সে জামানত থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। এ মাসআলাটি ধার গ্রহণকারী ব্যক্তির মাসআলা থেকে ব্যতিক্রম। কেননা সে তো নিজের জন্যই কোন বস্তু হস্তগত করে। কাজেই এটিকে মালিকের দখলে পৌঁছিয়ে দেওয়া আবশ্যক। আর যে ব্যক্তি বন্ধক রাখার জন্য কোন কিছু ধার নেয়, সে তো আদেশ দাতার উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যই তা করে। আর আদেশ দাতার উদ্দেশ্য হলোঃ যদি বন্ধকী মাল বন্ধকগ্রহীতার নিকট ধ্বংস হয় এবং সে তার পাওনা বুঝে পায়, তখন সে বন্ধকদাতা ধার গ্রহণকারীর প্রতি রুজু করবে। অর্থাৎ তার নিকট থেকে নিজের পাওনা উসুল করে নেবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন : বন্ধকদাতা ব্যক্তি যদি বন্ধকী মালের উপর কোনরূপ অন্যায় হস্তক্ষেপ করে, তবে তার উপর ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে। কেননা এতে অন্যের (বন্ধক গ্রহীতার) মূল্যবান মাল নষ্ট করা হয়। সর্বোপরি নিয়ম আছে যে, কারো হকের সাথে যদি অন্যের মালিকানা সম্পৃক্ত হয়ে যায়, তবে ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে সে তৃতীয় ব্যক্তির অনুরূপ হয়ে যায়। যেমন মরণাপান্ন রুগ্ন ব্যক্তির মালের ওয়ারিসগণের হক সম্পৃক্ত হওয়া, যা এক সাথে এক তৃতীয়াংশের অধিক সম্পদের ক্ষেত্রে তার দান কার্যকরী হওয়ার ব্যাপারে প্রতিবন্ধক হয়ে থাকে। এমনিভাবে কারো খিদমতের জন্য কোন গোলামকে অসিয়ত করার পর ওয়ারিসগণ যদি তাকে মেরে ফেলে, তাহলে তাদেরকে এর মূল্যের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, যাতে এর স্থান পূরণের জন্য কোন গোলাম খরীদ করে নেওয়া যায়।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন : যদি বন্ধক গ্রহীতা ব্যক্তি বন্ধকী মালের ব্যাপারে কোনরূপ অন্যায় হস্তক্ষেপ করে, তবে অন্যায় হস্তক্ষেপ পরিমাণ অর্থ তার পাওনা ঋণ থেকে রহিত হয়ে যাবে। এর মর্ম হলোঃ এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য হবে, যদি ঋণ এবং ক্ষতিপূরণ একই জাতীয় বস্তু হয়। (যেমন ওজনযোগ্য বস্তু বা পরিমাণযোগ্য বস্তু)। কেননা মূল বস্তুটি মালিকের মালিকানাভুক্ত এবং এর উপর বন্ধকগ্রহীতা ব্যক্তি যুলম-অত্যাচার করেছে। কাজেই মালিকের জন্য তাকেই ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ যদি বন্ধকী গোলাম বন্ধকদাতা; বন্ধকগ্রহীতা এবং তাদের মালামালের উপর অন্যায় হস্তক্ষেপ করে তবে তা ক্ষমাযোগ্য বলে গণ্য হবে। এটি ইমাম আবু হানীফা (র) এর অভিমত। পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেনঃ বন্ধকী গোলাম বন্ধক গ্রহীতার উপর কোন অন্যায় হস্তক্ষেপ করলে তা ধর্তব্য হবে। বন্ধকগ্রহীতা ব্যক্তির উপর অন্যায় হস্তক্ষেপ করার অর্থ হলো এমন অন্যায় অপরাধ করা, যা মাল ওয়াজিব করে। মোদ্দাকথা হচ্ছে, ইমামগণের সর্বসম্মত (উপরোক্ত) মাসআলা, যার উপর তারা সকলেই একমত, এর যুক্তি হলো এই যে, এ ক্ষেত্রে গোলাম তার মালিকের উপর অন্যায় হস্তক্ষেপ করেছে। (কাজেই এটি ধর্তব্য হবে না)। লক্ষ্যণীয় যে, যদি বন্ধকী গোলাম মারা যায়, তবে তার কাফনের দায়-দায়িত্ব বন্ধকদাতার উপরই বর্তাবে। কিন্তু আত্মসাৎকৃত গোলাম যদি যার নিকট থেকে তাকে আতস্মাৎ করা হয়েছে, তার উপর অন্যায় হস্তক্ষেপ করে, তবে তার হুকুম এর থেকে ভিন্নতর। কেননা জরিমানা আদায় করার মাধ্যমে আত্মসাৎকৃত এ মালে আত্মসাৎকারী ব্যক্তির মালিকানা সাব্যস্ত হয়ে গেছে। এ কারণেই আত্মসাৎকৃত গোলাম যদি মারা যায়, তবে আত্মসাৎকারী ব্যক্তির উপর তার কাফনের দায়িত্ব বর্তাবে। এ হিসাবে যার নিকট থেকে আত্মসাৎ করা হয়েছে এর উপর আত্মসাৎকৃত গোলামের অন্যায় হস্তক্ষেপ, মালিক নয় এমন ব্যক্তির উপর অপরাধ করার তুল্য। অতএব অপরাধ ধর্তব্য হবে। আর যে মাসআলায় সাহেবাইনের মতভেদ রয়েছে, এ ক্ষেত্রে তাদের যুক্তি হলোঃ যে ব্যক্তি এ গোলামের মালিক নয় (বন্ধকগ্রহীতা) তার উপর সে অন্যায় হস্তক্ষেপ করেছে, (যেমন পূর্বে বর্ণিত হয়েছে), এবং এ অন্যায় হস্তক্ষেপের বিষয়টি বিবেচনায় আনার মধ্যে উপকার রয়েছে। আর তা হচ্ছেঃ অন্যায় হস্তক্ষেপের কারণে গোলামটিকে বন্ধকগ্রহীতার নিকট হস্তান্তর করে দেওয়া। কাজেই তা ধর্তব্য হবে। এ অবস্থায় বন্ধকদাতা ও বন্ধকগ্রহীতা ব্যক্তি যদি ইচ্ছা করে, তবে বন্ধকচুক্তিকে বাতিল করে দিয়ে গোলামটিকে বন্ধকগ্রহীতার নিকট হস্তান্তর করে দিতে পারবে। আর যদি বন্ধকগ্রহীতা বলেঃ আমি অন্যায় হস্তক্ষেপের বিনিময় চাই না, তবে এটি পূর্ববৎ বন্ধক হিসাবে বাকী থাকবে।

ইমাম আবু হানীফা (র) এর দলীল হলোঃ বন্ধক গ্রহীতার জন্য যদি আমরা এ অন্যায় হস্তক্ষেপের বিষয়টিকে বিবেচনায় আনি, তবে তার (বন্ধকগ্রহীতার) উপর ওয়াজিব হবে অন্যায় হস্তক্ষেপ থেকে একে মুক্ত করা। কেননা এ অন্যায় হস্তক্ষেপ তার দায়িত্বে থাকা অবস্থায় সংঘটিত হয়েছে। কাজেই তার (বন্ধকগ্রহীতার) উপর অপরাধমুক্ত করার দায়িত্ব আরোপিত থাকা অবস্থায় তার জন্য ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব করাতে কোন উপকার নেই।

বন্ধকী গোলাম যদি বন্ধকগ্রহীতার মালের উপর কোন অন্যায় হস্তক্ষেপ করে, তবে কোন ইমামের মতেই এটি ধর্তব্য হবে না। যদি গোলামের মূল্য এবং ঋণ উভয়টিই সমান সমান হয়। কেননা এটি বিবেচনা করার মধ্যে কোন উপকার নেই। কারণ সে (বন্ধকগ্রহীতা) তো এ গোলামের মালিক হতে পারবে না। আর এটিই ছিল উপকারের বিষয়।

যদি বন্ধকী গোলামের মূল্য ঋণের তুলনায় বেশী হয়, তবে ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে তিনি আমানতের পরিমাণ অনুপাতে এর বিবেচনা করেন। কেননা ঋণের তুলনায় যতটুকু অতিরিক্ত আছে, তা বন্ধক গ্রহীতার দায়িত্বে নেই। কাজেই অন্যায় হস্তক্ষেপ আমানত গ্রহীতার উপর আমানতী গোলামের অন্যায় হস্তক্ষেপের অনুরূপ হয়ে গেল। ভিন্ন এক বর্ণনা মতে ইমাম আবু হানীফা (র) থেকে বর্ণিত আছে যে, এটি ধর্তব্য হবে না। কেননা বন্ধকের হুকুম অর্থাৎ মাল আটক রাখা তা অতিরিক্ত পরিমাণের ক্ষেত্রে সাব্যস্ত আছে। এ হিসাবে অতিরিক্ত পরিমাণটি দায়বদ্ধের মত হয়ে গেল। এ মাসআলাটি বন্ধকদাতা বা বন্ধকগ্রহীতার সন্তানের উপর বন্ধকী গোলামের অন্যায় হস্তক্ষেপ করার মাসআলা থেকে ব্যতিক্রম। কেননা মালিকানার সূত্র বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। সুতরাং এটি তৃতীয় কোন ব্যক্তির উপর অন্যায় হস্তক্ষেপ করার অনুরূপ হয়ে গেলে। ইমাম মুহাম্মদ (র) জামে সগীর গ্রন্থে বলেনঃ কেউ হাজার টাকা দামের একটি গোলাম হাজার টাকা বিনিময়ে নির্ধারিত সময়ের জন্য কারো কাছে বন্ধক রাখলো; এরপর এর মূল্য কমে একশত টাকা হয়ে গেল। তারপর অপর কোন ব্যক্তি এ গোলামকে হত্যা করে একশত টাকা এর জরিমানা আদায় করলো। আর এ সবের পর ঋণ পরিশোধের সময় আসলো। এ অবস্থায় বন্ধকগ্রহীতা ব্যক্তি তার পাওনা উসূল করার লক্ষ্যে এক শতটাকা হস্তগত করে নেবে। কিন্তু বন্ধকদাতা ব্যক্তির নিকট হতে অতিরিক্ত আর কিছু নিতে পারবে না। আমাদের মাযহাব অনুসারে এ ক্ষেত্রে মূলনীতি হলোঃ দাম কমে যাওয়ার কারণে যদি কোন বস্তুর মূল্য হ্রাস প্রাপ্ত হয়ে যায়, তবে তা ঋণ রহিত হওয়াকে ওয়াজিব করবে না। ইমাম যুফার (র) এর থেকে ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি বলেনঃ এ ক্ষেত্রে গোলামের দাম কমে গেছে। কাজেই এটি মূলবস্তু ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাওয়ার অনুরূপ হয়ে গেল।

আমাদের যুক্তি হলোঃ দাম কমে যাওয়ার অর্থ হলো বস্তুর ব্যাপারে মানুষের আকর্ষণ কমে যাওয়া। আর এটি ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ধর্তব্য হয় না। এমন কি এতে ক্রেতার ইখতিয়ারও সাব্যস্ত হবে না। অনরূপভাবে আত্মসাতের ক্ষেত্রেও এটি ধর্তব্য হয় না। কাজেই এতে কোনরূপ ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না। কিন্তু মূলবস্তু যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায়, তবে এর হুকুম ভিন্নতর হবে। কেননা বন্ধকী বস্তুর কোন অংশ যদি বিনষ্ট হয়ে যায়, তবে বস্তুর এ অংশে বন্ধকগ্রহীতা ব্যক্তির পাওনা উসুল হয়ে যায়। কেননা, বন্ধক গ্রহীতার দখল তো হলো তার পাওনা উসুল করার দখল। উল্লেখ্য যে, বস্তুর দাম হ্রাস প্রাপ্ত হওয়ার কারণে ঋণ যেহেতু রহিত হয় না, তাই এ অবস্থায়ও বন্ধকী বস্তু পূর্ণ ঋণের বদলায় বন্ধক হিসাবেই বাকী থাকবে। এ অবস্থায় কোন আযাদ ব্যক্তি যদি একে হত্যা

করে তবে তাকে একশত টাকা মূল্যই জরিমানা হিসাবে আদায় করতে হবে : কেননা, গোলাম হত্যার জরিমানার ক্ষেত্রে হত্যার দিন এর যে মূল্য ছিল, তাই ধর্তব্য হবে। কারণ যে পরিমাণ ক্ষতি করেছে, সে পরিমাণই ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। আর এ ক্ষতিপূরণ বন্ধকগ্রহীতা ব্যক্তি নিয়ে নেবে। কেননা বন্ধকগ্রহীতা ব্যক্তির ক্ষেত্রে এটিই তার মালের আর্থিক অবস্থা। যদিও আমাদের মূলনীতি অনুসারে এটি খুনের বদলা। এ কারণেই আযাদ ব্যক্তির রক্ত পানের তুলনায় তা বেশী হতে পারবে না। কেননা মুনীব তার আর্থিক কারণেই এর হকদার হয়েছে। আর বন্ধকগ্রহীতার হক অর্থের সাথেই সংশ্লিষ্ট। কাজেই যে জিনিস মূলবস্তুর স্থলাভিষিক্ত, সে ক্ষেত্রেও এ হুকুম প্রযোজ্য হবে।

উপরোক্ত অবস্থায় বন্ধকগ্রহীতা ব্যক্তি বন্ধকদাতার নিকট হতে অতিরিক্ত আর কিছু উসুল করতে পারবে না। কেননা সূচনা লগ্ন হতেই বন্ধকীমালের দখল হলো নিজের পাওনা উসুল করার দখল (মালিকানা সূত্রের দখল নয়)। আর বন্ধকী বস্তু ধ্বংস হয়ে গেলে প্রাপ্তির বিষয়টি আরো মজবুত হয়ে যায়। কাজেই সূচনা লগ্নে এর মূল্য যেহেতু হাজার টাকা ছিল, তাই সে প্রথম হতেই হাজার টাকা বুঝে পেয়েছে বলে ধর্তব্য হবে। অথবা এ ক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য হলো ঃ একশতের বিনিময়ে সে হাজার টাকা বুঝে পেয়েছে এ কথা কোনভাবেই বলা যায় না। এরূপ বলা হলে এতে সুদ অনিবার্য হয়ে দাঁড়াবে। কাজেই বলতে হবে, সে একশত টাকা বুঝে পেয়েছে। আর নয়শত টাকা মূল বন্ধকী মালে বাকী রয়েছে। এরপর যখন ঐ বন্ধকী মাল ধ্বংস হয়ে গেছে, তখন এ ধ্বংসের কারণে সে বাকী নয়শতও বুঝে পেয়েছে বলে গণ্য হবে। কিন্তু হত্যা করা ছাড়া যদি বন্ধকী গোলাম মারা যায়, তবে গোলামের কারণেই সে পূর্ণ হাজার টাকা বুঝে পেয়েছে বলে ধর্তব্য হবে। কেননা এতে সুদ হবে না।

ইমাম মুহাম্মদ (র) 'জামে সগীর' গ্রন্থে বলেনঃ যদি বন্ধকদাতা ব্যক্তি বন্ধকগ্রহীতা ব্যক্তিকে বন্ধকী মাল বিক্রি করে দেওয়ার জন্য হুকুম করে এবং সে তা একশত টাকায় বিক্রি করে নিজের পাওনা উসুল করার লক্ষ্যে তা হস্তগত করে নেয়, তবে এ অবস্থায় সে বন্ধকদাতা ব্যক্তির নিকট থেকে আরো নয়শত টাকা উসূল করে নিবে। কেননা বন্ধক গ্রহীতা ব্যক্তি যখন বন্ধকদাতার নির্দেশে মাল বিক্রি করলো। তখন এটি এমন হলোঃ যেন বন্ধকদাতা তার মাল ফেরৎ নিয়ে নিজেই তা বিক্রি করে দিয়েছে। এ অবস্থায় বন্ধক বাতিল হয়ে যাবে এবং ঋণ বাকী থাকবে, তবে যে পরিমাণ সে উসুল করে নেবে, ঐ পরিমাণ বাদ যাবে। এ ক্ষেত্রেও মাসআলা ঠিক তদ্রূপই হবে।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন ঃ একশত টাকা দামের কোন গোলাম যদি বন্ধকী গোলামকে হত্যা করে এবং তাকে এর বদলা হিসাবে দিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে বন্ধকদাতা ব্যক্তি সমুদয় ঋণ পরিশোধ করে তাকে ছাড়িয়ে নিবে। এটি ইমাম আবু হানীফা এবং ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর অভিমত। ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন ঃ বন্ধকদাতার ইখতিয়ার থাকবে। সে ইচ্ছা করলে সমুদয় ঋণ পরিশোধ করে তাকে ছাড়িয়ে নিবে, অথবা ইচ্ছা করলে বন্ধকগ্রহীতার মালের বিনিময়ের প্রদত্ত গোলামটি তার নিকট হস্তান্তর করবে।

ইমাম যুফার (র) বলেনঃ একশত টাকার বিনিময়ে এটি তার নিকট বন্ধক হিসাবে থাকবে। তাঁর দলীল হলোঃ বন্ধকী মালের দখল নিজের পাওনা উসুল করার দখল। বন্ধকী মাল ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কারণে তার পাওনা স্থির হয়ে গেছে। তবে সে এক দশমাংশের পরিমাণ বিনিময়ে নিয়ে নিয়েছে। তাই এই এক দশমাংশ পরিমাণ ঋণ বাকী থাকবে। ইমাম যুফার (র) এর বিপক্ষে আমাদের ইমামগণের দলীল হলোঃ শরীর এবং রক্ত উভয় দিক থেকেই দ্বিতীয় গোলামটি প্রথম গোলামের স্থলাভিষিক্ত। যদি প্রথম গোলামটি বহাল থাকতো এবং এর দাম কমে যেত, তবে আমাদের ইমামগণের মতে এ অবস্থায় ঋণ রহিত হতো না উপরোক্ত দলীলের ভিত্তিতে। সুতরাং প্রদত্ত গোলাম প্রথমটির স্থলাভিষিক্ত অবস্থায়ও অনুরূপ হুকুম প্রযোজ্য হবে। বন্ধকদাতা ব্যক্তির ইখতিয়ার হাসিল হওয়ার ব্যাপারে ইমাম মুহাম্মদ (র) এর দলীল হলোঃ বন্ধকী গোলাম বন্ধকগ্রহীতার দায়-দায়িত্বে যাওয়ার পর তাতে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। কাজেই তার ইখতিয়ার হাসিল হবে। যেমন–বিক্রীত পণ্য যদি হস্তগত করার আগেই একে হত্যা করে দেওয়া হয়। অথবা আত্মসাৎকৃত গোলামকে যদি আত্মসাৎকারী ব্যক্তির হাতে থাকা অবস্থায়ই হত্যা করে দেওয়া হয়, তাহলে এ অবস্থায় ক্রেতার এবং যার নিকট থেকে গোলাম আত্মসাৎ করা হয়েছে, তাদের ইখতিয়ার হাসিল হয়ে থাকে। এক্ষেত্রেও ঠিক তদ্রূপই হবে।

শায়খাইনের দলীল হলোঃ গোশত এবং রক্ত উভয় দিক থেকেই যেহেতু দ্বিতীয় গোলামটি প্রথম গোলামের স্থলাভিষিক্ত, তাই মূল গোলামের ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন প্রকাশ পায়নি, যেমনটি আমরা ইমাম যুফার (র) এর অভিমতের সাথে বর্ণনা করেছি। আর আমাদের মাযহাবে মূল বন্ধকী গোলামটি যেহেতু আমানত, তাই বন্ধকগ্রহীতার সম্মতি ব্যতিরেকে বন্ধকদাতা কর্তৃক একে বন্ধক গ্রহীতার মালিকানায় হস্তান্তর করা জাইয হবে না। অধিকন্তু একে ঋণের মোকাবিলায় বন্ধকী বস্তু বানিয়ে দেওয়া একটি জাহিল বিধান। অথচ জাহিল যুগের ন্যায় বিধান দেওয়া, ইসলাম রহিত করে দিয়েছে। পক্ষান্তরে ক্রয় বিক্রয়ের বিষয়টি এর থেকে ব্যতিক্রম। কেননা এতে ইখতিয়ার প্রদান করা (বাতিল করা তুল্য)। আর এটি শরীআতে অনুমোদিত। এমনিভাবে আত্মসাতের বিষয়টিও বন্ধক চুক্তি থেকে ভিন্নতর। কেননা জরিমানা আদায় করে আত্মসাতকারীকে এর মালিক বানিয়ে দেওয়াও শরীআত অনুমোদিত। গোলামের মূল্য কমে গিয়ে এর দাম একশত টাকা হয়ে যাওয়ার পর তাকে যদি একশত টাকা দামের জন্য কোন গোলাম হত্যা করে আর এ হত্যার বিনিময়ে যদি তাকে (হত্যাকারীকে) হস্তান্তর করা হয়, তবে এ ক্ষেত্রেও অনুরূপ মতভেদ রয়েছে।

যদি বন্ধকী গোলাম কোন ব্যক্তিকে ভুলক্রমে হত্যা করে ফেলে তবে তার এ অন্যায় হস্তক্ষেপের ক্ষতিপূরণ বন্ধক গ্রহীতার উপর ওয়াজিব হবে। হত্যার বিনিময়ে এ গোলামকে হস্তান্তর করে দেওয়া বন্ধক গ্রহীতা ব্যক্তির জন্য জাইয হবে না। কেননা, সে অপর কাউকে মালিক বানানোর ইখতিয়ার রাখেনা। **যদি বন্ধক গ্রহীতা ব্যক্তি এ হত্যার রক্তপণ নিজে আদায় করে দেয়, তবে বন্ধকী গোলাম (দায় মুক্ত)**

হয়ে যাবে এবং ঋণ পূর্বাবস্থায় বাকী থাকবে। এ **অবস্থায় বন্ধকগ্রহীতা** ব্যক্তি বন্ধকদাতার নিকট থেকে আংশিক রক্তপণও উসুল করে নিতে পারবেন। কেননা **বন্ধকী** বস্তু তার দায়িত্বে থাকা অবস্থায় সে অন্যায় কাজ করেছে। কাজেই এ অন্যায় হস্তক্ষেপের দায়-দায়িত্ব তার উপরই বার্তাবে।

যদি বন্ধক গ্রহীতা ব্যক্তি রক্তপণ আদায়ে অস্বীকৃতি ব্যক্ত করে, তবে বন্ধকদাতা ব্যক্তিকে বলা হবে ঃ (নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসদের নিকট) এ গোলামকে হস্তান্তর করে দাও অথবা রক্তপণ দিয়ে তাকে মুক্ত করে নেও। কেননা গোলামের মূল স্বত্বায় তার মালিকানা এখনো কায়েম আছে। বন্ধক গ্রহীতা ব্যক্তি যেহেতু বন্ধকদাতার স্থলাভিষিক্ত, তাই ফিদ্য়া তথা রক্তপণ আদায় করার দায়িত্ব তার উপর বার্তাবে। সে তা আদায়ে অস্বীকার করলে অন্যায় হস্তক্ষেপের হুকুমের ভিত্তিতে বন্ধক দাতার নিকট এর দাবী করা হবে। আর অন্যায় হস্তক্ষেপের হুকুম হচ্ছেঃ গোলাম হস্তান্তর করা বা রক্ত পণ আদায় করার মধ্যে ইখতিয়ার থাকা। **যদি সে গোলাম হস্তান্তর করার বিষয়টিকে গ্রহণ করে তবে ঋণ রহিত হয়ে যাবে।** কেননা এমন করলে অপর ব্যক্তি বন্ধকী গোলামের হকদার হয়েছে- যা বন্ধকগ্রহীতা ব্যক্তির দায়িত্বে থাকা অবস্থায় সংঘটিত হয়েছে। কাজেই এ হকদার হওয়া ধ্বংসের অনুরূপই হয়ে গেল। **যদি বন্ধকদাতা ব্যক্তি ফিদয়া তথা রক্তপণ প্রদান করে; তবে এ ক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম হবে।** কেননা বন্ধকদাতা ব্যক্তির এ গোলাম এমন প্রতিদানের বিনিময়ে হাসিল হয়েছে; যা বন্ধক গ্রহীতার উপর ওয়াজিব ছিল। আর তা হলো রক্তপণ বন্ধকী দাসীর বাচ্চার হুকুম এর থেকে ব্যতিক্রম। অর্থাৎ এ জাতীয় সন্তান যদি কোন মানুষকে হত্যা করে অথবা কারো মাল ধ্বংস করে, তবে এ অবস্থায় প্রথমেই বন্ধকদাতা ব্যক্তিকে বলা হবেঃ তুমি গোলাম হস্তান্তর করে দাও অথবা রক্তপণ প্রদান কর। কেননা বাচ্চার ক্ষেত্রে বন্ধক গ্রহীতা ব্যক্তির কোন দায়বদ্ধতা নেই। কাজেই বন্ধকদাতা যদি হকদার ব্যক্তিকে বাচ্চা দিয়ে দেয়, তবে তা বন্ধক থেকে খারিজ হয়ে যাবে এবং ঋণ থেকেও কোন অংশ বাদ যাবে না। যেমন সূচনাতেই তা ধ্বংস হয়ে গেলে হয়ে থাকে। আর যদি বন্ধকদাতা ব্যক্তি এর রক্তপণ পরিশোধ করে দেয়, তবে এ সন্তান পূর্ববৎ তার মায়ের সাথে বন্ধক হিসাবে বাকী থাকবে।

যদি বন্ধকী গোলাম এ পরিমাণ মাল নষ্ট করে, যা তার পূর্ণ সত্তাকে পরিবেষ্টন করে নেয় অর্থাৎ গোলামের মূল্যের সমান হয়, এ অবস্থায় বন্ধক গ্রহীতা ব্যক্তি যদি গোলামের উপর যে ঋণ অপরিহার্য হয়েছে, তা আদায় করে দেয়, তবে তার পাওনা ঋণ পূর্বের অবস্থায় বহাল থাকবে। যেমন রক্তপণ আদায় করার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। যদি বন্ধক গ্রহীতা ব্যক্তি গোলামের উপর অপরিহার্য ঋণ পরিশোধ করতে অস্বীকার করে, তবে বন্ধকদাতা ব্যক্তিকে বলা হবে, ঋণ পরিশোধের জন্য তাকে তুমি বিক্রি করে দাও। কিন্তু বন্ধকদাতা ব্যক্তি যদি বন্ধক গ্রহীতার পক্ষ হতে রক্তপণ পরিশোধ করতে সম্মত হয়, তবে এর হুকুম ভিন্ন হবে। অর্থাৎ সে যদি রক্তপণ আদায় করে দেয়, তবে বন্ধকগ্রহীতা ব্যক্তির প্রদত্ত ঋণ বাতিল হয়ে যাবে। যেমন রক্তপণ প্রদানের ক্ষেত্রে আমরা

আলোচনা করেছি। যদি বন্ধকদাতা ব্যক্তি তা আদায় না করে এবং ঋণ পরিশোধের জন্য গোলামকে বিক্রি করে দেওয়া হয়, তবে গোলামের পাওনাদার ব্যক্তি (প্রথমে) তার পাওনা বুঝে নেবে। কেননা গোলামের ঋণ বন্ধক গ্রহীতা এবং ওসীয়ে জিনায়াতের হকের তুলনায় অধিক অগ্রগণ্য। কারণ গোলামের ঋণ মুনীবের হকের থেকেও অগ্রগণ্য। ঋণ পরিশোধের পর যদি কিছু অংশ অবশিষ্ট থেকে যায় এবং গোলামের পাওনাদার ব্যক্তির ঋণ বন্ধকগ্রহীতা ব্যক্তির ঋণের সমপরিমাণ হয়, অথবা বেশী হয়, তাহলে অতিরিক্ত অংশ বন্ধকদাতা ব্যক্তির পাওনা হিসাবে থেকে যাবে। আর বন্ধক গ্রহীতা ব্যক্তির প্রদত্ত ঋণ বাতিল হয়ে যাবে। কেননা গোলাম বন্ধকগ্রহীতা ব্যক্তির দায়-দায়িত্বে থাকা অবস্থায় অপর ব্যক্তি তার হকদার সাব্যাস্ত হয়েছে। এ হিসাবে এটিও ধ্বংস হওয়ার অনুরূপই হলো।

আর যদি গোলামের ঋণ তুলনামূলক কম হয়, তবে গোলামের ঋণের সমপরিমাণ অংশ বন্ধকগ্রহীতা ব্যক্তির ঋণ থেকে রহিত হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে গোলামের ঋণ থেকে যা অবশিষ্ট থাকবে, তা পূর্বের ন্যায় বন্ধক হিসাবে বাকী থাকবে। এরপর যখন বন্ধকগ্রহীতার ঋণ উসুলের সময় আসবে তখন সে তার পাওনার পরিবর্তে এটি নিয়ে নিবে। কেননা এটিও তার হকের অনুরূপ জাতীয় জিনিসই। আর যদি ঋণ উসুলের সময় না আসে, তবে সময় আসা পর্যন্ত একে নিজের কাছে আটকে রাখবে।

যদি গোলামের মূল্যের দ্বারা পাওনাদার ব্যক্তির পাওনা পরিশোধ না হয়, তবে পাওনাদার ব্যক্তি গোলামের মূল্য উসুল করে নেবে। কিন্তু অবশিষ্ট পাওনা (বন্ধকদাতা গ্রহীতা) কারো থেকেই উসুল করতে পারবে না। অবশ্য গোলামকে যদি আযাদ করে দেওয়া হয়, তবে এর হুকুম ভিন্নতর হবে। অর্থাৎ তখন সে গোলামের নিকট থেকে বাকী পাওনা উসুল করে নিতে পারবে। কেননা, কোন কিছু ধ্বংস করার কারণে যে ঋণ কারো উপর বর্তায়, এর হক গোলামের মূল সত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে থাকে এবং সে তা উসুলও করে নিয়েছে (বিক্রি করার মাধ্যমে)। কাজেই তার হক আযাদ হওয়ার পরবর্তী অবস্থার সাথে সম্পর্কিত হবে। আযাদ হওয়ার পর সে যখন ঐ (বাকী) ঋণ পরিশোধ করে দেবে তখন পাওনাদার ব্যক্তি আর এ ব্যাপারে কারো নিকট চাইতে পারবে না। কেননা গোলামের কৃত কর্মের কারণেই এ ঋণ গোলামের উপর ওয়াজিব হয়েছিল।

গোলামের মূল্য দুই হাজার, তাকে বন্ধক রাখা হয়েছে একহাজার টাকার বিনিময়ে। এ অবস্থায় এই গোলাম যদি কারো উপর অপরাধ করে, তবে বন্ধকদাতা ও বন্ধকগ্রহীতা উভয়কে বলা হবে তোমরা উভয়ে মিলে এর বিনিময় পরিশোধ করে দাও। কেননা এর অর্ধেক তো (দায়বদ্ধ) আর বাকী অর্ধেক হচ্ছে আমানত। দায়বদ্ধ থাকা অবস্থায় ফিদয়া ওয়াজিব হয় বন্ধকগ্রহীতার উপর। আর আমানতের অবস্থায় ফিদয়া বর্তায় বন্ধকদাতার উপর। যদি তারা উভয়ে একমত হয় উক্ত অপরাধকারী গোলামকে হস্তান্তর করে দেওয়ার ব্যাপারে, তবে তাকে হস্তান্তর করে দেবে। এ অবস্থায় বন্ধকগ্রহীতার পাওনা রহিত ও বাতিল হয়ে যাবে। প্রকৃতপক্ষে বন্ধকগ্রহীতার পক্ষ হতে

গোলাম হস্তান্তর করা তো সম্ভব নয়। তারপক্ষ থেকে হয় শুধুমাত্র সম্মতি। এর কারণ আমরা পূর্বেই বর্ণনা করেছি।

যদি বন্ধকদাতা ও বন্ধকগ্রহীতার মধ্যে মতভেদ হয় তবে যে বলবে ঃ আমি ফিদয়া দেব" তার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। চাই সে বন্ধকদাতা হোক বা বন্ধক গ্রহীতা হোক। কেননা বন্ধকগ্রহীতা যদি ফিদয়া দিতে চায়, তবে তার কথা এ জন্য গ্রহণযোগ্য হবে যে, তার ফিদয়া দেওয়ার কারণে বন্ধকদাতার হক বাতিল হয় না। পক্ষান্তরে বন্ধকদাতা যদি গোলাম হস্তান্তর করাকে পছন্দ করে তবে এতে বন্ধক গ্রহীতার হককে বাতিল করা অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। বন্ধকী দাসীর সন্তানের অপরাধের ক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম প্রযোজ্য হবে. যদি বন্ধকগ্রহীতা ব্যক্তি বলে ঃ "আমিই তার ফিদয়া প্রদান করবো"। অর্থাৎ সে দিতে চাইলে দিতে পারবে, যদিও দাসীর সন্তানের মালিক সন্তান হস্তান্তরের বিষয়টিকে পছন্দ করে। কেননা বাচ্চাটি যদিও দায়বদ্ধ নয়. তথাপিও তা ঋণের পরিবর্তে আটক আছে। আর বন্ধকগ্রহীতা ব্যক্তি যদি ফিদয়া প্রদান করে, তবে এতে তার উদ্দেশ্য সঠিক রয়েছে। সর্বোপরি এতে বন্ধকদাতার কোন ক্ষতি নেই। কাজেই সে চাইলে অপরাধী গোলামের পক্ষ থেকে ফিদয়া প্রদান করতে পারবে। পক্ষান্তরে বন্ধকদাতা ব্যক্তি যদি ফিদয়া দিতে চায় এবং বন্ধক গ্রহীতা সন্তান হস্তান্তর করতে চায়, তবে বন্ধকগ্রহীতা ব্যক্তি তা করতে পারবে না। কেননা বন্ধকগ্রহীতা ব্যক্তির সন্তান হস্তান্তরের ইখতিয়ার নেই। কেমন করে সে তা পছন্দ করবে। এর কারণ আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। উল্লেখ্য যে, বন্ধকগ্রহীতা ব্যক্তি যদি ফিদয়া প্রদান করে, তবে সে তার আমানতী অংশের ব্যাপারে একটি নফল কাজ করলো। কাজেই সে তার প্রদত্ত ফিদয়া বন্ধকদাতার নিকট থেকে আদায় করে নিতে পারবে না। কেননা এটি না করারও তার সুযোগ ছিল। এটি করা তার জন্য অপরিহার্য হলে সে এ ব্যাপারে বন্ধকদাতার প্রতি রুজু করতে পারতো। যা হোক, সে যেহেতু এ কাজকে নিজের উপর অপরিহার্য করে নিয়েছে, আর অবস্থাতো পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে, তাই এ ব্যাপারে সে (নফল কর্ম সম্পাদনকারী) বলে গণ্য হবে। এটি ইমাম আবু হানীফা (র) এর একটি বর্ণনাও বটে। তাঁর বর্ণনামতে নফল কাজ সম্পাদনকারী বন্ধকদাতার বিদ্যমান থাকা অবস্থায় নিজের পাওনা আদায় করে নিতে পারবে না। অচিরেই উভয় মতামত আমরা সবিস্তারে বর্ণনা করবো ইনশাআল্লাহ। যদি বন্ধকগ্রহীতা ব্যক্তি ফিদয়া দিতে অস্বীকার করে এবং বন্ধকদাতা ব্যক্তি সে ফিদয়া পরিশোধ করে, তবে প্রদত্ত অর্ধেক ফিদয়া বন্ধকগ্রহীতা ব্যক্তির উপর বর্তাবে। (আর বাকী অর্ধেক বন্ধকদাতার উপর বর্তাবে।) কেননা ঋণ রহিত হওয়া একটি অনিবার্য বিষয়। চাই বন্ধকদাতা ব্যক্তি ফিদয়া প্রদান করুক বা গোলামকে পাওনাদার ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করে দিক। সুতরাং বন্ধকদাতা ব্যক্তিকে ফিদয়া প্রদানের ক্ষেত্রে (নফল কর্ম সম্পাদনকারী হিসাবে) গণ্য করা যাবে না। এরপর লক্ষ্য করতে হবে. যদি ফিদয়ার অর্ধেক ঋণের সমান হয় অথবা বেশী হয়, তবে ঋণ বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি কম হয়, তবে ফিদয়ার অর্ধেক পরিমাণ ঋণ থেকে রহিত হয়ে যাবে। আর অবশিষ্ট পাওনার পরিবর্তে গোলামটি বন্ধক হিসাবে থেকে যাবে। কেননা

ফিদয়ার অর্ধেক তার উপর অপরিহার্য হয়েছিল। যেহেতু বন্ধকদাতা নফল কাজ সম্পাদনকারী না হওয়া সত্ত্বেও তা আদায় করে দিয়েছে, কাজেই সে তা আদায় করে নিতে পারবে এবং এটি তার ঋণের বিনিময় হয়ে যাবে। যেন সে তার ঋণের অর্ধেক পরিশোধ করে দিয়েছে। কাজেই বাকী ঋণের মুকাবিলায় গোলামটি বন্ধক হিসাবেই থেকে যাবে। যদি বন্ধকগ্রহীতা ব্যক্তি ফিদয়া পরিশোধ করে এবং বন্ধকদাতা ব্যক্তিও উপস্থিত থাকে, তবে এ ক্ষেত্রে বন্ধকগ্রহীতা ব্যক্তি নফলকর্ম সম্পাদনকারী বলে গণ্য হবে। আর যদি বন্ধকদাতা ব্যক্তি অনুপস্থিত থাকে, তবে তাকে নফল কর্ম সম্পাদনকারী হিসাবে গণ্য করা যাবে না। এটি ইমাম আবু হানীফা (র) এর অভিমত; পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ, ইমাম হাসান ও ইমাম যুফার (র) এর মতে উভয় অবস্থাতেই বন্ধকগ্রহীতা ব্যক্তি নফল সম্পাদনকারী বলে গণ্য হবে। কেননা, সে অন্যের মালিকানাধীন বস্তুর ফিদয়া আদায় করেছে তার অনুমতি ছাড়া। কাজেই সে তৃতীয় ব্যক্তির ন্যায় হয়ে গেছে।

ইমাম আবু হানীফা (র) এর দলীল হলোঃ যে অবস্থায় বন্ধকদাতা ব্যক্তি উপস্থিত আছে, সে অবস্থায় তাকে সম্বোধন করা সম্ভব। অতএব যখন বন্ধকগ্রহীতা ব্যক্তি তার ফিদয়া আদায় করলো, তখন সে তৃতীয় ব্যক্তির ন্যায় নফল কার্য সম্পাদনকারী হয়ে গেল, আর বন্ধকদাতা ব্যক্তি যখন অনুপস্থিত, তখন তাকে সম্বোধন করা অসম্ভব। অথচ বন্ধকগ্রহীতা ব্যক্তি যে জিনিসের জামানত পরিশোধ করবে, এর ইসলাহ বা সংশোধন করা তার জন্য অপরিহার্য। জামানতী বস্তু ইসলাহ না করে তার পক্ষে এটি সম্ভব নয়। কাজেই সে নফল কর্মসম্পাদনকারী হবে না।

ইমাম কুদূরী (র) বলেনঃ যদি বন্ধকদাতা ব্যক্তি মারা যায়, তবে অসী (বা অসিয়ত বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তি বন্ধকী মাল বিক্রি করে ঋণ পরিশোধ করবে। কেননা, অসীই বন্ধকদাতা ব্যক্তির স্থলাভিষিক্ত। বন্ধকদাতা ব্যক্তির জীবদ্দশায় সে নিজেই যদি এর মুতাওয়াল্লী হতো, তবে বন্ধকগ্রহীতার অনুমতি সাপেক্ষে সে এ বন্ধকী বস্তুটি বিক্রি করতে পারতো। কাজেই তার স্থলাভিষিক্ত অসীর ক্ষেত্রেও অনুরূপ বিধান প্রযোজ্য হবে।

যদি বন্ধকদাতা ব্যক্তির নিয়োগকৃত কোন অসী না থাকে, তবে বিচারক তার জন্য কোন একজনকে অসী নিয়োগ করবেন এবং তাকে হুকুম করবেন, যেন সে এটি বিক্রি করে (ঋণ পরিশোধ করে) দেয়। কেননা, বিচারক নিয়োগ করা হয় সর্বস্তরের মুসলমানদের হকসমূহের দেখাশুনা করার জন্য, যখন তারা নিজেরা তা দেখাশুনা করতে অক্ষম হয়। আর অসী নিয়োগ করা তার পক্ষ হতে বিশেষ অনুগ্রহ, যাতে সে বন্ধকদাতার উপর অন্যের যা পাওনা আছে, তা পরিশোধ করে দেয় এবং অন্যের কাছে তার যা পাওনা আছে, তা উসুল করে নেয়।

যদি মৃত ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত হয় এবং অসী তার রেখে যাওয়া সম্পদের কিয়দংশ কোন এক পাওনাদের নিকট বন্ধক রাখে, তবে তা জাইয হবে না। এ অবস্থায় অন্যান্য পাওনাদারদের জন্য অধিকার থাকবে তা ফেরৎ নিয়ে আসা। কেননা,

হুকমী (বাস্তবে নয়) ভাবে ঋণ পরিশোধ করে সে কোন এক পাওনাদারকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। এরূপ করাটা বাস্তবভাবে ঋণ পরিশোধ করে কোন একজনকে অগ্রাধিকার দেওয়ার অনুরূপ হয়ে গেল। (অথচ এমনটি করা তার জন্য জাইয নয়।) **বন্ধকী বস্তুটি ফেরৎ আনার আগে অসী যদি সকল পাওনাদারের পাওনা পরিশোধ করে দেয়, তবে বন্ধক জাইয হবে।** কেননা, পাওনাদারদের হক তাদের নিকট পৌঁছার ক্ষেত্রে যেটি প্রতিবন্ধক ছিল, তা অপসারিত হয়ে গেছে। **পক্ষান্তরে যদি মৃত ব্যক্তির অপর কোন পাওনাদার না থাকে, (কেবলমাত্র একজনই পাওনাদার থাকে) তার বন্ধক রাখা জাইয হবে।** যেমন বাস্তবভাবে পাওনাদার ব্যক্তির পূর্ণ পাওনা পরিশোধ করা জাইয। এরপর পাওনাদার ব্যক্তির পাওনা পরিশোধ করার লক্ষ্যে বন্ধকী বস্তুটি বিক্রি করে দেওয়া হবে। কেননা পরিত্যাজ্য সম্পদ ঋণ পরিশোধের জন্য বন্ধক রাখার আগেও বিক্রি করা জাইয; অনুরূপভাবে তা পরেও বিক্রি করা জাইয হবে।

মৃত ব্যক্তির কারো নিকট কিছু টাকা পাওনা ছিল, সে পাওনার বিনিময়ে অসী যদি তার থেকে কোন মালামাল বন্ধক গ্রহণ করে, তবে তা জাইয হবে। কেননা এটি মূলত: পাওনা উসুল করার মধ্যে শামিল। আর এ জাতীয় কাজের ইখ্‌তিয়ার অসীর রয়েছে। হিদায়া গ্রন্থকার শায়খ বুরহানউদ্দীন (র) বলেনঃ অসী কর্তৃক বন্ধক রাখার ব্যাপারে বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে 'অসিয়ত অধ্যায়ে'। এগুলো সম্বন্ধে সেখানে সবিস্তার আলোকপাত করবো ইনশাআল্লাহ।

পরিচ্ছেদ ঃ বিবিধ মাসাইল

কেউ যদি দশ টাকার বিনিময়ে দশ টাকা দামের আঙ্গুরের রস বন্ধক রাখে, এরপর তা মদ হয়ে যায়, তারপর তা আবার সিরকা হয়ে যায় এবং সিরকার মূল্যও দশ টাকা হয়, তবে এটি দশ টাকার বিনিময়ে বন্ধক হিসাবে গণ্য হবে। কেননা, যে জিনিস বিক্রয়ের ক্ষেত্র, অর্থাৎ বিক্রি করা জাইয, তা বন্ধক রাখাও জাইয। কারণ উভয় বিষয়েই ক্ষেত্র সাব্যাস্ত হয় আর্থিক দিকের বিবেচনায়। আর মদ যদিও প্রথমত: বিক্রয়ের ক্ষেত্র নয়, কিন্তু শেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে তা বিক্রয়ের ক্ষেত্র হতে পারে। এ কারণেই কেউ যদি আঙ্গুরের রস খরীদ করার পর হস্তগত করার আগেই তা মদে পরিণত হয়ে যায়, তবে মূল চুক্তি (এ অবস্থায়ও) বাকী থাকবে। কিন্তু এ বিক্রয়ের ব্যাপারে ক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে। (সে ইচ্ছা করলে তা গ্রহণ করতে পারবে, আবার ইচ্ছা করলে তা ভঙ্গ করে দিতে পারবে।) কেননা বিক্রীত পণ্যের অবস্থার মধ্যে পরিবর্তন সাধিত হওয়ার বিষয়টি বিক্রীত পণ্য ক্রটিযুক্ত হয়ে যাওয়ার মতই। **কেউ দশ টাকার বিনিময়ে দশটাকা দামের একটি বকরী বন্ধক রাখার পর যদি তা মারা যায়, এরপর তার চামড়া দাবাগাত করা হয়, যদি এ দাবাগাতকৃত চামড়ার মূল্য এক টাকার সম পরিমাণ হয়, তবে এটি এক টাকার বিনিময়ে বন্ধক হিসাবে গণ্য হবে।** কেননা বন্ধক বস্তু মারা যাওয়াতে বন্ধক চুক্তি স্থির হয়ে গেছে। এখন বন্ধকী মালের যেহেতু কিছু অংশ জীবিত (বাকী) আছে, তাই এই পরিমাণের উপর বন্ধকের

হুকুম কার্যকরী হবে। কিন্তু বিক্রীত বকরী হস্তগত করার আগেই তা যদি মারা যায়, এরপর এর চামড়া দাবাগত করা হয়, তবে এ বিক্রয় আর কার্যকর হবে না। কেননা হস্তগত করার পূর্বে বিক্রীত বকরী মারা যাওয়াতে বিক্রি বাতিল হয়ে গেছে। আর বাতিল জিনিস ফেরত আসেনা। বন্ধকের বিষয়টি হচ্ছে ভিন্নতর। কেননা বন্ধকী মাল ধ্বংস হয়ে গেলে বন্ধক আরো স্থির হয়ে যায়। যেমন আমরা পূর্বেও বর্ণনা করেছি। আমাদের কোন কোন ফকীহ্ ক্রয় বিক্রয়ের ব্যাপারে পূর্বোক্ত বিধানকে অস্বীকার করে বলেন ঃ এ ক্ষেত্রেও ক্রয় বিক্রয়ের বিধান ফিরে আসবে অর্থাৎ কার্যকর হবে। **ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ বন্ধকী মাল যদি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তবে বন্ধকদাতা ব্যক্তিই এর মালিক হিসেবে গণ্য হবে।** বস্তুত এটি বন্ধকী দাসীর সন্তান, বন্ধকী বাগানের ফল, বন্ধকী গাভীর দুধ এবং বন্ধকী পশুর পশমের অনুরূপই একটি বিষয়। কেননা এটি তার (বন্ধকদাতার) মালিকানাধীন বস্তু হতেই সৃষ্টি হয়েছে। কাজেই তা মূলবস্তুর সাথে বন্ধক হিসাবে গণ্য হবে। কারণ এটি তো মূলবস্তুর সাথেই সংশ্লিষ্ট। সর্বোপরি বন্ধক চুক্তি হচ্ছে একটি অপরিহার্য হক। সুতরাং তা বর্ধিত বস্তুতে সংক্রমিত হবে। **যদি এ বর্ধিত অংশ বিনষ্ট হয়ে যায় তবে তা কোনরূপ ক্ষতিপূরণ ছাড়াই ধ্বংস হয়েছে বলে গণ্য হবে।** কেননা সংশ্লিষ্ট জিনিসের কোন অংশ নেই, ঐ ঋণের মধ্যে যা মূল বস্তুর মুকাবিলায় ধর্তব্য হয়ে থকে। কারণ এসব জিনিস আকদের মধ্যে মূল প্রতিপাদ্য বস্তু হিসাবে দাখিল নয়। কেননা শব্দ এসব কে শামিল করে না।

যদি মূলবস্তু ধ্বংস হয়ে যায় এবং বর্ধিত অংশ বাকী থাকে তবে বন্ধকদাতা ব্যক্তি এটিকে এর সমপরিমাণ বস্তুর বিনিময়ে ছাড়িয়ে নেবে। অর্থাৎ বন্ধক গ্রহণের দিন বন্ধকী বস্তুর যে মূল্য ছিল এবং ছাড়িয়ে নেওয়ার দিন বর্ধিত অংশের যে মূল্য হবে এর উপর ঋণের ভাগ করা হবে। (এবং সে হিসাবেই বর্ধিত অংশকে ছাড়িয়ে আনা হবে) কেননা হস্তান্তর করার কারণেই বন্ধকী বস্তু দায়বদ্ধ হয়ে থাকে, অর্থাৎ এর ক্ষতিপূরণ আদায় করা ওয়াজিব হয়ে থাকে। আর বর্ধিত অংশ যদি ছাড়িয়ে নেওয়ার দিন পর্যন্ত বাকী থাকে, তবে ছাড়িয়ে নেওয়ার কারণে তাও মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ে পরিণত হয়ে যায়। উল্লেখ্য যে, তাতে তথা সংশ্লিষ্ট বস্তুও যখন মূলপ্রতিপাদ্য বিষয়ে পরিণত, তখন এর মুকাবিলায়ও অন্য কিছু অপরিহার্য হয়ে থাকে। যেমন বিক্রীত পণ্যের বাচ্চা। সুতরাং ঋণের যে পরিমান অংশ মূল বন্ধকের সমান হবে তা রহিত হয়ে যাবে। কেননা এর মুকাবিলায় মূল বন্ধকী বস্তু রয়েছে এবং এটি মূল প্রতিপাদ্যও বটে। আর যে পরিমাণ ঋণ বর্ধিত অংশের মুকাবিলায় আসবে, তা পরিশোধ করে বন্ধকদাতা ব্যক্তি এটিকে ছাড়িয়ে নেবে। এর যুক্তি আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। উপরোক্ত মূলনীতির ভিত্তিতে বহু মাসআলা উদ্ভাবিত হয়। এর কিছু মাসআলা আমি কিফায়তুল মুনতাহী গ্রন্থে উল্লেখ করেছি। অবশ্য এসবের পূর্ণ আলোচনা জামে কবীর এবং 'যিয়াদাত' গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে।

কেউ দশ দিরহামের বিনিময়ে দশ দিরহাম মূল্যের একটি বকরী বন্ধক রাখলো। তারপর বন্ধকদাতা বন্ধকগ্রহীতাকে বললোঃ তুমি এটিকে দোহন কর। দোহন

করার পর যা হবে, তা তোমার জন্য হালাল। এরপর সে বন্ধকগ্রহীতা ব্যক্তি তা দোহন করে পান করলো। তবে এ সবের কারণে তার উপর কোন ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না। উল্লেখ্য যে, মুবাহ কাজকে শর্তের সাথে সংযুক্ত করা জাইয আছে। কেননা, মুবাহ হওয়ার অর্থ হলোঃ শর্তহীন থাকা। মূলতঃ এটি মালিক বানানো নয়। কাজেই একে শর্তের সাথে যুক্ত করা সহীহ হবে। এ অবস্থায় ঋণের কিছুই রহিত হবে না। কেননা সে মালিকের অনুমতি ক্রমেই এটিকে বিনষ্ট করেছে।

বন্ধকদাতা ব্যক্তি বকরীটি ছাড়িয়ে নেয়নি, এমতাবস্থায় তা যদি বন্ধকগ্রহীতার হাতে মারা যায়, তবে দুধ এবং বকরীর মূল্যের উপর ঋণকে বণ্টন করা হবে। বকরীর মূল্য পরিমাণ ঋণ রহিত হয়ে যাবে। আর দুধের মূল্য পরিমাণ ঋণ বন্ধকগ্রহীতা ব্যক্তি বন্ধকদাতার নিকট হতে উসুল করে নেবে। কেননা, বন্ধকদাতার মালিকানাধীন দুধ বন্ধক গ্রহীতার কর্মের কারণে ধ্বংস (নষ্ট) হয়ে গেছে। আর বন্ধকদাতার পক্ষ হতে সুযোগ করে দেওয়ার কারণেই বন্ধকগ্রহীতা ব্যক্তির পক্ষে এরূপ করা সম্ভব হয়েছে। তাহলে বিষয়টি এমন হলো যে, বন্ধকদাতা ব্যক্তি বস্তুটি গ্রহণ করে নিজেই তা আবার ধ্বংস করে দিল। কাজেই ক্ষতিপূরণ বন্ধকদাতার উপর বর্তাবে। কাজেই বন্ধকগ্রহীতা ব্যক্তি তার পাওনা থেকে দুধের অংশ পরিমাণ পাবে এবং এ পরিমাণ পাওনা তার বাকী থাকবে। বন্ধকী বকরীর বাচ্চার ক্ষেত্রের অনুরূপ বিধান প্রযোজ্য হবে। যদি বন্ধকদাতা ব্যক্তির অনুমতিতে তা ভক্ষণ করা হয়। উক্ত কিয়াসের আলোকে সকল প্রকার বর্ধিত মালামালের ক্ষেত্রেও এ বিধান প্রযোজ্য হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেনঃ বন্ধকী মাল বর্ধিত করা জাইয। কিন্তু ঋণ বর্ধিত করা জাইয নয়, ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র) এর মতে। বন্ধকী বস্তু বর্ধিত পরিমাণের মুকাবিলায় বন্ধক হিসাবে গণ্য হবে না। ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেনঃ ঋণের পরিমাণ বর্ধিত করাও জাইয আছে। ইমাম যুফার এবং ইমাম শাফিঈ (র) বলেনঃ বন্ধকী মাল এবং ঋণ কোনটাই বাড়ানো জাইয নেই। বন্ধকী মূল্য, বিক্রীত পণ্য মহর এবং বিবাহিত স্ত্রী ইত্যাদির ক্ষেত্রে আমাদের সাথে তাদের যুগপৎভাবে মতভেদ বিদ্যমান রয়েছে।[১]

বেচা-কেনা অধ্যায়ে আমরা এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। দ্বিতীয় যে মাসআলাটিতে ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর মতভেদ রয়েছে, সে ক্ষেত্রে তার যুক্তি

১. আমাদের মতে বন্ধকী মাল বাড়িয়ে দেওয়া জাইয। তাদের মতে জাইয নয়। ক্রয়ের ক্ষেত্রে মূল্য বাড়িয়ে দেওয়া আমাদের মতে জাইয। কিন্তু তাদের মতে জাইয নয়। বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিক্রীত পণ্য বাড়িয়ে দেওয়া আমাদের মতে জাইয; কিন্তু তাদের মতে জাইয নয়। আমাদের মাযহাবে বিবাহের মহর বর্ধিত করে দেওয়া জাইয; তাদের নিকট জাইয নয়। আমাদের মাযহাবে বিবাহের মধ্যে বিবাহিত স্ত্রীর সংখ্যা বাড়িয়ে দেওয়া জাইয; কিন্তু তাদের নিকট জাইয নয়। অর্থাৎ মুনীব যদি তার কোন দাসীকে এক হাজার টাকা মহরের বিনিময়ে কারো নিকট বিবাহ দেয়, তারপর আবার এক দাসীকে তার নিকট এই টাকার বিনিময়েই বিবাহ প্রদান করে এবং স্বামীও তা কবুল করে নেয়, তাহলে তা জাইয হবে। এ অবস্থায় উক্ত এক হাজার টাকা মহর তাদের উভয়ের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া হবে। গ্রন্থকার (র) বলেন ঃ বেচা-কেনা অধ্যায়ে আমরা এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

হলোঃ বন্ধকের ক্ষেত্রে ঋণের বিষয়টি হলো ক্রয় বিক্রয়ের মূল্যের মত আর বন্ধকী বস্তুটি হলো বিক্রীত পণ্যের মত। কাজেই বেচা-কেনার ন্যায় ঋণ এবং বন্ধকী বস্তু উভয়টিতেই বর্ধিত করা জাইয হবে। এ দুটি বিষয়ে একই হুকুম হওয়ার কারণ হলো ঃ বর্ধিত অংশকে মূল চুক্তির সাথে সংযোজন করে দেওয়া প্রয়োজনের কারণে এর সম্ভাবনা থাকার প্রেক্ষিতে।

আর ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র) এর দলীল হলো একটি কিয়াস। আর সে কিয়াস হলোঃ যদি ঋণের পরিমাণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়, তবে যে বস্তু বিভাজনকৃত নয়, তা বন্ধকী মাল হওয়া অনিবার্য হয়ে পড়ে। অথচ আমাদের মাযহাবে তা বন্ধকী বস্তু হতে পারে না। পক্ষান্তরে যদি বন্ধকী মাল বর্ধিত করে দেওয়া হয়, তবে এতে যে বস্তু বিভাজনকৃত নয়, ঋণের তা হয়ে যাওয়া অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। আর এটি বন্ধক সহীহ হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক নয়। লক্ষণীয় যে, যদি পাঁচশত টাকা ঋণের বিনিময়ে কোন গোলাম বন্ধক রাখা হয়, তবে তা জাইয হবে। যদি ঋণের পরিমাণ হাজার টাকা হয়, তবুও বন্ধক জাইয হবে। বস্তুত এটি হলো ঃ ঋণের (বিভাজনকৃত নয় এমন বস্তু) হয়ে যাওয়া।

আর ঋণের ক্ষেত্রে বর্ধিত অংশকে মূল চুক্তির সাথে সংযুক্ত করা সম্ভব নয়। কেননা, এটি যার উপর চুক্তি হয়, এরূপ নয় এবং যার মুকাবিলায় চুক্তি হয়, এরূপও নয়। বরং ঋণ অবশ্যম্ভাবী হয়েছে বন্ধকেরও আগে। এমনিভাবে তা ভঙ্গ হয়ে যাওয়ার পরও ঋণের বিষয়টি বাকী থাকবে। আর মূল চুক্তির সাথে সংযুক্তি চুক্তির দুই বিনিময়, তথা যার উপর চুক্তি হয় এবং যার মুকাবিলায় চুক্তি হয়, এর ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে ক্রয়-বিক্রয়ের বিষয়টি এর থেকে ব্যতিক্রম। কেননা ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মূল্য এমন একটি বিনিময়, যা চুক্তির কারণে ওয়াজিব হয়ে থাকে।

বন্ধকী মালের মধ্যে অতিরিক্ত সংযোজন জাইয আছে এবং এ অতিরিক্ত পরিমাণকে 'স্বেচ্ছাকৃত বর্ধিত অংশ' বলা হয়। আর বন্ধকী মাল গ্রহণের দিন এর যে মূল্য ছিল, সে মূল্যের উপর ঋণকে বণ্টন করা হবে। যদি গ্রহণের দিন অতিরিক্ত পরিমাণের মূল্য পাঁচশত টাকা এবং মূলবস্তুর মূল্য এক হাজার টাকা হয়, আর ঋণ হয় সর্ব সাকুল্যে এক হাজার টাকা, তবে ঋণকে তিন ভাগে ভাগ করা হবে। অতিরিক্ত অংশের ক্ষেত্রে এক তৃতীয়াংশ এবং মূল অংশের ক্ষেত্রে দুই তৃতীয়াংশ। আর এই হুকুম দেওয়া হয়েছে বন্ধকী বস্তু গ্রহণের সময় এগুলোর যে মূল্য ছিল সে হিসাবে। কেননা উভয় অংশের ক্ষেত্রেই ক্ষতিপূরণ সাব্যস্ত হয় হস্তগত করার দ্বারা। কাজেই হস্তগত করার সময় এতদুভয় পরিমাণের যে মূল্য ছিল, সে মূল্যই ধর্তব্য।

আর বন্ধকী দাসী কোন বাচ্চা প্রসব করার পর বন্ধকদাতা ব্যক্তি যদি এর সাথে আরো একটি গোলাম যুক্ত করে দেয়, আর তাদের প্রত্যেকের মূল্য এক হাজার টাকা করে হয়, তবে গোলামও বাচ্চার সাথে বন্ধক হিসাবে গণ্য হবে। বাচ্চার মুকাবিলায় যে ঋণ আছে তা বাচ্চার উপর, আর অতিরিক্ত অংশ গোলামের উপর বণ্টন করে দেওয়া

হবে। কেননা বন্ধকদাতা ব্যক্তি গোলামকে বাচ্চার সাথে যোগ করেছে। মায়ের সাথে নয়। পক্ষান্তরে পরে যা বর্ধিত করা হয়েছে, তা যদি মায়ের সাথে যোগ করা হয়, তবে ঋণকে তাদের উপর বন্টন করা হবে। অর্থাৎ বন্ধক চুক্তির দিন মায়ের যা মূল্য ছিল এর উপর এবং হস্তগত করার দিন অতিরিক্ত ও বর্ধিত অংশের (গোলামের) যা মূল্য ছিল, এর উপর ঋণের বিষয়টিকে বণ্টন করা হবে। তার মায়ের অংশে যা আসবে, সেটিকে মা এবং তার সন্তানের উপর বণ্টন করা হবে। কেননা অতিরিক্ত অংশটি মায়ের অংশের সাথে যুক্ত হয়েছে।

ইমাম মুহম্মদ (র) 'জামে সগীর' গ্রন্থে বলেনঃ কেউ এক হাজার টাকার বিনিময়ে এক হাজার টাকা দামের একটি গোলাম বন্ধক রাখলো। তারপর বন্ধকদাতা ব্যক্তি বন্ধক গ্রহীতার নিকট প্রথম গোলামের স্থলে এক হাজার টাকা মূল্যের আরেকটি গোলাম হস্তান্তর করলো। এ অবস্থায় প্রথম গোলামটিই বন্ধকী বস্তু হিসাবে গণ্য হবে। যতক্ষণ না বন্ধকগ্রহীতা ব্যক্তি তাকে বন্ধকদাতার নিকট ফেরত দিয়ে দিবে। এ পর্যায়ে বন্ধকগ্রহীতা ব্যক্তি দ্বিতীয় গোলামকে প্রথম গোলামের স্থলাভিষিক্ত না করা পর্যন্ত তার ক্ষেত্রে সে আমানতদার বলে গণ্য হবে। কেননা, প্রথম গোলামটি কবযা ও ঋণের কারণে বন্ধক গ্রহীতার দায়িত্বে শামিল হয়েছে। আর বর্তমানে উভয়টিই যথাবস্থায় বাকী আছে। কাজেই ঋণ বাকী অবস্থায় কবযাকে না ভেঙ্গে দেওয়া পর্যন্ত প্রথম গোলামটি তার জামানত তথা দায় দায়িত্ব থেকে বের হবে না। উল্লেখ্য যে, প্রথমটি বন্ধক গ্রহীতার যামানতে থাকা অবস্থায় দ্বিতীয়টি তার জামানতে কখনো শামিল হবে না। কেননা বন্ধকদাতা ও বন্ধকগ্রহীতা উভয়ে গোলাম দুটির কোন একটির জামানতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার উপর রাজি। কিন্তু উভয়টির শামিল হওয়ার উপর রাজি নয়। আর বন্ধক গ্রহীতা ব্যক্তি যখন প্রথমটিকে বন্ধকদাতার নিকট ফেরত দিয়ে দেবে, তখন দ্বিতীয়টি তার দায়িত্বে এসে যাবে।

কোন কোন ফকীহ বলেনঃ এ ক্ষেত্রে নতুন দখল শর্ত। কেননা, দ্বিতীয় গোলামের উপর বন্ধকগ্রহীতা ব্যক্তির যে দখল রয়েছে, তা হচ্ছে আমানত দখল, অথচ বন্ধকের দখল হচ্ছে নিজের পাওনা উসুল করার দখল এবং ক্ষতিপূরণ আদান-প্রদানের দখল। কাজেই আগের দখল যথেষ্ট হবে না। যেমন অপর কোন ব্যক্তির নিকট নিখুঁত দিরহাম পাওনা আছে। সে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির নিকট থেকে কিছু খুঁত বিশিষ্ট দিরহাম উসুল করে নিল। তার ধারণা ছিল এগুলো নিখুঁত। তারপর জানতে পারলো যে, এগুলো নিখুঁত নয়। অবশেষে বাধ্য হয়ে সে তার নিকট নিখুঁত দিরহাম চাইলো এবং তা নিয়ে নিল। এ অবস্থায় অচল খুঁতযুক্ত দিরহামগুলো ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির নিকট ফেরৎ না দেওয়া পর্যন্ত, এগুলো পাওনাদার ব্যক্তির নিকট আমানত স্বরূপ থাকবে। ফেরত দেওয়ার পর আবার পুনরায় নিখুঁত দিরহামগুলো নতুনভাবে দখল বুঝে নিতে হবে।

কিন্তু অপরাপর ফকীহগণ বলেন ঃ নতুনভাবে দখল করা শর্ত নয়। কেননা বন্ধকচুক্তি হচ্ছে হিবার ন্যায় একটি নফল কাজের চুক্তি। যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা

করেছি। আর আমানতী দখল হিবার দখলের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে। অধিকন্তু বন্ধকের মূলবস্তু হচ্ছে আমানতী বস্তু। আর মূলবস্তুই দখল করা হয়ে থাকে। সুতরাং মূলবস্তু দখলের ক্ষেত্রে আমানতী দখলই যথেষ্ট হবে।

বন্ধকগ্রহীতা ব্যক্তি বন্ধকদাতা ব্যক্তিকে ঋণ থেকে মুক্ত করে দিয়েছে অথবা সে তার পাওনা তাকে হিবা করে দিয়েছে। এ অবস্থায় যদি বন্ধকী মাল বন্ধকগ্রহীতার হাতে নষ্ট হয়ে যায়, তবে সূক্ষ্ম কিয়াসের দৃষ্টিতে কোনরূপ ক্ষতিপূরণ ছাড়াই এটি ধ্বংস হয়েছে বলে গণ্য হবে। কিন্তু ইমাম যুফার (র) এর থেকে ভিন্নমত পোষণ করেন। কেননা (আমাদের দলীল) বন্ধকী বস্তু ঋণের পরিবর্তে দায়বদ্ধ থাকে। অথবা সম্ভাব্য ঋণের পরিবর্তে দায়বদ্ধ থাকে; যেমন প্রতিশ্রুত ঋণের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে ঋণ মুক্ত করে দেওয়ার পর বা হিবা করে দেওয়ায় পর, ঋণ আর বাকী থাকে না। এমনিভাবে ঋণ রহিত হয়ে যাওয়া অবস্থায় সম্ভাব্য ঋণও বাকী থাকে না। কিন্তু বন্ধকগ্রহীতা ব্যক্তি যদি নতুনভাবে কোন কিছু করে অর্থাৎ ঋণকে অস্বীকার করে, তবে সে আত্মসাতকারী বলে গণ্য হবে। কেননা তার নিষেধ করার কোন কর্তৃত্ব নেই।

অনুরূপভাবে যদি মহরের বিনিময়ে কোন মহিলা বন্ধকগ্রহণ করে, এরপর সে (মহিলা) তার স্বামীকে মহর থেকে মুক্ত করে দেয়। অথবা সে তাকে এ টাকা হিবা করে দেয়, অথবা সহবাসের আগেই যদি ধর্মত্যাগ করে (মুরতাদ হয়ে যায় নাউযুবিল্লাহ) অথবা মহিলা যদি মহরের ব্যাপারে স্বামীর সাথে খুলা করে, তারপর বন্ধকী মাল তার হাতে থাকা অবস্থায় ধ্বংস হয়ে যায় তবে কোনরূপ ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হওয়া ব্যতিরেকেই তা ধ্বংস হয়েছে বলে গণ্য হবে। অর্থাৎ এ অবস্থায় কোন ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না। কেননা ঋণ রহিত হয়ে গেছে। যেমন ঋণমুক্ত করে দেওয়া অবস্থায় তা রহিত হয়ে যায়।

যদি বন্ধকদাতা কর্তৃক বা অন্য কোন (দাতা) কর্তৃক ঋণ পরিশোধের মাধ্যমে বন্ধকগ্রহীতা ব্যক্তি তার পাওনা উসুল করে নেয়, তারপর বন্ধকী মাল তার হাতে ধ্বংস হয়ে যায়, তবে ঋণের মুকাবিলায় তা ধ্বংস হবে। এ অবস্থায় বন্ধকগ্রহীতার উপর ওয়াজিব হবে উসুলকৃত ঋণ, যার থেকে উসুল করেছে তার নিকট ফেরত দেওয়া। চাই সে বন্ধকদাতা হোক বা অন্য কোন (দাতা ব্যক্তি) হোক। কিন্তু ঋণ মুক্ত করে দেওয়ার বিষয়টি এর থেকে ব্যতিক্রম। এতদুভয় বিষয়ের মধ্যে পার্থক্যের কারণ হলো ঃ ঋণ মুক্ত করে দেওয়ার কারণে ঋণ সর্বোতভাবে রহিত হয়ে যায়। যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। আর ঋণ উসুল করার কারণে তা রহিত হয় না। ঋণ ওয়াজিবকারী বিষয় বিদ্যমান থাকার কারণে। তবে পুনরায় ঋণ উসুল করতে যেহেতু কোন উপকার নেই, তাই এ অবস্থায় উসুল অসম্ভব। কেননা পুনরায় উসূল করা হলে বন্ধকদাতা আবার তার নিকট তার পাওনা দাবী করবে। এভাবে দাবী দাওয়া কেবল পরস্পরের মধ্যে চলতেই থাকবে। মোদ্দাকথা হচ্ছে, যেহেতু বন্ধক গ্রহীতার পাওনা উসুল করার অধিকার বাকী আছে, তাই বন্ধকী মাল ধ্বংস হওয়ার পর তার প্রথম অধিকার আগে মযবুত হয়ে

গেছে। কাজেই এ অবস্থায় তার দ্বিতীয়বার পাওনা তাগাদা করার অধিকার বাতিল হয়ে যাবে।

এমনিভাবে যদি বন্ধকগ্রহীতা ব্যক্তি তার কর্জের বিনিময়ে কোন বস্তু খরীদ করে নেয় অথবা এর পরিবর্তে কোন মূলবস্তুর উপর আপোষ করে নেয়, তবে এ ক্ষেত্রেও উক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে। কেননা এটিও পাওনা উসুল করার একটি উপায়। অনুরূপ ভাবে যদি বন্ধকদাতা ব্যক্তি বন্ধকগ্রহীতার ঋণ অন্য কারো উপর ন্যস্ত করে দেয়, তারপর বন্ধকী মাল ধ্বংস হয়, তবে ন্যস্ত করা বাতিল হয়ে যাবে এবং ঋণের বিনিময়ে তা ধ্বংস হয়েছে বলে গণ্য হবে। কেননা ন্যস্ত করাও এক প্রকার ঋণ মুক্ত করে দেওয়ার মতই। কারণ ন্যস্ত করার কারণে দায়-দায়িত্ব (বন্ধকদাতা) এর উপর থেকে যার উপর ন্যস্ত করা হয় তার দিকে স্থানান্তরিত হয়ে যায়। কেননা যার উপর কোন কাজের দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে, সে মূলত: উকীলেরই মত। এমনিভাবে যদি বন্ধকদাতা ও বন্ধকগ্রহীতা উভয়ে এ ব্যাপারে একমত হয় যে, তাদের পরস্পরের মধ্যে কোন ঋণ নেই, তারপর বন্ধকী মাল ধ্বংস হয়ে যায়, তবে ঋণের পরিবর্তে তা ধ্বংস হয়েছে বলে গণ্য হবে। কেননা ঋণের উপর তাদের একমত হওয়ার সম্ভাবনার ভিত্তিতে এখানে ঋণ ওয়াজিব হওয়ার সম্ভাবনাও বাকী রয়েছে। তাই ঋণের বিষয়টি বাকী রয়েছে বলে ধরে নেওয়া যায়। কিন্তু ঋণ মুক্ত করে দেওয়ার মাসআলাটি এ মাসআলা থেকে ব্যতিক্রম। আল্লাহই এ সম্বন্ধে সর্বাধিক জ্ঞাত।

كِتَابُ الْجِنَايَاتِ
অধ্যায় ঃ জিনায়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْجِنَايَاتِ

অধ্যায় ঃ জিনায়াত[১]

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ কতল বা হত্যা পাঁচ প্রকার: প্রথমত: ইচ্ছাকৃত হত্যা, দ্বিতীত: প্রায় ইচ্ছাকৃত হত্যা, তৃতীয়তঃ ভুলক্রমে হত্যা, চতুর্থত: ভুলক্রমে হত্যার শ্রেণীভুক্ত হত্যা, পঞ্চমত: কারণজনিত হত্যা।

এখানে শুধু ঐ সকল 'হত্যা' আলোচনা করা উদ্দেশ্য যেগুলোর সঙ্গে (কিসাস, দিয়াত, কাফ্ফারা, মীরাস থেকে বঞ্চিত হওয়া ইত্যাদি) বিভিন্ন বিধান সম্পৃক্ত হয়।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ ইচ্ছাকৃত হত্যা অর্থ, (লোহার তৈরী) অস্ত্র দ্বারা কিংবা অস্ত্রের পর্যায়ভুক্ত কিছু দ্বারা আঘাত করা, ('অস্ত্রের পর্যায়ভুক্ত' দ্বারা উদ্দেশ্য হল) ধারালো বা চোখা কাঠ এবং বাঁশের ধারালো কঞ্চি, ধারালো পাথর এবং আগুন (অর্থাৎ যা কিছু জখম ও রক্তক্ষরণ ঘটায়)।

কেননা ইচ্ছাটাই হল মূল বিবেচ্য, কিন্তু ইচ্ছার প্রমাণ বিবেচনা করা ছাড়া ইচ্ছার উপস্থিতি বোঝার উপায় নেই।

আর ইচ্ছার প্রমাণ হলো—হত্যাকাণ্ড ঘটাতে সক্ষম ঘাতক অস্ত্র ব্যবহার করা। সুতরাং ঐ ধরনের অস্ত্র ব্যবহারের সময় তাকে হত্যার উদ্দেশ্য পোষণকারী বলে গণ্য করা হবে।

এই ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ডের অনিবার্য ফল হল গুনাহ।

কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا .

যে ব্যক্তি কোন মু'মিনকে (এবং কোন যিম্মীকে[২]) ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করবে, তার প্রতিদান হল জাহান্নাম, তাতে সে চিরকাল অর্থাৎ দীর্ঘকাল বাস করবে। (৪ঃ৯৩)।

---

১. جِنَايَةٌ শব্দের আভিধানিক অর্থ মানুষ যে অন্যায় কাজ করে, এটা ব্যাপক বিষয়। তবে শরীয়তের পরিভাষায় জিনায়াত বলে ঃ শরীয়ত কর্তৃক নিষেধকৃত এমন অপরাধমূলক কাজকে, যা কোন প্রাণীর প্রাণ বা অঙ্গের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়। প্রথমটি হল হত্যা, আর দ্বিতীয়টি হল কর্তন ও জখম।

২. আয়াতের প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা শুধু মুমিনের হত্যার ক্ষেত্রেই গুনাহ সাব্যস্ত হয়। পক্ষান্তরে পরোক্ষ প্রমাণ দ্বারা যিম্মীর হত্যার ক্ষেত্রে গুনাহ প্রমাণিত হয়। কেননা নিরাপত্তা গুণের ক্ষেত্রে মুসলমান ও যিম্মীর মাঝে সমতা সুপ্রমাণিত।

হত্যাকাণ্ডের ফল গুনাহ হওয়া সম্পর্কে বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আর এ বিষয়ে উম্মতের 'ইজমা' অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ এবং (দুনিয়াতে) কিসাস।

কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلَى ·

নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের উপর কিসাস ওয়াজিব করা হয়েছে। (২ঃ১৮৭)

তবে আয়াতকে ইচ্ছাকৃতভাবে করার গুণ দ্বারা শর্তযুক্ত করা হয়েছে।

কেননা (মাশহুর হাদীসে) রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ الْعَمْدُ قَوَدٌ (ইচ্ছাকৃত হত্যা হলো কিসাস) অর্থাৎ ইচ্ছাকৃত হত্যার অবশ্য সাব্যস্ত বিধান হল কিসাস।

তাছাড়া যুক্তিগত কারণ এই যে, ইচ্ছার উপস্থিতি দ্বারা অপরাধ পূর্ণতা লাভ করে, আর শাসানোর হিকমত ও উদ্দেশ্য তখনই পূর্ণরূপে অর্জিত হয়। আর ইচ্ছার উপস্থিতি ছাড়া চূড়ান্ত শাস্তি শরীয়তের পক্ষ হতে অনুমোদনযোগ্য নয়।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ তবে যদি (নিহতের) অভিভাবকগণ মাফ করে দেয়, কিংবা সমঝোতা করে নেয়।

কেননা কিসাসের হক তাদের অনুকূলে সাব্যস্ত হয়েছে।

আর আমাদের মতে কিসাসের বিধান সুনির্ধারিতরূপে অবশ্য সাব্যস্ত। সুতরাং হত্যাকারীর সম্মতি ছাড়া (নিহতের) অভিভাবকের অধিকার নেই (কিসাসের পরিবর্তে) দিয়ত বা রক্তপণ গ্রহণ করার।

আর এটা শাফেয়ী (র) এর দু'টি মতের একটি।

তবে তাঁর মতে হত্যাকারীর সম্মতি ছাড়াও অভিভাবকের অধিকার রয়েছে 'প্রাণ হরণ' থেকে 'মাল গ্রহণের' দিকে ফিরে আসার।

কেননা প্রাণকে নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষার উপায় হিসাবে এটা নির্ধারিত হয়ে গেছে।

সুতরাং তার সম্মতি ছাড়াই সেটা জায়েয হবে।

আর শাফেয়ী (র) এর দ্বিতীয় মতে (হত্যার দণ্ডরূপে) অবশ্য সাব্যস্ত বিধান হলো অনির্ধারিতভাবে (কিসাস ও দিয়াত, এ) দু'টির কোন একটি। আর অভিভাবকের ইখতিয়ার দ্বারা তা নির্ধারিত হবে।

কেননা শরীয়ত বান্দার হককে ক্ষতিপূরণরূপে অনুমোদন করেছে। আর (কিসাস ও দিয়াত) প্রতিটিতেই ক্ষতিপূরণের দিক রয়েছে। সুতরাং অভিভাবকের ইখতিয়ার থাকবে।

আমাদের দলীল কিতাবুল্লাহ্র ঐ আয়াত, যা আমরা তেলাওয়াত করেছি, এবং যে হাদীস বর্ণনা করেছি।

তাছাড়া যুক্তিগত কারণ এই যে, (বিধান ও দণ্ড) উভয়ের মাঝে সাদৃশ্য বিদ্যমান না থাকার কারণে 'মাল' অবশ্য সাব্যস্ত বিধান হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। পক্ষান্তরে সদৃশ হওয়ার কারণে কিসাস হত্যায় অবশ্য সাব্যস্ত বিধান হওয়ার যোগ্যতা রাখে। আর তাতে শাসানো ক্ষতিপূরণ উভয় হিসাবেই জীবিতদের জন্য কল্যাণকর দিক রয়েছে। সুতরাং অবশ্য সাব্যস্ত দণ্ডবিধানরূপে এটাই নির্ধারিত হয়ে যাবে।

আর অনিচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে অর্থ দণ্ড তথা দিয়াতের ওয়াজিব হওয়া হচ্ছে, মানব রক্ত তথা মানব প্রাণকে মূল্যহীন হওয়া থেকে রক্ষার প্রয়োজনে।

আর দিয়াতের মাল গ্রহণের পর (নিহতের) অভিভাবকের (হত্যার) ইচ্ছা না করার বিষয়টি সুনিশ্চিত নয়। সুতরাং প্রাণকে নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষার উপায় হিসাবে এটা সুনির্ধারিত হয় না।

আর আমাদের মতে (ইচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে) কাফ্ফারা নেই। আর শাফেয়ী (র) এর মতে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে।

কেননা অনিচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে কাফ্ফারা ওয়াজিব হওয়ার প্রয়োজনের চেয়ে ইচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে কাফ্ফারা ওয়াজিব হওয়ার প্রয়োজন বেশী। সুতরাং কাফ্ফারাহ ওয়াজিব করার ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃত হত্যা অধিক কার্যকর 'কারণ' হবে।

আমাদের যুক্তি এই যে, ইচ্ছাকৃত হত্যা হল একেবারেই কাবীরা গুনাহ, যাতে বৈধতার কোন অবকাশ নেই। অথচ কাফ্ফারাহ এর বিধানের ক্ষেত্রে ইবাদতের দিকও রয়েছে। সুতরাং এ ধরনের কাবীরা গুনাহের সঙ্গে কাফ্ফারাহ এর বিধান সম্পৃক্ত হতে পারে না।

আর দ্বিতীয় যুক্তি এই যে, কাফ্ফারা হল শরীয়ত নির্ধারিত পরিমাণ। আর নিম্নতর পাপ রোধ করার জন্য শরীয়তের পক্ষ হতে কোন পরিমাণ নির্ধারিত হওয়া, উচ্চতর পাপ রোধ করার জন্য নির্ধারিত হওয়াকে অপরিহার্য করে না।

আর ইচ্ছাকৃত হত্যার একটি বিধান হল মীরাছ থেকে মাহরূম হওয়া।

কেননা রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ لَامِيْرَاثَ لِقَاتِلٍ (কোন হত্যাকারীর অনুকূলে মীরাছ সাব্যস্ত হবে না। –তিরমিযি)

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ আবু হানীফা (র) এর মতে প্রায় ইচ্ছাকৃত হত্যার অর্থ এই যে, এমন বস্তু দ্বারা ইচ্ছাকৃত আঘাত করা, যেটা (হত্যার জন্য তৈরী) অস্ত্র নয়, এবং (অঙ্গচ্ছেদের ক্ষেত্রে) অস্ত্রের স্থলে প্রচলিত নয়।

আর আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র) এর মতে –এবং এটা শাফেয়ী (র) এরও মত–যদি সে তাকে বিরাট পাথর দ্বারা কিংবা বিরাট কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা আঘাত করে, তবে (হত্যার জন্য তৈরী অস্ত্র না হলেও) সেটা ইচ্ছাকৃত হত্যা হবে। আর প্রায়

ইচ্ছাকৃত হত্যার অর্থ হবে, এমন কিছু দ্বারা ইচ্ছাকৃত আঘাত করা, যা দ্বারা সাধারণত: হত্যা করা হয় না।

কেননা যা দ্বারা সাধারণত: হত্যা করা হয় না, এমন ছোট যন্ত্র (বা বস্তু) ব্যবহার করা দ্বারা ইচ্ছাকৃতভাবে করার অর্থ হ্রাস পায়। কেননা এ ধরনের বস্তু ব্যবহার দ্বারা হত্যা ছাড়া অন্য কিছুর ইচ্ছা করা হয়ে থাকে। যেমন শিক্ষা দেওয়া ইত্যাদি।

সুতরাং এটা প্রায় ইচ্ছাকৃত হত্যা। পক্ষান্তরে এমন অস্ত্র ব্যবহার দ্বারা ইচ্ছাকৃতভাবে করার অর্থ হ্রাস পায় না, যা হত্যা করতে বিলম্ব করে না।

কেননা তা দ্বারা হত্যা ছাড়া অন্য কিছুর ইচ্ছা করা হয় না। যেমন তরবারি। সুতরাং সেটা হবে কিসাস ওয়াজিবকারী ইচ্ছাকৃত হত্যা।

আর আবু হানীফা (র) এর দলীল হল, নবী (সা) এর বাণী ঃ

اَلاَ اِنَّ قَتِيْلَ خَطَاِ الْعَمَدِ قَتِيْلُ السَّوْطِ وَالْعَصَا وَفِيْهِ مِائَةٌ مِّنَ الاِبِلِ ٠

শোনো, প্রায় ইচ্ছাকৃত হত্যার নিহত ব্যক্তি হল চাবুক বা লাঠির আঘাতে নিহত ব্যক্তি। আর তাতে একশ উট সাব্যস্ত হয়।[১]

তাছাড়া যুক্তিগত কারণ এই যে, এই বস্তু (অর্থাৎ ছোট বা বড় লাঠি) হত্যা করার জন্য তৈরী নয়, এবং (সাধারণত:) হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত নয়। কেননা যাকে হত্যা করা উদ্দেশ্য তার অজ্ঞাতসারে সেটা ব্যবহার করা সম্ভব নয়।

অথচ অজ্ঞাতসারে ব্যবহারের সম্ভাবতা দ্বারাই সাধারণত হত্যাকাণ্ড সম্পন্ন হয়। সুতরাং বস্তুটির প্রকৃতি বিবেচনায় ইচ্ছাকৃতভাবে করার অর্থ হ্রাস পেয়েছে। সুতরাং এটা হবে প্রায় ইচ্ছাকৃত হত্যা। যেমন চাবুক বা ছোট লাঠি দ্বারা হত্যা করার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ উভয় মত অনুসারে প্রায় ইচ্ছাকৃত হত্যার বিধান হলো (প্রথমত:) গুনাহ।

কেননা, এটা হত্যা, আর প্রহারের ক্ষেত্রে তার ইচ্ছা রয়েছে।

আর (দ্বিতীয়ত:) কাফ্ফারা।

কেননা অনিচ্ছাকৃত হত্যার সঙ্গে এর সাদৃশ্য রয়েছে।

আর (তৃতীয়ত:) আফলাহ বা দিয়ত প্রদানকারীদের উপর গুরু দিয়ত সাব্যস্ত হবে।

---

১. আলোচ্য হাদীসকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করার দিক হলো এই যে, এখানে চাবুক ও লাঠি ব্যবহারকে নিঃশর্তরূপে প্রায় ইচ্ছাকৃত হত্যা সাব্যস্ত করা হয়েছে। সুতরাং এটাকে ছোট লঠির সঙ্গে বিশিষ্টকরণের অর্থ হবে নিঃশর্ততা বাতিল করা। আর তা জায়েয হবে না।

এ বিষয়ে মূলনীতি হলো এই যে, যে কোন দিয়ত হত্যার কারণে সূচনাতেই[১] ওয়াজিব হয়। হত্যার পরে সৃষ্ট কোন কারণে নয়। সেই দিয়ত দিয়তপ্রদানকারীদের উপর সাব্যস্ত হয়, অনিচ্ছাকৃত হত্যার উপর কিয়াস করে এ বিধান দেওয়া হয়েছে।

আর তা তিন বছরে পরিশাধ করা ওয়াজিব। প্রমাণ হলো হযরত ওমর (রা) এর ফায়সালা। আর গুরু দিয়ত ওয়াজিব হবে। পরবর্তীতে (দিয়ত অধ্যায়ে) আমরা গুরু দিয়তের পরিচয় বর্ণনা করবো ইনশাআল্লাহ।

এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে মীরাছ থেকে বঞ্চিত হওয়ার বিধান যুক্ত হবে।

কেননা এটা হলো (প্রত্যক্ষ) হত্যাকাণ্ডের শাস্তি। আর 'সাদৃশতা' কিসাস রহিত হওয়ার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে, মীরাছ থেকে বঞ্চিত হওয়ার ক্ষেত্রে নয়।

আর ইমাম মালিক (র) যদিও ইচ্ছাকৃত হত্যার প্রায় সদৃশ হত্যার পরিচয় জানার কথা অস্বীকার করেছেন, কিন্তু তাঁর বিপক্ষে প্রমাণ হলো আমাদের পূর্ববর্ণিত হাদীস ও যুক্তি।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ আর ভুলক্রমে হত্যা দু'প্রকার। প্রথমত: ধারণার ক্ষেত্রে ভুল, আর তা এই যে, (দূর থেকে কোন ব্যক্তি) দৃষ্ট বস্তুকে শিকার ধারণা করে (তীর) নিক্ষেপ করলো, কিন্তু দেখা গেল যে, তা মানুষ। কিংবা হারবী[২] মনে করে হত্যা করলো, কিন্তু দেখা গেলো যে, সে মুসলমান।

(দ্বিতীয়ত:) (ধারণার ভুল নয়, বরং) কর্মের ভুল। আর তা এই যে, কেউ কোন নিশানা লক্ষ্য করে (তীর) নিক্ষেপ করল, কিন্তু তা কোন মানুষের গায়ে লাগল। আর অনিচ্ছাকৃত হত্যার বিধান হলো (হত্যাকারীর উপর) কাফ্ফারা এবং আকিলাহদের উপর দিয়ত।

কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ اِلٰى اَهْلِهٖ ۔

তাহলে (তার বিধান হলো) একটি মুমিন গোলাম আযাদ করা এবং নিহতের অভিভাবকের হাতে দিয়ত অর্পণ করা। (৪ঃ৯২)।

আর দিয়ত হত্যাকারীর আকিলাহদের উপর তিন বছরে পরিশোধ করা ওয়াজিব হবে। এর প্রমাণ আমরা উল্লেখ করেছি।

আর এতে গুনাহ সাব্যস্ত হয় না।

অর্থাৎ অনিচ্ছাকৃত হত্যার উভয় ক্ষেত্রে।

১. ইচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে আপোষ মীমাংসার ভিত্তিতে কিসাসের পরিবর্তে যে দিয়ত ওয়াজিব হয়, সেটা এর ব্যতিক্রম। তদ্রূপ সন্তানকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যার কারণে পিতার উপর যে দিয়ত ওয়াজিব হয়। সেটাও কিসাসের বিকল্প, কেননা 'পিতৃত্বের' সম্মান রক্ষার জন্য কিসাস রহিত হয়ে যায়। আর রক্তের মূল্যহীনতা রোধ করার জন্য পরবর্তীতে দিয়াত ওয়াজিব হয়।

২. 'দারুল হরব' অর্থাৎ মুশরিকদের রাজ্য। এখানকার অধিবাসীদের 'হারবী' বলা হয়। যুদ্ধরত দেশের অমুসলিমকেও 'হারবী' বলা হয়।

ফকীহগণ বলেছেন ঃ এখানে গুনাহের দ্বারা হত্যার গুনাহ বুঝানো হয়েছে। পক্ষান্তরে মূল কর্মের ক্ষেত্রে নিক্ষেপের সময় পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন না করার গুনাহ থেকে বিষয়টি খালি হবে না। কেননা, কাফ্‌ফারার বিধান আরোপ এই দিকটির বিবেচিত হওয়ার প্রমাণ করে।

আর সে (হত্যাকারী) মীরাছ থেকে বঞ্চিত হবে।

কেননা তাতে গুনাহ রয়েছে। সুতরাং তার সঙ্গে মীরাছ থেকে বঞ্চিত হওয়ার বিধান যুক্ত করা সিদ্ধ হবে।

পক্ষান্তরে, যদি শরীরের এক স্থানকে উদ্দেশ্য করে আঘাত করে, আর অন্যস্থানে লেগে মারা যায়, তাহলে কিসাস ওয়াজিব হবে।

কেননা সমগ্র দেহ যেহেতু একটি স্থানতুল্য, সেহেতু দেহের একটি অংশকে উদ্দেশ্য করার কারণে হত্যা সাব্যস্ত হয়েছে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ আর অনিচ্ছাকৃত হত্যা সমতুল্যের উদাহরণ হলো ঃ ঘুমন্ত ব্যক্তি গড়িয়ে চাপা দিয়ে হত্যা করা। শরীয়তে এর বিধান হলো অনিচ্ছাকৃত হত্যার বিধান।

আর কারণজনিত হত্যার উদাহরণ হলো ঃ অন্যের মালিকানায় কূপ খননকারী, কিংবা পাথর খণ্ড স্থাপনকারী। এর বিধান এই যে, এতে যদি কোন মানুষ মারা যায়, তাহলে আকিলা -এর উপর দিয়ত ওয়াজিব হবে।

কেননা, সে প্রাণনাশের কারণ সৃষ্টি করেছে। আর (কাজটি অন্যের মালিকানায় করার কারণে) এ বিষয়ে সে সীমালঙ্ঘনকারী হয়েছে। সুতরাং তাকে ঐ পতিত ব্যক্তির নিক্ষেপকারী হিসেবে গণ্য করা হবে। সুতরাং দিয়ত ওয়াজিব হবে।

আর তাতে কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে না এবং এর সঙ্গে মীরাছ থেকে বঞ্চিত বিধান যুক্ত হবে না।

আর শাফেয়ী (র) বলেন ঃ আর এই হত্যা বিধানের ক্ষেত্রে অনিচ্ছাকৃত হত্যার সঙ্গে যুক্ত হবে। কেননা শরীয়ত তাকে হত্যাকারী হিসেবে সাব্যস্ত করেছে।

আমাদের যুক্তি এই যে, কারণ সৃষ্টিকারীর পক্ষ হতে প্রকৃত হত্যাকাণ্ড অবিদ্যমান। সুতরাং (রক্তকে মূল্যহীনতা থেকে রক্ষা করার জন্য) ক্ষতিপূরণের ক্ষেত্রে হত্যার কারণ সৃষ্টিকে হত্যার সঙ্গে যুক্ত করা হবে। অতএব ক্ষতিপূরণ ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে তা মূল অবস্থার উপর বহাল থাকবে।

আর অন্যের মালিকানায় কূপ খননের কারণে যদিও সে গুনাহগার হবে, কিন্তু লোকটির মৃত্যুর কারণে সে গুনাহগার হবে না, যেমন আলিমগণ বলেছেন।

অথচ এক্ষেত্রে যে কাফ্‌ফারা সাব্যস্ত হয়, সেটা হল হত্যার গুনাহের কাফ্‌ফারা। তদ্রূপ মীরাছ থেকে বঞ্চিত হওয়া সাব্যস্ত হয় হত্যার গুনাহের কারণে।

আর প্রাণনাশের ক্ষেত্রে যে হত্যা প্রায় ইচ্ছাকৃত বলে গণ্য, এর চেয়ে নীচু পর্যায়ের পার্থক্যের (অর্থাৎ অঙ্গহানি ও জখমের ক্ষেত্রে) সেটা ইচ্ছাকৃত বলে গণ্য হবে।

কেননা, প্রাণ নাশের (উদ্দেশ্যগত) অবস্থা অস্ত্রের বিভিন্নতার কারণে বিভিন্ন বলে সাব্যস্ত হয়। পক্ষান্তরে প্রাণনাশের নীচু পর্যায়ের (অর্থাৎ অঙ্গহানির) বিষয়টি এক অস্ত্র বাদ দিয়ে অন্য অস্ত্রের সাথে খাস হয় না। আল্লাহ্ অধিক অবগত।

অনুচ্ছেদ

যাতে কিসাস ওয়াজিব হয়, আর যাতে কিসাস ওয়াজিব হয় না

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ স্থায়ীভাবে যার রক্ত (প্রাণ) নিরাপত্তাপ্রাপ্ত, তাকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করলে সেই হত্যার কারণে কিসাস ওয়াজিব হবে।

ইচ্ছাকৃতভাবে করার শর্ত আরোপের কারণ আমরা (জিনায়াত পর্বের শুরুতে) বর্ণনা করেছি।

আর রক্তের (প্রাণের) স্থায়ী নিরাপত্তার শর্ত আরোপের কারণ এই যে, হত্যার বৈধতার সন্দেহ যাতে দূর হয় এবং (নিহত ও হত্যাকারী) উভয়ের মাঝে সমতা সাব্যস্ত হয়।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ স্বাধীন ব্যক্তিকে স্বাধীন ব্যক্তির বিপরীতে এবং স্বাধীন ব্যক্তিকে গোলামের বিপরীতে হত্যা করা হবে।

কেননা বিভিন্ন আয়াতে ও হাদীসে এ সম্পর্কে আম বা শর্তমুক্ত বর্ণনা রয়েছে।

আর ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন ঃ স্বাধীন ব্যক্তিকে গোলামের বিপরীতে হত্যা করা হবে না।

কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ .

স্বাধীন ব্যক্তির বিপরীতে স্বাধীন ব্যক্তি এবং গোলামের বিপরীতে গোলাম (কিসাসপ্রাপ্ত হবে।) (২ঃ১৭৮)

আর এই মুকাবিলার অনিবার্য দাবী হলো স্বাধীন ব্যক্তিকে গোলামের বিপরীতে হত্যা না করা।

তাছাড়া কিসাসের ভিত্তি হলো সমতার উপর। আর মালিক (স্বাধীন ব্যক্তি) এবং মালিকানাধীন (গোলাম) এর মাঝে সমতা নেই।

আর এ সমতা না থাকার কারণেই গোলামের অঙ্গের বিপরীতে স্বাধীন ব্যক্তির অঙ্গ কর্তন করা হয় না। পক্ষান্তরে গোলামের বিপরীতে গোলামের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, তারা উভয়ে সমান। তদ্রূপ (স্বাধীন ব্যক্তির বিপরীতে) গোলামের বিষয়টিও ভিন্ন অর্থাৎ স্বাধীন ব্যক্তির বিপরীতে গোলামকে হত্যা করা হয়। কেননা এটা হলো সমতা থেকে নিম্ন পর্যায়ের পার্থক্য।

আমাদের যুক্তি এই যে, কিসাস রক্তের (প্রাণের) নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সমতার উপর নির্ভর করে। আর নিরাপত্তার সমতা সাব্যস্ত হয় ধর্ম-অভিন্নতা কিংবা আবাস-অভিন্নতা দ্বারা। আর স্বাধীন ব্যক্তি ও গোলাম উভয় ক্ষেত্রে সমতার অধিকারী।

আর দুই গোলামের মাঝে কিসাসের কার্যকর হওয়া রক্ত বৈধ হওয়ার সন্দেহ না থাকার কথা প্রমাণ করে।

আর 'নাছ'-এর উদ্দেশ্য হলো উল্লেখের ক্ষেত্রে খাস করা। সুতরাং তা অন্যান্য অংশকে নাকচ করে না।[১]

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ যিম্মীর বিপরীতে মুসলমানকে হত্যা করা হবে।

ইমাম শাফেয়ী (র) ভিন্নমত পোষণ করেন।

তাঁর প্রমাণ হলো নবী (সা)-এর বাণী— لَايُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ (ابوداؤد)

—কোন মুমিনকে কোন কাফিরের বিপরীতে হত্যা করা হবে না।

তাছাড়া যুক্তিগত কারণ এই যে, অপরাধ সংঘটনের সময় উভয়ের মাঝে কোন সমতা নেই। তদ্রূপ কুফুরি হত্যার বৈধতা প্রদান করে। সুতরাং তা অসমতার সন্দেহ সৃষ্টি করবে।

আমাদের প্রমাণ এই যে, বর্ণিত আছে যে, নবী (সা) যিম্মীর বিপরীতে মুসলমানকে হত্যা করেছেন। (দারে কুতনী)।

তাছাড়া যুক্তিগত কারণ এই যে, বিধানের বাধ্যবাধকতা কিংবা আবাস-অভিন্নতার প্রেক্ষিতে নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সমতা সাব্যস্ত রয়েছে। আর হত্যার বৈধতা দানকারী হলো হারবীর কুফরী, শান্তিকামী যিম্মীর কুফরী নয়। যিম্মীর বিপরীতে যিম্মীকে হত্যার বিধান (রক্তের) বৈধতার সন্দেহ না থাকা প্রমাণ করে।

আর ইমাম শাফেয়ী (র) যে হাদীস বর্ণনা করেছেন তার উদ্দেশ্য হলো হারবী। কেননা হাদীসের পরবর্তী অংশে রয়েছে وَلَاذُوعَهْدٍ فِى عَهْدِهِ (এবং যিম্মীকে যিম্মী অবস্থায় হত্যা করা যাবে না)। আর সংযোগ অব্যয় দ্বারা সংযোগ করায় বৈপরিত্য প্রমাণিত হয়।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ আর নিরাপত্তাপ্রাপ্ত হারবীর বিপরীতে মুসলমানকে হত্যা করা হবে না।

---

১. এখন প্রশ্ন হলো যে, তাহলে কিসাসের বর্ণনায় স্বাধীন ব্যক্তির বিপরীতে স্বাধীন ব্যক্তি এবং গোলামের বিপরীতে গোলামের উল্লেখ কেন হলো ? উত্তর এই যে, মুকাবিলা বা বিপরীতায়ন দু'রকম হয়, প্রথমত: সমগ্রের বিপরীতে সমগ্রের উল্লেখ, দ্বিতীয়ত: সমগ্রের বিপরীতে অংশ বিশেষের উল্লেখ। এখানে সেটাই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ আয়াতে শুধু এটুকু বলা হয়েছে যে. স্বাধীন ব্যক্তিকে হত্যার বিপরীতে স্বাধীন ব্যক্তিকে হত্যা করা হবে, বাকী গোলামকে হত্যার বিপরীতে স্বাধীন ব্যক্তিকে হত্যা করা হবে কি না, সেটা এখানে উল্লেখ করা হয়নি। বরং এ বিষয়ে নীরবতা পালন করা হয়েছে। সেটার বিধান আমরা اِنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ (জানের বদলে জান) এই আয়াতের ব্যাপকতা দ্বারা জেনেছি।

কেননা, তার রক্ত (প্রাণ) স্থায়ীভাবে নিরাপদ নয়। তদ্রূপ তার কুফরীও লড়াইয়ের কারণ রূপে বিদ্যমান। কেননা সে (দারুল হরবে) ফিরে যাওয়ার ইচ্ছার উপর বহাল রয়েছে।

আর নিরাপত্তাপ্রাপ্ত হারবীর বিপরীতে যিম্মীকে হত্যা করা হবে না।

এর কারণ আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি।

আর নিরাপত্তাপ্রাপ্ত হারবীর বিপরীতে নিরাপত্তাপ্রাপ্ত হারবীকে কতল করা হবে।

এ বিধান হলো সমতার প্রেক্ষিতে কিয়াসের ভিত্তিতে। তবে হত্যার বৈধতা (তথা হারবীর কুফরী) বিদ্যমান থাকার প্রেক্ষিতে সূক্ষ্ম কিয়াসের ভিত্তিতে (কিসাসরূপে) তাকে হত্যা করা হবে না।

আর স্ত্রীলোকের বিপরীতে পুরুষকে এবং অপ্রাপ্ত বয়স্কের বিপরীতে প্রাপ্তবয়স্ককে এবং সুস্থ ব্যক্তিকে অন্ধের বিপরীতে, পঙ্গুর বিপরীতে, অঙ্গহীন ব্যক্তির বিপরীতে এবং পাগলের বিপরীতে হত্যা করা হবে।

কারণ হলো 'নাছ'-এর শর্তমুক্ত হওয়া। তাছাড়া যুক্তিগত কারণ এই যে, রক্তের নিরাপদতার বাইরে অন্যান্য তারতম্যের বিষয়টি বিবেচনা করার অর্থ হবে কিসাস নিষিদ্ধ হয়ে যাওয়া এবং পরস্পর খুনাখুনি ও ধ্বংস ছড়িয়ে পড়া।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ কোন লোককে তার পুত্রের বিপরীতে হত্যা করা হবে না।

কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

لَايُقَادُ الْوَالِدُ بِوَلَدِه (الترمذى، وابن ماجة)

–অর্থাৎ পিতাকে তার সন্তানের বিপরীতে হত্যা করা হবে না।

এই হাদীসটাই তার শর্তমুক্ত হওয়ার প্রেক্ষিতে ইমাম মালিক (র)-এর বিপক্ষে প্রমাণ। কেননা তিনি বলেন ঃ যদি পিতা তাকে সরাসরি জবাই করে হত্যা করে, তাহলে তাকে হত্যা করা হবে।

তাছাড়া যুক্তিগত দিক এই যে, পিতা হলো সন্তানের জীবন লাভের কারণ। সুতরাং এটা অসম্ভব যে, সন্তান পিতার প্রাণনাশের হকদার হবে। এজন্যই তো সন্তান যদি পিতাকে লড়াইরত অবস্থায় শত্রুর কাতারে দেখতে পায় কিংবা যিনাকারী অবস্থায় পেয়ে যায়, আর সে মোহছান[১] হয়, তবু পিতাকে হত্যা করা তার জন্য জায়েয হবে না।

আর মূলত: নিহত ব্যক্তি প্রথমে কিসাসের হকদার হয়। তারপর তার ওয়ারিস তার স্থলবর্তী হয়।

আর দাদা ও নানা যত উর্ধ্ববর্তী হোক, এক্ষেত্রে পিতার পর্যায়ভুক্ত, তদ্রূপ মা এবং দাদী ও নানী-নিকটবর্তী হোক বা দূরবর্তী-(এক্ষেত্রে পিতার পর্যায়ভুক্ত হবে) এর কারণ আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি।

---

১. রজম প্রসঙ্গে মোহছান-এর সঙ্গা বলা হয়েছে।

আর সন্তানকে পিতার বিপরীতে হত্যা করা হবে।

কেননা সন্তানের ক্ষেত্রে কিসাস রহিতকারী কোন কারণ বিদ্যমান নেই।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ মনিবকে তার গোলামের বিপরীতে, তার মুদাব্বারের বিপরীতে, তার মুকাতারের বিপরীতে এবং তার সন্তানের গোলামের বিপরীতে হত্যা করা যাবে না।

কেননা মনিব নিজের জন্য নিজের উপর কিসাসের হকদার হয় না, অদ্রূপ তার সন্তানও তার পিতার উপর কিসাসের হকদার হয় না।

তদ্রূপ ঐ গোলামের বিপরীতেও মনিবকে হত্যা করা হবে না, যে গোলামের আংশিক মালিকানা সে লাভ করেছে। কেননা কিসাস বিভাজনযোগ্য নয়।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ কেউ যদি তার পিতার বিপক্ষে কিসাসের ওয়ারিস হয় (যেমন পিতা তার সন্তানের মাকে হত্যা করলো) তাহলে কিসাস রহিত হয়ে যাবে।

এ বিধান পিতৃত্বের সম্মান রক্ষা করার জন্য।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ আর কিসাস শুধু তলোয়ার দ্বারাই উশুল করা হবে।

আর শাফেয়ী (র) বলেন ঃ সে নিহত ব্যক্তির সঙ্গে যে আচরণ করেছে, তার সঙ্গেও সেই আচরণ করা হবে, যদি সেই আচরণটি শরীয়ত অনুমোদিত হয়।[১] যদি উক্ত আচরণ দ্বারা সে মারা যায়, তাহলে তো ভাল। অন্যথায় তার গর্দান উড়িয়ে দেয়া হবে।

কেননা কিসাসের ভিত্তি হলো সমতার উপর।

আমাদের প্রমাণ নবী (সা)-এর বাণী ঃ

لَاقَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ (اِبْنُ مَاجَهْ)

তলোয়ার ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা কিসাস গ্রহণ বৈধ নয়।

আর (সাহাবা কেরামের সিদ্ধান্ত এই যে,) তলোয়ার শব্দ দ্বারা অস্ত্র উদ্দেশ্য।

তাছাড়া যুক্তিগত প্রমাণ এই যে, শাফেয়ী (র) যে মত গ্রহণ করেছেন, তাতে যদি সদৃশ আচরণ দ্বারা উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হয়, ফলে পরবর্তীতে হত্যাকরীর গর্দান উড়াতে হয়, তাহলে অতিরিক্ত জিনিস উশুল করা সাব্যস্ত হবে। সুতরাং তা পরিহার করা অবশ্য কর্তব্য হবে। যেমন হাড় ভেঙ্গে ফেলার ক্ষেত্রে।[২]

---

১. যেমন ইচ্ছাকৃতভাবে কারো হাত কেটে ফেলল, আর তাতে কয়েকদিন পর সে মারা গেল, সেক্ষেত্রে হত্যাকরীর হাত কেটে ঐ কয়দিন অপেক্ষা করা হবে, যদি মারা গেল তাহলে তো ভাল। আর মারা না গেলে তখন তাকে তলোয়ার দিয়ে গর্দান উড়িয়ে দেয়া হবে। আর যদি কর্মটি শরীয়তসম্মত না হয়, যেমন তাকে অতিরিক্ত মদ পান করিয়ে মারলো, কিংবা ছোট মেয়েকে ধর্ষণ করে বা ছোট ছেলেকে বলাৎকার করে মেরে ফেললো। এ অবস্থায় তার সঙ্গে অনুরূপ আচরণ করা যাবে না।

২. কেউ যদি কারো হাঁড় ভেঙ্গে ফেলে, সেক্ষেত্রে হাঁড় ভাঙ্গার কিসাস নিষিদ্ধ হয়ে যায়। কেননা ঠিক ঐ পরিমাণ ভাঙ্গলে কিসাস হবে। কিন্তু অতিরিক্ত পরিমাণ ভাঙ্গলে কিসাসের ক্ষেত্রে সীমালংঘন হয়ে যাবে। আর যেহেতু সদৃশ পরিমাণ ভাঙ্গার নিশ্চয়তা নেই, সেহেতু এক্ষেত্রে কিসাস নিষিদ্ধ। তদ্রূপ আলোচ্য ক্ষেত্রে যেহেতু হত্যাকারী যে পরিমাণ কর্ম করেছে কিসাসের ক্ষেত্রে (সদৃশ কর্ম দ্বারা হত্যা সম্পন্ন না হলে) অতিরিক্ত কর্মের সম্ভাবনা রয়েছে। সেহেতু সদৃশ আচরণ নিষিদ্ধ হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ মুকাতাবকে যদি ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করা হয়, আর মনিব ছাড়া তার কোন ওয়ারিছ না থাকে, আর সে (কিতাবাত চুক্তির বিনিময় পরিশোধ করার মত) পর্যাপ্ত অর্থ রেখে গিয়ে থাকে, তাহলে আবু হানীফা ও আবু ইউসুফ (র) এর মতে মনিব কিসাসের হকদার হবে।

আর ইমাম আহমদ (র) বলেন ঃ এক্ষেত্রে আমি কিসাসের কোন অবকাশ দেখিনা।

কেননা এখানে উশুল করার কারণটি অস্পষ্ট হয়ে গেছে। কারণ যদি সে স্বাধীন অবস্থায় মারা গিয়ে থাকে, তাহলে কিসাস উশুল করার হকদারির কারণ হবে 'ওয়ালা'[১] সম্পর্ক। আর যদি গোলাম অবস্থায় মারা গিয়ে থাকে, তাহলে কারণ হবে মালিকানা সম্পর্ক।

তার বিষয়টি এমন হলো যে, দাসীর মনিবকে কেউ বললো যে, এই দাসীটি তুমি আমার কাছে এতো মূল্যের বিনিময়ে বিক্রি করেছো, আর মনিব বললোঃ না, বরং তাকে আমি তোমার কাছে বিবাহ দিয়েছি।

এ ক্ষেত্রে কারণ ভিন্ন হওয়া লোকটির জন্য দাসীর সঙ্গে বিবাহ করা বৈধ হবে না। এখানেও একই বিধান হবে।

শায়খায়নের যুক্তি এই যে, উভয় ছূরতেই কিসাস উশুল করার হকদারি নিশ্চিত রূপেই মনিবের অনুকূলে সাব্যস্ত হবে। আর মনিব তো নির্ধারিত আছে এবং বিধানও অভিন্ন থাকছে। আর কারণের ভিন্নতা বিবাদের পর্যায়ে নিয়ে যায় না, এবং বিধানের ভিন্নতার দিকেও নিয়ে যায় না। সুতরাং কারণের ভিন্নতার বিষয়টিকে বিবেচনা করা হবে না।

পক্ষান্তরে (নযীর রূপে পেশাকৃত) ঐ মাসাআলাটি ভিন্ন। কেননা, দাস সত্তার মালিকানার বিধান বিবাহের বিধান থেকে ভিন্ন।

আর যদি মুকাতাব গোলাম পর্যাপ্ত অর্থ রেখে গিয়ে থাকে, আর মনিব ছাড়া তার অন্য ওয়ারিস থেকে থাকে, তাহলে কিসাস সাব্যস্ত হবে না, এমনকি কিসাস দাবী করার ক্ষেত্রে তারা মনিবের সঙ্গে একজোট হলেও।

কেননা কিসাস উশুল করার হকদার ব্যক্তিটি অস্পষ্ট (ও অনির্ধারিত) হয়ে পড়েছে। কারণ যদি সে গোলাম অবস্থায় মারা গিয়ে থাকে, তাহলে হকদার হবে মনিব। পক্ষান্তরে যদি স্বাধীন অবস্থায় মারা গিয়ে থাকে, তাহলে হকদার হবে ওয়ারিছ। (অস্পষ্টতার কারণ এই যে,) উক্ত মুকাতাবের স্বাধীনতা গুণের উপর কিংবা দাসত্ব গুণের উপর মৃত্যু বরণ করা সম্পর্কে সাহাবা কিরামের মাঝে মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে। পক্ষান্তরে প্রথম মাসাআলাটি ভিন্ন। কেননা, সে ক্ষেত্রে মনিব নির্ধারিত।

আর যদি সে পর্যাপ্ত অর্থ না রেখে গিয়ে থাকে এবং তার স্বাধীন ওয়ারিসরা থেকে থাকে, তাহলে ইমামত্রয়ের সবার মতেই মনিবের অনুকূলে কিসাস অবশ্য সাব্যস্ত হবে।

---

১. আযাদকৃত দাসের মীরাছ।

কেননা সে কিতাবাত চুক্তি রহিত হওয়ার কারণে নিঃসন্দেহে গোলাম অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেছে।

পক্ষান্তরে আংশিক মুক্তিপ্রাপ্ত (গোলাম) যদি অপারগতার অবস্থায় মারা যায় এবং (অবশিষ্ট অংশের মুক্তির জন্য) পর্যাপ্ত অর্থ না রেখে যায়, তাহলে বিষয়টি ভিন্ন (অর্থাৎ কিসাস সাব্যস্ত হবে না)। কেননা অংশ বিশেষের ক্ষেত্রে মুক্তি অপারগতার কারণে রহিত হয়ে যায় না।

আর যদি বন্ধক গ্রহণকারীর কাছে থাকা অবস্থায় বন্ধকী গোলাম নিহত হয়, তাহলে বন্ধক প্রদানকারী এবং বন্ধক গ্রহণকারী একত্র হওয়া ছাড়া কিসাস অবশ্য সাব্যস্ত হবে না।

কেননা বন্ধকগ্রহণকারীর কোন মালিকানা নেই। সুতরাং সে কিসাস উশুল করার হকদার হতে পারে না। আর বন্ধক প্রদানকারী একা যদি উক্ত দায়িত্ব লাভ করে, তাহলে ঋণের ক্ষেত্রে বন্ধক গ্রহণকারীর হক বাতিল হয়। সুতরাং উভয়ের একত্র হওয়ার শর্ত হবে, যাতে বন্ধক গ্রহণকারীর হক তার সম্মতিক্রমে বাতিল হয়।

'জামে ছাগীর' কিতাবে ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন : মনসিক প্রতিবন্ধীর নিকটাত্মীয় যদি নিহত হয়, তাহলে মানসিক প্রতিবন্ধীর পিতার অধিকার থাকবে কিসাস গ্রহণ করার।

কেননা কিসাস উশুল করার বিষয়টি প্রাণ সত্তার উপর কর্তৃত্ব লাভের অন্তর্ভুক্ত, যা এমন একটি বিষয়ের কারণে শরীয়ত অনুমোদিত হয়েছে, যা (নিহত ব্যক্তির অভিভাবকের) প্রাণ সত্তার সঙ্গে সম্পৃক্ত। আর তা হচ্ছে প্রাণের জ্বালা নিবারণ। সুতরাং মানসিক প্রতিবন্ধীর পিতা (অর্থাৎ নিহতের দাদা) কিসাস উশুল করার ক্ষেত্রে তার অভিভাবকত্ব লাভ করবে, যেমন করবে বিবাহ করানোর ক্ষেত্রে। আবার তার আপোষ মীমাংসা করারও অধিকার রয়েছে।

কেননা মানসিক প্রতিবন্ধীর জন্য এটা অধিকতর কল্যাণকর। তবে তার মাফ করার অধিকার নেই। কেননা এতে মানসিক প্রতিবন্ধীর হক নষ্ট করা হয়।

তদ্রূপ (মানসিক প্রতিবন্ধীর পিতা কর্তৃত্ব লাভ করবে) যদি ইচ্ছাকৃতভাবে মানসিক প্রতিবন্ধীর হাত কাটা হয়,

কারণ সেটাই, যা আমরা উল্লেখ করেছি।

আর এসকল ক্ষেত্রে পিতার নিযুক্ত ওসী[১] পিতার পর্যায়ভুক্ত হবে। তবে সে হত্যাকারী থেকে কিসাস গ্রহণের অধিকারী হবে না।

কেননা মানসিক প্রতিবন্ধীর তার নিজের উপর কোন কর্তৃত্ব নেই। অথচ কিসাস উশুল করার বিষয়টি নিজের উপর কর্তৃত্বের অন্তর্ভুক্ত।

আর এই শর্ত মুক্ততার অন্তর্ভুক্ত হবে জানের কিসাসের বিপরীতে কৃত আপোষ মীমাংসার বিষয়টি এবং অঙ্গের কিসাস উশুল করার বিষয়টি।

---

১. যাকে ওসীয়ত করা হয়।

কেননা 'জামে ছাগীর' কিতাবে ইমাম মুহাম্মদ (র) শুধু কিসাস গ্রহণের বিষয়টিকে ব্যতিক্রম সাব্যস্ত করেছেন। তবে (মাবসূত কিতাবের) আপোষ মীমাংসা পর্বে রয়েছে যে, ওসী আপোষের অধিকারী নয়।

কেননা এটা হলো বিনিময় গ্রহণের মাধ্যমে প্রাণসত্তায় হস্তক্ষেপ। সুতরাং সমঝোতার মাধ্যমে বিনিময় গ্রহণের বিষয়টিকে কিসাস উশুল করার পর্যায়ভুক্ত ধরা হবে।

পক্ষান্তরে এখানে (অর্থাৎ জামে ছাগীরে) উল্লেখকৃত সিদ্ধান্তের যুক্তি এই যে, সমঝোতার উদ্দেশ্য হলো মাল, আর মাল সাব্যস্ত হবে ওসীর চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে, যেমন পিতার চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়। পক্ষান্তরে কিসাসের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা তার উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রাণের জ্বালা নিবারণ আর সেটা তো পিতার সঙ্গেই খাস।

আর ওসী ব্যক্তি মাফ করার অধিকারী হবে না, কেননা অন্যের হক বাতিল করার দিক বিবেচনায় পিতা নিজেও তার অধিকারী নয়। সুতরাং সে আরো স্বাভাবিক কারণেই তার অধিকারী হবে না।

ফকীহগণ বলেছেন যে, কিয়াসের দাবী এই যে, ওসী ব্যক্তি অঙ্গের কিসাস উশুল করারও হকদার হবে না, যেমন জানের কিসাস উশুল করার অধিকারী হয় না। কেননা উভয় কিসাসের উদ্দেশ্য অভিন্ন, অর্থাৎ প্রাণের জ্বালা নিবারণ।

তবে সূক্ষ্ম কিয়াস মতে ওসীব্যক্তি অঙ্গের কিসাস গ্রহণের অধিকার লাভ করবে। কেননা বিধানের ক্ষেত্রে অঙ্গের ব্যাপারে মালের অনুরূপ দৃষ্টিকোণ পোষণ করা হয়। কারণ অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে প্রাণ রক্ষার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, মালের বিষয়টিও তাই, যেমন আগে এ বিষয়ে জানা গেছে। সুতরাং অঙ্গের কিসাস উশুল করা মালের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার পর্যায়ভুক্ত হবে।

আর বাচ্চা এ ক্ষেত্রে মানসিক প্রতিবন্ধীর পর্যায়ভুক্ত হবে এবং বিশুদ্ধ মতে কাযী পিতার পর্যায়ভুক্ত হবেন।

লক্ষণীয় যে, কেউ যদি নিহত হয়, আর তার কোন অভিভাবক না থাকে, তাহলে সুলতান তার কিসাস উশুল করেন, আর এক্ষেত্রে কাযী সুলতানের স্থলবর্তী হন।

'জামে ছাগীর' কিতাবে ইমাম মুহম্মদ (র) বলেনঃ কেউ যদি নিহত হয় আর তার ছোট ও বড় অভিভাবক থাকে, (যেমন একজন ছোট ভাই এবং একজন বড় ভাই) তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে প্রাপ্তবয়স্ক অভিভাবকরা হত্যাকারীর কাছ থেকে কিসাস গ্রহণ করতে পারবে। আর সাহেবায়ন বলেনঃ ছোটরা প্রাপ্ত বয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত, তারা তা পারবে না।

কেননা কিসাস গ্রহণ করা তাদের সম্মিলিত অধিকার, আর কিসাস যেহেতু বিভাজন যোগ্য নয়, সেহেতু কিসাসের কিছু অংশ উশুল করা সম্ভব নয়। আর বড়দের সমগ্র কিসাস উশুল করায় ছোটদের হক বাতিল করা হয়। সুতরাং তাদের প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া

পর্যন্ত কিসাস বিলম্বিত হবে, যেমন কিসাস যদি দুজন বড় অভিভাবকের মাঝে সম্মিলিত হতো, আর তাদের একজন অনুপস্থিত হতো; কিংবা কিসাস যদি (একজন ছোট ও একজন বড়) দুই মনিবের মাঝে সম্মিলিত হতো।

ইমাম আবু হানীফা (র) এর যুক্তি এই যে, কিসাস হচ্ছে একটি অবিভাজ্য হক। কেননা তা এমন কারণ দ্বারা সাব্যস্ত হয়, যা বিভাজন যোগ্য নয়। আর তা হচ্ছে আত্মীয়তার সম্পর্ক। আর ছোট অভিভাবকের পক্ষ হতে ক্ষমা করার সম্ভাবনা অবিদ্যমান, কেননা তার কোন যোগ্যতা নেই। সুতরাং কিসাসের হক উভয়ের জন্য পূর্ণাঙ্গ রূপে সাব্যস্ত হবে। যেমন বিবাহ প্রদানের অভিভাবকত্বের ক্ষেত্রে হয়।

দুই বড় অভিভাবকের বিষয়টি ভিন্ন, কেননা অনুপস্থিত ব্যক্তির পক্ষ হতে ক্ষমা করার সম্ভাবনা বিদ্যমান রয়েছে।

আর দুই মনিবের মাসআলাটির এ সিদ্ধান্ত স্বীকৃত নয়।

ইমাম মুহম্মদ (রা) বলেনঃ কেউ যদি 'ফলাযুক্ত কাষ্ঠখন্ড' দ্বারা আঘাতের দ্বারা হত্যা করে, আঘাত যদি ফলার অংশ দ্বারা হয় তাহলে এই হত্যার বিপরীতে তাকে হত্যা করা হবে। আর যদি লাঠির অংশ দ্বারা হয়, তাহলে তার উপর দিয়ত ওয়াজিব হবে।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন ঃ এ বিধান তখন প্রযোজ্য হবে, যখন ফলার ধারালো অংশ দ্বারা আঘাত করে। কেননা তাতে জখম সাব্যস্ত হয় এবং হত্যার কারণ পূর্ণতা লাভ করে।

আর যদি লোহার পৃষ্ঠ দ্বারা আঘাত করে (এবং তাতে ক্ষত না হয়) তাহলে সাহেবায়নের মতে কিসাস অবশ্য সাব্যস্ত হবে। এটা ইমাম আবু হানীফা (র) হতে প্রাপ্ত একটি বর্ননা। কেননা, তিনি লৌহযন্ত্র হওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করেছেন।

ইমাম আবু হানীফা (র) হতে প্রাপ্ত আরেকটি বর্ননা এই যে, এ অবস্থায় যদি ক্ষত সৃষ্টি হয় তাহলে কিসাস ওয়াজিব হবে। আর এটাই বিশুদ্ধতম মত। এ বিষয়ে আমরা সামনে বর্ননা করবো ইনশাআল্লাহ।

আর পাল্লার 'বাটখারা' দ্বারা আঘাত করার বিষয়টিও এই শ্রেণীভুক্ত হবে।

আর ফলাযুক্ত লাঠি। লাঠির অংশ দ্বারা আঘাত করার ক্ষেত্রে দিয়ত ওয়াজিব হওয়ায় কারণ এই যে, এতে নিরপত্তাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে হত্যা করা এবং কিসাস গ্রহণ করা অসম্ভব সাব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং নিরপত্তা প্রাপ্ত প্রাণ যাতে মূল্যহীন হয়ে না পড়ে, (সে জন্য দিয়ত ওয়াজিব হবে)।

এরপর কারো কারো মতে এটা হবে বড় লাঠির পর্যায়ভুক্ত। সুতরাং এটি ভারী জিনিস দ্বারা হত্যা করার হুকুমভুক্ত হবে। (অর্থাৎ তা প্রায় ইচ্ছাকৃত হত্যা বলে গণ্য হবে।) আর এ বিষয়ে ইমাম আবু হানাফা (র) এর ভিন্নমত রয়েছে। যেমন সামনে আমরা বর্ণনা করবো। আর কারো কারো মতে এটা হবে চাবুক দ্বারা আঘাত করার পর্যায়ভুক্ত। আর তাতে ইমাম শাফেরী (র) এর ভিন্নমত রয়েছে।

আর বিরোধপূর্ণ মাসআলাটি হচ্ছে লাগাতার প্রহার করার মাসআলা।

ইমাম শাফেয়ী (র) এর যুক্তি এই যে, মারা যাওয়া পর্যন্ত লাগাতার প্রহার করতে থাকা ইচ্ছাকৃত ভাবে প্রহার করার প্রমাণ। সুতরাং প্রহার কিসাস ওয়াজিবকারী হিসাবে সাব্যস্ত হবে।

আমাদের প্রমাণ হলো (জিনায়াত পর্বের শুরুতে) আমাদের বর্ণিত হাদীস ঃ

اَلاَ إِنَّ قَتِيْلَ خَطَاءِ الْعَمَدِقَتِيْلُ السَّوْطِ وَالْعَصَا ; কোন কোন বর্ণনায় قَتِيْلُ شِبْهِ الْعَمَدِ বর্ণিত হয়েছে।

তাছাড়া যুক্তিগত প্রমাণ এই যে, লাগাতার প্রহার করার ক্ষেত্রে অনিচ্ছাকৃতভাবে করার সন্দেহ রয়েছে। কেননা লাগাতার প্রহার করা কখনো কখনো শিক্ষা দানের জন্য হয়ে থাকে। কিংবা হয়তো হত্যার ইচ্ছা প্রহারের মাঝখানে তার মনে উদিত হয়েছে। সুতরাং প্রহার কর্মের প্রথম অংশ হত্যার ইচ্ছা থেকে যুক্ত হল। আর এমনও সম্ভাবনা রয়েছে যে, (হত্যার ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও) মৃত্যুর নির্ধারিত সময়ে আঘাতটি লেগেছে এবং মৃত্যু ঘটেগেছে। আর স্পষ্ট সন্দেহ কিসাস রহিত করে। সুতরাং দিয়াত ওয়াজিব হবে।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেনঃ কেউ যদি কোন বাচ্চাকে বা প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে পানিতে ডুবিয়ে মারে, তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে তার উপর কিসাস নেই।

আর সাহেবায়ন বলেনঃ তার থেকে কিসাস নেয়া হবে। আর এটা শাফেয়ী (র) এরও মত। তবে সাহেবায়নের মতে তার গর্দান উড়িয়ে কিসাস উশুল করা হবে। আর শাফেয়ী (রহ) এর মতে (সমতা বিধানের বিষয়টি বিবেচনা করে) তাকেও ডুবিয়ে মারা হবে, যেমন ইতিপূর্বে আমরা বর্ণনা করে এসেছি।

তাদের তিনজনের দলীল হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী ঃ

مَنْ غَرَّقَ غَرَّقْنَاهُ (ابْنُ حِبَّان)

অর্থাৎ যে ডুবিয়ে মারবে, আমরাও তাকে ডুবিয়ে মারবো। (ইবন হিব্বান)।

তাছাড়া যুক্তিগত কারণ এই যে, মাধ্যমরূপে ব্যবহৃত বস্তুটি হত্যা সম্পন্ন করার উপযুক্ত। সুতরাং সেটার ব্যবহার ইচ্ছাকৃতভাবে করার প্রমাণ। আর নিহত ব্যক্তির প্রাণের নিরাপদতার বিষয়টি সন্দেহাতীত।

আর ইমাম আবু হানীফা (র) এর প্রমাণ হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস ঃ اَلاَ إِنَّ قَتِيْلَ خَطَاءِ الْعَمَدِ قَتِيْلُ السَّوْطِ وَالْعَصَا

আর হাদীসের অন্য অংশে রয়েছে ঃ وَفِىْ كُلِّ خَطَاءٍ أَرْشٌ –আর যে কোন অনিচ্ছাকৃত হত্যার (বা অঙ্গহানিতে) দিয়ত ওয়াজিব হয়।

তাছাড়া যুক্তিগত কারণ এই যে, উল্লেখিত মাধ্যম বস্তুটি হত্যার জন্য প্রস্তুতকৃত নয়। এবং হত্যার কাজে সাধারণভাবে ব্যবহৃতও নয়। কেননা সেটাকে হত্যার কাজে ব্যবহার করা দুঃসাধ্য। সুতরাং অনিচ্ছাকৃতভাবে করার সন্দেহ সুদৃঢ় হয়েছে।

তাছাড়া দ্বিতীয় যুক্তি এই যে, قِصَاصٌ শব্দটি অভিধানিক ভাবে সমতার অর্থ প্রদান করে। তা থেকেই বলা হয় اِقْتَصَّ أَثَرَهُ। সে তার পদাংক অনুসরণ করলো এবং তা থেকে কাঁচির দুই সমান ফলাকে مِقَصَّةٌ বলে।

অথচ জখম করা ও থেতলে দেয়ার মাঝে সাদৃশ্য নেই। কেননা (দেহের) বাহ্যিক দৃশ্যকে নষ্ট করার ক্ষেত্রে দ্বিতীয়টিতে অসম্পূর্ণতা রয়েছে।

তদ্রূপ (কিসাস) প্রবর্তনের ক্ষেত্রে শাসানো ও ভীতি প্রদর্শনের যে হিকমত রয়েছে, সে দিক থেকেও দুটি হত্যা সদৃশ নয়। কেননা অস্ত্র দ্বারা হত্যা সচরাচর সংঘটিত হয়। (সুতরাং এক্ষেত্রে কিসাস) প্রয়োগ দ্বারা শাসানো অধিকতর প্রয়োজনীয়। পক্ষান্তরে ভারী বস্তু দ্বারা হত্যা করা বিরল। আর ডুবিয়ে মারা এই শ্রেণীভুক্ত।

আর ইমাম শাফেয়ী (র) যে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তার সনদ মারফূ' নয়। কিংবা সেটাকে শাসানোর কৌশলের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হবে। আর এই বিধানের প্রয়োগকে নবী ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক নিজের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করায় সে দিকেরই ইঙ্গিত বহন করে।

আর যখন কিসাস নিষিদ্ধ হবে, তখন দিয়ত ওয়াজিব হবে আর তা আকিলাহদের উপর বর্তাবে। বিষয়টি আমরা (জিনায়াত পর্বের শুরুর দিকে) আলোচনা করেছি।

আর ইমাম আবু হানীফা (রহ) হতে প্রাপ্ত বর্ণনার ভিন্নতা কাফ্ফারার ক্ষেত্রে। (দিয়াত ওয়াজিব হওয়ার বিষয়ে নয়।)

ইমাম কুদূরী (র) বলেনঃ কেউ যদি কোন ব্যক্তিকে ইচ্ছাকৃতভাবে জখম করে, আর সে শয্যাশায়ী হয়ে থাকে, এমনকি (সেই জখমে) সে মারা যায়, তাহলে তার উপর কিসাস বর্তাবে।

কেননা কিসাস ওয়াজিবকারী কারণ বিদ্যমান হয়েছে এবং বাহ্যত: উক্ত কারণের কার্যকরতা বাতিলকারী কিছু পাওয়া যায়নি। সুতরাং হুকুমটিকে তার সাথেই সম্পৃক্ত করা হবে।

'জামে ছাগীর' কিতাবে ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেনঃ মুসলমান ও মুশরিকদের দুটি দল যদি মুখোমুখি হয় আর একজন মুসলমান অন্য একজন মুসলমানকে মুশরিক মনে করে হত্যা করে ফেলে, তাহলে তার উপর কিসাস ওয়াজিব হবে না, বরং তার উপর কাফফারা ওয়াজিব হবে।

কেননা আমরা বর্ণনা করে এসেছি যে,এটা ভুলক্রমে হত্যার দুই প্রকারের এক প্রকার। আর ভুলক্রমে হত্যার কোন প্রকারই কিসাস ওয়াজিব করে না; বরং কাফফারা ওয়াজিব করে। তদ্রূপ দিয়ত ওয়াজিব করে, যেমন কিতাবুল্লাহর 'নাছ' বা স্পষ্টভাষ্য ঘোষণা করেছে।

আর (উহুদের যুদ্ধে) হযরত হোযায়ফা (রা) এর পিতা হযরত ইয়ামান (রা) এর উপর যখন মুসলমানদের তালোয়ার লাগাতার আঘাত করল (আর তিনি নিহত হলেন) তখন নবী ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিয়তের ফাছালা দিয়েছিলেন।

ফকীহগণ বলেছেনঃ দিয়ত ঐ সময় ওয়াজিব হয়, যথা কাফির-মুসলমানরা সংঘর্ষে একাকার হয়ে যায়। পক্ষান্তরে যদি সে মুসলিম মুশরিকদের কাতারে থাকে, তাহলে দিয়ত ওয়াজিব হবে না। কেননা (নিজের উপস্থিত দ্বারা) তাদের দলভারী করার কারণে তার রক্তের 'নিরাপদতা' রহিত হয়ে গেছে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

مَنْ كَثَّرَ سَوَادَ قَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ ·

–যে ব্যক্তি কোন গোষ্ঠীর দল ভারী করে, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেনঃ কেউ যদি নিজেকে জখম করে, অন্য একজন লোক তাকে জখম করে, কোন সিংহ তাকে জখম করে, কিম্বা কোন সাপ দংশন করে, আর এই সব জখমের কারণে সে মারা যায়, তাহলে অপরিচিত জখমকারী ব্যক্তির উপর এক তৃতীয়াংশ দিয়ত ওয়াজিব হবে।

কেননা, সিংহের জখম এবং সাপের জখম অভিন্ন শ্রেণীভুক্ত। কারণ দুনিয়ার ক্ষেত্রে এবং আখিরাতের ক্ষেত্রে তা অবিচার্য আর নিজেকে নিজে জখম করার বিষয়টি দুনিয়াতে অবিচার্য, কিন্তু আখিরাতে বিচার্য। একারণেই সে গুনাহগার হয়।

আর অপ্রকাশিত (ও বিরল) বর্ণনা রয়েছে যে, ইমাম আবু হানীফা ও মুহম্মদ (রহ) এর মতে তাকে গোছল দেয়া হবে এবং তার জানাযার নামায পড়া হবে। পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর মতে তাকে গোছল দেয়া হবে কিন্তু তার জানাযা পড়া হবে না।

আর কাযীদের ব্যাখ্যা গ্রন্থে তার জানাযা পড়া সম্পর্কে মাশায়েখের মতপার্থক্য বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন আমরা كِتَابُ التَّجْنِيْسِ وَالْمَزِيْدِ-এ লিখেছি। সুতরাং তার কর্মটি সম্পূর্ণত: অবিচার্য হল না, ফলে তা একটি ভিন্ন শ্রেণীর কর্ম হল। আর 'আজনাবী' এর কর্মটি দুনিয়াতে এবং আখিরাতে বিচার্য। সুতরাং তিন শ্রেণীর কর্ম একত্র হল। আর তিনটি কর্ম দ্বারা তার প্রাণ নষ্ট হল। সুতরাং নষ্ট প্রাণ তিন শ্রেণীর প্রতিটি কর্মে বিভাজিত হবে। ফলে 'আজনাবী' এর উপর দিয়তের এক তৃতীয়াংশ সাব্যাস্ত হবে। আল্লাহই অধিক জানেন।

পরিচ্ছেদ ঃ

'জামে ছাগীর' কিতাবে মুহম্মদ (র) বলেন ঃ কেউ যদি মুসলমানদের বিরুদ্ধে তরবারি ধারণ করে, তাহলে মুসলমানদের কর্তব্য হবে তাকে হত্যা করা।

কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

مَنْ شَهَرَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ سَيْفًا فَقَدْ أَطَلَّ دَمَهُ (النسائى)

যে ব্যক্তি মুসলমানদের বিরুদ্ধে তরবারি ধারণ করে, সে তার রক্তকে মূল্যহীন করে ফেলে।

তা ছাড়া যুক্তিগত কারণ এই যে, সে হল বিদ্রোহকারী। সুতরাং তার বিদ্রোহের কারণে তার নিরাপত্তা রহিত হয়ে যাবে।

তাছাড়া দ্বিতীয় যুক্তি এই যে, নিজেকে হত্যা থেকে বাঁচানোর উপায় রূপে তাকে হত্যা করা নির্ধারিত হয়ে গেছে। সুতরাং তার অধিকার থাকবে তাকে হত্যা করার।

'মাবসূত' কিতাবে ইমাম মুহম্মদ (র) এর ভাষ্য فَعَلَيْهِمْ (তাদের কর্তব্য) এবং 'জামে ছাগীর' কিতাবে তাঁর ভাস্য فَحَقٌّ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ (মুসলমানদের কর্তব্য) উভয় ভাষ্য ওয়াজিব হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করে।

বস্তুত: (তাকে কতল করা ওয়াজিব হওয়ার) অর্থ হলো, ক্ষতি প্রতিরোধ করা ওয়াজিব হওয়া।

'জামে ছাগীর' কিতাবের سَرِقَةٌ (চুরির বিধান) অধ্যায়ে বলা হয়েছেঃ কেউ যদি রাতে বা দিনে কোন লোকের উপর অস্ত্র ধারণ করে কিংবা রাত্রে শহরে কোন লোকের উপর লাঠি উত্তোলন করে কিংবা দিনে শহরের বাইরে কোন পথে লাঠি উত্তোলন করে আর আক্রান্ত ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে তাকে হত্যা করে, তাহলে তার উপর কোন দণ্ড আসবে না। এর কারণ আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি।

এটা এজন্য যে, অস্ত্র প্রাণহানি ঘটাতে বিলম্ব করে না। সুতরাং আক্রান্ত ব্যক্তি হত্যার মাধ্যমে তাকে রোধ করার মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে ছোট লাঠি যদিও প্রাণহানি ঘটাতে বিলম্ব করে, কিন্তু রাতে তার কাছে সাহায্য এসে পৌছবে না। সুতরাং হত্যার মাধ্যমে সে তাকে রোধ করতে বাধ্য হবে। তদ্রূপ দিনের বেলা শহরের বাইরে কোন পথে তার কাছে সাহায্য পৌছবে না, সুতরাং আক্রান্ত ব্যক্তি যদি তাকে হত্যা করে, তাহলে তার রক্ত (বা প্রাণ) মূল্যহীন হয়ে পড়বে।

ফকীহগণ বলেছেনঃ যদি এমন লাঠি হয়, যা প্রাণহানি ঘটাতে বিলম্ব করে না তাহলে সম্ভবত: ছাহেবায়নের মতে তা অস্ত্রের মত বলেই গণ্য হবে।

পাগল যদি অন্য কারো উপর অস্ত্র ধারণ করে, আর আক্রান্ত ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে তাকে হত্যা করে ফেলে, তাহলে তার উপর তার মাল থেকে দিয়ত দেয়া ওয়াজিব হবে।

আর ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, তার উপর কোন দণ্ড বর্তাবে না। একই মতপার্থক্য হবে বাচ্চা ও পালিত পশুর দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার ক্ষেত্রে।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) হতে প্রাপ্ত একটি বর্ণনা মতে পশুর ক্ষেত্রে তার বাজার মূল্যের দর সাব্যস্ত হবে। আর বাচ্চা ও পাগলের ক্ষেত্রে কিছু ওয়াজিব হবে না। ইমাম শায়েফী (র) এর যুক্তি এই যে, সে নিজেকে রক্ষা করার জন্য তাকে হত্যা করেছে। সুতরাং (বাচ্চা, পাগল ও পশু সবকটাকে) প্রাপ্ত বয়স্ক (ও সুস্থমস্তিষ্ক) অস্ত্রধারণকারীর উপর কিয়াস করা হবে।

তাছাড়া সে নিজের কর্ম দ্বারা নিজেকে নিহত হওয়ার মুখে নিক্ষিপ্ত করেছে। সুতরাং আক্রান্ত ব্যক্তি হত্যা করার ব্যাপারে বল প্রয়োগকৃত ব্যক্তির সদৃশ হবে।

আর ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর যুক্তি এই যে, পশুর কর্মটি সম্পূর্ণত:ই অবিচার্য হবে। তাই যদি পশুর পক্ষ হতে হত্যাকর্ম সম্পন্ন হয়ে যায়, তবে পশুর উপর কোন দর সাব্যস্ত হয় না।

পক্ষান্তরে বাচ্চার ও পাগলের কর্ম সামগ্রিক ভাবে বিবেচ্য হয়। তাই যদি তার হত্যা কর্ম সম্পন্ন করে ফেলে তাহলে তাদের উপর দর সাব্যস্ত হবে। তদ্রূপ তাদের নিরাপত্তা হচ্ছে তাদের নিজস্ব হক হিসাবে। পক্ষান্তরে পশুর নিরাপত্তা হচ্ছে তার মালিকের হক হিসাবে। সুতরাং তাদের দুজনের কর্ম তাদের নিরাপত্তা রহিতকারী হবে, পক্ষান্তরে পশুর কর্ম তার নিরাপত্তা রহিতকারী হবে না।

আমাদের যুক্তি এই যে, (বাচ্চা ও পাগলের ক্ষেত্রে) সে শরীয়তের পক্ষ হতে নিরাপত্তা প্রাপ্ত একজন ব্যক্তিকে হত্যা করেছে, কিংবা (পশুর ক্ষেত্রে) এমন একটি মাল নষ্ট করেছে, যা মালিকের অধিকার হিসাবে নিরাপত্তা প্রাপ্ত। আর পশুর কর্মটি নিরাপত্তা রহিতকারী হওয়ার যোগ্য নয়। তদ্রূপ তাদের দুজনের কর্ম নিরাপত্তা রহিতকারী হতে পারে না, যদিও তাদের নিরাপত্তা ও তাদের নিজস্ব হকের কারণে সাব্যস্ত হয়েছে। কেননা তাদের গ্রহণযোগ্য ইখতিয়ার নেই। একারণেই তো তাদের পক্ষ হতে হত্যা কর্ম সম্পন্ন হওয়া দ্বারা কিসাস ওয়াজিব হয় না।

পক্ষান্তরে সুস্থ মস্তিষ্ক প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির বিষয়টি ভিন্ন। কেননা তার জন্য গ্রহণযোগ্য ইখতিয়ার রয়েছে। তবে কিসাস ওয়াজিব না হওয়ার কারণ হলো হত্যার বৈধতাদানকারী বিদ্যমান থাকা। আর তা হলো অনিষ্ট রোধ করা, সুতরাং (বিকল্প হিসাবে) দিয়ত ওয়াজিব হবে।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেনঃ যদি কেউ শহরে অন্য কারো উপর অস্ত্র ধারণ করে এবং তাকে আঘাত করে, তারপর অন্য কেউ তাকে হত্যা করে, তাহলে হত্যাকারীর উপর কিসাস ওয়াজিব হবে।

এর অর্থঃ যদি সে তাকে আঘাত করার পর বিরত হয়ে ফিরে যায়। কেননা ফিরে যাওয়ার মাধ্যমে সে লড়াইকারীর ভূমিকা থেকে বের হয়ে গেলো। সুতরাং তার নিরাপত্তা প্রত্যাবর্তিত হলো।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেনঃ কারো ঘরে যদি রাতে কেউ প্রবেশ করে এবং চুরি করা মাল নিয়ে বের হয়ে যায়, আর চুরির শিকার ব্যক্তি তার পিছু নিয়ে তাকে হত্যা করে তাহলে তার উপর কোন দণ্ড বর্তাবে না।

কেনলা নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ قَاتِلْ دُوْنَ مَالِكَ (مسند اسحق ابن راهويه) তুমি তোমার মাল রক্ষা করার জন্য লড়াই কর।

তাছাড়া যুক্তিগত কারণ এই যে, সূচনা লগ্নেই মাল রক্ষা হিসাবে তাকে হত্যা করা তার জন্য বৈধ ছিল। সুতরাং সমাপ্তিতে মাল ছিনিয়ে আনার ক্ষেত্রেও তা জাইয হবে।

অবশ্য মাসআলাটির ব্যাখ্যা এই যে, চুরির শিকার ব্যক্তি যদি হত্যা করা ছাড়া মাল ছিনিয়ে আনতে সক্ষম না হয়। আল্লাহ অধিক অবগত।

প্রাণহানির নীচে (অঙ্গহানির ক্ষেত্রে) কিসাস

ইমাম কুদূরী (র) বলেনঃ কেউ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে অন্য কারো হাত কবজি পর্যন্ত কেটে ফেলে, তাহলে (কিসাস রূপে) তার হাত (কব্জি থেকে) কেটে ফেলা হবে, যদিও তার হাত কর্তিত হাত থেকে বড় হয়।

কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ (জখমসমূহ কিসাস সম্পন্ন হবে) আর তা সাদৃশ্যতা প্রমাণ করে। সুতরাং যেকোন স্থানে সাদৃশ্যতা বিবেচনা করা সম্ভব, তাতে কিসাস ওয়াজিব হবে। আর যে কোন স্থানে সাদৃশ্যতা বিবেচনা করা সম্ভব নয়, সেখানে কিসাস ওয়াজিব হবে না। আর কবজি থেকে কর্তনের ব্যাপারে সাদৃশ্যতা বিবেচনা করা সম্ভব হয়েছে, তাই তা বিবেচনা করা হয়েছে। আর হাতের বড়ত্ব ও ছোটত্বের বিষয়টি বিবেচ্য নয়। কেননা তা দ্বারা হাতের প্রধান উপকারিতা বিভিন্ন হয় না। পায়ের বিষয়টি এবং নাকের নরম অংশটি এবং কানের বিষয়টিও একই রকম। কেননা এসকল ক্ষেত্রে সাদৃশতা বিবেচনা করা সম্ভব।

ইমাম কুদূরী (র) বলেনঃ কেউ যদি কোন লোকের চোখে আঘাত করে এবং তা উপড়ে ফেলে, তাহলে তার উপর কিসাস ওয়াজিব হবে না।

কেননা উপড়ানোর ক্ষেত্রে সাদৃশতা সম্ভব নয়। আর যদি চক্ষু কোটরে বহাল থাকে, শুধু চোখের জ্যোতি চলে যায়, তাহলে তার উপর কিসাস ওয়াজিব হবে। কেননা সাদৃশতা রক্ষা করা সম্ভব। যেমন 'মুখতাছারুল কুদূরী' কিতাবে বলা হয়েছে যে, আয়নার মত চকচকে স্টিল গরম করা হবে এবং তার মুখমণ্ডলে ভিজা তুলা রাখা হবে, তারপর চোখের সামনে গরম ধরা হবে। ফলে চোখের জ্যোতি চলে যাবে। এটা সাহাবা (রা) এর একটি জামাত থেকে বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেনঃ আর দাঁতের ক্ষেত্রে কিসাস সাব্যস্ত হবে।

কেননা, আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ, (এবং দাঁতের বদলে দাঁত)

যদিও যার কাছ থেকে কিসাস নেয়া হবে, তার দাঁত অপর জনের দাঁত থেকে বড় হয়।

কেননা দাঁতের ছোট ও বড় হওয়ার দ্বারা এবং উপকারিতায় কোন তারতম্য হয় না।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ আর যে কোন জখমের ক্ষেত্রে সাদৃশতা সাব্যস্ত হতে পারে, তাতে কিসাস ওয়াজিব হবে।

এর প্রমাণ আমাদের তিলাওয়াতকৃত আয়াত।

ইমাম কুদূরী (র) বলেনঃ আর দাঁত ছাড়া অন্য কোন হাঁড় ভাঙ্গার ক্ষেত্রে কিসাস নেই।

একথাটা এভাবে হযরত ওমর (রা) এবং হযরত ইবনে মাসউদ (র) হতে বর্ণিত হয়েছে।

আর নবী সাল্লাল্লাহ আলাহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ لاَ قِصَاصَ فِيْ الْعَظْمِ (হাঁড়ের ক্ষেত্রে কোন কিসাস নেই) আর উদ্দেশ্য হলো দাঁত ছাড়া অন্য হাঁড়।

তা ছাড়া যুক্তিগত কারণ এই যে, দাঁত ছাড়া অন্য হাঁড়ের ক্ষেত্রে সাদৃশতা বিধান করা দু:সাধ্য । কেননা কমবেশী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পক্ষান্তরে দাঁতের বিষয়টি ভিন্ন, কেননা তা 'রেত' দ্বারা ঘষে সমান করা হয়। আর দাঁত যদি উপড়ে ফেলে থাকে, তাহলে দ্বিতীয় জনেরও দাঁত উপড়ে ফেলা হবে, ফলে উভয়টি সমান হয়ে যাবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেনঃ আর প্রাণহানির নীচে (অর্থাৎ অঙ্গহানির ক্ষেত্রে) প্রায় ইচ্ছাকৃত: কোন প্রকার নেই, বরং হয় তা ইচ্ছাকৃত কিংবা ভুলকৃত।

কেননা ইচ্ছাকৃত প্রকারটি মাধ্যম যন্ত্রের সাথে সম্পৃক্ত। আর হত্যাকর্মই যন্ত্রের বিভিন্নতা দ্বারা বিভিন্ন হয়, প্রাণহানির নীচের ক্ষেত্রে বিভিন্ন হয় না, কেননা যন্ত্রের বিভিন্নতা দ্বারা অঙ্গ নষ্টকরা বিভিন্ন হয় না। সুতরাং সেখানে ইচ্ছাকৃত ভাবে করা অনিচ্ছাকৃত ভাবে করা ছাড়া আর কিছু বিদ্যমান থাকে না।

প্রাণহানির চেয়ে নীচের অংগহানীতে পুরুষ ও স্ত্রীলোকের মাঝে স্বাধীন ও গোলামের মাঝে এবং দুই গোলামের মাঝে কোন কিসাস নেই।

এ সকল ক্ষেত্রে শাফেয়ী (র) ভিন্ন মত পোষণ করেন, তবে স্বাধীন ব্যক্তি যদি গোলামের কোন অঙ্গ কর্তন করে, তাতে কিসাস ওয়াজিব হবেনা।

তিনি অঙ্গসমূহকে প্রাণের সঙ্গে বিবেচনা করেন। কেননা অঙ্গসমূহ প্রাণের সাথে সংশ্লিষ্ট।

আমাদের যুক্তি এই যে, (মালের মত) অঙ্গসমূহকেও (প্রাণ রক্ষার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে বিধায়) মালের পর্যায়ভুক্ত ধরা হয়। সুতরাং মূল্যগত তারতম্যের কারণে উভয়ের মাঝে সাদৃশ্যতা বিলুপ্ত হবে। আর মূল্যগত তারতম্যটি শরীয়াতের নির্ধারণের কারণে সুনিশ্চিত ভাবে জানা আছে। সুতরাং এই তারতম্য বিবেচনা করা সম্ভব। পক্ষান্তরে (ছোটত্ব ও বড়ত্বের কারণে) হাতের ধরণ ক্ষমতার তারতম্যের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা সেটা নির্ধারণের জন্য শরীয়ত নির্ধারিত কোন নিয়ম নেই।

পক্ষান্তরে প্রাণহানির বিষয়টিও ভিন্ন। কেননা সেখানে নষ্টকৃত বিষয় হলো রূহকে দেহ থেকে বের করে দেয়া। আর সে বিষয়ে কোন তারতম্য নেই।

আর মুসলমান ও কাফিরের মাঝে অঙ্গসমূহের ব্যাপারে কিসাস ওয়াজিব হবে।

কেননা দিয়তের ক্ষেত্রে উভয়ের মাঝে সমতা রয়েছে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেনঃ কেউ যদি কোন লোকের হাত অর্ধেক থেকে কর্তন করে কিংবা এমন জখম করে, যা উদর পর্যন্ত পৌঁছে যায় এবং সে সেই জখম থেকে আরোগ্য লাভ করে, তাহলে তার উপর কিসাস বর্তাবে না।

কেননা তাতে সাদৃশ্যতা বিবেচনা করা সম্ভব নয়। বস্তুত: প্রথমটি হলো হাড় ভাঙ্গা। আর তাতে কোন নির্ধারিত উপায় নেই। তদ্রূপ উদর পর্যন্ত পৌঁছা জখম থেকে আরোগ্য লাভ করা বিরল ব্যাপার। সুতরাং বাহ্যত দ্বিতীয়টি প্রাণনাশ পর্যন্ত গড়াবে।

আর যদি কর্তিত হাত সুস্থ হয়, পক্ষান্তরে কর্তনকারীর হাত অবশ হয়, কিংবা কম আঙ্গুল বিশিষ্ট হয় তাহলে যার হাত কর্তন করা হয়েছে, তাকে ইখতিয়ার দেয়া হবে। ইচ্ছা করলে সে দোষযুক্ত হাত কর্তন করবে, আর এ ছাড়া সে অন্য কিছু পাবে না। আর ইচ্ছা করলে সে পূর্ণ দিয়ত গ্রহণ করবে।

কেননা পূর্ণ হক উশুল করা সম্ভব নয়। সুতরাং তার অধিকার রয়েছে, তার হকের চেয়ে নীচের জিনিসের বিনিময়ে মাফ করে দেওয়ার। আবার বিনিময়ের দিকে রুজু করারও তার অধিকার রয়েছে। যেমন সদৃশ বস্তু যদি নষ্ট করে ফেলার পর মানুষের হাত থেকে তা উধাও হয়ে যায়, এরপর সে অসম্পূর্ণ ভাবে তা উশুল করে, তাহলে বোঝা যাবে যে, সে তাতে সম্মত রয়েছে; ফলে তার হক রহিত হয়ে যাবে। যেমন সে উৎকৃষ্ট জিনিসের স্থানে নিকৃষ্ট জিনিস গ্রহণে সম্মত হলো।

আর যদি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির ইখতিয়ার প্রয়োগের আগেই তার অবশ হাত খসে পড়ে, কিংবা জুলুম করে কর্তন করা হয়, তাহলে তার জন্য কোন দণ্ড সাব্যস্ত হবে না। এটা আমাদের হানাফীদের মত। কেননা তার হক তো নির্ধারিত ছিল কিসাসের ক্ষেত্রে। মালের দিকে তা স্থানান্তিরত হয়. শুধু তার ইখতিয়ার প্রয়োগের কারণে। সুতরাং ক্ষেত্র অবিদ্যমান হওয়ার কারণে কিসাস রহিত হয়ে যাবে।

পক্ষান্তরে যদি (অন্যের পক্ষ হতে) তার উপর সাব্যস্ত হকের কারণে, চাই সেটা কিসাস জনিত হক হোক, কিংবা চুরি জনিত হক হোক, যদি সেই হকের কারণে তার হাত কাটা যায়, তাহলে বিষয়টি ভিন্ন হবে, অর্থাৎ তার উপর দিয়ত ওয়াজিব হবে।

কেননা ঐ হাতটি দ্বারা সে একটি হক আদায় করেছে, যা তার উপর অবশ্য সাব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং গুণগতভাবে তার জন্য তা অক্ষত রয়েছে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেনঃ কেউ যদি কোন লোকের মাথায় জখম করে, আর (মাথা ছোট হওয়ার কারণে) উক্ত জখম মাথার দুই পার্শ্বের মধ্যবর্তী পুরো স্থান জুড়ে নেয় অথচ ঐ জখম আঘাতকারীর মাথার দুই পার্শ্বের মধ্যবর্তী পুরো স্থান জুড়ে নেয় না, তাহলে যার মাথায় জখম করা হয়েছে, সে ইখতিয়ার লাভ করবে। ইচ্ছা করলে তার জখমের সম পরিমাণ জখম দ্বারা কিসাস নেবে, মাথার দুদিকের যে দিক থেকে ইচ্ছা শুরু করতে পারবে। আর ইচ্ছা করলে দিয়ত গ্রহণ করতে পারবে।

কেননা মাথায় আঘাত যেহেতু দোষ সৃষ্টি করে, সেহেতু উক্ত আঘাত কিসাস ওয়াজিবকারী বলে গণ্য। সুতরাং আঘাতটি পরিমাণে বেশী হলে দোষও বৃদ্ধি পাবে। আর আঘাতকারীর মাথার দুই পার্শ্বের মধ্যবর্তী পুরো স্থান জুড়ে কিসাস উশুল করার

ক্ষেত্রে আঘাতকারীর 'কৃতকর্মের' চেয়ে বেশী উশুল করা হয়। আবার নিজের হক পরিমাণ কিসাস উশুল করলে আঘাত প্রাপ্ত ব্যক্তির সঙ্গে যে পরিমাণ দোষ (ও অসৌন্দর্য) যুক্ত হয়েছে, সে পরিমাণ দোষ আঘাতকারীর সঙ্গে যুক্ত হবে না। সুতরাং আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তির হক কম পরিমাণে অর্জিত হবে। তাই তাকে ইখতিয়ার প্রদান করা হবে। যেমন অবশ হাত এবং সুস্থ হাতের ক্ষেত্রে ইখতিয়ার দেয়া হয়।

এর বিপরীত ক্ষেত্রেও (অর্থাৎ আঘাত প্রাপ্তের মাথা আঘাতকারী মাথার চেয়ে বড় হওয়ার ক্ষেত্রে) আঘাত প্রাপ্ত ব্যক্তিকে ইখতিয়ার প্রদান করা হবে। কেননা (কিসাস) পূর্ণ রূপে উশুল করা সম্ভব হবে না। কারণ তার হক এর সীমা ছাড়িয়ে যাবে।[১]

তদ্রূপ যদি আঘাত মাথার লম্বালম্বিতে হয়, আর তা তার কপাল থেকে মাথার পিছন পর্যন্ত পৌঁছে যায়, অথচ আঘাতকারীর মাথার পিছন পর্যন্ত পৌঁছবে না, তখন আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তির ইখতিয়ার থাকবে।

কেননা আড়াআড়ি ও লম্বালম্বিতে জখমের কারণ ভিন্ন হয় না।

ইমাম কুদূরী (র) বলেনঃ জিহ্বার ক্ষেত্রে এবং পুরুষাঙ্গের ক্ষেত্রে কিসাস নেই।

আর ইমাম আবু ইউসুফ (র) হতে বর্ণিত রয়েছে যে, যদি জিহ্বা বা পুরুষাঙ্গ গোড়া থেকে কেটে ফেলা হয়, তাহলে কিসাস ওয়াজিব হবে। কেননা সে ক্ষেত্রে সমতা বিবেচনা করা সম্ভব।

আমাদের যুক্তি এই যে, তা সংকুচিত ও সম্প্রসারিত হয়, সুতরাং সমতা বিবেচনা করা সম্ভব নয়।

তবে যদি পুরুষাঙ্গের মাথা কেটে ফেলা হয়, তবে এর হুকুম ভিন্ন। কেননা কর্তনের স্থান সুনির্ধারিত রয়েছে, যেমন কব্জির ক্ষেত্রে। আর যদি পুরুষাঙ্গের মাথার অংশবিশেষ কর্তন করা হয় কিংবা পুরুষাঙ্গের অংশ বিশেষ কর্তন করা হয়, তাহলে সে ক্ষেত্রে কিসাস সাব্যস্ত হবে না। কেননা অংশ বিশেষের পরিমাণ সুনির্দিষ্ট ভাবে জানা যাবে না।

পক্ষান্তরে কানের সম্পূর্ণটুকু বা অংশবিশেষ কাটা হলে বিষয়টি ভিন্ন হবে, কেননা তা সংকুচিত ও সম্প্রসারিত হয় না। আর এর সুনির্দিষ্ট সীমা রয়েছে। সুতরাং (উভয়ের মাঝে) সমতা বিধান করা সম্ভব হবে।

আর ঠোঁট যদি চূড়ান্ত সীমা পর্যন্ত কেটে ফেলা হয়, তাহলে কিসাস ওয়াজিব হবে। কেননা এক্ষেত্রে সমতার বিষয়টি বিবেচনা করা সম্ভব। পক্ষান্তরে ঠোঁটের অংশবিশেষ কর্তন করা হলে বিষয়টি ভিন্ন হবে। কেননা সে ক্ষেত্রে সমতা বিবেচনা করা কঠিন হবে।

---

১. সুতরাং হয় সে দিয়াত গ্রহণ করবে, কিংবা আঘাতকারীর মাথায় এমনভাবে জখম করবে, যাতে উভয়ের অসৌন্দর্য একই রকম হয়। যদিও পরিমাণের দিক থেকে কম হবে। কেননা একই পরিমাণ জখম করলে আঘাতকারীর মাথার একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে চলে যাবে, তখন অসৌন্দর্য বেশী পরিমাণে হয়ে যাবে, যা তার প্রাপ্য হক নয়।

পরিচ্ছেদ ঃ আপোস মীমাংসা প্রসঙ্গে

ইমাম কুদূরী (র) বলেনঃ হত্যাকারী এবং নিহতের অভিভাবকরা যদি নির্ধারিত পরিমাণ মালের উপর আপোস মীমাংসা করে নেয়, তাহলে কিসাস রহিত হয়ে যাবে এবঙ মাল ওয়াজিব হবে, তা পরিমাণে অল্প হোক বা বেশী।

কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ·

যাকে তার ভাইয়ের পক্ষ হতে কোন কিছু মাফ করে দেয়া হয়, তাহলে কোমল আচরণের সঙ্গে তাগাদা করতে হবে এবং সদাচারের সাথে তার হাতে (প্রতিশ্রুত অর্থ) পরিশোধ করতে হবে। (২ঃ১৭৮)

কারো কারো মতে এই আয়াত আপোস মীমাংসা সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।

আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَاَهْلُهُ بَيْنَ خَيْرَتَيْنِ إِنْ شَاءُ أَقَادُ وَإِنْ شَاءُ أَخَذُ الدِّيَةَ ·

যাদের কোন লোক নিহত হয়েছে, তার নিকটজনদের দুটি বিষয়ের মাঝে ইখতিয়ার থাকবে, ইচ্ছা করলে তারা কিসাস গ্রহণ করবে, আর ইচ্ছা করলে দিয়ত বা অর্থদণ্ড গ্রহণ করবে।

আর আল্লাহ অধিক অবগত, হাদীসের উদ্দেশ্য ঘাতকের সম্মতিক্রমে দিয়ত গ্রহণ। যেমন আমরা বর্ণনা করে এসেছি। আর হুবহু এটাই হলো সমঝোতা!

তাছাড়া যুক্তিগত কারণ এই যে, কিসাস হলো ওয়ারিসদের পক্ষে সাব্যস্ত হক। যাতে ক্ষমার ভিত্তিতে রহিতকরণ কার্যকর হয়, সুতরাং বিনিময়ের ভিত্তিতে রহিতকরণও সাব্যস্ত হবে। কেননা বিনিময় গ্রহণের বিষয়টি অভিভাবকদের পক্ষ হতে সদাচার এবং ঘাতককে জীবিত রাখা অন্তর্ভুক্ত করে। সুতরাং পারস্পরিক সম্মতির মাধ্যমে তা জাইয হবে। আর এ ক্ষেত্রে অল্প ও বেশী সমান। কেননা এ সম্পর্কে পরিমাণ নির্ধারক কোন 'নাছ' বা স্পষ্টভাষ্য নেই। সুতরাং তাদের উভয়ের সমঝোতার উপর তা সোর্পদ করা হবে। যেমন খোলা তালাক ও এ জাতীয় বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে হয়ে থাকবে।

আর যদি নগদ বা বাকী কোনটাই উল্লেখ না করে থাকে, তাহলে তা নগদ হবে। কেননা এটা (পারস্পরিক সম্মতির মাধ্যমে) সম্পন্ন চুক্তি বলে সাব্যস্ত মাল। আর এ ধরনের ক্ষেত্রে নগদ হওয়াই অবস্থা, যেমন মোহর ও বিক্রয়মূল্যের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

পক্ষান্তরে দিয়তের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা তা চুক্তি বলে ওয়াজিব হয়।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেনঃ হত্যাকারী যদি স্বাধীন ব্যক্তি ও গোলাম (এ দুজন) হয়, আর স্বাধীন ব্যক্তি ও গোলামের মনিব যদি কোন লোককে তাদের কিসাসের বিপরীতে এক হাজার দিরহামের বিনিময়ে সমঝোতা করার আদেশ দেয়, তাহলে এক হাজার দিরহাম উক্ত স্বাধীন ব্যক্তি ও মনিব উভয়ের উপর অর্ধেক অর্ধেক করে ওয়াজিব হবে।

কেননা সমঝোতা চুক্তিকে তাদের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে।

আর যদি ওয়ারিছদের কোন একজন কিসাস মাফ করে দেয় কিংবা কিসাসে তার প্রাপ্য হকের বিপরীতে কোন বিনিময়ের উপর সমঝোতা করে ফেলে, তাহলে কিসাস থেকে অন্যদের হকও রহিত হয়ে যাবে। এবং দিয়ত থেকে তাদের প্রাপ্য হিসসা তাদের অনুকূলে সাব্যস্ত হবে।

এ সিদ্ধান্তের ভিত্তি এই যে, কিসাস হলো ওয়ারিসদের হক, তদ্রূপ দিয়তও ওয়ারিছদের হক, তবে স্বামী স্ত্রীর ক্ষেত্রে ইমাম মালিক ও শাফেয়ী (র) ভিন্নমত পোষণ করেন।

তাদের যুক্তি এই যে, ওরাসাত বা উত্তরাধিকার হচ্ছে ওয়ারিসদের পক্ষ হতে মূরিছ[১] এর স্থলবর্তীতা আর তা নসব দ্বারা সাব্যস্ত হয়, সবববা উদ্ভূত সূত্র দ্বারা সাব্যস্ত হয় না। কেননা উদ্ভূত সূত্র মৃত্যুর মাধ্যমে কর্তিত হয়ে যায়।

আমাদের প্রমাণ এই যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশয়ামে যাবাবীর স্ত্রীকে আশয়ামের দিয়তের উত্তরাধিকার প্রদানের আদেশ করেছিলেন।

তাছাড়া যুক্তিগত কারণ এই যে, কিসাস বা দিয়ত এমন একটি হক, যাতে মীরদ কার্যকর হয়। এমন কি কেউ যদি দুই পুত্র রেখে নিহত হয়, আর দু'জনের একজন একপুত্র রেখে মারা যায়, তাহলে কিসাস ঔরসজাত পুত্র এবং পুত্রের পুত্রের মাঝে সম্মিলিত হবে। সুতরাং কিসাস ও দিয়ত সকল ওয়ারিসদের জন্য সাব্যস্ত হবে। আর উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে মৃত্যুর পরও বৈবাহিক সম্পর্ক গুণগতভাবে বিদ্যমান থাকে।

কিংবা কিসাস বা দিয়ত মৃত্যুর পর তথা জখমের দিকে সম্পর্কিত অবস্থায় সাব্যস্ত হবে।

মোট কথা, কিসাসের হক যখন ওয়ারিসদের জন্য সাব্যস্ত হলো, তখন তাদের প্রত্যেকে তা উশুল করতে এবং ক্ষমা বা সমঝোতার ভিত্তিতে তা রহিত করতে সক্ষম।

আর কিসাসের ক্ষেত্রে কোন একজনের হক রহিত হয়ে যাওয়ার অনিবার্য ফল হলো, তাতে অন্যদের হকও রহিত হয়ে যাওয়া। কেননা তা বিভাজনযোগ্য নয়।

পক্ষান্তরে যদি দু'জন লোককে হত্যা করা হয়, আর দুই নিহতের অভিভাবকদের একজন যদি কিসাস মাফ করে দেয়, তাহলে অপর অভিভাবকের কিসাসের অধিকার বহাল থাকবে। কেননা সেখানে সন্দেহাতীত রূপে দুটি কিসাস ওয়াজিব হয়েছে। কারণ হত্যাকর্ম ও নিহত ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন। পক্ষান্তরে এখানে (আমাদের আলোচ্য ক্ষেত্রে) একটি কিসাস সাব্যস্ত হবে। কারণ হত্যাকর্ম ও নিহত ব্যক্তি উভয়টি অভিন্ন।

আর কিসাস যখন রহিত হয়ে যাবে, তখন অবশিষ্টদের প্রাপ্য হিসসা মালে রূপান্তরিত হবে। কেননা কিসাস এমন একটি কারণে রহিত হয়েছে, যা হত্যাকারীর সঙ্গে সম্পৃক্ত।

---

১. মূরিছ (مورث) অর্থ মৃত ব্যক্তি, যার পক্ষ হতে উত্তরাধিকার সম্পদ ওয়ারিসগণ লাভ করে।

তবে মাফকারী ওয়ারিছ দিয়তের কোন হিসসা পাবে না। কেননা সে নিজের কর্ম দ্বারা এবং নিজের সম্মতিক্রমে নিজের হক রহিত করেছে।

এরপর দিয়তের যে পরিমাণ মাল ওয়াজিব হবে, তা তিন বছরের মেয়াদে ওয়াজিব হবে।

আর যুফার (র) বলেনঃ কিসাস যদি দুই শরীকের মাঝে মিলিত হয়, আর দু'জনের একজন যদি মাফ করে দেয়, তাহলে দিয়ত দুই বছরের মেয়াদে সাব্যস্ত হবে। কেননা কিসাস মাফ করার মাধ্যমে অর্ধেক দিয়ত ওয়াজিব হচ্ছে। সুতরাং এটাকে ভুলক্রমে হস্তকর্তনের সাথে বিবেচনা করা হবে।

আমাদের যুক্তি এই যে, এটা হচ্ছে রক্তের বিনিময়ের অংশবিশেষ। আর রক্তের সমগ্র বিনিময় তিন বছর মেয়াদি হয়, সুতরাং রক্তের বিনিময়ের অংশবিশেষও তিনবছর মেয়াদী হবে।

আর ভুলক্রমে হাত কর্তনের ক্ষেত্রে অঙ্গের সমগ্র দিয়ত ওয়াজিব হয়, এবং শরীয়ত মতে তাতে দুই বছরের মেয়াদে সাব্যস্ত হয়।

আর ঘাতকের নিজের মাল থেকে দিয়ত পরিশোধ করা ওয়াজিব হবে। কেননা এটা ইচ্ছাকৃত হত্যা।

ইমাম কুদূরী (র) বলেনঃ একটি দল যদি একজন মানুষকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে, তাহলে সকলের থেকে কিসাস গ্রহণ করা হবে।

কেননা, এ সম্পর্কে 'উমর (রা) বলেছেনঃ যদি 'ছান্‌আবাসী' সকলে তাকে হত্যা করার ব্যাপারে জড়িত হতো তাহলে আমি তাদের সকলকে কিসাস রূপে হত্যা করতাম।

তাছাড়া যুক্তিগত কারণ এই যে, 'মুখবন্ধ' হয়ে হত্যা করাটাই প্রবল, আর কিসাস প্রবর্তনের উদ্দেশ্য হলো নির্বোধ লোকদেরকে ভীতি প্রদর্শন ও হুঁশিয়ারকরণ। সুতরাং জীবন রক্ষার হিকমত বাস্তবায়নের জন্য সবার উপর কিসাস ওয়াজিব হবে।

আর যদি একজন একটি জামাতকে হত্যা করে, আর নিহতদের অভিভাবকগণ উপস্থিত হয়, তখন তাদের সবার পক্ষে তাকে হত্যা করা হবে, এছাড়া আর কিছু তাদের পক্ষে সাব্যস্ত হবে না।

আর যদি নিহতদের একজনের অভিভাবক উপস্থিত হয়, তাহলে তার পক্ষেই তাকে হত্যা করা হবে, আর অন্যান্য নিহতের অভিভাবকদের হক রহিত হয়ে যাবে।

আর ইমাম শাফেয়ী (র) বলেনঃ নিহতদের মাঝে যাকে প্রথমে হত্যা করা হয়েছে, তার বিপরীতে তাকে হত্যা করা হবে আর অন্যদের পক্ষে দিয়তের মাল ওয়াজিব হবে। আর যদি অভিভাবকরা একত্র হয়, কিন্তু প্রথম নিহত কে, তা জানা না যায়, তাহলে তাদের সবার পক্ষে তাকে হত্যা করে হবে, আর দিয়তসমূহ তাদের মাঝে বন্টন করা হবে। আর কারো কারো মতে তাদের মাঝে লটারী করা হবে, যার নাম বের হবে, তার পক্ষে তাকে হত্যা করা হবে।

ইমাম শাফেয়ী (র) এর যুক্তি এই যে, একজন থেকে কয়েকটি হত্যা সম্পন্ন হয়েছে, আর সেই একজনের ক্ষেত্রে একটি হত্যা সাব্যস্ত হয়েছে, সুতরাং উভয়ের মাঝে সমতা নেই। প্রথম ছুরতের (অর্থাৎ এক জামাতের দ্বারা একজন নিহত হওয়ার) ক্ষেত্রেও কিয়াসের দাবী এটাই। তবে তার বিধান শরীয়ত থেকে জানা গেছে;(তাই সে ক্ষেত্রে কিয়াস বর্জিত হয়েছে।)

আমাদের যুক্তি এই যে, নিহতদের অভিভাবকদের মধ্য হতে প্রত্যেক (কিসাসের সূত্রে) পূর্ণাঙ্গ পর্যায়ের হত্যাকারী। ফলে (হত্যাকারীর সঙ্গে প্রত্যেক নিহতের অভিভাবকের মাঝে) সাদৃশ্যতা এসেছে। এই সাদৃশ্যতা সাব্যস্ত হওয়ার মূল হচ্ছে প্রথম ছুরতটি। কেননা প্রথম ছুরতে যদি সাদৃশ্যতা সাব্যস্ত না হতো, তাহলে কিসাস ওয়াজিব হতো না।[১]

তাছাড়া দ্বিতীয় যুক্তি এই যে, (গুণগতভাবে) অভিভাবকদের প্রত্যেকের পক্ষ হতে এমন একটি জখম করা সম্পন্ন হয়েছে, যা প্রাণনাশের উপযুক্ত।[২] সুতরাং কিসাসরূপে হত্যাকর্মটি প্রত্যেকের দিকে সম্বন্ধযুক্ত হবে। কেননা তা বিভাজন যোগ্য নয়।

তাছাড়া আরেকটি কারণ এই যে, জীবন রক্ষায় হিকমত বাস্তবায়নের জন্য বিরোধী গুণ (তথা মানব প্রাণের হুরমত ও সম্মানযোগ্যতা) বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কিসাস) শরীয়তকর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। আর হত্যাকারীকে হত্যা করা দ্বারাই এই উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে। সুতরাং সেটাকেই যথেষ্ট মনে করা হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেনঃ যার উপর কিসাস ওয়াজিব হয়েছে, সে মারা গেলে কিসাস রহিত হয়ে যাবে।

কেননা কিসাস উশুল করার ক্ষেত্র বিলুপ্ত হয়েছে। সুতরাং বিষয়টি হত্যা অপরাধ সংঘটনকারী গোলামের মৃত্যুর সদৃশ হল। এক্ষেত্রেও ইমাম শাফেয়ী (র) এর মতপার্থক্য সাব্যস্ত হতে পারে। কেননা তাঁর মতে ওয়াজিব বিধান হল (কিসাস বা দিয়ত) দু'টির একটি।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ দু'জন লোক যদি একজন লোকের হাত কেটে ফেলে, তাহলে দুজনের কারো উপর কিসাস ওয়াজিব হবে না, বরং তাদের উভয়ের উপর অর্ধেক হারে দিয়ত ওয়াজিব হবে।

---

১. অর্থাৎ প্রথম ছুরতে একজন নিহতের বিপরীতে পূরা জামাতকে হত্যা করা হবে, এ সিদ্ধান্ত সর্বসম্মত। অথচ একদল ঘাতক এবং একজন নিহতের মাঝে যদি সাদৃশ্যতা সাব্যস্ত না হবে, তাহলে কিসাস ওয়াজিব হতো না। আর সাদৃশ্যতা সাব্যস্ত হওয়ার অর্থ এই যে, ঘাতকদলের প্রত্যেককে পূর্ণাঙ্গ হত্যাকারী বিবেচনা করা হয়েছে। সুতরাং ঘাতক হিসাবে এক জামাত যদি একজনের সদৃশ হয় তাহলে বিপরীত দিক থেকেও অর্থাৎ নিহত হওয়ার দিক থেকে এক জামাত একজন ঘাতকের সদৃশ হবে। কেননা দুই বস্তুর মাঝে সমতা ও সাদৃশ্যতা উভয় দিক থেকেই সাব্যস্ত হয়ে থাকে। মোট কথা, অপরাধ হিসাবে সংঘটিত হত্যাকাণ্ড এবং কিসাসরূপে সংঘটিত হত্যাকাণ্ড একই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার্য হবে।

২. কেননা সকলে যখন উপস্থিত হন এবং কাযী কিসাসের ফায়সালা প্রদান করলেন, তখন হয় সকলে নিজস্বভাবে তাদের হক উশুল করবে কিংবা একজন অপরজনকে নিজের হকের ব্যাপারে ওকীল বানাবে। কিংবা অন্য কাউকে (যেমন জল্লাদকে) ওকীল নিযুক্ত করবে; সেক্ষেত্রে ওকীলের কর্ম মুআক্কিলের কর্মরূপে গণ্য হবে। সুতরাং প্রাণনাশের উপযোগী জখম প্রত্যেকের পক্ষ হতে অস্তিত্ব লাভ করবে।

আর ইমাম শাফেয়ী (র) বলেনঃ উভয়ের হাত কাটা হবে। আর মাসআলাটির কল্পিত রূপ এই যে, উভয়ে একটি ছুরি ধরেছে এবং লোকটার হাতে পোঁচ দিয়েছে, ফলে তা কাটা গেছে।

ইমাম শাফেয়ী (র) বিষয়টিকে প্রাণনাশের উপর কিয়াস করেন। কেননা হাত (ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ) প্রাণের অনুবর্তী। সুতরাং তা প্রাণের বিধান গ্রহণ করবে। কিংবা প্রাণনাশ ও হস্তকর্তনের কিসাসের মাঝে ভীতিসঞ্চারের যোগসূত্র দ্বারা বিধানের অভিন্নতা সাব্যস্ত করা হবে।

আমাদের যুক্তি এই যে, উভয়ের প্রত্যেকেই হাতের অংশ বিশেষ কর্তনকারী। কেননা উভয়ের ভার প্রয়োগের দ্বারা কর্তন সম্পন্ন হয়েছে। আর কর্তনের ক্ষেত্র তথা হাত বিভাজনযোগ্য। সুতরাং উভয়ের প্রত্যেকের দিকে কর্তনের অংশবিশেষ সম্পর্কিত হবে। সেক্ষেত্রে (অপরাধরূপে কর্তন এবং কিসাসরূপে কর্তন, উভয়ের মাঝে) সাদৃশ্যতা সাব্যস্ত হবে না।

অপরাধ রূপে কর্তন এবং কিসাস রূপে কর্তন, উভয়ের মাঝে প্রাণের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা প্রাণের বিলুপ্তি বিভাজনযোগ্য নয়।

তাছাড়া আরেকটি কারণ এই যে, সাহায্যকারী দল এসে পড়ার সম্ভাবনার কারণে, সতর্কতা হিসাবে সংঘবদ্ধ হয়ে হত্যাকরাই সচারচর অবস্থা। পক্ষান্তরে কব্জি থেকে হাত কর্তনের ক্ষেত্রে সংঘবদ্ধতা বিরল। কেননা হস্তকর্তনের জন্য কিছু ধীর পূর্ব প্রস্তুতির প্রয়োজন হয়, (যেমন হাত বাঁধা এবং ছুরি চালানো) ফলে সাহায্যকারী দল এসে পৌছার সুযোগ থাকে। (সুতরাং হস্ত কর্তনের ক্ষেত্রে সংঘবদ্ধতা কোন কাজে আসে না)।

আর তাদের উপর অর্ধেক দিয়ত আসবে। কেননা এটাই হলো একটি হাতের দিয়ত। আর তারা উভয়ে তা কর্তন করেছে।

আর যদি একজন দুই ব্যক্তির দুই হাত কেটে ফেলে এবং উভয়ে উপস্থিত হয়, তাহলে উভয়ের অধিকার আছে তার হস্ত কর্তনের এবং তার থেকে অর্ধ দিয়ত গ্রহণ করে উভয়ের মাঝে অর্ধেক করে বণ্টন করার। চাই উভয়ের হাত এক সঙ্গে কর্তন করুক, কিংবা পরপর কর্তন করুক।

আর ইমাম শাফেয়ী (র) বলেনঃ পরপর কর্তনের ক্ষেব ত্রে প্রথম জনের বিপরীত তার হস্তকর্তন হবে। আর একত্রে কর্তনের ক্ষেত্রে লটারী করা হবে।

কেননা, প্রথম জন আগেই কর্তনকারীর হাতের হক হয়ে গেছে। সুতরাং তাতে দ্বিতীয় জনের হক সাব্যস্ত হবে না। যেমন একখানে বন্ধক রাখার পর অন্যখানে বন্ধক রাখা। আর একত্র কর্তনের ক্ষেত্রে একটি হাত দুটি হকের জন্য যথেষ্ট হবে না। সুতরাং লটারীর মাধ্যমে অগ্রগণ্যতা সাব্যস্ত হবে।

আমাদের যুক্তি এই যে, হকদার হওয়ার কারণ (তথা কর্তন) এর ক্ষেত্রে উভয়ে সমান। সুতরাং (কারণ এর কার্য) তথা বিধানের ক্ষেত্রে উভয়ে সমান হবে। যেমন (দেনাদার) পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে দুই পাওনাদারের হকের বিষয়টি। আর কিসাস অর্থ

কর্মগত মালিকানা লাভ, যা বিপরীত গুণের বিদ্যমানতা সত্ত্বেও সাব্যস্ত হয়। সুতরাং হক উশুল করার ক্ষেত্রেই শুধু মালিকানা প্রকাশ পাবে। পক্ষান্তরে ক্ষেত্রটি মালিকানা সাব্যস্ত থেকে মুক্ত থাকবে। সুতরাং তা দ্বিতীয় জনের মালিকানা সাব্যস্ত হওয়াকে বাধা দেবে না।

বন্ধক প্রদানের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা (বন্ধক গ্রহণকারীর পাওনা উশুল করার) হক স্বয়ং ক্ষেত্রটিতে সাব্যস্ত হয়। সুতরাং বিষয়টি এমন হলো যে, গোলাম পরপর দু'জনের হাত কেটে ফেললো। তখন উভয়ের পক্ষে গোলামের দেহসত্তার হক সাব্যস্ত হয়।

আর যদি দু'জনের একজন উপস্থিত হয় এবং কিসাস রূপে তার হস্তকর্তন সম্পন্ন হয়ে যায়, তখন তার বিপক্ষে অপরজনের অনুকূলে অর্ধেক দিয়ত সাব্যস্ত হবে।

কেননা উপস্থিত ব্যক্তির নিজের হক উশুল করার অধিকার রয়েছে। কারণ তার হক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পক্ষান্তরে অনুপস্থিত ব্যক্তির হক সাব্যস্ত হওয়া দ্বিধাপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। কেননা সে মাফ করে দিতে পারে বা হাজির না হতে পারে, সুতরাং দ্বিধান্বিত হকের অপেক্ষায় সুনিশ্চিত হক বিলম্বিত হতে পারে না। যাই হোক, উপস্থিত ব্যক্তি যখন তার হক উশুল করে নিল, তখন (পরবর্তী জনের) হক উশুল করার ক্ষেত্র বাকি থাকলো না। সুতরাং অপরজনের হক দিয়তের ক্ষেত্রে সুনির্ধারিত হয়ে গেল। কেননা সে উক্ত অঙ্গ দ্বারা একটি প্রাপ্য হক আদায় করেছে।[১]

ইমাম কুদূরী (র) বলেনঃ গোলাম যদি ইচ্ছাকৃত হত্যার কথা স্বীকার করে, তাহলে তার উপর কিসাস ওয়াজিব হবে।

আর ইমাম যুফার (র) বলেনঃ তার স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা, তা মনিবের হক বাতিল করার সমান্তরাল হয়। সুতরাং সেটা গোলামের পক্ষ হতে মালের স্বীকারোক্তির মত হলো।

আমাদের যুক্তি এই যে, যেহেতু এই স্বীকারোক্তি দ্বারা সে ক্ষতিগ্রস্ত, সেহেতু এ বিষয়ে সে অভিযুক্ত নয়। সুতরাং তার স্বীকারোক্তি গ্রহণ করা হবে।

তাছাড়া দ্বিতীয় কারণ এই যে, মানব সত্তার দিক বিবেচনায় রক্ত বা প্রাণের ক্ষেত্রে গোলামকে মূল স্বাধীনতার উপর বহাল রাখা হয়েছে। (অর্থাৎ তার প্রাণসত্তাকে স্বাধীন ধরা হয়েছে) এ কারণেই তার বিপক্ষে মনিবের হদ ও কিসাস সংক্রান্ত কোন স্বীকারোক্ত গ্রহণযোগ্য হয় না।

---

১. অর্থাৎ যেহেতু সে তার পূর্ণ অঙ্গ দ্বারা তার বিপক্ষে প্রাপ্য একটি হক আদায় করেছে, সেহেতু অপরজনের হক দিয়ত দ্বারা আদায় করবে। পক্ষান্তরে জানের কিসাসের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা সেক্ষেত্রে যদি একজন কিসাস উশুল করে নেয়, তারপর একজন উপস্থিত হয়, সেক্ষেত্রে তার অনুকূলে কিছু সাব্যস্ত হয় না। কেননা তার অনুপস্থিতির কারণে তার উশুল করার হক বিলুপ্ত হয়েছে। কারণ উভয়ে একত্রে হাজির হলে এবং হক উশুল করলে উভয়েই নিজেদের পূর্ণাঙ্গ হক উশুলকারী হতো। সুতরাং কিসাসের দিয়ত ওয়াজিব হবে না। পক্ষান্তরে হস্তকর্তনের ক্ষেত্রে উভয়ের উপস্থিত অবস্থায়ও এক অঙ্গ দ্বারা উভয়ের হক পূরা হয় না। ফলে হাত কর্তনের সঙ্গে দিয়ত ওয়াজিব করতে হয়।

আর মনিবের হক নাকচ হওয়া অনিবার্য পার্শ্ব বিষয় হিসাবে সাব্যস্ত হচ্ছে। সুতরাং সেটার পরোওয়া করা হবে না।

আর কেউ যদি কোন ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে ইচ্ছাকৃতভাবে তীর নিক্ষেপ করে, এবং তীর তাকে ভেদ করে অন্য একজনকেও বিদ্ধ করে এর ফলে উভয়ে মারা যায় তাহলে প্রথমজনের বিপরীতে তার উপর কিসাস ওয়াজিত হবে। আর দ্বিতীয় জনের বিপরীতে তার আকিলাহদের বা দিয়াত আদায়কারীদের উপর দিয়ত সাব্যস্ত হবে।

কেননা প্রথমটি হলো ইচ্ছাকৃত হত্যা, আর দ্বিতীয়টি হলো ভুলক্রমে হত্যার দুই প্রকারের এক প্রকার। যেন সে শিকারের দিকে তীর ছুঁড়লো আর কোন মানুষের গায়ে তা লেগে গেল। আর প্রতিক্রিয়ার বিভিন্নতা দ্বারা একটি কর্মকে বিভিন্ন কর্ম বলে গণ্য করা হয়।

পরিচ্ছেদ ঃ একই ক্ষেত্রে একাধিক অপরাধ

কেউ যদি কোন ব্যক্তির হাত ভুলক্রমে কেটে ফেলে এরপর তার হাত সুস্থ হওয়ার আগে ইচ্ছাকৃতভাবে তাকে হত্যা করে, কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে তার হাত কেটে ফেলে তারপর ভুলক্রমে তাকে হত্যা করে কিংবা ভুলক্রমে তাকে হত্যা করে কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে তার হাত কেটে ফেলে এবং তা সুস্থ হয়ে যায়, তারপর ইচ্ছাকৃতভাবে তাকে হত্যা করে, তাহলে উভয় অপরাধের বিপরীতেই তাকে পাকড়াও করা হবে।

এ ক্ষেত্রে মূলনীতি এই যে, প্রথম জখমটির পরিপূরক সাব্যস্ত করে সমাপ্ত জখমকে যথা সম্ভব একই হুকুমভুক্ত করা জরুরী। কেননা হত্যা সাধারণত: লাগাতার আঘাত দ্বারা সম্পন্ন হয়। আর প্রতিটি আঘাতকে নিজস্বভাবে বিবেচনায় আনাতে কিছুটা অসুবিধা রয়েছে। (সুতরাং পরবর্তী আঘাতগুলিকে প্রথমটির পরিপূরক ধরে সবগুলি আঘাতকে অভিন্ন উদ্দেশ্যে পরিচালিত অভিন্ন আঘাত হিসাবে গণ্য করা হবে।)

আর উপরোল্লেখিত অবস্থাগুলির প্রথম দুই অবস্থায় উভয় আঘাতকে একত্র করা দুঃসাধ্য। কেননা উভয় আঘাতের হুকুম ভিন্ন। আর মাঝখানে আরোগ্য সাব্যস্ত হওয়ার কারণে শেষ দুটি অবস্থায় উভয় আঘাতকে একত্র করা অসম্ভব। কেননা আরোগ্য ক্ষতের সংক্রমণকে রোধ করে।

তাই যদি মাঝখানে আরোগ্য দেখা না দেয় আর উভয় কর্ম অভিন্ন শ্রেণীর হয়, যেমন উভয়টি ভুলক্রমে হলো, তাহলে সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে উভয় আঘাতকে একত্র করা হবে। কেননা (কর্ম দুটির শ্রেণীভিন্নতা না থাকার কারণে এবং মাঝখানে আরোগ্য না থাকার কারণে) উভয় কর্মকে একত্র করা সম্ভব। তাই উভয় কর্মের বিপরীতে একটি দিয়াতকে যথেষ্ট ধরা হবে।

আর যদি ইচ্ছাকৃতভাবে তার হাত কেটে ফেলে, এরপর তার হাত ভাল হওয়ার পূর্বেই ইচ্ছাকৃতভাবে সে তাকে হত্যা করে, তাহলে ইমাম বা শাসক ইচ্ছা করলে

(অভিভাবকদেরকে) বলতে পারেন যে, তোমরা প্রথমে তার হাত কাটো, তারপর তাকে হত্যা কর। আবার ইচ্ছা করলে বলতে পারেন, তোমরা তাকে হত্যা কর।

এটা ইমাম আবু হানীফা (র) এর মত। সাহেবায়ন (র) বলেনঃ তাকে শুধু হত্যা করা হবে, তার হাত কাটা হবে না।

কেননা উভয় কর্মের অভিন্ন শ্রেণী হওয়ার কারণে এবং মাঝখানে আরোগ্য সাব্যস্ত না হওয়ার কারণে, উভয় কর্মকে একত্র করা সম্ভব। সুতরাং উভয়কে একত্র করা হবে।

ইমাম আবু হানীফা (র) এর যুক্তি এই যে, উভয় কর্মকে একত্র করা অসম্ভব। আর অসম্ভব হওয়ার কারণ হলো এই দুটি কর্মের মাঝে ভিন্নতা। কেননা উভয় কর্মের বিধান হলো কিসাস। আর কিসাস কর্মের সমতার উপর নির্ভর করে। আর তা এভাবে সম্ভব যে, হত্যার বিনিময়ে হত্যা হবে, আর কর্তনের বিনিময়ে কর্তন হবে। আর (একত্র করা অবস্থায়) সমতা বিধান অসম্ভব। (কেননা এ অবস্থায় হস্তকর্তন শাস্তিবিহীন থেকে যাবে)।

কিংবা উভয় কর্মের একত্রীকরণ অসম্ভব হওয়ার কারণ এই যে, 'গর্দান কর্তন' ক্ষতের সংক্রমণকে হস্তকর্তনের দিকে সম্পৃক্ত করণকে রোধ করে। এজন্যই যদি ইচ্ছাকৃত কর্তন ও হত্যা পৃথক দুই ব্যক্তি থেকে সম্পন্ন হয় তাহলে হত্যাকারীর উপর কিসাস ওয়াজিব হবে। সুতরাং বিষয়টি মাঝখানে আরোগ্য লাভের মত হলো। পক্ষান্তরে যদি কর্তন করে, আর ক্ষত সংক্রমিত হয়, তাহলে বিষয়টি ভিন্ন হবে। কেননা (মৃত্যু রূপ পরিণতির বিচারে) উভয় কর্ম অভিন্ন। তদ্রূপ যদি উভয়টি ভুলক্রমে হয়, তাহলেও বিষয়টি ভিন্ন হবে। কেননা ভুলক্রমে কৃত অপরাধের ক্ষেত্রে বিধান হলো দিয়ত। আর তা সমতার বিবেচনা ছাড়া প্রাণের বিনিময় রূপে সাব্যস্ত।[১]

তাছাড়া হাতের দিয়ত ওয়াজিব হয়, যখন কর্তন কর্মের প্রতিক্রিয়া স্থির হয়ে যায়। (যেমন আরোগ্য লাভ দ্বারা) আর (আমাদের আলোচ্য ক্ষেত্রে) কর্তন কর্মের প্রতিক্রিয়া স্থির হয়েছে গর্দান কর্তন দ্বারা, যা সংক্রমণের সুযোগ বিলুপ্ত করে। সুতরাং (এখানে হাতের দিয়ত সাব্যস্ত করলে) একই অবস্থায় সমগ্রের ক্ষতিপূরণ এবং অংশের ক্ষতিপূরণ একত্র করা হয়। অথচ তা একত্র হতে পারে না।

পক্ষান্তরে ইচ্ছাকৃত হস্তকর্তন ও হত্যার ক্ষেত্রে উভয় কিসাস একত্র হতে পারে।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেনঃ কেউ যদি কোন লোককে চাবুকের একশটি আঘাত করে, আর নব্বইটি আঘাত থেকে সুস্থ হয়ে যায় কিন্তু দশটি আঘাতের জখমজনিত কারণে মারা যায়,[২] তাহলে তাতে একটি দিয়ত আসবে।

---

১. একটি দিয়ত ওয়াজিব হয়। অথচ কর্ম এখানে বিভিন্ন হয়েছে। কেননা ক্ষেত্র অভিন্ন। পক্ষান্তরে সবাই মিলে যদি একজনকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে তাহলে সবাইকে কিসাসরূপে হত্যা করা হবে। কেননা কিসাস হলো কর্মের শাস্তি। আর কর্মের একাধিকতা দ্বারা শাস্তি একাধিক হবে।

২. এর অর্থ এই যে, শরীরের একস্থানে নব্বইটি আঘাত করেছিল, আর অন্যস্থানে দশটি আঘাত করেছিল। তারপর নব্বইটি আঘাতের স্থান ক্ষত শুকিয়ে সুস্থ হয়ে গেল, আর দশটি আঘাতের স্থানে ক্ষত সংক্রমিত হয়ে মারা গেল।

কেননা নব্বইটি আঘাত থেকে যখন সে সুস্থ হয়ে গেলো, তখন শাস্তির ক্ষেত্রে তার বিবেচ্যতা বহাল থাকলেও দিয়তের ক্ষেত্রে তার বিবেচ্যতা বহাল থাকবে না। সুতরাং দশটির ক্ষেত্রে শুধু বিবেচ্যতা বহাল থাকবে। ইমাম আবু হানীফা (র) এর মূলনীতি অনুযায়ী এমন যে কোন জখমের একই হুকুম হবে, যা শুকিয়ে গেছে এবং তার চিহ্ন বিদ্যমান নেই।

আর এ ধরনের ক্ষেত্রে ইমাম আবু ইউসুফ (র) হতে বর্ণিত আছে যে, একজন ন্যায়বান ব্যক্তির বিচার বিবেচ্য হবে। আর ইমাম মুহম্মদ (র) হতে বর্ণিত আছে যে, তার উপর চিকিৎসকের খরচ ওয়াজিব হবে।

আর যদি কেউ কোন ব্যক্তিকে চাবুকের একশ আঘাত করে এবং তাকে জখম করে ফেলে; আর (শুকিয়ে যাওয়ার পরও) তার চিহ্ন থেকে যায়, তাহলে (দিয়ত সাব্যস্ত হবে না, বরং) একজন ন্যায়বান ব্যক্তির বিচার বিবেচ্য হবে।

কেননা জখমের চিহ্ন রয়ে গেছে। (আর চিহ্নের ক্ষেত্রে এটাই হলো বিধান।) পক্ষান্তরে দিয়ত ওয়াজিব হয় (দেহকে অতিক্রম করে) প্রাণ সত্তায় প্রভাবের বিষয়টি বিবেচনার ভিত্তিতে (যেমন ক্ষত নিরাময় হলো না)।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেনঃ কেউ যদি কোন লোকের হাত কেটে ফেলে, আর যার হাত কাটা হয়েছে সে ব্যক্তি যদি তার হাত কাটার অপরাধ মাফ করে দেয়, এর পর ঐ কর্তনের কারণে সে মারা যায়, তাহলে কর্তনকারীর উপর তার নিজস্ব মাল থেকে দিয়ত আদায় করা ওয়াজিব হবে। আর যদি সে কর্তন এবং কর্তন থেকে যে অবস্থা উদ্ভূত হবে তা মাফ করে দেয় আর একারণে সে মারা যায়, তাহলে তা দ্বারা প্রাণহানিও মাফ করা সাব্যস্ত হবে।

আর কর্তন যদি ভুলক্রমে হয়, তাহলে ক্ষমার বিষয়টি (অপরাধীর) একতৃতীয়াংশ মাল থেকে বিবেচ্য হবে। আর যদি ইচ্ছাকৃত হয়, তাহলে ক্ষমার বিষয়টি সমস্ত মাল থেকে বিবেচ্য হবে।

এটা ইমাম আবু হানীফা (র) এর মত। সাহেবায়ন (র) বলেনঃ যদি কর্তন অপরাধ মাফ করে তাহলে সেটা প্রাণহানি সম্পর্কেও মাফ বলে গণ্য হবে। একই মতপার্থক্য হবে যদি জখম মাফ করে দেয়, এরপর তা প্রাণঘাতী রূপে সংক্রমিত হয় এবং মারা যায়।

ছাহেবায়নের যুক্তি এই যে, 'কর্তন' মাফ করার অর্থ হলো কর্তনের বিধান থেকে অব্যাহতি দেয়া; আর তার বিধান হলো জখম সীমিত থাকা অবস্থায় কিসাস রূপে কর্তন; আর সংক্রমণ (ও মৃত্যুর) অবস্থায় হত্যা। সুতরাং কর্তন মাফ করার অর্থ হলো (সীমিত ও সংক্রমিত) উভয় প্রকার কর্তন মাফ করা। আর বিষয়টি জিনায়াত (বা অপরাধ) মাফ করে দেয়ার মত হলো। সেক্ষেত্রে সংক্রমিত ও সীমিত উভয় প্রকারের অপরাধই অন্তর্ভুক্ত হয়। সুতরাং এখানেও তাই হবে।

ইমাম আবু হানীফা (র) এর যুক্তি এই যে, দায় বহনের কারণ অস্তিত্ব লাভ করেছে, আর তা হচ্ছে নিরাপত্তা সম্পন্ন একটি ব্যক্তিকে হত্যা করা। আর ক্ষমা প্রত্যক্ষভাবে হত্যাকর্মকে অন্তর্ভুক্ত করেনি। কেননা সে শুধু 'কর্তন' মাফ করেছে, যা হত্যা থেকে ভিন্ন কর্ম। আর ক্ষতের সংক্রমণ দ্বারা প্রকাশ পেয়েছে যে, সম্পন্ন কর্মটি হলো হত্যা (নিছক কর্তন নয়।) সুতরাং তারও প্রাপ্য হক হলো হত্যা (অর্থাৎ যা মাফ করেছে তা তার হক নয়, আর যেটা তার হক সেটা সে মাফ করেনি।)

আর আমরা তার ক্ষতিপূরণ অবশ্যই সাব্যস্ত করছি। অথচ কিয়াসের দাবী হলো কিসাস ওয়াজিব হওয়া। কেননা কিসাস হলো ইচ্ছাকৃত হত্যার বিধান। তবে সূক্ষ্ম কিয়াস মতে দিয়ত ওয়াজিব হবে; কেননা ক্ষমার দৃশ্যত বিদ্যমানতা সন্দেহ সৃষ্টি করেছে আর তা কিসাস রহিত করে।

আর আমরা স্বীকার করি না যে, সংক্রমিত জখম কর্তনের একটি প্রকার এবং সংক্রমণ কর্তনের অবস্থা বিশেষ; বরং সংক্রমিত জখম সম্বলিত কর্তন সূচনা থেকেই হত্যা হিসাবে গণ্য। তদ্রূপ কর্তন হিসাবে এর কোন বিধান নেই। সুতরাং ক্ষমার বক্তব্য সেটাকে অন্তর্ভুক্ত করবে না।

পক্ষান্তরে জিনায়াত বা অপরাধ মাফ করার ঘোষণার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা এটা হলো জিন্‌স বা শ্রেণীবাচক শব্দ (সুতরাং তা সংক্রমিত ও সীমিত উভয় প্রকার আঘাতজনিত অপরাধকে অন্তর্ভুক্ত করবে।)

তদ্রূপ জখম এবং জখম থেকে যা উদ্ভূত হবে, তা মাফ করার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা এটা ক্ষতের সংক্রমণ এবং হত্যাকে মাফ করার ব্যাপারে প্রত্যক্ষ বক্তব্য।

আর কর্তন যদিও ভুলক্রমে ছিল, কিন্তু সকল ক্ষেত্রে মতৈক্যপূর্ণ ও মতানৈক্যপূর্ণ উভয় অবস্থায় ইমাম মুহম্মদ সেটাকে ইচ্ছাকৃত কর্তনের পর্যায়ভুক্ত ধরেছেন, এবং নিঃশর্ত উল্লেখ দ্বারা সেদিকে ইংগিত করেছেন। তবে তিনি ভুলক্রমে হলে ক্ষমাকে একতৃতীয়াংশ মাল থেকে গণ্য করেছেন আর ইচ্ছাকৃত হলে সমগ্রমাল থেকে গণ্য করেছেন। কেননা ইচ্ছাকৃত কর্মের বিধান হলো কিসাস। আর (মৃত্যুর পূর্বে) সেটার সাথে ওয়ারিছদের হক সম্পৃক্ত হয়নি। কেননা কিসাস মাল নয়। সুতরাং বিষয়টি এমন হলো যে, সে যেন তার জমি আরিয়াত (বিনামূল্যে সাময়িক ব্যবহারের জন্য) প্রদানের অছিয়ত করলো।

পক্ষান্তরে অনিচ্ছাকৃত কর্তনের বিধান যেহেতু মাল (দিয়ত); আর ওয়ারিছদের হক যেহেতু মালের সঙ্গে যুক্ত হয়, সেহেতু এ ক্ষেত্রে তার ক্ষমা এক তৃতীয়াংশ মাল থেকে বিবেচিত হবে।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেনঃ কোন স্ত্রীলোক যদি কোন পুরুষের হস্তকর্তন করে, আর ঐ পুরুষ তার হস্তকর্তনের দিয়তের বিনিময়ে তাকে বিবাহ করে। এরপর লোকটি ঐ জখমজনিত কারণে মারা যায়[১] তাহলে স্ত্রী মোহরে মেছেল লাভ করবে।

১. মোহরে মেছেল ওয়াজিব হওয়ার জন্য মারা যাওয়ার শর্ত আরোপের কারণ এই যে, যদি মারা না যায়, বরং ভালো হয়ে যায়, তাহলে বোঝা যাবে যে, এই কর্তনের বিধান হলো দিয়ত, কিসাস নয়। কেননা পুরুষ ও নারীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাঝে কিসাস কার্যকর হয় না, দিয়ত কার্যকর হয়। আর দিয়ত মোহর হওয়ার যোগ্যতা রাখে। সুতরাং মোহর নির্ধারণ সহীহ হলো এবং তা হলো পাঁচ হাজার দিরহাম।

আর স্ত্রীর আকিলাহ্ বা নিকট আত্মীয়র উপর দিয়ত আসবে। যদি কর্তন ভুলক্রমে হয়ে থাকে। আর যদি ইচ্ছাকৃত হয়, তাহলে তার নিজের মাল থেকে দিয়ত দিতে হবে।

এটা ইমাম আবু হানীফা (র) এর মত।

কেননা ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে, হস্তকর্তন মাফ করা যেহেতু হস্তকর্তন থেকে যা উদ্ভূত হবে (অর্থাৎ প্রাণহানি) সেটা মাফ করা নয়; সেহেতু হস্তকর্তনের বিনিময়ে বিবাহ করার অর্থ, হস্তকর্তন থেকে যা উদ্ভূত হবে তার বিনিময়ে বিবাহ কর নয়।

এরপর হস্তকর্তন যদি ইচ্ছাকৃত হয়, তাহলে এটা হবে অঙ্গের কিসাসের বিনিময়ে বিবাহ করা। অথচ কিসাস মাল নয়। সুতরাং তা মোহর হতে পারে না, বিশেষত: কিসাস রহিত হওয়ার অবস্থায়। সুতরাং মোহরে মেছেল ওয়াজিব হবে।

আর স্ত্রীর উপর তার মাল থেকে দিয়ত দেওয়া ওয়াজিব হবে। কেননা বিবাহ যদিও ক্ষমাকে অন্তর্ভুক্ত করে, যেমন ইনশাআল্লাহ আমরা বর্ণনা করবো; কিন্তু এই অবস্থায় সেটা হবে অঙ্গের জন্য সাব্যস্ত কিসাস ক্ষমা করা। পক্ষান্তরে কর্তনের ক্ষত যদি সংক্রমিত হয়, তাহলে প্রকাশ পাবে যে, এটা (হস্তকর্তন নয়, বরং) প্রাণনাশ। আর ক্ষমার বক্তব্য সেটাকে অর্ন্তভুক্ত করেনি, সুতরাং দিয়ত ওয়াজিব হবে। আর ইচ্ছাকৃত অপরাধ হওয়ার কারণে তার নিজের মাল থেকে দিয়ত আদায় করা ওয়াজিব হবে। অবশ্য কিয়াসের দাবী হলো কিসাস ওয়াজিব হওয়া, যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করে এসেছি। আর যখন স্ত্রীর জন্য মোহরে মেছেল সাব্যস্ত হলো এবং তার উপর দিয়ত সাব্যস্ত হলো, তখন উভয়টি সমান সমান হলে কাটাকাটি হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে দিয়ত উদ্বৃত্ত থাকলে স্বামীর ওয়ারিছদের কাছে তা পরিশোধ করতে হবে। আর যদি মোহর উদ্বৃত্ত থাকে তাহলে ওয়ারিছরা স্ত্রীকে তা পরিশোধ করবে।

পক্ষান্তরে হস্তকর্তন ভুলক্রমে হলে, এটা হবে হাতের দিয়তের বিনিময়ে বিবাহ। কিন্তু কর্তনের ক্ষত যদি প্রাণনাশ পর্যন্ত সংক্রমিত হয়, তাহলে প্রকাশ পাবে যে, হস্তকর্তনের কোন দিয়ত ছিল না এবং উল্লেখকৃত মোহর অস্তিত্বহীন। সুতরাং মোহরে মেছেল ওয়াজিব হবে। যেমন যদি হাতের মুঠোয় যে মাল আছে, তার বিনিময়ে কেউ কোন স্ত্রীলোককে বিবাহ করলো অথচ দেখা গেল যে, হাতে কিছুই নেই।

এক্ষেত্রে অবশ্য দুইয়ের মাঝে কাটাকাটি হবে না। কেননা ভুলক্রমে অপরাধ সংঘটনের ক্ষেত্রে দিয়ত আকিলাহদের উপর ওয়াজিব হয়, আর মোহর হবে তার নিজস্ব।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেনঃ হস্তকর্তন এবং তা থেকে যা উদ্ভূত হবে সেটার বিনিময়ে কিংবা সংঘটিত অপরাধের বিনিময়ে যদি স্ত্রীলোকটিকে বিবাহ করে, এরপর ঐ কারণে মারা যায়, আর হস্তকর্তন ইচ্ছাকৃত হয়ে তাকে, তাহলে সে মোহরে মেছেল পাবে।

কেননা এটা হলো কিসাসের বিনিময়ে বিবাহ। আর তা মোহর হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। সুতরাং মোহরে মেছেল ওয়াজিব হবে। যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করে এসেছি। আর বিষয়টি এমন হবে যে, সে তাকে মদ বা শূকরের বিনিময়ে বিবাহ করলো। আর স্ত্রী লোকটির উপর দিয়ত বা কিসাস কিছুই ওয়াজিব হবে না।

কেননা সে যখন কিসাসকে মোহর ধার্য করেছে, তখন বোঝা গেল যে, মোহরের দিক থেকে কিসাস রহিত হওয়ার বিষয়ে সে সম্মত ছিল। সুতরাং মূল থেকেই তা রহিত হয়ে যাবে। যেমন যদি এই শর্তে কিসাস রহিত করে যে, তা মালে রূপান্তরিত হবে, তাহলে মূল থেকেই তা রহিত হয়ে যাবে।

আর যদি হস্তকর্তন ভুলক্রমে হয়, তাহলে আকিলাদের (উপর পুরুষের অনুকূলে দিয়ত ওয়াজিব হবে, তবে তাদের) থেকে মোহরে মেছেল পরিমাণ রহিত হয়ে যাবে। তদুপরি দিয়ত পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত মোহরে মেছেলের অতিরিক্ত যে মাল সে রেখে গেছে তার এক তৃতীয়াংশ আকীলাহদের জন্য অছিয়ত রূপে সাব্যস্ত হবে। কেননা এটা হলো দিয়তের বিনিময়ে বিবাহ। আর দিয়ত মোহর হওয়ার যোগ্যতা রাখে। তবে দিয়তকে মোহর নির্ধারণের কারণে পরোক্ষরূপে যে ক্ষমা সাব্যস্ত হয়েছে, উক্ত ক্ষমা সমগ্র মাল থেকে মোহরে মেছেল পরিমাণ পর্যন্ত বিবেচ্য হবে। কেননা সে মৃত্যু রোগের রোগী, আর বিবাহ হলো তার মৌলিক প্রয়োজনভুক্ত বিষয়। সুতরাং মোহরে মেছেলের অতিরিক্ত পরিমাণের ক্ষেত্রে উক্ত ক্ষমা গ্রহণযোগ্য হবে না, কেননা সেটা হবে ছাড় প্রদান, তবে তা (আকিলাহদের অনুকূলে) অছিয়ত রূপে গণ্য হবে।

আর মোহরে মেছেল পরিমাণ আকিলাহদের থেকে রহিত হওয়ার কারণ এই যে, তারা স্ত্রীলোকটির পক্ষ হতে (তার অপরাধের) দায় বহন করছে। সুতরাং এটা অসম্ভব যে, তার অপরাধ দ্বারা যা সাব্যস্ত হয়েছে, সেটার অংশবিশেষ সে আকীলাহদের কাছ থেকে গ্রহণ করবে। (বরং ঐ দায়বদ্ধ মাল থেকে যে পরিমাণ সে মোহর বাবদ মালিক হয়েছে, সেটা আকিলাহদের থেকে রহিত হয়ে যাবে।)

আর অতিরিক্ত যে মাল, সেটা আকিলাহদের অনুকূলে অছিয়ত হওয়ার কারণ এই যে, যেহেতু তারা হত্যাকারী নয়, সেহেতু তারা নিহত ব্যক্তির পক্ষ হতে অছিয়ত লাভ করার যোগ্য।

সুতরাং এই অতিরিক্ত পরিমাণটুকু যদি মৃতের একতৃতীয়াংশ মাল থেকে বের হয়ে আসে, তাহলে সেটা (আকিলাহদের থেকে) রহিত হয়ে যাবে। আর যদি বের হয়ে না আসে, তাহলে মৃতের মাল থেকে এক তৃতীয়াংশ পরিমাণ রহিত হবে।

হস্তকর্তনের বিনিময়ে বিবাহ করার ক্ষেত্রেও ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহম্মদ (র) এর মতে একই বিধান হবে। কেননা তাদের মতে হস্তকর্তন ক্ষমা করার অর্থ হস্তকর্তন থেকে যা উদ্ভূত হবে সেটাকেও ক্ষমা করা। সুতরাং উভয় ক্ষেত্রে[1] সাহেবায়নের সিদ্ধান্ত অভিন্ন হবে।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেনঃ যদি (ইচ্ছাকৃতভাবে) কারো হস্তকর্তন করা হয় এবং তার পক্ষে হস্তকর্তনের কিসাস গ্রহণ করা হয়, তারপর (ক্ষেত্রের সংক্রমণের কারণে)

১. অর্থাৎ (ভুলক্রমে) হস্তকর্তনের বিনিময়ে বিবাহ করা এবং হাত কর্তন ও তা থেকে যা উদ্ভূত হবে তার বিনিময়ে কিংবা তার কৃত অপরাধের বিনিময়ে তাকে বিবাহ করা— এই দুই ক্ষেত্রে।

লোকটির মৃত্যু হয়, তাহলে যার থেকে কিসাস নেওয়া হয়েছে, পুনরায় কিসাস রূপে তাকে হত্যা করা হবে।

কেননা (সংক্রমণজনিত মৃত্যু দ্বারা) প্রমাণ হয়ে গেল যে, অপরাধটি ছিল ইচ্ছাকৃত হত্যা, (ইচ্ছাকৃত হস্তকর্তন নয়) আর কিসাস লাভকারীর হক ছিল হত্যার কিসাস। আর 'হস্তকর্তন' উশুল করে নেয়ার কারণে কিসাসের হত্যা রহিত হবে না। যেমন যে ব্যক্তির কিসাস রূপে হত্যার হক পাওনা ছিল, যার উপর কিসাস ওয়াজিব হয়েছে, তার কোন অঙ্গ উশুল করে নিল।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) হতে বর্ণিত যে, তার কিসাস গ্রহণের হক রহিত হয়ে যাবে। কেননা সে যখন হস্তকর্তনে উদ্যত হলো, তখন বোঝা গেল যে, এর অতিরিক্ত যেটা, সেটা থেকে অপরাধীকে সে অব্যাহতি প্রদান করেছে।

আমরা বলি যে, সে তো এই ধারণার কারণে হস্তকর্তনে উদ্যত হয়েছে যে, তার হক এটাতেই রয়েছে। কিন্তু সঙক্রমণের পর প্রমাণিত হয়েছে যে, তার হক হলো কিসাস রূপে হত্যার ক্ষেত্রে। সুতরাং কিসাসের হক না জানা অবস্থায় সে কিসাস থেকে অব্যাহতি দানকারী হতে পারে না। **ইমাম মুহম্মদ (র) বলেনঃ কেউ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন লোককে হত্যা করে, আর নিহতের অভিভাবক হত্যাকারীর হস্তকর্তন করে, এরপর হত্যাকারীকে কিসাস থেকে অব্যাহতি প্রদান করে, অথচ অব্যাহতি প্রদানের পূর্বে তার পক্ষে কিসাসের ফায়ছালা জারি হয়েছে, কিংবা ফায়ছালা জারি হয়নি; উভয় ক্ষেত্রেই আবু হানীফা (র) এর মতে হস্তকর্তনকারীকে হাতের দিয়ত প্রদান করতে হবে। আর ছাহেবায়ন বলেন, তার উপর কোন দণ্ড বর্তাবে না।**

কেননা সে তার হক উশুল করেছে, সুতরাং সে তার দায় বহন করবে না। এটা হক উশুল করা এভাবে হলো যে, সে তো হত্যাকারীর সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গসহ প্রাণ হরণ করার হকদার হয়েছে। একারণেই তো হস্তকর্তনের পর যদি সে তাকে কিসাস থেকে অব্যাহতি প্রদান না করতো, তাহলে তাকে দায় বহন করতে হতো না।

তদ্রূপ যদি হস্তকর্তনের ক্ষত (নিরাময় না হয়ে) সংক্রমিত হয়ে পড়লো, কিংবা ক্ষমাও করেনি আবার শর্তটি সংক্রমিতও হয়নি। কিংবা হস্তকর্তনের পর সুস্থ হওয়ার আগে বা পরে হত্যা করে ফেললো; (এসব ক্ষেত্রে হস্তকর্তনের দায়ভার আসে না)। সুতরাং বিষয়টি এমন হলো যে, সে হাতের কিসাসের অধিকারী ছিল, কিন্তু হাতের আঙ্গুল কাটলো, এরপর হস্তকর্তনের কিসাস মাফ করে দিল। সে ক্ষেত্রে তাকে আঙ্গুলের ক্ষতিপূরণের দায় বহন করতে হবে না। ইমাম আবু হানীফা (র) এর যুক্তি এই যে, সে এমন জিনিস উশুল করেছে, যা তার হক নয়। কেননা তার হক ছিল হত্যা করা। অথচ এটা হলো অঙ্গ কর্তন এবং অঙ্গচ্ছেদন।

আর কিয়াসের দাবী ছিল হস্তকর্তনকারীর উপর (হস্তকর্তনের) কিসাস ওয়াজিব হওয়া। তবে উদ্ভূত সন্দেহের কারণে তা রহিত হয়েছে।

কেননা প্রাণনাশের অনুবর্তী রূপে অঙ্গনাশের অধিকার তার রয়েছে। যাই হোক কিসাস যখন রহিত হলো, তখন মাল (বা দিয়ত) ওয়াজিব হবে।

তবে **তৎক্ষণাৎ ক্ষতিপূরণ** ওয়াজিব না হওয়ার কারণ এই যে, সংক্রমণের মাধ্যমে তা হত্যায় রূপান্তরিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তখন তো সে তার প্রাপ্য হক উশুলকারী হবে।

(সে তার হক উশুল করেছে—সাহেবায়নের এ বক্তব্যের জবাব এই যে,) জানের কিসাসের মালিকানা[১] অনিবার্য প্রয়োজনে সাব্যস্ত করা হয়েছে, সুতরাং তা হক উশুল করা কিংবা মাফ করা কিংবা বিনিময় গ্রহণ করার ক্ষেত্র ছাড়া অন্য কোন ক্ষেত্রে প্রকাশ পাবে না। কেননা এগুলো হচ্ছে হত্যাকারীর জানের ক্ষেত্রে (প্রয়োজনীয়) হস্তক্ষেপ। কিন্তু এর আগে মালিকানার প্রয়োজন না থাকার কারণে মলিকানা প্রকাশ পাবে না।

তদ্রূপ ক্ষত সংক্রমিত হয়ে মৃত্যু ঘটার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা এটা (অংশত:) হক উশুল বলে গণ্য হবে।

পক্ষান্তরে মাফ না করা এবং সংক্রমিত না হওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য এই যে, শুধু নিরাময়ের মাধ্যমে সাব্যস্ত হতে পারে যে, এটা ছিল হক ছাড়া অন্যায়ভাবে কর্তন। তাই তো যদি হস্তকর্তন করে, আর মাফ না করে, আর নিরাময় হয়ে যায়, তাহলে বিশুদ্ধ মতে একই মতপার্থক্য হবে। (সুতরাং এটাকে নযীর রূপে পেশা করা বৈধ নয়।)

আর যদি কর্তন করার পর নিরাময় লাভের পূর্বে অভিভাবক তাকে হত্যা করে, তাহলে এটাকে হক উশুল করা বিবেচনা করা হবে। আর যদি নিরাময় লাভের পর হত্যা করে, বিশুদ্ধ মতে একই মতপার্থক্য হবে, (সুতরাং সেটা নযীর রূপে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।)

আর আঙ্গুলগুলো অবস্থানগত ভাবে যদিও হাতের পাতার সাথে সংশ্লিষ্ট, কিন্তু উদ্দেশ্যগতভাবে হাতের পাতা আঙ্গুলের সাথে সংশ্লিষ্ট।

পক্ষান্তরে পুরো অঙ্গের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা সবদিক থেকেই তা প্রাণ সত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট।

যে ব্যক্তি অঙ্গের কিসাসের হকদার হয়েছে, সে যদি তা উশুল করে, এরপর তা প্রাণঘাতী রূপে সংক্রমিত হয় এবং মারা যায়, তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে সে জানের দিয়তের দায় বহন করবে। আর ছাহেবায়ন বলেনঃ তাকে দায় বহন করতে হবে না।

কেননা সে তার কর্তনের হক উশুল করেছে। আর কর্তনকে নিরাপত্তার গুণ দ্বারা শর্তাবদ্ধ করা সম্ভব নয়। কেননা তাতে কিসাসের দ্বার রুদ্ধ হয়ে পড়বে। আর সংক্রমণ পরিহার করা তার সাধ্যের বাইরে। সুতরাং (এ ক্ষেত্রে তার অবস্থান হবে চোরের হস্তকর্তনকারী) শাসকের মত এবং (চিকিৎসার জন্য) শিরা কর্তনকারী ও রক্ত মোক্ষণকারীর মত। এবং (শাসকের পক্ষ হতে) হস্তকর্তনের আদেশপ্রাপ্ত ব্যক্তির মত।

---

১. প্রতিবন্ধক বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও। আর প্রতিবন্ধক হল ব্যক্তির স্বাধীনতা এবং প্রাণের শরীয়ত প্রদত্ত নিরাপত্তা।

ইমাম আবু হানীফা (র) এর যুক্তি এই যে, সে অন্যায়ভাবে তাকে হত্যা করেছে। কেননা তার হক হস্তকর্তনের ক্ষেত্রে। অথচ এটা হয়েছে হত্যা। এজন্যই তো এ ঘটনা যদি জুলুম রূপে ঘটাতো, তাহলে এটা হত্যা বলে গণ্য হতো।

তা ছাড়া এটা হলো এমন আঘাত, যা সাধারণ নিয়মেই প্রাণনাশ পর্যন্ত গড়ায়, আর এটাকেই হত্যা নাম দেয়া হয়। তবে সৃষ্ট সন্দেহের কারণে কিসাস রহিত হয়েছে, তাই দিয়ত ওয়াজিব হবে।

পক্ষান্তরে সাহেবায়ন যে সমস্ত মাসআলাকে নযীর রূপে পেশ করেছেন, সেগুলো ভিন্ন। কেননা সেক্ষেত্রে উক্ত কর্মসমূহ সম্পদনকারী ব্যক্তি হয় পদগ্রহণবশত: বাধ্যকৃত যেমন ইমাম, কিংবা চুক্তিবশত: বাধ্যকৃত, যেমন অন্যান্যরা। আর অবশ্যপালনীয় কর্ম নিরাপত্তার গুণ দ্বারা শর্তাবদ্ধ হতে পারে না। যেমন হরবীকে লক্ষ্য করে তীর ছোঁড়া (আর মুসলমানের গায়ে লেগে যাওয়া।)

পক্ষান্তরে আমাদের আলোচ্য মাসআলার বাধ্যবাধকতা এবং অবশ্যপালনীয়তা ছিল না। বরং তাকে তো ক্ষমা করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। সুতরাং তার এই 'কর্তন কর্ম' ছিল পর্যায়ভুক্ত। (আর মোবাহ কাজ নিরাপত্তার গুণ দ্বারা শর্তাবদ্ধ) সুতরাং তা শিকার লক্ষ্য করে তীর ছোঁড়া (এবং মানুষের গায়ে লাগার) মত হলো।

হত্যা সম্পর্কে সাক্ষ্য

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেনঃ কাউকে যদি ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করা হয়, আর তার দু'জন পুত্র থাকে; একজন উপস্থিত, আর অন্যজন অনুপস্থিত, আর উপস্থিত পুত্র হত্যার সত্যতা সম্পর্কে দলীল পেশ করলো, এরপর অনুপস্থিত পুত্র আগমন করলো, তাহলে আবু হানীফা (র) এর মতে তাকেও দলীল পুন: উপস্থাপন করতে হবে। আর সাহেবায়নের মতে দলীল পুন: উপস্থাপন করতে হবে না।

আর যদি ভুলক্রমে হত্যা হয় তাহলে সর্বসম্মত মতেই দলীল পুন: উপস্থাপন করতে হবে না। তাদের পিতার অনুকূলে কারো কাছে প্রাপ্য ঋণ সম্পর্কেও একই বিধান।

মতপার্থক্যপুর্ণ ক্ষেত্রে সাহেবায়নের যুক্তি এই যে, কিসাসের ক্ষেত্রে 'উত্তরাধিকার' নীতি অনুসৃত হয়; (অর্থাৎ মালিকানা মূরিছ-এর অনুকূলে সম্পন্ন হয়, তারপর ওয়ারিছ এর কাছে স্থানান্তরিত হয়।) যেমন ঋণের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। এর কারণ এই যে, এটা হলো নিহত ব্যক্তির প্রাণসত্তার বিনিময়। সুতরাং বিনিময়ের মাঝে তার মালিকানাই সাব্যস্ত হবে, বিনিময়কৃত বস্তুতে যার মালিকানা ছিল, যেমন দিয়তের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। একারণেই তো কিসাস যদি মাল-এ রূপান্তরিত হয়, তখন সেটা মৃতের মালিকানাধীন হয়। এবং একারণেই জখমের পর মৃত্যুর পূর্বে মৃত ব্যক্তির মাফ করে দেয়া দ্বারা কিসাস রহিত হয়ে যায়। সুতরাং (মামলা পরিচালনা দলীল উপস্থাপনের ক্ষেত্রে) এক ওয়ারিছ অন্যান্যদের পক্ষ হতে প্রতিপক্ষ রূপে গৃহীত হবে।

ইমাম আবু হানীফা (র) এর যুক্তি এই যে, কিসাসের ক্ষেত্রে 'উত্তরাধিকার নীতি' নয়, বর' স্থলবর্তিতার নীতি' অনুসৃত হয়। লক্ষ্যণীয় যে, কিসাস গ্রহণকারীর মালিকানা সাব্যস্ত হয় মৃত্যুর পর, অথচ মৃত ব্যক্ত তো মালিকানা লাভের যোগ্য নয়।

ঋণ ও দিয়তের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা মালের ক্ষেত্রে তাকে মালিকানা লাভের যোগ্য বিবেচনা করা হয়। যেমন সে শিকার করার জন্য জাল পাতল, আর তার মৃত্যুর পর সেই জালে শিকার আটকা পড়লো, সে ক্ষেত্রে সেই শিকারের মালিক হয়।

যাই হোক, সূচনা রূপে মালিকানা সাব্যস্ত করাই যখন কিসাসের ক্ষেত্রে অনুসৃত পন্থা হলো, তখন ওয়ারিছদের একজন অন্যান্যদের পক্ষ হতে 'প্রতিপক্ষ' বলে গৃহীত হবে না। বরং তার উপস্থিত হওয়ার পর তাকে নিজস্বভাবে পুন: দলীল উপস্থাপন করতে হবে।

আর হত্যাকারী যদি এই মর্মে দলীল পেশ করে যে, অনুপস্থিত ব্যক্তি তাকে মাফ করে দিয়েছে, তাহলে উপস্থিত ব্যক্তি মামলায় প্রতিপক্ষ রূপে বিবেচিত হবে (এবং তার উপস্থিতিতে দলীল গ্রহণযোগ্য হবে।) এবং কিসাস রহিত হয়ে যাবে।

কেননা, হত্যাকারী উপস্থিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে এই দাবী করছে যে, কিসাসের ক্ষেত্রে তার প্রাপ্য হক মাল-এ (দিয়াতে) রূপান্তরিত হয়ে গেছে। আর এই দাবী তার পক্ষে প্রমাণিত করা সম্ভব নয় অনুপস্থিত ব্যক্তির পক্ষ হতে ক্ষমা প্রমাণিত করা ছাড়া। সুতরাং উপস্থিত ব্যক্তিকে অনুপস্থিত ব্যক্তির পক্ষ হতে 'প্রতিপক্ষ' রূপে গ্রহণ করা হবে।

তদ্রূপ দু'জন লোকের শরীকানার গোলামকে যদি ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করা হয়, আর দুজনের একজন অনুপস্থিত থাকে, তাহলে এখানেও একই মতপার্থক্য হবে। কারণ সেটাই, যা আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেনঃ আর অভিভাবক যদি তিনজন হয়, আর তাদের দু'জন তৃতীয়জন সম্পর্কে সাক্ষ্য দিল যে, সে হত্যাকারীকে ক্ষমা করেছে; তাহলে তাদের সাক্ষী বাতিল হবে। এবং তাদের দু'জনের পক্ষ হতে ক্ষমা বলে গণ্য হবে।

(বাতিল হওয়ার কারণ এই যে,) এই সাক্ষ্য দ্বারা তারা নিজেদের দিকে সুবিধা টেনে আনছিল। আর তা হলো কিসাস মালে রূপান্তরিত হওয়া।

আর হত্যাকারী যদি তাদের দুজনকে সত্যায়ন করে, তাহলে দিয়ত তাদের মাঝে একতৃতীয়াংশ হারে বণ্টিত হবে।

এর অর্থ এই যে, হত্যাকারী একা তাদেরকে সত্যায়ন করছে। কেননা হত্যাকারী যখন তাদেরকে সত্যায়ন করলো, তখন অবস্থা এই দাঁড়াল যে, সে তাদের অনুকূলে দুই তৃতীয়াংশ দিয়তের প্রাপ্যতা স্বীকার করলো। সুতরাং তার স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য হবে। তবে সে 'সাক্ষ্যগ্রস্ত' ব্যক্তির হক রহিত হওয়ার দাবী করছে, আর সে তা অঙ্গীকার করছে সুতরাং এ বিষয়ে তাকে 'সত্যবাদী' বলে গ্রহণ হবে না। বরং সাক্ষ্যগ্রস্ত ব্যক্তির প্রাপ্য হিসসার ক্ষতিপূরণ তাকে বহন করতে হবে।

আর যদি হত্যাকারী তাদেরকে মিথ্যুক বলে, তাহলে তাদের পক্ষে কিছুই সাব্যস্ত হবে না, আর তৃতীয়জন এক তৃতীয়াংশ দিয়ত পাবে।

অর্থাৎ (সাক্ষ্যগ্রস্ত ব্যক্তির সঙ্গে) হত্যাকারীও যদি তাদেরকে মিথ্যুক সাব্যস্ত করে।

এর কারণ এই যে, তারা দুজন নিজেদের বিপক্ষে কিসাস রহিত হওয়ার স্বীকারোক্তি করেছে। সুতরাং তা গ্রহণ করা হবে। আর তাদের কিসাসের প্রাপ্য হক মালে রূপান্তরিত হওয়ার দাবী করেছে। সুতরাং প্রমাণ ছাড়া তা গ্রহণ করা হবে না। তবে সাক্ষ্যগ্রস্ত ব্যক্তির প্রাপ্য হিসসা (কিসাস থেকে) দিয়তে রূপান্তরিত হয়ে যাবে।

কেননা তার বিপক্ষে তাদের ক্ষমা-করার দাবী এবং তার অস্বীকৃতি প্রকৃতপক্ষে সাক্ষ্যগ্রস্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে তাদের পক্ষ হতে সূচনা থেকেই ক্ষমা করার সমতুল্য। কেননা কিসাস রহিত হওয়ার বিষয়টি তাদের দুজনের দিকে সম্বন্ধিত হয়েছে।

আর যদি সাক্ষ্যগ্রস্ত ব্যক্তি একা ঐ দুজনকে সত্যায়ন করে তাহলে হত্যাকারী 'সাক্ষ্যগ্রস্ত' ব্যক্তির পক্ষে এক তৃতীয়াংশ দিয়ত বহন করবে। কেননা হত্যাকারী ঐ বিষয়ে সাক্ষ্যগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে স্বীকারোক্তি করেছে।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেনঃ সাক্ষীরা যদি এই মর্মে সাক্ষ্য দেয় যে, সে তাকে আঘাত করেছে, ফলে সে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছে, এমন কি মৃত্যু বরণ করেছে; তাহলে তার উপর কিসাস সাব্যস্ত হবে।

যদি আঘাত ইচ্ছাকৃত হয়। কেননা সাক্ষ্য দ্বারা যা সাব্যস্ত হয়, তা চাক্ষুষ সাব্যস্ত হওয়ার সমতুল্য।

আর ইচ্ছাকৃত আঘাতের ক্ষেত্রে কিসাস ওয়াজিব হয়। যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করে এসেছি। আর এ ধরনের বক্তব্য দ্বারা ইচ্ছাকৃত হত্যা সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান সম্পন্ন হবে।

কেননা, আঘাতের কারণে মৃত্যু হয়েছে বলে তখনই বোঝা যাবে, যখন আঘাতের কারণে শয্যাশায়ী হয়ে পড়বে এবং শয্যাশায়ী থেকে মারা যাবে।

আর মাসআলাটির ব্যাখ্যা এই যে, সাক্ষীরা এ মর্মে সাক্ষ্য দেবে যে, ঘাতক আহতকারী অস্ত্র দ্বারা তাকে আঘাত করেছে।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেনঃ আর হত্যার সাক্ষীদ্বয় যদি দিন সম্পর্কে বা শহর সম্পর্কে বা ব্যবহৃত অস্ত্র সম্পর্কে মতপার্থক্য করে, তাহলে সাক্ষ্য বাতিল হয়ে যাবে।

কেননা একই হত্যাকাণ্ড পুনরাবৃত্ত হতে পারে না। আর এক সময়ের এবং এক স্থানের হত্যা অন্য সময়ের এবং অন্যস্থানের হত্যা থেকে ভিন্ন। তদ্রূপ লাঠি দ্বারা হত্যা, অস্ত্র দ্বারা হত্যা থেকে ভিন্ন।

কেননা প্রথমটি হলো ইচ্ছাকৃত হত্যা, আর দ্বিতীয়টি হলো প্রায় ইচ্ছাকৃত হত্যা। এবং উভয়ের বিধানও ভিন্ন। সুতরাং প্রতিটি হত্যার সপক্ষে একটি সাক্ষ্য হল। কাজেই তা প্রত্যাখ্যাত হবে।

তদ্রূপ যদি দুজনের একজন বলে যে, সে লাঠি দ্বারা তাকে আঘাত করেছে, আর অন্যজন বলে জানি না, কী দ্বারা হত্যা করেছে, তাহলে সাক্ষ্য বাতিল হবে।

কেননা শর্তমুক্ত সাক্ষ্য বিধানের ক্ষেত্রে শর্তযুক্ত সাক্ষ্য থেকে ভিন্ন হয়।[১]

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেনঃ যদি তারা এভাবে সাক্ষ্য দেয় যে, সে তাকে হত্যা করেছে, তবে জানিনা, কী দ্বারা হত্যা করেছে, সে ক্ষেত্রে সূক্ষ্ম কিয়াস অনুযায়ী দিয়ত ওয়াজিব হবে।

আর কিয়াসের দাবী হলো এই সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য না হওয়া। কেননা অস্ত্রের বিভিন্নতা দ্বারা হত্যাও বিভিন্ন হবে। সুতরাং সাক্ষ্য-বিষয় অজ্ঞাত হলো।

১. শর্তমুক্ত সাক্ষ্য হত্যাকারীর নিজস্ব মালে দিয়ত ওয়াজিব করে। পক্ষান্তরে লাঠি দ্বারা শর্তযুক্ত সাক্ষ্য আকিলাহদের উপর দিয়ত ওয়াজিব করে।

সূক্ষ্ম কিয়াসের যুক্তি এই যে, সাক্ষীগণ শর্তমুক্ত হত্যা সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান করেছে। আর শর্তমুক্ত বক্তব্য, 'অব্যাখ্যাত' বক্তব নয়। সুতরাং তা দ্বারা হত্যার দুটি বিধানের নিম্নতরটি অবশ্যই সাব্যস্ত হবে। আর তা হলো দিয়ত।

তাছাড়া দ্বিতীয় কারণ এই যে, সাক্ষ্য প্রদানের ক্ষেত্রে তাদের অস্পষ্টায়নকে সাক্ষ্যগ্রস্ত ব্যক্তির (আংশিক) দোষ গোপন[১] করার মাধ্যমে তার প্রতি তাদের সদাচার বলে বিবেচনা করা হবে।

আর না জানা সম্পর্কে তাদের মিথ্যা কথাকে তারা ঐ হাদীসের বাহ্যিক অর্থ দ্বারা ব্যাখ্যা করেছে, যা পারস্পরিক সম্পর্ক সংশোধনের উদ্দেশ্যে মিথ্যা কথাকে বৈধতা প্রদান করে বর্ণিত হয়েছে। আর এই মিথ্যা কথাটি পারস্পরিক সম্পর্ক সংশোধনের পর্যায়ভুক্ত। সুতরাং (তাদের জানা না জানা সম্পর্কে সৃষ্ট) সন্দেহের কারণে 'হত্যাকর্মের' বিভিন্নতা সাব্যস্ত হবে না।

আর হত্যাকারীর নিজস্ব মাল থেকে দিয়ত দেয়া ওয়াজিব হবে। কেননা কর্মের ক্ষেত্রে মূল নীতি হলো ইচ্ছাকৃতভাবে করা। সুতরাং আকিলাহদের উপর দিয়ত ওয়াজিব হবে না।

আর যদি দু'জন ব্যক্তির প্রত্যেকে এই মর্মে স্বীকারোক্তি করে যে, সে অমুককে হত্যা করেছে, আর নিহতের অভিভাবক বলে যে, তোমরা উভয়ে তাকে হত্যা করেছো, তাহলে তার অধিকার রয়েছে কিসাস রূপে উভয়কে হত্যা করার। আর যদি একদল সাক্ষী একজন লোকের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয় যে, সে অমুককে হত্যা করেছে, আর অন্য একদল সাক্ষী অন্য একজনের বিরুদ্ধে অমুককে হত্যা করার সাক্ষ্য দেয়, আর অভিভাবক বলে যে, তোমরা উভয়ে তাকে হত্যা করেছো, তাহলে উভয় সাক্ষ্য বাতিল হয়ে যাবে।

এই দু'টি মাসআলাতে পার্থক্যের কারণ এই যে, স্বীকারোক্তি ও সাক্ষ্য এর প্রতিটি, সংশ্লিষ্ট উভয় ব্যক্তির প্রত্যেকের পক্ষ হতে পূর্ণ হত্যাকাণ্ড অস্তিত্ব লাভ করা এবং কিসাস ওয়াজিব হওয়াকে অন্তর্ভুক্ত করে। আর প্রথম অবস্থায় স্বীকারোক্তি প্রাপ্ত অভিভাবকের পক্ষ হতে মিথ্যায়ন সাব্যস্ত হয়েছে, পক্ষান্তরে দ্বিতীয় অবস্থায় সাক্ষ্যপ্রাপ্ত (অভিভাবকের) পক্ষ হতে মিথ্যায়ন সাব্যস্ত হয়েছে। কিন্তু কথা এই যে, স্বীকারোক্তি অংশবিশেষ সম্পর্কে স্বীকারোক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তির পক্ষ হতে স্বীকারোক্তিকারীর মিথ্যায়ন অবশিষ্ট অংশে তার স্বীকারোক্তিকে বাতিল করে না। পক্ষান্তরে সাক্ষ্য বিষয়ের অংশবিশেষ সম্পর্কে সাক্ষ্যপ্রাপ্ত ব্যক্তির পক্ষ হতে সাক্ষীর মিথ্যায়ন তার সাক্ষ্যকে গোড়া থেকেই বাতিল করে দেয়।

কেননা মিথ্যায়নের অর্থ হলো ফাসিক আখ্যাদান। আর সাক্ষীর ফাসিক হওয়া সাক্ষ্যের গ্রহণযোগ্যতাকে রোধ করে। পক্ষান্তরে স্বীকরোক্তিকারীর ফাসিক হওয়া স্বীকারোক্তির বৈধতাকে রোধ করে না।

---

১. অর্থাৎ সাক্ষ্যগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে এমন বিষয় গোপন করার মাধ্যমে, যা তার উপর কিয়াসের বিধান ওয়াজিব করতো।

হত্যার অবস্থা বিবেচনা প্রসঙ্গে

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেনঃ কেউ যদি কোন মুসলমানকে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করে আর তীর নিক্ষিপ্ত ব্যক্তি আল্লাহ্ না করুন মুরতাদ হয়ে যায়; এরপর তীরটি তাকে বিদ্ধ করে, তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে নিক্ষেপকারীর উপর দিয়ত ওয়াজিব হবে। আর সাহেবায়ন বলেনঃ তার উপর কিছু বর্তাবে না। কেননা সে ধর্মত্যাগের মাধ্যমে আপন সত্তায় মূল্য-সম্পন্নতা রহিত করেছে। সুতরাং সে নিক্ষেপকারীকে নিক্ষেপের বিধান থেকে অব্যাহতি দানকারী হবে। যেমন জখমের পর মৃত্যুর পূর্বে তাকে (নিক্ষেপের অপরাধ থেকে) অব্যাহতি দান করলে তা অব্যাহতি রূপে সাব্যস্ত হয়ে যায়।

ইমাম আবু হানীফা (র) এর যুক্তি এই যে, নিক্ষেপকারীর নিক্ষেপ কর্ম দ্বারা ক্ষতিপূরণের দায় সাব্যস্ত হয়ে যায়। কেননা নিক্ষেপের পর নিক্ষেপকারীর পক্ষ হতে অন্য কোন কর্ম সম্পন্ন হয় না। সুতরাং নিক্ষেপের সময়ের অবস্থাই বিবেচ্য হবে। আর নিক্ষেপের অবস্থাই বিবেচ্য হবে। আর নিক্ষেপের অবস্থায় নিক্ষিপ্ত ব্যক্তি (তার মুসলিমত্বের কারণে) মূল্যসম্পন্ন ছিল।

এ কারণেই শিকার হালাল হওয়ার ক্ষেত্রে নিক্ষেপের অবস্থা বিবেচ্য হয়। তাই তো নিক্ষেপের পর নিক্ষেপকারীর মুরতাদ হওয়া দ্বারা তার শিকার হারাম হয়ে যায় না।

তদ্রূপ কাফ্ফারা আদায়ের ক্ষেত্রে (নিক্ষেপের অবস্থা বিবেচ্য হবে) তাই তো জখমের পরে মৃত্যুর পূর্বে যদি কাফ্ফারা আদায় করে তাহলে কাফ্ফারা আদায় করা ছহী হবে।

আর হত্যাকর্মটি যদিও ইচ্ছাকৃত হয়েছে, কিন্তু সৃষ্ট সন্দেহের কারণে কিসাস রহিত হয়ে গেছে এবং দিয়ত ওয়াজিব হয়েছে।

আর যদি সে লোকটির মুরতাদ অবস্থায় তার দিকে তীর নিক্ষেপ করে এরপর সে ইসলাম গ্রহণ করে তার সে তীর বিদ্ধ হয়, তাহলে তিন ইমামের সবার মতেই তার উপর কোন দায় বর্তাবে না। তদ্রূপ যদি সে কোন হারবীর দিকে তীর নিক্ষেপ করে আর সে ইসলাম গ্রহণ করে, সেক্ষেত্রে তার উপর কোন দায় বর্তাবে না।

কেননা তীর বিদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রটির মূল্যসম্পন্নতা অবিদ্যমান হওয়ার কারণে, তীর নিক্ষেপ কর্মটি দায় সাব্যস্তকারী রূপে সংঘটিত হয়নি। সুতরাং ক্ষেত্রটি পরবর্তীতে মূল্যসম্পন্ন হওয়ার কারণে কর্মটি দায় সাব্যস্তকারী রূপে পরিবর্তিত হবে না।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেনঃ কেউ যদি কোন গোলামকে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করে, আর তার মনিব তাকে মুক্ত করে দেয়, তারপর সে তীরবিদ্ধ হয় এবং মারা যায়, তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে নিক্ষেপকারীর উপর মনিবের পক্ষে গোলামের বাজার মূল্য ওয়াজিব হবে।

আর ইমাম মুহম্মদ (র) বলেনঃ নিক্ষিপ্ত এবং অনিক্ষিপ্ত অবস্থার মাঝে তার যে উদ্বৃত্ত মূল্য, সেটা নিক্ষেপকারীর উপর ওয়াজিব হবে। আর ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর মত ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতের মতই।

ইমাম মুহম্মদ (র) এর যুক্তি এই যে, মুক্তিদান[১] ক্ষতের সংক্রমণের বিবেচ্যতা রহিত করে দেয়।[২] আর সংক্রমণের বিবেচ্যতা যখন রহিত হলো, তখন শুধু নিক্ষেপ কর্ম বিদ্যমান থাকলো। আর নিক্ষেপ এমন অপরাধ, যার কারণে নিক্ষেপ পূর্ব সময়ের তুলনায় নিক্ষিপ্ত ব্যক্তির মূল্য হ্রাস পায়। সুতরাং এই উদ্বৃত্ত পরিমাণটুকু (নিক্ষেপকারীর উপর) ওয়াজিব হবে।

শায়খায়নের যুক্তি এই যে, নিক্ষেপকারী নিক্ষেপের সময় থেকেই হত্যাকারী রূপে গণ্য হবে। কেননা নিক্ষেপই হচ্ছে তার কর্ম। আর নিক্ষেপের অবস্থায় সে ছিল মালিকানাধীন। সুতরাং তার (নিক্ষেপকালের) মূল্য ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে কর্তন ও জখমের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা কর্তন ও জখম এর অর্থ হলো ক্ষেত্র এর অংশবিশেষ নষ্ট করা। আর তা (মনিবের মালিকানাধীন স্থানে সীমালংঘন হওয়ার কারণে) মনিবের পক্ষে দায় ওয়াজিব করে। আর সংক্রমণের পর কোন দায় সাব্যস্ত হলে সেটা গোলামের পক্ষে সাব্যস্ত হবে। সুতরাং শেষ অবস্থা সূচনা অবস্থা থেকে ভিন্ন হবে। এই অনিবার্যতার কারণে মুক্তিকে সংক্রমণ রহিতকারী বিবেচনা করতে হয়েছে। পক্ষান্তরে তার বিশুদ্ধতার পূর্বে নিক্ষেপ অর্থ কোন কিছু নষ্ট করা নয়। কেননা ক্ষেত্রটিতে নিক্ষেপকারীর কর্মের কোন চিহ্ন নেই। অবশ্য গোলামটির প্রতি আগ্রহ হ্রাস পেয়েছে, সুতরাং তা দ্বারা কোন দায় সাব্যস্ত হবে না। কাজেই (ক্ষতিপূরণের হকদারির ক্ষেত্রে) শেষ অবস্থা ও শুরু অবস্থা বিভিন্ন হবে না। অতএব নিক্ষেপকারীর উপর মনিবের পক্ষে গোলামের মূল্য অবশ্য সাব্যস্ত হবে।

আর ইমাম যুফার (র) তীর বিদ্ধতার অবস্থার দিকে লক্ষ্য করে[৩] যদিও গোলামের মূল্য ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে আমাদের সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করেন (এবং দিয়ত

---

১. যেমন কোন গোলামের হস্তকর্তন করা হলো, কিংবা তাকে জখম করা হলো, তারপর মনিব তাকে আযাদ করে দিল, এরপর হস্তকর্তন বা জখম সংক্রমিত হয়ে মৃত্যুর কারণ হলো, এক্ষেত্রে মুক্তিদান জখমের সংক্রমের বিবেচ্যতা রহিত করে দেয়। তাই সংক্রমণের কারণে মুক্তিলাভের পর দিয়ত বা মূল্য কিছুই সাব্যস্ত হয় না; অবশ্য ক্ষতির দায় বহন করতে হয়। সুতরং আলোচ্য ক্ষেত্রেও তাই হবে। কারণ তীরের অভিমুখিতা বিদ্যমান জখমের মতই তার মৃত্যুর নিকটবর্তিতাকে অনিবার্য করে তোলে।

২. কারণ হলো হকদারের অস্পষ্টতা, কেননা অপরাধের সূচনাকালে হকদার হলো মনিব, আর আক্রান্তের সময় হলো মুক্ত গোলাম। সুতরাং এক্ষেত্রেও মুক্তি লাভ জখমের ক্ষেত্রে নিরাময় লাভের মত হলো।

৩. কেননা তখন সে স্বাধীন ব্যক্তি, গোলাম নয়।

ওয়াজিব করেন), কিন্তু তার বিপক্ষে আমাদের যুক্তি সেটাই, যা আমরা প্রমাণ করে এসেছি।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেনঃ কারো বিপক্ষে যদি রজমের[১] ফায়ছালা জারি করা হয়, আর কেউ তাকে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করে, তারপর সাক্ষীদের একজন সাক্ষ্য প্রত্যাহার করে নেয় এরপর সে তীর বিদ্ধ হয়, তাহলে নিক্ষেপকারীর উপর দিয়ত ওয়াজিব নয়।

কেননা নিক্ষেপকালের অবস্থা বিবেচ্য। আর এ সময় তাকে হত্যা করা বৈধ ছিল।

মাজূসী (অগ্নিপূজক) যদি কোন শিকার লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করে এরপর ইসলাম গ্রহণ করে তারপর শিকার তীর বিদ্ধ হয়, তাহলে তা হালাল হবে না।

আর সে যদি মুসলিম অবস্থায় নিক্ষেপ করে, এরপর আল্লাহ না করুন মাজূসী হয়ে যায়, তাহলে তা হালাল হবে।

কেননা, হালাল-হারামের ক্ষেত্রে নিক্ষেপকালের অবস্থা বিবেচিত হবে। কারণ শিকারের জন্য নিক্ষেপই হলো হালালকারী জবেহ। সুতরাং সে সময় জবেহ করার যোগ্যতা থাকা না থাকা বিবেচ্য হবে।

আর মুহ্‌রিম ব্যক্তি যদি শিকারকে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করে, তারপর ইহরাম মুক্ত হয়। এরপর শিকারটি তীরবিদ্ধ হয়, তাহলে তার উপর 'দন্ড' ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে ইহরাম মুক্ত অবস্থায় সে যদি তীর নিক্ষেপ করে, তারপর ইহরাম ধারণ করে, (তারপর তীর বিদ্ধ হয়) তাহলে কোন দণ্ড ওয়াজিব নয়।

কেননা এক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ দণ্ড সাব্যস্ত হয় সীমালংঘন দ্বারা, আর তা হলো ইহরাম অবস্থায় তীর নিক্ষেপ। আর প্রথম অবস্থায় নিক্ষেপের সময় সে ছিল মুহরিম। এবং দ্বিতীয় অবস্থায় নিক্ষেপের সময় সে ছিল ইহরাম মুক্ত। সুতরাং দুটি অবস্থা পার্থক্যপূর্ণ হয়ে গেলো। সঠিক বিষয় আল্লাহ্ অধিক অবগত।

---

১. প্রস্তরাঘাতে কারো মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা।

كِتَابُ الدِّيَاتِ
অধ্যায় ঃ দীয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الدِّيَاتِ

অধ্যায় ঃ দীয়াত

ইমাম কুদূরী (র) বলেনঃ প্রায় ইচ্ছাকৃত অপরাধের ক্ষেত্রে আকিলাহ্‌দের[১] উপর গুরু দিয়ত ওয়াজিব হবে। আর হত্যাকারীর উপর কাফফারা ওয়াজিব হবে।

আর জিনায়াত অধ্যায়ের প্রথম দিকে 'প্রায় ইচ্ছাকৃত' অপরাধের ব্যাখ্যা আমরা দিয়েছি।

ইমাম কুদূরী (র) বলেনঃ আর এর কাফ্‌ফারা হলো একটি মুমিন গোলাম আযাদ করা।

কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ

অর্থ ঃ তবে এক মুমিন দাস মুক্ত করা বিধেয়। (৪ঃ৯২)

فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّٰهِ

অর্থ ঃ যদি গোলাম না পায়, তাহলে লাগাতার দুই মাস রোযা রাখবে। তাওবার জন্য ইহা আল্লাহ্‌র ব্যবস্থা। (৪ ঃ ৯২)

উপরোক্ত 'নাছ' দ্বারাই তা প্রমাণিত হয়।

আর এই কাফ্‌ফারার ক্ষেত্রে 'আহার প্রদান' যথেষ্ট হবে না। কেননা এ বিষয়ে 'নাছ' আসেনি। আর যাবতীয় 'পরিমাণ' শরীয়তের অবগতি প্রদান দ্বারা অবগত হওয়া সম্ভব।

---

১. (আকিলাহ) বলে তাদেরকে, যারা (হত্যাকারীর পক্ষ থেকে) দিয়ত পরিশোধ করে; (এমন সম্পর্কের ভিত্তিতে, যা বিপদে, দুর্যোগে সাহয্য করতে অপরিহার্য করে)।

তাছাড়া আরেকটি কারণ এই যে, আলোচ্য আয়াতে :فَـ অব্যয় প্রয়োগ করে 'উল্লেখকৃত' দুটি ছূরতকেই অবশ্য সাব্যস্ত বিধানের 'সমগ্র' নির্ধারণ করা হয়েছে। কিংবা এটা হলো উল্লেখকৃত এর সমগ। যেমন মৌল ফিকাহ শাস্ত্রে আলোচিত হয়েছে।

আর (গোলাম আযাদ করার ক্ষেত্রে) এমন দুগ্ধ পোষ্য শিশুও যথেষ্ট হবে, যার পিতামাতার কোন একজন মুসলমান।

কেননা তার অনুবর্তী রূপে সেও মুসলিম হবে। আর শিশুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ 'অবিকল' থাকাই স্বাভাবিক।

তবে গর্ভস্থ সন্তান যথেষ্ট নয়।

কেননা তার জীবিত থাকা এবং অবিকল থাকা (স্বাভাবিক ভাবে) জানা সম্ভব নয়।

গ্রন্থকার বলেন ঃ ভুলক্রমে হত্যার ক্ষেত্রেও এটাই হবে কাফফারা। এর প্রমাণ আমাদের পেশকৃত আয়াত।

আর ইমাম আবু হানীফা ও আবু ইউসুফ (র) এর মতে এর দিয়ত হলো চারভাগে একটি উট। দ্বিতীয় বছরে পড়া পঁচিশটি উট এবং তৃতীয় বছরে পড়া পঁচিশটি উট। এবং চতুর্থ বছরে, পড়া পঁচিশটি উট এবং পঞ্চম বছরে পড়া পঁচিশটি উট।

আর ইমাম মুহম্মদ ও শাফেয়ী (র) বলেনঃ তিনভাগে একশটি উট। পঞ্চম বছরে পড়া ত্রিশটি উট এবং চতুর্থ বছরে পড়া ত্রিশটি উট এবং ষষ্ঠ বছরে পড়া চল্লিশটি উট। চল্লিশটির প্রতিটি হবে গর্ভবতী।

কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

أَلاَ اِنَّ قَتِيْلَ خَطَاِ الْعَمَدِ قَتِيْلُ اَلسَّوْطِ وَالْعَصَا وَفِيْهِ مِائَةٌ مِنَ الْاِ بِلِ اَرْبَعُوْنَ مِنْهَا فِىْ بُطُوْنِهَا أَوْ لاَدُهَا.

'ইচ্ছার ভুলে' নিহত ব্যক্তি হচ্ছে চাবুক বা লাঠির আঘাতে নিহত ব্যক্তি। আর তাতে একশ উট (দিয়ত) আসে। তার মধ্যে চল্লিশটি এমন, যাদের পেটে বাচ্চা রয়েছে।

আর হযরত ওমর ও হযরত যায়দ ইবন ছাবিত (রা) হতে বর্ণিত রয়েছে যে, চতুর্থ বছরে পড়া ত্রিশটি এবং পঞ্চম বছরে পড়া ত্রিশটি।

আর যুক্তিগত কারণ এই যে, প্রায় ইচ্ছাকৃত হত্যার দিয়ত সব চাইতে কঠিন, আর আমরা যা বলেছি, তাতেই সব চাইতে কঠিনতা হয়।

শায়খানের দলীল হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী ঃ فِىْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ مِا ئَةٌ مِنَ الْاِبِلِ (ابن حبان) অর্থাৎ মুমিনের সত্তায় একটি উট রয়েছে। (ইবন হিব্বান)

ইমাম মুহম্মদ ও শাফেয়ী (র) যে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তা প্রমাণিত নয়। কারণ কঠিনতর বিবরণের ক্ষেত্রে ছাহাবা কিরামের মত ভিন্নতা রয়েছে। হযরত ইবনে মসউদ (রা) কঠিনতার বিবরণে চার ভাগের কথা বলেছেন, যেমন আমরা উল্লেখ করেছি।

আর (যদিও তা ছাহাবী নির্ভর বর্ণনা, কিন্তু গুণগতভাবে) তা مَرْفُوْع (শীর্ষসনদযুক্ত) হাদীসের সমতুল্য। সুতরাং তা দ্বারা পূর্বোক্ত হাদীসের 'সমকক্ষতা' করা যাবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেনঃ দিয়তের কঠিনতা শুধু উটের ক্ষেত্রেই সাব্যস্ত হবে।

কেননা শুধু উটের ক্ষেত্রে শরীয়াতের পক্ষ হতে অবগতি প্রদান করা হয়েছে। সুতরাং যদি উট ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা দিয়ত আদায়ের ফায়ছালা করা হয়, তাহলে তা কঠিন হবে না, এর কারণ আমরা বলেছি।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ অনিচ্ছাকৃত হত্যা দ্বারা আকিলাহদের উপর দিয়ত ওয়াজিব হয়, আর হত্যাকারীর উপর কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হয়।

এর কারণ আমরা ইতিপূর্বে বর্ণনা করেছি। **ইমাম কুদূরী (র) বলেনঃ অনিচ্ছাকৃত হত্যার দিয়ত হলো পাঁচভাগে একশ উট। দ্বিতীয় বছরে পড়া বিশটি উট। তৃতীয় বছরে পড়া বিশটি উট, চতুর্থ বছরে পড়া বিশটি উট এবং পঞ্চম বছরে পড়া বিশটি উট।**

এটা হযরত ইবনে মসউদ (রা) এর মত। আর আমরা এবং শাফেয়ী (র) তাঁর মত এ জন্য গ্রহণ করেছি যে, তিনি বর্ণনা করেছেন যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভুলক্রমে হত্যা করা হয়েছে এমন এক নিহত ব্যক্তির দিয়ত পাঁচভাগে (একশ উটের) ফায়ছালা করেছেন, যেমন যহরত ইবনে মসউদ (রা) বর্ণনা করছেন।

তাছাড়া আমরা যা বলেছি সেটাই লঘুতর। সুতরাং অনিচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে সেটা অধিকতর উপযোগী। কেননা ভুলক্রমে অন্যায়কারীর ওযর গ্রহণযোগ্য।

তবে শাফেয়ী (র) এর মতে দ্বিতীয় বছরে পড়া উটের স্থলে তৃতীয় বছরে পড়া বিশটি উটের ফায়ছালা দেয়া হবে। আর তাঁর বিপক্ষে প্রমাণ সেটাই, যা আমরা বর্ণনা করেছি।

ইমাম কুদূরী (র) বলেনঃ স্বর্ণ দ্বারা আদায় করা হলে একহাজার দীনার এবং রৌপ্য দ্বারা আদায় করা হলে দশ হাজার দিরহাম দিতে হবে।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেনঃ রৌপ্য আদায় করা হলে বার হাজার দিরহাম দিতে হবে। কেননা হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (বনী 'আদী গোত্রের এক নিহত ব্যক্তি সম্পর্কে) এ পরিমাণ দিরহামের ফায়ছালা করেছেন। (সুনান চতুষ্টয়)

আমাদের প্রমাণ হলো হযরত ওমর (রা) হতে বর্ণিত হাদীছ যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক নিহত ব্যক্তির দিয়ত সম্পর্কে দশ হাজার দিরহামের ফায়ছালা করেছিলেন।

আর হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণিত হাদীছের ব্যাখ্যা এই যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ দিরহাম দ্বারা ফায়ছালা করেছিলেন, যার ওজন ছিল ছয় মিছকালে দশ দিরহাম। আর তখন দিরহামের পরিমাপ ঐ রূপ ছিল।

ইমাম কুদূরী (র) বলেনঃ এই তিন প্রকার ছাড়া আর কোন প্রকার দ্বারা দিয়ত সাব্যস্ত হবে না।

এটা ইমাম আবু হানীফা (র) এর মত। ছাহেবায়ন (র) বলেনঃ এই তিন প্রকার দ্বারা হবে, আর গরু থেকে দুইশ গরু দ্বারা এবং বকরী থেকে দুই হাজার বকরী দ্বারা এবং পোশাক থেকে দুইশ পোশাক দ্বারা হবে। প্রতিটি পোশাক দুটি কাপড়ের (একটি লুঙ্গি এবং একটি চাদর)।

কেননা ওমর (রা) এভাবে প্রত্যেক সম্পদশালীর উপর ঐ শ্রেণী থেকে দিয়ত নির্ধারণ করেছেন।

ইমাম আবু হানীফা (র) এর যুক্তি এই যে, পরিমাণ নির্ধারণ এমন জিনিস দ্বারাই সুষ্ঠু হবে, যার অর্থমূল্য নির্ধারিত আছে। অথচ উল্লেখিত তিনটির অর্থমূল্য অজ্ঞাত। তাই যে সমস্ত জিনিস নষ্ট করা দ্বারা যিমান বা ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হয়, সেগুলোর ক্ষতিপূরণ এই সব জিনিস দ্বারা নির্ধারণ করা হয়নি, আর উট দ্বারা পরিমাণ নির্ধারণের বিষয়টি মশহূর হাদীছ দ্বারা জানা গেছে, যা অন্যগুলিতে আমরা পাইনি।

আর মাবসূত গ্রন্থের মা'আকিল পর্বে ইমাম মুহম্মদ (র) বলেছেনঃ নিহতের অভিভাবক যদি দুইশ পোশাকের, কিংবা দুইশ গরুর চেয়ে বেশী পরিমাণের উপর সমঝোতা করে, তাহলে তা জাইয হবে না। এটা (শরীয়ত কর্তৃক দিয়তকে) ঐ পরিমাণ দ্বারা নির্ধারিত করার প্রমাণ।[১] এরপর (সমস্যার মীমাংসা রূপে) কেউ কেউ এ ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, অবৈধ হওয়ার মত সকলের। সুতরাং (দিয়তের পরিমাণ পাঁচটি হওয়ার ব্যাপারে) মতপার্থক্য থাকবে না। আর কারো কারো মতে অবৈধ হওয়ার সিদ্ধান্ত ছাহেবায়নের মত।[২]

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেনঃ স্ত্রী লোকের দিয়ত (জানের ক্ষেত্রে এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ক্ষেত্রে) পুরুষের দিয়তের অর্ধেক।

---

১. কেননা যে পরিমাণ শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত, তার চেয়ে বেশী পরিমাণের উপর সমঝোতা জাইয নয়।

২. ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে এটা শরীয়ত নির্ধারিত পরিমাণ নয়। সুতরাং এর চেয়ে বেশী পরিমাণের উপর সমঝোতা হতে পারে না। আর ওমর (রা) এর ফায়সালা সম্পর্কে বক্তব্য এই যে, হয়ত তিনি মূল ফায়সালা দিয়েছিলেন স্বর্ণ বা রৌপ্যের 'পরিমাণ'-এর ভিত্তিতে, এরপর এই পরিমাণের উপর উভয় পক্ষকে সমঝোতা করিয়েছিলেন।

এ বক্তব্য ছাহাবী নির্ভর সনদে আলী (রা) হতে এবং শীর্ষোন্নীত সনদে নবী ছাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াদাল্লাম হতে বর্ণিত হয়েছে।

আর ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন ঃ দিয়তের এক তৃতীয়াংশের কম পরিমাণ পর্যন্ত (স্ত্রীলোকের দিয়ত পুরুষের দিয়তের) অর্ধেক হবে না (বরং সমান হবে।) এর উপরে গেলে অর্ধেক হবে। এ ব্যাপারে তাঁর ইমাম হলেন হযরত যায়দ ইবন ছাবিত (রা) আর তাঁর বিপক্ষে প্রমাণ হলো আমাদের বর্ণিত হাদীসের ব্যাপকতা।

তা ছাড়া যুক্তিগত কারণ এই যে, স্ত্রীলোকের অবস্থা পুরুষের চেয়ে নীচে এবং স্ত্রীলোকের উপকারিতা পুরুষের চেয়ে কম। আর এই কম হওয়ার ফল প্রকাশ পেয়েছে জানের দিয়তের ক্ষেত্রে অর্ধেক করার দ্বারা। সুতরাং জানের দিয়তের উপর কিয়াস করে এবং তৃতীয়াংশ ও তার বেশীর উপর কিয়াস করার মাধ্যমে অংগ প্রত্যঙ্গের ক্ষেত্রেও তা প্রকাশ পাবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেনঃ মুসলমানের দিয়ত এবং যিম্মীর দিয়ত সমান।

আর ইমাম শাফেয়ী (র) বলেনঃ ইয়াহুদী ও খৃষ্টানের দিয়ত হলো চার হাজার দিরহাম। আর মাজূসীর দিয়ত হলো আটশ দিরহাম। আর ইমাম মালিক (র) বলেন, ইয়াহুদী ও খৃষ্টানের দিয়ত হলো ছয় হাজার দিরহাম।

কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন عَقْلُ الْكَافِرِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُسْلِمِ (الترمزى)। (কাফিরের দিয়ত মুসলমানের দিয়তের অর্ধেক)।

আর ইমাম মালিক এর মতে দিয়তের সমগ্র পরিমাণ হলো বার হাজার দিরহাম।

ইমাম শাফেয়ী (র) এর প্রমাণ হলো বর্ণিত হাদীছ যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের দিয়ত চার হাজার নির্ধারণ করেছেন এবং মাজূসীর দিয়ত আটশ দিরহাম নির্ধারণ করেছেন। (মুছান্নাফে আব্দুর রায্যাক)

আমাদের প্রমাণ এই যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

دِيَةُ كُلِّ ذِىْ عَهْدٍ فِىْ عَهْدِهِ اَلْفُ دِيْنَارٍ

যিম্মা-চুক্তিতে আবদ্ধ প্রত্যেকের দিয়ত যিম্মা-চুক্তি বহাল অবস্থায় এক হাজার দীনার।

তদ্রূপ হযরত আবু বকর ও ওমর (রা) এ ফায়ছালা করেছেন। আর ইমাম শাফেয়ী (র) যে হাদীছ বর্ণনা করেছেন, তা প্রমাণসিদ্ধ নয়, হাদীসের কিতাবগুলিতে তা উল্লেখিত হয়নি।

আর আমরা যে হাদীছ বর্ণনা করেছি, তা ইমাম মালিক (র) বর্ণিত হাদীছের চেয়ে প্রসিদ্ধ। কেননা ছাহাবা কিরামের আমল সেটার উপরই দেখা গেছে।

পরিচ্ছেদ ঃ জানের চেয়ে কমের ক্ষেত্রে দিয়ত

ইমাম কুদূরী (র) বলেনঃ জানের ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ দিয়ত আসবে আর তা আমরা আলোচনা করেছি।

তদ্রূপ নাকের নরম অংশের ক্ষেত্রে, জিহবার ক্ষেত্রে, এবঙ পুরুষাঙ্গের ক্ষেত্রে পূর্ণ দিয়ত ওয়াজিব হবে।

এ বিষয়ে প্রমাণ হলো হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব (রা) হতে বর্ণিত হাদীছ যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

فِى النَّفْسِ الدِّيَةُ وَفِى اللِّسَانِ الدِّيَةُ وَفِى الْمَارِنِ الدِّيَةُ অর্থাৎ জানের ক্ষেত্রে পূর্ণ দিয়ত, জিহ্বার ক্ষেত্রে পূর্ণ দিয়ত এবং নাকের নরম অংশের ক্ষেত্রে পূর্ণ দিয়ত দিতে হবে। হযরত আমর ইবনে হাযম (রা) এর নামে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে পত্র লিখেছিলেন, তাতে একথাই রয়েছে।

আর অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ক্ষেত্রে মূলনীতি এই যে, যদি কেউ কারো কোন অঙ্গের শ্রেণী সুবিধা পূর্ণরূপে বিনষ্ট করে দেয়, কিংবা এমন সৌন্দর্য পূর্ণমাত্রায় বিনষ্ট করে দেয়, যা মানুষের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য রূপে গণ্য, সে ক্ষেত্রে পূর্ণ দিয়ত ওয়াজিব হবে। কেননা এতে এক দিক থেকে জান নষ্ট করা হয়েছে। আর মানবের মর্যাদার প্রেক্ষিতে বিধান হিসাবে একদিক থেকে জান নষ্ট করা সর্বদিক দিক থেকে জান নষ্ট করার সাথে যুক্ত।

এর প্রমাণ হলো জিহ্বা ও নাকের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্ণ দিয়তের ফায়ছালা করা।

এই মূলনীতির আলোকে বহু অনুসিদ্ধান্ত আহরিত হয়। তাই আমরা বলি যে, নাকের ক্ষেত্রে পূর্ণ দিয়ত দিতে হবে, কেননা সে সৌন্দর্যকে পূর্ণ মাত্রায় বিলুপ্ত করেছে। আর এ সৌন্দর্য উদ্দেশ্যভুক্ত। তদ্রূপ যদি নাকের নরম অংশ বা নাকের পার্শ্ব অংশ কর্তন করে তাহলে পূর্ণ দিয়ত হবে। কারণ সেটাই, যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। আর যদি নাকের নরম অংশ শক্ত হাঁড়সহ কর্তন করে, তাহলে একটি দিয়ত থেকে অতিরিক্ত কিছু ধার্য করা হবে না। কেননা এটা অভিন্ন অঙ্গ।

তদ্রূপ জিহ্বা কর্তনের ক্ষেত্রে পূর্ণ দিয়ত ওয়াজিব হবে। কেননা তাতে জিহ্বা অঙ্গের উদ্দিষ্ট সুবিধা বিলুপ্ত হয়। আর সেটা হলো 'বাকক্ষমতা'।

এভাবে জিহ্বার অংশ বিশেষ কর্তন দ্বারা যদি বাকক্ষমতা রুদ্ধ হয়, তাহলেও পূর্ণ দিয়ত দিতে হবে। কেননা উদ্দিষ্ট সুবিধা বিলুপ্ত করা হয়েছে, যদিও বাকযন্ত্রটি বিদ্যমান রয়েছে। আর যদি কিছু কিছু হরফ উচ্চারণ করতে সক্ষম হয়, তাহলে কারো কারো মতে সমগ্র হরফ সংখ্যার উপর দিয়ত বণ্টিত হবে। আর কারো কারো মতে জিহ্বার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হরফ সংখ্যার উপর বণ্টিত হবে। যে পরিমাণ হরফ উচ্চারণে অক্ষম হবে, সেই পরিমাণ দিয়ত আসবে।

আর কারো কারো মতে যদি অধিকাংশ হরফ উচ্চারণ করতে সক্ষম হয়, তাহলে একজন ন্যায়বানের বিচার আবশ্যক হবে। কেননা কিছুটা বিঘ্নতা সত্ত্বেও মনের ভাব

বোঝানোর **কাজ হাছিল হচ্ছে।** আর যদি অধিকাংশ হরফ আদায় করতে সক্ষম না হয়, তাহলে পূর্ণ দিয়ত দিতে হবে। কেননা এটাই স্বাভাবিক যে, কথা বলার সুবিধা হাছিল হবে না।

পুরুষাঙ্গ কর্তনের ক্ষেত্রেও পূর্ণ দিয়ত ওয়াজিব হবে। কেননা সেটা কর্তন দ্বারা সহবাসের এবং সন্তান জন্মদানের সুবিধা বিলুপ্ত হয়। এবং প্রস্রাব ধারণ ও প্রক্ষেপণের সুবিধা বিলুপ্ত হয় এবং যোনি দেশে প্রবিষ্টকরণ ও বীর্যক্ষেপন এর সুবিধা বিলুপ্ত হয়, যা গর্ভ সঞ্চার করার প্রচলিত পন্থা।

তদ্রূপ পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ কর্তন দ্বারাও পূর্ণ দিয়ত ওয়াজিব হবে। কেননা প্রবিষ্ট করণ ও বীর্য ক্ষেপণের সুবিধার ক্ষেত্রে পুরষাঙ্গের মাথাই হল মূল, পুরষাঙ্গের দণ্ড হলো তার অনুবর্তীর মত।

ইমাম কুদূরী (র) বলেনঃ আর (মাথায়) আঘাত দ্বারা যদি আকল বা বুদ্ধি লোপ পায়, তাহলে পূর্ণ দিয়ত ওয়াজিব হবে।

কেননা 'বোধ সুবিধা' বিলুপ্ত হয়েছে। আর বোধ ও বুদ্ধি দ্বারাই সে দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় কাজে উপকৃত হয়। তদ্রূপ যদি আঘাত দ্বারা শ্রবণশক্তি, বা দৃষ্টিশক্তি, বা ঘ্রাণ শক্তি বা স্বাদগ্রহণ শক্তি বিলুপ্ত হয়, তাহলে পূর্ণ দিয়ত দিতে হবে।

কেননা এগুলোর প্রতিটি হলো উদ্দিষ্ট সুবিধা। আর বর্ণিত আছে যে, ওমর (রা) একটি আঘাতের বিপরীত চারটি দিয়তের ফায়ছালা করেছিলেন, যে আঘাত দ্বারা বুদ্ধিশক্তি, বাকশক্তি, শ্রবণ শক্তি ও দৃষ্টিশক্তি লোপ পেয়েছিল।

আর যদি দাঁড়ি ছেঁচে ফেলা হয় এবং নতুনভাবে না গজায়, তাহলে তাতে পূর্ণ দিয়ত ওয়াজিব হবে।

কেননা তাতে সৌন্দর্যের সুবিধা লুপ্ত হয়।

আর মাথার চুলের ক্ষেত্রে (যদি নতুন চুল না গজায়) তবে পূর্ণ দিয়ত দিতে হবে।

কারণ সেটাই, যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি।

আর ইমাম মালিক (র) বলেছেন, এবং সেটা শাফেয়ী (র) এরও মতঃ ঐ দুটিতে একজন ন্যায়বান লোকের বিচার আবশ্যক হবে। কেননা তা মানুষের মাঝে অতিরিক্ত বস্তু। তাই তো সমগ্র মাথার চুল মুন্ডন করা হয়, এবং কোন কোন অঞ্চলে দাঁড়ির অংশ বিশেষ মুন্ডন করা হয়। আর তা বুকের চুল এবং পায়ের গোছার চুলের মত হলো। একারণেই গোলামের (মাথায় বা দাঁড়ির) চুলে মূল্য হ্রাসের দর আসে, (পূর্ণ মূল্যের দর নয়)।

আমাদের যুক্তি এই যে, বয়সের যথা সময়ে দাঁড়ি হলো সৌন্দর্য। আর তা ছেঁচে ফেলায় সৌন্দর্যের পূর্ণ বিলুপ্তি হয়। সুতরাং (তাতে পূর্ণ) দিয়ত ওয়াজিব হবে, যেমন উঁচু দুই কানের ক্ষেত্রে, (শ্রবণশক্তি বিদ্যমান থাকলেও সৌন্দর্য হানির কারণে পূর্ণ দিয়ত দিতে হবে।)

তদ্রূপ মাথার চুলও সৌন্দর্য। লক্ষ্যণীয় যে, যার প্রাকৃতিক ভাবে চুল বিলুপ্ত হয়, সে কৃত্রিমভাবে তা ঢেকে রাখার চেষ্টা করে। বুকের ও পায়ের গোছার চুলের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা তার সঙ্গে সৌন্দর্যের কোন সম্পর্ক নেই।

আর গোলামের দাঁড়ি সম্পর্কে ইমাম আবু হানীফা (র) হতে একটি বর্ণনা রয়েছে, তাতে পূর্ণ মূল্য অবশ্য সাব্যস্ত হবে।

আর প্রকাশিত বর্ণনা অনুযায়ী তাঁর ব্যাখ্যা এই যে, গোলামের সৌন্দর্য উদ্দেশ্য নয়, বরং কাজে লাগানোর মাধ্যমে সুবিধা ভোগ করাই হলো উদ্দেশ্য। স্বাধীন ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিষয়টি ভিন্ন।

মোচের ক্ষেত্রে একজন ন্যায়বানের বিচার বিবেচ্য হবে, এটাই বিশুদ্ধতম মত।

কেননা তা দাঁড়ির অনুবর্তী, সুতরাং তা দাঁড়ির অংশ বিশেষের মত হলো।

আর 'ছাগলা-দাঁড়ি' যদি চিবুকে অল্পকটি চুল থাকে, তাহলে তা ছেঁচে ফেলাতে কোন 'দন্ড' আসবে না।

কেননা তার অস্তিত্ব সৌন্দর্য হানি ঘটায়, সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে না।

আর যদি বেশী পরিমাণে হয়, অর্থাৎ ছাড়া ছাড়া ভাবে গাল ও চিবুকে সর্বত্র হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে একজন ন্যায়বানের বিচার বিবেচ্য হবে।

কেননা তাতে কিছুটা সৌন্দর্য রয়েছে।

আর যদি যুক্ত অবস্থায় হয়, তাহলে পূর্ণ দিয়ত ওয়াজিব হবে।

কেননা তা ছাগলা দাঁড়ি নয়। আর তাতে পূর্ণ সৌন্দর্য থাকে। এ সমস্ত বিধান ঐ অবস্থায়, যখন দাঁড়ির উদগম নষ্ট হয়ে যায়। পক্ষান্তরে যদি দাঁড়ি গজিয়ে আগের মত সমান হয়ে যায়, তাহলে কোন দণ্ড ওয়াজিব হবে না। কেননা অপরাধের কোন চিহ্ন বাকি নেই। তবে অবৈধ একটি কাজ করার কারণে তাকে শাসন করা হবে।

আর যদি দাঁড়ি সাদা হয়ে গজায়, তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র) হতে বর্ণিত রয়েছে যে, স্বাধীন ব্যক্তির ক্ষেত্রে তাতে কোন দণ্ড ওয়াজিব হবে না। কেননা, তা তার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। পক্ষান্তরে গোলামের ক্ষেত্রে একজন ন্যায়বানের বিচার বিবেচ্য হবে। কেননা, তা তার মূল্য হ্রাস করে।

আর সাহেবায়নের মতে (স্বাধীন ব্যক্তির ক্ষেত্রেও) একজন ন্যায়বানের বিচার বিবেচ্য হবে। কেননা অসময়ে তা সৌন্দর্য হানি ঘটায়, সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে না।

আর এক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃতভাবে করা উভয়ই সমান। ফকীহগণের গরিষ্ঠ অংশ এই মতের অনুসারী।

উভয় ভ্রূর ক্ষেত্রে পূর্ণ দিয়ত ওয়াজিব হবে। আর এ দুটির একটিতে অর্ধ দিয়ত বর্তাবে।

আর ইমাম মালিক ও শাফেয়ী (র) এর মতে (উভয় ভ্রূর ক্ষেত্রে) একজন ন্যায়বানের বিচার বিবেচ্য হবে। এ সংক্রান্ত আলোচনা দাঁড়ি প্রসঙ্গে করা হয়েছে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেনঃ দুই চোখ, দুই হাত, দুই পা, দুই ঠোঁট, দুই কান, এবং দুই অণ্ডকোষের ক্ষেত্রে পূর্ণ দিয়ত ওয়াজিব হবে।

হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িবের সূত্রে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এরূপ বর্ণিত রয়েছে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেনঃ এই জিনিসগুলির প্রতিটি জোড়ার একটির ক্ষেত্রে অর্ধ দিয়ত ওয়াজিব হবে।

আমর ইবনে হাযম (রা) এর নামে লিখিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পত্রে রয়েছে ঃ

وَفِى الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ وَفِى اِحْدَيْهِمَا نِصْفُ الدِّيَةِ-

দুই চোখের ক্ষেত্রে পূর্ণ দিয়ত, আর এ দুটির একটির ক্ষেত্রে অর্ধেক দিয়ত।

তাছাড়া যুক্তিগত কারণ এই যে, এই জিনিসগুলোর উভয়টি নষ্ট করার ক্ষেত্রে সুবিধার পূর্ণ শ্রেণীসত্তা বিনষ্ট করা হয়, কিংবা সৌন্দর্যের পূর্ণতা নষ্ট করা হয়। সুতরাং পূর্ণ দিয়ত ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে দুটির একটি নষ্ট করার ক্ষেত্রে সুবিধার অর্ধেক বিনষ্ট করা হয়। তাই অর্ধ দিয়ত ওয়াজিব হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেনঃ স্ত্রী লোকের স্তনদ্বয়ের ক্ষেত্রে পূর্ণ দিয়ত ওয়াজিব হবে।

কেননা তাতে সুবিধার শ্রেণীসত্তা বিনষ্ট করা হয়।

আর একটি স্তনের ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকের দিয়তের অর্ধেক দিতে হবে।

'কারণ' আমরা বর্ণনা করেছি (যে, তাতে সুবিধার শ্রেণীসত্তার অর্ধেক বিনষ্ট করা হয়।)

পুরুষের স্তনদ্বয়ের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা তাতে একজন ন্যায়বানের বিচার বিবেচ্য হবে। কারণ তাতে সুবিধার শ্রেণীসত্তা এবং সৌন্দর্য বিনষ্ট হয় না।

আর স্ত্রীলোকের স্তনের দুই বোঁটার ক্ষেত্রে পূর্ণ দিয়ত ওয়াজিব হবে।

কেননা, এতে স্তন্যদান ও দুগ্ধধারণ সুবিধার শ্রেণীসত্তার বিলুপ্তি ঘটে।

আর এ দুটির একটির ক্ষেত্রে দিয়তের অর্ধেক ওয়াজিব হবে। 'কারণ' আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি।

ইমাম কুদূরী (র) বলেনঃ দুই চোখের (উপর নীচ) পাতা কেটে ফেলার ক্ষেত্রে পূর্ণ দিয়ত ওয়াজিব হবে। আর এর একটিতে দিয়তের চতুর্থাংশ ওয়াজিব হবে।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেনঃ রূপকভাবে এর অর্থ চোখের পাতার চুল হতে পারে। যেমন ইমাম মুহম্মদ (র) মাবসূত কিতাবে উল্লেখ করেছেন। আর রূপকতার সূত্র হলো প্রতিবেশিতা। যেমন (প্রতিবেশিতার সূত্রে) راوية শব্দটি পানিবহনের মশক অর্থে ব্যবহৃত হয়। অথচ প্রকৃত অর্থে তা পানি বহনের উটনীর জন্য ব্যবহৃত হয়।

এর কারণ এই যে, তা দ্বারা পূর্ণ সৌন্দর্য বিনষ্ট হয় এবং সুবিধার শ্রেণীর সত্তা বিনষ্ট হয়, আর তা হলো কষ্টদায়ক জিনিসকে চোখ থেকে দূরে রাখা। কেননা সেগুলো চোখের পাতার চুল দ্বারা রোধ করা হয়।

যাই হোক, চোখের সবকটি পাতায় যখন পূর্ণ দিয়ত আসে, আর সেগুলোর সংখ্যা হল চার, তখন একটিতে দিয়তের চতুর্থাংশ আসবে, এবং তিনটিতে তিন চতুর্থাংশ আসবে।

আবার চোখের পাতা শব্দটি দ্বারা প্রকৃত অর্থ হিসাবে চুল গজানোর স্থান উদ্দেশ্য হতে পারে। আর তাতে একই বিধান প্রযোজ্য হবে।

আর যদি চুলসহ চোখের পাতা কেটে ফেলা হয়, তাতে একটি দিয়ত ওয়াজিব হবে।

কেননা সবগুলো একক বস্তুর হুকুমভুক্ত। এবং বিষয়টি নাকের নরম অংশসহ শক্ত হাঁড় কেটে ফেলার মত হলো।

ইমাম কুদূরী (র) বলেনঃ দুই হাত দুই পায়ের প্রতিটি আঙ্গুলের ক্ষেত্রে দিয়তের দশমাংশ ওয়াজিব হবে।

কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

فِىْ كُلِّ اِصبَعٍ عَشْرٌ مِّنَ الْاِبِلِ (الترمذى)

প্রতিটি আঙ্গুলে দশটি উট ওয়াজিব হবে।

তাছাড়া যুক্তিগত কারণ এই যে, (দুই হাতের বা দুই পায়ের) সমস্ত আঙ্গুল কর্তনে সুবিধার শ্রেণীসত্তা বিলুপ্ত করা হয় আর তাতে পূর্ণ দিয়ত আসে। আর আঙ্গুলের সংখ্যা হলো দশটি। সুতরাং পূর্ণ দিয়ত দশটিতে বণ্টিত হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেনঃ আর সমস্ত আঙ্গুল সমান। কেননা হাদীছটি নিঃশর্ত।

তাছাড়া মূল সুবিধার ক্ষেত্রে সবকটি আঙ্গুল সমান। সুতরাং (কোন আঙ্গুলের ক্ষেত্রে) অতিরিক্ত সুবিধার বিষয়টি বিবেচিত হবে না। যেমন বাম হাতের সঙ্গে ডান হাতের বিষয়টি। দুই পায়ের আঙ্গুলগুলো সম্পর্কেও একই কথা। কেননা সমস্ত আঙ্গুল কর্তন দ্বারা হাঁটার সুবিধার শ্রেণীসত্তা বিলুপ্ত হয়। সুতরাং তাতে পূর্ণ দিয়ত ওয়াজিব হবে। আর দুই পায়ে দশটি আঙ্গুল রয়েছে, তাই একটি পূর্ণ দিয়ত সেগুলোর উপর দশমাংশ হারে বণ্টিত হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেনঃ যে সকল আঙ্গুলে তিনটি গিঠ রয়েছে; সেগুলোর একটি গিঠ কর্তনের ক্ষেত্রে এক আঙ্গুলের দিয়তের এক তৃতীয়াংশ ওয়াজিব হবে। আর যাতে দুইটি গিঠ রয়েছে, তার একটি গিঠ কর্তনের ক্ষেত্রে এক আঙ্গুলের দিয়ত অর্ধেক ওয়াজিব হবে।

এই বণ্টনের নযীর হলো আঙ্গুলগুলোর উপর হাতের দিয়ত বণ্টন। আর প্রতিটি দাঁতে পাঁচটি উট ওয়াজিব হবে।

কেননা হযরত আবু মূসা আশয়ারী (রা) বর্ণিত হাদীছে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বলেছেন ঃ

وَفِىْ كُلِّ سِنٍّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ

প্রতিটি দাঁতে পাঁচটি উট দিয়ত হবে। (আবু দাউদ)

আর সাধারণ দাঁত ও মাড়ীর দাঁত সমান। প্রমাণ হলো আমাদের (এইমাত্র) বর্ণিত হাদীছটির নিংশর্ততা।

তাছাড়া কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে ঃ

وَالْأَسْنَانُ كُلُّهَا سَوَاءٌ (ابو داؤد)

–আর সব দাঁতই সমান।

তাছাড়া যুক্তিগত প্রমাণ এই যে, মূল সুবিধার ক্ষেত্রে সব দাঁত সমান। সুতরাং পরস্পর শ্রেষ্ঠত্বের বিষয়টি বিবেচনা করা হবে না, যেমন হাত ও পায়ের ক্ষেত্রে। এই বিধান প্রযোজ্য হবে, যখন অপরাধ অনিচ্ছাকৃতভাবে সংঘটিত হবে। পক্ষান্তরে ইচ্ছাকৃত অপরাধের ক্ষেত্রে তাতে কিসাস ওয়াজিব হবে। আর জিনায়াত পর্বে সে আলোচনা করা হয়েছে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেনঃ কেউ যদি কারো কোন অঙ্গে আঘাত করে এবং ঐ অঙ্গের সুবিধা বিলুপ্ত করে দেয়, তাতে পূর্ণ দিয়ত ওয়াজিব হবে; যেমন (আঘাতের কারণে) হাত অবশ হয়ে গেলো এবং চোখের জ্যোতি চলে গেলো।

কেননা, পূর্ণ দিয়ত ওয়াজিব হওয়ার সম্পর্ক হলো অঙ্গের সুবিধার শ্রেণীসত্তা বিলুপ্ত করণের সঙ্গে; অঙ্গের সূরত বিলুপ্তির সঙ্গে নয়।

কেউ যদি কারো পৃষ্ঠ দেশে আঘাত করে, তথায় তাতে বীর্যের বিলুপ্তি ঘটে, তাহলে পূর্ণ দিয়ত ওয়াজিব হবে।

কেননা এতে সুবিধার শ্রেণীসত্তার বিলুপ্তিকরণ হয়েছে।

তদ্রূপ যদি ঐ আঘাত তাকে কুঁজো করে দেয়। কেননা, তা সৌন্দর্যের পূর্ণ মাত্রায় বিলুপ্তি ঘটিয়েছে। আর তা হলো দেহের ঋজুতা।

তবে পরবর্তীতে যদি কুঁজো হওয়া দূর হয়ে যায়, তাহলে তার উপর কোন দণ্ড ওয়াজিব হবে না। কেননা, তা চিহ্নসহ বিলুপ্ত হয়েছে।

পরিচ্ছেদ ঃ জখম প্রসঙ্গে

ইমাম কুদূরী (র) বলেনঃ জখম দশ প্রকার যথা ঃ

اَلْحَارِصَةُ — যে জখমে চামড়া ছিলে যায়, তবে রক্ত বের হয় না।

'اَلدَّامِعَةُ' — যে জখমে রক্ত দেখা দেয়, তবে প্রবাহিত হয়না, যেমন চোখের ভিতরে অশ্রু

دَامِيَةٌ — যে জখম থেকে রক্ত প্রবাহিত হয়।

اَلْبَاضِعَةُ — যে জখমে চামড়া ফেটে যায়।

اَلْمُتَلَاحِمَةُ — যে জখমে চামড়া ফেটে গোশতও কেটে যায়।

اَلسِّمْحَاقُ — যে জখমে গোশত ভেদ করে গোশত ও মাথার হাড়ের মধ্যবর্তী পাতলা চামড়ায় পৌঁছে যায়।

اَلْمُوضِحَةُ — যে জখমে হাড় বেরিয়ে পড়ে।

اَلْهَاشِمَةُ — যে জখমে হাড় ভেঙ্গে যায়।

اَلْمُنَقِّلَةُ — যে জখমে হাড় ভাঙ্গার পর স্থানচ্যুত হয়ে যায়।

اَلْآمَّةُ — যে জখম মাথার গভীরে চলে যায়, যেখানে মস্তিষ্কের অবস্থান। (জখম ও মস্তিষ্কের মাঝে শুধু একটি পাতলা আররণের ব্যবধান থাকে।)

ইমাম কুদূরী বলেন ঃ হাঁড় বেরিয়ে পড়া জখম যদি ইচ্ছাকৃতভাবে করা হয়, তাহলে তাতে কিসাস ওয়াজিব হবে।

কেননা বর্ণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ধরনের জখমের ক্ষেত্রে কিসাসের ফায়সালা করেছেন।

তাছাড়া যুক্তিগত কারণ এই যে, ছুরি হাড় পর্যন্ত গিয়ে থেমে যেতে পারে। সুতরাং উভয় জখম সমান হয়ে সমতা ও কিসাস সাব্যস্ত হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ অন্যান্য জখমে কিসাস নেই।

কেননা, সেগুলোতে সমতা বিবেচনা করা সম্ভব নয়। কারণ সেগুলোতে (হাড়ের মত কোন শক্ত) সীমা নেই, যেখানে গিয়ে ছুরি থেমে যাবে।

তাছাড়া আরেকটি কারণ এই যে, مُوضِحَةٌ এর চেয়ে উপরের জখমগুলোতে হাড় ভাঙ্গা হয়, তবু তাতে কিসাস নেই।

এটা ইমাম আবু হানীফা (র) হতে প্রাপ্ত একটি বর্ণনা। আর মাবসূত কিতাবে ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেছেন ঃ এবং সেটা হলো প্রকাশিত বর্ণনা যে, مُوضِحَةٌ এর পূর্ববর্তী জখমগুলিতে কিসাস ওয়াজিব হবে। কেননা সেগুলিতে হাড় ভাঙ্গার ব্যাপার নেই, এবং হালাক হওয়ার প্রবল আশংকা নেই, সুতরাং সেখানে সমতা রক্ষা সম্ভব হবে। এভাবে যে জখম পরিমাপক যন্ত্র দ্বারা জখমের গভীরতা পরিমাপ করা হবে, এরপর সেই পরিমাপ মত লোহা নেয়া হবে এবং তা দ্বারা ঐ পরিমাণ কর্তন করা হবে, যে পরিমাণ সে কর্তন করেছে। এভাবে কিসাস উশুল করা সম্পন্ন হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ مُوضِحَةٌ এর নীচের জখমগুলোতে একজন ন্যায়বান ব্যক্তির বিচার বিবেচ্য হবে।

কেননা, ঐগুলিতে (শরীয়তের পক্ষ হতে) নির্ধারিত কোন দিয়ত নেই। আবার সেগুলিকে 'মূল্যহীন'ভাবে ছেড়ে দেয়া সম্ভব নয়। সুতরাং একজন ন্যায়বান ব্যক্তির বিচার

দ্বারা সেগুলিকে বিবেচনায় আনা আবশ্যক হবে। আর এটা ইবরাহীম নাখঈ ও ওমর ইবন আবদুল আযীয (র) হতে বর্ণিত রয়েছে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ مُوَضِّحَةٌ (বা হাঁড় বের করা জখম) যদি ভুলক্রমে হয়, তাহলে তাতে দিয়তের দশমাংশের অর্ধেক ওয়াজিব হবে। আর مُوَضِّحَةٌ (বা হাড় ভাঙ্গা) জখমে দিয়তের দশমাংশ ওয়াজিব হবে। আর هَاشِمَةٌ (বা হাঁড় ভাঙ্গা ও স্থানচ্যুত হওয়া) জখমে দিয়তের দশমাংস এবং দশমাংশের অর্ধেক ওয়াজিব হবে। আর مُنَقِّلَةٌ (বা মস্তিষ্ক পর্যন্ত উপনীত) জখমে দিয়তের এক তৃতীয়াংশ ওয়াজিব হবে, এবং جَائِفَةٌ বা উদরের গভীরে[১] উপনীত) জখমে দিয়তের এক তৃতীয়াংশ ওয়াজিব হবে। আর যদি তা অপর দিকে পার হয়ে যায়, তাহলে দু'টি جَائِفَةٌ জখম বলে গণ্য হবে। সুতরাং তাতে দিয়তের দুই তৃতীয়াংশ আসবে।

কেননা আমর ইবন হাযম (রা)-এর নামে লেখা পত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ مُوَضِّحَةٌ –জখমে পাঁচ উট, هَاشِمَةٌ–জখমে দশ উট, مُنَقِّلَةٌ–জখমে পনেরটি উট এবং آمَّةٌ (বর্ণনান্তরে مَأْمُومَةٌ) জখমে দিয়তের তৃতীয়াংশ ওয়াজিব হবে।

(এরপর একই পত্রে) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ اَلْجَائِفَةُ জখমে দিয়তের তৃতীয়াংশ ওয়াজিব হবে।

আর হযরত আবু বকর (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি অপর দিকে ভেদ করে যাওয়া جَائِفَةٌ জখম সম্পর্কে দিয়তের দুই তৃতীয়াংশের ফায়সালা করেছেন।

তাছাড়া যুক্তিগত কারণ এই যে, جَائِفَةٌ যদি ভেদ করে যায়, তাহলে দু'টি জখম হয়ে যায়। একটি হলো পেটের দিক থেকে, অন্যটি পিঠের দিক থেকে। আর প্রতিটি جَائِفَةٌ জখমে দিয়তের এক তৃতীয়াংশের বিধান রয়েছে। এজন্যই ভেদ করে যাওয়া জখমে দুই-তৃতীয়াংশ ওয়াজিব হয়েছে।

আর মুহম্মদ (র) হতে বর্ণিত রয়েছে যে, مُتَلَاحِمَةٌ জখমকে তিনি بَاضِعَةٌ এর পূর্বে স্থাপন করেছেন, আর বলেছেন ঃ مُتَلَاحِمَةٌ এমন জখম, যাতে রক্ত ছড়িয়ে পড়ে এবং মাখামাখি হয়ে যায়। আর আমরা শুরুতে যেটা উল্লেখ করেছি, সেটা আবু ইউসুফ (র) হতে বর্ণিত। এটা মূলতঃ শব্দভিত্তিক বর্ণনাগত ভিন্নতা, গুণ ও বিধানগত ভিন্নতার সঙ্গে তা সম্পৃক্ত নয়।

এই সকল জখমের পর 'دَامِغَةٌ' নামে আরেকটি জখম রয়েছে, যা دِمَاغٌ বা মস্তিষ্কের ভিতরে পৌঁছে যায়। ইমাম মুহম্মদ (র) এজন্য এটা উল্লেখ করেন নি যে, সাধারণত এটা হত্যায় পর্যবশিত হয়, এটা সীমিত ও ভিন্ন বিধান সম্বলিত অপরাধ নয়।

এরপর (শরীয়তে) مُشَجَّةٌ নামে আখ্যায়িত এই জখমগুলি অভিধানগত দিক থেকে চেহারা ও মাথার সঙ্গে বিশিষ্ট। চেহারা ও মাথা ছাড়া অন্যান্য জখমকে جِرَاحَةٌ (বা সাধারণ জখম) বলে। আর বিশুদ্ধ মতে অভিধানগত হাকীকত বা মর্মের উপরই

১. জখমটা পেটে, বা বুকে বা পিঠে বা পার্শ্বদ্বয়ে হতে পারে।

বিধান আরোপিত হবে। সুতরাং পায়ের গোছা বা হাতে شُبْحَةٌ নামে সংজ্ঞায়িত কোন জখম যদি করা হয়, তাহলে তার জন্য নির্ধারিত কোন দিয়ত দিয়ে হবে না। বরং এতে একজন ন্যায়পরয়ণ লোকের বিচার আবশ্যক হবে।

কেননা শরীয়তের নির্ধারণ দ্বারাই দিয়ত নির্ধারিত হয়। আর চেহারা ও মাথার সঙ্গে বিশিষ্ট জখমের বিষয়েই শরীয়তের নির্ধারণ সাব্যস্ত হয়েছে।

তাছাড়া شُبْحَةٌ নামক জখমগুলিতে বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে মূলতঃ অসৌন্দর্যগত দিকের কারণে, যা জখমের চিহ্ন থেকে যাওয়ার কারণে দেখা যায়। আর অসৌন্দর্য ঐ সকল অঙ্গের সঙ্গে বিশিষ্ট হবে, যা সাধারণতঃ নজরে পড়ে। আর তা হলো এ দুই অঙ্গ, অন্যান্য অঙ্গ নয়।

আর চোয়াল সম্পর্কে কেউ কেউ বলেছেন যে, তা মুখমণ্ডলভুক্ত নয়। আর তা ইমাম মালিক (র) এর মত। সুতরাং চোয়ালে যদি এমন কোন জখম করা হয়, যাতে নির্ধারিত দিয়ত রয়েছে, তাহলে নির্ধারিত দিয়ত ওয়াজিব হবে না।

কেননা وَجْهٌ বা মুখমণ্ডল শব্দটি مُوَاجَهَةٌ বা মুখোমুখি হওয়া থেকে নির্গত হয়েছে। আর দর্শক অপর পক্ষের দুই চোয়ালের মুখোমুখি হয় না।

তবে আমাদের মতে চোয়ালদ্বয় কোন ব্যবধান ছাড়া চেহারার সঙ্গে যুক্ত থাকার কারণে তা চেহারাভুক্তই হবে। আর (প্রকৃতপক্ষে) এদু'টির ক্ষেত্রেও মুখোমুখি সাব্যস্ত হয়।

আর ফকীহগণ বলেছেন যে, اَلْجَائِفَةُ এর সম্পর্ক হলো جَوْفٌ বা উদর এর সঙ্গে, তা পেটের উদর হোক কিংবা মাথার 'উদর'।

আর ইমাম তাহাবী (র) এর বক্তব্য মতে 'ন্যায়বানের বিচার'–এর ব্যাখ্যা এই যে, লোকটিকে দাস ধরে জখমহীন অবস্থায় তার মূল্য নির্ধারণ করা হবে। এরপর ঐ জখমসহ তার মূল্য নির্ধাণ করা হবে। তারপর দুই মূল্যের মাঝের পার্থক্য লক্ষ্য করা হবে। যদি তা মূল্যের দশমাংশের অর্ধেক হয় তাহলে দিয়তের দশমাংশের অর্ধেক ওয়াজিব হবে। আর যদি মূল্যের দশমাংশের চতুর্থাংশ হয়, তাহলে দিয়তের দশমাংশের চতুর্থাশ হবে।

আর ইমাম কারখী (র) বলেছেন যে, লক্ষ্য করা হবে যে, مُوَضِّحَةٌ এর তুলনায় এই জখমের পরিমাণ কত। সুতরাং দিয়তের দশমাংশের অর্ধেক থেকে শুরু করে সেই পরিমাণের দিয়ত ওয়াজিব হবে।[১]

কেননা যে বিষয়ে 'নাছ' নেই, সেটাকে 'নাছ সম্পন্ন' বিষয়ের দিকে প্রত্যাবর্তন করানো হবে।

---

১. যেমন بَاضِعَةٌ এর সঙ্গে তুলনা করে দেখা হবে যে, তার পরিমাণ কত। যদি তা مُوَضِّحَةٌ এর তৃতীয়াংশ হয়, তাহলে مُوَضِّحَةٌ এর দিয়তের তৃতীয়াংশ ওয়াজিব হবে। আর যদি উক্ত জখম مُوَضِّحَةٌ এর চতুর্থাংশ হয় তাহলে مُوَضِّحَةٌ এর দিয়তের চতুর্থাংশ ওয়াজিব হবে।

পরিচ্ছেদ ঃ অন্যান্য অঙ্গ প্রসঙ্গ

আর হাতের আঙ্গুলগুলিতে অর্ধেক দিয়ত ওয়াজিব হবে।

কেননা, আমাদের ইতিপূর্বের বর্ণিত হাদীস অনুসারে প্রতি আঙ্গুলের দিয়ত হলো দশমাংশ। সুতরাং পাঁচ আঙ্গুলে অর্ধ দিয়ত হবে।

তাছাড়া যুক্তিগত কারণ এই যে, অঙ্গুলি কর্তনে 'ধরন-সুবিধার'শ্রেণীসত্তা বিলুপ্ত করা হয়। আর সেটাই হলো দিয়ত অবশ্য সাব্যস্তকারী বিষয়। যেমন পেছনে বলা হয়েছে।

আর যদি হাতের পাতাসহ আঙ্গুল কাটা হয়, তাহলে তাতেও অর্ধ-দিয়ত ওয়াজিব হবে। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

وَفِى الْيَدَيْنِ الدِّيَةُ وَفِى اِحْدهُمَا نِصْفُ الدِّيَة

দুই হাতে পূর্ণ দিয়ত ওয়াজিব হয়, আর এক হাতে অর্ধেক দিয়ত দিতে হবে।

তাছাড়া যুক্তিগত কারণ এই যে, যেহেতু ধরার সুবিধা আঙ্গুল দ্বারা অর্জিত হয়, সেহেতু হাতের পাতা আঙ্গুলের অনুবর্তী হবে।

আর যদি অর্ধেক বাহুসহ তা কর্তন করে, তাহলে হাতের পাতাসহ আঙ্গুলে অর্ধেক দিয়ত ওয়াজিব হবে। আর অতিরিক্ত অংশে একজন ন্যায়বান ব্যক্তির বিচার বিবেচ্য হবে। এটা ইমাম আবু ইউসুফ (র) হতে প্রাপ্ত বর্ণনা।

আর আবু ইউসুফ (র) হতে প্রাপ্ত আরেকটি বর্ণনা এই যে, কাঁধ পর্যন্ত এবং উরু পর্যন্ত হাতের ও পায়ের আঙ্গুলের অতিরিক্ত যে পরিমাণই হবে, সেটা অনুবর্তী বলে গণ্য হবে।

কেননা শরীয়ত একটি হাতের ক্ষেত্রে অর্ধেক দিয়ত ওয়াজিব করেছে। আর কাঁধ পর্যন্ত পুরো অঙ্গটাকেই হাত বলে। সুতরাং শরীয়তের নির্ধারণের উপর কোন কিছু বৃদ্ধি করা যাবে না।

তারফায়নের যুক্তি এই যে, হাত হলো ধরবার যন্ত্র। আর ধরার সম্পর্ক হলো হাতের পাতা ও আঙ্গুলের সঙ্গে, বাহুর সঙ্গে নয়। সুতরাং দায় আরোপের ক্ষেত্রে বাহুকে অনুবর্তী সাব্যস্ত করা যায় না।

তাছাড়া বাহুকে আঙ্গুলের অনুবর্তী সাব্যস্ত করায় কোন যুক্তি নেই। কেননা উভয়ের মাঝে পূর্ণ একটি অঙ্গ রয়েছে। তদ্রূপ সেটাকে হাতের পাতার অনুবর্তী করারও যুক্তি নেই। কেননা সেটা নিজেই অনুবর্তী; আর অনুবর্তীর অনুবর্তী হয় না।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন ঃ যদি কবজি থেকে হাত কেটে ফেলা হয়, তাতে একটা আঙ্গুল থাকে, তাহলে পুরোটায় দিয়তের দশমাংশ ওয়াজিব হবে। আর যদি দুইটি আঙ্গুল থাকে, তাহলে তাতে পঞ্চমাংশ ওয়াজিব হবে, আঙ্গুলবিহীন হাতের পাতায় কিছুই ওয়াজিব হবে না।

এটা ইমাম আবু হানীফা (র) এর মত। সাহেবায়ন বলেন ঃ হাতের পাতার ক্ষেত্রে ন্যায়বান ব্যক্তির বিচার এবং আঙ্গুলের ক্ষেত্রে ধার্য দিয়তের দিকে তাকানো হবে। এর মধ্যে পরিমাণে যেটা বেশী হবে, সেটাই কর্তনকারীর উপর ধার্য করা হবে। আর অল্পটা (হাতের পাতা ও আঙ্গুল-এর) সমগ্রটা এক অঙ্গের সমার্থক বিধায় দু'টি ক্ষতিপূরণ একত্র করার কোন যুক্তি নেই। কেননা একদিক থেকে প্রতিটিই স্বতন্ত্র। সুতরাং পরিমাণের আধিক্য দ্বারা আমরা অগ্রগণ্যতা নির্ধারণ করেছি।

আর ইমাম আবু হানীফা (র) এর যুক্তি এই যে, প্রকৃতপক্ষে এবং শরীয়তগতভাবে আঙ্গুলগুলো হলো মূল, আর হাতের পাতা হলো অনুবর্তী। কেননা আঙ্গুল দ্বারাই ধরা সম্পন্ন হয়। আর শরীয়ত একটি আঙ্গুলের বিপরীতে দশটি উট ওয়াজিব করেছে।

আর সত্তাগত ও বিধানগত উভয় দিক থেকে অগ্রাধিকার প্রদান করা, নিছক অবশ্য ধার্য বস্তুর (কম বেশী) পরিমাণের দিক থেকে অগ্রাধিকার প্রদানের চেয়ে উত্তম।

আর যদি হাতের পাতায় তিনটি আঙ্গুল থাকে, তাহলে আঙ্গুলের দিয়ত ওয়াজিব হবে। আর সর্বসম্মত মতেই হাতের পাতার বিপরীতে কিছু ধার্য হবে না।

কেননা মূল্য সম্পন্নতার দিক থেকে আঙ্গুল হচ্ছে আসল আর অধিকাংশের অনুকূলে সমগ্রের বিধান আরোপ করা হয়। সুতরাং আঙ্গুল তিনটি হাতের পাতাকে অনুবর্তী করে নেবে। সমস্ত আঙ্গুল বিদ্যমান থাকার ক্ষেত্রে যেমন হয়।

আর অতিরিক্ত আঙ্গুলের ক্ষেত্রে একজন ন্যায়বান ব্যক্তির বিচার বিবেচ্য হবে।

'মানব'কে মর্যাদা প্রদানের উদ্দেশ্য এ বিধান। কেননা উপকারিতা ও সৌন্দর্য না থাকলেও তা মানুষের হাতের অংশ।

তদ্রূপ বাড়তি দাঁতের ক্ষেত্রে একই বিধান।

এর কারণ আমরা আগে বলেছি।

আর বাচ্চার চোখ এবং তার পুরুষাঙ্গ এবং তার জিহ্বার সুস্থতা (ও অক্ষততা) যদি বোঝা না যায়, তাহলে একজন ন্যায়বানের বিচার বিবেচ্য হবে।

আর ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন ঃ তাতে পূর্ণ দিয়ত ওয়াজিব হবে। কেননা এগুলোর ক্ষেত্রে সুস্থতাই হলো প্রবল। সুতরাং এগুলো বাচ্চার নাকের নরম অংশ এবং কানের উদ্ভিন্ন অংশ কর্তনের সদৃশ হল।

আমাদের যুক্তি এই যে, ঐ তিন অঙ্গের উদ্দেশ্য হলো সুবিধা ভোগ, (সৌন্দর্য নয়)। সুতরাং এগুলোর সুস্থতা না জানা গেলে শুধু ধারণা ও সন্দেহের ভিত্তিতে পূর্ণ দিয়ত ওয়াজিব হতে পারে না।

আর বাহ্যিক অবস্থা দায় আরোপ করার জন্য প্রমাণ হতে পারে না (দায়মুক্তির জন্য প্রমাণ হতে পারে, তাই এমন বাচ্চা গোলাম দ্বারা কাফ্ফারা আদায় হয়)।

নাকের নরম অংশ এবং উদ্ভিন্ন কানের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা এর উদ্দেশ্য হলো সৌন্দর্য, অথচ কর্তনকারী তা পূর্ণ মাত্রায় বিলুপ্ত করেছে।

তদ্রূপ বাচ্চা যদি 'কান্না' করে, তাহলেও একই বিধান হবে।

কেননা এটা 'কথা' নয়; বরং নিছক আওয়াজ। (সুতরাং কান্না দ্বারা জিহ্বার সুস্থতা সাব্যস্ত হবে না।)

আর জিহ্বার ক্ষেত্রে সুস্থতা জানা যাবে কথা বলা দ্বারা, আর পুরুষাঙ্গের ক্ষেত্রে (সুস্থতা জানা যাবে পেশাব করার সময় তার) উত্থান দ্বারা। আর চোখের ক্ষেত্রে (সুস্থতা জানা যাবে) যা অবলোকন প্রমাণ করে (তা দ্বারা)। এগুলোর সুস্থতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পর, ইচ্ছাকৃতভাবে ও অনিচ্ছাকৃতভাবে করার ক্ষেত্রে তার হুকুম প্রাপ্ত বয়স্কের হুকুমের মত হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ কেউ যদি কোন ব্যক্তিকে مُوَضِّحَةٌ (বা হাঁড় বের হয়ে যাওয়া) আঘাত করে, আর তাতে তার আকল ও বুদ্ধি নষ্ট হয়ে যায় কিংবা মাথার চুল উঠে যায় (এবং না গজায়), তাহলে জখমের ক্ষতিপূরণ দিয়তে প্রবিষ্ট হয়ে যাবে।

কেননা আকল বিলুপ্ত হওয়া দ্বারা সমস্ত অঙ্গের সুবিধা বাতিল হয়ে যায়। সুতরাং বিষয়টি مُوَضِّحَةٌ আঘাত করার পর মারা যাওয়ার মত হলো।

আর مُوَضِّحَةٌ আঘাতের ক্ষতিপূরণ সাব্যস্ত হবে চুলের কিছু অংশ বিলুপ্ত হলেই। সুতরাং বিলুপ্ত অংশ গজিয়ে গেলে ক্ষতিপূরণ রহিত হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে পূর্ণ দিয়ত ওয়াজিব হবে সমগ্র চুল বিলুপ্ত হলে। আর ক্ষতিপূরণ ও দিয়ত দু'টোই একটি 'কারণ' (তথা চুলের বিলুপ্তি) এর সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছে। সুতরাং বিধানের ক্ষেত্রে 'অংশ', 'সমগ্র'-এর মাঝে প্রবিষ্ট হয়ে যাবে। যেমন যদি সে কোন ব্যক্তির একটা আঙ্গুল কেটে দেয়, আর তাতে তার হাত অবশ হয়ে যায়; (তাহলে হাতের ক্ষতিপূরণ সাব্যস্ত হবে, আর আঙ্গুলের ক্ষতিপূরণ তাতে প্রবিষ্ট হবে।)

ইমাম যুফার (র) বলেন ঃ مُوَضِّحَةٌ আঘাতের ক্ষতিপূরণ দিয়তে প্রবিষ্ট হবে না। কেননা (مُوَضِّحَةٌ আঘাত এবং বুদ্ধি লোপ পাওয়া বা চুল উঠে যাওয়া) দু'টির প্রতিটি জানের নীচের পর্যায়ের স্বতন্ত্র অপরাধ। সুতরাং একটা অন্যটাতে প্রবিষ্ট হবে না। যেমন অন্যান্য জিনায়াত বা অপরাধের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। আর এ জবাব আমরা আগে উল্লেখ করেছি।

আর যদি مُوَضِّحَةٌ আঘাত দ্বারা শ্রবণশক্তি বা দৃষ্টিশক্তি বা বাকশক্তি লোপ পায়, তাহলে আঘাতকারীর উপর দিয়তের সঙ্গে مُوَضِّحَةٌ আঘাতের ক্ষতিপূরণও অবশ্য সাব্যস্ত হবে।

মাশায়েখে কিরাম বলেন ঃ এটা ইমাম আবু হানীফা ও আবু ইউসুফ (র) এর মত।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) হতে প্রাপ্ত আরেকটি মত এই যে, শ্রবণশক্তি বা বাকশক্তি লোপের দিয়তের মাঝে তা প্রবিষ্ট হবে। দৃষ্টিশক্তি লোপের দিয়তের মাঝে প্রবিষ্ট হবে না।

প্রথম মতামতের যুক্তি এই যে, مُوْضِحَةٌ আঘাত এবং অন্য তিনটি ক্ষতির প্রতিটি হচ্ছে জানের নীচের পর্যায়ের অপরাধ। আর প্রতিটির সুবিধা স্ব-স্ব অঙ্গের সঙ্গে বিশিষ্ট। সুতরাং তা বিভিন্ন অঙ্গের সদৃশ হলো।[১] পক্ষান্তরে আকল ও বুদ্ধির বিষয়টি ভিন্ন। কেননা তার সুবিধা সকল অঙ্গের দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়, যেমন আগে বর্ণনা করেছি।

দ্বিতীয়টির যুক্তি এই যে, (প্রথম দর্শনে) শ্রবণশক্তি ও বাকশক্তি অপ্রকাশিত থাকে।[২] সুতরাং এ দু'টকে আকল ও বুদ্ধির পর্যায়ভুক্ত বিবেচনা করা হবে। পক্ষান্তরে দৃষ্টিশক্তি প্রকাশিত বিষয়। সুতরাং সেটাকে 'আকল'-এর সঙ্গে যুক্ত করা হবে না।

আর জামে সাগীর কিতাবে রয়েছে, কেউ যদি কোন ব্যক্তিকে مُوْضِحَةٌ পর্যায়ের আঘাত করে এবং তার দু'চোখের দৃষ্টিশক্তি চলে যায়, তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে তাতে কিসাস ওয়াজিব হবে না।

মাশায়েখে কিরাম বলেন ঃ তবে ইমাম আবু হানীফা (র) এর মত অনুসারে উভয় ক্ষেত্রে দিয়ত ওয়াজিব হওয়া উচিত। আর সাহেবায়নের মতে مُوْضِحَةٌ পর্যায়ের আঘাতে কিসাস ওয়াজিব হবে।

মাশায়েখে কিরাম বলেন ঃ সাহেবায়নের মত অনুসারে দু'চোখের ক্ষেত্রে দিয়ত ওয়াজিব হওয়া উচিত।

ইমাম মুহম্মদ (র) 'জামে সাগীর' কিতাবে বলেন ঃ কেউ যদি কোন ব্যক্তির 'সর্বাগ্র' গিঁঠ থেকে একটি আঙ্গুল কেটে ফেলে, ফলে আঙ্গুলের অবশিষ্ট অংশ বা পুরো হাত অবশ হয়ে যায়, তাহলে এর কোনটিতেই তার উপর কিসাস ওয়াজিব হবে না। তবে কর্তিত আঙ্গুলের সর্বাগ্র গিঁঠ-এর ক্ষেত্রে দিয়ত সাব্যস্ত হওয়া উচিত, আর আঙ্গুলের অবশিষ্ট অংশে ন্যায়বান ব্যক্তির বিচার বিবেচ্য হওয়া উচিত।

তদ্রূপ (কিসাস আসবে না) যদি কোন ব্যক্তির একটি দাঁতের অংশবিশেষ ভেঙ্গে ফেলে, আর অবশিষ্ট অংশ কালো হয়ে যায়।

মুহাম্মদ (র) 'জামে সাগীর' কিতাবে এ বিষয়ে কোন মতভিন্নতা উল্লেখ করেন নি। তবে পুরো দাঁতটির বিপরীতে দিয়ত অবশ্য সাব্যস্ত হওয়া উচিত।

আর মজলুম ব্যক্তিটি যদি বলে যে, আমি সর্বাগ্রে গিঁঠ পর্যন্ত কাটব, আর অবশিষ্ট অংশ ছেড়ে দেবো কিংবা সে দাঁতের যে পরিমাণ ভেঙ্গেছে (তার দাঁতের) সে পরিমাণ ভাঙ্গব, আর অবশিষ্ট অংশ ছেড়ে দেবো, তাকে সে অধিকার দেয়া হবে না। কেননা (জালিমের) কর্মটি স্বকীয়ভাবে কিসাস ওয়াজিবকারী সাব্যস্ত হয়নি। সুতরাং বিষয়টি এমন হলো যে, (জালিম) তাকে مُوْضِحَةٌ পর্যায়ের আঘাত করলো, আর সে বললো যে, আমি তাকে مُوْضِحَةٌ পর্যায়ের আঘাত করবো, আর অতিরিক্ত পাওনাটা ছেড়ে

১. আর জিনায়াত বা অপরাধ যখন বিভিন্ন অঙ্গে সংঘটিত হয়, তখন একটির ক্ষতিপূরণ অন্যটিতে প্রবিষ্ট হয় না।

২. প্রথম দর্শনে যেমন বুদ্ধিসম্পন্ন এবং অবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির মাঝে তারতম্য করা যায় না, তদ্রূপ বধির অ-বধির এবং বাকরহিত ও 'সবাক' ব্যক্তির মাঝে তারতম্য করা যায় না। পক্ষান্তরে দেখামাত্র দৃষ্টিশক্তির অধিকারী ব্যক্তিকে চেনা যায়। এদিক থেকেই প্রকাশিত অপ্রকাশিত ভাগ করা হয়েছে।

দেবো, (এ আবদার গ্রহণ করা হয় না। কেননা مُثَقَّلَةٌ পর্যায়ের আঘাত স্বকীয়ভাবে কিসাস ওয়াজিবকারী নয়।)

মতপার্থক্যপূর্ণ ক্ষেত্রটিতে সাহেবায়নের যুক্তি এই যে, কর্মটি (এর প্রতিক্রিয়া) দু'টি পৃথক ক্ষেত্রে সম্পন্ন হয়েছে। সুতরাং সূচনা থেকে স্বতন্ত্র দু'টি জিনায়াত বা অপরাধ বলে গণ্য হবে এবং একটির ক্ষেত্রে (চক্ষুদ্বয়ের দৃষ্টিশক্তি বিলুপ্তির ক্ষেত্রে) সৃষ্ট সন্দেহ অন্যটিতে সম্প্রসারিত হতে পারে না। যেমন কেউ এক ব্যক্তির দিকে ইচ্ছাকৃতভাবে তীর নিক্ষেপ করলো এবং তাকে ভেদ করে তা অন্যের গায়ে লাগলো এবং সেও নিহত হলো। এ ক্ষেত্রে প্রথমটিতে কিসাস ওয়াজিব হবে। (কিন্তু সন্দেহের কারণে দ্বিতীয়টিতে নয়।)

ইমাম আবু হানীফা (র) এর যুক্তি এই যে, প্রথম জখমটি সংক্রমণসম্পন্ন, আর শাস্তি বিধান হবে সদৃশ দ্বারা; অথচ সংক্রমণ সম্পন্ন জখম সৃষ্টি করা তার সাধ্যে নেই।[১] সুতরাং (বিকল্প হিসাবে) মাল ওয়াজিব হবে।

তাছাড়া প্রকৃতপক্ষে এখানে একটিমাত্র কর্ম। আর তা হলো আঘাত করার সময়ে বিদ্যমান অঙ্গ সঞ্চালন। তদ্রূপ এক হিসাবে উভয় অপরাধের ক্ষেত্রেও অভিন্ন। কারণ একটি অন্যটির সঙ্গে যুক্ত। সুতরাং অপরাধের সমাপ্তি অংশটি প্রারম্ভের অংশে অনিচ্ছাকৃতভাবে করার সন্দেহ সৃষ্টি করেছে।[২]

দু'টি জানের ক্ষেত্রে বিষয়টি ভিন্ন হবে। কেননা এখানে একটি অন্যটির সংক্রমণ থেকে সৃষ্টি নয়।[৩] তদ্রূপ অন্য আঙ্গুলের উপর ছুরি পড়ে যাওয়ার মাসআলাটি ভিন্ন। কেননা এটা উদ্দেশ্য সম্পন্ন কর্ম নয়।[৪]

---

১. অর্থাৎ এখানে দু'টি জিনিস, একটি হল জখম ,আরেকটি হল জখমের সংক্রমণ। আর সংক্রমণের দিক থেকে তো ওয়াজিব করা সম্ভব নয়। কেননা কিসাস রূপে যে জখমই করা হবে, তা সংক্রমিত নাও হতে পারে। সুতরাং সেটা প্রথম জখমের সদৃশ হবে না। আর সদৃশ্যতা ছাড়া কিসাস হতে পারে না। সুতরাং মূল ক্ষেত্রেও কিসাস ওয়াজিব হবে না।

২. অর্থাৎ অপরাধের শেষ অংশেতো সর্বসম্মতিক্রমেই কিসাস ওয়াজিব হবে না। সুতরাং উভয়ের অভিন্নতার প্রেক্ষিতে অপরাধের শেষ অংশে কিসাস ওয়াজিব না হওয়া প্রথম অংশের অনিচ্ছাকৃতভাবে করার সন্দেহ সৃষ্টি করবে।

৩. সাহেবায়ন যে নযীর পেশ করেছেন, তার জবাব। জবাবের খোলাসা এই যে, আমরা অপরাধ কর্মটিকে অভিন্ন ধরেছি এই হিসাবে যে, দ্বিতীয়টি প্রথমটির সংক্রমণ থেকে সম্পন্ন হয়েছে। সুতরাং সংক্রমণের ক্ষেত্রে দ্বিতীয়টি প্রথমটির অনুবর্তী হওয়া দরকার। আর অনুবর্তিতা অভিন্ন ব্যক্তির মাঝে হতে পারে। অথচ দ্বিতীয় মানুষটির ক্ষেত্রে কর্মটি প্রত্যক্ষ ও স্বতন্ত্রভাবে সম্পন্ন হয়েছে। সংক্রমিতভাবে নয়। কেননা এক মানুষ থেকে অন্য মানুষে ক্ষত সংক্রমিত হতে পারে না। সুতরাং দ্বিতীয়টিকে আলাদা কর্ম হিসাবে গণ্য করতে হবে। আর তা ছিল অনিচ্ছাকৃত।

৪. এটি একটি জবাব। প্রশ্ন এই যে, কেউ যখন কোন ব্যক্তির একটি আঙ্গুল ইচ্ছাকৃতভাবে কাটে আর কর্তনকারীর হাত কেঁপে গিয়ে ছুরিটি অন্য আঙ্গুলে গিয়ে পড়ে এবং ভুলক্রমে সেটি কেটে ফেলে। সেক্ষেত্রে প্রথম আঙ্গুলে কিসাস আসে। কিন্তু দ্বিতীয় আঙ্গুলে কিসাস আসে না। তাহলে আমাদের আলোচ্য মাসআলায় তেমন হবে না কেন? অথচ উভয় ক্ষেত্রে ব্যক্তি অভিন্ন। উত্তর এই যে, পরবর্তী আঙ্গুলের কর্তন প্রথমটির কর্তনের উদ্দেশ্যভুক্ত নয়। অর্থাৎ প্রথমটির কর্তনের প্রতিক্রিয়ারূপে সৃষ্টি নয়। কেননা উচ্ছাকৃত কর্ম থেকে অনিচ্ছাকৃত কর্ম উদ্দিষ্ট হতে পারে না। সুতরাং দ্বিতীয়টিকে প্রথমটির সম্পূরক ও সমাপ্তি সাব্যস্ত করা যায় না। সুতরাং দু'টি ভিন্ন কর্ম হওয়ার কারণে দ্বিতীয়টি প্রথমটিতে অনিচ্ছাকৃতির সন্দেহ সৃষ্টি করতে পারে না। সুতরাং দ্বিতীয়টি পৃথক বিধান সম্বলিত হবে। সুতরাং সেটিকে দ্বিতীয়টির সম্পূরক ও সমাপ্তি সাব্যস্ত করা যায়। ফলে সংক্রমণ অপরাধ কর্মের প্রথম অংশে অনিচ্ছাকৃতির সন্দেহ সৃষ্টি করতে পারে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ যদি একটি আঙ্গুল কেটে ফেলে আর তার পার্শ্ববর্তী অন্য আঙ্গুল অবশ হয়ে যায়, তাহলে তার কোনটিতেই ওয়াজিব হবে না।

এটা ইমাম আবু হানীফা (র) এর মত। পক্ষান্তরে সাহেবায়ন এবং ইমাম যুফার এবং হাসান ইবন যিয়াদ (র) বলেন ঃ প্রথম আঙ্গুলের বিপরীতে কিসাস গ্রহণ করা হবে। আর দ্বিতীয়টির বিপরীতে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

আর উভয় পক্ষের যুক্তি আমরা (مُوَضِّحَةٌ পর্যায়ের আঘাতে চোখের আলো চলে যাওয়া প্রসঙ্গে) উল্লেখ করেছি।

আর প্রথম মাসআলাটি (অর্থাৎ مُوَضِّحَةٌ পর্যায়ের আঘাতে চোখের জ্যোতি চলে যাওয়া) সম্পর্কে ইবনে সাম্মা'আ (র) মুহম্মদ (র) হতে বর্ণনা করেছেন যে, উভয় ক্ষেত্রে কিসাস ওয়াজিব হবে।

কেননা যে অপরাধটি প্রত্যক্ষ সংক্রমণ দ্বারা সংঘটিত হয়, তাতে কিসাস কার্যকর হয়। যেমন (দ্বিতীয়) জানটি হত্যার ক্ষেত্রে এবং مُوَضِّحَةٌ পর্যায়ের আঘাত দ্বারা দৃষ্টিশক্তি বিলুপ্তির ক্ষেত্রে।

শেষ মতপার্থক্যপূর্ণ মাসআলাটি ভিন্ন। কেননা অবশতার ক্ষেত্রে কিসাসের বিধান নেই।

মোট কথা (ইবনে সাম্মাআর) এই বর্ণনা মতে মুহম্মদ (র) এর মূলনীতি হলো এই যে, যে 'অপরাধকর্মে' কিসাস ওয়াজিব হয়েছে, তা যদি সংক্রমিত হয়ে এমন কর্মে পর্যবশিত হয়, যাতে কিসাস কার্যকর করা সম্ভব, তবে তাতে বিশ্বাস কার্যকর করা হবে। যেমন অঙ্গুলি কর্তনের জখম যদি প্রাণঘাতীতে পরিণত হয়, আর প্রথম কর্মটি ইচ্ছাকৃতভাবে সংঘটিত হয়ে থাকে।

মশহূর বর্ণনার যুক্তি এই যে, চোখের জ্যোতির বিলুপ্তি হয়েছে 'কারণ সৃষ্টিকরণ' প্রক্রিয়ায়, (প্রত্যক্ষভাবে নয়)। লক্ষণীয় যে, (مُوَضِّحَةٌ পর্যায়ের) জখমটি নিজস্বভাবেই বিধান সাবস্ত্যকারীরূপে বহাল রয়েছে। আর কারণ সৃষ্টিকরণ-এর ক্ষেত্রে কিসাস সাব্যস্ত হয় না। পক্ষান্তরে জানের দিকে (জখমের) সংক্রমণের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা প্রথমটি (অর্থাৎ জখম) তখন বিবেচ্য থাকে না। সুতরাং দ্বিতীয়টি (অর্থাৎ প্রাণহানি) প্রত্যক্ষ অপরাধরূপে পরিবর্তিত হয়ে যায়।

গ্রন্থকার বলেন ঃ আর যদি দাঁতের কিছু অংশ ভেঙ্গে ফেলে এবং অবশিষ্ট অংশ পড়ে যায় তাহলে কিসাস ওয়াজিব হবে না।

কিন্তু ইমাম মুহম্মদ (র) হতে ইবনে সাম্মাআর বর্ণনা মতে ওয়াজিব হবে। তদ্রূপ যদি দুইটি مُوَضِّحَةٌ পর্যায়ের আঘাত করে। তারপর তা পরস্পর মিলে একটি জখমে রূপান্তরিত হয়, তাহলে এক্ষেত্রে এই দুইটি বর্ণনা প্রযোজ্য হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ যদি কোন লোকের একটি দাঁত উপড়ে ফেলে এরপর তার স্থলে নতুন দাঁত ওঠে, তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে দিয়ত রহিত হবে।

সাহেবায়ন (র) বলেন ঃ অপরাধীর উপর পূর্ণ দিয়ত ওয়াজিব হবে। কেননা অপরাধ পূর্ণমাত্রায় সাব্যস্ত হয়েছে। আর নতুন গজানো দাঁত হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ হতে নতুনভাবে প্রদত্ত নিয়ামত।

ইমাম আবু হানীফা (র) এর যুক্তি এই যে, (নতুন দাঁত ওঠার মাধ্যমে) অপরাধ গুণগতভাবে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। সুতরাং বিষয়টি এমন হলো যে, বাচ্চার একটি দাঁত উপড়ে ফেললো, আর তার স্থলে নতুন দাঁত উঠলো, এ অবস্থায় তো সর্বসম্মত মতে দিয়ত ওয়াজিব হয় না। কেননা বাচ্চার দন্ত-সুবিধা ও দন্তশোভা লুপ্ত হয়নি।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) হতে প্রাপ্ত বর্ণনা মতে ব্যথা সৃষ্টির কারণে কোন ন্যায়বানের বিচার অবশ্য বিবেচ্য হবে।

যদি সে কারো দাঁত উপড়ে ফেলে আর দাঁত ওয়ালা সেটাকে যথাস্থানে পুনঃস্থাপনের ব্যবস্থা করে, আর তাতে মাড়ির গোশত উদ্গত হয়, তাহলে উৎপাটনকারীর উপর পূর্ণ দিয়ত ওয়াজিব হবে।

কারণ শিরাগুলো যেহেতু পুনঃসচল হয় না, সেহেতু এই উদগম বিবেচ্য নয়।

তদ্রূপ (দিয়ত দিতে হবে) যদি কারো কান কেটে ফেলে, আর কানওয়ালা পুনঃসংযোজন করে এবং তা জোড়া লেগে যায়।

কেননা (প্রকৃতভাবে) তা পূর্ব-অবস্থায় ফিরে আসে না।

কেউ যদি কারো দাঁত উৎপাটন করে, এরপর দন্ত-উৎপাটিত ব্যক্তি উৎপাটকের দাঁত উপড়ে ফেলে; আর প্রথমজনের দাঁত উদগত হয়, তাহলে প্রথমজনের উপর দ্বিতীয়জনের অনুকূলে পাঁচশ দিরহাম অবশ্য সাব্যস্ত হবে।

কেননা (দন্ত-উদগম দ্বারা) প্রকাশ পেয়ে গেল যে, সে না-হকভাবে উশুল করেছে। কারণ 'উদগম বিনষ্টতা' হলো দিয়ত অবশ্য সাব্যস্তকারী, অথচ তা বিনষ্ট হয়নি। কারণ তার স্থলে নতুন দাঁত উঠে এসেছে। সুতরাং কৃত অপরাধ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এ কারণেই সর্বসম্মত মতে এক বছর অপেক্ষা করা হবে। অবশ্য কর্তব্য ছিল কিসাস গ্রহণের জন্য (দন্ত উদগমনের ব্যাপারে) হতাশ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা। কিন্তু সেটা বিবেচনা করতে গেলে হক নষ্ট হয়। তাই আমরা এক বছরকে যথেষ্ট মনে করেছি। কেননা সাধারণত এ সময়ের মধ্যে দাঁত উঠে যায়। সুতরাং এক বছর যখন পার হয়ে যাবে, আর দাঁত উঠবে না, তখন আমরা কিসাসের ফায়সালা প্রদান করবো। কিন্তু এরপর যদি দাঁত ওঠে, তাহলে প্রকাশ পাবে যে, কিসাসরূপে দন্ত উৎপাটন করে আমরা ভুল করেছি এবং কিসাস উশুল করা প্রাপ্য হক ছাড়াই হয়েছে। তবে সৃষ্ট সন্দেহের কারণে কিসাস ওয়াজিব নয়, বরং মাল ওয়াজিব হবে।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন ঃ কেউ যদি কারো দাঁতে আঘাত করে, আর তা নড়ে যায়, তাহলে অপরাধীর কর্মের ফলাফল প্রকাশ পাওয়ার জন্য এক বছর অপেক্ষা করা হবে। সে হিসাবে কাযী যদি তাকে এক বছরের অবকাশ প্রদান করেন, আর প্রহৃত ব্যক্তি দাঁত পড়া অবস্থায় হাজির হয়, আর বছর হওয়ার আগে উভয়ে অপরাধীর প্রহারে দাঁত পড়া

নিয়ে মতবিরোধে লিপ্ত হয়, তাহলে প্রহৃত ব্যক্তির বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে, যাতে মেয়াদের অবকাশ প্রদান অর্থবহ হয় (কারণ অবকাশ প্রদানের উদ্দেশ্য ছিল ফলাফল প্রকাশ পাওয়া।)

পক্ষান্তরে যদি مُوْضِحَةٌ (বা হাড় বেরিয়ে যাওয়া) আঘাত করে থাকে, এরপর এমন অবস্থায় হাজির হলো যে, তার আঘাতটি مُنَقِّلَةٌ (বা হাড় স্থানচ্যুত হওয়া) আঘাতে পরিণত হয়েছে, আর উভয়ে মতবিরোধে লিপ্ত হলো (আঘাত প্রাপ্ত ব্যক্তি বললো যে, مُوْضِحَةٌ আঘাত مُنَقِّلَةٌ এর রূপান্তরিত হয়েছে। আর আঘাতকারী বললো যে, এটা অন্য কারো আঘাতের ফল); এক্ষেত্রে আঘাতকারীর বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে।

কেননা مُوْضِحَةٌ আঘাত مُنَقِّلَةٌ আঘাতে রূপান্তরিত হয় না। পক্ষান্তরে দাঁতকে নাড়া দেয়া পড়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে। সুতরাং দু'টি ক্ষেত্র পৃথক হয়ে গেল।

আর যদি তারা এক বছর পরে দাঁত পড়ে যাওয়ার ব্যাপারে মতবিরোধে লিপ্ত হয়। তাহলে আঘাতকারীর বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে। কারণ সে তার কর্মের আসর বা প্রতিক্রিয়া অস্বীকার করছে। আর কর্মের ফল বা প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পাওয়ার জন্য কাযী যে সময় বির্ধারণ করে ছিলেন, তা অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। সুতরাং (বাহ্যিক অবস্থা তার অনুকূল হওয়ার কারণে) অস্বীকারকারীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে।

আর যদি মেয়াদের পরেও তার দাঁত না পড়ে, তাহলে আঘাতকারীর উপর কোন দণ্ড বর্তাবে না। তবে ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর মতে ব্যথার বিষয়ে একজন ন্যায়বানের বিচার বিবেচ্য হবে। উভয় বর্ণনার কারণ ইনশাআল্লাহ্ এরপর আমরা বর্ণনা করবো।

আর যদি এমন হয় যে, পড়েনি কিন্তু কালো হয়ে গেছে তাহলে অনিচ্ছাকৃত আঘাতের ক্ষেত্রে আকিলাহদের উপর পূর্ণ দিয়ত ওয়াজিব হবে। আর ইচ্ছাকৃত আঘাতের ক্ষেত্রে তার নিজস্ব মাল থেকে দিয়ত দিতে হবে। কিন্তু কিসাস ওয়াজিব হবে না। কেননা, আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তির পক্ষে এমনভাবে আঘাত করা সম্ভব হবে না যাতে দাঁত কালো হবে, (কিন্তু পড়বে না, বরং আঘাতের কর্ম বেশী হওয়ারই প্রবল সম্ভাবনা)।

তদ্রূপ যদি আঘাতের কারণে দাঁতের কিছু অংশ ভেঙ্গে যায়, আর কিছু অংশ কালো হয়ে যায়, তাহলে আমাদের উল্লেখিত একই কারণে কিসাস ওয়াজিব হবে না। লাল বা সবুজ হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রেও একই বিধান।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ কেউ যদি কোন লোককে জখম করে, এরপর তা শুকিয়ে ভরাট হয়ে যায় এবং কোন চিহ্ন বিদ্যমান না থাকে, আর চুল গজিয়ে যায়, তাহলে দিয়ত রহিত হয়ে যাবে।

এটা ইমাম আবু হানীফা (র) এর মত। কেননা দিয়ত ওয়াজিবকারী অসৌন্দর্য দূর হয়ে গেছে।

আর ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন ঃ কোন ন্যায়বানের বিচার দ্বারা সাব্যস্ত ব্যথার ক্ষতিপূরণ তার উপর ধার্য হবে।

কেননা জখমের কারণে সৃষ্ট অসৌন্দর্য দূর হলেও সৃষ্ট ব্যথা তো দূর হয়নি। সুতরাং মূল্য নির্ধারণ আবশ্যক হবে।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন ঃ চিকিৎসকের এবং ঔষধের খরচ তার উপর ধার্য হবে। কেননা আঘাতকারীর কর্মের কারণেই আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তির উপর চিকিৎসকের এবং ওষুধের খরচ চেপেছে। সুতরাং যেন সে-ই আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তির মাল থেকে তা নিয়েছে।

তবে ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন ঃ আমাদের মূলনীতি অনুযায়ী বস্তুর সুবিধাসমূহ হয় চুক্তি দ্বারা কিংবা চুক্তিসদৃশ কার্য দ্বারা।[১] আর অপরাধীর ক্ষেত্রে তা পাওয়া যায়নি। সুতরাং সে কোন ক্ষতিপূরণের দায় বহন করবে না।[২]

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন ঃ কেউ যদি কোন লোককে চাবুকের একশটি আঘাত করে এবং তাকে জখম করে ফেলে, এরপর সে তা থেকে সুস্থ হয়ে যায়, তাহলে তার উপর প্রহারের ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে। অর্থাৎ যদি প্রহারের চিহ্ন বহাল থাকে। পক্ষান্তরে চিহ্ন বহাল না থাকলে 'জখম ভরাট হওয়া' প্রসঙ্গে যে মতপার্থক্য হয়েছে, এখানেও তা হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ কেউ যদি ভুলক্রমে কোন ব্যক্তির হাত কেটে ফেলে এরপর নিরাময়ের পূর্বে তাকে (ভুলক্রমে) হত্যা করে, তাহলে তার উপর পূর্ণ দিয়ত ওয়াজিব হবে এবং হাতের খণ্ডিত দিয়ত রহিত হয়ে যাবে।

কেননা, উভয় অপরাধ একই শ্রেণীভুক্ত। উভয়ের বিধানও অভিন্ন, অর্থাৎ দিয়ত। আর (পূর্ণ) দিয়ত হচ্ছে সমস্ত অঙ্গ-প্রতঙ্গসহ তার দেহ ও প্রাণ সত্তার বিনিময়। সুতরাং উক্ত অঙ্গ দেহ ও প্রাণ সত্তার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। যেন সূচনাতেই তাকে হত্যা করেছে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ কেউ যদি কোন লোককে জখম করে, তাহলে সুস্থ হওয়া পর্যন্ত তার থেকে কিসাস নেয়া হবে না।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন ঃ তৎক্ষণাৎ কিসাস গ্রহণ করা হবে জানের কিসাসের উপর কিয়াস করে। কেননা কিসাস সাব্যস্তকারী আঘাত অস্তিত্ব লাভ করে ফেলেছে। সুতরাং তাকে নিষ্ক্রিয় রাখা যায় না।

আমাদের প্রমাণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী ঃ

يُسْتَانَى فِى الْجِرَاحَاتِ سَنَةً .

জখমের ক্ষেত্রে এক বছর বিলম্ব করা হবে। তাছাড়া যুক্তিগত কারণ এই যে, জখমাদির ক্ষেত্রে পরবর্তী পরিণতি বিবেচনা করা হয়, বর্তমান অবস্থা নয়।

---

১. চুক্তি, যেমন বিশুদ্ধ ইজারা, আর চুক্তি সদৃশ কর্ম, যেমন ফাসিদ ইজারা।

২. আর নিছক ব্যথার মূল্য নেই। লক্ষ্যণীয় যে, যদি শুধু ব্যথাদায়ক আঘাত করে, কিন্তু কোন চিহ্ন সৃষ্টি না হয়, তাহলে কোন দণ্ড আসে না; তাছাড়া গালি দেয়ার কারণে মনে যে ব্যথা সৃষ্টি হয়, সেটা বিবেচনায় এনে কোন ক্ষতিপূরণ ধার্য করা হয় না।

কেননা বর্তমানে আঘাতটির সম্ভাব্য বিধান জানা নেই। কারণ হতে পারে যে, তা প্রাণ পর্যন্ত সংক্রমিত হলো, তখন প্রকাশ পাবে যে, এ আঘাত দ্বারা সে তাকে হত্যা করেছে। আর সুস্থতা লাভ দ্বারাই আঘাতের ফলাফল 'স্থিত' হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ আর যে কোন ইচ্ছাকৃত অপরাধের কিসাস সন্দেহের কারণে রহিত হয়ে যাবে, তার দিয়ত হত্যাকারীর নিজস্ব মাল থেকে আদায় হবে আর যে কোন 'দিয়ত' সমঝোতার মাধ্যমে সাব্যস্ত হবে, তা হত্যাকারীর নিজস্ব মাল থেকে আদায় হবে।

কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ لَاتَعْقِلُ الْعَوَاقِلُ عَمَدًا (البيهقى) অর্থাৎ আকিলাহগণ ইচ্ছাকৃত হত্যায় দিয়তের দায় বহন করবে না। আর এটা তো ইচ্ছাকৃত হত্যা, তবে প্রথম অবস্থায় দিয়ত তিন বছর মেয়াদে পরিশোধ করা ওয়াজিব হয়; কেননা তা এমন মাল, যা হত্যার কারণে সূচনাতেই ওয়াজিব হয়েছে। সুতরাং তা প্রায় ইচ্ছাকৃত হত্যার সদৃশ হলো।

আর দ্বিতীয় অবস্থায় তা অবিলম্বে ওয়াজিব হয়।

কেননা তা এমন মাল, যা সমঝোতা চুক্তির মাধ্যমে ওয়াজিব হয়েছে। সুতরাং তা বিক্রয় মূল্যের সদৃশ হলো।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ পিতা যদি পুত্রকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে, তাহলে তার নিজস্ব মাল থেকে তিন বছর মেয়াদে দিয়ত ওয়াজিব হবে।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন ঃ অবিলম্বে ওয়াজিব হবে। কেননা মূলনীতি এই যে, নষ্ট করার কারণে যে মাল ওয়াজিব হয়, তা তাৎক্ষণিকভাবে ওয়াজিব হয়ে থাকে। আর মেয়াদ নির্ধারণ করা হয় অনিচ্ছাকৃত অপরাধকারীর অনুকূলে সহজ করার জন্য। আর এ হচ্ছে ইচ্ছাকৃত অপরাধকারী। সুতরাং সে এই সহজ করার হকদার হতে পারে না।

তাছাড়া এই মাল ওয়াজিব হয়েছে পুত্রের হকের ক্ষতিপূরণ রূপে, আর নিজের জানের উর পুত্রের হক ছিল বর্তমান। সুতরাং বিলম্বিত বস্তু দ্বারা সেটার ক্ষতিপূরণ হতে পারে না।

আমাদের যুক্তি এই যে, এটা এমন মাল, যা হত্যার কারণে ওয়াজিব হয়েছে। সুতরাং তা বিলম্বিত হবে। অনিচ্ছাকৃত হত্যার এবং প্রায় ইচ্ছাকৃত হত্যার দিয়তের ক্ষেত্রে যেমন হয়ে থাকে।

আর এটা এজন্য যে, (মাল ও মানুষের মাঝে) সাদৃশ্যদা না থাকার কারণে কিয়াস কিন্তু মাল দ্বারা মূল্য নির্ধারণকে প্রত্যাখ্যান করে। তবে শরীয়তের পক্ষ হতে মূল্য নির্ধারণ সাব্যস্ত হয়েছে। আর শরীয়ত বিলম্বিত রূপেই সাব্যস্ত হয়েছে, অবিলম্বিত রূপে নয়। সুতরাং তা পরিহার করা যাবে না, বিশেষতঃ বৃদ্ধি করার দিকে।

আর যখন ইচ্ছাকৃত তার দিক বিবেচনা করে পরিমাণগতবাবে কঠিনতা আরোপ করা (অর্থাৎ দশ হাজার দিরহাম থেকে বৃদ্ধি করা) জাইয্ হয় না, তখন গুণগত দিক থেকেও কঠোরতা আরোপ করা যাবে না।

আর যে কোন অপরাধ অপরাধীর স্বীকারোক্তি দ্বারা সাব্যস্ত হবে, তার দিয়ত তার নিজস্ব মাল থেকে আদায় করা হবে। **আকিলাহদের প্রতিকূলে তার স্বীকারোক্তিকে সত্যায়ন করা হবে না।**

কারণ আমাদের বর্ণিত হাদীস।

তাছাড়া যুক্তিগত কারণ এই যে, স্বীকারোক্তি স্বীকারোক্তিকারীকে অতিক্রম করতে পারে না। কেননা অন্যের উপর তার কর্তৃত্ব নেই। সুতরাং আকিলাহদের উপর তার স্বীকারোক্তি কার্যকর হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ অপ্রাপ্তবয়স্ক ও পাগলের ইচ্ছাকৃতভাবে করা, অনিচ্ছাকৃতভাবে করা বলে গণ্য। আর সেক্ষেত্রে আকিলাহদের উপর দিয়ত ওয়াজিব হবে। তদ্রূপ যে কোন অপরাধের বিধান হলো পাঁচশ দিরহাম বা তার বেশী যেটা আকিলাহদের উপর ওয়াজিব হবে। আর মানসিক প্রতিবন্ধী (যার কথা অসংলগ্ন) পাগলের পর্যায়ভুক্ত।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন ঃ তাদের প্রত্যেকের ইচ্ছাকৃত অপরাধ ইচ্ছাকৃত বলেই গণ্য হবে। এ কারণেই তার নিজস্ব মাল থেকে দিয়ত আদায় করা হয়। কেননা প্রকৃতপক্ষে তো সেটা ইচ্ছাকৃত অপরাধ। পার্থক্য শুধু এই যে, ইচ্ছাকৃত অপরাধের দু'টি বিধানের একটি অর্থাৎ কিসাস, তার থেকে সরে গেছে। সুতরাং দ্বিতীয়টি তার দিকে সরে আসবে। অর্থাৎ তার নিজস্ব মাল থেকে দিয়ত ওয়াজিব হবে।

আর ইচ্ছাকৃতভাবে করার কারণেই তো ইমাম আবু হানীফা (র) এর মূলনীতি অনুযায়ী— এই হত্যা দ্বারা কাফ্ফারা ওয়াজিব হয় এবং মীরাছ থেকে বঞ্চিত হয়। কারণ এ দু'টি বিধানের সম্পর্ক হলো হত্যার সঙ্গে।

আমাদের প্রমাণ এই যে, আলী (রা) সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি পাগলের দিয়ত তার আকিলাহদের উপর ধার্য করেছিলেন এবং বলেছিলেন, তার ইচ্ছাকৃতভাবে করা অনিচ্ছাকৃতভাবে করার সমান।

তাছাড়া যুক্তিগত কারণ এই যে, বাচ্চা হলো দয়ার উপযুক্ত। আর ভুলক্রমে অপরাধকারী প্রাপ্তবয়স্ক ও সুস্থ মস্তিষ্ক ব্যক্তি যখন সহজ বিধানের হকদার হয় এবং তার দিয়ত আকিলাহদের উপর ওয়াজিব হয়, তখন বাচ্চা এই সহজ বিধানের আরো বেশী হকদার হবে। কেননা, তার ওযর আরো বেশী গ্রহণযোগ্য।

আর এক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পন্ন হওয়া আমরা স্বীকার করি না। কেননা ইচ্ছাকৃতভাবে করা নির্ভর করে জানার উপর। আর জানা হয় আকল ও জ্ঞান দ্বারা। অথচ পাগল হচ্ছে আকলহীন আর বাচ্চার আকল হচ্ছে অসম্পূর্ণ। সুতরাং কিভাবে তাদের থেকে 'ইচ্ছা' অস্তিত্ব লাভ করতে পারে ? সুতরাং (ইচ্ছা রহিত হওয়ার দিক থেকে) উভয়ে ঘুমন্ত ব্যক্তির ন্যায় হলো।

আর মীরাছ থেকে বঞ্চিত হওয়া হচ্ছে একটি শাস্তি, অথচ পাগল ও বাচ্চা শাস্তি প্রাপ্তির উপযুক্ত নয়।

আর কাফ্ফারা -তার নামের অর্থের মতই—গুনাহ আড়ালকারী। আর যেহেতু তাদের গুনাহ লেখা হয় না, সেহেতু তাদের আড়াল করার মত কোন গুনাহ নেই।

পরিচ্ছেদ ঃ গর্ভস্থ সন্তান প্রসঙ্গ

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ কেউ যদি কোন স্ত্রীলোকের পেটে আঘাত করে, ফলে তার গর্ভস্থ সন্তান মৃত অবস্থায় পড়ে যায়, তাহলে ঐ সন্তানের বিপরীতে পূর্ণ দিয়তের দশমাংশের অর্ধেক ওয়াজিব হবে।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন ঃ এর অর্থ হলো পুরুষের দিয়ত। আর এটা পুত্র সন্তানের ক্ষেত্রে। পক্ষান্তরে কণ্যা সন্তানের ক্ষেত্রে হবে স্ত্রীলোকের দিয়তের দশমাংশ। (অবশ্য ফলাফল এক। কেননা) উভয়টির পরিমাণ হচ্ছে পাঁচশ দিরহাম।

কিয়াসের দাবী হলো কিছু ওয়াজিব না হওয়া। কেননা গর্ভে থাকা অবস্থায় তার প্রাণের অস্তিত্ব সুনিশ্চিত নয়। আর (প্রাণ থাকার) বাহ্যিক অবস্থা হকদার সাব্যস্ত হওয়ার জন্য 'প্রমাণেরযোগ্যতা' রাখে না।

আর সূক্ষ্ম কিয়াসের যুক্তি হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত হাদীস। তিনি বলেছেন ঃ

فِى الْجَنِيْنِ غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ قِيْمَتُهُ خَمْسُ مِائَةٍ وَيُرْوٰى أَوْ خَمْسُ مِائَةٍ ٠

গর্ভস্থ সন্তানের ক্ষেত্রে একটি দাস বা দাসী ধার্য হবে, যার মূল্য পাঁচশ দিরহাম।

তাই আমরা হাদীসের বিপরীতে কিয়াস বর্জন করেছি।

আর এই হাদীস তাদের বিপক্ষে প্রমাণ, যারা দিরহাম নির্ধারণ করেছেন, যেমন ইমাম মালিক ও শাফেয়ী (র)।

আর আমাদের মতে তা আকিলাহদের উপর ওয়াজিব হবে।

আর ইমাম মালিক (র) বলেন ঃ আঘাতকারীর নিজস্ব মাল থেকে তা আদায় করা ওয়াজিব হবে। কেননা এটা হলো অংশের বিনিময়, (জানের বিনিময় নয়, আর আকিলাহ্রা শুধু জানের বিনিময় বহন করে থাকে।

আমাদের প্রমাণ এই যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গর্ভস্থ সন্তানের দিয়ত আকিলাহ্দের উপর ধার্য করেছেন। (আবু দাউদ শরীফ)

তাছাড়া যুক্তিগত কারণ এই যে, এটা গর্ভস্থ সন্তানের জানের বিনিময়। এজন্যই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটাকে দিয়ত আখ্যা দিয়ে বলেছেন ঃ তোমরা তার দিয়ত আদায় কর। সাহাবা কিরাম বললেন ঃ যে সন্তান কাঁদলো না, চিৎকার করলো না, তার দিয়ত আদায় করবো ?

তবে পাঁচশ দিরহামের কম হলে আকিলারা তা আদয় করবে না।[১]

আর তা এক বছরের মেয়াদে ওয়াজিব হবে।

---

১. অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটাকে দিয়ত বলেছেন; আর দিয়ত হল জানের বিনিময়। সুতরাং পাঁচশ দিরহামের কম হলেও তা আকিলাদেরই আদায় করার কথা। কেননা জানের বিনিময় আকিলাদেরই বহন করতে হয়, কম হোক বা বেশী। তবে যেহেতু এটা এক হিসাবে মায়ের দেহাংশের বিনিময়, একারণে পাঁচশ দিরহামের কম হলে তা আকিলাদের উপর বর্তাবে না।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন ঃ তিন বছরের মেয়াদে ওয়াজিব হবে। কেননা এটা জানের বিনিময়, (স্ত্রীলোকটির দেহাংশের বিনিময় নয়)। এ কারণেই উক্ত দিয়ত গর্ভস্থ সন্তানের ওয়ারিসদের মাঝে বণ্টিত হয়, (স্ত্রীরোকটির ওয়ারিসদের মাঝে নয়।)

আমাদের প্রমাণ মুহম্মদ ইবন হাসান (র) বর্ণিত হাদীস। তিনি বলেন ঃ আমাদের কাছে এই মর্মে হাদীস পৌঁছেছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গর্ভস্থ সন্তানের দিয়ত আকিলাহ্‌দের উপর এক বছর মেয়াদে ধার্য করেছেন।

তাছাড়া যুক্তিগত কারণ এই যে, পৃথক 'প্রাণ' হওয়ার কারণে এক হিসাবে যদি এটা জানের বিনিময় হয়ে থাকে, তবে মায়ের সঙ্গে যুক্ততার কারণে অন্য দিক থেকে তা মায়ের দেহাংশের বিনিময়। সুতরাং মীরাছ প্রদানের ক্ষেত্রে আমরা প্রথম সদৃশ্যতার উপর আমল করেছি, আর এক বছর মেয়াদ নির্ধারণের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় সদৃশ্যতার উপর আমল করেছি।

কেননা অঙ্গের বিনিময় যদি দিয়তের তৃতীয়াংশ হয় কিংবা তার কম, তবে দশমাংশের অর্ধেকের বেশী হয়, সেক্ষেত্রে তা এক বছরের মেয়াদে ওয়াজিব হয়।

দিয়তের বিভিন্ন অংশের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, এটি দিয়তের প্রতিটি অংশ যাদের উপর হবে, তা তিন বছর মেয়াদেই ধার্য হবে।[১]

আর এক্ষেত্রে ছেলে ও মেয়ে সমান হবে।

কারণ, আমাদের বর্ণিত হাদীসের শর্তমুক্ত হওয়া। তাছাড়া যুক্তিগত কারণ এই যে, (মাতৃগর্ভ থেকে বিচ্ছিন্ন) দুই জীবিত সন্তানের মাঝে তারতম্য প্রকাশ পাওয়ার কারণ হলো (মালিকানা লাভের ক্ষেত্রে) মানবত্ব গুণের পার্থক্য।[২] অথচ গর্ভস্থ সন্তানের এদিক থেকে তারতম্য নেই। তাই একই পরিমাণে তাদের দিয়ত নির্ধারিত হবে, অর্থাৎ পাঁচশ দিরহাম।

আর যদি সে সন্তান জীবিত বের হয়ে পরে মারা যায়, তাহলে তাতে পূর্ণ দিয়ত ওয়াজিব হবে।

কেননা আঘাতকারী পূর্ববর্তী আঘাত দ্বারা একটি জীবিত 'মানুষ' হত্যা করেছে।

আর যদি মৃত সন্তান প্রসব করে 'মা' মৃত্যুবরণ করে, তাহলে আঘাতকারীর উপর মাকে হত্যা করার কারণে পূর্ণ দিয়ত ওয়াজিব হবে। আর গর্ভস্থ সন্তানকে নষ্ট করার কারণে গুররাহ[৩] ওয়াজিব হবে।

---

১. যেমন বিশজন লোক ভুলক্রমে একজন লোককে হত্যা করলো, তখন তাদের প্রত্যেকের উপর তিন বছর মেয়াদে দিয়তের দশমাংশের অর্ধেক ওয়াজিব হবে।

২. কেননা পুরুষ সম্পদের মালিকানা অর্জন করে এবং বিবাহের মালিকানা অর্জন করে। পক্ষান্তরে স্ত্রীলোক সম্পদের মালিকানা অর্জন করে কিন্তু বিবাহের মালিকানা অর্জন করে না।

৩. গর্ভস্থ সন্তানের দিয়তকে হাদীসে غُرَّة শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে। غُرَّة শব্দের অর্থ প্রথম, আর দিয়তের সর্ব প্রথম পরিমাণ হলো পাঁচশ দিরহাম।

আর যদি আঘাতের কারণে মায়ের মৃত্যু হয়, তারপর গর্ভস্থ সন্তান জীবিত বের হয়ে মারা যায়, তাহলে আঘাতকারীর উপর মায়ের দিয়ত এবং গর্ভস্থ সন্তানের দিয়ত ওয়াজিব হবে।

কেননা, সে দু'টি ব্যক্তিকে হত্যা করেছে।

আর যদি মা মৃত্যুবরণ করে, তারপর সন্তান বের হয়ে আসে, তাহলে আঘাতকারীর উপর মায়ের বিপরীতে দিয়ত ওয়াজিব হবে, কিন্তু 'জানীন'[১] এর বিপরীতে কিছু আসবে না।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন ঃ 'জানীন'-এর ক্ষেত্রে গোররা ওয়াজিব হবে। কেননা বাহ্যত ঘটনা এই যে, আঘাতের কারণেই জানীনের মৃত্যু হয়েছে। সুতরাং বিষয়টি মায়ের জীবিত অবস্থায় মৃত সন্তান প্রসব করার মতই হলো।

আমাদের যুক্তি এই যে, মায়ের মৃত্যু হলো জানীন-এর মৃত্যুর দু'টি কারণের একটি কারণ। কেননা তার শ্বাস গ্রহণ মায়ের শ্বাস গ্রহণ দ্বারা সম্পন্ন হওয়ার কারণে মায়ের মৃত্যুতে সে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে পড়ে। সুতরাং সন্দেহের অবস্থায় দায় সাব্যস্ত হবে না।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ 'জানীন'-এর বিপরীতে যে দিয়ত ওয়াজিব হবে, তা তার পক্ষ হতে মীরাছরূপে বণ্টিত হবে।

কেননা এটা হলো তার জানের বিনিময়। সুতরাং তার ওয়ারিছরাই তোর মালিক হবে। তবে আঘাতকারী ওয়ারিছ হতে পারবে না। সুতরাং কেউ যদি নিজের স্ত্রীর পেটে আঘাত করে, আর স্ত্রী লোকটি আঘাতকারীর সন্তানকে মৃত অবস্থায় প্রসব করে, তাহলে আঘাতকারী পিতার আকিলাহদের উপর দিয়ত ওয়াজিব হবে। কিন্তু পিতা তা থেকে মীরাছ পাবে না। কেননা, সে না-হক ভাবে সরাসরি হত্যা করেছে। আর হত্যাকারীর জন্য কোন মীরাছ নেই।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ দাসীর গর্ভস্থ 'জানীন'-এর ক্ষেত্রে (মনিবের ঔরসে নয়), যদি তা ছেলে হয় তাহলে তার জীবিত অবস্থার মূল্যের দশমাংশের অর্ধেক ওয়াজিব হবে। আর যদি মেয়ে হয় তাহলে তার মূল্যের দশমাংশ ওয়াজিব হবে।

আর ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন ঃ তার ক্ষেত্রে তার মায়ের মূল্যের দশমাংশ ওয়াজিব হবে।

কেননা, এক হিসাবে সে তার মায়ের দেহাংশ। আর অংশের ক্ষতিপূরণ সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে তার মূল থেকেকেই পরিমাণ নির্ধাণ করা হয়।

আমাদের যুক্তি এই যে, এটা হচ্ছে গর্ভস্থ সন্তানের নিজস্ব সত্তার বিনিময়। কেননা, অঙ্গের ক্ষতিপূরণ তখনই ওয়াজিব হয় যখন তা দ্বারা মূল-এর সত্তার ক্ষতি প্রকাশ পায়। অথচ গর্ভস্থ সন্তানের ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে মূলের ক্ষতি প্রকাশ পাওয়া (না পাওয়ার) বিষয়টি বিবেচ্য নয়। সুতরাং বোঝা গেল যে, এটা তার নিজস্ব বিনিময়। সুতরাং তার নিজস্ব সত্তার মূল্য দ্বারাই তার ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করা হবে।

---

১. জানীন (جَنِيْن) গর্ভস্থ ভ্রূণ, ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) পশুর গর্ভস্থ সন্তানের উপর কিয়াস করে বলেন ঃ এটা দ্বারা যদি মায়ের মূল্য -ক্ষতি হয়, তাহলে অপরাধীর উপর মায়ের ক্ষতি ওয়াজিব হবে।

এটা একারণে যে, দাস হত্যার ক্ষেত্রে তাঁর মতে মালের ক্ষতিপুরণ ওয়াজিব হয়, যেমন ইনশাআল্লাহ আমরা আলোচনা করবো। সুতরাং তাঁর মূলনীতি অনুযায়ী এই কিয়াস সহী হয়েছে।

ইমাম মুহাম্মদ (র) 'জামে সগীর' কিতাবে বলেন ঃ আর যদি দাসীকে আঘাত করা হয় তারপর মনিব তার গর্ভস্থ সন্তানকে আযাদ করে দেয়, তারপর সে জীবিত ভূমিষ্ঠ হয়ে মারা যায়, তাহলে তার ক্ষেত্রে তার জীবিত অবস্থার পূর্ণ মুল্য ওয়াজিব হবে। আর মুক্তিদানের পর মারা গেলেও দিয়ত ওয়াজিব হবে না।

কেননা, অপরাধী তাকে মুক্তিদান পূর্ব আঘাত দ্বারা হত্যা করেছে। আর তখন সে দাস অবস্থায় ছিল, একারণেই দিয়ত ওয়াজিব না হয়ে মুল্য ওয়াজিব হবে। আর জীবিত অবস্থায় মূল্য ওয়াজিব হওয়ার কারণ এই যে, সে জীবিত অবস্থায় হত্যা করেছে। (সুতরাং প্রাণ সম্পর্কে সন্দেহের অবস্থা বিবেচনা করা হয়নি।)

তাই আমরা দুটি অবস্থার দিকে লক্ষ্য করেছি। করাণ (প্রথমতঃ) কারণ (তথা আঘাত) অস্তিত্ব লাভ করার অবস্থা (আর এখন প্রাণ সম্পর্কে সন্দেহ থাকায় দিয়তের পরিবর্তে মূল্য সাব্যস্ত করেছি।)

(দ্বিতীয়ত:) নষ্ট হওয়ার যখমের অবস্থা (আর তখন প্রাণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার কারণে জীবিত অবস্থার মুল্য সাব্যস্ত করেছি।)

কেউ কেউ বলেন ঃ এটা শায়খায়নের মত। পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মদ (রহ) এর মতে প্রকৃত অবস্থা এবং অপ্রকৃত অবস্থার মধ্যবর্তী মূল্য ওয়াজিব হবে।

কেননা, মুক্তি দান, পূর্ববর্তী আঘাতের সংক্রমণকে রোধ করে। যেমন পরবর্তীতে আপনার সামনে আলোচনা আসছে ইনশাআল্লাহ।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ জানীন-এর ক্ষেত্রে ওয়াজিব হবে না।

ইমাম শাফিঈ (র) এর মতে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। কেননা, এক হিসাবে তা পৃথক প্রাণসত্তা,সুতরাং সতর্কতা মূলকভাবে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে।

আমাদের যুক্তি এই যে, কাফ্ফারাতে শাস্তির দিক রয়েছে , আর কাফ্ফারার কথা জানা গেছে পূর্ণ প্রাণসত্তার ক্ষেত্রে, সুতরাং তা এটাকে অতিক্রম করে অন্যত্র সম্প্রসারিত হবে না, আর পূর্ণ প্রাণ সত্তার অবিদ্যমানবতার কারণেই তো তাতে পূর্ণ বিনিময় ওয়াজিব হয়নি। বরং গুররাহ (পাঁচ দিরহাম মূল্যের দাস বা দাসী) ওয়াজিব হয়েছে।

ফকীহগণ বলেছেন ঃ এর আঘাতকারী যদি কাফ্ফারা আদায় করতে চায়, তাহলে করতে পারে। কেননা, সে একটি নিষিদ্ধ কাজ করেছে। সুতরাং যদি সে কাফ্ফারার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য লাভ করতে চায়, সেটা তার জন্য উত্তম হবে। আর সে তার কৃতকর্ম থেকে ইস্তিগফার করবে।

আর এ সকল বিধানের ক্ষেত্রে আংশিক আকৃতিপ্রাপ্ত জানীন পূর্ণ জানীন এর পর্যায়ভুক্ত হবে।

কারণ, আমাদের বর্ণিত হাদীসের শর্ত মুক্ত হওয়া। তা ছাড়া যুক্তিগত কারণ এই যে, উম্মেওয়ালাদ সাবাস্ত করার ক্ষেত্রে ইদ্দত সমাপ্তির ক্ষেত্রে, নিফাস সমাপ্তির ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে সে সন্তান রূপে গণ্য হয়। সুতরাং এই বিধানের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা হবে।

তা ছাড়া আরেকটি কারণ এই যে, এই পরিমাণ আকৃতি লাভ দ্বারা সে জমাট রক্তের স্তর থেকে উন্নীত হয়ে যায়। সুতরাং সে 'নফস' বা মানব সত্তা বলে গণ্য হবে। মহান আল্লাহ্ অধিক অবগত।

সাধারণের চলাচলের পথে কিছু তৈরী করা

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন ঃ কেউ যদি প্রধান সড়কে পায়খানা তৈরী করে, কিংবা পানি নামার নল স্থাপন করে কিংবা কড়িকাঠ বের করে রাখে,[১] কিংবা দোকান তৈরী করে তাহলে যে কোন সধারণ মানুষের তা ভেঙ্গে ফেলার অধিকার থাকবে।

কেননা, প্রত্যেককেই নিজে এবং তার সওয়ারিসসহ ঐ পথে চলাচলের অধিকারী। সুতরাং প্রতিবন্ধক অপসারণের অধিকার তার থাকবে। এজমালি মালিকদের ক্ষেত্রে যেমন এক শরীকদার তাতে কিছু তৈরী করলে প্রত্যেক শরীকদারের তা অপসারণের অধিকার থাকে, সম্মিলিত অধিকারের ক্ষেত্রেও একই হুকুম প্রযোজ্য হবে।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন ঃ আর যে তা তৈরী করেছ, সে তা দ্বারা উপকৃত হতে পারে, যতক্ষণ না সাধারণ মুসলমান তা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

কেননা, তার তাতে চলাচলের অধিকার রয়েছে এবং তাতে অন্য কারো ক্ষতি নেই। সুতরাং অক্ষতিকর তার দিক থেকে তার পর্যায়ভুক্ত বিষয়ও এর সাথে যুক্ত হবে, আর বাধা দান করা হঠকারী বলে গণ্য হবে।

পক্ষান্তরে পথে যদি সাধারণ মুসলমানের ক্ষতি হয়, তাহলে তার জন্য তা মাকরূহ হবে। কেননা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

لَاضَـرَرَ وَلَاَ ضِـرَارَ فِيْ الْاِسْـلَامِ (طبـرانـى فـى الاوسـط)

কারো ক্ষতি সাধন এবং ক্ষতি সাধণের প্রতি উত্তরে (অতিরিক্ত) ক্ষতি সাধন করা ইসলামে বৈধ নয়।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন ঃ সাধারণের জন্য উম্মুক্ত নয়, এমন গলির বাসিন্দাদের কারো অধিকার নেই অন্য বাসিন্দাদের অনুমতি ছাড়া পায়খানা বা ছাদের পানির নল গলির দিকে বাড়িয়ে দেয়ার।

কেননা, এটা তাদের মালিকানাধীন। এ কারণেই(বিক্রিতব্য বাড়ী থেকে নৈকট্য ও দূরত্ব) সর্বাবস্থায় তাদের সবার জন্য শোফা অধিকার সাব্যস্ত হয়। সুতরাং তাদের ক্ষতি হোক বা না হোক তাদের অনুমতি ছাড়া তাতে হস্তক্ষেপ বৈধ হবে না। পক্ষান্তরে

---

১. মূল এবারতে جُرْضُنْ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, এর অর্থ সম্পর্কে যথেষ্ট মতভিন্নতা রয়েছে, কারো কারো মতে এর অর্থ দোতালার ঝুল-বারান্দা।

সাধারণের চলাচলের জন্য উন্মুক্ত রাস্তায় যদি কারো ক্ষতি না হয়, তাহলে তার হস্তক্ষেপের অধিকার থাকবে। কেননা, সবার অনুমতি গ্রহণ দুঃসাধ্য হবে। সুতরাং প্রত্যেকের ব্যাপারে ধরে নেয়া হবে, যেন সে একাই সেটার মালিক। যাতে তা থেকে উপকৃত হওয়ার উপায় তার জন্য রুদ্ধ না হয়ে যায়।

অচলাচলপূর্ণ পথ তেমন নয়। কেননা, ঐ পথের অধিকারীদের সম্মতি আদায় করা সম্ভব। সুতরাং পথটি প্রকৃতভাবে এবং গুণগতভাবে শরীকানার অবস্থায় বহাল থাকবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ কেউ যদি রাস্তার উপরে দ্বিতলে আসা-যাওয়ার বারান্দা তৈরী করে কিংবা ছাদের পানি নামার নল বের করে দেয় কিংবা এ জাতীয় কিছু করে, আর তা পড়ে গিয়ে কোন মানুষের মৃত্যু হয় তাহলে তার আকিলাহদের উপর দিয়ত ওয়াজিব হবে।

কেননা, সে তার মৃত্যুর কারণ সৃষ্টি করেছে এবং রাস্তার শূন্যস্থান ব্যস্ত রেখে সীমালংঘন করেছে। আর তা দায় সাব্যস্ত হওয়ার কারণ সমূহে অন্তর্ভুক্ত। আর এটাই হলো দায় সাব্যস্ত হওয়ার মূলনীতি।

আর একই বিধান হবে যদি এ অনুচ্ছেদের শুরুতে উল্লেখিত বস্তুগুলির কোনটি ভেঙ্গে পড়ে।

তদ্রূপ একই বিধান হবে যদি তার ভগ্নাবশেষে হোঁচট খেয়ে কোন মানুষ বা পশু মারা যায়। আর যদি ভগ্নাবশেষে হোঁচট খেয়ে কোন মানুষ অন্য আরেক জনের উপর গিয়ে পড়ে, আর উভয়ে মারা যায়, তাহলে উভয়ের ক্ষেত্রে ক্ষতিপুরণ তার উপর ওয়াজিব হবে, যে ঐ গুলো তৈরী করেছে।

কেননা, সে এমন হবে যেন ঐ লোকটিকে সে দিকে ধাক্কা দিয়ে ফেলেছে।

আর ছাদের পানি নামার নল পড়ে গেলে লক্ষ্য করতে হবে, যদি দেয়ালের সীমানার ভিতরের অংশটি কোন মানুষকে আঘাত করে থাকে, আর লোকটি নিহত হয়, তাহলে তার উপর কোন দায় বর্তাবে না।

কেননা, এ বিষয়ে সে সীমালংঘন কারী নয়। আর বস্তুটির ঐ অংশকে সে তার মালিকানাভুক্ত স্থানে স্থাপন করেছে।

আর যদি দেয়ালের বাইরে বিদ্যমান অংশটি তাকে আঘাত করে থাকে,তাহলে দায় ঐ ব্যক্তির উপর বর্তাবে, যে তা স্থাপন করেছে।

কেননা, এ বিষয়ে সে সীমালংঘনকারী, আর কোন অনিবার্য প্রয়োজন ছিল না। কেননা, সেটা দেয়ালে সংযুক্ত করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল। তবে তার উপর কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। এবং সে মীরাছ থেকে বঞ্চিত হবে না। কেননা, (গুণগতভাবে তাকে হত্যাকারী বলা হলেও) প্রকৃত পক্ষে সে হত্যাকারী নয়।

আর যদি দেয়ালের ভিতরের ও বাইরের উভয় অংশ আঘাত করে থাকে, আর তা জানা যায়, তাহলে অর্ধেক দিয়ত ওয়াজিব হবে, আর অর্ধেক দিয়ত বেকার যাবে।

কোন হিংস্র প্রাণী এবং কোন মানুষ সম্মিলিতভাবে আঘাত করলে যেমন হয়।

আর যদি কোন্ অংশটি আঘাত করেছে তা জানা না যায়, তাহলে উভয় অবস্থায় একত্বের (সম্ভাবনা) বিবেচনা করে তার উপর অর্ধেক দিয়তের দায় আরোপ করা হবে।

আর কেউ যদি রাস্তার দিকে দ্বিতলের কোন অংশ (বারান্দা বা কার্নিশ) বাড়িয়ে দেয়, আর বাড়ীটি বিক্রি করে দেয়,তারপর তা কোন ব্যক্তির মৃত্যুর কারণ হয়। কিংবা রাস্তার দিকে কোন কাঠ বাড়তি রাখে এরপর ঐ কাঠ বিক্রি করে এবং ঐ কাঠের সম্ভাব্য যে কোন দুর্ঘটনা থেকে ক্রেতার কাছে নিজেকে দায়মুক্ত করে নেয়, আর ক্রেতা তা ঐ অবস্থায় রেখে দেয়, ফলে তার আঘাতে কোন মানুষ মারা যায়, এমতাবস্থায় দিয়তের দায় বিক্রেতার উপরে বর্তাবে।

কেননা, মালিকানা বিলুপ্ত হওয়ার কারণে তার কর্ম (অর্থাৎ উক্ত বস্তু স্থাপন) বিলুপ্ত হয়নি। আর তার কর্মটাই হলো দিয়ত ওয়াজিবকারী।

আর যদি সে রাস্তায় 'অঙ্গারদানি' রেখে দেয়, আর তা কোন জিনিস পুড়িয়ে দেয়, তাহলে সে তার দায় বহন করবে। কেননা, এ বিষয়ে সে সীমালংঘনকারী।

আর যদি বাতাস ঐ অঙ্গারদানি[১] (তার স্ফুলিঙ্গ বা আগুন নয়) তাড়িয়ে অন্যত্র নিয়ে যায় তার পর তা কোন কিছু পুড়িয়ে দেয়, তাহলে সে দায় বহন করবে না।

কেননা, বাতাস তার কর্মটিকে রহিত করেছে (এবং নিজে 'কর্ম' সৃষ্টি করেছে।)

কারো কারো মতে যদি ঝড়ো হওয়া পূর্ণ দিন হয় তাহলে সে দায় বহন করবে। কেননা, সে পরিণতির কথা জেনেও একাজ করেছে। আর কাজটি পরিণতিতে উপনীত হয়েছে। আর একেই প্রত্যক্ষভাবে সম্পন্ন করার সমতুল্য ধরা হবে।

আর যদি গৃহের মালিক রাস্তার দিকে বারান্দা বা ছাউনী বের করর জন্য শ্রমিক নিয়োগ করে, আর শ্রমিকরা কাজ শেষ করার আগেই তা পড়ে গিয়ে কোন মানুষ মারা যায়, তাহলে তাদের উপর দায় বর্তাবে।

কেননা, তাদের কাজ দ্বারা প্রাণহানি ঘটেছে, আর যতক্ষণ তারা কাজ শেষ না করে, ততক্ষণ কাজটা বাড়ীর মালিকের হাতে অর্পণকৃত হয় না।

এটা এজন্য যে, তাদের কর্মটি হত্যাকর্মে রূপান্তরিত হয়েছে, তাই কাফ্ফারা তাদের উপরে ওয়াজিব হবে। আর হত্যাকর্ম তার সম্পাদিত চুক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল না। সুতরাং তাদের কর্ম তার দিকে সম্পর্কিত হবে না, বরং তাদের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

---

১. বাতাস যদি আগুন উড়িয়ে নেয়, আর সেই আগুন পুড়িয়ে দেয়, তাহলে কারো কারো মতে দায় বহাল থাকবে। কেননা, বাতাস মূল বস্তুটিকে স্থানচ্যুত করেনি। সুতরাং তার কর্মটি রহিত হয়নি, ফলে কর্মটির কারণত্ব বহাল থাকবে।

আর যদি তাদের কাজ শেষ হওয়ার পর পড়ে,তাহলে সূক্ষ্ম কিয়াস অনুযায়ী বাড়ীর মালিকের উপর দায় বর্তাবে।

কেননা, তার কর্মে নিযুক্ত করণ সিদ্ধ হয়েছে। এজন্যই মুজুরির হকদার হয়েছে। আর তাদের কর্মটি নির্মাণ ও সংস্কার রূপেই সম্পন্ন হয়েছে, ফলে এখন তাদের কর্ম তার দিকে সম্পর্কিত হয়েছে। সুতরাং যেন সে নিজেই কর্মটি করেছে। তাই সে তার দায় বহন করবে।

তদ্রূপ (দায় সাব্যস্ত হবে) যদি রাস্তার পানি ফেলে বা পানি ছিটায় বা অযু করে, আর তাতে (পা পিছলে পড়ে গিয়ে) কোন মানুষ বা পশুর প্রাণহানি হয়।

কেননা, পথচারীদের সঙ্গে ক্ষতির কারণ যুক্ত করার মাধ্যমে এ বিষয়ে সে সীমালংঘনকারী হয়েছে।

পক্ষান্তরে যদি এ কাজগুলি সে অচলাচলপূর্ণ গুলিতে করে, আর সে ঐ গলির বাসিন্দাদের একজন হয়ে থাকে, তাহলে বিষয়টি ভিন্ন হবে, কিংবা যদি সে ঐ গলিতে বসা থাকে বা তার সামান রেখে থাকে,(আর তাতে হোঁচট খেয়ে কোন মানুষের প্রাণ হানি হয়)।

কেননা, প্রত্যেকেরই ঐ গলিতে তা করার অধিকার রয়েছে, কারণ তা বসবাসের প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত, যেমন- এজমালি বাড়ীর ক্ষেত্রে।

মাশায়েখে কিরাম বলেছেন ঃ এ বিধান তখন হবে, যখন সে এমন প্রচুর পানি ছিটাবে, যাতে মানুষের পা সাধারণত পিছলে যায়। পক্ষান্তরে যদি সামান্য পানি ছিটায়, যেমন মানুষের অভ্যাস, আর বাহ্যিক অবস্থা এই যে, তা দ্বারা সাধারণত কারো পা পিছলে যায় না, তাহলে তার উপর দায় আরোপ করা হবে না।

আর লোকটি যদি (দেখে শুনে) ইচ্ছা করে পানি ফেলার স্থানটি দিয়ে অতিক্রম করে, তাহলে যে পানি ছিটায়েছে, সে দায় বহন করবে না।

কেননা, অতিক্রমকারী ব্যক্তিটি হলো হেতু সৃষ্টিকারী। আর কারো কারো মতে দায় আরোপিত না হওয়ার বিষয়টি তখন হবে, যখন পথের একাংশে পানি ছিটাবে। কেননা, সে অতিক্রম করার জন্য এমন জায়গা পেয়েছে, যেখানে পানির চিহ্ন নেই। আর সেটা জানা সত্ত্বেও যখন পানি ফেলার স্থান দিয়েই ইচ্ছাকৃতভাবে অতিক্রম করবে, তখন পানি ছিটানো ব্যক্তির উপর কোন দায় বর্তাবে না।

আর যদি পুরো পথে পানি ছিটায়ে দেয়, তাহলে তাকে দায় বহন করতে হবে। কেননা, পথচারী পানির উপর দিয়ে অতিক্রম করতে বাধ্য।

একই বিধান হবে রাস্তায় ফেলে রাখা কাঠ, আংশিক স্থান কিংবা সম্পূর্ণ স্থান জুড়ে থকার ক্ষেত্রে।

আর যদি দোকানদারের অনুমতিক্রমে দোকানের অঙ্গনে পানি ছিটিয়ে দেয়, তাহলে যে প্রাণহানি ঘটবে, সূক্ষ্ম কিয়াসমতে সেটার দায় আদেশ বা অনুমতিদাতার উপরই বর্তাবে।

আর কেউ যদি তার দোকানের অঙ্গনে দেয়াল তৈরীর জন্য কোন মজদুরকে কাজে নিয়োগ করে, আর কাজ শেষ করার পর কোন মানুষ তার সাথে ধাক্কা খেয়ে মারা যায়, তা হলে সূক্ষ্ণ কিয়াস মতে আদেশদাতার উপর দায় বর্তাবে। আর যদি রাস্তার মাঝে দোয়াল তোলার আদেশ দেয়, তাহলে মজদুরের উপর দায় আসবে। কারণ, আদেশটি গ্রহণযোগ্য নয়।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ কেউ যদি (জনপদে) মুসলমানদের চলাচলের পথে কূপ খনন করে, কিংবা কোন পাথর স্থাপন করে, আর তাতে কোন মানুষের প্রাণহানি ঘটে, তাহলে তার দিয়ত খননকারীর আকিলাহ্‌দের উপর বর্তাবে। আর কোন পশুর প্রাণহানি ঘটলে ক্ষতিপূরণ তার নিজস্ব মাল থেকে দিতে হবে।

কেননা, এ বিষয়ে সে সীমালংঘনকারী। সুতরাং তার সীমালংঘন থেকে যে দূর্ঘটনা উদ্ভূত হবে, তার দায় সে-ই বহন করবে। তবে আকিলাহগণ জানের দায় বহন করে, মালের নয়, তাই পশুর ক্ষতিপূরণ তার নিজস্ব মাল থেকে দিতে হবে।

আর রাস্তায় মাটি ফেলা ও কাদা ফেলার বিষয়টি পাথর ফেলা ও কাঠ ফেলার পর্যায়ভুক্ত। এর কারণ, আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি।

আর যদি রাস্তা ঝাড়ু দেয়, আর ঝাড়ু দেয়ার স্থানে কোন মানুষ (পিছল খেয়ে) মারা যায়, তাহলে সে দায় বহন করবে না। কেননা, সে সীমালংঘনকারী নয়। কারণ সে রাস্তায় কোন কিছু করেনি, বরং রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস দূর করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু যদি সে ঝাড়ুর আর্বজনা রাস্তায় জমা করে, আর তাতে পড়ে গিয়ে কোন মানুষ মারা যায়, তাহলে সে দায় বহন করবে। কারণ রাস্তাকে আবর্জনা দ্বারা আটকে রেখে সে সীমালংঘন করেছে।

আর যদি সে রাস্তায় কোন পাথর রেখে থাকে, আর অন্য কেউ সেটাকে সেখান থেকে সরিয়ে অন্যস্থানে রাখে, আর তাতে কোন মানুষের প্রাণহানি ঘটে,তাহলে যে সরিয়েছে তার উপর দায় বর্তাবে।

কেননা, প্রথম জনের কর্মটির কার্যকরতা রহিত হয়ে গেছে। কারণ সে যে স্থানটি ব্যস্ত রেখেছিল,তা খালি হয়ে গেছে। এখন দ্বিতীয় কর্ম দ্বারা অন্যস্থান ব্যস্ত হয়েছে।

'জামে সগীর' কিতাবে রয়েছে ঃ কোন ব্যক্তি যদি রাস্তায় (ময়লা পানি নিষ্কাশনের) ড্রেন খনন করে,আর তা যদি শাসকের আদেশে করে থাকে, কিংবা শাসক তাকে তা করতে বাধ্য করে থাকে, তাহলে সে দায় বহন করবে না।

কেননা, সে সীমালংঘনকারী নয়। কারণ সে যা করেছে, তা এমন ব্যক্তির আদেশে করেছে, যার 'জন-অধিকারের' ব্যাপারে কর্তৃত্ব রয়েছে।

আর যদি শাসকের আদেশ ছাড়া হয়ে থাকে, তাহলে অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ করার কারণে কিংবা ইমামের মতামত এড়িয়ে নিজস্ব মত খাটানোর কারণে, সে সীমা লংঘনকারী হবে। কিংবা এটা এমন ছোট কাজ ছিল, যা নিরাপত্তার শর্ত দ্বারা আবদ্ধ।

আর সাধারণের চলাচলের পথে যা কিছু সে করবে এবং অন্যান্য যা কিছু কাজ সে করবে, সে সমস্তের বিধান এই তাফসিল অনুযায়ী হবে, যা আমরা উল্লেখ করেছি। কেনেনা, সবগুলো কাজের গুণগত দিক বিভিন্ন নয়।

তদ্রূপ যদি নিজের মালিকানাভুক্ত জমিতে কূপ খনন করে তাহলে দায় বহন করবে না।

কেননা,সে এব্যাপারে সীমা লংঘনকারী নয়।

তদ্রূপ যদি নিজের বাড়ীর প্রাঙ্গনে খনন করে, (এমনকি অঙ্গন তার মালিকানাভুক্ত না হলেও)

কেননা, তার বাড়ীর সুবিধার জন্য তার সে অধিকার রয়েছে। আর প্রাঙ্গন হল তার হস্তক্ষেপভুক্ত বিষয়।

কারো করো মতে এই দায়হীনতা তখন হবে, যখন প্রাঙ্গন তার মালিকানাভুক্ত হবে। কিংবা তার খনন করার বৈধ অধিকার থাকবে। কেননা, তখন সে সীমা লংঘনকারী হবে না।

পক্ষান্তরে যদি তা মুসলমানের মালিকানাভুক্ত স্থান হয়, কিংবা এজমালি জায়গা হয়, যেমন চলাচলের অযোগ্য গলিতে, তাহলে তাকে তার দায় বহন করতে হবে। কেননা, সে কারণ সৃষ্টিকারী এবং সীমা লংঘনকারী। এ সিদ্ধান্ত সঠিক।

আর যদি রাস্তায় কূপ খনন করে, আর তাতে পতিত ব্যক্তি (আঘাতে নয়), বরং অনাহারে বা দুশ্চিন্তায় মারা যায়, তাহলে খননকারীর উপর দায় বর্তাবে না।

এটা ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মত। কেননা, সে নিজের সত্তাগত কারণে মারা গেছে। অথচ দায় সাব্যস্ত হয়, যদি পতিত হওয়ার কারণে মারা যায়।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন ঃ যদি ক্ষুধার করণে মারা যায়, তাহলে একই বিধান। কিন্তু ভয়ে ও দুশ্চিন্তায় মারা গেলে খননকারী তার দায় বহন করবে।

কেননা, পতিত হওয়া ছাড়া দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। পক্ষান্তরে ক্ষুধার অবস্থা কূপের সঙ্গে বিশিষ্ট নয়।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন ঃ সকল অবস্থায় খননকারী দায় বহন করবে। কেননা, যা ঘটেছে তা পতিত হওয়ার কারণেই ঘটেছে। আর পতিত না হলে খাবার তো তার নিকটেই ছিল।

গ্রন্থকার বলেন ঃ আর যদি সে কিছু মজদুর নিয়োগ করে, আর তার প্রাঙ্গনের বাইরে তার জন্য কূপ খনন করে, আর তাদের একথা জানা না থাকে যে, এটা তার প্রাঙ্গন নয়, তাহলে নিযুক্তকারীর উপর দায় বর্তাবে, মজদূরের উপর দায় বর্তাবে না।

কেননা, বিষয়টি তাদের না জানা অবস্থায় বাহ্যত ইজারা চুক্তি সিদ্ধ হয়েছে। সুতরাং তাদের কাজ তার সাথে সম্পর্কিত হবে। কেননা, তারা (তার পক্ষ হতে)

ধোঁকাগ্রস্ত ছিল। সুতরাং বিষয়টি এমন হলো যে, কাউকে এই বকরীটি জবাই করার আদেশ দিল। আর সে তা জবাই করলো, কিন্তু পরে জানা গেলো যে, বকরীটি অন্যের।

তবে এখানে আদিষ্ট ব্যক্তি দায় বহন করবে। তারপর আদেশদাতার কাছে রুজু করবে। কেননা, জবাইকারী হলো প্রত্যক্ষ কর্ম সম্পন্নকারী, আর আদেশদাতা হলো কারণ সৃষ্টিকারী। আর প্রত্যক্ষ কর্ম সম্পাদন প্রধান লাভ করে থাকে, সুতরাং জবাই কারী দায় বহন করবে। আর (ধোঁকা গ্রস্ততার কারণে) আদেশদাতার কাছ থেকে তা আদায় করে নেবে।

পক্ষান্তরে এখানে সূচনাতেই মজুর নিয়োগকারীর উপর দায় ওয়াজিব হবে। কেননা, উভয়ের প্রত্যেকেই কারণ সৃষ্টিকারী, কেউ প্রত্যক্ষ কর্ম সম্পাদনকারী নয়। আর মজদূর সীমা লংঘনকারী নয়, কিন্তু কাজে নিয়োগকারী সীমা লংঘনকারী হিসাবে তার নিকট প্রধান্য লাভ করবে।

আর যদি বিষয়টি তারা জেনে থাকে, তাহলে মজদূরদের উপর দায় বর্তাবে।

কেননা, যে জিনিস তার মালিকানাধীন নয়, সে বিষয়ে তার আদেশ দেয়া ঠিক নয়। (সুতরাং তাদের কাজ তার সংগে সম্পর্কিত হবে না।) আর (তাদের জানা থাকার কারণে) ধোঁকাগ্রস্ততা নেই। সুতরাং কর্মটিই তাদের সাথে সম্পর্কিত অবস্থায় বহাল থাকবে।

আর যদি সে তাদেরকে বলে যে, এটা আমার প্রাঙ্গন তবে তাতে আমার খনন করার অধিকার নেই, এরপর তারা তার আদেশে খনন করে, আর তাতে পড়ে কোন মানুষ মারা যায়, তাহলে কিয়াস অনুযায়ী মজদূরদের উপর দায় বর্তাবে।

কেননা, তারা আদেশের অসিদ্ধতা সম্পর্কে জেনেছে। সুতরাং সে তাদেরকে ধোঁকায় ফেলেনি।

আর সূক্ষ্ম কিয়াস মতে মজদূর নিযুক্তকারীর উপর দায় বর্তাবে।

কেননা, প্রাঙ্গনটি তার (ব্যবহারাধীন) হওয়া তার মালিকানাধীন হওয়ারই পর্যায়ভুক্ত। কারণ তাতে তার হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা অবাধ। যেমন মাটি ফেলা, লাকড়ী রাখা, পশু বাঁধা, আরোহন করা, দোকান তৈরী করা ইত্যাদি। সুতরাং আমাদের উল্লেখকৃত এ সকল হস্তক্ষেপের দিকে লক্ষ্য করে বাহ্যত সে নিজের মালিকানাতেই খননের আদেশ করেছে (বলে বুঝা যায়), আর কর্মটি (মজদুরদের থেকে) তার দিকে স্থানান্তরের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট হবে।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন ঃ কেউ যদি ইমামের অনুমতি ছাড়া পুল তৈরী করে, আর কোন লোক স্বেচ্ছায় তার উপর দিয়ে পার হতে গিয়ে মারা পড়ে, তাহলে পুল স্থাপনকারীর উপর দায় বর্তাবে না।

কেননা, প্রথম কর্মটি হলো কারণ সৃষ্টি করণ জাতীয় সীমা লংঘন। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় কর্মটি হলো প্রতক্ষ কর্ম সম্পাদন জাতীয় সীমা লংঘন। সুতরাং প্রত্যক্ষ কর্মসম্পাদন কারীর দিকে সম্পর্কিত করা অধিক সমীচীন হবে।

তা ছাড়া ইচ্ছাধিকার সম্পন্ন কর্ম সম্পাদনকারীর কর্ম মধ্যবর্তী হওয়া (কারণ-এর দিকে) সম্পর্কিত হওয়াকে রহিত করে। যেন নিক্ষেপকারীর সঙ্গে খননকারী ক্ষেত্রে।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন ঃ কেউ যদি কোন কিছু বহন করে রাস্তা দিয়ে নিয়ে যায়; আর তা কোন মানুষের উপর পড়ে এবং পড়ার কারণে সে মারা যায়, তাহলে সে দায় বহনকারী হবে। তদ্রূপ যদি তা রাস্তায় পড়ে, আর তাতে হোঁচট খেয়ে কোন মানুষ মারা যায়। পক্ষান্তরে যদি কোন চাদর তার পরিধানে থাকে, আর তা রাস্তায় পড়ে, আর তাতে পেঁচিয়ে কোন লোক মারা যায়, তাহলে চাদরওয়ালা দায় বহন করবে না।

(দায় বহন করার) এই কথাটা (উপরে পড়া এবং হোঁচট খাওয়া) উভয় অবস্থাকে অন্তর্ভুক্ত করে।

আর (বহনকৃত ও পরিধানকৃত-এর মাঝে) পার্থক্যের কারণ এই যে, কোন জিনিস বহনকারী ঐ জিনিসকে হিফাযত করার ইচ্ছা পোষণকারী হয়। সুতরাং তার উপর নিরাপত্তার শর্ত আরোপ করা অসঙ্গত ও অসুবিধাজনক নয়। পক্ষান্তরে পরিধানকারী পরিধানকৃত বস্তুকে হিফাজত করার ইচ্ছা পোষণ করে না। সুতরাং আমরা যে (নিরাপত্তার) শর্তের কথা উল্লেখ করেছি, সেই শর্ত আরোপ করা দ্বারা সে অসুবিধা ভোগ করবে। তাই পরিধান করার অবস্থায় নিঃশর্ত অবস্থায় বৈধ সাব্যস্ত করেছি।

ইমাম মুহম্মদ (র) হতে বর্ণিত রয়েছে যে, যদি সে এমন জিনিস পরিধান করে, যা (সাধারণতঃ) পরিধান করা হয় না, তাহলে সে সেটা বহনকারীর মত হবে। কেননা প্রয়োজন সেটা পরিধান করার কথা বলে না।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন ঃ মসজিদ যদি কোন গোষ্ঠীর বা পরিবারের হয়, আর তাদের একজন তাতে ঝাড়বাতি ঝুলায়; আর তাতে কোন মানুষের প্রাণহানি ঘটে, তাহলে সে দায় বহন করবে না। পক্ষান্তরে এগুলো যে করেছে, সে যদি গোষ্ঠীভুক্ত কেউ না হয়, তাহলে তাকে দায় বহন করতে হবে।

মাশায়েখে কিরাম বলেছেন ঃ এটা ইমাম আবু হানীফা (র) এর মত। আর সাহেবায়ন বলেন ঃ উভয় অবস্থাতেই তাকে দায় বহন করতে হবে না। কেননা এগুলো হলো নেক কাজ। আর প্রত্যেকেই তা করার অনুমতিপ্রাপ্ত। সুতরাং তা নিরাপত্তার শর্ত দ্বারা শর্তযুক্ত হবে না, যেমন যদি সে গোষ্ঠীর কোন একজনের অনুমতিক্রমে তা করে থাকে।

ইমাম আবু হানীফা (র) এর যুক্তি এই যে, আর সেটাই পার্থক্যের কারণ,মসজিদ সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা মসজিদওয়ালাদের হাতেই থাকে, অন্যদের হাতে নয়। যেমন ইমাম নিয়োগ, মুতাওয়াল্লী নির্বাচন, দরজা খোলা ও বন্ধ করা এবং মসজিদ বহির্ভূত কেউ তাদের আগে জামাত করলে পুনরায় জামাত করা। সুতরাং তাদের কর্মটি হবে বৈধ এবং নিরাপত্তার শর্ত থেকে মুক্ত। পক্ষান্তরে অন্যদের কর্মটি হবে সীমালংঘন, কিংবা নিরাপত্তার শর্ত দ্বারা আবদ্ধ বৈধ কর্ম। আর যদি নিয়ম লংঘন করে, তাহলে ছাওয়াবের ইচ্ছা পোষণ করা দণ্ড প্রয়োগের পরিপন্থী হবে না। যেমন যিনা সম্পর্কে একা সাক্ষ্য প্রদান করা।

আর আমাদের আলোচ্য ক্ষেত্রে সঠিক পন্থা ও নিয়ম হলো মসজিদওয়ালাদের কাছ থেকে অনুমতি গ্রহণ।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন ঃ আর যদি গোষ্ঠীর কোন লোক মসজিদে বসা থাকে এবং তার সাথে ধাক্কা বা হোঁচট খেয়ে কোন লোকের প্রাণহানি ঘটে, তাহলে গোষ্ঠীর লোকটি দায় বহন করবে না, যদি সে নামাযে থেকে থাকে। আর যদি নামায ছাড়া অন্য কোন কাজে বসা থাকে, তাহলে দায় বহন করবে।

এটা ইমাম আবু হনীফা (র) এর অভিমত। সাহেবায়ন বলেন ঃ কোন অবস্থাতেই সে দায় বহন করবে না।

আর যদি কুরআন পড়ার জন্য, কিংবা (দ্বীন) শিক্ষা দানের জন্য, বা নামাযের অপেক্ষায় বসে থাকে, নামাযের মধ্যে বা নামাযের বাইরে মসজিদে ঘুমিয়ে থাকে, কিংবা মসজিদের মধ্য দিয়ে হেঁটে যায় কিংবা মসজিদে গল্প করার জন্য বসে (আর তার সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে কোন লোকের প্রাণহানি ঘটে), তাহলে একই মতপার্থক্য হবে।

আর ই'তিকাফকারীর বিষয়টি কারো কারো মতে একই মতপার্থক্যপূর্ণ। আর কারো কারো মতে সর্বসম্মতিক্রমেই তাতে দায় বর্তাবে।

সাহেবায়নের যুক্তি এই যে, মসজিদকে নামায ও যিকিরের জন্যই তৈরী করা হয়েছে, আর জামাতের সাথে নামাজ আদায় করা, জামাতের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া সম্ভব নয়। সুতরাং মসজিদে বসা একটি মুবাহ বা বৈধ কাজ। কেননা তা নামাযের প্রয়োজনভুক্ত বিষয়। কিংবা কারণ এই যে, হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, নামাজের জন্য অপেক্ষাকারী ব্যক্তি হুকুমের দিক থেকে নামাযের মধ্যে রয়েছে বলে গণ্য হবে। সুতরাং তার উপর দায় আরোপ করা যাবে না, যেমন প্রকৃতপক্ষে নামাযে থাকলে আরোপ করা যায় না।

ইমাম আবু হানীফা (র) এর যুক্তি এই যে, মসজিদ নামাযের জন্য তৈরী করা হয়েছে। আর অন্যান্য ইবাদত নামাযের সংগে যুক্ত। (তাই নামাযের জন্য জায়গা না পেলে অন্য ইবাদতকারীকে সরিয়ে দেয়া যায়।)

সুতরাং মূল ও অনুবর্তীর মাঝে পার্থক্য প্রকাশ করা আবশ্যক। তাই মূল ইবাদতের (তথা সমানের) জন্য বসাকে নিঃশর্তরূপে) তার সঙ্গে যুক্ত ইবাদতের জন্য বসাকে

নিরাপত্তার শর্ত দ্বারা আবদ্ধরূপে মুবাহ সাব্যস্ত করেছি। আর কোন কাজ মুবাহ বা মুস্তাহাব হওয়ার পর নিরাপত্তার শর্ত দ্বারা আবদ্ধ হওয়া আশ্চর্যের কিছু নয়। যেমন কাফিরকে লক্ষ্য করে বা শিকারকে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করা এবং রাস্তায় হাঁটা এবং মসজিদের ভিতর দিয়ে হেঁটে যাওয়া, আর অন্যকে পদদলিত করা এবং মসজিদে ঘুমানো, আর অন্যের উপর গড়িয়ে পড়া।

আর যদি গোষ্ঠীর বাইরের কেউ মসজিদে নামায অবস্থায় বসা থাকে, আর তার সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে কোন মানুষের প্রাণহানি ঘটে, তাহলে তার দায় বহন করার কথা নয়।

কেননা মসজিদ নামাযের জন্য তৈরী হয়েছে, আর জামাতের সঙ্গে নামাযের বিষয়টি যদিও মসজিদওয়ালাদের হাতে সোপর্দকৃত, কিন্তু প্রতিটি মুসলমানের জন্য তাতে একা একা নামায পড়ার অধিকার রয়েছে।

পরিচ্ছেদ ঃ হেলে পড়া দেয়াল

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ দেয়াল যদি সাধারণ মুসলমানদের চলাচলের পথে হেলে পড়ে, আর দেয়ালের মালিকের কাছে তা ভেঙ্গে ফেলার দাবী জানানো হয় এবং দাবী জানানোর অনুকূলে সাক্ষী রাখা হয়, কিন্তু যতটা সময়ে ভেঙ্গে ফেলা সম্ভব ছিল, সেই সময়ের মধ্যে সে তা ভাঙ্গেনি,-এমনকি পড়ে গেল, তাহলে এতে যে জান-মালের হানি ঘটবে, তার দায় তাকে বহন করতে হবে।

কিয়াসের দাবী হলো দায় বহন না করা। কেননা তার পক্ষ হতে প্রত্যক্ষরূপে ক্ষতির কর্ম সম্পন্ন হয়নি এবং এমন কোন কর্মও করেনি, যা ক্ষতির জন্য শর্ত, আর তাতে সে সীমালংঘনকারী।

কেননা, মূল দেয়াল তার মালিকানায় ছিল, কিন্তু হেলে পড়া এবং শূন্যস্থান ব্যস্ত করে রাখা তার কর্ম নয়। সুতরাং তা সাক্ষী রাখার পূর্বের অবস্থার মত হলো।

সূক্ষ্ম কিয়াসের যুক্তি এই যে, দেয়াল যখন রাস্তার দিকে হেলে পড়লো তখন তার মালিকানাভুক্ত বস্তু দ্বারা মুসলমানদের পথের শূন্যস্থান ব্যস্ত হয়ে পড়লো, আর তা রোধ করার দায়িত্ব তার হাতেই রয়েছে। সুতরাং যখন তার কাছে আগে বেড়ে ঐ শূন্যস্থান খনন করার দাবী জানানো হবে, তখন তা খালি করা তার জন্য ওয়াজিব হবে। আর যখন সে তা থেকে বিরত থাকবে তখন সে সীমা লংঘনকারী হবে। যেমন কোন মানুষের কোলে গিয়ে যদি কোন কাপড় পড়ে, আর ফেরত চাওয়ার পর সে যদি অর্পণ করা থেকে বিরত থাকে, তাহলে সে সীমালংঘনকারী হবে। এখানেও একই অবস্থা হবে। পক্ষান্তরে সাক্ষী রাখার পূর্বের অবস্থাটি ভিন্ন। কেননা সেটা হলো ফেরত চাওয়ার পূর্বে কাপড়টি নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর্যায়ভুক্ত।

তাছাড়া দ্বিতীয় কারণ এই যে, আমরা যদি তার উপর দায় সাব্যস্ত না করি, তাহলে সে শূন্যস্থান খালি করা থেকে বিরত থাকবে। ফলে পথচারীরা প্রাণহানির আশংকায়

পথ চলাচল বন্ধ করে দেবে। ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর জনক্ষতি রোধ করা অবশ্যকরণীয় কাজ। আর দেয়ালের সঙ্গে তার (ম্যালিকানায়) সম্পর্ক রয়েছে। সুতরাং এই ক্ষতি রোধ করার জন্য সে-ই নির্ধারিত ব্যক্তি হবে। আর বহু ব্যক্তিগত ক্ষতি সাধারণ ক্ষতি করার জন্য বরদাশত করে নেয়া হয়।

এরপর এই দেয়ালের কারণে যে (মানব) প্রাণহানি ঘটবে তাতে ওয়াজিব হবে এবং আকিলাহগণ তা বহন করবে।

কেননা অপরাধ হওয়ার দিক থেকে এটা ভুলক্রমে কৃত অপরাধের চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের। সুতরাং এক্ষেত্রে আরো স্বাভাবিক কারণেই সে সহজ বিধান লাভের হকদার হবে। যাতে দিয়ত পরিশোধ তাকে নির্মূল এবং তাকে সর্বসান্ত করার কারণ না ঘটায়।

আর ঐ দেয়ালের কারণে যে সম্পদ হানি ঘটবে, যেমন পশু মারা যাওয়া এবং আসবাব-পত্র নষ্ট হওয়া, সেক্ষেত্রে তার নিজস্ব মাল থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করা ওয়াজিব হবে। কেননা আকিলাহগণ (শুধু জানের দিয়ত বহন করে,) মালের দিয়ত বহন করে না।

শর্ত হলো—দেয়ালের মালিকের কাছে গিয়ে দেয়াল ভেঙ্গে ফেলার দাবী জানানো (দাবীর বিষয়ে) সাক্ষী রাখা শর্ত নয়। সাক্ষী রাখার বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে দেয়ালওয়ালা ভেঙ্গে ফেলার দাবী জানানোর কথা অস্বীকার করার সময় তা প্রমাণ করা সম্ভব। সুতরাং এটা হলো সতর্কতামূলক পদক্ষেপ।

সাক্ষী রাখার ছূরত এই যে, লোকটি বলবে ঃ তোমরা সাক্ষী থাকো যে, আমি দেয়াল ভেঙ্গে ফেলার ব্যাপারে এই লোকটির কাছে এসেছিলাম। আর দেয়াল হেলে পড়ার আগে সাক্ষী রাখা সিদ্ধ নয়। কেননা তখন সীমালংঘন পাওয়া যায়নি।

আর যদি শুরু থেকেই হেলে পড়া অবস্থায় দেয়াল তৈরী করে থাকে, তাহলে মাশায়েখে কিরাম বলেন ঃ তা পড়ে যাওয়ার কারণে যা কিছু নষ্ট হবে, (দাবী জানানো এবং) সাক্ষী রাখা ছাড়াই সেটার দায় তাকে বহন করতে হবে।

কেননা, সূচনা থেকেই দেয়াল নির্মাণ কর্মটি সীমালংঘনরূপে গণ্য হয়েছে। যেমন রাস্তার উপর ঝুল বারান্দা করার ক্ষেত্রে।

আর দাবী জানানোর বিষয়ে দু'জন পুরুষ কিংবা একজন পুরুষ ও দু'জন স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য।

কেননা এটা হত্যা সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান নয়।

আর ইমাম কুদূরী (র) এতটা সময় দেয়াল না ভেঙ্গে রেখে দেয়ার শর্ত আরোপ করেছেন, যতটা সময়ে দেয়াল ভেঙ্গে ফেলা সম্ভব। কেননা দেয়াল ভাঙ্গার কাজে সক্ষম হওয়া জরুরী যাতে (দেয়াল না ভেঙ্গে) রেখে দেয়া দ্বারা অপরাধী সাব্যস্ত হয়।

আর মুসলমান বা যিম্মীর দেয়াল ভাঙ্গার দাবী জানানো সমান। কেননা চলাচলের ব্যাপারে সমস্ত মানুষ শরীক। সুতরাং তাদের মধ্য হতে প্রত্যেকেরই আগে বেড়ে দাবী জানানো সিদ্ধ হবে। পুরুষ হোক বা নারী, স্বাধীন হোক বা মুকাতাব গোলাম।

আর শাসকের কাছে এবং অন্য কারো কাছে গিয়েও দেয়ালওয়ালার কাছে দাবী জানানো সিদ্ধ হবে।

কেননা এটা 'খালিকরণের' দাবী। সুতরাং প্রত্যেক হকদার এ বিষয়ে একক ক্ষমতার অধিকারী হবে।

আর যদি দেয়াল কোন লোকের বাড়ীর দিকে হেলে পড়ে তাহলে (দেয়াল ভাঙ্গার) দাবী জানানোর বিষয়টি বিশেষভাবে বাড়ীর মালিকের জন্য সাব্যস্ত হবে। কেননা সংশ্লিষ্ট হকটি বিশেষভাবে তার।

আর যদি ঐ বাড়ীতে অন্যান্য বাসিন্দা থাকে, তাহলে তাদেরও দাবী জানানোর অধিকার থাকবে। কেননা যে জিনিস বাড়ীকে 'ব্যস্ত' রাখে তার অপসারণের দাবী জানানোর অধিকার তাদের রয়েছে। সুতরাং যে জিনিস বাড়ীর শূন্যস্থানকে ব্যস্ত রাখে, সেটার অপসারণের দাবী জানানোর অধিকার তাদের থাকবে।

আর যদি বাড়ীওয়ালা দেয়াল ভাঙ্গার ব্যাপারে তাকে সময় দেয়, কিংবা তাকে তা থেকে দায় মুক্ত করে দেয়, কিংবা বাড়ীর বাসিন্দারা যদি তা করে, তাহলে তা জাইয হবে এবং দেয়াল পড়ে কোন কিছু নষ্ট হলে তার উপর দায় বর্তাবে না। কেননা হক তাদের ছিল, (আর তারা তা ছেড়ে দিয়েছে।)

পক্ষান্তরে দেয়াল যদি রাস্তার দিকে হেলে পড়ে, আর কাযী তাকে সময় প্রদান করেন কিংবা যে দেয়ালওয়ালার কাছে দাবী উত্থাপন করে সাক্ষী রেখেছে সে সময় প্রদান করে, তাহলে এই সময় প্রদান সিদ্ধ হবে না। কেননা অধিকার হলো মুসলমানদের জামাতের। সুতরাং তাদের দু'জনের ক্ষমতা নেই সে অধিকার বাতিল করার।

আর তার কাছে দাবী জানানোর এবং সাক্ষী রাখার পর যদি বাড়ী বিক্রি করে ফেলে এবং ক্রেতা তার দখল বুঝে নেয়, তাহলে বিক্রেতা তার দায় থেকে মুক্ত হয়ে যাবে।

কেননা অপরাধ সাব্যস্ত হবে সক্ষমতা সত্ত্বেও ভেঙ্গে ফেলা বন্ধ রাখা দ্বারা। অথচ বিক্রয়ের কারণে তার সক্ষমতা লুপ্ত হয়েছে।

রাস্তার দিকে ঝুল-বারান্দা তৈরী করার পর বিক্রি করার বিষয়টি ভিন্ন। কিননা বাড়ীর মালিক (রাস্তার শূন্যের উপর ঝুল-বারান্দা) স্থাপনা দ্বারা অপরাধ করেছে এবং বিক্রয়ের কারণে স্থাপন কর্ম রহিত হয়নি। সুতরাং সে দায় মুক্ত হবে না, যেমন আমরা পূর্বে উল্লেখ করে এসেছি।

তবে ক্রেতার উপরও দায় বর্তাবে না। কেননা তার কাছে দাবী জানানো এবং সাক্ষী রাখা হয়নি। তবে যদি খরিদ করার পর তার কাছে দাবী জানানো হয় এবং সাক্ষী রাকা হয়, তাহলে সে দায় বহন করবে।

কেননা দাবী জানানোর পর তা খালি করার বিষয়ে সক্ষমতা সত্ত্বেও সে খালি করা বন্ধ রেখেছে।

এ বিষয়ে মূলনীতি এই যে, দেয়াল ভেঙ্গে ফেলতে এবং শূন্যস্থান খালি করে দিতে সক্ষম। পক্ষান্তরে যে তা করতে সক্ষম নয়, তার কাছে দাবী জানানো সিদ্ধ নয়। যেমন বাড়ী-বন্ধক গ্রহণকারী, ভাড়ায় গ্রহণকারী, আমানতরূপে গ্রহণকারী এবং (অ-মালিক) বাসিন্দা। তবে বন্ধকদাতার কাছে দাবী জানানো সিদ্ধ হবে। কেননা বন্ধক ছাড়ানোর মাধ্যমে সে দেয়াল ভাঙ্গতে সক্ষম। তদ্রূপ অসীর কাছে এবং ইয়াতীমের দাদার কাছে কিংবা তার মায়ের কাছে বাচ্চার দেয়াল ভাঙ্গার দাবী জানানো সিদ্ধ হবে। কেননা তাদের কর্তৃত্ব বিদ্যমান রয়েছে। মায়ের কথা 'যিয়াদাত' কিতাবে উল্লেখ হয়েছে।

আর ইয়াতীমের মাল থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করা হবে। কেননা এদের কাজ বাচ্চার কাজের সমতুল্য এবং মুকাতিব গোলামের কাছে দাবী জানানো সিদ্ধ হবে। কেননা (ভাঙ্গার) কর্তৃত্ব তার।

আর ব্যবসায়ের অনুমতিপ্রাপ্ত গোলামের কাছে দাবী জানানো সিদ্ধ হবে। চাই তার যিম্মায় ঋণ থাকুক বা না থাকুক।

কেননা দেয়াল ভাঙ্গার কর্তৃত্ব তার।

এরপর (গোলামের কাছে দাবী জানানোর ক্ষেত্রে) দেয়াল পড়ে নষ্ট হওয়া জিনিস যদি মাল হয়, তাহলে তার দায় গোলামের উপর বর্তাবে। আর যদি মানুষ হয়, তাহলে তার দায় মনিবের আকিলাহদের উপর ওয়াজিব হবে।

কেননা এক হিসাবে দাবী জানানো এবং সাক্ষী রাখার কাজটি মনিবের বিপক্ষে হয়েছে। আর মালের দায় গোলামের উপর আরোপ করাই অধিক উপযোগী। (কেননা সে মাল লেনদেনের অনুমতিপ্রাপ্ত)। আর জানের দায় মনিবের উপর আরোপ করা অধিক উপযুক্ত।

আর ওয়ারিসদের একজনের কাছে তার হিসসার ব্যাপারে দাবী জানানো সিদ্ধ হবে। যদিও সে একা দেয়াল ভাঙ্গার অধিকারী নয়। কেননা সে মেরামতের উপায় অবলম্বন করে নিজের হিসসা মেরামত করতে পারে। আর তা হলো কাযীর কাছে বিষয়টি উত্থাপন করা।

আর যদি দাবী জানানো ও সাক্ষী রাখার পর হেলে পড়া দেয়াল কোন মানুষের উপর পড়ে তার প্রাণহানি ঘটায়, তারপর অন্য কেউ নিহত ব্যক্তির সাথে হোঁচট খেয়ে মারা যায়; তাহলে দেয়ালওয়ালা দ্বিতীয় ব্যক্তির দায় বহন করবে না।

কেননা নিহত ব্যক্তিকে সরিয়ে জায়গা খালি করার দায়িত্ব অভিভাবকের, দেয়াল-মালিকের নয়।

আর যদি ভেঙ্গে পড়া দেয়ালের ভগ্নাবশেষের কারণে প্রাণহানি ঘটে, তাহলে তাকে দায় বহন করতে হবে।

কেননা ভগ্নাবশেষের মালিকানা যেহেতু তার, সেহেতু তা সরিয়ে স্থান খালি করার দায়িত্ব তার। আর দেয়াল ভাঙ্গার জন্য দাবী জানানো ও সাক্ষী রাখা ভগ্নাবশেষ

সরানোর দাবী সাক্ষী বলে গণ্য হবে। কেননা দাবীর মূল উদ্দেশ্য হলো স্থানবদ্ধতা দূর হওয়া।

আর যদি দেয়ালের উপর মটকা (বা ভারী কিছু থাকে), আর দেয়াল পড়ার কারণে সেটাও পড়ে যায় এবং সেটার কারণে প্রাণহানি ঘটে, আর সেটা দেয়াল-মালিকের মালিকানভুক্ত হয়, তাহলে তাকে দায় বহন করতে হবে।

কেননা সেটা সরিয়ে স্থান খালি করার দায়িত্ব ছিল তার।

পক্ষান্তরে যদি সেটা অন্যের মালিকানভুক্ত হয়, তাহলে সে দায় বহন করবে না।

কেননা খালি করার দায়িত্ব ঐ বস্তুর মালিকের।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন ঃ দেয়াল যদি পাঁচজন লোকের মালিকানাধীন হয়, আর তাদের একজনের কাছে দাবী জানানো ও সাক্ষী রাখা হয়, আর দেয়াল পড়ে গিয়ে কোন মানুষের প্রাণহানি ঘটে, তাহলে ঐ লোক দিয়তের এক পঞ্চমাংশের দায় বহন করবে। আর সেটা তার আকিলাহদের উপর বর্তাবে।

আর যদি কোন বাড়ী তিনজন লোকের শরীকাধীন হয়, আর তাদের একজন অপর দুই শরীকদারের অসম্মতিতে তাতে কূপ খনন করে, কিংবা দেয়াল তৈরী করে, আর তাতে কোন মানুষের প্রাণহানি ঘটে তাহলে তার উপর দিয়তের দুই-তৃতীয়াংশ ওয়াজিব হবে।[১] যা পরিশোধের দায়িত্ব হবে আকিলাহদের উপর।

এটা ইমাম আবু হানীফা (র) এর মত। সাহেবায়ন বলেন ঃ উভয় ছূরতে তার আকিলাদের অর্ধেক দিয়ত দিতে হবে।

সাহেবায়নের যুক্তি এই যে, যার কাছে দাবী জানানো হয়েছে এবং সাক্ষী রাখা হয়েছে, তার হিসসার বিপরীতে প্রাণহানির দায় বিবেচ্য হবে। পক্ষান্তরে যাদের কাছে দাবী জানানো এবং সাক্ষী রাখা হয়নি, তাদের হিসসার বিপরীতে প্রাণহানির দায় বেকার যাবে। এভাবে দু'টি প্রকার হলো। সুতরাং দিয়তও দুইভাগে বিভক্ত হবে। যেমন সিংহের থাবা এবং সাপের দংশন এবং মানুষ কর্তৃক আহতকরণ সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে।

ইমাম আবু হানীফা (র) এর যুক্তি এই যে, একটিমাত্র হেতু দ্বারা মৃত্যু সংঘটিত হয়েছে, আর তা হলো (দেয়ালের ক্ষেত্রে) নির্ধারিত গভীরতা। কেননা ভার ও গভীরতার মূল তথা নূন্যতম পরিমাণ হেতু হতে পারে না। তাহলে তো (ভার ও গভীরতার) প্রতিটি অংশকেই হেতু বিবেচনা করতে হবে এবং এক্ষেত্রে অনেক হেতু একত্র হবে।

---

১ কেননা, সে তার দুই শরীকদারের দুই-তৃতীয়াংশ হিসসার ক্ষেত্রে সীমালংঘনকারী হয়েছে। সুতরাং দিয়তের দুই-তৃতীয়াংশের দায় তাকে বহন করতে হবে। কিন্তু তার নিজের তৃতীয়াংশের বিপরীতে দিয়তের তৃতীয়াংশ আদায় করতে হবে না। কেননা এই অংশটুকুর ক্ষেত্রে সে সীমালংঘনকারী নয়।

যাই হোক, বিষয়টি যখন এমনই হলো, অর্থাৎ হেতু যখন একটি হলো তখন সেই একটি হেতুর দিকেই মৃত্যু সম্বনিন্ধত হবে। এরপর বাড়ীর মালিকদের উপর তাদের মালিকানা অনুপাতে দিয়ত বণ্টিত হবে।

জখমগুলোর বিষয় ভিন্ন। কেননা প্রতিটি জখম স্বকীয়ভাবে প্রাণহানির কারণ। জখম ছোট হোক বা বড় হোক, যেমন পিছনের আলোচনা থেকে জানা হয়েছে।

তবে বিভিন্ন জখমের মুকাবিলার ক্ষেত্রে অগ্রবর্তিতা সাব্যস্ত না হওয়ার কারণে, সব ক'টির দিকে মৃত্যুকে সম্বন্ধিত করা হবে।

পশুর অপরাধ এবং পশুর প্রতি কৃত অপরাধ

'জামে ছাগীর' কিতাবে ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন ঃ বাহনের পশু যা পিষ্ট করবে অর্থাৎ তার সামনের পা, পিছনের পা, কিংবা তার মাথা দ্বারা যা কিছু আক্রান্ত হবে, কিংবা মুখে কামড়াবে কিংবা আঘাত করবে, কিংবা ধাক্কা দেবে, সেক্ষেত্রে আরোহী তার দায় বহন করবে।

পক্ষান্তরে পায়ে মারলে কিংবা লেজ দিয়ে বাড়ী মারলে, তার দায় বহন করবে না।

এ বিষয়ে মূলনীতি এই যে, মুসলমানদের চলাচলের পথে চলা নিরাপত্তার শর্ত দ্বারা আবদ্ধ অবস্থায় বৈধ। কেননা এক হিসাবে সে নিজের প্রাপ্য হক ব্যবহার করছে। আরেক হিসাবে অন্যদের হক-এর মাঝে হস্তক্ষেপ করছে। কেননা তা সকল মানুষের মাঝে শরীকানাধীন। তাই উভয় দিকের বিবেচনা ভারসাম্যপূর্ণ হওয়ার জন্য আমরা আমাদের উল্লেখকৃত নিরাপত্তার শর্ত দ্বারা আবদ্ধ অবস্থায় (চলাচলের) বৈধতার সিদ্ধান্ত প্রদান করেছি।

এরপর নিরাপত্তার শর্ত দ্বারা আবদ্ধ হবে ঐ সকল ক্ষেত্রে যা পরিহার করা সম্ভব। পক্ষান্তরে যে ক্ষেত্রে পরিহার করা সম্ভব নয়, সেক্ষেত্রে ঐ শর্ত দ্বারা (চলাচল) আবদ্ধ হবে না। কেননা তাতে যাবতীয় পদক্ষেপ রোধ করা হয় এবং তার দরজা বন্ধ হয়ে যায়; অথচ (জীবনযাত্রার তাগিদে) তা খোলা রাখা অপরিহার্য।

আর পদপিষ্ট করা এবং এ জাতীয় অন্যান্য বিষয় পরিহার করা সম্ভব। কেননা এটা বাহন চালানোর অনিবার্য প্রয়োজনভুক্ত নয়। সুতরাং বাহন চালনাকে আমরা এ সকল বিষয় থেকে নিরাপত্তার শর্ত দ্বারা আবদ্ধ করেছি।

পক্ষান্তরে বাহনে আরোহণ করে চলা অবস্থায় পা দ্বারা লাথি মারা এবং লেজ দ্বারা বাড়ি মারা পরিহার করা সম্ভব নয়। সুতরাং বাহন চালনাকে পায়ের বা লেজের আঘাত থেকে নিরাপত্তার শর্ত দ্বারা আবদ্ধ করা হয়নি।

পক্ষান্তরে যদি বাহনকে পথে দাঁড় করায়, তাহলে পায়ের বা লেজের বাড়ীর দায়ও তাকে বহন করতে হবে।

কেননা, বাড়ি মারা পরিহার করতে না পারলেও পথে থামিয়ে রাখা অবশ্যই পরিহার করতে পারতো। সুতরাং রাস্তায় থামানোর ক্ষেত্রে এবং থামানো দ্বারা রাস্তাকে ব্যস্ত রাখার ক্ষেত্রে সে সীমালংঘনকারী হলো। কাজেই সে তার দায় বহন করবে।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন ঃ বাহনের পশুটি যদি সামনের বা পিছনের পা দ্বারা কংকর বা বীচি ছিটকে ফেলে কিংবা ধূলি ওড়ায় কিংবা ছোট পাথর ছিটকে মারে, আর তা কোন মানুষের চোখ ফুঁড়ে দেয়, কিংবা কাপড় নষ্ট করে ফেলে, তাহলে সে সেটার দায় বহন করবে না। তবে বড় পাথর হলে দায় বহন করতে হবে।

কেননা প্রথম অবস্থায় তা পরিহার করা সম্ভব নয়। কারণ বাহনের ছুটে চলা এগুলো থেকে মুক্ত হয় না। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় অবস্থায় তা পরিহার করা সম্ভব। কেননা বাহনের চলা সাধারণত তা থেকে মুক্ত হয়; এটা হয়েছে শুধু আরোহীর দুরন্তপনার কারণে।

আর আমাদের উল্লেখকৃত এ সকল ক্ষেত্রে পিছনের সহযাত্রী মূল আরোহীর মতই হবে। কেননা বিধান ওয়াজিবকারী গুণ উভয়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন হয় না। (কেননা বাহন উভয়ের ব্যবহারে ও নিয়ন্ত্রণে রয়েছে)।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ বাহনের পশু যদি চলার সময় পথে মল বা মূত্র ত্যাগ করে, আর তাতে কোন মানুষের প্রাণহানি ঘটে, তাহলে আরোহী তার দায় বহন করবে না।

কেননা এটা বাহনের চলার অনিবার্য প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তা পরিহার করা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

তদ্রূপ যদি মলমূত্র ত্যাগ করানোর জন্য থামায়, তাহলেও একই বিধান হবে।

কেননা কোন কোন পশুর অভ্যাস এই যে, না থামালে মলমূত্র ত্যাগ করতে চায় না।

তবে যদি অন্য কোন উদ্দেশ্যে থামায়, আর তার মল-মূত্র ত্যাগের কারণে কোন মানুষের প্রাণহানি ঘটে, তাহলে তাকে দায় বহন করতে হবে।

কেননা এই থামানোটা যেহেতু বাহনের চলার অনিবার্য প্রয়োজনভুক্ত নয়, সেহেতু এ বিষয়ে সীমালংঘনকারী হবে।

এরপর এই থামানোটা যেহেতু পথচারীদের জন্য চলা অবস্থার চেয়ে ক্ষতিকর, কারণ তা চলার চেয়ে অধিক স্থায়ী, সেহেতু এটাকে (চলার অনুবর্তীরূপে) চলার সঙ্গে যুক্ত করা যায় না।

যে ব্যক্তি পশুকে পিছন থেকে হাঁকিয়ে নেয়, সে পশুর সামনের পা এবং পিছনের পা দ্বারা যা আক্রান্ত হয় সেটার দায় বহন করবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি সামনে থেকে টেনে নেয়, সে পশুর সামনের পা দ্বারা যা আক্রান্ত হয়, সেটার দায় বহন করবে। পিছনের পা দ্বারা যা আক্রান্ত হয় সেটার নয়।

আক্রান্ত করার অর্থ লাথ মারা; (পিষ্ট করা নয়) কেননা পিষ্টতার ক্ষেত্রে উভয়ের উপর দিয়ত আসা সর্বসম্মত।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন ঃ ইমাম কুদূরী (র) তাঁর 'মোখতাছার' গ্রন্থে এভাবেই উল্লেখ করেছেন এবং কতিপয় মাশায়েখ (অর্থাৎ ইরাকের মাশায়েখ) এ মতই গ্রহণ করেছেন। এর যুক্তি এই যে, লাথি মারা পশ্চাদবর্তী চালকের চোখের সামনে হয়।

সুতরাং তার পক্ষে তা পরিহার করা সম্ভব। পক্ষান্তরে যদি অগ্রবর্তী চালকের চোখের আড়ালে তা ঘটে, তবে তার পক্ষে তা পরিহার করা সম্ভব নয়।

পক্ষান্তরে অধিকাংশ মাশায়েখ (অর্থাৎ মাওয়ারা নহরের—আমু দরিয়ার পশ্চাদবর্তী এলাকার -মাশায়েখ) বলেন ঃ পশ্চাদবর্তী চালকও দেখা সত্ত্বেও লাথির দায় বহন করবে না। কেননা, তার (সামনের বা) পিছনের পায়ে এমন কিছু নেই, যা তাকে লাথি দেয়া থেকে বিরত রাখতে পারে। সুতরাং চালকের পক্ষে তা পরিহার করা সম্ভব নয়।

কামড়ানোর বিষয়টি ভিন্ন। কেননা তা লাগাম টান দিয়ে রোদ করা সম্ভব। কুদূরীর অধিকাংশ অনুলিপি এটাই বলে এবং এটাই বিশুদ্ধতম মত।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন ঃ (আরোহী, অগ্রবর্তী চালক ও পশ্চাদবর্তী চালক) সবাই লাথির দায় বহন করবে।

কেননা পশুর কর্মটি তাদের দিকে সম্বন্ধিত হবে। আর তাঁর বিপক্ষে প্রমাণ সেটাই, যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি।

আর তা হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়াসাল্লামের বাণী ঃ

اَلرِّجْلُ جُبَارٌ

'পায়ের আঘাত মূল্যহীন'

আর পায়ের আঘাত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো লাথি। (কেননা পদ পিষ্টতা সর্বসম্মত মতেই দায় সম্পন্ন।)

(ইমাম শাফেয়ী (র) এর যুক্তিগত প্রমাণের জবাব এই যে,) কর্মের সম্বন্ধ পবির্তন হয় হত্যার ভয় প্রদর্শনের মাধ্যমে। যেমন বলপ্রয়োগকৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রে অথচ এখানে হলো প্রহার দ্বারা ভীতি প্রদর্শন।[১]

'জামে ছাগীর' কিতাবে রয়েছে, যে সব ক'টি ক্ষেত্রে আরোহী দায় বহন করে, সে সবক'টি ক্ষেত্রে পশ্চাদবর্তী চালক ও অগ্রবর্তী চালক দায় বহন করবে। কেননা তারা উভয়ে প্রাণহানির শর্ত—তথা পশুকে অপরাধ সংঘটনের স্থানের নিকটবর্তীকরণের কর্মটিকে প্রত্যক্ষরূপে সম্পাদনের মাধ্যমে কারণ সৃষ্টিকারী হয়েছে। সুতরাং পরিহারযোগ্য ক্ষেত্রগুলোতে তাদের পশু চালনা নিরাপত্তার শর্ত দ্বারা আবদ্ধ হবে, যেমন আরোহীর ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

তবে পশুর সামনের বা পিছনের পা দ্বারা পিষ্ট করার ক্ষেত্রে আরোহীর উপর কাফফারা ওয়াজিব হবে। কিন্তু চালকদ্বয়ের উপর কাফ্ফারা বর্তাবে না। এমনকি আরোহীর উপরও পদ পিষ্টতা ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে কাফ্ফারা দিতে হবে না।

১. অর্থাৎ চূড়ান্ত বল প্রয়োগ দ্বারা যদি কার্য সম্পাদন করানো হয় তখন বলপ্রয়োগকৃতের কর্ম বলপ্রয়োগকারীর দিকে সম্বন্ধিত হয়। আর চূড়ান্ত বল প্রয়োগ হয় হত্যার হুমকি দ্বারা ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে। সীমিত বল প্রয়োগের ক্ষেত্রে সম্বন্ধ পরিবর্তন হয় না।

কেননা, **পদপিষ্টতার** ক্ষেত্রে আরোহী **হচ্ছে** প্রত্যক্ষ কর্ম সম্পাদককারী। কারণ প্রাণহানি হচ্ছে মূলত তার ভার দ্বারা, আর পশুর ভার হচ্ছে তার 'ভার'-এর অনুবর্তী। কেননা বাহন পশুটির চলা তার দিকে সম্বন্ধিত এবং সেটা তার চলার যন্ত্র বা মাধ্যম।

পক্ষান্তরে (পিছনের ও সামনের) চালকদ্বয় হচ্ছে 'কারণ সৃষ্টিকারী' (প্রত্যক্ষ কর্ম সম্পাদক নয়)। কেননা অপরাধ পাত্র (তথা নিহত ব্যক্তি)-এর সঙ্গে তাদের পক্ষ হতে কোন কর্ম যুক্ত হয়নি। তদ্রূপ পদপিষ্টতা ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে আরোহীও কারণ সৃষ্টিকারী। আর কাফ্ফারা হচ্ছে প্রত্যক্ষ কর্ম সম্পাদনের ফলশ্রুতি (বা বিধান); কারণ সৃষ্টি করণের বিধান নয়।

তদ্রূপ আরোহীর ক্ষেত্রে পদপিষ্টতা দ্বারা মীরাছ ও অসিয়ত থেকে বঞ্চিত হওয়ার বিষয়টি সাব্যস্ত হয়। পিছনের বা সামনের চালকের ক্ষেত্রে নয়।

কেননা (ভার প্রয়োগের মাধ্যমে) প্রত্যক্ষ কর্ম সম্পাদনের সঙ্গে সে-ই বিশিষ্ট।

আর যদি আরোহী ও পিছনের চালক দু'জন থাকে, তাহলে কারো কারো মতে পশু যা পদপিষ্ট করবে, তার দায় পিছনের চালক বহন করবে না।

কেননা আমরা ভার প্রয়োগের যে কারণ উল্লেখ করেছি, তাতে পদপিষ্টতার ক্ষেত্রে আরোহী হচ্ছে প্রত্যক্ষ কর্ম সম্পাদনকারী। আর পিছনের চালক হচ্ছে 'কারণ-স্রষ্টা' আর ('কারণ-স্রষ্টার' চেয়ে) প্রত্যক্ষ সম্পাদনকারীর দিকে কর্মের সম্বন্ধযুক্ত করা অধিকতর উপযোগী।

আর কারো কারো মতে উভয়ের উপর দায় বর্তাবে। কেননা, আরোহণ ও চালনা উভয়ের প্রতিটি (স্বতন্ত্রভাবে) দায় সাব্যস্ত হওয়ার কারণ। (সুতরাং তা একত্রভাবেও কারণ হবে।)

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ দুই অশ্বারোহী যদি পরস্পর সংঘর্ষের শিকার হয়ে মৃত্যুবরণ করে, তাহলে উভয়ের প্রত্যেকের আকিলাদের উপর অপরের দিয়ত ওয়াজিব হবে।

আর যুফার ও শাফেয়ী (র) বলেন ঃ উভয়ের প্রত্যেকের আকিলাহদের উপর অপরের অর্ধেক দিয়ত আসবে। কেননা, হযরত আলী (রা) হতে এমনই বর্ণিত হয়েছে।

তাছাড়া যুক্তিগত কারণ এই যে, উভয়ের প্রত্যেকে নিজের কর্ম দ্বারা এবং অপর পক্ষের কর্ম দ্বারা মারা গেছে। কারণ সে নিজের আঘাত দ্বারা নিজেকে এবং অপর পক্ষকে ব্যথা প্রদান করেছে (আর ব্যথাই হলো মৃত্যুর কারণ)। সুতরাং তার অর্ধেক মূল্যহীন হবে। আর বাকী অর্ধেক বিবেচ্য হবে।

যেমন উভয়ে যদি ইচ্ছাকৃতভাবে পরস্পর সংঘর্ষ ঘটায়, কিংবা প্রত্যেকে নিজেকে এবং অপর পক্ষকে জখম করে, কিংবা পথের মধ্যস্থলে কূপ খনন করে, আর তা উভয়কে নিয়ে ধ্বসে পড়ে, এমতাবস্থায় উভয়ের প্রত্যেকের উপর অর্ধেক দিয়ত ওয়াজিব হবে। সুতরাং এ ক্ষেত্রেও এই বিধান হবে।

আমাদের যুক্তি এই যে, প্রত্যেকের মৃত্যু অপর পক্ষের কর্মের দিকে সম্বন্ধিত হবে। কেননা তার নিজস্ব কর্মটি বৈধ ছিল, আর তা হলো রাস্তায় চলা। সুতরাং দায় আরোপের ক্ষেত্রে তার নিজস্ব কর্মটি মৃত্যুর সাথে সম্বন্ধযুক্ত হওয়ার যোগ্য নয়। যেমন পথচারী যদি পথিমধ্যের কূপে না জেনে হেঁটে পড়ে যায়। তার রক্তের কোন অংশই মূল্যহীন সাব্যস্ত হয় না।

আর অপর পক্ষের কর্মটি যদিও বৈধ, কিন্তু বৈধ কর্ম অন্যের বিষয়ে দায় সাব্যস্ত হওয়ার কারণ হতে পারে। যেমন ঘুমন্ত ব্যক্তি যদি অন্যের উপর গড়িয়ে পড়ে।

আর আলী (রা) হতে বর্ণিত রয়েছে যে, তিনি উভয়ের প্রত্যেকের পূর্ণ দিয়ত আরোপের ফায়সালা দিয়েছেন। এভাবে তার দু'টি বর্ণনা পরস্পর বিপরীত হলো। সুতরাং আমরা যে যুক্তি উল্লেখ করেছি, তার দ্বারা অগ্রাধিকার নির্ধারণ করেছি।

আর যুফার ও শাফেয়ী (র) এর পক্ষ হতে যে মাসআলাগুলো উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানে উভয় কর্ম হচ্ছে নিষিদ্ধ। সুতরাং পার্থক্য পরিষ্কার হয়ে গেল।

আর ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত পরস্পর সংঘর্ষের ক্ষেত্রে যে বিধান আমরা উল্লেখ করলাম, তা ঐ সময় যখন উভয়ে স্বাধীন ব্যক্তি হবে। পক্ষান্তরে উভয়ে গোলাম হলে অনিচ্ছাকৃত সংঘর্ষের ক্ষেত্রে উভয়ের রক্ত মূল্যহীন হবে।

কেননা জিনায়াত বা অপরাধ গোলামের দাস সত্তার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছে অর্পণ করা এবং ক্ষতিপূরণ প্রদান করা উভয় দিক থেকে।[১] আর মনিবের কোন 'কৃত কর্ম' ছাড়াই 'দাস সত্তা' কোন স্থলবর্তী ছাড়া শেষ হয়ে গেছে। সুতরাং অনিবার্য কারণে তা মূল্যহীন হয়ে যাবে। ইচ্ছাকৃতভাবে করার ক্ষেত্রেও একই কথা। কেননা উভয়ের প্রত্যেকে অপরাধ সংঘটনের পর ধ্বংস হয়েছে। অথচ স্থলবর্তীরূপে কোন বিনিময় রেখে যায়নি।

দু'জনের একজন যদি স্বাধীন এবং অপরজন গোলাম হয়, তাহলে ভুলক্রমে সংঘর্ষের ক্ষেত্রে নিহত স্বাধীন ব্যক্তির আকিলাহদের উপর গোলামের মূল্য ওয়াজিব হবে। আর তা গ্রহণ করবে (গোলামের সাথে সংঘর্ষে) নিহত স্বাধীন ব্যক্তির ওয়ারিছরা। আর (হত্যাকারী হওয়ার দিকটি বিবেচনা করার কারণে)। দিয়তের ঐ পরিমাণের ক্ষেত্রে স্বাধীন নিহত ব্যক্তির হক বাতিল হয়ে যাবে, যা গোলামের মূল্য থেকে অতিরিক্ত।

কেননা ইমাম আবু হানীফা ও মুহম্মদ (র) এর মূলনীতি অনুযায়ী গোলামের মূল্য (নিহত স্বাধীন ব্যক্তির) আকিলাহদের উপর ওয়াজিব হবে। কেননা এটা হলো মানুষের (প্রাণহানির) দায়, (যা আকিলাহদের উপর ওয়াজিব হয়)। এভাবে এই পরিমাণ (অর্থাৎ মূল্য পরিমাণ) বদল সে স্থলবর্তী রেখে গেল। সুতরাং স্বাধীন নিহত ব্যক্তির ওয়ারিস্রা (দিয়ত হিসাবে) তা গ্রহণ করবে। আর স্থলবর্তী বদল থাকার কারণে এর অতিরিক্ত যে পরিমাণ নিহত স্বাধীন ব্যক্তির প্রাপ্য ছিল, তা বাতিল হয়ে যাবে। আর ইচ্ছাকৃতভাবে করার ক্ষেত্রে স্বাধীন ব্যক্তির আকিলাহদের উপর গোলামের মূল্যের অর্ধেক ওয়াজিব

---

১. অর্থাৎ হয় গোলামকে অর্পণ করতে হচ্ছে, কিংবা তার 'মুক্তিপণ' আদায় করতে হচ্ছে।

হবে। কেননা ইচ্ছাকৃতভাবে করার ক্ষেত্রে অর্ধেক মূল্যই হচ্ছে দায় সম্পন্ন। আর এই পরিমাণ নিহত গোলামের অবিভাবক গ্রহণ করবে। পক্ষান্তরে গোলামের উপর তার দাস সত্তার যা অবশ্য সাব্যস্ত হয়েছিল, অর্থাৎ স্বাধীন ব্যক্তির অর্ধেক দিয়ত, তার মৃত্যুর কারণে রহিত হয়ে যাবে, তবে যে পরিমাণ বদল সে স্থলবর্তীরূপে রেখে গেছে অর্থাৎ তার মূল্যের অর্ধেক সেটা রহিত হবে না।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন ঃ কেউ যদি কোন বাহন-পশু হাঁকিয়ে নিয়ে যায়, আর (বাহনের পিঠ থেকে) গদিটি কোন মানুষের উপর পড়ে গিয়ে তার প্রাণহানি ঘটায়, তাহলে চালক তার দায় বহন করবে। একই বিধান হবে বাহনের অন্যান্য সরঞ্জামের ক্ষেত্রে, যেমন লাগাম ইত্যাদি। তার উপর বহনকৃত বোঝার ক্ষেত্রেও একই বিধান হবে।

কেননা চালক এই 'কারণ' সৃষ্টির ক্ষেত্রে সীমালংঘনকারী। আর তার ত্রুটির জন্যই অর্থাৎ না বাঁধার বা বাঁধন মজবুত না করার কারণেই তা পড়ে গেছে।

পরিধানের চাদরের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা সাধারণত তা বাঁধা হয় না। (সুতরাং তা পড়ে গিয়ে প্রাণহানির কারণ হলে তার দায় আসবে না।)

তাছাড়া চালক এই সকল সরঞ্জাম হিফাজতের ইচ্ছা পোষণ করে, যেমন নিজের কাঁধে বহনকৃত বোঝার ক্ষেত্রে (যেহেতু তা হিফাজতের ইচ্ছা পোষণ করা হয়, সেহেতু তা পড়ে গিয়ে প্রাণহানির কারণ হলে দায় বর্তাবে।) পোশাকের ক্ষেত্রেও নয়, যেমন ইতিপূর্বে বলা হয়েছে। সুতরাং (ঐ সকল ক্ষেত্রে) বাহন চালনা নিরাপত্তার শর্ত দ্বারা আবদ্ধ হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ কেউ যদি উটের কাতার টেনে নেয়, তাহলে যা পদপিষ্ট হবে, চালক তার দায় বহন করবে। সুতরাং কোন উট যদি কোন মানুষকে পিষ্ট করে (প্রাণহানি ঘটায়) তাহলে তার বিপরীতে সে দায় বহন করবে, যা পরিশোধ করা আকিলাহদের উপর আবশ্যক হবে।

কেননা পশ্চাদবর্তী চালকের ন্যায় অগ্রবর্তী চালকের কর্তব্য হলো কাতার রক্ষা করা। আর তার পক্ষে তা সম্ভব ছিল। কিন্তু রক্ষার ব্যাপারে ত্রুটি করার কারণে সে সীমালংঘনকারী হয়েছে। আর সীমালংঘনমূলক কারণ সৃষ্টি হচ্ছে দায় সাব্যস্ত হওয়ার কারণ। তবে কারণ সৃষ্টিকরণ ক্ষেত্রে প্রাণহানির দায় আকিলাহদের উপর বর্তায় আর মালের দায় বর্তায় অপরাধকারীর নিজস্ব মালে।

আর যদি তার সঙ্গে পশ্চাদবর্তী চালক থাকে, তাহলে উভয়ের উপর দায় বর্তাবে।

কেননা একটি উটে টেনে নেয়া চালক সব কয়টিরই টেনে নেয়ারই চালক। তদ্রূপ একটি উটের হাঁকিয়ে নেয়া চালক সবকটি উটেরই হাঁকিয়ে নেয়ার চালকরূপে গণ্য হবে। কেননা সবকটি লাগাম সংযুক্ত থাকে।

আর এই বিধান তখন হবে যখন পশ্চাদবর্তী চালক উটের কাতারের এক পাশে চলবে. পক্ষান্তরে যদি পশ্চাদবর্তী চালক কাতারের মধ্যস্থানে থাকে, আর কোন একটি

উটের লাগাম ধরে থাকে, তাহলে তার পিছনের উট দ্বারা যে প্রাণহানি ঘটবে, সেটার দায় তাকে বহন করতে হবে। আর তার সামনের উট দ্বারা যে প্রাণহানি ঘটবে, সেটার দায় উভয়কেই বহন করতে হবে।

কেননা পশ্চাদবর্তী চালকের পিছনে যা আছে, অগ্রবর্তী চালক সেগুলোকে চালনা করে না। কারণ সেগুলোর লাগাম বিচ্ছিন্ন। পক্ষান্তরে পশ্চাদবর্তী চালক তার সামনের গুলোকেও চালনা করে।

আর যদি কোন ব্যক্তি উটের কাতারে একটি উট বেঁধে দেয়, অথচ অগ্রবর্তী চালক তা জানে না। আর ঐ বেঁধে দেয়া উটটি কোন মানুষকে পিষ্ট করে তার প্রাণহানি ঘটায়, তাহলে অগ্রবর্তী চালকের আকিলাহদের উপর দিয়ত ওয়াজিব হবে।

কেননা অন্যের উট বাঁধা থেকে নিজের উটের কাতারকে রক্ষা করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল। সুতরাং রক্ষা করা বর্জন করে সে সীমালংঘনকারী হয়েছে। আর প্রাণহানির কারণ সৃষ্টিকরণের ক্ষেত্রে আকিলাহদের উপর দিয়ত ওয়াজিব হয়, যেমন অনিচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

এরপর তারা বন্ধনকারীর আকিলাহদের কাছে রুজু করবে।

কেননা সেই তাদেরকে এই দায়ে নিক্ষিপ্ত করেছে।

বন্ধনকারী ও অগ্রবর্তী চালক উভয়ে 'কারণ-স্রষ্টা' হওয়া সত্ত্বেও সূচনাতেই উভয়ের উপর সম্মিলিতভাবে দায় সাব্যস্ত হয় না। এজন্য যে, অগ্রবর্তী চালনার মুকাবিলায় বন্ধন করার অর্থ, প্রত্যক্ষ কর্ম সম্পাদনের মুকাবিলায় কারণ সৃষ্টি করা। কেননা প্রাণহানির কর্ম চালনার সঙ্গে যুক্ত, বন্ধনের সঙ্গে নয়।

মাশায়েখে কিরাম বলেছেন ঃ (রুজু করায়) এই বিধান তখন হবে, যখন সে উটের কাতার চলা অবস্থায় উট বাঁধবে। কেননা বন্ধন দ্বারা পরোক্ষভাবে সে উটটিকে চারিয়ে নেয়ার আদেশকারী হবে। সুতরাং অগ্রবর্তী চালকের যখন এ বিষয়ে জানা থাকবে না, তখন তার পক্ষে তা থেকে বিরত থাকা সম্ভব হবে না। সুতরাং দায় সাব্যস্ত হবে বন্ধনকারীর উপর।

পক্ষান্তরে যদি সে উটের কাতার দাঁড়ানো অবস্থায় উটটিকে বাঁধে। এরপর অগ্রবর্তী চালক তা চালিয়ে নেয়, তাহলে অগ্রবর্তী চালকই দায় বহন করবে।

কেননা সে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কোন রকম অনুমতি ছাড়াই অন্যের উট চালিয়ে নিয়েছে। সুতরাং যে দায় তার উপর আরোপিত হয়েছে, তা সে অন্যের কাছে রুজু করতে পারবে না।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন ঃ কেউ যদি কোন পশু (কুকুর) পাঠায়, আর তার সঙ্গে সে চালকরূপে থাকে, আর পশুটি প্রেরণমাত্র কোন কিছুকে আক্রমণ করে, তাহলে তাকে দায় বহন করতে হবে।

কেননা পশুটির 'আক্রমণ কর্ম' পরিচালনার মাধ্যমে তার দিকে সম্বন্ধিত হবে।

আর যদি একটি (শিকারী) পাখী পাঠায় এবং সে তার পেছনে পেছনে চলে, আর প্রেরণমাত্র পাখিটি আক্রমণ করে, তাহলে সে দায় বহন করবে না।

উভয়ের মাঝে পার্থক্য এই যে, দেহগতভাবে পশু হাঁকিয়ে নেয়ার উপযুক্ত ; সুতরাং তাকে হাঁকিয়ে নেয়ার বিষয়টি বিবেচ্য হবে। পক্ষান্তরে পাখীকে হাঁকিয়ে নেয়ার উপযুক্ত নয়। সুতরাং চালরয়ে নেয়ার অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব একই পর্যায়ে হবে।

তদ্রূপ যদি কুকুর পাঠায়, আর সে তার চালকরূপে না থাকে, তাহলে সে দায় বহন করবে না।

আর যদি কুকুরকে সে শিকারের দিকে পাঠায়, কিন্তু সে তার চালকরূপে না থাকে, আর কুকুর শিকার ধরে হত্যা করে ফেলে, তাহলে তা হালাল হবে।

পার্থক্যের কারণ এই যে, পশু আপন কর্মের ক্ষেত্রে ইচ্ছা-সম্পন্ন, প্রেরকের স্থলবর্তী হওয়ার উপযোগী নয়। সুতরাং তার কর্মকে অন্যের দিকে সম্বন্ধিত করা যায় না। এটাই হল হাকীকত। তবে শিকারের ক্ষেত্রে অনিবার্য প্রয়োজন দেখা দিয়েছে ; তাই তার কর্মকে প্রেরকের দিকে সম্বনিন্ধত করা হয়েছে। কেননা শিকার করা শরীয়ত অনুমোদিত কর্ম। অথচ (প্রশিক্ষিত) পশু ছাড়া শিকার ধরার উপায় নেই। কিন্তু সীমালংঘনের দায় আরোপের ক্ষেত্রে (পশুর কর্মকে প্রেরকের দিকে সম্বন্ধিত করার) প্রয়োজন নেই। ইমাম ইউসুফ (র) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি মানুষের মালের হিফাজতের জন্য সতর্কতামূলকভাবে এ সকল ক্ষেত্রে দায় অবশ্য সাব্যস্ত করেছেন।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন ঃ মাবসূত কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কেউ যদি মুসলমানদের চলাচলের পথে (ঘোড়া, উট; গরু বা এ জাতীয়) কোন পশু প্রেরণ করে, আর প্রেরণমাত্র তা (কিছুকে) আক্রান্ত করে, তাহলে প্রেরণকারীকে দায় বহন করতে হবে। কেননা পশু যতক্ষণ এসাজা প্রেরিত পথে চলতে থাকে, ততক্ষণ তার চলাকে প্রেরকের দিকে সম্বন্ধিত করা হয়; কিন্তু যদি পশুটি (বিনা প্রয়োজনে) ডানে বা বামে মোড় নেয়, তাহলে প্রেরণের 'সম্বন্ধ' রহিত হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যদি ডানের বা বামের পথ ছাড়া আর কোন পথ না থাকে, তাহলে সম্বন্ধ রহিত হবে না।

তদ্রূপ যদি পশুটি প্রেরণের পর থেমে যায়, তারপর চলে, তাহলে প্রেরণের 'সম্বন্ধ' রহিত হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যদি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পশু শিকারের জন্য প্রেরণের পর থামে, আবার চলে এবং শিকার ধরে, তাহলে সম্বন্ধ অব্যাহত থাকবে। কেননা ঐ থামা যেহেতু শিকার ধরার সক্ষমতা লাভের জন্য, সেহেতু তা প্রেরকের উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করে। আর (অন্যান্য পশদের ক্ষেত্রে) এই থামা প্রেরকের উদ্দেশ্য তথা চলাকে নাকচ করে। সুতরাং তাতে প্রেরণর সম্বন্ধ রহিত হয়ে যাবে।

আর যদি কেউ কোন শিকারের উদ্দেশ্যে পশুকে প্রেরণ করে, আর প্রেরণমাত্র কোন জানের বা মালের হানি করে, তাহলে প্রেরণকারী তার দায় বহন করবে না। কিন্তু রাস্তায় প্রেরণ করার ক্ষেত্রে দায় বহন করবে। কেননা রাস্তাকে ব্যস্ত রাখা হলো

সীমালংঘন। সুতরাং তা থেকে যা দুর্ঘটনা উদ্ভূত হবে, তার দায় তাকে বহন করতে হবে। পক্ষান্তরে শিকারের জন্য প্রেরণ হলো একটি মোবাহ ও বৈধ কর্ম, আর সীমালংঘনের অবস্থা ছাড়া (দায়মূলক) কারণ সৃষ্টিকরণ হয় না।

গ্রন্থকার বলেন ঃ আর যদি কোন পশুকে প্রেরণ করে, আর তা প্রেরণ করা মাত্র কোন ফসল নষ্ট করে ফেলে; তাহলে প্রেরণকারী দায় বহন করবে। পক্ষান্তরে যদি ডানে বা বামে মোড় নেয়, অথচ তার সামনে অন্য পথ ছিল, তাহলে দায় বহন করবে না।

কারণ সেটা, যা আগে উল্লেখ করা হয়েছে।

আর যদি পশু ছুটে যায় এবং রাতে বা দিনে কোন মানুষ বা সম্পদ নষ্ট করে, তাহলে পশুর মালিকের উপর দায় বর্তাবে না।

কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

جَرْحُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ (الْبُخَارِى)

বোবা জানোয়ারের জখম মূল্যহীন হবে।

আর ইমাম মুহম্মদ (র) বলেছেন ঃ হাদীসের উদ্দেশ্য হল ছুটে যাওয়া পশু।

তাছাড়া যুক্তিগত কারণ এই যে, উক্ত পশুটির কৃতকর্ম মালিকের দিকে সম্বন্ধিত নয়। কেননা এমন কিছু বিদ্যমান নেই, যা সম্বন্ধকে অবশ্য সাব্যস্ত করে। যেমন প্রেরণ বা এই জাতীয় কিছু (অর্থাৎ হাঁকিয়ে নেয়া, টেনে নেয়া বা আরোহণ করা।)

কসাইয়ের বকরী (এবং যে কোন বকরী) যদি চোখ ফুটো করে দেয়া হয় তাহলে তাতে মূল্য ক্ষতির দায় সাব্যস্ত হয়।

কেননা বকরীর একমাত্র উদ্দেশ্য হলো গোশত। সুতরাং তাতে সম্পদগুলোর ক্ষতিটুকুই শুধু বিবেচ্য হবে।

কসাইয়ের কারো উটের (এবং যেকোন গরু ও উটের) চোখের ক্ষেত্রে তার মূল্যের চতুর্থাংশ ওয়াজিব হবে। গাধা, খচ্চর ও ঘোড়ার ক্ষেত্রেও একই বিধান।

আর ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন ঃ তাতেও মূল্য ক্ষতি ওয়াজিব হবে। তিনি বকরীর উপর কিয়াস করেন।

আমাদের প্রমাণ হলো বর্ণিত হাদীস যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পশুর চোখের ক্ষেত্রে মূল্যের চতুর্থাংশের ফায়সালা করেছেন। (তাবারানী) আর হযরত ওমর (রা) একই ফায়সালা করেছেন।

তাছাড়া যুক্তিগত কারণ এই যে, এগুলোতে গোশত ছাড়া অন্যান্য উদ্দেশ্যও রয়েছে। যেমন বোঝা বহন, আরোহণ, শোভা ও সৌন্দর্য এবং কাজ। সুতরাং এদিক থেকে তা মানুষের সদৃশ হলো। আবার শুধু গোশত খাওয়ার জন্যও এগুলোকে পালা হয়। সুতরাং এদিক থেকে ভক্ষণযোগ্য প্রাণীর সদৃশ হলো। সুতরাং আমরা উভয়

সদৃশ্যতার দিক বিবেচনায় এনেছি। মানুষের সদৃশ্যতার বিবেচনা করেছি মূল্যের চতুর্থাংশ ওয়াজিব করার ক্ষেত্রে।

আর দ্বিতীয় সদৃশ্যতার দিক বিবেচনা করেছি অর্ধপরিমাণকে নাকচ করার ক্ষেত্রে। (কেননা দুই চোখে পূর্ণ দিয়ত হয় এবং এক চোখে অর্ধেক দিয়ত হয়। সে হিসাবে এখানে এক চোখে অর্ধেক মূল্য সাব্যস্ত হওয়ার কথা ছিল।)

তাছাড়া আরেকটি কারণ এই যে, চার চোখ ব্যবহার করা ছাড়া পশু দ্বারা কাজ নেয়া যায় না। পশুর দুই চোখ এবং পশু ব্যবহারকারীর দুই চোখ। সুতরাং পশু যেন চার চোখওয়ালা হলো। সুতরাং এক চোখ নষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে মূল্যের চার ভাগের একভাগ ওয়াজিব হলো।

কেউ যদি পথে সওয়ারির উপর চলে, আর কোন লোক সওয়ারিকে আঘাত করে বা খোঁচা দেয়,[১] ফলে সওয়ারিটি কোন মানুষকে পিছনের পায়ে লাথি মারে, কিংবা সামনের পায়ে আঘাত করে কিংবা উদ্ভ্রান্ত হয়ে তাকে ধাক্কা দেয়। ফলে লোকটার প্রাণহানি ঘটে, তাহলে যে মেরেছে বা খোঁচা দিয়েছে তার উপর দায় সাব্যস্ত হবে। আরোহীর উপর নয়।

হযরত ওমর ও ইবনে মসউদ (রা) হতে এরূপ বর্ণিত হয়েছে।

তাছাড়া যুক্তিগত কারণ এই যে, আরোহী ও বাহন দু'টোই আঘাতকারীর তাড়নায় তাড়িত হয়েছে। সুতরাং পশুটির কর্ম তার দিকে সম্বন্ধিত হবে; যেন সে নিজ হাতে কাজটি করেছে।

তাছাড়া আরেকটি কারণ এই যে, কারণ সৃষ্টিকরণের ক্ষেত্রে খোঁচাদানকারী হচ্ছে সীমা লংঘনকারী। পক্ষান্তরে আরোহী তার কর্মে সীমালংঘনকারী নয়। সুতরাং সীমা লংঘনের দিক বিবেচনায় দণ্ড আরোপের ক্ষেত্রে তার দিকটি প্রাধান্য লাভ করবে। তাই তো যদি আরোহীর বাহন রাস্তায় দাঁড়ানো থাকে তাহলে আরোহী ও খোঁচাদানকারী উভয়ের উপর অর্ধেক করে দায় সাব্যস্ত হবে। কেননা সেও দাঁড় করানোর ক্ষেত্রে সীমা লংঘনকারী।

আর যদি খোঁচাদানকারীকে লাথি মারে (এবং তার প্রাণহানি ঘটায়) তাহলে তার রক্ত মূল্যহীন হবে।

কেননা সে নিজেই নিজের উপর অপরাধকারী বিবেচিত হবে।

আর যদি (খোঁচা দেয়ার কারণে) আরোহীকে ফেলে তার প্রাণহানি ঘটায়, তাহলে তার দিয়ত খোঁচাদাতার আকিলাহদের উপর বর্তাবে।

কেননা কারণ সৃষ্টিকরণের ক্ষেত্রে সে সীমালংঘনকারী। আর তাতে দিয়ত আকিলাহদের উপর বর্তায়।

---

১. অর্থাৎ আরোহীর অনুমতি ছাড়া। কেননা আরোহীর অনুমতিক্রমে হলে তাকে পশ্চাদবর্তী বলে গণ্য করা হবে।

আর যদি তার খোঁচা দেয়ার কারণে কোন মানুষের উপর সেটি লাফিয়ে পড়ে কিংবা তাকে পদ পিষ্ট করে, আর তাতে তার প্রাণহানি ঘটে, তাহলে খোঁচাদাতার উপর তার দায় বর্তাবে, আরোহীর উপর নয়।

এর কারণ আমরা বর্ণনা করেছি (যে, আরোহী ও বাহন উভয়ে তাড়িত হয়েছে)। আর নিজের মালিকানাভুক্ত স্থানে বাহনসহ দাঁড়ানো ব্যক্তি এবং চলমান ব্যক্তি সমান। (অর্থাৎ সে সীমালংঘনকারী নয়)।

আর ইমাম আবু ইউসুফ (র) হতে বর্ণিত আছে যে, খোঁচাদাতা ও আরোহী উভয়ের উপর অর্ধেক করে দায় ওয়াজিব হবে। কেননা আরোহীর বার এবং বাহনের পদ পিষ্টতা উভয় কারণেই প্রাণহানি ঘটেছে। এর মধ্যে দ্বিতীয়টি খোঁচাদাতার দিকে সম্বন্ধিত। সুতরাং উভয়ের উপর দায় ওয়াজিব হবে।

আর যদি আরোহীর অনুমতিক্রমে পশুটিকে খোঁচা দিয়ে থাকে, তাহলে তা আরোহীর নিজস্ব 'কর্ম'-এর পর্যায়ভুক্ত হবে, যেন সে নিজেই খোঁচা দিল। আর বাহনটি যদি লাথি দেয়, তাহলে খোঁচাদাতার উপর দায় বর্তাবে না।

কেননা খোঁচা দেওয়া পশ্চাদবর্তী চালনার সমার্থক, সেহেতু আরোহী এমন কাজের আদেশ (অনুমতি) প্রদান করেছে, যে কাজের তার অধিকার রয়েছে। সুতরাং এ বিষয়ে তার আদেশ প্রদান সিদ্ধ হয়েছে, এবং (অনুমতির আকারে) গুণগত আদেশ বিদ্যমান হওয়ার কারণে কর্মটি তার দিকে সম্বন্ধিত হবে।

আর যদি বাহন তার চলা অবস্থায় কোন মানুষকে পদপিষ্ট করে, এমন অবস্থায় যে, খোঁচাদাতা আরোহীর অনুমতিক্রমে খোঁচা দিয়েছে, তাহলে উভয়ের উপর থেকে অর্ধেক করে দিয়ত ওয়াজিব হবে, যদি তা খোঁচা দানের পরপরই হয়, (অর্থাৎ পশুটি রাস্তা পরিবর্তন না করে থাকে।)

কেননা, ঐ অবস্থায় পশুটির পথ চলা উভয়ের দিকে সম্বন্ধিত হবে। আর আরোহীর অনুমতিদান খোঁচাদাতার খোঁচাদান কর্মকে পশ্চাদবর্তী চালনা অর্থেই শুধু অন্তর্ভুক্ত করবে, প্রাণহানি করার অর্থে সেটাকে অন্তর্ভুক্ত করবে না। (অর্থাৎ আরোহী তাকে খোঁচা প্রদান করে পরিচালনার অনুমতি প্রদান করেছে, পদপিষ্ট করানোর অনুমতি প্রদান করেনি।) সুতরাং এদিক থেকে দায় শুধু খোঁচাদাতার মাঝে সীমাবদ্ধ থাকার কথা।

আর আরোহণ যদিও পথপিষ্টতার হেতু,কিন্তু খোঁচা দান এই হেতুর শর্ত নয়। বরং তা চলার শর্ত বা হেতু। আর চলা হচ্ছে পদপিষ্টতার হেতু। (সুতরাং পদপিষ্টতা দু'টি হেতু দ্বারা সাব্যস্ত হলো।) তাই হেতু সৃষ্টিকারী প্রাধান্য লাভ করবে না। (বরং উভয়ের উপর দায় সাব্যস্ত হবে)। যেমন একজন মানুষকে কেউ আহত করলো, আর সে পথিমধ্যে অন্য কারো খননকৃত কূপে পড়লো এবং মারা গেলো,এ অবস্থায় উভয়ের উপর দিয়ত ওয়াজিব হয়।

কেননা, কূপ খনন অন্য একটা হেতুর শর্ত। 'জখম হেতু'র শর্ত নয়। এখানেও একই কথা।

কারো কারো মতে খোঁচাদাতা পদপিষ্টাতার কারণে যে দায় বহন করেছে, তা আরোহীর কাছ থেকে আদায় করে নেবে। কেননা, সে তার আদেশেই তা করেছে।

আর কারো কারো মতে সে এটা করতে পারবে না। আমার দৃষ্টিতে এটাই বিশুদ্ধতম মত। কেননা, আরোহী তো পদপিষ্ট করানোর অনুমতি দেয়নি (খোঁচা দেওয়ার অনুমতি দিয়েছে।) আর খোঁচাদান পদপিষ্ট করানো থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে; ফলে বিষয়টি এমন হল যে, বাহনে আরোহণ করতে সক্ষম এমন কোন বাচ্চাকে সে বাহন চালিয়ে দেয়ার আদেশ করলো, আর বাহন কোন মানুষকে পদপিষ্ট করলো, এবং বাচ্চার আকিলাহ্‌রা তার দায় বহন করলো। সে ক্ষেত্রে তারা আদেশদাতার কাছ থেকে আদায় করে নিতে পারে না।

এরপর খোঁচাদাতা তখনই শুধু দায় বহন করবে, যখন খোঁচাদানের পরপরই পদপিষ্ট করে, যাতে খোঁচাদানের মাধ্যমে চালনা করা তার দিকে সম্বন্ধিত হতে পারে। পক্ষান্তরে পদপিষ্ট করা যদি খোঁচাদানের পরপরই না হয় (বরং ডানে বা বামে মোড় নেয়ার পর হয়), তাহলে আরোহীর উপর দায় বর্তাবে। কেননা, খোঁচাদানের প্রভাব লুপ্ত হয়ে গেছে। ফলে বাহন চালনার কর্মটি পূর্ণ রূপে আরোহীর দিকে সম্বন্ধিত রয়ে গেছে।

আর কেউ যদি বাহনকে (বা যে কোন পশুকে) সামনের দিক থেকে চালিয়ে নেয়, আর কোন লোক তাকে খোঁচা দেয়,আর তা চালকের হাত থেকে ছুটে গিয়ে সাথে সাথে (অর্থাৎ পথ পরিবর্তন করার আগে) কোন কিছুকে আক্রান্ত করে, তাহলে খোঁচাদাতার উপর দায় বর্তাবে। একই বিধান হবে যদি পশুটির কোন পশ্চাদবর্তী চালক থাকে, আর অন্য কেউ তাকে খোঁচা দেয়।

কেননা, এক্ষেত্রে পশুর কর্ম খোঁচাদাতার দিকে সম্বন্ধিত হবে।

আর খোঁচাদাতা যদি গোলাম হয়,তাহলে দায় তার সত্তার উপর বর্তাবে। আর যদি খোঁচাদাতা বাচ্চা হয়, তাহলে তার মালে দায় আরোপিত হবে। কেননা, গোলাম ও বাচ্চা তাদের কাজের জন্য দায়িত্ব সম্পন্ন।

আর যদি পশুটি রাস্তায় স্থাপিত কোন বস্তু দ্বারা খোঁচা প্রাপ্ত হয়, আর কোন মানুষকে লাথি মেরে তার প্রাণহানি ঘটায়, তাহলে উক্ত বস্তুটি স্থাপনকারীর উপর বর্তাবে।

কেননা, রাস্তাকে ব্যস্ত রাখার কারণে সে সীমালংঘনকারী সাব্যস্ত হবে। সুতরাং কর্মটি তার দিকে সম্বন্ধিত হবে। যেন সে নিজস্ব কর্ম দ্বারা তাকে খোঁচা দিয়েছে। মহান আল্লাহ্ অধিক অবগত।

গোলামের অপরাধ এবং গোলামের বিষয়ে অপরাধ

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ গোলাম যদি ভুলক্রমে কোন অপরাধ করে, তাহলে তার মনিবকে বলা হবে, হয় তুমি এই অপরাধের বিপরীতে তাকে অর্পণ কর কিংবা তার দায় পরিশোধ কর।

আর ইমাম শাফিঈ (র) বলেন ঃ তার অপরাধ তার দাস সত্তার উপরে বর্তাবে। ঐ অপরাধের বিপরীতে তাকে বিক্রি করা হবে, তবে মনিব যদি দিয়ত পরিশোধ করে দেয়,তা হলে ভিন্ন কথা ।

এই মতপার্থক্যের ফলাফল দেখা দেবে মুক্তি লাভের পর অপরাধীর পিছু নেয়ার ব্যাপারে।

আর মাসআলাটি সাহাবা কেরামের মাঝে মতপার্থক্যপূর্ণ ছিল।

ইমাম শাফিঈ (র) এর যুক্তি এই যে, জিনায়াত বা অপরাধের বিধানের ক্ষেত্রে মূলনীতি এই যে, বিনষ্টকারীর উপর তা আরোপিত হবে। কেননা, সেই হলো অপরাধকারী। তবে আকিলাহগণ (সম্পর্কের দাবীকে) তার পক্ষ হতে তা বহন করে। আর গোলামের কোন আকিলাহ নেই। কেননা, 'আকিলাহ-দায়' সাব্যস্ত হয় আত্মীয়তা সম্পর্কের ভিত্তিতে, অথচ গোলাম ও মনিবের মাঝে কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক নেই। সুতরাং দিয়াত গোলামের যিম্মায় সাব্যস্ত হবে। যেমন যিম্মীর ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

আর উক্ত দায় গোলামের দাস-সত্তার সঙ্গে সম্পৃক্ত হবে, এবং তা উশুল করার জন্য তাকে বিক্রি করা হবে। যেমন সম্পদ সংক্রান্ত অপরাধের ক্ষেত্রে করা হয়ে থাকে।

আমাদের যুক্তি এই যে, ভুলক্রমে মানুষের জানের উপর অপরাধ সংঘটনের ক্ষেত্রে মূলনীতি এই যে, অপরাধের দায় অপরাধী থেকে দূরে রাখা হবে, যাতে তাকে নির্মূল করার এবং সাব্যস্ত করার কারণ না হয়। কেননা, উক্ত অনিচ্ছাকৃত অপরাধের বিষয়ে সে নিরূপায়। কারণ সে তো ইচ্ছাকৃতভাবে অপরাধ করেনি। আর যদি অপরাধকারীর আকিলাহ থাকে, তাহলে আকিলাহদের উপর দায় সব্যস্ত হবে। আর মনিবই তার আকিলাহ হবে। কেননা, গোলাম মনিব দ্বারা সাহায্য ও শক্তি লাভ করে। আর আমাদের মতে আকিলাহ সম্পর্কের মূল হলো সাহায্য ও শক্তি লাভ। এমনকি ইসলামী হুকুমতে দিওয়ানভুক্তদের উপরও দিয়াতের দায় সাব্যস্ত হয়।

যিম্মীর বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, তারা নিজেদের মাঝে আকিলাহ সম্পর্ক স্থাপন করে না। তাই রক্তকে মূল্যহীন হওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য দিয়ত তার দায়িত্বে আরোপ

করা হবে। তদ্রূপ সম্পদ সংক্রান্ত অপরাধের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, আকিলাহ মালের দায় বহনে বাধ্য নয়।

তবে মনিবকে গোলাম অর্পণ করা এবং দিয়ত পরিশোধ করার মাঝে ইচ্ছাধিকার প্রদান করা হবে। কেননা, উভয় প্রকার দায় বহনের ক্ষেত্রে মনিব অভিন্ন ব্যক্তি। আর ইচ্ছাধিকার প্রদানে তার প্রতি কিঞ্চিৎ সহজ করার অবকাশ রয়েছে। যেন সে নির্মূল না হয়ে পড়ে।

তবে বিশুদ্ধ মতে গোলামকে অর্পণ করাই হলো মূল বিধান। একারণেই গোলামের মৃত্যু দ্বারা দায় রহিত হয়ে যায়। কারণ, ওয়াজিব সাব্যস্ত হওয়ার পাত্র বিলুপ্ত হয়েছে। যদিও মনিবের অধিকার রয়েছে মূল বিধানকে দায় পরিশোধের দিকে স্থানান্তরিত করার, যেমন যাকাতের মালের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

স্বাধীন অপরাধকারীর মৃত্যুর বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, উশুল করার দিক থেকে 'ওয়াজিব' এর সম্পর্ক স্বাধীন ব্যক্তির দেহ-সত্তার সঙ্গে হয় না। সুতরাং সে 'ছাদাকাতুল ফিত্‌রের' ক্ষেত্রে গোলামের অনুরূপ হল। (গোলামের মৃত্যুতে তা রহিত হয় না।)

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ আর মনিব যদি গোলামকে অর্পণ করে, তাহলে অপরাধের (শিকার ব্যক্তির) অভিভাবক তার মালিক হয়ে যাবে। আর যদি মনিব তার 'মুক্তি পণ' আদায় করে, তাহলে অপরাধের দিয়ত পরিমাণ 'মুক্তি পণ' আদায় করবে। আর সবটাই নগদ ওয়াজিব হবে।

গোলামকে অর্পণের ক্ষেত্রে কারণ এই যে, নির্ধারিত বস্তুসমূহের ক্ষেত্রে মেয়াদ বিলম্ব করা বৈধ নয়। অথচ মনিব গোলামকে অর্পণের বিষয়টি গ্রহণ করলে নির্ধারিত বস্তুই ওয়াজিব হবে। আর মুক্তি পণের ক্ষেত্রে কারণ এই যে, শরীয়তে সেটাকে গোলামের স্থলবর্তী নির্ধারণ করেছে, যদিও তা 'হালাল কৃত' এর পরিমাণ দ্বারা নির্ধারিত হয়। এ কারণেই এটাকে 'মুক্তিপণ' বলে। সুতরাং সেটা গোলামের স্থলবর্তী হবে, এবং তার বিধান গ্রহণ করবে। সুতরাং বিনিময়কৃত গোলামের ন্যায় বিনিময়টাও নগদ ওয়াজিব হবে।

মনিব দুটির যে কোনটি গ্রহণ করবে এবং কার্যকর করবে, সেটি ছাড়া অন্য কিছু অপরাধের (শিকার ব্যক্তির) অভিভাবকের প্রাপ্য হবে না।

গোলামকে অর্পণের ক্ষেত্রে কারণ এই যে, গোলামের সঙ্গে অভিভাবকের হক সম্পৃক্ত হয়েছে। সুতরাং মনিব যখন অভিভাবকের মাঝে এবং গোলামের দাস-সত্তার মাঝে প্রতিবন্ধকতা তুলে নেবে, তখন অভিভাবকের দাবী করার হক রহিত হয়ে যাবে।

আর মুক্তি পণ আদায়ের ক্ষেত্রে কারণ এই যে, দিয়ত ছাড়া অন্য কিছু তার হক নয়। সুতরাং মনিব যখন তার হক পূর্ণ আদায় করে দেবে, তখন গোলামই তার অনুকূলে নিরাপদ হয়ে যাবে।

আর যদি (কথায় বা কাজে) মনিব তার ইচ্ছা প্রকাশ করার আগেই গোলামের মৃত্যু হয়ে যায়, তাহলে অপরাধের শিকার ব্যক্তির হক বাতিল হয়ে যাবে। কেননা,

তার হকের ' ক্ষেত্র' বিলুপ্ত হয়ে গেছে, যেমন আমরা বর্ণনা পূর্বে করে এসেছি। আর যদি মনিবের মুক্তিপণ পরিশোধের দিকটি গ্রহণের পর গোলাম মারা যায়, **তাহলে মনিব** দায়মুক্ত হবে না। কেননা, অভিভাবকের প্রাপ্য হক গোলামের দাসসত্তা থেকে মনিবের যিম্মায় স্থানান্তরিত হয়ে গেছে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ আর গোলাম যদি দ্বিতীয় বার অপরাধ করে, তাহলে দ্বিতীয় অপরাধের হুকুম প্রথম অপরাধের হুকুমের অনুরূপ হবে।

এর অর্থ হলো - প্রথম অপরাধের 'মুক্তিপণ' পরিশোধের পর (যদি দ্বিতীয় অপরাধ করে।)

কেননা, মুক্তিপণ পরিশোধের পর সে যখন কৃত অপরাধ থেকে পাক (নির্দেষ) হয়ে গেলো, তখন ধরে নেয়া হবে, যেন অপরাধটি ছিলই না। বরং এটা হলো অপরাধের সূচনা।

ইমাম কুদূরী (র) বলেনঃ আর যদি দুটি অপরাধ করে তাহলে মনিবকে বলা হবে, হয় তুমি উভয় অপরাধের অভিভাবকের হাতে তাকে অর্পণ কর, তারা তাকে নিজেদের হক এর পরিমাণ অনুযায়ী নিজেদের মাঝে বণ্টন করে নেবে। কিংবা উভয়ের প্রত্যেককে একটি করে দিয়ত গোলামের মুক্তিপণ রূপে পরিশোধ কর।

কেননা, গোলামের দাস সত্তার সঙ্গে প্রথম অপরাধের সম্পৃক্তি দাস সত্তার সঙ্গে দ্বিতীয় অপরাধের সম্পৃক্তিকে বাধাগ্রস্ত করে না। যেমন পরপর সাব্যস্ত ঋণের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। লক্ষণনীয় যে, মনিবের মালিকানা তো প্রথম অপরাধটিকে গোলামের দাস সত্তার সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে বাধা নেয়নি। সুতরাং প্রথম অপরাধের শিকার ব্যক্তির হক আরো স্বাভাবিক কারণেই (দ্বিতীয় অপরাধের সম্পৃক্তিকে) বাধ্য দান করতে পারবে না।

আর ইমাম কুদূরী (র) এর বক্তব্য 'উভয়ের হক এর পরিমাণ অনুযায়ী'-এর অর্থ উভয়ের সঙ্গে কৃত অপরাধের দিয়তের পরিমাণ অনুযায়ী।

আর যদি অপরাধের শিকার ব্যক্তি অনেক হয়, তাহলে অর্পণকৃত গোলামকে তারা তাদের প্রাপ্য হিস্‌সা অনুযায়ী বণ্টন করে নেবে। আর যদি মনিব গোলামের 'মুক্তিপণ' আদায় করে, তাহলে গোলামের মুক্তিপণ রূপে তাদের সকলের দিয়ত আদায় করবে।

এর কারণ আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি।

আর গোলাম যদি একজনকে হত্যা করে এবং অন্য জনের চক্ষু ফুঁড়ে দেয়, তাহলে উভয়ে গোলামকে তিনভাবে বণ্টন করবে।

কেননা, (একটি) চক্ষুর দিয়ত হলো জানের দিয়তের অর্ধেক। বিভিন্ন আঘাতের বিধানও একই রকম হবে।

আর মনিবের অধিকার রয়েছে যে, অভিভাবকদের কাউকে সে গোলামের মুক্তিপণ পরিশোধ করবে, আর কাউকে গোলামের ঐ পরিমাণ অর্পণ করবে,যে পরিমণের সঙ্গে তার হক সম্পৃক্ত হয়েছে।

কেননা, হক সমূহের কারণ তথা অপরাধ বিভিন্ন হওয়ার ফলে হকগুলোও পৃথক পৃথক সত্তা লাভ করবে।

পক্ষান্তরে একই নিহত ব্যক্তির দুই অভিভাবক হলে বিষয়টি ভিন্ন হবে। সে ক্ষেত্রে দু'জনের একজনকে মুক্তি প্রদান করার এবং অন্য জনকে গোলামের প্রাপ্য পরিমাণ অর্পণ করার অধিকার মনিবের থাকবে না।

কেননা, এখানে কারণ অভিন্ন হওয়ায় প্রাপ্য হকও অভিন্ন হবে। আর কারণটি হলো অপরাধ। আর 'হক' প্রথমে নিহতের অনুকূলে সাব্যস্ত হয়, তারপর তার স্থলবর্তী হিসাবে ওয়াজিব এর অনুকূলে সাব্যস্ত হয়। সুতরাং জিনায়াতের বিধানের ক্ষেত্রে পৃথকীকরণের অধিকার তার থাকবে না।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ মনিব যদি অপরাধের কথা না জানা অবস্থায় গোলামকে আযাদ করে দেয়, তাহলে তার মূল্য এবং অপরাধের দিয়তের মাঝে স্বল্পতরটির দায় সে বহন করবে।

আর যদি অপরাধ সম্পর্কে জানার পর আযাদ করে, তাহলে তার দিয়ত ওয়াজিব হবে।

কেননা, প্রথম অবস্থাতে সে অপরাধের শিকার ব্যক্তির হক নষ্ট করেছে। সুতরাং তাকে সেটার দায় বহন করতে হবে। আর তার প্রাপ্য হক হলো দুটির স্বল্পতরটি।

একথা বলা যাবে না যে, (আযাদ করার অর্থ হলো) মুক্তিরপণ-এর দিকটি সে স্বেচ্ছায় বেছে নিয়েছে। কেননা, না জানা অবস্থায় এরূপ করা যায় না। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় অবস্থায় সে (মুক্তিপণের দিকটি) স্বেচ্ছায় গ্রহণকারী বলে গণ্য হবে। কেননা, মুক্তিদান তাকে গোলাম অর্পণ করা থেকে বাধা দেবে। সুতরাং মুক্তিপণের পদক্ষেপ নেওয়ার অর্থ হলো তার পক্ষ হতে অপরদিকটি গ্রহণ করা।

গোলামকে বিক্রি করা, হিবা করা, মুদাব্বার ঘোষণা করা এবং উম্মে ওয়ালাদ বানানোর বিষয়টিও এই দুই ছূরত বিশিষ্ট হবে।

কেননা, এগুলোর প্রতিটি গোলামকে অর্পণ করাকে বাধাগ্রস্ত করে। কারণ তা দ্বারা মালিকানা বিলুপ্ত হয়ে যায়।

তবে 'মবসূস' গ্রন্থের বর্ণনামতে (কোন অনুপস্থিত ব্যক্তির অনুকূলে মনিবের) শিকারোক্তির বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, তা দ্বারা অপরাধের (শিকার ব্যক্তির) অভিভাবকের হক রহিত হয় না। কারণ স্বীকারোক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে অভিভাবকের হাতে অর্পণ করতে বলা হবে। আর তাতে মালিকানা হস্তান্তরের বিষয় নেই। কেননা, স্বীকারোক্তিকারী যেমন বলেছে, বিষয়টি তেমন হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

আর ইমাম কারখী (র) স্বীকারোক্তির বিষয়টিকে বিক্রয় ও অন্যান্য ছূরতের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। কেননা, বাহ্যত স্বীকারোক্তি করা তাকে গোলামটির মালিকানা দান করেছে। সুতরাং তার স্বীকারোক্তি বলে স্বীকারোক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি হকদার হবে। সুতরাং (মালিাকনা হস্তান্তরের ক্ষেত্রে) তা বিক্রয়ের সদৃশ্য হবে।

আর কুদূরী কিতাবে উল্লেখকৃত বিধানের নিঃশর্ততা প্রাণহানি ও তার নিম্নবর্তী সকল বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। আর গুণগত দিকটিও ভিন্ন নয়। (কেননা, গোলামের সব কিছুই মাল।)

আর বিক্রয় শব্দের নিঃশর্ততা ক্রেতার অনুকূলে সাব্যস্ত ইচ্ছাধিকার সম্পন্ন বিক্রয়কেও অন্তর্ভুক্ত করে। কেননা, তা বিক্রেতার মালিকানাকে বিলুপ্ত করে। তবে ইচ্ছাধিকার যদি বিক্রেতার অনুকূলে সাব্যস্ত হয়, আর সে বিক্রয় চুক্তি বাতিল করে, তাহলে বিষয়টি ভিন্ন হবে।

তদ্রূপ বিক্রয়ের জন্য প্রদর্শনের বিষয়টিও ভিন্ন হবে।

কেননা, মালিকানা বহাল রয়েছে। আর মনিব যদি গোলামকে বিক্রয় চুক্তির মাধ্যমে বিক্রি করে, তাহলে গোলামকে (ক্রেতার হাতে) অর্পণ করার আগ পর্যন্ত সে মুক্তিপণের দিকটি গ্রহণকারী হবে না।

কেননা, অর্পণ দ্বারাই মালিকানা বিলুপ্ত হয়। ফাসিদ কিতাবাত চুক্তির বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, কিতাবাত চুক্তি বদল করার পূর্বেই চুক্তির বিধান সাব্যস্ত হয়ে যায়। সুতরাং স্বয়ং কিতাবাত চুক্তি দ্বারাই মনিব অপর দিকটি গ্রহণকারী বলে গণ্য হয়ে যাবে।

আর মনিব যদি তাকে অপরাধের শিকার ব্যক্তির নিকট বিক্রি করে, তাহলে সে 'মুক্তিপণের' দিকটি গ্রহণকারী হবে। পক্ষান্তরে যদি সে গোলামটি তাকে হেবা করে, তাহলে বিষয়টি ভিন্ন হবে। কেননা, তার প্রাপ্য হলো বিনিময় ছাড়া গোলামটি গ্রহণ করা, আর সেটা হিবাতে সম্পন্ন হয়েছে, বিক্রিতে নয়।

আর মনিবের আদেশে অপরাধের শিকার ব্যক্তি কর্তৃক গোলামকে আযাদ করা, আমাদের আলোচিত ক্ষেত্রে মনিবের নিজে আযাদ করার পর্যায়ভুক্ত।

কেননা, আদিষ্ট ব্যক্তির কর্ম আদেশকারীর দিকে সম্বন্দিত হয়।

আর যদি অপরাধের বিষয় জানা অবস্থায় মনিব তাকে প্রহার করে, তার মূল্যহানি ঘটায়, তাহলে সে মুক্তি পণের দিকটি গ্রহণকারী হবে।

কেননা, এর অর্থ গোলামের অংশবিশেষ আটকে রাখা। তদ্রূপ যদি অপরাধকারিণী দাসী কুমারী হয়.আর মনিব তার সঙ্গে সহবাস করে (তাহলে সে মুক্তিপণের দিকটি গ্রহণকারী হবে।) যদিও ঐ সহবাস গর্ভসঞ্চারকারী না হয়।

এর কারণ আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। বিবাহ দানের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, শরীয়তের বিধান বিসাবে এটা দোষ হলেও প্রকৃত পক্ষে দোষ নয়। তদ্রূপ প্রকাশিত বর্ণনা অনুযায়ী অকুমারীর সাথে সহবাস করার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, গর্ভসঞ্চার ছাড়া ঐ সহবাস মূল্যহানি ঘটায়নী। (সুতরাং তা দ্বারা দাসীর অংশবিশেষ আটকে রাখা সাব্যস্ত হয় না।)

খিদমতে বা কাজে নিযুক্ত করার বিষয়টিও ভিন্ন। কেননা, সেটা মালিকানার সঙ্গে বিশিষ্ট নয়। এ কারণেই তা দ্বারা শর্তগত ইচ্ছাধিকার রহিত হয় না।

আর অধিকতর প্রকাশিত বর্ণনা মতে মনিব ভাড়ায় প্রদান এবং বন্ধক রাখা দ্বারা মুক্তিপণ-এর দিকটি গ্রহণকারী হয় না। তদ্রূপ ব্যবহারের অনুমতি প্রদানের ক্ষেত্রেও একই কথা, যদিও সে ব্যবসা করতে গিয়ে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে। কেননা, এই অনুমতি গোলামকে অর্পণ করার সুযোগ বিলুপ্ত করে না এবং তার দাস সত্তার মূল্যহানি ঘটায় না। তবে অপরাধের (শিকার ব্যক্তির) অভিভাবকের তা গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকার অধিকার থাকবে। কেননা, তার উপর ঋণ চেপেছে মনিবের দিক থেকে(অনুমতির কারণে), সুতরাং গোলামের মূল্য অর্পণ করা মনিবের জন্য বাধ্যতামূলক হবে।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন ঃ কেউ যদি (অপরাধ সংঘটনকারী) গোলামকে বলে যে,তুমি যদি অমুককে হত্যা কর বা তীরবিদ্ধ কর বা জখম কর, তাহলে তুমি আযাদ, আর সে তা বাস্তবে ঘটায়, তাহলে মনিব মুক্তিপণ-এর দিকটি গ্রহণকারী বলে গণ্য হবে।

ইমাম যুফার (র) বলেন ঃ সে মুক্তিপণ-এর দিকটি গ্রহণকারী হবে না। কেননা, একথা উচ্চারণের সময় কোন অপরাধ নেই। আর ভবিষ্যতে তার অস্তিত্ব হওয়া সম্পর্কে তার জানা নেই। আর (শর্তকৃত) অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পর মনিবের পক্ষ হতে এমন কোন কর্ম পাওয়া যায়নি, যা দ্বারা সে মুক্তিপণের দিকটি গ্রহণকারী বলে গণ্য হতে পারে।

লক্ষ্যণীয় যে, সে তালাক বা মুক্তিকে শর্তাবদ্ধ করে, এরপর কসম করে যে, সে তালাক দেবে না, কিংবা আযাদ করবে না। তারপর উক্ত শর্ত অস্তিত্ব লাভ করলো এবং মুক্তি ও তালাক সাব্যস্ত হয়ে গেলো। সে ক্ষেত্রে সে তার ঐ কসম ভংকারী হয় না। এখানেও একই অবস্থা হবে।

আমাদের যুক্তি এই যে, সে মুক্তিদানকে অপরাধ সংঘটনের সঙ্গে ঝুলন্ত করেছে, আর শর্তের সাথে ঝুলন্ত বক্তব্য শর্তের অস্তিত্ব লাভের সময় অস্তিত্ব লাভ করে। যেমন তাৎক্ষণিক শর্তমুক্ত বক্তব্য। সুতরাং বিষয়টি অপরাধ সংঘটনের পর মুক্তি দানের মত হল। লক্ষ্যণীয় যে, কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে, তুমি যদি ঘরে প্রবেশ কর, তাহলে আল্লাহর কসম (চার মাস) তোমার কাছে যাবো না। এ বক্তব্য দ্বারা প্রবেশের সময় থেকে 'ঈলা'-এর সূচনা হয়। তদ্রূপ কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে ঃ আমি যদি আসুস্থ হই তাহলে তুমি তিন তালাক। এরপর সে অসুস্থ হলো এবং তিন তালাক হয়ে গেলো, এবং অসুস্থতায় মারা গেলো, তাহলে সে (স্ত্রী দায় থেকে) পলায়ণকারী বলে গণ্য হবে। কেননা, সে মৃত্যুরোগের অস্তিত্ব লাভের পর তালাক প্রদানকারী বলে গণ্য হবে।

ইমাম যুফার (র) সে নযীর উপস্থাপন করেছেন, সেটি ভিন্ন। কেননা, সেখানে কসমকারীর উদ্দেশ্য হলো এমন তালাক বা মুক্তি, যা থেকে বিরত থাকা তার ক্ষেত্রে সম্ভব। কেননা, ইয়ামীন বা কসম করা হয় রোধ করার জন্য। সুতরাং ঐ তালাক বা মুক্তি কসমের অন্তর্ভুক্ত হবে না, যা থেকে বিরত থাকা তার পক্ষে সম্ভব নয়। (আর সেটা হল কসম পূর্ব ঝুলন্ত তালাক।)

তা ছাড়া দ্বিতীয় যুক্তি এই যে, গোলামকে সে শর্তটি সম্পন্ন করতে উদ্বুদ্ধ করেছে সর্বাধিক শক্তিশালী প্রেরণা দানকারী বিষয় দ্বারা। আর এটাই স্বাভাবিক সে তা করে ছাড়বে। সুতরাং এটা মুক্তিপণের দিকটি গ্রহণ করার প্রমাণ।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন ঃ গোলাম যদি কোন ব্যক্তির হাত ইচ্ছাকৃতভাবে কেটে ফেলে আর আদালতের ফায়সালার মাধ্যমে কিংবা ফায়সালা ছাড়া গোলামকে তার হাতে অর্পণ করা হয় আর ঐ লোক তাকে আযাদ করে দেয়, এরপর ঐ লোক হাতের জখমের কারণে মারা যায়, তাহলে গোলামটি অপরাধের বিপরীতে আপোসমীমাংসার বিনিময় হবে। আর যদি আযাদ না করে, তাহলে গোলাম মনিবকে ফেরত দিতে হবে। আর মৃতের (নিহতের) অভিভাবকদের বলা হবে যে, তাকে তোমরা হত্যা কর কিংবা মাফ করে দাও।

এর কারণ এই যে, সে যদি আযাদ না করে আর তার জখম সংক্রমিত হয়ে পড়ে তাহলে পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, আপোশ মীমাংশাটি অসিদ্ধ হয়েছে। কেননা, গোলামের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এবং স্বাধীন ব্যক্তির অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মাঝে যেহেতু কিসাস কার্যকর হয় না, সেহেতু গোলামকে অর্পণের অর্থ ছিল অবশ্য সাব্যস্ত মালের বিপরীতে সমঝোতা করা। কিন্তু যখন কর্তন ও জখম সংক্রমিত হলো(এবং তা প্রাণহানি ঘটালো) তখন পরিষ্কার হয়ে গেলো যে, এখানে মাল ওয়াজিব নয়, বরং কিসাসই ওয়াজিব। সুতরাং সমঝোতাটি হলো বিনিময় ছাড়া সমঝোতা। সুতরাং তা বাতিল হলো আর যা বাতিল, তা সন্দেহ সৃষ্টি করতে পারে না (সুতরাং সন্দেহ জনিত কারণে কিসাস রহিত হওয়ার প্রশ্ন ওঠবে না।) যেমন কেউ যতি তার তিন তালাক দেয়া স্ত্রীর সাথে ইদ্দতের মধ্যে সহবাস করে অথচ সে জানে যে, ঐ স্ত্রী তার জন্য হারাম, (তাহলে সন্দেহ জনিত কারণে যিনার হদ্দ রহিত হয়েছে বলা যাবে না। এখানেও বিষয়টি তাই।) সুতরাং কিসাস ওয়াজিব হবে।

তবে গোলামকে সে যদি আযাদ করে দেয়, তাহলে বিষয়টি ভিন্ন হবে। কেননা, মুক্তিদানের পদক্ষেপ দ্বারা সমঝোতাকে শুদ্ধিকরণের ইচ্ছা প্রমাণিত হয়। কারণ এটাই স্বাভাবিক যে, কোন ব্যক্তি যখন কোন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে, তখন সে সেটাকে সিদ্ধতা প্রদানের ইচ্ছাই পোষণ করে। অথচ এটাকে সিদ্ধতা দানের এছাড়া আর কোন উপায় নেই যে, এটাকে অপরাধ এবং অপরাধ থেকে যা উদ্ভূত হবে, তার বিপরীতে সমঝোতা বলে গণ্য করা।

এ কারণেই (গোলামকে অর্পণের সময়) সে যদি সমঝোতার এই প্রকৃতি[১] স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করে, আর মনিব তাতে সম্মত হয়, তাহলে তা সিদ্ধ হবে। আর মনিব তাতে সম্মত হয়েছে। কেননা, সে যখন গোলামকে অল্পের বিনিময় বানাতে রাজি ছিল, তখন বেশীর বিনিময় বানাতে সে আরো অধিক সম্মত হবে। সুতরাং সে যখন

১. অর্থাৎ এটা হবে অপরাধ এবং তা থেকে যা উদ্ভূত হবে তার বিপরীতে সমঝোতা।

গোলামকে আযাদ করে দিল, তখন আযাদ করার মধ্যদিয়ে নতুন একটি সমঝোতা সম্পন্ন হওয়ার সিদ্ধতা লাভ করবে।[১]

কিন্তু যদি মুক্তিদান না করে তাহলে (কোন পরোক্ষ প্রমাণ না থাকায়) বলা যাবে না যে, নতুন একটি সমঝোতা হয়েছে, অথচ প্রথম সমঝোতা দেয়া হবে। আর অভিভাবকগণ কিসাস গ্রহণ করা এবং মাফ করার মাঝে ইখতিয়ার লাভ করবে।

আর কোন কোন সংস্করণে বিষয়টি এভাবে রয়েছে যে, এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তির হাত ইচ্ছাকৃতভাবে কেটে ফেললো। আর কর্তনকারী কর্তনের শিকারে লোকটির সঙ্গে তার হাতের বিপরীতে একটি গোলামের বিনিময়ে সমঝোতা করলো এবং গোলামকে তার কাছে অর্পণ করলো, আর কর্তিত হস্ত লোকটি গোলামকে আযাদ করে দিল, এবং তার ঐ জখম সংক্রমিত হওয়ার কারণে সে মারা গেল, তাহলে গোলামটি অপরাধের বিপরীতে সমঝোতার বদল বলে গণ্য হবে। এরপর বর্ণনার শেষ পর্যন্ত অভিন্ন।

তবে মাসাআলার এই দ্বিতীয় রূপ-কাঠামোটিতে একটি প্রশ্ন সৃষ্টি হয় যে, যদি হস্তকর্তনের অপরাধ মাফ করে দেয়া হয়, এরপর (অঙ্গ থেকে) প্রাণ পর্যন্ত সংক্রমিত হয় এবং প্রাণহানি ঘটে, তাহলে তো সেখানে কিসাস ওয়াজিব হয় না, অথচ এখানে বলা হয়েছে যে, এখানে (সমঝোতার মাসআলার) যা বলা হয়েছে, সেটা হলো কিসাসের সিদ্ধান্ত। সুতরাং (মাফ এবং সমঝোতা) মাসআলায় উভয় রূপকাঠামো কিসাস ও সূক্ষ্ম কিসাসের ভিত্তিতে স্থাপিত।

আর কারো কারো মতে উভয়ের মাঝে পার্থক্য রয়েছে। আর তার কারণ এই যে, হস্ত কর্তনের অপরাধটি মাফ করে দেয়া বাহ্যত সিদ্ধ হয়েছে। কেননা, বাহ্যিক ভাবে তাদের ক্ষেত্রেই ছিল তার প্রাপ্য হক। সুতরাং বাহ্যত মাফ করা সিদ্ধ হয়েছে। তারপর যদিও গুণগতভাবে তা বাতিল হয়েছে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তা বিদ্যমান রয়েছে। আর কিসাস ওয়াজিব হওয়াকে রোধ করার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। পক্ষান্তরে এখানে সমঝোতা অপরাধকে বাতিল করে না, বরং স্থির করে। কেননা, অপরাধের বিপরীতে মালের বিনিময়ে সে সমঝোতা করে। সুতরাং অপরাধই যখন বাতিল হল না, তখন তার শাস্তি নিষিদ্ধ হবে না।

এটা হলো ঐ সময়, যখন সে গোলাম আযাদ না করে, পক্ষান্তরে গোলামকে আযাদ করলে মাসআলাটির ব্যাখ্যা তাই হবে, যা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি।

ইমাম মুহাম্মদ (র)বলেনঃ অনুমতিপ্রাপ্ত গোলাম যদি কোন অপরাধ করে, আর তার যিম্মায় এক হাজার দিরহাম ঋণ থাকে, আর মনিব তার অপরাধের কথা না জেনে তাকে আযাদ করে দেয়, তাহলে তাকে মূল্য আদায় করতে হবে, প্রথমত: ঋণের পাওনাদারের অনুকূলে, দ্বিতীয়ত: অপরাধের (শিকার ব্যক্তির) অভিভাবকদের অনুকূলে।

---

১. অর্থাৎ ধরে নেয়া হবে, যেন নতুন একটি সমঝোতা সম্পন্ন হলো এবং সেটা হলো কিসাস এর বিপরীতে সমঝোতা।

কেননা, সে এমন দুটি হক নষ্ট করেছে, যার প্রতিটি স্বতন্ত্রভাবে সমগ্র মূল্য দ্বারা দায়-সম্পন্ন। একটা অভিভাবকদের অনুকূলে গোলামকে অর্পণ করা, আরেকটা হলো পাওনাদারদের অনুকূলে গোলামকে বিক্রি করা। উভয় হক একত্র হওয়ার ক্ষেত্রেও একই হুকুম হবে। আর একই দাস-সত্তা থেকে পরিশোধ করার ক্ষেত্রে দুটি হক একত্র করা সম্ভব, এভাবে যে, অপরাধের (শিকার ব্যক্তির) অভিভাবকের হাতে গোলামকে অর্পণ করা হবে। এরপর পাওনাদারদের অনুকূলে তাকে বিক্রি করা হবে। সুতরাং (দুই জনের দুটি)হক নষ্ট করার কারণে উভয়ের.দায় সে বহন করবে।

পক্ষান্তরে কোন আজনাবী (তৃতীয় ব্যক্তি) যদি (ঋণগ্রস্ত) গোলামকে মেরে ফেলে, তাহলে আজনবীর উপর মালিকের অনুকূলে গোলামের একটি মূল্য ওয়াজিব হবে। আর মনিব সেটা পাওনাদারদের প্রদান করবে। কেননা, আজনবী ব্যক্তি মনিবের অনুকূলে দায় বহন করছে মালিকানার ভিত্তিতে। সুতরাং মুকাবেলায় (পাওনাদারদের) হক প্রকাশ পাবে না। কেননা, প্রাপ্য হকের মর্যদা মালিকের চেয়ে নীচে।

পক্ষান্তরে এখানে প্রত্যেকের অনুকূলে মূল্য সাব্যস্ত হচ্ছে প্রাপ্য হক নষ্ট করার কারণে। সুতরাং অগ্রাধিকার প্রদানের উপায় নেই। সুতরাং দুটোই প্রকাশ পাবে এবং উভয়েরই দায় মনিবকে বহন করতে হবে।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন ঃ অনুমতি প্রাপ্ত দাসী যদি তার মূল্যের বেশী ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে, এরপর সে সন্তান প্রসব করে, তাহলে ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে তার সাথে তার সন্তানকেও বিক্রি করা হবে। পক্ষান্তরে সে যদি কোন অপরাধ করে তাহলে তার সঙ্গে তার সন্তানকে অর্পণ করা হবে না।

উভয় ছুরতের মাঝে পার্থক্যের কারণ এই যে, ঋণগ্রস্ততা হচ্ছে দাসীর ব্যাপারে শরীয়ত আরোপিত একটি অবস্থা, যা তার যিম্মায় ওয়াজিব হয় এবং উশুল করার ক্ষেত্রে তার দাস-সত্তার সঙ্গে তা সম্পৃক্ত হয়। সুতরাং এটা তার সন্তানের দিকেও সম্প্রসারিত হবে। যেমন দাসীর সন্তানের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

অপরাধের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, (অপরাধের বিপরীতে) অর্পণ করার দায়িত্ব হচ্ছে মনিবের যিম্মায়, দাসীর যিম্মায় নয়। বরং প্রকৃত কর্মটি তথা অর্পণের চিহ্ন তার সাথে যুক্ত হয়।

আর শরীয়ত আরোপিত অবস্থার ক্ষেত্রে সম্প্রারণ গ্রহণযোগ্য। (কেননা, এটা গুণগত বিষয়,যা বিবেচনা নির্ভর। সুতরাং যেখানে বিবেচনা করা হবে, সেখানেই তা বিদ্যমান বলে বিবেচিত হতে পারে।) প্রকৃত ও বাস্তব অবস্থার ক্ষেত্রে সম্প্রসারণ গ্রহণ যোগ্য নয়। (কেননা, তা পাত্র সাপেক্ষে, সুতরাং ঐ পাত্রের বাইরে সেটা স্থানান্তরিত হতে পারে না)

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন ঃ কোন ব্যক্তির গোলাম সম্পর্কে যদি কেউ দাবী করে যে, তার মনিব তাকে আযাদ করে দিয়েছে, তারপর গোলাম ঐ দাবীকারীর কোন নিকটাত্মীয়কে ভুলক্রমে হত্যা করে, তাহলে নিহতের অভিভাবক হিসাবে তার অনুকূলে কিছুই সাব্যস্ত হবে না।

কেননা, মনিব তাকে মুক্তি দান করেছে, একথা দাবী করার অর্থ হলোঃ আকিলাহদের উপর দিয়ত দাবী করা এবং গোলাম ও মনিব উভয়কে দায়মুক্ত করে দেয়া। তবে প্রমাণ ছাড়া আকিলাহদের বিপক্ষে এ দাবী গ্রহণযোগ্য হবে না।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন ঃ কোন গোলামকে যদি আযাদ করা হয়, আর সে কোন লোককে উদ্দেশ্য করে বলে, আমি গোলাম অবস্থায় ভুল ক্রমে তোমার ভাইকে হত্যা করেছি। আর ঐ লোকটি বললোঃ তুমি তাকে স্বাধীন অবস্থায় হত্যা করেছ, তাহলে গোলামের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হবে।

কেননা, সে দায়বদ্ধতা অস্বীকার করছে, আর সে দায় আরোপের বিরোধী একটি সুপরিচিত অবস্থার দিকে হত্যা কর্মকে সম্বন্ধিত করেছে।

কারণ আমাদের আলোচনা হচ্ছে ঐ ক্ষেত্রে, যেখানে তার দাসত্বের বিষয়টি সুপরিচিত।

আর গোলামের অপরাধের ক্ষেত্রে মনিবের উপর দায় সাব্যস্ত হয়, হোক তা গোলামকে অর্পণ করা কিংবা মুক্তি পরিশোধ করা।

বিষয়টি এমন হলো যে, সুস্থমস্তিক প্রাপ্ত বয়স্ক কোন ব্যক্তি বললোঃ আমি বাচ্চা অবস্থায় আমার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছি, কিংবা অবস্থায় আমি আমার বাড়ী বিক্রি করেছি। কিংবা বললোঃ বিকৃত মস্তিক অবস্থায় আমি আমার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছি। আর তার মস্তিক বিকৃতির বিষয়টি সুপরিচিত ছিল, তখন আমাদের উপরোল্লেখিত কারণে কিসাসসহ তার বক্তব্যই গ্রহণযোগ্য হয়। (এখানেও তাই হবে।)

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন ঃ কেউ যদি তার দাসীকে আযাদ করে, তারপর বলে যে, আমার দাসী থাকা অবস্থায় আমি তোমার হাত কেটেছিলাম, আর দাসী বলেঃ আমি স্বাধীন থাকা অবস্থায় তুমি আমার হাত কেটেছো, তাহলে দাসীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে। তদ্রূপ তার কাছ থেকে যা কিছু নেয়া হয়েছে, সে বিষয়ে তার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে, শুধু সহবাস এবং দাসীর উপার্জনের বিষয় ছাড়া।

এটা সূক্ষ্ম কিয়াসের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এবং এটা ইমাম আবু হানীফা (র) ও ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর অভিমত।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন ঃ শুধু ঐ জিনিসের দায়ভার সে বহন করবে, যা তার হাতে আছে এবং সে যা দাসীর কাছ থেকে নিয়েছে, সেটা দাসীকে ফেরত দেয়ার আদেশ করা হবে।

কেননা, মনিব দায় ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারটি অস্বীকার করছে। কারণ কার্মটিকে সে দায় সাব্যস্ত হওয়ার বিরোধী একটি সুপরিচিত অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত করছে, যেমন প্রথম মাসআলাটির ক্ষেত্রে, এবং সহবাস ও উপার্জনের ক্ষেত্রে।

আর বিদ্যমান নির্ধারিত বস্তুর ক্ষেত্রে মনিব দাসীর হস্ত-অধিকার স্বীকার করছে। কারণ সে দাসীর কাছ থেকে নেয়ার কথা স্বীকার করেছে। এরপর সে (দাসত্বের অবস্থার কথা উল্লেখ করে মূলত)তার বিপক্ষে নিজের মালিকানার দাবী করছে, আর

দাসী তা **অস্বীকার করছে। আর অস্বীকারকারীর কথাই গ্রহণযোগ্য**। একারণেই **মনিবকে উক্ত বস্তু** দাসীর হাতে ফেরত প্রদানের আদেশ দেয়া হবে।

শায়খায়নের যুক্তি এই যে, মনিব দায় সাব্যস্তির কারণ স্বীকার করেছে। এরপর এমন বিষয় দাবী করেছে, যা দায় থেকে তাকে অব্যাহতি দেয়। সুতরাং তার কথা গ্রহণ করা হবে না।

তাই বিষয়টি এমন হল যে, অন্য কোন ব্যক্তিকে সে বললো ঃ আমি তোমার ডান চক্ষু ফুঁড়েছিলাম এমন অবস্থায় যে,আমার ডান চক্ষু অক্ষত ছিল, তারপর তা নষ্ট হয়েগেছে (এবং কিসাস রহিত হয়ে গেছে।) আর স্বীকারোক্তি প্রাপ্ত ব্যক্তি বলে ঃ না, বরং (তুমি আমার ডান চক্ষু ফুঁড়েছো এমন অবস্থায় যে তোমার ডান চক্ষু ফোঁড়া ছিল (নষ্ট ছিল) সে ক্ষেত্রে স্বীকারোক্তি প্রাপ্ত ব্যক্তির কথা গ্রহণযোগ্য হবে।

এটা এজন্য যে, মনিব তার 'কর্মটিকে' এমন অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত করেনি ,যা দায় সাব্যস্ত হওয়ার বিরোধী। কেননা, যদি দাসীর ঋণগ্রস্ত অবস্থায় সে দাসীর হস্ত কর্তন করে, তাহলে তার উপর হস্তকর্তনের দায় বর্তাবে। (সুতরাং বোঝা গেল নিছক দাসত্ব দায় সাব্যস্ত হওয়ার বিরোধী নয়।)

তদ্রূপ যদি কেউ নিরাপত্তা প্রাপ্ত অবস্থায় হারবীর মাল নেয়, তাহলে তাকে তার দায় বহন করতে হবে।

সহবাস ও উপার্জনের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, ঋণগ্রস্ত দাসীর সঙ্গে মনিবের সহবাস 'সঙ্গম-মুল্য' ওয়াজিব করে না। অদ্রূপ দাসীর ঋণগ্রস্ত অবস্থায়ও যদি মনিব দাসীর আয় থেকে কিছু গ্রহণ করে, তাহলে মানিবের উপর দায় সাব্যস্ত হয় না। সুতরাং মনিবের কর্মটিকে এমন পরিচিত অবস্থায় সাথে সম্পৃক্ত করা পাওয়া গেল, যা দায় সাব্যস্ত করার বিরোধী।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন ঃ নিষেধাজ্ঞা সম্পন্ন কোন গোলাম যদি অপ্রাপ্ত বয়স্ক স্বাধীন বালককে কোন মানুষকে হত্যা করার আদেশ দেয়, আর সে তাকে হত্যা করে, তাহলে বাচ্চার আকিলাহদের উপর দিয়ত ওয়াজিব হবে।

কেননা, প্রকতপক্ষে সেই হত্যাকারী। আর ইতিপূর্বে বর্ণনা করে এসেছি যে, বাচ্চার ইচ্ছাকৃতভাবে ও অনিচ্ছাকৃতভাবে করা-উভয়টিই আর আদেশদাতার উপর কোন দায় আসবে না। তদ্রূপ একই বিধান হবে যদি আদেশদাতা অপ্রাপ্ত বয়স্ক হয়। কেননা, গোলাম ও বাচ্চার উচ্চারিত কোন কথার কারণে তাদের জবাবদিহি করতে হয় না।

কেননা, উচ্চারিত বক্তব্যের ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা আসে শরীয়তের বিবেচনার কারণে। আর শরীয়ত তাদের কোন বক্তব্যকে বিবেচনায় আনেনি।

আর বাচ্চার আকিলাদের কখনই আদেশদাতা বাচ্চার কাছে রুজু করার অধিকার থাকবে না। তবে তাদের আদেশদাতা গোলামের কাছে, তার মুক্তি লাভের পর, রুজু করার অধিকার থাকবে। কেননা, তার বক্তব্যের অবিরোধীতা ছিল মনিবের হকের

কারণে, গোলামের স্বীকার যোগ্যতার ত্রুটির কারণে নয়, আর তা দূর হয়ে গেছে। বাচ্চার বিষয়টি ভিন্ন, কেননা, সে অসম্পূর্ণ যোগ্যতার অধিকারী।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন ঃ একই বিধান হবে যদি কোন গোলাম আদেশ দেয়।

অর্থাৎ আদেশদাতা ও আদিষ্ট উভয় নিষেধাজ্ঞা সম্পন্ন গোলাম। **এক্ষেত্রে হত্যাকারীর মনিবকে আদেশ করা হবে গোলামটিকে অর্পণ করার কিংবা মুক্তিপণ পরিশোধ করার।** আর সে বর্তমান অবস্থায় প্রথম গোলামের কাছে রুজু করতে পারবে না। তবে মুক্তি লাভের পর গোলামের মূল্য ও মুক্তি পণের মাঝে স্বল্পতরটি সম্পর্কে রুজু করতে পারবে। কেননা, মনিব তো অতিরিক্ত পরিমাণটি দিতে বাধ্য ছিল না। (গোলামের মূল্য কম হওয়ার ছুরতে সে গোলামকে অর্পণ করতে পারবে।)

এ বিধান তখন হবে, যখন হত্যাকান্ড ভুলক্রমে সংঘটিত হবে। তদ্রূপ ইচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে হত্যাকারী গোলাম যদি অপ্রাপ্ত বয়স্ক হয়। কেননা, অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকের ইচ্ছাকৃত কাজ অনিচ্ছাকৃত কাজের মত। পক্ষান্তরে গোলাম বয়স্ক হলে কিসাস ওয়াজিব হবে। কেননা, কিসাস স্বাধীন ও গোলামের মাঝে কার্যকর হয়।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন ঃ গোলাম যদি দু'জন লোককে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে এবং উভয়ের প্রত্যেকেরই দু'জন করে অভিভাবক থাকে, আর উভয়ের প্রত্যেকের দুই অভিভাবকের একজন ক্ষমা করে দেয়, তাহলে মনিব (দুই নিহতের) অপর দুই অভিভাবকের হাতে অর্ধেক গোলাম অর্পণ করবে, কিংবা গোলামের দশ হাজার দিরহাম মুক্তিপণ আদায় করবে।

কেননা, উভয়ের প্রত্যেকের দুই অভিভাবকের একজন যখন ক্ষমা করে দিল, তখন কিসাস রহিত হয়ে গেলো এবং তা মালে রূপান্তরিত হয়ে গেল। সুতরাং বিষয়টি সূচনাতেই মাল (দিয়ত) ওয়াজিব হওয়ার মত হয়ে গেল।

এটা এজন্য যে, (দু পক্ষের) অভিভাবকদের প্রাপ্য হক হলো গোলামের দাস-সত্তা কিংবা বিশ হাজার (মুক্তিপণ)। আর দুই ক্ষমাকারীর হিসসা রহিত হয়ে গেছে, আর তা হলো অর্ধেক। সুতরাং বাকী থাকলো অর্ধেক।

আর যদি সে একজনকে হত্যা করে ইচ্ছাকৃতভাব এবং অন্য জনকে হত্যা করে অনিচ্ছাকৃতভাবে। এরপর ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যাকৃত ব্যক্তির দুই অভিভাবকের একজন মাফ করে দেয়, তাহলে মনিব মুক্তিপণ পরিশোধ করতে চাইলে গোলামের মুক্তিপণ হিসাবে পনের হাজার দিরহাম পরিশোধ করবে। পাঁচ হাজার হলো ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যাকৃত ব্যক্তির দুই অভিভাবকের একজনের জন্য, আর দশ হাজার হলো অনিচ্ছাকৃতভাবে হত্যাকৃত ব্যক্তির দুই অভিভাবকের জন্য।

কেননা, ইচ্ছাকৃত হত্যার কিসাস যখন মাল বা দিয়তে রূপান্তরিত হলো তখন অনিচ্ছাকৃত হত্যার অভিভাবকের প্রাপ্য হলো সমগ্র দিয়ত বা দশ হাজার দিরহাম,- পক্ষান্তরে ইচ্ছাকৃত হত্যার দুই অভিভাবকের একজনের প্রাপ্য হলো অর্ধেক দিয়ত বা

পাঁচ হাজার দিরহাম। আর (দুই) মুক্তিপণ (বা দিয়তের)মাঝে সংকীর্ণতা নেই। সুতরাং পনের হাজার দিরহাম ওয়াজিব হবে।

আর মনিব যদি তাদের হাতে গোলামকে অর্পণ করতে চায়, তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে তিনভাগ করে অর্পণ করবে। দুই তৃতীয়াংশ অনিচ্ছাকৃত হত্যার অভিভাবদ্বয়কে, আর ইচ্ছাকৃত হত্যার অভিভাবকদ্বয়ের অক্ষমাকারীকে এক তৃতীয়াংশ। আর ছাহেবায়ন বলেন ঃ চারভাগ করে অর্পণ করবে, চারভাগের তিনভাগ হলো অনিচ্ছাকৃত হত্যার অভিভাবকদ্বয়কে, আর চার ভাগের একভাগ হলো ইচ্ছাকৃত হত্যার অক্ষমকারী অভিভাবককে।

তার ছাহেবায়নের মতে বণ্টন হবে মুকাবেলার ভিত্তিতে। সুতরাং অনিচ্ছাকৃত হত্যার অভিভাবকদ্বয়ের অনুকূলে মুকাবেলাহীন অবস্থায় অর্ধেক অর্পণ করবে।

তারপর অন্য অর্ধেকের ক্ষেত্রে উভয় দলের মোকাবেলা সমান হবে। ফলে সেই অর্ধেক অর্ধেক করে ভাগ হবে। এজন্য গোলামটি চারভাগে বণ্টিত হবে।

ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে 'عَوْلٌ' বা مُضَارَبَةٌ (অংশ বৃদ্ধি ও গুণ) পদ্ধতিতে গোলামটি তিনভাগে ভাগ হবে। কেননা, তাদের হকের সম্পর্ক হয়েছে দাস-সত্তার সঙ্গে। এর মূল ঋণ-বেষ্টিত পরিত্যক্ত সম্পত্তি। ফলে এই দু'জন সমগ্র দ্বারা হিসসা গ্রহণ করবে। আর এক জন অর্ধেক দ্বারা হিসসা গ্রহণ করবে।

এই মাসআলার কিছু নযীর রয়েছে এবং কিছু বিপরীত নযীর রয়েছে। زِيَادَاتٌ কিভাবে সেগুলো আমরা উল্লেখ করেছি।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন ঃ দুই মনিবের যদি একটি শরীকানা গোলাম থাকে, আর সে উভয়ের কোন নিকটাত্মীয়কে (যেমন তাদের বাপ বা ভাইকে) হত্যা করে, আর তাদের একজন তাকে মাফ করে দেয়, তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে (অপর জনের) সমস্ত হক (নফস ও মাল উভয় ক্ষেত্রের হক) বাতিল হয়ে যাবে। আর ছাহেবায়ন (র) বলেন ঃ যে মাফ করেছে, সে তার হিসসার অর্ধেক অপর জনকে দেবে। কিংবা গোলামের মুক্তি পণের এক চতুর্থাংশ আদায় করবে।

'জামে ছাগীরের' কোন কোন সংস্করণে ইমাম মুহাম্মদের মত ইমাম আবু হানীফা (র) এর সঙ্গে উল্লেখিত হয়েছে।

আর 'যিয়াদাত' গ্রন্থে মাসআলাটি এবাবে উল্লেখিত হয়েছে; একজন গোলাম তার মনিবকে হত্যা করলো, যার রয়েছে দুটি পুত্র। তাদের একজন গোলামকে ক্ষমা করে দিল। সে ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফা ও মুহাম্মদ (র)-এর মতে (নফস ও মাল উভয় ক্ষেত্রের) সমস্ত হক বাতিল হয়ে যাবে। আর ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে এক্ষেত্রের সিদ্ধান্ত কিভাবে বর্ণিত মাসআলার সিদ্ধান্তের অনুরূপ, আর বর্ণনার মতপার্থক্য উল্লেখিত হয়নি।

ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর যুক্তি এই যে, গোলামের মাঝে (মনিব দ্বয়ের প্রত্যেকের অর্ধেক) কিসাসের হক ব্যাপ্ত রূপে সাব্যস্ত হয়েছে। কেননা, এক মনিবের

মালিকানা অপর মনিবের অনুকূলে কিসাসের হক সাব্যস্ত হওয়াকে বাধাগ্রস্ত করে না। সুতরাং দুজনের একজন যখন নিজের হিসসা মাফ করে দিল, তখন অপর জনের হিসসা তথা অর্ধেক কিসাস মাল-এ রূপান্তরিত হয়ে গেলো, তবে সেই অর্ধেক সমগ্রে ব্যাপ্ত অর্ধেক রয়েছে মাফকারীর অর্ধেক হিসসায়।

সুতরাং তার নিজের হিসসার বিপরীতে যে অর্ধেক আসে, সেটা এই অনিবার্য প্রয়োজনে রহিত হয়ে যাবে যে, মনিব তার নিজের গোলামের উপর কোন মালের দায় আরোপ করতে পারে না,(কেননা, সেটা নিজের উপর আরোপ করা হবে)।

আর মাফকারী অপর শরীকদারের হিসসার বিপরীতে যে অর্ধেক আসে, তা বহাল থাকবে। আর অর্ধেকের অর্ধেক হচ্ছে চতুর্থাংশ। একারণেই মাফকারী শরীকদারকে বলা হবে যে, তোমার হিসসার অর্ধেক গোলাম (অর্থাৎ অর্ধেকের অর্ধেক) অর্পণ করা, কিংবা দিয়তের চতুর্থাংশ দ্বারা তার মুক্তিপণ আদায় কর, তারফায়নের যুক্তি এই যে, যে মালে (বা দিয়ত) ওয়াজিব হবে, সেটা মূলত নিহত ব্যক্তির হক। কেননা, তা তার রক্তের (জানের) বিনিময়।

একারণেই তো তা থেকে নিহতের ঋণ পরিশোধ করা হয়। এবং তাতে নিহতের অসিয়ত কার্যকর হয়। এরপর নিহতের প্রয়োজন থেকে উক্ত মাল মুক্ত হওয়ার পর ওয়ারিসগণ সেই মালে তার স্থলবর্তী হয়। আর মনিব তার গোলামের উপর কোন মাল ধার্য করতে পারে না। সুতরাং নিহতের ওয়ারিসরা ঐ মালের ক্ষেত্রে তার স্থলবর্তী হতে পারবে না।

পরিচ্ছেদ ঃ গোলামের প্রতি কৃত অপরাধ

কেউ যদি কোন গোলামকে ভুলক্রমে হত্যা করে, তাহলে তার উপর গোলামের মূল্য ওয়াজিব হবে, তবে দশ হাজার দিরহাম অতিক্রম করতে পারবে না। সুতরাং গোলামের মূল্য যদি দশ হাজার বা বেশী হয়, তাহলে মনিবের অনুকূলে দুশ কম দশ হাজারের ফায়সালা করা হবে। আর দাসীর ক্ষেত্রে তার মূল্য যদি দিয়তের পরিমাণের চেয়ে বেশী হয়, তাহলে পাঁচ কম পাঁচ হাজারের ফায়সালা করা হবে।

এটা ইমাম আব হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত। আর ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন ঃ তার মূল্য ওয়াজিব হবে। সেটা যতই হোক।

আর যদি সে কোন গোলাম ছিনিয়ে নেয়, যার মূল্য বিশ হাজার দিরহাম। এরপর গোলাম তার হাতে থাকা অবস্থায় মারা যায়, তাহলে সর্বসম্মত মতে তার মূল্য ওয়াজিব হবে। পরিমাণ যাই হোক।

ইমাম আবু ইউসুফ ও শাফিঈ (র)-এর যুক্তি এই যে, ক্ষতিপূরণ, গোলামের সম্পদগুণের বিনিময়ে, (রক্তের বা জানের বদল নয়) তাই সেটা মনিবের অনুকূলে সাব্যস্ত হয়। অথচ মনিব তো শুধু সম্পদ গুণের দিক থেকেই গোলামের মালিক। তদ্রূপ

বিক্রীত গোলামকে যদি কবয্ করার আগে হত্যা করা হয়, তখন বিক্রয় চুক্তি বহাল থাকে, আর বিক্রয় চুক্তি বাকি থাকা সম্ভব সম্পদগুণ বাকি থাকার মাধ্যমে হোক, তা মূল রূপে কিংবা বিনিময় রূপে।

সুতরাং (দিয়তের চেয়ে বেশী মূল্য সম্পন্ন গোলামের) বিষয়টি দিয়তের চেয়ে কমমূল্যের গোলামের মত হলো এবং ছিনিয়ে নেয়া গোলামের মত হলো।

ইমাম আবু হানীফা ও মুহাম্মদ (র)-এর প্রমাণ হলো আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ

وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ اِلٰى اَهْلِهٖ .

আর দিয়ত, যা তার অভিভাবকদের কাছে অর্পণ করা হবে। (৪ঃ৯২)।

এখানে আল্লাহ্ তা'আলা (দাস ও স্বাধীনের মাঝে পার্থক্য না করে) নিঃশর্ত রূপে দিয়ত ওয়াজিব করেছেন। আর দিয়ত বলে মানবসত্তার বিপরীতে সাব্যস্ত মালকে।

তাছাড়া যুক্তিগত কারণ এই যে, গোলামের মাঝে মানবত্বের অর্থ বিদ্যমান রয়েছে। তাই সে মুকাল্লাফ (বিধান-আদিষ্ট) হয়। আবার তার মাঝে সম্পদগুণ আছে। তন্মধ্যে মানবত্বের গুণ হল উচ্চতর। সুতরাং উভয়কে একত্র করা অসম্ভব হওয়ার সময় নিম্নতরকে মূল্যহীন করে উচ্চতরকে বিবেচনায় আনতে হবে।

আর (তারা যে নযির পেশ করেছেন, তার জবাব এই যে,) গছবের দায় সাব্যস্ত হয় সম্পদ-গুণের বিপরীতে। কেননা, গছব সম্পন্ন হয় শুধু মালের উপর।

আর চুক্তি বিদ্যমান থাকা চুক্তির ফায়দা বিদ্যমান থাকার অনুবর্তী। এ কারণেই গোলামকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করার পরও চুক্তি বহাল থাকে, কিসাস গোলামের সম্পদ-গুণের বিনিময় হয়। (কেননা, চুক্তির বিদ্যমানতার ফায়দা রয়েছে, আর তা হল বিক্রয় রহিত করা এবং কিসাস উশুল করার মাঝে ইচ্ছাধিকার প্রদান। যাই হোক, কিসাস যেমন সর্বসম্মতভাবে সম্পদ-গুণের বিনিময় নয়) দিয়তের বিষয়টিও তদ্রূপ।

আর দিয়তের চেয়ে মূল্য কম হওয়ার ক্ষেত্রে যা ওয়াজিব হয়, সেটা হলো গোলামের মানব সত্তার বিপরীতে। তবে, যেহেতু এ ক্ষেত্রে শরীয়ত নির্ধারিত কোন পরিমাণ নেই, সেহেতু নিজস্ব মত প্রয়োগ করে আমরা তার মূল্য দ্বারা তার পরিমাণ নির্ধারণ করেছি।

দিয়তের চেয়ে মূল্য বেশী হওয়ার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, স্বাধীন ব্যক্তির মূল্য শরীয়ত কর্তৃক দশ হাজার নির্ধারিত হয়েছে। সুতরাং গোলামের ক্ষেত্রে আমরা তার মর্যাদার নীচুতা প্রকাশ করার জন্য তা থেকে কিছু কমিয়েছি। আর দশ দিরহাম নির্ধারিত হয়েছে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর আছার বা ছাহাবা বাণী দ্বারা।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ গোলামের হাতের ক্ষেত্রে তার মূল্যের অর্ধেক সাব্যস্ত হবে, তবে তা পাঁচ কম পাঁচ হাজারের বেশী হতে পারবে না।

কেননা, (শরীয়তের দৃষ্টিতে) হাত হলো মানুষের অর্ধেক। সুতরাং সেটাকে তার সমগ্রের উপর কিয়াস করা হবে। আর গোলামের মর্যাদার নীচুতা প্রকাশ করার জন্য এই পরিমাণ হ্রাস করা হবে।

আর স্বাধীন ব্যক্তির যে সকল দিয়ত শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত রয়েছে, গোলামের ক্ষেত্রে সেটা তার মূল্য থেকে ঐ হারে নির্ধারিত হবে। কেননা, গোলামের ক্ষেত্রে তার মূল্য স্বাধীন ব্যক্তির ক্ষেত্রে তার দিয়তের সমতুল্য। কারণ দিয়ত হচ্ছে রক্তের (বা জানের) বিনিময়, যেমন আমরা সাব্যস্ত করে এসেছি।

আর যদি কেউ কোন দাসীকে গছব করে, যার মুল্য বিশ হাজার দিরহাম, এবং তার হাতে থাকা অবস্থায় সে মরা যায়, তাহলে তার উপর দাসীর পূর্ণ মূল্য ওয়াজিব হবে। কেননা, আমরা বর্ণনা করে এসিছি যে,গছবের দায় হচ্ছে সম্পদ গুণের দায়।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন ঃ কেউ যদি কোন গোলামের হাত কেটে ফেলে, আর মনিব তাকে আযাদ করে দেয়, এরপর (গোলাম ঐ জখমে মারা যায়) মনিব ছাড়া তার কোন ওয়ারিছ থাকলে তাতে কিসাস আরোপিত হবে না। অন্যথায় তার থেকে কিসাস গ্রহণ করা হবে। এটা ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর অভিমত। আর **ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন ঃ সে ক্ষেত্রে কিসাস ওয়াজিব হবে না, তবে কর্তনকারীর উপর হাতের দিয়ত ওয়াজিব হবে। আর তাতে যে মুল্যহানি ঘটেছে, সেটা আসবে আযাদ করা পর্যন্ত। আর উদ্বৃত্ত পরিমাণ বাতিল হবে।**

প্রথম ছূরতে (অর্থাৎ মনিব ছাড়া অন্য কোন ওয়ারিছ না থাকার ছূরতে) কিসাস ওয়াজিব না হওয়ার কারণ হলো কিসাস গ্রহণের অধিকারীর অস্পষ্ট হওয়া। কেননা, কিসাস ওয়াজিব হয় মৃত্যুর সময়, তবে জখমের সময়ের দিকে সম্পৃক্ত অবস্থায়। সুতরাং জখমকালীন অবস্থার বিবেচনায় হক সাব্যস্ত হয় মনিবের জন্য। পক্ষান্তরে মৃত্যুকালের অবস্থা বিবেচনায় হক সাব্যস্ত হয় ওয়ারিছদের জন্য। ফলে অস্পষ্টতা দেখা দিল এবং কিসাস উশুল করা অসম্ভব হয়ে গেল। ফলে উশূল করার উপাযোগী রূপে কিসাস ওয়াজিব হওয়া সম্ভব নয়। আর আমাদের আলোচনা হচ্ছে এ ব্যাপারেই (নিছক কিসাস ওয়াজিব হওয়ার বিষয়ে কোন কথা নেই।)

আর উভয়ের একত্র করার অস্পষ্টতা দূর হবে না। কেননা, উভয়ের মালিকানা হচ্ছে ভিন্ন-ভিন্ন দুই ক্ষেত্রে। (সুতরাং উভয়ের জন্য স্থায়ীভাবে মালিকানা সাব্যস্ত হবে না,এবং এক সাথে কিসাস উশুল করতে পারবে না।)

পক্ষান্তরে, যে গোলামের খিদমত একজন লোকের অনুকূলে অসিয়ত করা হয়েছে, আর তার দাস-সত্তা অন্য একজনের অনুকূলে অসিয়ত করা হয়েছে, তাকে হত্যা করা হলে বিষয়টি ভিন্ন হবে।

কেননা, উভয়ের প্রত্যেকের অনুকূলে যে হক রয়েছে, তা জখমের সময় থেকে মৃত্যুর সময় পর্যন্ত সাব্যস্ত। সুতরাং কিসাস উশুলের ক্ষেত্রে তারা একত্র হলে অস্পষ্টতা দূর হয়ে যাবে।

মতানৈক্যপূর্ণ ক্ষেত্রে অর্থাৎ মনিব ছাড়া গোলামের কোন ওয়ারিস না থাকার ক্ষেত্রে ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর যুক্তি এই যে, (মনিবের) অভিভাবকত্ব লাভের কারণ ভিন্ন

হয়েছে। কেননা, দু' অবস্থার এক অবস্থায় (অর্থাৎ মুক্তির পূর্বে জখমের অবস্থায়) কারণ হচ্ছে মালিকানা। আর অন্য অবস্থায় (অর্থাৎ মুক্তির পর মৃত্যুর অবস্থায়) কারণ হচ্ছে 'ওয়ালা' সূত্রে লব্ধ মীরাছী অধিকার। সুতরাং যে সকল ক্ষেত্রে সতর্কতা অবম্বন করা জুরুরী (অর্থাৎ সন্দেহ অবস্থায় যা সাব্যস্ত হয় না), সে সকল ক্ষেত্রে হকদার সাব্যস্ত কারণগত ভিন্নতাকে হকদার ভিন্ন হওয়ার স্থলবর্তী গণ্য করা হবে।

যেমন কেউ যদি বলে, তুমি এই দাসীটি আমার কাছে এত মূল্যে বিক্রয় করেছো, আর মনিব বলে, বরং তাকে তোমার কাছে বিবাহ দিয়েছি, সে ক্ষেত্রে (সহবাসের অধিকার লাভের কারণগত ভিন্নতা দেখা দেয়ায়) দাসীর সঙ্গে সহবাস করা তার জন্য জাইয হবে না। তা ছাড়া মুক্তিদান হলো (গুণগতভাবে) জখমের সংক্রমণকে রহিতকারী। আর তা রহিত হওয়ায় জখম সংক্রমণের অবস্থায় থেকে যাবে। আর সংক্রমণ কর্তনের বিধানহীন অবস্থায় থেকে যাবে। সুতরাং কিসাস নিষিদ্ধ হয়ে যাবে, (যেন কোন দৈব দুর্ঘটনায় এটা ঘটেছে।)

শায়খায়নের যুক্তি এই যে, মনিবের অনুকূলে অভিভাবকত্ব সাব্যস্ত হওয়ার বিষয়টি আমরা নিশ্চিতভাবে জেনেছি। সুতরাং সে কিসাস উশুল করবে।

এটা এজন্য যে, যার অনুকূলে কিসাসের ফায়ছালা করা হচ্ছে, সে নির্দিষ্ট। আর হুকুম এবং ফায়দা লাভ করার বৈধতার সপক্ষে মত প্রকাশ করা আবশ্যক।

প্রথম ছুরতটি অর্থাৎ মনিব ছাড়া অন্য কোন ওয়ারিশ থকার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, (জখম কালের অবস্থা এবং মৃত্যু কালের অবস্থার বিবেচনায় বলতে হয় যে, যার অনুকূলে ফায়সালা করা হয়েছে সে অজ্ঞাত।

আর এখানে কারণের বিভিন্নতা বিবেচ্য নয়। কেননা, তাতে বিধান ভিন্ন হচ্ছে না। দাসীর মাসআলাটি ভিন্ন। কেননা, 'হস্তগত' মালিকানা বিধানের দিক থেকে বিবাহগত মালিকানা থেকে ভিন্ন।

আর মুক্তিদান স্বকীয়ভাবে সংক্রমণকে রহিত করে না, বরং কিসাস উশুল করার হকদার কে, তা অপষ্ট হওয়ার কারণে রহিত করে। আর এটা হয় অনিচ্ছাকৃতভাবে করার ক্ষেত্রে, ইচ্ছাকৃতভাবে করার ক্ষেত্রে নয়। কেননা, গোলাম মালের মালিক হওয়ার যোগ্যতা রাখে না।

সুতরাং জখমের অবস্থা বিবেচনায় অধিকার সাব্যস্ত হয় মালিকের জন্য, আবার মৃত্যু কালের অবস্থা বিবেচনায় স্বাধীনতার কারণে মৃতের অনুকূলে অধিকার সাব্যস্ত হয়, দিয়তের মাল থেকে তার ঋণ শোধ করা হয় এবং তার অসিয়ত কার্যকর করা হয়। ফলে অস্পষ্টতা এসে গেল। পক্ষান্তরে ইচ্ছাকৃতভাবে করার ক্ষেত্রে তার বিধান হলো কিসাস। আর কিসাসের বিষয়ে দাস তার মূল স্বাধীনতার উপর বহাল রয়েছে।

আর হক মূলতঃ গোলামের জন্য সাব্যস্ত হয়, এই হিসাবে (গোলামের স্থলবর্তী রূপে) মনিবই সেটার কর্তৃত্ব গ্রহণ করবে। কেননা, মনিব ছাড়া তার কোন ওয়ারিস নেই। সুতরাং কার জন্য হক সাব্যস্ত হবে, সে বিষয়ে অস্পষ্টতা নেই।

আর ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে যেহেতু উভয় ছূরতে কিসাস নিষিদ্ধ হলো, সেহেতু হাতের দিয়ত ওয়াজিব হবে এবং জখমকাল থেকে মুক্তিদান পর্যন্ত যে মূল্যহানি ঘটেছে, তার দায়ও বর্তাবে।

এর কারণ আমরা বর্ণনা করেছি যে, তা তার মালিকানায় সম্পন্ন হয়েছে। আর উদ্বৃত্ত পরিমাণ বাতিল হবে।

আর শায়খায়নের নিকট প্রথম ছূরতের সিদ্ধান্ত ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর নিকট দ্বিতীয় ছূরতের সিদ্ধান্তের অনুরূপ।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন ঃ কেউ যদি তার দুই গোলামকে লক্ষ্য করে বলেঃ তোমাদের একজন আযাদ, এরপর তাদেরকে 'জখম' করা হলো, আর মনিব অস্পষ্ট মুক্তিকে তাদের একজনের উপর আরোপ করল, তাহলে উভয়ের দিয়ত মনিব পাবে।

কেননা, অস্পষ্টতার কারণে নির্ধারিত গোলামের উপর 'মুক্তি' প্রযোজ্য হয়নি। পক্ষান্তরে আঘাত নির্ধারিত-এর সাথেই যুক্ত হয়। সুতরাং আঘাতের ক্ষেত্রে তারা মালিকাধীনই থেকে যাবে।

আর যদি কোন একজন লোক তাদেরকে (একসঙ্গে) হত্যা করে, তাহলে একজন স্বাধীন ব্যক্তির দিয়ত এবং একজন গোলামের মূল্য ওয়াজিব হবে।

পার্থক্যের কারণ এই যে, (অস্পষ্ট মুক্তি দানের পর) ব্যাখ্যাদানের অর্থ এক হিসাবে 'মুক্তি' সৃষ্টি করণ, আরেক হিসাবে পূর্বের সৃষ্ট 'মুক্তি' প্রকাশ করণ, যেমন মৌল ফিকাহ শাস্ত্রে আলোতি হয়েছে। আর গোলাম 'জখম'-এরপর ব্যাখ্যায় 'পাত্র' রূপে বহাল থাকে, সুতরাং ব্যাখ্যাকে উভয়ের ক্ষেত্রেই 'সৃষ্টিকরণ' হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে। (সুতরাং জখম গোলাম অবস্থায় হয়েছে), কিন্তু মৃত্যুর পর ব্যাখ্যার পাত্র রূপে বহাল থাকে না। সুতরাং ব্যাখ্যাকে আমরা নিছক প্রকাশ করণ বলে বিবেচনা করেছি। আর একজন তো নিশ্চিত রূপেই স্বাধীন। সুতরাং একজন গোলামের মূল্য এবং একজন স্বাধীন ব্যক্তির দিয়ত ওয়াজিব হবে।

পক্ষান্তরে উভয়ের প্রত্যেকে যদি পৃথক পৃথকভাবে একজন লোক হত্যা করে, তাহলে দুই গোলামের মূল্য ওয়াজিব হবে। কেননা, উভয়ের প্রত্যেকের স্বাধীন অবস্থায় মারা যাওয়ার বিষয়টি আমরা নিশ্চিত নই। আর উভয়ের প্রত্যেকে অস্বীকার করছে। তা ছাড়া কিসাস অজ্ঞাত ব্যক্তির ক্ষেত্রে মুক্তি সাব্যস্ত হওয়া অস্বীকার করছে। কেননা, তা মুক্তির ফায়দা ও অবস্থা বয়ে আনবে না। তবে (সুস্থ মস্তিক ও প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির) হস্তক্ষেপের সিদ্ধতার প্রয়োজনে আমরা এধরণের মুক্তিদান সিদ্ধ বলে গ্রহণ করেছি। এবং (ব্যাখ্যার মাধ্যমে) অজ্ঞাত থেকে পরিজ্ঞাত-এর দিকে তা স্থানান্তরিত করার কর্তৃত্ব তার অনুকূলে সাব্যস্ত করেছি। সুতরাং এটা প্রয়োজন পরিমাণেই সীমাবদ্ধ থাকবে। আর প্রয়োজন হচ্ছে নফসের ক্ষেত্রে। (কারণ নফস হলো পাত্র), অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ক্ষেত্রে নয়। সুতরাং অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ক্ষেত্রে গোলামই থেকে যাবে।

—৫৯

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন ঃ কেউ যদি গোলামের দুটি চোখ উপড়ে ফেলে, তখন মনিব ইচ্ছা করলে গোলামটি তাকে দিয়ে তার মুল্য গ্রহণ করতে পারে। আর ইচ্ছা করলে তাকে রেখে দিতে পারে। তবে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে তার অনুকূলে কোন মূল্যহানির দায় সাব্যস্ত হবে না। আর ছাহেবায়ন (র) বলেনঃ ইচ্ছা করলে সে গোলামকে রেখে দিয়ে যে মূল্যহানি ঘটেছে, তা নিতে পারে। আর ইচ্ছা করলে গোলামকে দিয়ে তার মূল্য নিতে পারে।

আর ইমাম শাফিঈ (র) বলেনঃ মনিব ক্ষতিপূরণ রূপে সমগ্র মূল্য লাভ করবে এবং গোলামের দেহ সত্তাও সে-ই ধরে রাখবে।

কেননা, ইমাম শাফিঈ (র) যা নষ্ট হয়েছে তার মুকাবেলায় ক্ষতিপূরণ সাব্যস্ত করেন। সুতরাং যা বাকি আছে, তা তার মালিকানায় বহাল থাকবে। যেমন কেউ গোলামের দু'হাতের একটি কেটে ফেললো কিংবা দু'চোখের একটি ফুঁড়ে দিল।

আমাদের যুক্তি এই যে, গোলামের সত্তায় সম্পদ-গুণ বিদ্যমান রয়েছে। এমন অবস্থায় যে, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ক্ষেত্রেও তা বিবেচ্য। কেননা, শুধু সত্তার মাঝে সীমাবদ্ধ রেখে সত্তার ক্ষেত্রে সম্পদ-গুণ বিবেচনা করা সম্ভব নয়। আর যখন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ক্ষেত্রে সম্পদ-গুণ বিবেচনা হলো, আর দুবিধার একটি শ্রেণী সত্তা বিনষ্ট করার মাধ্যমে এক দিক থেকে জান বিনষ্ট করা পাওয়া গেল। আর যিমান বা ক্ষতি পূরণ সমগ্রের মূল্য দ্বারা পরিমাণিত হয়, তখন ক্ষতিগ্রস্ততা রোধ করার জন্য এবং সাদৃশ্য সম্পন্ন করার জন্য দেহ সত্তার মালিকানা মনিবের থাকবে।

পক্ষান্তরে কেউ যদি একজন স্বাধীন ব্যক্তির চক্ষুদ্বয় ফুঁড়ে দেয়, তাহলে বিষয়টি ভিন্ন হবে। কেননা, তাতে সম্পদ গুণের অর্থ নেই।

তদ্রূপ মোদাব্বারের চক্ষুদ্বয়ের বিষয়টিও ভিন্ন। কেননা,তা এক মালিকানা থেকে অন্য মালিকানায় স্থানান্তর গ্রহণ করে না।

আর দুই হাতের একটি কর্তনের ক্ষেত্রে এবং দুই চোখের একটি ফুঁড়ে দেয়ার ক্ষেত্রে সুবিধার শ্রেণীসত্তা বিলুপ্ত করার দিক পাওয়া যায় নি।

ছাহেবায়েনের যুক্তি এই যে, সম্পদগুণ যখন বিবেচ্য হলো, তখন আমরা যেমন বলেছি, সেরূপ ইচ্ছাধিকার মনিবের অনুকূলে সাব্যস্ত হওয়া আবশ্যক, যেমন অন্য সমস্ত মালের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। কেননা কেউ যদি কারো কাপড় বেশী পরিমাণে ফেঁড়ে ফেলে, তাহলে মালিক ইচ্ছা করলে কাপড়টি ঐ ব্যক্তিকে দিয়ে তার উপর কাপড়ের মূল্য দায় আরোপ করতে পারে, আবার ইচ্ছা করলে কাপড় রেখে দিয়ে মূল্যহানির দায় তার উপর আরোপ করতে পারে।

ইমাম আবূ হানীফা (র) এর যুক্তি এই যে, যদিও তার সত্তার সম্পদগুণ বিবেচিত হয়, কিন্তু মানবত্ব গুণ সত্তার মাঝে এবং অঙ্গ প্রসঙ্গের মাঝেও বিলুপ্ত হয় না। লক্ষ্যণীয় যে, একজন গোলাম যদি অন্য একজন গোলামের হাত কেটে ফেলে, সেক্ষেত্রে মনিবকে আদেশ করা হয় গোলামকে অর্পণ করার কিংবা তার মুক্তিপণ পরিশোধ

করার। আর এটা মানবত্বের বিধানভুক্ত বিষয়। কেননা মালের ক্ষেত্রে অপরাধের বিধান হলো ঐ অপরাধের বিপরীতে গোলামকে বিক্রি করা।

এরপর মানবত্ব গুণের বিধান সমূহের একটি এই যে, নফসের বদল এবং বিনষ্ট অঙ্গের বদল সকল অংশের বণ্টিত হবে না। এবং মনিব দেহসত্তার মালিক থাকবে না। আর সম্পদত্ব গুণের বিধান সমূহের একটি এই যে, তা বণ্টিত হবে এবং মনিব দেহসত্তার মালিক হবে। সুতরাং উভয় সদৃশ্যতাকে আমরা বিধান থেকে তাদের প্রাপ্য পূর্ণ অংশ দান করেছি।[১]

পরিচ্ছেদ ঃ মুদাব্বার ও উম্মে ওয়ালাদের অপরাধ

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ মুদাব্বার বা উম্মে ওয়ালাদ যদি কোন অপরাধ করে, তাহলে মনিব তার মূল্য এবং অপরাধের দিয়ত এই দুইয়ের স্বল্পতরটির দায় বহন করবে।

কেননা হযরত আবু ওবায়দা (রা) সম্পর্কে বর্ণিত রয়েছে যে, তিনি মুদাব্বারের অপরাধের ক্ষেত্রে তার মনিবের বিপক্ষে ফায়সালা দিয়েছেন।

তাছাড়া যুক্তিগত কারণ এই যে, মনিব মোদাব্বার ঘোষণার মাধ্যমে বা উম্মে ওয়ালাদ বানানোর ঘোষণার মাধ্যমে গোলামকে অর্পণ করা থেকে বাধাদানকারী হয়েছে। এবং মুক্তিপণ পরিশোধের দিকটিকে গ্রহণ করেনি। সুতরাং বিষয়টি এমন হলো যে, অপরাধ সংঘটনের পর ঘটনা না জানা অবস্থায় মনিব ঐ কর্মটি সম্পন্ন করেছে।

আর গোলামের মূল্য এবং দিয়ত থেকে স্বল্পতরটি সাব্যস্ত হওয়ার কারণ এই যে, দিয়তের বেশী পরিমাণের ক্ষেত্রে অপরাধের শিকার ব্যক্তির অভিবাবকের কোন হক নেই। আর মূল্যের অধিক পরিমাণের ক্ষেত্রে মনিবের পক্ষ হতে বাধাদান পাওয়া যায়নি। আর স্বল্পতর ও অধিকতর এর মাঝে ইচ্ছাধিকার প্রদানের অবকাশ নেই। কেননা, একই শ্রেণীর ক্ষেত্রে তা অর্থবহ নয়। কারণ অবধারিত ভাবেই সে স্বল্পতরটি গ্রহণ করবে।

১. অর্থাৎ যেহেতু মানব সত্তার উপর অপরাধ সংঘটনের বিপরীতে দিয়ত ওয়াজিব হয়েছে। সেহেতু আমরা সিদ্ধান্ত দিয়েছি যে, দিয়ত সমস্ত অঙ্গে বণ্টিত রূপে সাব্যস্ত হবে না, বরং সমগ্র দিয়ত বিনষ্ট অঙ্গের বিপরীতেই সাব্যস্ত হবে। আবার যেহেতু (গোলামের সম্পদ গুণের বিচারে) এই দিয়ত মালের বিপরীতে সাব্যস্ত হয়েছে, সেহেতু আমরা সিদ্ধান্ত দিয়েছি যে, চোখের পূর্ণ বদল গ্রহণের পর দেহসত্তা সে ধরে রাখতে পারবে না। পক্ষান্তরে ছাহেবায়ন যে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, তাতে মানবত্বের দিকটি সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয়েছে এবং শুধু সম্পদ গুণের দিকটি বিবেচিত হয়েছে। কেননা মালের ক্ষেত্রে বিধান এই যে, মালিক ইচ্ছা করলে মাল অর্পণ করে পূর্ণ মূল্য গ্রহণ করতে পারে। আবার ইচ্ছা করলে তা রেখে দিয়ে মূল্য হানির ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করতে পারে। যেমন কাপড় ফেঁড়ে ফেলার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।
পক্ষান্তরে শাফেয়ী (র) যে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, তাতে সম্পদগুণের দিকটি সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয়েছে এবং মানবত্বের দিকটি শুধু বিবেচিত হয়েছে।

গোলামের বিষয়টি ভিন্ন, কেননা বস্তু সত্তার প্রতি আগ্রহের বিষয়টি বাস্তব। সুতরাং গোলামকে অর্পণ করা এবং মুক্তিপণ পরিশোধ করার মাঝে ইচ্ছাধিকার প্রদানের বিষয়টি অর্থবহ হবে।

আর মোদাব্বার পরপর, লাগাতার অপরাধ করলেও একটি মাত্র মূল্য ওয়াজিব হবে।

কেননা তার পক্ষ হতে শুধু একটি দাসসত্তাকে বাধা দান করা পাওয়া গেছে। তাছাড়া মূল্য পরিশোধ করা, গোলামকে অর্পণ করারই সমতুল্য। আর গোলামকে তো বারংবার অর্পণ করা হয় না। সুতরাং মূল্য পরিশোধের ক্ষেত্রে একই অবস্থা হবে। আর মূল্যের ক্ষেত্রে তারা নিজ নিজ হিসসার হার অনুসারে গ্রহণ করবে। এবং প্রত্যেকের অনুকূলে অপরাধ সংঘটনকালীন তার মূল্য বিবেচ্য হবে। কেননা ঐ সময় মানিবের পক্ষ হতে বাধাদান সাব্যস্ত হয়।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ প্রথম অপরাধের অভিভাবকের কাছে আদালতের মাধ্যমে মনিবের মূল্য পরিশোধ করার পর মোদাব্বার বা উম্মে ওয়ালাদ যদি আরেকটি অপরাধ করে,তাহলে মনিবের উপর আর কোন দন্ড বর্তাবে না।

কেননা মনিব আদালতের ফায়সালার কারণে মূল্য পরিশোধে বাধ্য ছিল।

আর যদি আদালতের ফায়ছালা ছাড়া মূল্য পরিশোধ করে থাকে, তাহলে দ্বিতীয় অপরাধের অভিভাবকের ইচ্ছাধিকার থাকবে, ইচ্ছা করলে সে মনিবের পিছু নিতে পারে, আবার ইচ্ছা করলে প্রথম অপরাধের অভিভাবকের পিছু নিতে পারে। এটা ইমাম আবু হানীফা (র) এর মত। আর ছাহেবায়ন বলেন ঃ মনিবের উপর (এ ক্ষেত্রেও) কোন দন্ড বর্তাবে না।

কেননা মানিব মূল্য পরিশোধ করার সময় দ্বিতীয় অপরাধের অস্তিত্ব ছিল না। কারণ সে প্রাপ্য হকের সমগ্র হক প্রাপকের কাছে পরিশোধ করেছে। আর বিষয়টি আদালতের ফায়ছালার মাধ্যমে পরিশোধ করার মত।

ইমাম আবু হানীফা (র) এর যুক্তি এই যে, দ্বিতীয় অপরাধের অভিভাবকের হক (স্বেচ্ছায়) প্রথম অপরাধের অভিভাবকের হাতে প্রদান করা দ্বারা মনিব অপরাধকারী হয়েছে। আর প্রথম অপরাধের অভিভাবকতার হক অন্যায়ভাবে কবযা করা দ্বারা দায়বদ্ধ হয়েছে। সুতরাং সে ইচ্ছাধিকার লাভ করবে।

আর এটা এজন্য যে, দ্বিতীয় অপরাধটি এক হিসাবে গুণগতভাবে প্রথমটির সমকালীন। আর এদিকটি প্রথম অপরাধের অভিভাবকের সঙ্গে শরীকদারি সাব্যস্ত করে।

আবার দ্বিতীয় অপরাধটি এদিক থেকে গুণগতভাবে প্রথমটি থেকে বিলম্বিত যে, দ্বিতীয় অপরাধের ক্ষেত্রে গোলামের মূল্য, দ্বিতীয় অপরাধের দিন ধার্য করা হবে। সুতরাং দায় আরোপের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় অপরাধটিকে প্রথমটির সমকালীন এর ন্যায় গণ্য করা হয়েছে। কেননা মনিব তার সঙ্গে সম্পৃক্ত দ্বিতীয় অপরাধে অভিভাবকের হক বাতিল

করেছে। এ সিদ্ধান্ত আমরা গ্রহণ করেছি (সমকালীনতা বিলম্ব) উভয় সদৃশ্যতার উপর আমল করার জন্য।

কয়েকটি অপরাধ সংঘটনের পর মনিব যদি মোদাব্বারকে আযাদ করে দেয়, তাহলে মনিবের উপর একটি মাত্র মূল্য ওয়াজিব হবে।

কেননা তার উপর দায় সাব্যস্ত হয়েছে মোদাব্বার ঘোষণার মাধ্যমে গোলামের অর্পণকে বাধাগ্রস্ত করার কারণে। সুতরাং এরপর মুক্তিদানের অস্তিত্ব অভিন্ন হবে।

আর পেছনে আমরা যা কিছু বর্ণনা করেছি, সে সমস্তের ক্ষেত্রে উম্মে ওয়ালাদ মোদাব্বারের পর্যায়ভুক্ত হবে।

কেননা মোদাব্বার ঘোষণার মত উম্মে ওয়ালাদ ঘোষণা অর্পণকে বাধাগ্রস্ত করে।

আর মোদাব্বার যদি অনিচ্ছাকৃত অপরাধের স্বীকারোক্তি করে, তাহলে তার স্বীকারোক্তি বৈধ হবে না। এবং এই স্বীকারোক্তি দ্বারা স্বয়ং মোদাব্বারের উপর কিছু অপরিহার্য হবে না, সে মুক্তি লাভ করুক বা না করুক।

কেননা মোদাব্বারের অনিচ্ছাকৃত অপরাধের বিধান তার মনিবের উপর বর্তায়। আর মনিবের বিপক্ষে তার ঐ স্বীকারোক্তি কার্যকর হয় না। আল্লাহ অধিক জানেন।

গোলাম, মোদাব্বার ও বাচ্চাকে অপহরণ করা এবং তাদের ক্ষেত্রে অপরাধ সংঘটন করা

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন ঃ কেউ যদি তার গোলামের হাত কর্তন করে, এরপর কোন লোক তাকে অপহরণ করে, আর ঐ কর্তনের কারণে অপহরণকারীর হাতে সে মারা যায়, তাহলে গছবকারীর উপর হস্ত কর্তিত অবস্থায় গোলামের মূল্য ওয়াজিব হবে।

আর যদি মনিব অপহরণকারীর হাতে থাকা অবস্থায় তার হাত কাটে এবং সেই কারণে সে অপহরণকারীর কাছে থাকা অবস্থায় মারা যায়, তাহলে অপরহণকারীর উপর কোন দায় বর্তাবে না।

পার্থক্যের কারণ এই যে, গছব সংক্রমণকে রোধ করে। কেননা, তা মালিকানা লাভের কারণ। যেমন বিক্রয় চুক্তি মালিকানা লাভের কারণ। সুতরাং বিষয়টি এমন হলো যেন গোলাম দৈব কোন দুর্ঘটনায় মারা গেছে। তাই হস্তকর্তিত অবস্থায় তার যে মূল্য, সেটা সাব্যস্ত হবে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় ছূরতে সংক্রমণের বিবেচ্যতা বোধকারী কিছু পাওয়া যায়নি। সুতরাং সংক্রমণ ও প্রাণহানি প্রথম অবস্থার দিকে সম্বন্ধিত হবে এবং মনিবই গোলমের প্রাণহরণকারী রূপে সাব্যস্ত হবে। আর (কর্তনের মাধ্যমে) গোলামকে ফেরত আনয়ণকারী হবে। কেননা সে তো গোলামের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে। আর সেটাই হলো ফেরত গ্রহণ। সুতরাং অপহরণকারী দায় থেকে মুক্ত হয়ে যাবে।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন ঃ নিষেধাজ্ঞা সম্পন্ন গোলাম যদি অন্য এক নিষেজ্ঞা সম্পন্ন গোলামকে অপহরণ করে, আর সে তার হাতে থাকা অবস্থায় মারা যায়, তাহলে সে দায়বদ্ধ হবে।

কেননা নিষেধাজ্ঞা সম্পন্ন গোলামকে তার কর্মসমূহের বিষয়ে জবাবদিহী (ও দায়ী) করা হয়।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন ঃ কেউ যদি কোন মোদাব্বারকে অপহরণ করে, আর সে অপহরণকারীর কাছে থাকা অবস্থায় কোন অপরাধ করে, এরপর অপরহণকারী তাকে মনিবের কাছে ফিরিয়ে দেয়, আর মনিবের কাছে এসে সে আরেকটি অপরাধ করে, তাহলে মনিবের উপর মোদব্বারের মূল্য-দায় বর্তাবে, যা উভয় অপরাধের অভিভাবকদ্বয়ের মাঝে অর্ধেক করে বণ্টিত হবে। কারণ মূল্য সাব্যস্তকারী বিষয়ের ক্ষেত্রে তারা উভয়ে সমান।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন ঃ আর মনীব অপরহণকারীর কাছ থেকে গোলামের অর্ধেক মূল্য রুজু করবে।

কেননা তার বিপক্ষে বিনিময়ের অর্ধেকের হকদারি সাব্যস্ত হয়েছে এমন কারণ দ্বারা, যা অপহরণকারী হাতে থাকায় সময় সম্পন্ন হয়েছে। সুতরাং বিষয়টি অহপরণকারীর হাতে থাকা অবস্থায় অর্ধেক গোলামের হকদারি সাব্যস্ত হওয়ার মতো হলো।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন ঃ আর অপহরণকারীর কাছ থেকে গ্রহণকৃত অর্ধেক মূল্য প্রথম অপরাধের অভিভাবকের কাছে অর্পণ করবে। এরপর সেটাকে আবার অপহরণকারীর কাছ থেকে রুজু করবে।

এটা ইমাম আবু হানীফা ও আবু ইউসুফ (র)-এর অভিমত। আর মুহম্মদ (র) বলেন ঃ মনিব অপহরণকারী থেকে গোলামের মুল্যের অর্ধেক গ্রহণ করে (অভিভাবকের হাতে অর্পণ করবে না, বরং) সেটা তার মালিকানায় রেখে দেবে।

কেননা মনিব 'গাছিব'-এর কাছ থেকে যা রুজু করেছে সেটা হলো ঐ জিনিসের বিনিময়,যা সে প্রথম অপাধের (শিকার ব্যক্তির) অভিভাবকের হাতে অর্পণ করেছে। সুতরাং আবার সেটা সে অভিভাবকের হাতে অর্পণ করবে না। যাতে বদল ও বদলকৃত উভয় বস্তু একই ব্যক্তির মালিকানায় একত্র না হয়ে যায় এবং হকদারি যেন বারবার সাব্যস্ত না হয়।

শায়খায়নের যুক্তি এই যে, প্রথম অপরাধের (শিকার ব্যক্তির) অভিভাবকের হক উক্ত গোলামের সমগ্র মূল্যে সাব্যস্ত হয়েছে। কেননা গোলাম যখন তার ব্যাপারে অপরাধ সংঘটন করে, তখন অন্য কেউ তার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। পরে অবশ্য দ্বিতীয় অপরাধের (শিকার ব্যক্তির) অভিভাবক প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়ার কারণে, প্রথম জনের হক হ্রাস পেয়েছে। সুতরাং যখন গোলামের বিনিময় থেকে এমন কিছু মনিবের হস্তগত হবে, যা দ্বিতীয় অপরাধের অভিভাবকের হক থেকে মুক্ত, তখন সেটা সে নিয়ে নেবে, যাতে তার হক পূর্ণ হয়। আর মনিবের কাছ থেকে যখন সে তা নিয়ে নেবে, তখন সেটা আবার অপহরণকারীর কাছ থেকে রুজু করবে। কেননা, অপহরণকারীর হাতে থাকা অবস্থায় সৃষ্ট কারণ দ্বারাই এই অংশটিকে তার হাত থেকে নিয়ে নেয়ার হকদার বের হয়েছে।

আর যদি মোদাব্বার মনিবের কাছে থাকা অবস্থায় অপরাধ সংঘটন করে, তারপর কেউ তাকে অপহরণ করে নিয়ে যায়, আর সে অপহরণকারীর কাছে থাকা অবস্থায় আরো একটি অপরাধ করে, তাহলে মনিবের উপর গোলামের মূল্যদায় আসবে, যা উভয়ের মাঝে বণ্টিত হবে। আর মনিব মূল্যের অর্ধেক সম্পর্কে অপহরণকারীর কাছে রুজু করবে। কারণ সেটাই, যা আমরা প্রথম ছুরতে বর্ণনা করেছি।

তবে এক্ষেত্রে 'অর্ধেক মূল্যের' হকদার সাব্যস্ত হয়েছে দ্বিতীয় অপরাধটা দ্বারা। কেননা, সেটাই অপহরণকারীর হাতে থাকা অবস্থায় সংঘটিত হয়েছে। সুতরাং এটা গ্রহণ করে প্রথম অপরাধের (শিকার ব্যক্তির) অভিভাবকের হাতে অর্পণ করবে, কিন্তু অপহরণকারীর কাছ থেকে তা রুজু করবে না। এটা সর্বসম্মত।

এরপর ইমাম মুহাম্মদ (র) মাসআলাটির রূপ-কাঠামো সাধারণ গোলামের ক্ষেত্রে নির্ধারণ করেছেন এবং বলেছেন ঃ কেউ যদি কোন গোলাম অপহরণ করে, আর

গোলাম তার হাতে থাকা অবস্থায় কোন অপরাধ করে, তারপর গোলামকে সে মনিবের হাতে ফেরত দেয়, আর গোলাম মনিবের কাছে এসে দ্বিতীয় অপরাধ **সংঘটন করে,** তাহলে মনিব উভয় অপরাধের অভিভাবকদ্বয়ের হাতে গোলামকে অর্পণ করবে। এরপর সে অপহরণকারীর কাছে অর্ধেক মূল্য রুজু করবে এবং তা প্রথম অপরাধের অভিভাবকের হাতে অর্পণ করবে। আর এই অর্ধেক মূল্য দ্বিতীয়বার অপহরণকারীর কাছে রুজু করবে। এটা ইমাম আবু হানীফা ও আবু ইউসুফ (র)-এর মত। আর মুহাম্মদ (র)-এর মতে (প্রথমবার) অর্ধেক মূল্য অপহরণকারীর কাছে রুজু করবে এবং সেটা তার মালিকানায় অক্ষত থেকে যাবে। (অর্থাৎ প্রথম অপরাধের অভিভাবকের হাতে অর্পণ করবে না।)

পক্ষান্তরে গোলামটি যদি মনিবের কাছে থেকে কোন অপরাধ সংঘটন করে, তারপর কেউ তাকে অপহরণ করে, আর অপহরণকারীর কাছে গিয়ে দ্বিতীয় অপরাধ সংঘটন করে, তাহলে মনিব গোলামটিকে অর্ধেক করে অভিভাবকদ্বয়ের হাতে অর্পণ করবে এবং অপহরণকারীর কাছ থেকে অর্ধেক মূল্য রুজু করবে এবং প্রথম অভিভাবকের কাছে তা অর্পণ করবে, এরপর দ্বিতীয়বার সেটা অপহরণকারীর কাছ থেকে রুজু করবে না।

মোট কথা, আমাদের আলোচিত সকল ছুরতে সাধারণ গোলাম সম্পর্কে সিদ্ধান্ত মোদাব্বার সম্পর্কে সিদদ্ধান্তের অনুরূপ। পার্থক্য শুধু এই যে, এই ছুরতে মনিব গোলামকে অর্পণ করবে। আর প্রথম ছুরতে (মোদাব্বারের) মূল্য অর্পণ করবে।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেনঃ কেউ যদি মোদাব্বারকে অপহরণ করে, আর সে তার কাছে কোন অপরাধ সংঘটন করে, তারপর অপহরণকারী তাকে মনিবের হাতে ফিরিয়ে দেয়, তারপর সে আবার তাকে মনিবের হাতে ফিরিয়ে দেয়, তারপর তাকে অপহরণ করে, তারপর গাছিবের কাছে সে দ্বিতীয়বার অপরাধ সংঘটন করে, তাহলে মনিবের উপর মোদাব্বারের মূল্য-দায় বর্তাবে, যা উভয় অপরাধের অভিভাবক দ্বয়ের মাঝে অর্ধেক হারে বণ্টিত হবে।

কেননা, মোদাব্বার ঘোষণার মাধ্যমে সে একটি মাত্র দাস–সত্তাকে বাধা প্রাপ্ত করেছে, সুতরাং একটি মুল্যই তার উপর ওয়াজিব হবে।

এরপর অপহরণকারীর কাছ থেকে মোদাব্বারের পূর্ণ মূল্য রুজু করবে।

কেননা, উভয় অপরাধ অপহরণকারীর কাছে থাকা অবস্থায় সংঘটিত হয়েছে। **আর মুল্যের অর্ধেক প্রথম অপরাধের (শিকার ব্যক্তির) অভিভাবকের হাতে অর্পণ করবে।**

কেননা, (প্রথম অভিভাবক) সমগ্র মূল্যের হকদার হয়েছে। কারণ তার বিপক্ষে অপরাধ সংঘটনের সময় অন্য কারো হক সাব্যস্ত ছিল না। বরং প্রথম জনের হক হ্রাস পেয়েছে পরবর্তীতে (দ্বিতীয় অপরাধের) প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণে।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেনঃ আর এই অর্ধেক,(যা সে প্রথম অভিভাবককে দ্বিতীয়বার দিল, তা) অপহরণাকারীর কাছ থেকে পুনরায় নিয়ে নেবে।

কেননা, (এই অর্ধেকের উপর প্রথম অভিভাবকের পুনরায়) হকদার হওয়া ঐ কারণ দ্বারাই ঘটেছে, যা অপহরণকারীর কাছে থাকা অবস্থায় সংঘটিত হয়েছে। আর এটা মনিবের মালিকানায় অক্ষত থেকে যাবে। প্রথম অপরাধের (শিকার ব্যক্তির) অভিভাবককেও দেবে না এবং দ্বিতীয় অপরাধের অভিভাবককেও দেবে না।

কেননা, প্রথম জনের হক অগ্রবর্তী হওয়ার কারণে দ্বিতীয় জনের হক শুধু অর্ধেকের মাঝে সাব্যস্ত ছিল, আর সেটা তার কাছে পৌঁছে গেছে।

আর কারো কারো মতে (অপহরণকারীর কাছে উভয় অপরাধ সংঘটিত হওয়ার) এই মাসআলাটি (অর্থাৎ অপহরণকারীর কাছ থেকে নেয়া সমগ্র মূল্যের অর্ধেক প্রথম অভিভাবককে প্রদানের বিষয়টি হুবহু প্রথম মাসআলাটির মতবিরোধপূর্ণ।[১]

আর কারো কারো মতে এটা সর্বসম্মত অভিমত।

(সর্ব সম্মত হওয়ার অবস্থায়) মুহাম্মদ (র)-এর অনুকূলে পার্থক্যের যুক্তি এই যে, প্রথম মাসআলায় মনিব (অপহরণকারীর কাছ থেকে) যা রুজু করছে, সেটা ঐ অংশের বিনিময়, যা প্রথম অপরাধের অভিভাবকের হাতে মনিব অর্পণ করেছে। (আর সেটা দ্বিতীয় অপরাধের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়) কারণ দ্বিতীয় অপরাধ তো মনিবের কাছে থাকা অবস্থায় ঘটেছে। সুতরাং এখন দ্বিতীয়বার যদি সেটা প্রথম অভিভাবককে প্রদান করা হয়, তাহলে (একই অপরাধের কারণে) হক দারির পুনরাবৃত্তি ঘটবে।

পক্ষান্তরে এই মাসআলায় যেহেতু দ্বিতীয় অপরাধটিও অপহরণকারীর হাতে থাকা অবস্থায় সঙঘটিত হয়েছ, সেহেতু অপহরণকারী থেকে নেয়া এই অংশটাকে দ্বিতীয় অপরাধের বিনিময় ও বদল বলে সাব্যস্ত করা যায়। সুতরাং তা আমাদের উল্লেখকৃত সমস্যাটির দিকে নিয়ে যাবে না।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন ঃ কেউ যদি কোন স্বাধীন বালককে অপহরণ করে, আর সে অপহরণকারীর হাতে হঠাৎ মারা যায়, কিংবা জ্বরের মত কোন অসুস্থতায় মারা যায়, তাহলে অপহরণকারীর উপর কোন দায় বর্তাবে না। আর যদি বজ্রাঘাতের মত কোন আসমানি বালায় কিংবা সর্পদংশনের মত কোন দুর্ঘটনায় মারা যায়, তাহলে অপহরণকারীর আকিলাহদের উপর দিয়ত ওয়াজিব হবে।

এটা হলো সূক্ষ্ম কিয়াস। আর সাধারণ কিয়াসের দাবী এই যে, উভয় অবস্থায় অপহরণকারী কোন দায় বহন করবে না। এটাই ইমাম যুফার ও শাফেয়ী (র)-এর মত। কেননা, স্বাধীন ব্যক্তির ক্ষেত্রে অপহরণ সাব্যস্ত হয় না। লক্ষ্যণীয় যে, সে যদি বাচ্চা মোকাতাব হতো, তাহলেও অপহরণ দায় বহন করত না, অথচ সে শুধু হস্তনিয়ন্ত্রণের দিক থেকে স্বাধীন। সুতরাং ছোট বাচ্চা যদি সত্তাগতভাবে এবং

---

১. অর্থাৎ আলোচ্য মাসআলায় ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন ঃ মনিব অপহরণকারীর কাছে যে পূর্ণ মূল্য রুজু করবে, সেটা তার জন্যই অক্ষত থেকে যাবে। প্রথম জিনায়াতের অভিভাবক তার বাকি অর্ধেক হক নিতে পারবে না।

আর কারো কারো মতে শায়খানের মত মুহাম্মদ (র) বলেছেন যে, প্রথম জিনায়াতের অভিভাবক অপহরণকারীর কাছ থেকে মনিবের রুজু করায় সমগ্র মূল্য থেকে অর্ধেক নিয়ে তার হক পূর্ণ করবে।

—৬০

হস্তনিয়ন্ত্রণগতভাবেও স্বাধীন হয়, তাহলে তো আরো স্বাভাবিক কারণেই অপহরণকারীর দায়হীনতা সাব্যস্ত হবে।

সূক্ষ্ম কিয়াসের যুক্তি এই যে, অপহরণের কারণে তার উপর দায় আরোপ করা হবে। আর এটা হচ্ছে কারণ সৃষ্টিকরণের মাধ্যমে নষ্ট করা। কেননা, অপহরণকারী তাকে শ্বাপদসংকুল স্থানে বা বজ্রকবলিত স্থানে নিয়ে গেছে। এটা এজন্য যে, বজ্রপাত এবং সাপ ও হিংস্র প্রাণী সব স্থানে থাকে না। সুতরাং সে যদি তাকে ঐ সকল স্থানে সীমালংঘনপূর্বক নিয়ে যায় এমন অবস্থায় যে, (তার উপর থেকে) অভিভাবকের হিফাজত বিলুপ্ত করেছে, তখন মৃত্যুর কারণগুলো তার দিকে সম্বন্ধিত হবে।

কেননা, হেতুর শর্ত হেতুর স্থলবর্তী হয়, যদি শর্তটি সীমা লংঘনমূলক হয়। যেমন রাস্তায় খনন করা।

হঠাৎ মৃত্যু বা জ্বরজনিত মৃত্যুর বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, স্থান ভিন্নতা দ্বারা তা ভিন্ন হয় না। এমনকি যদি তাকে জ্বরকবলিত বা রোগ কবলিত কোন স্থানে নিয়ে যায়, তাহলে আমরাও তার উপর দায় আরোপের কথা বলবো। তখন তার (উপর না বরং) আকিলাহদের উপর দিয়ত ওয়াজিব হবে। (কেননা, এটা প্রত্যক্ষ হত্যা নয় বরং) কারণ সৃষ্টিকরণ যোগ হত্যা।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন ঃ কোন বাচ্চার কাছে যদি কোন গোলামকে আমানত রাখা হয়,আর সে তাকে হত্যা করে ফেলে, তাহলে বাচ্চার আকিলাহদের উপর দিয়ত বর্তাবে।

পক্ষান্তরে যদি তার কাছে কোন খাদ্য গচ্ছিত রাখে, আর সে তা খেয়ে ফেলে, তাহলে তার উপর দায় আরোপ করা হবে না।

এটা ইমাম আবু হানীফা ও মুহাম্ম (র)-এর মত। পক্ষান্তরে ইমাম আবু ইউসুফ ও শাফেয়ী (র) বলেনঃ উভয় ছূরতে এবাচ্চা দায় বহন করবে।

এই বিধানের আলোকে যদি নিশেধাজ্ঞাসম্পন্ন গোলামের কাছে কোন মাল গচ্ছিত রাখা হয়, আর গোলাম তা নষ্ট করে ফেলে, তাহলে ইমাম আবু হানীফা ও মুহাম্মদ (র)-এর মতে বর্তমান অবস্থায় তার উপর দায় আরোপ করা হবে না। তবে মুক্তি লাভের পর তার থেকে দায় উশুল করা হবে। আর ইমাম ইউসুফ ও শাফিয়ী (র)-এর মতে বর্তমান অবস্থায় তার উপর দায় আরোপ করা হবে। একই মত পার্থক্যপূর্ণ হবে। গোলাম ও বাচ্চার ক্ষেত্রে করয প্রদান ও ধারে প্রদানের বিষয়টি।

জামে ছাগীরের শব্দভাষ্যে মুহাম্মদ (র) বলেছেন ঃ صبى قد عقل অর্থাৎ এমন বাচ্চা, যার আকল বা কর্মের বোধ রয়েছে। আর তিনি জামে কাবীর কিতাবে মাসআলাটির কাঠামো তৈরী করেছেন। বার বছর বয়সের বালক সম্পর্কে এটা প্রমাণ করে যে, আকল ও বোধহীন বাচ্চার ক্ষেত্রে সর্বসম্মতভাবে তার উপর দায় আরোপ করা হবে।

কেননা, আমানত প্রদানকারীর পক্ষ হতে দায়িত্ব প্রদান গ্রহণ যোগ্য নয়, কিন্তু উক্ত বাচ্চার নিজস্ব কর্ম গ্রহণযোগ্য।

ইমাম আবু ইউসুফ ও শাফেয়ীর (র) যুক্তি এই যে, বাচ্চা এমন মাল নষ্ট করেছে, যা মূল্যসম্পন্ন ও নিরপত্তাসম্মপন্ন এবং মালিকের হক রূপে স্বীকৃত। সুতরাং তার উপর দায় বর্তাবে। গচ্ছিত বস্তু গোলাম হওয়ার ক্ষেত্রে যেমন হয়ে থাকে আর আমানত গ্রহণকারী বাচ্চার হাতে থাকা অবস্থায় ঐ বাচ্চা ছাড়া অন্য কেউ নষ্ট করে ফেলার ক্ষেত্রে যেমন হয়ে থাকে।

ইমাম আবু হানীফা ও মুহাম্মদ (র)এর যুক্তি এই যে, সে এমন মাল নষ্ট করেছে, যা (বয়স্ক দ্বারা) রক্ষিত ও নিরাপদ নয়। সুতরাং দায় সাব্যস্ত হবে না। যেমন মালিকের অনুমতি ও সম্মতিতে নষ্ট করলে দায় বর্তাবে না।

আর এটা (অর্থাৎ অরক্ষিত হওয়া) এজন্য যে, হিফাজত ও সুরক্ষা সাব্যস্ত হয় মালিকের হক হিসাবে। অথচ সে নিজের বিপক্ষে সুরক্ষা বিলুপ্ত করেছে। কারণ মালকে এমন হাতের নিয়ন্ত্রণে রেখেছে, যা (গচ্ছিত রাখা থেকে) নিষেধকৃত। সুতরাং সে (নিজের দোষে) সুবিবেচনা ও সুদৃষ্টি লাভের অধিকারী থাকবে না। তবে যদি হিফাজতের ক্ষেত্রে সে অন্যকে নিজের স্থলবর্তী করতো তাহলে সুবিবেচনা লাভ করতো। অথচ এখানে স্থলবর্তীকরণ নেই। কেননা, বাচ্চার উপর তার কোন কর্তৃত্ব নেই এবং বাচ্চারও নিজের উপর কোন কর্তৃত্ব নেই।

প্রাপ্ত বয়স্ক নিজের ব্যবসার অনুমতি প্রাপ্ত গোলামের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, তাদের নিজদের উপর নিজেদের কর্তৃত্ব রয়েছে। তদ্রূপ গাচ্ছিত বস্তু গোলাম হলেও বিষয়টি ভিন্ন হবে।

কেননা, তার হিফাজত ও সুরক্ষা তার নিজস্ব হক রূপেই সাব্যস্ত, (এই হিসাবে নয় যে মালিক তাকে রক্ষা করে।) কেননা নিজের জানের ক্ষেত্রে সে মূল স্বাধীনতার উপর বহাল রয়েছে।

তদ্রূপ বাচ্চার হাতে থাকা অবস্থায় বাচ্চা ছাড়া অন্য কেউ যদি তা নষ্ট করে, তাহলেও বিষয়টি ভিন্ন হবে। কেননা, অন্যকে বাদ দিয়ে ঐ বাচ্চার দিকে সম্বন্ধিত করার কারণেই মালের সুরক্ষা বাতিল হয়ে গেছে। যার হাতে মাল রাখা হয়েছে।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন ঃ যদি এমনিতেই সে কোন মাল নষ্ট করে, তাহলে দায় বহন করবে।

অর্থাৎ তার কাছে গচ্ছিত রাখা ছাড়া। কেননা, বাচ্চাকে তার কর্মসমূহের ব্যাপারে দায়ী করা হয়। আর বান্দার হকের ক্ষেত্রে (দায়ী করার জন্য) ইচ্ছার সিদ্ধতার (অর্থাৎ গ্রহণ যোগ্য ইচ্ছার উপস্থিতি) বিবেচ্য নয়। সঠিক বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ্ অধিক অবগত।

কাসামাহ্ প্রসঙ্গ

ইমাম কুদূরী (র) বলেনঃ নিহত ব্যক্তিকে যদি কোন মহল্লায় পাওয়া যায়, তখন ঐ মহল্লাবাসীদের মধ্য থেকে পঞ্চাশ জনকে এই মর্মে কসম করানো হবে যে, আল্লাহ্র কসম, আমরা তাকে হত্যা করিনি এবং তার কোন হত্যাকারীর কথা আমরা জানিনা। ঐ পঞ্চাশ জনকে নিহতের অভিভাবক নির্বাচন করবে। (এটাকেই কাসামাহ্ বলে।)

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন ঃ (বাদীর দাবীর সত্যতা সম্পর্কে ধারণা হওয়ার মত) কোন আলামত যদি সেখানে থাকে, তাহলে নিহতের অভিভাবকদেরকে পঞ্চাশটি কসম করানো হবে। এরপর বিবাদীর উপর তাদের অনুকূলে দিয়তের ফায়সালা করা হবে। (তার বিরুদ্ধে) ইচ্ছাকৃত হত্যার দাবী করা হোক কিংবা অনিচ্ছাকৃত হত্যার।

ইমাম মালিক (র) বলেন ঃ ইচ্ছাকৃত হত্যার দাবী হলে কিসাসের ফায়সালা করা হবে। আর এটা ইমাম শাফেয়ী (র)-এর দুটি মতের একটি।

আর তাদের উভয়ের মতে "لَوْثٌ" মানে এই যে, নির্দিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে হত্যার কোন আলামত বিদ্যমান থাকা। (যেমন গায়ে রক্ত লেগে থাক, বা সঙ্গে রক্ত মাখা ছুরি থাকা।) কিংবা বাহ্যিক অবস্থা বাদীর অনুকূলে সাক্ষ্যরূপে থাকা। যেমন প্রকাশ্য প্রক্রতা। কিংবা ন্যায়বান কোন লোকের সাক্ষ্য থাকা কিংবা অ-ন্যায়বান এক জামাতের সাক্ষ্য থাকা যে, মহল্লা বাসীরাই তাকে হত্যা করেছে।

আর যদি বাহ্যিক অবস্থা বাদীর অনুকূলে সাক্ষী না হয় সে অবস্থায় বাদীকে দিয়ে কসম শুরু করার ক্ষেত্রে তার মাযহাব আমাদের মাযহাবের অনুরূপ। (মহল্লার পঞ্চাশজন পূর্ণ না হলে)

তবে তিনি কসমের পুনরাবৃত্তির কথা বলেন না, বরং তা অভিভাবকের দিকে ফিরিয়ে দেন।

যাই হোক (আমাদের মাযহাব মতে) মহল্লাবাসীরা যখন কসম করবে, তখন তাদের উপর কোন দিয়ত বর্তাবে না।

বাহ্যিক অবস্থা যদি বাদীর (অর্থাৎ অভিভাবকের অনুকূলে সাক্ষী হয়, সেক্ষেত্রে) অভিভাবককে দিয়ে কসম শুরু করার নিহতের অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে সপক্ষে শাফেয়ী (র) এর প্রমাণ হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্য ঃ

فَيُقْسِمُ مِنْكُمْ خَمْسُونَ أَنَّهُمْ قَتَلُوهُ .

–তোমাদের মধ্য থেকে পঞ্চাশজন এই মর্মে কসম করবে যে, অবশ্যই তারা তাকে হত্যা করেছে।

তাছাড়া যুক্তিগত প্রমাণ এই যে, বাহ্যিক ও প্রকাশিত অবস্থা যার অনুকূলে সাক্ষ্য দেবে, তারই উপর কসম ওয়াজিব হবে।

একারণেই যার হস্ত নিয়ন্ত্রণ বিদ্যমান থাকে, তার উপর কসম ওয়াজিব হবে। সুতরাং প্রকাশিত অবস্থা যদি অভিভাবকের অনুকূলে সাক্ষী হয়, তাহলে তার ইয়ামীন বা কসম দ্বারাই শুরু করা হবে। আর ইয়ামীন বা কসমকে বাদীর দিকে ফেরানো হলো শাফেয়ী (র)-এর মূলনীতি। তবে এই ইয়ামীন এমন প্রমাণ,যাতে এক প্রকার সন্দেহ রয়েছে। আর কিসাস সন্দেহের সঙ্গে একত্র হয় না। পক্ষান্তরে সন্দেহপূর্ণ প্রমাণ দ্বারাও মাল ওয়াজিব হয়। একারণেই এখানে (কিসাসের পরিবর্তে) দিয়ত ওয়াজিব হয়েছে।

আমাদের প্রমাণ হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী ঃ

اَلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِىْ وَالْيَمِيْنُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ .

বাইয়েনাহ বা দলীল পেশ করার দায়িত্ব বাদীর উপর, আর কসম করা তার দায়িত্ব, যে অস্বীকার করবে।

আর সাঈদ ইবন মুসাইয়্যিব (রা) বর্ণনা করেছেন যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইহুদীদের দিয়ে কাসামাহ শুরু করেছিলেন এবং তাদের উপর দিয়ত ওয়াজিব করেছিলেন। কারণ তাদের মাঝে নিহত ব্যক্তিকে পাওয়া গিয়েছিল।

তা ছাড়া যুক্তিগত কারণ এই যে, ইয়ামীন হলো (প্রতিপক্ষের) হক রোধ করার জন্য ব্যবহৃত প্রমাণ। নিজের হক সাব্যস্ত করার প্রমাণ নয়। আর নিহতের অভিভাবকের প্রয়োজন নিজের হকদারি প্রমাণ করা। একরণেই বাদী তার ইয়ামীন দ্বারা তুচ্ছ মালের হকদার হয় না। সুতরাং আরো স্বাভাবিক কারণেই তা দ্বারা সম্মানযোগ্য জানের হকদার হতে পারবে না।

আর কুদূরী (র)-এর এই বক্তব্য যে, 'অভিভাবক তাদেরকে নির্বাচন করবে' এদিকে ইঙ্গিত করে যে, 'পঞ্চাশজন নির্ধারণের ইচ্ছাধিকার অভিভাবকের রয়েছে।' কেননা, কসম হলো তার প্রাপ্য হক। আর স্বভাবতই সে ঐ লোকদেরকে নির্বাচক করবে,যাদেরকে সে হত্যার ব্যাপারে অভিযুক্ত বা সন্দেহ করছে। কিংবা মহল্লাবাসীদের মাঝে যারা সৎ, তাদেরকে নির্বাচন করবে। কেননা, তাদের মিথ্যা কসম পরিহার করা হবে চূড়ান্ত পর্যায়ের, ফলে হত্যাকারী প্রকাশ পেয়ে যাবে। আর ইয়ামীন বা কসমের ফায়দা হলো অস্বীকার করা (দ্বারা দাবী করার সুযোগ হওয়া)। সুতরাং যদি তারা হত্যা না করে থাকে, আর হত্যাকারীর পরিচয় জেনে থাকে সে অবস্থায় অবগতি অর্জনের ক্ষেত্রে সৎলোকের কসম। অর্থাৎ লোকের কসমের চেয়ে অনেক বেশী কার্যকর।

আর যদি অভিভাবকরা কোন অন্ধকে বা অপবাদের দণ্ডপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তিকে নির্বাচন করে, তাহলে জায়েয হবে। কেননা, এটা হলো ইয়ামীন বা কসম, সাক্ষ্য নয়।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ যখন তারা কসম করবে, তখন মহল্লাবাসীদের বিপক্ষে দিয়তের ফায়সালা করা হবে। আর অভিভাবককে কসম করানো হবে না।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন ঃ মহল্লাবাসীরা কসম করার পর তাদের উপর দিয়ত ওয়াজিব হবে না।

কেননা আবদুল্লাহ ইবন সহল (রা) বর্ণিত হাদীসে নবী (সা) বলেছেন ঃ

تُبَرِّئُكُمُ الْيَهُوْدُ بِأَيْمَانِهِمْ (البيهقى)

ইহুদীরা ইয়ামীন দ্বারা তোমাদের থেকে দায়মুক্ত হয়ে যাবে।

তাছাড়া যুক্তিগত কারণ এই যে, শরীয়তে ইয়ামীন বিবাদীকে দায় মুক্তকারীরূপে অনুমোদিত হয়েছে, দায় আরোপকারীরূপে নয়। যেমন অন্য সকল দাবী দাওয়ার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

আমাদের প্রমাণ এই যে, হযরত সহল (রা) বর্ণিত হাদীসে এবং যিয়াদ ইবন আবু মারয়াম (রা) বর্ণিত হাদীসে নবী (সা) দিয়ত ও কাসামাহ একত্র করেছেন। তদ্রূপ ওয়াছাআ গোত্রের বিপক্ষে ওমর (রা) কাসামাহ ও দিয়ত একত্র করেছেন। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী ঃ تُبَرِّئُكُمُ الْيَهُوْدُ। প্রযুক্ত হবে কিসাস ও আটকাদেশ থেকে অব্যাহতির উপর।

তদ্রূপ যুক্তিগত প্রমাণ এই যে, ইয়ামীন বা কসম ঐ হুকুম থেকে অব্যাহতি দান করে, যার জন্য ইয়ামীন বা কসম সাব্যস্ত হয়েছে। আর কাসামাহ এজন্য অনুমোদিত হয়নি যে, তারা অস্বীকার করার ছূরতে তাদের উপর দিয়ত ওয়াজিব হবে। বরং এজন্য অনুমোদিত হয়েছে যে, যাতে তাদের মিথ্যা কসম পরিহার দ্বারা এবং হত্যার স্বীকারোক্তি দ্বারা কিসাস সাব্যস্ত হয়। সুতরাং যখন তারা কসম করবে, তখন কিসাস থেকে দায়মুক্তি সাব্যস্ত হয়ে যাবে।

তারপর দিয়ত ওয়াজিব হবে বাহ্যত তাদের মধ্য হতে সংঘটিত হত্যার কারণে। কেননা নিহত ব্যক্তিকে তাদের মাঝে পাওয়া গেছে। তাদের কসম অস্বীকার করার মাধ্যমে নয়। কিংবা ওয়াজিব হবে তাদের হিফাজত ব্যবস্থার ত্রুটির কারণে, অনিচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে যেমন হয়ে থাকে।

আর মহল্লাবাসীদের মধ্য হতে কেউ যদি কসম করতে অস্বীকার করে, তাহলে কসম করা পর্যন্ত তাকে আটক রাখা হবে।

কেননা, এ বিষয়ে কসম স্বকীয়ভাবেই অন্যের হকরূপে অবশ্য পালনীয়। যাতে মানব রক্তের মর্যাদা প্রকাশ পায়। এ কারণেই কসম ও দিয়ত এখানে একত্র করা হয়েছে।

মালের ক্ষেত্রে কসমের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা (মালের ক্ষেত্রে) ইয়ামীন হচ্ছে নিহত ব্যক্তির মূল হকের বিনিময়। এ কারণেই দাবীকৃত মাল আদায় করলে কসম রহিত হয়ে যায়।

পক্ষান্তরে আমাদের আলোচ্য ক্ষেত্রে দিয়ত আদায় করলেও কসম রহিত হয় না।

এই বিধান প্রযোজ্য হবে তখন, যখন নিহতের অভিভাবক সমস্ত মহল্লাবাসীর বিরুদ্ধে হত্যার দাবী করে। তদ্রূপ যদি অনির্দিষ্টভাবে কতিপয়ের বিরুদ্ধে দাবী উত্থাপন করে। আর দাবী ইচ্ছাকৃত হত্যা সম্পর্কে হতে পারে কিংবা অনিচ্ছাকৃত হত্যা সম্পর্কেও হতে পারে।

কেননা (অনির্দিষ্টতার কারণে) তারা অন্যদের থেকে প্রথক হয় না। (সুতরাং কিসাস থেকে দায়মুক্ত হওয়ার জন্য তাদের কসম করতে হবে।)

আর যদি সুনির্দিষ্টভাবে কারো বিরুদ্ধে কসম করে যে, সে তার নিটাত্মীয়কে ইচ্ছাকৃতভাবে বা অনিচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করেছে; তাহলেও একই বিধান হবে। কুদূরী কিতাবে উল্লেখিত বিধানের নিঃশর্ততা এটাই প্রমাণ করে। মাবসূত কিতাবেও একই সিদ্ধান্ত উল্লেখিত হয়েছে। তবে দায়টি মূল কিতাবের বাইরে আবু ইউসুফ (র) হতে প্রাপ্ত বর্ণনায় রয়েছে যে, কিয়াসের দাবী মতে অবশিষ্ট মহল্লাবাসী থেকে কাসামাহ ও দিয়ত রহিত হয়ে যাবে। আর অভিভাবককে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, তোমার কি বাইয়েনাহ রয়েছে ? যদি বলে ঃ না, নেই, তাহলে বিবাদীকে নিহত ব্যক্তির হত্যা সম্পর্কে একটি মাত্র কসম করানো হবে।

অবশিষ্ট মহল্লাবাসী থেকে কাসামাহ ও দিয়ত রহিত হওয়ার কারণ এই যে, কিয়াস তা প্রত্যাখ্যান করে। কেননা তাদের পরিবর্তে অন্যদের থেকেও হত্যাকাণ্ড অস্তিত্ব লাভ করার সম্ভাবনা রয়েছে। আর কাসামাহ ও দিয়তের একত্রকরণ শুধু ঐ ক্ষেত্রে নাছ দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে, যখন নিহত ব্যক্তিকে এমন স্থানে পাওয়া যায়, যা বিবাদীদের দিকে সম্পৃক্ত, আর বাদী তাদের বিরুদ্ধে হত্যার দাবী করে। এছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে বিধান মূল কিয়াসের উপর বহাল থাকবে। আর বিষয়টি মহল্লাবাসীদের বাইরে অন্য কারো বিরুদ্ধে দাবী উত্থাপন করার মত হয়ে যাবে।

আর সূক্ষ্ম কিয়াস মতে মহল্লাবাসীদের উপর কাসামাহ ও দিয়ত ওয়াজিব হবে। কেননা 'নাছ' সমূহের নিঃশর্ততার এক দাবী এবং অন্য দাবীর মাঝে কোন পার্থক্য নেই। সুতরাং আমরা তা নাছ দ্বারাই ওয়াজিব করছি, কিয়াস দ্বারা নয়।

মহল্লাবাসীদের বাইরে অন্য কারো বিরুদ্ধে দাবী উত্থাপনের বিষয়টি ভিন্ন হবে। কেননা সে বিষয়ে নাছ নেই। সুতরাং তার ক্ষেত্রে যদি কাসামাহ ও দিয়ত সাব্যস্ত করতে যাই, তাহলে কিয়াসের মাধ্যমেই করতে হবে। আর কিয়াস দ্বারা তা করা নিষিদ্ধ।

আর মহল্লাবহির্ভূত ঐ লোকটির ক্ষেত্রে বিধান এই যে, যদি বাড়ীর কাছে বাইয়েনাহ থাকে, তাহলে তার দাবী প্রতিষ্ঠিত হবে; আর যদি না থাকে, তাহলে বাদী তাকে একটি সাধারণ কসম করাবে। কেননা এর সপক্ষে যেহেতু 'নাছ' নেই এবং কিয়াস মতে তা নিষিদ্ধ, সেহেতু এটা কাসামাহ হবে না।

এরপর যদি সে কসম করে, তাহলে দায়মুক্ত হয়ে যাবে। আর যদি কসম করতে অস্বীকার করে; আর দাবী মাল সংক্রান্ত হয়, তাহলে অস্বীকৃতি দ্বারা মাল সাব্যস্ত হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে কিসাস সংক্রান্ত দাবী হলে তা (ইমাম আবু হানীফা ও সাহেবায়নের মাঝে) মতপার্থক্যপূর্ণ হবে। যেমন কিতাবুদ্ দাওয়া বা দাবী উত্থাপন অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ যদি মহল্লাবাসীরা সংখ্যায় পঞ্চাশ পূর্ণ না হয়, তাহলে পঞ্চাশ পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত তাদের মাঝে কসমের পুনরাবৃত্তি করা হবে।

কেননা, বর্ণিত আছে যে, ওমর (রা) যখন কাসামাহ-এর ফায়সালা করলেন আর তার সামনে ঊনপঞ্চাশজন লোক হাজির হলো, তখন তিনি তাদের মধ্য হতে একজনকে দিয়ে কসমের পুনরাবৃত্তি করালেন, এভাবে পঞ্চাশ পূর্ণ হলো। তারপর তিনি দিয়তের ফায়সালা করলেন।

হযরত কাযী শুবায়হ ও হযরত ইবরাহীম নাখঈ (র) হতেও অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে।

তাছাড়া পঞ্চাশ সংখ্যা যেহেতু সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত, সেহেতু যথাসম্ভব তা পূর্ণ করা আবশ্যক হবে। এক্ষেত্রে (কসমের পুনরাবৃত্তির) অর্থবহতা জানতে চাওয়া ঠিক নয়। কেননা তা সুন্নাহ দ্বারা সাব্যস্ত। (সুতরাং তা মেনে নেয়াই হলো কর্তব্য)। তদুপরি তাতে রয়েছে মানব রক্তের মর্যাদা সাব্যস্ত করা।

আর যদি সংখ্যা পূর্ণ হয়ে য়াওয়ার পরেও অভিভাবক কারো ক্ষেত্রে কসমের পুনরাবৃত্তি করতে চায়, তাহলে তার সে অধিকার থাকবে না। কেননা পুনরাবৃত্তির আশ্রয় নেয়া হয় সংখ্যা পূরণের অনিবার্য প্রয়োজনে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ বাচ্চা ও বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তির উপর কাসামাহ নেই।

কেননা, তারা সিদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য বক্তব্যের যোগ্য নয়। আর ইয়ামীন হলো সিদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য বক্তব্য।

আর নারী ও গোলামের ক্ষেত্রেও কাসামাহ নাই।

কেননা, তারা (বিপদে, দুর্যোগে) সাহয্যকারীদের অন্তর্ভুক্ত নয়। আর কাসামাহ এর ইয়ামীন তাদেরই উপর আসে, যারা সাহায্যকারী হওয়ার যোগ্য।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ যদি এমন কোন মৃত ব্যক্তি পাওয়া যায়, যার দেহে হত্যার চিহ্ন নেই, তাহলে কাসামাহ ও দিয়ত কিছুই ওয়াজিব হবে না।

কেননা সে নিহত নয়, কারণ লোক প্রচলনে (এবং শরীয়তের পরিভাষায়) তাকেই নিহত বলা হয়, যার প্রাণ নির্গত হয়েছে এমন কারণে, যা কোন জীবিত ব্যক্তি সম্পন্ন করেছে। সুতরাং এ ব্যক্তি হলো স্বাভাবিক মৃত্যু বরণকারী। আর 'দায়' বান্দা সৃষ্ট কর্মের অনুবর্তী হয় এবং কাসামাহ হত্যা-সম্ভাবনার বিদ্যমানতার অনুবর্তী হয়। এরপর তাদের উপর কসম ওয়াজিব হয়। সুতরাং মৃত ব্যক্তির দেহে এমন কোন চিহ্ন থাকতে হবে, যা দ্বারা প্রমাণ করা যায় যে, সে নিহত। আর তা এভাবে যে, তার দেহে জখম পাওয়া গেল। তদ্রূপ যদি তার চোখ বা কান দিয়ে রক্ত বের হয়ে থাকে। কেননা সাধারণত

জীবিত ব্যক্তির পক্ষ হতে কৃত কোন কর্ম ছাড়া চোখ ও কান থেকে রক্ত বের হয় না। পক্ষান্তরে মুখ থেকে বা গুহ্যদ্বার থেকে বা পুরুষাঙ্গ থেকে রক্ত বের হওয়ার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা কারো কৃত কর্ম ছাড়াই এ সকল ছিদ্রপথে সাধারণত রক্ত বের হয়। শহীদ প্রসঙ্গে আমরা তা আলোচনা করেছি।

আর কোন মহল্লায় যদি নিহতের পূর্ণ দেহ বা অর্ধেকের বেশী পরিমাণ দেহ, মাথাসহ অর্ধেক দেহ পাওয়া যায়, তাহলে সেই মহল্লাবাসীদের উপর কাসামাহ ও দিয়ত আসবে।

আর যদি লম্বালম্বিতে ফাঁড়া অর্ধেক দেহ পাওয়া যায়, কিংবা মাথাসহ অর্ধেকের কম পাওয়া যায়, কিংবা তার হাত, পা ও মাথা পাওয়া যায়, তাহলে মহল্লাবাসীদের উপর কিছু বর্তাবে না।

কেননা, কাসামাহ-এর বিধান আমরা জেনেছি 'নাছ;' দ্বারা। আর 'নাছ' 'মৃতদেহ' সম্পর্কে। তবে 'মানব' এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন হেতু অধিকাংশকে পূর্ণ-এর বিধান প্রদান করা হয়েছে। কমের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, কোন অর্থেই তাপূর্ণ দেহ নয় এবং পূর্ণ দেহের সঙ্গে যুক্তও নয়। সুতরাং তাতে কাসামাহ বর্তাবে না।

তাছাড়া যদি আমরা অল্প-অংশকেও বিবেচনায় আনি, তাহলে দুটি কাসামাহ ও দুটি দিয়তের পুনরাবৃত্তি হতে পারে,অথচ পরপর দুটি কাসামাহ ও দিয়ত কার্যকর হতে পারে না।

এক্ষেত্রে মূলনীতি এই যে, প্রথমে প্রাপ্ত অংশটি যদি এমন অবস্থায় হয় যে, অবশিষ্ট পাওয়া গেলে (পরিমাণে তা অধিকাংশ হওয়ার কারণে), তাতে কাসামাহ কার্যকর হবে, তাহলে প্রথমে প্রাপ্তটিতে কাসামাহ বর্তাবে না। পক্ষান্তরে প্রথমে প্রাপ্তটি যদি এমন অবস্থায় হয় যে, অবশিষ্টটি পাওয়া গেলে (পরিমাণে কম হওয়ার কারণে) তাতে কাসামাহ কার্যকর হবে না, প্রথমে প্রাপ্তটিতে কাসামাহ ওয়াজিব হবে।

এর কারণ সেটাই, যা আমরা বলে এসেছি (যে, একই নিহত ব্যক্তির ক্ষেত্রে দু'টি কাসামাহ ও দিয়ত সাব্যস্ত করা জাইজ না। এই দেহাংশের ক্ষেত্রে জানাযা পড়ার মাসআলাটি আলোচ্য মূলনীতি থেকে নির্গত হবে। কেননা, জানাযার নামাযও পুনরাবৃত্ত হয় না।

আর যদি কোন মহল্লাবাসীদের মাঝে জানীন (বা ভ্রূণ), কিংবা অসম্পূর্ণ বাচ্চা পাওয়া যায়, যার দেহে জখমের কোন চিহ্ন নেই, তাহলে মহল্লাবাসীদের উপর কিছু বর্তাবে না।

কেননা, সেটা তো বিদ্যমান'বড়' মৃতদেহের চেয়ে বেশী নয়, (অথচ তাতেই তো কিছু বর্তায় না।)

আর যদি তাতে প্রহারের চিহ্ন থাকে, আর তা পূর্ণ আকৃতি প্রাপ্ত হয়, তাহলে মহল্লাবাসীদের উপর কাসামাহ ও দিয়ত ওয়াজিব হবে।

কেননা, এটাই স্বাভাবিক যে, পূর্ণ আকৃতির শিশু জীবিত অবস্থায় গর্ভচ্যুত হবে।

আর যদি অপূর্ণ আকৃতি সম্পন্ন হয়, তাহলে তাদের উপর কিছু আসবে না।

কেননা, তা মৃত অবস্থায় গর্ভচ্যূত হয়, জীবিত অবস্থায় নয়।

ইমাম কুদূরী (র) বলেনঃ আর নিহত ব্যক্তিকে যদি কোন বাহনের উপর পাওয়া যায়, যা কোন ব্যক্তি হাঁকিয়ে নিচ্ছে, তাহলে চালকের আকিলাহদের উপর দিয়ত বর্তাবে, মহল্লাবাসীদের উপর নয়।

কেননা, নিহত লাশ তার কবরে রয়েছে, সুতরাং এটা তার বাড়ীতে থাকার মত হলো। আর একই বিধান হবে, যদি বাহনকে অগ্রবর্তী থেকে টেনে নেয়, কিংবা যদি সে বাহনের আরোহী হয়।

আর যদি একই বাহনে এই তিনজন একত্রিত হয় তাহলে সবার উপর দিয়ত ওয়াজিব হবে।

কেননা নিহত লাশটি তাদের তিনজনেরই নিয়ন্ত্রণে রয়েছে; সুতরাং এটি তাদের সম্মিলিত বাড়ীতে থাকার মত হলো।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেনঃ যদি দুই লোকালয়ের মধ্যবর্তী পথ দিয়ে কোন বাহন অতিক্রম করে, আর তাতে কোন নিহত ব্যক্তির লাশ থাকে, তাহলে (দুইয়ের) নিকটস্থ লোকালয়ের উপর দিয়ত ওয়াজিব হবে।

কেননা, বর্ণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াল্লাম দুটি লোকালয়ের মধ্যবর্তী স্থানে পাওয়া একটি মৃতদেহের কাছে আসলেন এবং (উভয়ের দুরত্ব) মাপ করার আদেশ দিলেন।

আর হযরত ওমর (র) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে,(ইয়ামানে তার নিযুক্ত প্রশাখাকে) যখন তাঁর কাছে ওয়াদিআ ও আরহাব গোত্রদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে প্রাপ্ত এক নিহত ব্যক্তির বিধান জানতে চেয়ে পত্র লিখলেন, তখন তিনি দুই গ্রামের মধ্যবর্তী দূরত্ব পরিমাণ করার আদেশ দিলেন, ফলে নিহত ব্যক্তিটিকে ওয়াদিআ গোত্রের অধিকতর নিকটবর্তী পাওয়া গেলে, তখন তিনি তাদের বিপক্ষে কাসামাহ এর ফায়সালা দিলেন।

কারো কারো মতে এটা ঐ অবস্থার উপর প্রযোজ্য, যখন নিহত ব্যক্তি এমন স্থানে পড়ে থাকে, যেখান থেকে নিকটের লোকালয়ের বাসিন্দাদের কানে তার আওয়াজ পৌছার কথা। কেননা, এ অবস্থা হলে তার কাছে সাহায্যকারী দল পৌছতে পারে, সুতরাং (ধরা হবে যে,) তাদের পক্ষে থেকে সাহায্য করা সম্ভব ছিল, কিন্তু তারা ত্রুটি করেছে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেনঃ আর নিহত ব্যক্তিকে যদি কোন মানুষের বাড়ীতে পাওয়া যায়, তাহলে তার উপর কাসামাহ ওয়াজিব হবে।

কেননা, বাড়ী তার নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

আর দিয়ত ওয়াজিব হবে তার আকিলাহদের উপর।

কেননা, তাদের থেকেই তার সাহায্য লাভ হয় এবং তাদের দ্বারাই তার শক্তি অর্জিত হয়।

ইমাম কুদূরী (র) বলেনঃ ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে (ভাড়ায় কিংবা ধারে) বসবাসকারীরা বাড়ীর মালিকের সঙ্গে কাসামায় শরীক হবে না।

এটাই ইমাম মুহম্মদ (র) এরও অভিমত। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেনঃ তাদের দাবীর উপর কাসামাহ ওয়াজিব হবে।

কেননা, বাড়ীর ব্যবস্থাপনা পরিচালনায় কর্তৃত্ব যেমন মালিকানা বলে অর্জিত হয় তেমনি বসবাস সূত্রেও অর্জিত হয়। লক্ষ্যণীয় যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহুদীদের উপর কাসামাহ ও দিয়ত ধার্য করেছিলেন, অথচ তারা ছিলো খায়বারের বাসিন্দা।

তারফায়নের যুক্তি এই যে, কথিত স্থানটিতে সাহায্য করার বিষয়ে মালিকই বিশিষ্ট (ও সক্ষম), বাসিন্দারা নয়। কেননা, মালিকদের বসবাস (সাহায্যকে) অধিকতর অনিবার্যকারী এবং তাদের স্থিতি অধিকতর স্থায়ী, সুতরাং বাড়ীর ব্যবস্থাপনা কর্তৃত্ব তাদের দিকেই সম্পৃক্ত হবে। সুতরাং ত্রুটিটা তাদের থেকেই হয়েছে বলে সাব্যস্ত হবে।

আর খায়রবাসীদের বিষয় এই যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে তাদের মালিকানার উপর স্থির রেখেছিলেন, এবং তাদের কাছ থেকে শুধু খিরাজ হিসাবে সম্পদ গ্রহণ করতেন।

ইমাম কুদূরী (র) বলেনঃ আর কাসামাহ বর্তাবে মূল 'দাগ-মালিকদের' উপর[১] পরবর্তীতে দাগ মালিকদের থেকে ক্রয়কারীদের উপর নয়।

এটা ইমাম আবূ হানীফা ও মুহম্মদ (র) এর অভিমত। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন, সবাই শরীক থাকবে।

কেননা দায় সাব্যস্ত হয় শুধু এ কারণে যে, যাদের হিফাজত করার সামর্থ্য ও কর্তৃত্ব ছিল, তাদের পক্ষ হতে হিফাজত করা হয়নি। আর এদিক থেকেই তাদেরকে অপরাধকারী ও ত্রুটিকারী সাব্যস্ত করা হবে। আর রক্ষা করার কর্তৃত্ব সাব্যস্ত হয় মালিক হওয়ার হিসাবে আর এ বিষয়ে মূল-দাগ-মালিক ও পরবর্তী ক্রেতা সমান।

তারফায়নের যুক্তি এই যে, মূলদাগ-মালিকই সংশ্লিষ্ট স্থানটিতে সাহায্য করার ব্যাপারে বিশিষ্ট ব্যক্তি। এটাই প্রচলিত অবস্থা। তাছাড়া 'দাগ-মালিক' হলো মূল বাসিন্দা, পক্ষান্তরে ক্রেতা হলো অনুপ্রবেশকারী। আর ব্যবস্থাপনায় কর্তৃত্ব মূল বাসিন্দাদের হাতেই থাকে।

কারে কারো মতে ইমাম আবু হানীফা (র) কুফাতে যে রীতি প্রত্যক্ষ করেছেন সেটার উপর তাঁর সিদ্ধান্তের ভিত্তি করেছেন।

---

১. أهل الخطة শব্দটির অর্থ হলো দাগ মালিক, অর্থাৎ ইসলামী বিজয়ের পর ভূমি বন্টনের সময় যাদেরকে মালিকানা প্রদান করা হয়েছে এবং দাগ টেনে সীমানা নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে, তারাই হলো 'দাগ মালিক' এবং আদি বাসিন্দা।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ দাগ মালিকদের একজনও যদি বাকি থাকে, তাহলে একই বিধান হবে।

কারণ সেটাই যা আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি।

আর যদি তাদের একজনও বাকী না থাকে, যেমন সবাই বিক্রি করে চলে গিয়েছে, তাহলে কাসামাহ ক্রেতা বাসিন্দাদের উপর বর্তাবে।

কেননা, কর্তৃত্ব তাদের দিকে হস্তান্তরিত হয়েছে। কিংবা তা তাদের জন্য নিরংকুশ হয়েগেছে। কারণ যারা তাদের থেকে অগ্রবর্তিতা দাবী করবে, কিংবা তাদের সাথে প্রতিদ্বন্দিতা করবে, তারা চলে গেছে।

আর কোন বাড়ীতে যদি কোন নিহত ব্যক্তিকে পাওয়া যায়, তাহলে বাড়ীর মালিক এবং তার গোষ্ঠির (অর্থাৎ আকিলাহদের) উপর কাসামাহ বর্তাবে। আকিলাহগণ যদি উপস্থিত থেকে থাকে, তাহলে তারাও কাসামার অন্তর্ভুক্ত হবে। পক্ষান্তরে আকিলাহগণ অনুপস্থিত থেকে থাকলে বাড়ীর মালিকের উপর কাসামাহ বর্তাবে এবং (পঞ্চাশ সংখ্যা পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত) কসম তার উপর পুনরাবৃত্ত হতে থাকবে।

এটা ইমাম আবু হানীফা ও মুহাম্মদ (র)-এর অভিমত। আর ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন ঃ আকিলাহদের উপর কাসামাহ নেই। কেননা, বাড়ীর মালিক বাড়ীর বিষয়ে অন্যদের চেয়ে অধিকতর বিশিষ্ট। সুতরাং কাসামাহর ক্ষেত্রে অন্য কেউ তার সঙ্গে শরীক হবে না। যেমন মহল্লাবাসীদের কাসামাহর ক্ষেত্রে তাদের আকিলাহগণ তাদের সঙ্গে শরীক হয় না।

তারফায়নের যুক্তি এই যে, যারা উপস্থিত রয়েছে, তাদের মালিকের উপর তা অপরিহার্য ছিল। সুতরাং কাসামাহর ক্ষেত্রে তারা তার সঙ্গে শরীক হবে।

আর যদি নিহত ব্যক্তিকে কোন এজমালি বাড়ীতে পাওয়া যায়,যার অর্ধেক একজনের, দশমাংশ একজনের আর অবশিষ্টাংশ অন্য জনের,তাহলে মাথা গুণতি হিসাবে কাসামাহ ও দিয়ত ওয়াজিব হবে।

কেননা, ব্যবস্থাপনার কর্তৃত্ব বিষয়ে অল্প অংশের মালিক, বেশী অংশের মালিকের প্রতিদ্বন্দী রূপে গণ্য হয়। সুতরাং হিফাজতের ব্যাপারে এবং ত্রুটির ব্যাপারে সবাই সমান হবে।

অতএব, (যা সাব্যস্ত হবে) তা মাথাগুণতি হিসাবেই সাব্যস্ত হবে। শোফার ক্ষেত্রে যেমন হয়ে থাকে।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন ঃ কেউ যদি একটি বাড়ী খরিদ করে, আর দখল গ্রহণের পূর্বেই সেখানে কোন নিহত ব্যক্তিকে পাওয়া যায়, তাহলে দিয়ত বিক্রেতার আকিলাহদের উপর বর্তাবে। আর যদি বিক্রয় চুক্তিতে দুপক্ষের কোন এক পক্ষের অনুকূলে ইচ্ছাধিকারের শর্ত থাকে, তাহলে দিয়ত ঐ ব্যক্তির

আকিলাহদের উপর বর্তাবে, যার দখলে বাড়ীটি রয়েছে। এটা ইমাম আবু হানীফা(র)-এর অভিমত।

আর ছাহেবায়ন বলেনঃ যদি বিক্রয় চুক্তিতে কোন পক্ষের জন্য ইচ্ছাধিকার না থাকে, তাহলে দিয়ত ক্রেতার আকিলাহদের উপর বর্তাবে। আর যদি বিক্রয় চুক্তিতে ইচ্ছাধিকারের শর্ত থাকে, তাহলে শেষপর্যন্ত বাড়ীটি যার হবে, দিয়ত তার আকিলাহদের উপর বর্তাবে।

কেননা,তাকে হত্যাকারীর স্থলবর্তী করা হয়েছে শুধু হিফাজতের ব্যাপারে ত্রুটির কারণে। আর হিফাজত তারই উপর ওয়াজিব হবে, যার অনুকূলে হিফাজতের কর্তৃত্ব সাব্যস্ত হবে। আর কর্তৃত্ব অর্জিত হয় মালিকানা দ্বারা। একারণেই তো বাড়ীর মালিকের আকিলাহদের উপর দিয়ত বর্তাবে, বাড়ীটি আমানত রূপে যার হাতে আছে, তার অকিলাহদের উপর আসেনা। আর (শর্তমুক্ত) চূড়ান্ত বিক্রয়ের ক্ষেত্রে দখল গ্রহণের পূর্বেই ক্রেতার অনুকূলে মালিকানা সাব্যস্ত হয়।

আর ইচ্ছাধিকারের শর্তসম্পন্ন চুক্তিতে মালিকানার স্থিতির বিষয়টি বিবেচনা করা হবে। ছদাকাতুল ফিতরের ক্ষেত্রে যেমন হয়ে থাকে।[১]

ইমাম আবু হানীফা (র)-এর যুক্তি এই যে, হিফাজতের সক্ষমতা সাব্যস্ত হয় হস্ত নিয়ন্ত্রণ দ্বারা,[২] শুধু মালিকানা দ্বারা নয়। লক্ষ্যণীয় যে, মালিকানা ছাড়াও দখলে থাকা জিনিস মানুষ হিফাজত করতে সক্ষম হয় না।

আর শর্তমুক্ত ছাড়াও বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রেতার দখল গ্রহণের পূর্বে হস্তনিয়ন্ত্রণ বিক্রেতার থাকে। তদ্রূপ দুপক্ষের এক পক্ষের জন্য ইখতিয়ারের শর্ত সম্পন্ন বিক্রয়ের ক্ষেত্রে দখল গ্রহণের পূর্বে (বিক্রেতার হস্ত বহাল থাকে।) কেননা, এটা তো চূড়ান্ত বিক্রয়ের চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের।

আর বিক্রীত দ্রব্য যদি ক্রেতার হাতে থাকে এবং তার জন্য সাব্যস্ত হয়ে থাকে, তাহলে এটাতে হস্তক্ষেপ করার ক্ষেত্রে সে-ই হল সবচেয়ে বিশিষ্ট ব্যক্তি।

আর যদি ইখতিয়ার বিক্রেতার অনুকূলে সাব্যস্ত হয়ে থাকে, তাহলে বিক্রীত দ্রব্য ক্রেতার বাজার মূল্য দ্বারা দায়বদ্ধ অবস্থায় থাকে। গছবকৃত বস্তুর ক্ষেত্রে যেমন হয়ে থাকে। সুতরাং তার হস্ত নিয়ন্ত্রণ দ্বারাই তো সে বস্তুটি হিফাজত করতে সক্ষম হয়।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন ঃ কারো হস্তনিয়ন্ত্রণে (দখলে) যদি কোন বাড়ী থাকে, আর তাতে কোন নিহত ব্যক্তিকে পাওয়া যায়, তাহলে আকিলাহগণ তার দিয়তের দায় বহন করবে না; যতক্ষণ না সাক্ষীরা সাক্ষ্য দেয় যে, বাড়ীটি যার দখলে রয়েছে সে-ই তার মালিক।

---

১. অর্থাৎ ইচ্ছাধিকার শর্তসহ যদি গোলাম বিক্রি করে, তাহলে গোলামের মালিকানা যার অনুকূলে স্থিতি লাভ করবে, তারই উপর গোলামের ছাদাকাতুল ফিতর আদায় করা ওয়াজিব হবে।

২. অর্থাৎ আমানত গ্রহণকারীর মত নিছক হস্তনিয়ন্ত্রণ নয়, বরং মালিকানা সূত্রে সম্বন্ধিত হস্ত নিয়ন্ত্রণ; পক্ষান্তরে আমানত গ্রহণকারীর হস্ত নিয়ন্ত্রণ স্থলবর্তিতা ভিত্তিক, সম্বন্ধ ভিত্তিক নয়।

কেননা, বাড়ীর পক্ষ হতে আকিলাহদের দায় গ্রহণের জন্য তার মালিকানা থাকা অপরিহার্য। আর হস্তনিয়ন্ত্রণ বা দখল যদিও মালিকানার প্রমাণ, কিন্তু তা সম্ভাবনামূলক, সুতরাং আকিলাহদের উপর দিয়ত সাব্যস্ত করার জন্য তা যথেষ্ট নয়।

যেমন মালিকানা বলে শোফাসম্পন্ন বাড়ীতে শোফার হক লাভ করার জন্য নিছক হস্ত নিয়ন্ত্রণ (মালিকানার প্রমাণ রূপে) যথেষ্ট নয়। সুতরাং মালিকানার অনুকূলে সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপন করা অপরিহার্য।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ কোন জাহাজে যদি কোন নিহত ব্যক্তিকে পাওয়া যায়, তাহলে ঐ জাহাজে যত যাত্রী ও মাল্লাহ্ (চালক, কর্মচারী ও অন্যান্যরা) রয়েছে, তাদের দাবীর উপর কাসামাহ ওয়াজিব হবে।

কেননা, জাহাজ তাদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। আর কুদূরী কিতাবে ব্যবহৃত مَنْ فِيْهَا অর্থাৎ তাতে যারা রয়েছে, শব্দটি জাহাজের সঙ্গে সংলিষ্ট মালিক, অমালিক সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করে। সুতরাং ঐ জাহাজে যারা সংশ্লিষ্ট রয়েছে, তাদের সবার উপর এবং হাল-ধারীদের উপর এবং যারা বিভিন্নভাবে জাহাজ চালনার সাহায্য করে, তাদের সবার উপর কাসামাহ (ও দিয়ত) ওয়াজিব হবে। এক্ষেত্রে মালিক, অমালিক সবাই সমান। পশুতে টানা গাড়ীর ক্ষেত্রেও একই হুকুম।

আর এটা (অর্থাৎ মালিক, অমালিক সবাই সমান হওয়া) ইমাম আবু ইউসুফ (র) হতে যা বর্ণিত হয়েছে সে অনুযায়ী অতি স্পষ্ট। (কেননা, মহল্লায় প্রাপ্ত নিহতের ক্ষেত্রে মহল্লাহর মালিক ও বাসিন্দাকে তিনি সমান সাব্যস্ত করেছেন)।

আর তারফায়নের পক্ষ হতে পার্থক্যের কারণ এই যে, জাহাজ তো স্থানান্তরিত হতে থাকে, সুতরাং সেখানে হস্ত নিয়ন্ত্রণই বিবেচ্য হবে, মালিকানা নয়, বাহনের পশুর ক্ষেত্রে যেমন হয়ে থাকে- মহল্লা ও বাড়ীর বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, তা স্থানান্তরিত হয় না।(সুতরাং -এখানে দখল প্রধান নয়, মালিকানা প্রধান।)

ইমাম কুদুরী (র) বলেনঃ কোন মহল্লার মসজিদে যদি কোন নিহত ব্যক্তিকে পাওয়া যায়, তাহলে ঐ মহল্লাবাসীদের উপর কাসামাহ আসবে।

কেননা, ঐ মসজিদের ব্যবস্থাপনার কর্তৃত্ব তাদেরই হাতে অর্পিত।

আর যদি জামে মসজিদে কিংবা বড় রাস্তায় কোন নিহত ব্যক্তিকে পাওয়া যায় তাহলে তাতে কাসামাহ ওয়াজিব হবে না। আর দিয়ত ওয়াজিব হবে বাইতুল মালের উপর।

কেননা, জামে মসজিদ ও বড় রাস্তা হলো জন সাধারণের জন্য, তাদের মধ্য হতে কেউ একজন তার সাথে বিশিষ্ট নয়। তদ্রূপ পুলগুলিও সর্বসাধারণের জন্য। আর বাইতুল মালের সম্পদ হলো সাধারণ মুসলমানদের সম্পদ।

আর যদি নিহত ব্যক্তিকে বাজারে পাওয়া যায় এবং ঐ স্থানটি যদি কারো মালিকানাধীন হয়, তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে (ঐ স্থানের মালিক, অমালিক) সমস্ত বাসিন্দার উপর দিয়ত ওয়াজিব হবে। আর তারফায়নের মতে শুধু

মালিকের উপর দিয়ত বর্তাবে। আর যদি সংশ্লিষ্ট স্থানটি কারো মালিকানাধীন না হয়, যেমন বাজারে চলাচলের জন্য তৈরীকৃত পথ, তাহলে দিয়ত বাইতুল মালের উপর বর্তাবে।

কেননা, বাজার হলো সাধারণ মুসলমানদের ব্যবহারের জন্য।

আর যদি জেলখানায় পাওয়া যায়, তাহলে বাইতুল মালের উপর দিয়ত বর্তাবে।

ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মত অনুযায়ী দিয়ত ও কাসামাহ জেলে অবস্থানকারীদের উপর সাব্যস্ত হবে। কেননা, তারাই এলাকার বাসিন্দা এবং এর ব্যবস্থাপনার কর্তৃত্বও তাদের হাতে অর্পিত। আর বাহ্যিক অবস্থা এই যে, তাদের থেকেই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে।

আর তারফায়ন বলেন ঃ জেলের বাসিন্দা হলো শক্তি রহিত, পর্যুদস্ত। সুতরাং তারা একে অন্যকে সাহায্য করতে পারে না। কাজেই সাহায্য না করার কারণে যা ওয়াজিব হয় (অর্থাৎ দিয়ত ও কাসামাহ), সেটা তাদের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারে না।

তাছাড়া জেলখানা তৈরী করা হয়েছে মুসলমানদের হক উশুল করার জন্য, সুতরাং জেলখানার কল্যাণ ও উপকারিত যেমন তাদের দিকে তেমনি তার দায়ও তাদের উপর বর্তাবে। (সুতরাং সেখানে প্রাপ্ত নিহতের দিয়ত বাইতুল মালে থেকে যাবে।)

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ আর যদি কোন খোলা প্রান্তরে কোন নিহত ব্যক্তিকে পাওয়া যায়, যার আশপাশে কোন জনবসতি নেই, তাহলে তা মূল্যহীন যাবে।

আশ্রপাশ বা নিকটবর্তিতার ব্যাখ্যা সেটাই, যা আমরা উল্লেখ করেছি। অর্থাৎ যেখান থেকে লোকালয় আওয়াজ শোনা যাওয়া।

কেননা, নিহত ব্যক্তি যদি এ অবস্থায় (অর্থাৎ এতদূরে) থাকে,তাহলে অন্য কারো পক্ষ হতে তার কাছে সাহায্য পৌঁছতে পারবে না। সুতরাং কাউকে ত্রুটি করার দোষে দোষী বলা যাবে না।

আর এ বিধান হলো তখন, যখন উক্ত খোলা প্রান্তর কারো মালিকানাধীন না হবে। পক্ষান্তরে যদি তা কারো মালিকানাধীন হয়, তাহলে দিয়ত ও কাসামা মালিকের আকিলাহদের উপর বর্তাবে।

আর যদি দুই লোকালয়ের মধ্যবর্তী স্থানে নিহত ব্যক্তিকে পাওয়া যায়, তাহলে তাদের নিকটতর লোকালয়ের উপর (কাসামাহ ও দিয়ত) বর্তাবে।

আর এ বিষয়টি আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি।

আর যদি ফোরাত নদীর মধ্যস্থলে স্রোতে ভাসমান অবস্থায় পাওয়া যায়, তাহলে তা মূল্যহীন হবে।

কেননা, উক্তস্থান কারো হস্ত-নিয়ন্ত্রণে বা কারো মালিকানায় নেই।

আর যদি ফোরাতের পাড়ে আটকা পড়ে থাকে, তাহলে ঐ স্থান থেকে নিকটতম লোকালয়ের উপর (কাসামাহ ও দিয়ত) বর্তাবে।

তবে আওয়াজ শোনা যাওয়ার পূর্ববর্তী ব্যাখ্যা সহ।

কেননা, এ স্থানে সাহায্য করার বিষয়ে সেই জনপদটি বিশিষ্ট।

সুতরাং নিহত ব্যক্তিটি তীর ভূমিতে ফেলে রাখা নিহত ব্যক্তির মত হলো। আর তীর ভূমি তার নিকটবর্তী লোকদের হস্ত নিয়ন্ত্রণেই থাকে। লক্ষ্যণীয় যে, তারা এখান থেকে পানি নেয় এবং এখানেই তাদের পশুদের নিয়ে আসে।

পক্ষান্তরে ছোট খাল, যা দ্বারা শোফা-অধিকার লাভ করা হয়[১] তার বিধান ভিন্ন। কেননা, এ খাল শোফার অধিকারীদের সাথে খাস। কারণ তার উপর তাদের হস্ত নিয়ন্ত্রণ বিদ্যমান। সুতরাং কাসামাহ ও দিয়ত তাদেরই উপর বর্তাবে।

ইমাম কুদুরী (র) বলেন ঃ নিহতের অভিভাবক যদি মহল্লাবাসীদের মধ্য হতে নির্দিষ্ট কোন একজনের বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ উত্থাপন করে, তাহলে মহল্লাবাসীদের থেকে কাসামাহ রহিত হবে না।

আর বিষয়টি আমরা আলোচনা করেছি এবং এবিষয়ে কিয়াস ও সূক্ষ্ণ কিয়াস আলোচনা করেছি।

আর যদি মহল্লাবাসীদের বাইরে কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে, তাহলে মহল্লাবাসীদের থেকে কাসামাহ রহিত হয়ে যাবে।

পার্থক্যের কারণ ইতি পূর্বে আমরা বর্ণনা করেছি। আর তা এই যে, (শরীয়তের পক্ষ হতে মহল্লাবাসীদের উপর) কাসামাহ ওয়াজিব হওয়া প্রমাণ করে যে, হত্যাকারী তাদেরই মধ্য হতে বলে ধরে নেয়া হয়েছে। সুতরাং তাদের মধ্য হতে একজনকে নির্দিষ্ট করা কাসামাস-এর সূচনা অবস্থার বিরোধী নয়;[২]. কেননা, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। পক্ষান্তরে তাদের বাইরে থেকে কাউকে নির্দিষ্ট করলে বিষয়টি ভিন্ন হবে। আর সেটার অর্থ হবে এই ঘোষণা করা যে, হত্যাকারী তাদের মধ্য থেকে নয়। অথচ তারা দায় বহন করবে তখনই যখন হত্যাকারী তাদের মধ্য থেকে হবে, কারণ জালিমকে প্রতিরোধ না করায় গুণগতভাবে তারাও হত্যাকারী হয়ে গেছে।

তাছাড়া মহল্লাবাসীরা অভিভাবকের দাবী ও অভিযোগ উত্থাপন ছাড়া শুধু তাদের মাঝে নিহত ব্যক্তির উপস্থিতির কারণে বহন করবে না। সুতরাং যখন তাদের বাইরে অন্য কারো বিরুদ্ধে অভিয়োগ উত্থাপন করলো, তখন তাদের বিরুদ্ধে তার অভিযোগ উত্থাপন নিসিদ্ধ হয়ে গেল এবং শর্ত অবিদ্যমান হওয়ায় দায়ও রহিত হয়ে গেল।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেনঃ এক দল লোক যদি তালোয়ার নিয়ে মুখোমুখি হয়, এরপর একজন নিহত ব্যক্তিকে দেখতে পায়, তাহলে তার দায় মহল্লাবাসীদের উপর বর্তাবে।

---

১. অর্থাৎ শরীয়ত সূচনা অবস্থাতেই মহল্লাবাসীদের উপর কাসামাহ ওয়াজিব করেছে। সুতরাং তাদেরই মধ্য হতে একজনকে নির্দিষ্ট করা, শরীয়ত সূচনায় যা ওয়াজিব, তার বিরোধী হবে না।

২. অর্থাৎ শরীয়ত সূচনা অবস্থাতেই মহল্লাবাসীদের উপর কাসামাহ ওয়াজিব করেছে। সুতরাং তাদেরই মধ্য হতে একজনকে নির্দিষ্ট করা, শরীয়ত সূচনা যা ওয়াজিব করেছে, তার বিরোধী হবে না।

কেননা, নিহত ব্যক্তি তাদের মাঝে ছিল এবং তাকে রক্ষা করা তাদের দায়িত্ব ছিল।

তবে যদি অভিভাবকরা ঐ লোকদের বিরুদ্ধে কিংবা তাদের মধ্য হতে নির্দিষ্ট একজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে, তখন মহল্লাবাসীদের উপর কোন দায় বর্তাবে না।

কেননা, এই দাবী কাসামাহ থেকে মহল্লাবাসীদের অব্যহতিকে অন্তর্ভুক্ত করেছে।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেনঃ ঐ লোকদের উপরও বর্তাবে না, যতক্ষণ না অভিভাবকরা সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করে।

কেননা, আমরা যে হাদীস বর্ণনা করেছি, তাতে নিছক দাবী দ্বারা হক সাব্যস্ত হয় না।

আর উপরোক্ত দাবী দ্বারা মহল্লাবাসীদের থেকে (কাসামাহ ও দিয়তের) হক রহিত হওয়ার কারণ এই যে, তার নিজের বক্তব্য-তার নিজের বিপক্ষে প্রমাণ রূপে গণ্য হবে।

আর যদি কোন মালিকানা বিহীন নির্জন প্রান্তরে স্থাপিত সেনা শিবিরে কোন নিহত ব্যক্তিকে পাওয়া যায়, যদি কোন তাবুতে বা শামিয়ানায় পাওয়া যায়, তাহলে তাতে যারা বাস করে, তাদের উপর দিয়ত ও কাসামাহ ওয়াজিব হবে। আর যদি শামিয়ানার বাইরে পাওয়া যায়, তাহলে নিকটতম তাঁবুর লোকদের উপর দিয়ত ও কাসামাহ ওয়াজিব হবে।

কেননা, (নিহতকে পাওয়ার স্থানটির) মালিকানা না থাকা অবস্থায় হস্ত নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি বিবেচনা করা হবে।

আর যদি বাহিনী লড়াইয়ে লিপ্ত হয়, আর তাদের মাঝে একজন নিহত ব্যক্তি পাওয়া যায়, তাহলে কাসামাহ ও দিয়ত কিছুই বর্তাবে না।

কেননা, বাহ্যিক অবস্থা এই যে, সে শত্রুর সাথে লড়াই না হয় (বরং তাঁবুতে বা তাঁবুর বাইরে পাওয়া যায়), তাহলে আমরা যা বর্ণনা করে এসেছি, সে অনুযায়ী বিধান হবে।

আর যদি শিবির স্থাপনের ভূমির কোন মালিক থাকে, তাহলে সেনা বাহিনীর লোকেরা অস্থায়ী বাসিন্দাদের মত হবে। সুতরাং ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে মালিকের উপর দায় সাব্যস্ত হবে। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র) ভিন্নমত পোষণ করেন এবং বিষয়টি আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ যাকে কসম করতে বলা হলো, সে যদি বলে যে, অমুক তাকে হত্যা করেছে,তাহলে (এতটুকু কথায় কসম রহিত হবে না, বরং) তাকে এই মর্মে কসম করানো হবে যে, আমি তাকে হত্যা করিনি এবং অমুক ব্যক্তি ছাড়া তার জন্য কোন হত্যাকারীর কথা জানি না।

কেননা, সে তার উক্ত কথা দ্বারা নিজের উপর থেকে বাদীর বিবাহের হক রহিত করতে চায়। সুতরাং তা গ্রহণ করা হবে না। বরং আমরা যেভাবে বলেছি, সেভাবে তাকে কসম করানো হবে। কারণ সে যখন একজনের বিপক্ষে হত্যার স্বীকারোক্তি করলো, তখন ঐ একজন কসম থেকে বাদ গেল। সুতরাং ঐ একজন ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে ইয়ামীন বা কসমের বিধান বহাল রয়ে গেলো। সুতরাং সে বিষয়ে তাকে কসম করানো হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ মহল্লাবাসীদের উপর থেকে দু'জন লোক যদি তাদের বাইরের কোন একজন লোকের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয় যে, সে হত্যা করেছে, তাহলে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না।

ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর অভিমত। ছাহেবায়ন বলেনঃ তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে।

কেননা, মহল্লাবাসীরা (অভিভাবকের) প্রতিপক্ষ হওয়ার সম্ভাবনার মুখে ছিল। কিন্তু অভিভাবকের পক্ষ হতে তাদের বাইরের লোকের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করায় সে সম্ভাবনা বাতিল হয়ে গেছে। সুতরাং (নিরপেক্ষ ব্যক্তি হিসাবে) তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ যোগ্য হবে। যেমন(এই ঘটনায়) বিবাদ ও মামলা পরিচালনার জন্য নিযুক্ত উকীলকে যদি বিবাহ ও মামলা শুরুর পূর্বে বরখাস্ত করা হয়,(তাহলে সে ঐ ঘটনার সাক্ষী হতে পারে।)

ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর যুক্তি এই যে, যেহেতু তাদের পক্ষ হতে ত্রুটি প্রকাশ পাওয়ার কারণে তাদেরকে (গুণগতভাবে) হত্যাকারীদের পর্যায়ে নামিয়ে আনার ফলে তারা প্রতিপক্ষ হয়েছে, সেহেতু তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না। যদিও তারা প্রতিপক্ষদের দল থেকে বের হয়েগেছে। যেমন অসী তার দায়িত্ব গ্রহণ করার পর(বাচ্চা প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার কারণে বা কাযীর বরখাস্ত করার কারণে)

অসী দায়িত্ব থেকে বের হয়ে গেলো, তারপর সাক্ষ্য প্রদান করলো,(এক্ষেত্রে তার সাক্ষ্য) গ্রহণ করা হয় না।। হিদায়া গ্রন্থকার বলেন ঃ এই দুইটি (সর্বসম্মত) মূলনীতির উপর এই শ্রেণীর বহু মাসআলা উদ্ভাসিত হয়।

আর নিহতের অভিভাবক যদি মহল্লাবাসীদের মধ্য হতে নির্দিষ্ট কোন একজনের বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ উত্থাপন করে, আর মহল্লাবাসীদের মধ্য হতে দু'জন সাক্ষী তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করে, তাহলে সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না।

কেননা, সাধারণভাবে সবার সঙ্গেই বিবাদ বহাল রয়েছে, যেমন আমরা বর্ণনা করে এসেছি। আর প্রত্যেক সাক্ষী (সাক্ষ্য প্রদাানের মাধ্যমে প্রকারান্তরে) তার নিজের উপর থেকে বিবাদ খন্ডন করতে যাচ্ছে। সুতরাং সে (তার উদ্দেশ্যের ব্যাপারে) অভিযুক্ত হবে।

আর ইমাম আবূ হানীফা (র) হতে বর্ণিত আছে যে, সাক্ষীদেরকে এই মর্মে কসম করানো হবে যে, আল্লাহর কসম! আমরা তাকে হত্যা করিনি। এর সঙ্গে অতিরিক্ত কিছু যোগ করবে না। কেননা, তারা আগেই খবর দিয়েছে যে, হত্যাকারীকে তারা চিনেছে।

কাউকে যদি কোন গোত্রে জখম করা হয়,এরপর তাকে নিজের খান্দানে স্থানান্তরিত করা হয়, আর ঐ জখমের কারণে সে মারা যায়, তাহলে যদি সে মৃত্যু পর্যন্ত শয্যাশায়ী থাকে, তবে ঐ গোত্রের উপর কাসামাহ ও দিয়ত ওয়াজিব হবে।

এটা ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর অভিমত। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেন ঃ কাসামাহ ও দিয়ত কিছুই বর্তাবে না।

কেননা, গোত্রে বা মহল্লায় যা ঘটেছে, সেটা হলো প্রাণহানির নীচের পর্যায়ের ঘটনা। আর তাতে কাসামাহ নেই। সুতরাং বিষয়টি শয্যাশায়ী না হওয়ার মত হলো।

ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর যুক্তি এই যে, জখমের সঙ্গে যদি মৃত্যু যুক্ত হয়, তাহলে সেটা হত্যায় রূপান্তরিত হয়। এ কারণেই তো কিসাস ওয়াজিব হয়। সুতরাং যদি সে ঐ আঘাতের কারণে মৃত্যু পর্যন্ত শয্যাশায়ী থাকে, তাহলে মৃত্যুকে জখমের দিকে সম্বন্ধিত করা হবে। আর যদি শয্যাশায়ী না থাকে, তাহলে মৃত্যুটি জখম ছাড়া অন্য কোন কারণে হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং সন্দেহের ভিত্তিতে কাসামাহ ও দিয়ত আবশ্যক হবে না।

একজন লোক যদি জখমী হয়, আর তার মুমূর্ষু অবস্থা হয়, আর কোন মানুষ তাকে বহন করে তার পরিবার পরিজনের কাছে নিয়ে আসে, এরপর একদিন বা দু'দিন থেকে মারা যায়, তাহলে ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর মতে যে তাকে তার পরিবার পরিজনের কাছে বহন করে এনেছে, সে দায় বহন করবে না। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতামতে কিয়াস অনুযায়ী তাকে দায় বহন করতে হবে।

কেননা, তার হস্তনিয়ন্ত্রণ মহল্লার স্থলবর্তী। সুতরাং তার হাতে জখম অবস্থায় তার বিদ্যমানতা, মহল্লায় তার বিদ্যমান থাকার অনুরূপ হবে। আর ইতিপূর্বে গোত্রে জখম হওয়া সংক্রান্ত মাসআলায় উভয় মতামতের যুক্তি আমরা উল্লেখ করেছি।

কোন মানুষকে যদি তার নিজের ঘরে নিহত অবস্থায় পাওয়া যায়, তাহলে তার দিয়ত তার আকিলাহদের উপরে বর্তাবে, যা তার ওয়ারিছরা পাবে। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর অভিমত। ইমাম আবূ ইউসুফ, মুহাম্মদ ও যুফার (র) বলেন ঃ তার ক্ষেত্রে কিছুই বর্তাবে না।

কেননা, জখম হওয়ার সময় বাড়ী তার হস্ত নিয়ন্ত্রণে (দখলে) ছিল। সুতরাং ধরে নেয়া হবে যে, সে নিজেই নিজেকে হত্যা করেছে। কাজেই তা মূল্যহীন যাবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর যুক্তি এই যে, কাসামাহ ওয়াজিব হয় (হত্যাকারী ছাড়া) হত্যাকান্ড প্রকাশ পাওয়ার ক্ষেত্রে। একারণেই হত্যাকান্ড প্রকাশ পাওয়ার আগে যেসব আকিলাহ মারা যায়, দিয়ত পরিশোধে তারা অন্তর্ভুক্ত থাকে না। আর হত্যাকান্ড প্রকাশ পাওয়ার সময় বাড়ী হচ্ছে ওয়ারিছদের। সুতরাং ওয়ারিছদের আকিলাহদের উপর তা ওয়াজিব হবে।

মুকাতাব গোলামকে তার বাড়ীতে নিহত অবস্থায় পাওয়ার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, তার হত্যাকাণ্ড প্রকাশ পাওয়ার সময় বাড়ী গুণগতভাবে তার মালিকানায় বহাল থাকে। সুতরাং যেন সে নিজেই নিজেকে হত্যা করলো। কাজেই তার রক্ত মূল্যহীন যাবে।

যদি দু'জন লোক এক বাড়ীতে থাকে, আর সেখানে তৃতীয় কেউ না থাকে, আর দু'জনের একজনকে জবাই করা অবস্থায় পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেনঃ অপরজন দিয়তের দায় বহন করবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন ঃ সে তার দায় বহন করবে না।

কেননা, এমন সম্ভাবনা আছে যে, সে নিজেই নিজেকে হত্যা করেছে অর্থাৎ আত্মহত্যা করেছে। আবার এমন সম্ভাবনাও আছে যে, অপরজন তাকে হত্যা করেছে। সুতরাং সন্দেহের ভিত্তিতে তার উপর দায় আরোপ করা যাবে না।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র)-এর যুক্তি এই যে, সাধারণত মানুষ আত্ম হত্যা করে না। সুতরাং এ ধারনা বাতিল হবে। কোন মহল্লায় কোন নিহত ব্যক্তিকে পাওয়া গেলে যেমন এই সম্ভাবনা গ্রহণ করা হয় না।

কোন স্ত্রীলোকের মালিকানাধীন লোকায়ে যদি কোন নিহত ব্যক্তিকে পাওয়া যায়, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র)-এর মতে কাসামাহ ঐ স্ত্রীলোকের উপর বর্তাবে। আর পঞ্চাশ সংখ্যা পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত তার উপর কসম পুনরাবৃত্ত হতে থাকবে। আর দিয়ত আসবে তার আকিলাহদের উপর, অর্থাৎ নসবের দিক থেকে তার নিকটমত গোত্রের বা গোষ্ঠীর উপর।

আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র) বলেনঃ কাসামাহও দিয়তের ন্যায় অ-অকিলাহদের উপর ওয়াজিব হবে।

কেননা, কাসামাহ ওয়াজিব হয় ঐ লোকদের উপর, যারা বিপদে দুর্যোগে সাহায্যকারী। আর স্ত্রীলোক সাহায্যকারীদের অন্তর্ভুক্ত নয়। সুতরাং সে বাচ্চার সদৃশ হলো।

তারফায়নের যুক্তি এই যে, কাসামাহ ওয়াজিব হয় তোহ্‌মত (বা অভিযোগ) নিরসনের জন্য। আর হত্যার তোহ্‌মত স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রেও সাব্যস্ত হয়।

পরবর্তী মাশায়েখে কিরাম বলেনঃ এই মাসআলায় দিয়তের দায় বহনের ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকটি আকিলাহদের অন্তর্ভুক্ত হবে। কেননা, তাকে আমরা হত্যাকারিণীরূপে গণ্য করেছি, আর হত্যাকারী আকিলাহদের সঙ্গে শরীক হয়ে থাকে।

কোন লোককে যদি গ্রামের পাশে একজন লোকের জমিতে নিহত অবস্থায় পাওয়া যায়, যে লোক ঐ গ্রামের বাসিন্দা নয়, তাহলে তা জমির মালিকের উপর বর্তাবে।

কেননা, সে নিজের জমিতে সাহায্য করার ব্যাপারে গ্রামবাসীদের চেয়ে বেশী হকদার।

كِتَابُ الْمَعَاقِلِ
অধ্যায় ঃ মা'আকিল

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْمَعَاقِلِ

অধ্যায় ঃ মা'আকিল বা দিয়ত

مَعَاقِلُ হচ্ছে مَعْقُلُ এর বহুবচন। এটা دِيَةٌ (দিয়ত) এর সমার্থক। (عَقْلُ এর অর্থ রোধ করা) دِيَةٌ (দিয়তকে مَعْقُلُ বলা হয় এজন্য যে, তা মানব রক্ত অযথা প্রবাহিত হওয়া থেকে রোধ করে।)

ইমাম কুদূরী (র) বলেনঃ প্রায় ইচ্ছাকৃত এবং অনিচ্ছাকৃত অপরাধে দিয়ত ওয়াজিব হয়। আর যেসকল দিয়ত স্বয়ং হত্যার কারণে ওয়াজিব হয়, সেটা আকিলাদের উপরে বর্তাবে।

আর عَاقِلَةٌ (আকিলাহ্) বলে তাদেরকে, যারা (হত্যাকারীর পক্ষ হতে) দিয়ত পরিশোধ করে,(এমন সম্পর্কের ভিত্তিতে, (যা বিপদে, দুর্যোগে সাহায্য করাকে অপরিহার্য করে।) দিয়ত প্রসঙ্গে আমরা আলোচনা করেছি। ;

দিয়তকে আকিলাহদের উপর ওয়াজিব করার দলীল হলো হামল ইবন মালিক (রা)-এর হাদীসে অপরাধীর অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী ঃ قُوْمُوْا فَدُوْهُ — অর্থ ঃ যাও, এবং তার দিয়ত পরিশোধ কর।

তাছাড়া যুক্তিগত কারণ এই যে, মানব প্রাণ হল সম্মানযোগ্য, তাকে মূল্যহীন করার অবকাশ নেই। অথচ অনিচ্ছাকৃত অপরাধী হচ্ছে মাযূর। তদ্রূপ যে প্রায় ইচ্ছাকৃত অপরাধ করেছে, সেও হত্যার মাধ্যমে অস্ত্রের দিক বিবেচন করে মা'যূর গণ্য হওয়ার যোগ্য। সুতরাং তার উপর শাস্তি ওয়াজিব করার কোন যুক্তি নেই। আবার বিরাট পরিমাণ অর্থ তার উপর ধার্য করার অর্থ হলো তাকে কোণঠাসা করা এবং নির্মূল করে দেয়া, ফলে তা শাস্তিতে রূপান্তরিত হবে। তাই(মা'যূর অপরাধীর জন্য) সহজ বিধান নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে আকিলাহদেরকে তার সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। আর আকিলাহদেরকে বিশেষভাবে যুক্ত করার কারণ এই যে, (এ ধরনের সীমালংঘন থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে) সে অবহেলা করেছে। নিজের মাঝে শক্তি অনুভব করার

কারণে। আর এই শক্তিবোধ (তার মাঝে এসেছে) তার সাহায্য কারীদের উপর ভরসা থেকে,আর তারাই হলো আকিলাহ। সুতরাং তার প্রতি সতর্ক প্রহরা না রাখার মাধ্যমে তারাই আসল ত্রুটিকারী হলো। তাই তাদেরকেই বিশেষভাবে এর সাথে যুক্ত করা হয়েছে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেনঃ হত্যাকারী যদি দীওয়ানভুক্ত হয় তাহলে দীওয়ানভুক্তরাই হবে তার আকিলাহ। তাদের প্রাপ্য ভাতা ও সম্মানি থেকে তিন বছরের মেয়াদে দিয়ত উশুল করা হবে।

দীওয়ান ভুক্ত অর্থ বিভিন্ন পতাকাধারীরা (অর্থাৎ সেনাবাহিনীর বিভিন্ন দল বা ইউনিট, যাদের নাম দলওয়ারি খাতায় দীওয়ানে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।[১] এটা হলো আমাদের মত।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেনঃ দিয়ত আসবে তার খান্দান ও গোত্রের উপর। কেননা, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এমনই বিধান ছিল। আর তাঁর পরে বিধান রহিত করার অবকাশ নেই। তাছাড়া এটা হলো দান। সুতরাং-এক্ষেত্রে আত্মীয় স্বজনরাই অধিকতর উপযোগী।

আমাদের প্রমাণ হলো হযরত ওমর (রা)-এর ফায়সালা। কেননা, যখন বিভিন্ন দীওয়ান তৈরী করেন, তখন দিয়তের দায় দীওয়ানভুক্তদের উপর নির্ধারণ করেন। আর তা ছাহাবা কিরামের উপস্থিতে বিনা আপত্তিতে সম্পন্ন হয়।

আর এটা রহিত করণ নয়, বরং গুণগতভাবে এটা হলো 'সুস্থিত করণ'।

কেননা, দিয়তের দায় ছিল (তার সঙ্গে) সাহায্য বন্ধনে আবদ্ধদরে উপর। আর (সে সঙ্গে) এই সাহায্য বন্ধন ছিল বিভিন্ন প্রকারের আত্মীয়তার বন্ধনের কারণে, মৈত্রী বন্ধনের কারণে, (মনিব-গোলামের মাঝে) সম্পর্কের কারণে এবং একত্রে ওঠাবসা-চলাফেরা ও বসবাসের সুবাদে দলভুক্ত বা গোত্রভুক্ত হওয়ার কারণে, যদিও আসলে তারা গোত্রভুক্ত নয়।[২]

ওমর (রা)-এর যুগে এই সাহায্য-বন্ধন হয়েছে দীওয়ানের ভিত্তিতে। অর্থাৎ সাহায্য বন্ধনের অন্তর্নিহিত গুণ বিবেচনা করে তিনি দীওয়ানভুক্তদের উপর দিয়তের দায় আরোপ করেন। (সুতরাং এক দীওয়ানভুক্তরা পরস্পরের আকিলাহ হবে।)

এ কারণেই মাশায়েখেকিরাম বলেছেন ঃ বর্তমানে যদি এমন জনগোষ্ঠী পাওয়া যায়, যাদের পারস্পরিক সাহায্য হলো পেশার ভিত্তিতে, তাহলে সমপেশার লোকেরাই তাদের আকিলাহ। আর যদি জোট ও মিত্র সম্পর্কের ভিত্তিতে পারস্পরিক রীতি প্রচলিত হয়, তাহলে জোটভুক্ত ও মিত্রভুক্তরা হবে তাদের আকিলাহ।

---

১. এই দলবদ্ধতার কারণে নিজেদের মাঝে সাহায্য করার একটা চেতনা থাকে। বর্তমানের বিভিন্ন পেশাজীবীদের ইউনিয়ন সম্পর্কে একই বিধান হবে। অর্থাৎ ইউনিয়ন ভুক্তরা আকিলাহ হবে।

২. যেমন ইবলিস বহুদিন ফিরেশতাদের মাঝে উঠাবসা ও থাকা চলার কারণে তাকে ফিরিশতাদের দলভুক্ত মনে করা হতো, অথচ সে ছিল ভিন্ন শ্রেণীর।

আর দিয়ত পরিশোধ একটি দান অবশ্যই, যেমন ইমাম শাফেয়ী (র) বলেছেনঃ তবে তা মানুষের মূল উপার্জনের উপর আরোপ করার চেয়ে তাদের দানমূলক উপরি আয়ের উপর আরোপ করাই অধিকতর সঙ্গত। আর সেটা হলো দীওয়ান থেকে নির্ধারিত ভাতা ও সম্মানি।

আর তিন বছর সময় নির্ধারণ নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা থেকে বর্ণিত হয়েছে এবং ওমর (রা) সম্পর্কেও শ্রুত হয়েছে।

তাছাড়া যুক্তিগত কারণ এই যে, মূল উপার্জনের পরিবর্তে দানমূলক আয় থেকে উশুল করার উদ্দেশ্য হলো সহজ করা। আর দীওয়ান থেকে ভাতা ও দান বছরে একবারই জারি করা হয়।

এখন যদি তিন দফার দান তিন বছরের বেশী সময়ে বা তিন বছরের কম সময়ে দীওয়ান থেকে জারী করা হয়, তাহলে তা থেকে সেই হারে নেয়া হবে।

কেননা, তাতে উদ্দেশ্য হাছিল হয়ে যাচ্ছে। (অর্থাৎ দিয়তকে তিনটি দানের মাঝে বণ্টিত করা)। ইমাম কুদুরী (র) নিঃশর্তভাবে তিন বছরের কথা উল্লেখ করেছেন। তার ব্যাখ্যা এই যে, আদালতের ফায়ছালার পর সামনের বছর গুলোতে যদি 'দান' পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে যদি ফায়ছালা জারী হওয়ার পূর্বে বিগত বছর গুলোর 'দান' দীওয়ানে জমা থেকে। এরপর ফায়ছালা জারী হওয়ার পর বিগত বছররের দানগুলো দীওয়ান থেকে বের হয়ে আসে, তাহলে তা থেকে দিয়তের কিস্তি উশুল করা হবে না। (কেননা, এগুলো আদালতের ফায়ছালা পরবর্তী বছরের দান নয়।)

দিয়তের কিস্তি পরিশোধ করা ওয়াজিব হবে আদালতের রায় দ্বারা। যেমন আমরা সামনে বর্ণনা করবো ইনশাআল্লাহ।

আর যদি হত্যাকারী (ও তার আকিলাহদের) তিনটি দান-ভাতা এক বছরেই বের হয়ে আসে, অর্থাৎ সামনের বছরের (অর্থাৎ আদালতের ফায়ছালার পরে।) তাহলে ঐ তিনটি দান থেকে সমগ্র দিয়ত উশুল করে নেয়া হবে। এর কারণ আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি।

আর সমগ্র দিয়ত যখন তিন বছরে আদায়যোগ্য হলো তখন দিয়তের প্রত্যেক তৃতীয়াংশ এক বছরে আদায়যোগ্য হবে।

আর যদি কার্যত: জানের দিয়তের এক তৃতীয়াংশ বা তার কম অবশ্য সাব্যস্ত হয়, তাহলে সেটা এক বছরেই আদায় করতে হবে। পক্ষান্তরে এক তৃতীয়াংশের অতিরিক্ত যা হবে, দুই তৃতীয়াংশ পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত সেটা দ্বিতীয় বছরে আদায়যোগ্য হবে। আর দুই তৃতীয়াংশের অতিরিক্ত যা হবে, দিয়ত পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত সেটা তৃতীয় বছরে আদায়যোগ্য।

আর আকিলাহদের উপর যে দিয়ত ওয়াজিব হবে, কিংবা মাল থেকে শুধু হত্যাকারীর উপর যে দিয়ত ওয়াজিব হবে,-যেমন বাপ তার সন্তানকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করলো, তাহলে সেটাও তার মাল থেকে তিন বছর মেয়াদে আদায়যোগ্য। ইমাম

শাফেয়ী (র) বলেনঃ হত্যাকারীর উপর তার নিজস্ব মাল থেকে যে দিয়ত আদায় করা ওয়াজিব হবে, সেটা নগদ আদায়যোগ্য। কেননা, আকিলাহদের বহন করার কারণে সহজ করার উদ্দেশ্যে মেয়াদ নির্ধারণ করা হয়েছিল। সুতরাং সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃত হত্যার বিষয়টিকে এর সঙ্গে যুক্ত করা যায় না।

আমাদের যুক্তি এই যে, (জানের বিপরীতে মাল ওয়াজিব করা) কিয়াস এটা গ্রহণ করে না। অথচ অনিচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে শরীয়ত তা নির্ধারণ করেছে। সুতরাং এই বিধান শরীয়তের নির্ধারিত স্থান ছাড়া অন্যত্র প্রয়োগ করা যাবে না।

(তবে পিতাপুত্রের মাসআলাটি অনিচ্ছাকৃত ভাবে করার অন্তর্ভুক্ত এই হিসাবে যে, উভয় ক্ষেত্রে সূচনাতেই দিয়ত ওয়াজিব হয়েছে।)

আর যদি দশজনে মিলে একজনকে ভুলক্রমে হত্যা করে, তাহলে প্রত্যেকের উপর দিয়তের দশমাংশ ওয়াজিব হবে তিন বছর মেয়াদে।

এ বিধান হলো অংশকে সমগ্রের উপর কিয়াস করে। কেননা, তা হলো জানের বিনিময়।

আর তিন বছরের মেয়াদ বিবেচনা করা হবে(আদালত কর্তৃক) দিয়তের ফায়ছালা জারী হওয়ার সময় থেকে, (হত্যার সময় থেকে নয়।)

কেননা, মূল বিধান ছিল সদৃশ জিনিস তথা জানের বদলে জান), কিন্তু আদালতের ফায়ছালা দ্বারা মূল্যের দিকে তার পরিবর্তন সম্পন্ন হয়েছে। সুতরাং দিয়ত পরিশোধ করা শুরু হবে আদালতের ফায়ছালার সময় থেকে। ধোঁকাগ্রস্ত ব্যক্তির সন্তানের ক্ষেত্রে যেমন। (অর্থাৎ সন্তান যদি আদালতের ফায়সালার আগে মারা যায়, তাহলে ধোঁকা গ্রস্ত ব্যক্তি কোন দায় বহন করবে না।)

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ কেউ যদি দীওয়ানভুক্ত না হয়, তাহলে তার আকিলাহ হবে তার গোত্রের বা গোষ্ঠীর লোকেরা।

কেননা, তাদের দ্বারাই সে সাহায্য লাভ করে থাকে। আর আকিলাহ সম্পর্কের ক্ষেত্রে সেটাই হলো বিবেচ্য।

ইমাম কুদূরী (র) বলেনঃ আর দিয়ত তাদের মাঝে বণ্টন করা হবে তিন বছরে। প্রতিবছর জনপ্রতি চার দিরহামের বেশী আরোপ করা হবে না। তবে তা থেকে কম করা যেতে পারে।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেনঃ ইমাম কুদূরী (র) তাঁর সংকলিত 'মোখতাছর'-এ এমনই উল্লেখ করেছেন; এটা এদিকে ইংগিত করে যে, সমগ্র দিয়ত থেকে চার দিরহামের বেশী হবে।[১] (কিন্তু তা ঠিক নয়)। কেননা, ইমাম মুহাম্মদ (র) স্পষ্ট বলেছেন যে,

১. যেহেতু এক বছরের পরিমাণ হলো দিয়তের তৃতীয়াংশ,সেহেতু প্রতি বছর দিয়তের তৃতীয়াংশ থেকে চার দিরহাম করে নেয়ার অর্থ হবে, সমগ্র দিয়ত থেকে বছর প্রতি বার দিরহাম করে নেয়া।

সমগ্র দিয়ত থেকে তিন বছরে জনপ্রতি তিন বা চার দিরহাম বা এক দিরহাম এবং এক দিরহামের তিনভাগের একভাগের বেশী নেয়া যাবে না, এটা বিশুদ্ধতম মত।

ইমাম কুদুরী (র) বলেনঃ যদি দিয়তের জন্য গোত্রের লোক সংখ্যা পর্যাপ্ত না হয়, তাহলে তাদের সঙ্গে নিকটতম গোত্রকে যোগ করা হবে।

এর অর্থ হলো- বংশ সূত্রে নিকটতম। এসবই করা হচ্ছে সহজ করার উদ্দেশ্যে। আর আছাবার বিন্যাস অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে নিকটতরকে যোগ করা হবে। যেমন প্রথমে ভাইদেরকে, তারপর তাদের পুত্রদেরকে, তারপর চাচাদেরকে, তারপর তাদের পুত্রদেরকে। আর হত্যাকারীর বাপ ও পুত্রদের বাপারে কেউ কেউ বলেনঃ নিকটত্মীয়তার কারণে তারাও অন্তর্ভুক্ত হবে। আর কারো কারো মতে, তারা অন্তর্ভুক্ত হবে না। কেননা, অন্যদেরকে যোগ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে অসুবিধা দূর করা, (এবং বোঝা হালকা করা।) যাতে জনপ্রতি তিন বা চার দিরহামের বেশী না পড়ে। আর (বোঝা হালকা করার) এই গুণ সাব্যস্ত হবে সংখ্যাধিক্যের ক্ষেত্রে। অথচ বাপ ও পুত্ররা তো (অন্যান্য আত্মীয় ও গোষ্ঠীর তুলনার সংখ্যায়·বেশী হবে না।

এই ভিত্তিতেই সৈন্যবাহিনীর বিভিন্ন পতাকাধারী (বা ইউনিট)-এর বিধান সাব্যস্ত হবে। অর্থাৎ এক পতাকাধারী লোকসংখ্যা যদি পর্যাপ্ত না হয়, তাহলে তাদের সঙ্গে নিকটতম পতাকাধারী লোকদেরকে যোগ করা হবে, যখন কোন দুর্যোগ দেখা দেয় তখন সাহায্য করার দিক দিকে যারা পর্যায়ক্রমে তাদের নিকটতর। আর নির্ধারণের বিষয়টা নেতার হাতে ছেড়ে দেয়া হবে। কেননা, এ বিষয়ে তিনিই অবগত।

এ সকল সিদ্ধান্ত হলো আমাদের মতে। আর ইমাম শাফেয়ী (র) এর মতে, জনপ্রতি অর্ধেক দীনার নির্ধারণ করা ওয়াজিব হবে, এবং (বাপ, পুত্র, ভাই ও অন্যান্য) সবার মাঝে সমান হারে নির্ধারণ করা হবে।

কেননা, এটা হলো বিনিময়হীন বাধ্যতামূলক দান। সুতরাং সেটাকে যাকাতের সাথে বিবেচনা করা হবে, আর অর্ধেক দীনারই হলো যাকাতের সর্বনিম্ন পরিমাণ। কিন্তু আমরা বলি মর্যাদার দিক থেকে দিয়ত যাকাতের চেয়ে নীচে। লক্ষ্যণীয় যে, দিয়ত মূল উপার্জন থেকে গ্রহণ করা হয় না, (বরং দীওয়ান থেকে প্রদত্ত সম্মান ও দান থেকে নেয়া হয়।) সুতরাং অতিরিক্ত হালকাকরণ নিশ্চিত করার জন্য যাকাতের পরিমাণ থেকে কম করা হবে।

আর যদি হত্যাকারী লোকটির আকিলাহরা (দরিদ্র) ভাতাধারী হয়[১], তাহলে প্রতি বছর দিয়তের এক তৃতীয়াংশ হারে তিন বছরের মেয়াদে তাদের ভাতা থেকে দিয়ত নির্ধারণ করা হবে।

কেননা, তাদের ক্ষেত্রে প্রদত্ত ভাতা (মুজাহিদের ক্ষেত্রে প্রদত্ত) সম্মানির স্থলবর্তী। কেননা, দুটোই বাইতুল মাল থেকে প্রদত্ত 'অনুগ্রহ।'

---

১. عَطَايَا বা সম্মানী হল মুজাহিদের জন্য দীওয়ান থেকে নির্ধারিত দান। আর رِزْق বা ভাতা দরিদ্রদের জন্য নির্ধারিত দান।

অত:পর দেখা হবে, যদি তাদের ভাতা প্রতিবছর বের হয়, তাহলে যখনই ভাতা বের হবে, তখনই তা থেকে (দিয়তের) এক তৃতীয়াংশ নেয়া হবে, সম্মানী ও দানের মত।

আর যদি প্রতি ছয় মাস অন্তর বের হয়, এবং আদালতের ফায়সালার পর তা বের হয়, তাহলে তা থেকে দিয়তের ষষ্ঠাংশ নেয়া হবে।

আর যদি প্রতিমাসে বের হয়, তাহলে প্রতিটি ভাতা থেকে (মাস) অনুপাতে দিয়তের হিসাবে নেয়া হবে যাতে প্রতিবছর উশুলকৃত অর্থ দিয়তের এক তৃতীয়াংশের পরিমাণ হয়।

আর যদি আদালতের ফায়সালার একদিন বা ততোধিক দিন পরে ভাতা বের হয়, তাহলে ঐ মাসের ভাতা (দিন অনুপাতে) মাসের হিসাবে নেয়া হবে।

আর যদি প্রতিমাসে তাদের একাধিক ভাতা ও সম্মানী বের হয়, তাহলে প্রতিটি সম্মানিতে দিয়ত ধার্য করা হবে। কিন্তু ভাতায় তা ধার্য করা হবে না। কেননা, সম্মানী হলো স্বচ্ছলতর বিষয়। কারণ সম্মানী পরিমাণে ভাতার চেয়ে বেশী হয়ে থাকে। কিংবা একারণে যে, ভাতা হলো সময়ের প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য। সুতরাং তা থেকে আদায় করা কঠিন হবে। পক্ষান্তরে সম্মানী দেয়া হয়ে (প্রয়োজনের বাইরে), যেন তারা ইমামকে সাহায্য করার জন্য দীওয়ানে অন্তর্ভুক্ত থাকে। কাজেই এ থেকে দিয়ত আদায় করা সহজ হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেনঃ হত্যাকারীকেও আকিরাহদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে। সুতরাং আদায়কৃত হিসসার ক্ষেত্রে সেও তাদের একজন হবে।

কেননা, সেই তো আসল হোতা, সুতরাং তাকে দায় থেকে বাইরে এবং অন্যদেরকে দায়ভূক্ত রাখার কোন অর্থ হয় না।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেনঃ হত্যাকারীর উপর দিয়তের কিছুই ওয়াজিব হবে না। তিনি হত্যাকারী থেকে রহিত করার ক্ষেত্রে অংশকে 'সমগ্র'-এর উপর কিয়াস করেন। (অর্থাৎ সমগ্র যেমন তার উপর আরোপ করা হয় না, তেমনি অংশও তার উপর আরোপ করা হবে না।) আর উভয়ের মাঝে যোগসূত্র হলো হত্যাকারীর মাযুর হওয়া।

আমরা বলি ঃ সমগ্র দিয়ত আরোপ করার অর্থ হলো তাকে নির্মূল করা, কিন্তু অংশ আরোপ করার বিষয়টি তা নয়। তাছাড়া ভুলকারী যদি অপারগ হয়, তাহলে ভুল থেকেও নির্দোষ যারা তারা অপারগ হওয়ার আরো বেশী হকদার। কেননা, আল্লাহ বলেছেনঃ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرٰى "এক মানুষ অন্য মানুষের গুনাহের বোঝা বহন করবে না।" (৩৫ঃ১৮)

নারী ও নাবালকের দিওয়ান থেকে (ভাতা বা সম্মানী) জারি থাকলেও তাদের উপর 'আকিলা-দায়' বর্তাবে না।

কেননা, হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেনঃ "আকিলাদের সাথে কোন বাচ্চা বা নারী দিয়তের দায় বহন করবে না।"

তাছাড়া যুক্তিগত কারণ এই যে, 'আকিলা-দায়' সাব্যস্ত হয় 'সাহায্য-বন্ধনে আবদ্ধ' দের উপর। কেননা, তারা তার প্রতি সতর্ক প্রহরা পরিত্যাগ করেছে। আর মানুষ সাধারণত: মেয়ে-ছেলে' দের দ্বারা শক্তি ও সহায়তা লাভ করে না। একারণেই সাহায সহায়তার স্থলবর্তীরূপে ধার্য 'জিযিয়া' তাদের উপর ধার্য করা হয় না।

এই ভিত্তিতে হত্যাকারী যদি বাচ্চা বা স্ত্রীলোক হয় , তাহলে (আকিলাদের সঙ্গে) তাদের উপর দিয়তের কোন অংশ বর্তাবে না।

পুরুষের বিষয়টি ভিন্ন। (দিয়ত পরিশোধের ক্ষেত্রে সে আকিলাদের অন্তর্ভুক্ত হবে।) কেননা, হত্যাকারীর উপর দিয়তের অংশ সাব্যস্ত হওয়ার সূত্র এই যে, সেও আকিলাহদের একজন। কেননা, সে নিজে নিজেকে সাহায্য করে থাকে। অথচ এই গুণগত দিকটি বাচ্চা ও স্ত্রীলোকের মাঝে পাওয়া যায় না। তবে তাদের দিওয়ান থেকে সম্মানী প্রদান সাহায্য গ্রহণের জন্য নয়, বরং সাহায্য করার জন্য; যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদের জন্য ধার্য সম্মানী। (রাদিয়াল্লাহু আনহুন্না।)

আর এক শহরের লোকেরা অন্য শহরের লোকদের আকিলাহ হবে না।

একথা দ্বারা তিনি বোঝাতে চাচ্ছেন যে, প্রত্যেক শহরবাসীর জন্য যদি পৃথক দীওয়ান থেকে থাকে, কেননা, দীওয়ান দ্বারা পারস্পরিক সহযোগীতা সম্ভব হবে দীওয়ান বিদ্যমান থাকা অবস্থায়, আর যদি বসবাসের নৈকট্য হিসাবে হয়, তাহলেও নিজের শহরের লোকেরা অন্য শহরের লোকদের তুলনায় তার অধিকতর নিকটবর্তী।

আর প্রত্যেক শহরের লোকেরা তাদের পার্শ্ববর্তী গ্রামের লোকদের আকিলাহ হবে।

কেননা, তারা শহরবাসীদের অনুবর্তী। কারণ যখন তারা কোন বিপদ-দুর্যোগে আক্রান্ত হয় তখন তারা শহরের লোকদের সাহায্য গ্রহণ করে (বিপরীতও হয়) সুতরাং নৈকট্য ও সাহায্য গ্রহণের দিক বিবেচনা করে শহরের লোকেরা তাদের আকিলাহ হবে।

কারো আবাসস্থল যদি বসরায় হয়, আর তার দীওয়ান কুফায় হয় তাহলে কুফাবাসীরা তার আকিলাহ হবে।

কেননা, সে তার দীওয়ানভুক্ত লোকদের থেকে সাহায্য গ্রহণ করে থাকে, প্রতিবেশীদের থেকে নয়। মোট কথা, দীওয়ান থেকে সাহায্য গ্রহণ (সাহায্যের অন্যান্য সূত্র থেকে) অধিক প্রবল। সুতরাং দীওয়ানের উপস্থিতিতে আত্মীয়তা, বংশ, ওয়ালা, বাস-নৈকট্য ও অন্যান্য সূত্র দ্বারা সাহায্য গ্রহণের বিধান বিবেচ্য হবে না।

আর দীওয়ানের পর বংশ সূত্রে সাহায্য গ্রহণই বিবেচিত হয়ে থাকে। যেমন আমরা পূর্বে বর্ণনা করে এসেছি। আর এই মূলনীতির উপর আকিলা সংক্রান্ত বহু মাসআলা আহরিত হয়।

শহরের কোন লোক যদি কোন অপরাধ করে, আর দীওয়ানে তার নামে কোন সম্মানী জারি না থাকে, এদিকে গ্রামের অধিবাসীরা বংশ সূত্রে তার অধিকতর

নিকটবর্তী হলেও তার বসবাসের স্থান হলো শহরে, এমতাবস্থায় ঐ শহরের দীওয়ানভুক্ত লোকেরা তার আকিলাহ হবে।

মুহম্মদ (র) তার ও দীওয়অনভুক্তদের মাঝে আত্মীয়তা সম্পর্ক বিদ্যমান থাকার শর্ত আরোপ করেন নি। কারো কারো মতে এটাই সহী সাব্যস্ত।

কেননা, যারা শহরবাসীদের পক্ষে দাঁড়ায় তাদের সাহায্য করে এবং তাদের উপর থেকে বিপদ দুর্যোগ দূর করে, তারা হলো দীওয়ানভুক্ত লোক। আর এ বিষয়ে তারা শুধু দীওয়ান থেকে সম্মানী লাভকারীদেরকে সাহায্য করে না, (বরং শহরের সবাইকে সাহায্য করে।)

কেউ কেউ 'দীওয়ানভুক্তরা তার আকিলাহ হবে' - কথার ব্যাপারে বলেছেনঃ সে যদি তাদের আত্মীয় হয়, আর কিতাবে সেদিকে ইশারাও রয়েছে। কেননা, তিনি বলেছেনঃ গ্রামবাসীরা (বংশসূত্রে) তার অধিকতর নিকটবর্তী।

এটা একারণে যে, তাদের উপর আকিলাহ-দায় আরোপিত হয় আত্মীয়তার সম্পর্কের বিধান হিসাবে। আর শহরবাসীরা বংশ সূত্রে তার অধিকতর নিকটবর্তী না হলেও স্থানগতভাবে তার অধিকতর নিকটবর্তী। সুতরাং সাহায্যের সক্ষমতা তাদেরই বেশী। এটা নিকটতর আত্মীয়-এর বিচ্ছিন্ন অনুপস্থিতি-এর নযীর হলো।

গ্রাম্য ব্যক্তি যদি শহরে সাময়িক অবস্থান করে, যার শহরে কোন বাসস্থান নেই, তবে শহরবাসীরা তার আকিলাহ হবে না।

কেননা, দীওয়ানের সম্মানী ভোগকারীরা তাদেরকে সাহায্য করতে বাধ্য নয়, যাদের শহরে বাসস্থান নেই। যেমন গ্রামের লোকেরা তাদের মাঝে সাময়িক অবস্থানকারী কোন শহরবাসীর আকিলা হবে না। কেননা, সে তো তাদের শক্তি লাভ করে না।

যিম্মীদের যদি পরিচিত কোন আকিলাহ গোষ্ঠী থাকে, যারা পরস্পরকে সাহায্য করে এবং দায় বহন করে; আর তাদের একজন যদি কাউকে হত্যা করে, তাহলে তার দিয়ত তার আকিলাহদের উপর বর্তাবে, মুসলমানের ক্ষেত্রে যেমন হয়ে থাকে।

কেননা, মুসামালা ও দায়-দায়িত্বের ক্ষেত্রে ইসলামের বিধান সমূহের বাধ্যবাধকতা তারা গ্রহণ করেছে। বিশেষতঃ যে সকল বিধান ক্ষতিরোধকারী, আর পরস্পর সাহায্য গ্রহণের প্রয়োজন তাদের ক্ষেত্রেও বিদ্যমান রয়েছে।

আর যদি তাদের পরিচিত 'আকিলাহ-ব্যবস্থা' না থাকে, তাহলে তার বিরুদ্ধে নিজস্ব মালে দিয়ত বর্তাবে, তিন বছরের মেয়াদে। যে দিন তার বিপক্ষে দিয়তের ফায়ছালা জারি করা হবে সেদিন থেকে হিসাব শুরু হবে।

যেমন মুসলমানের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। এর কারণ আমরা বর্ণনা করেছি যে, বিধানে মূলত হত্যাকারীর নিজের উপর সাব্যস্ত হয় মাত্র, যদি আকিলাহ থাকে। সুতরাং আকিলাহ পাওয়া না গেলে সেটা তার নিজের মালের উপরই বহাল থেকে যাবে।

যেমন দারুল হরবে গমনকারী দুই মুসলিম ব্যবসায়ীর একজন অপর জনকে হত্যা করে ফেললো। সে ক্ষেত্রে হত্যাকারীর নিজস্ব মাল থেকে দিয়ত পরিশোধের ফায়সালা দেয়া হবে। কেননা, দারুল ইসলামের লোকেরা তার আকিলাহ হবে না। আর এই হত্যাকান্ডের সক্ষমতা দারুল ইসলামের লোকদের সাহায্যের কারণে নয়।

আর কাফির, মুসলমানের এবং মুসলমান, কাফিরের আকিলাহ হতে পারে না। কেননা, তাদের মাঝে সাহায্য বিনিময়ের সম্পর্ক নেই। পক্ষান্তরে কাফিররা ধর্মবিভিন্নতা সত্ত্বেও পরস্পরের আকিলাহ হতে পারবে। কেননা, সমস্ত কুফুর অভিন্ন ধর্ম।

মাশায়েখে কিরাম বলেছেন ঃ এ বিধান হবে তখন, যখন দুই ধর্মের লোকদের মাঝে স্পষ্ট শত্রুতা না থাকে। পক্ষান্তরে যদি স্পষ্ট ও প্রবল শত্রুতা থাকে, যেমন ইহুদী ও নাছারাদের মাঝে, তাহলে তারা একে অপরের আকিলাহ হতে পারবে না। কেননা, তাদের মাঝে পারস্পরিক সাহায্য করার দিকটা অনুপস্থিত। ইমাম আবূ ইউসুফ (র) হতেও এরূপ বর্ণিত আছে।

আর যদি কুফাবাসী হয়, আর কুফার দীওয়ালে তার নামে সম্মানি জারি থাকে। (কিন্তু হত্যার পর) সে তার নাম বছরায় পরিবর্তন করে নেয়। এরপর কাযীর দরবারে হত্যা মামলা উত্থাপিত হয়, তখন কাযী তার বছরাবাসী আকিলাদের উপর দিয়তের ফায়ছালা করবেন।

আর ইমাম যুফার (র) বলেনঃ কুফাবাসী আকিলাহদের উপর দিয়তের ফায়ছালা করবেন। এটা ইমাম আবূ ইউসুফ(র) থেকেও প্রাপ্ত একটি বর্ণনা।

কেননা, কৃত অপরাধই হচ্ছে দিয়তে অবশ্য কারণ। আর সেটা সম্পন্ন হওয়ার সময় কুফাবাসীরাই ছিল তার আকিলাহ। সুতরাং বিষয়টি বিচারের পর বসরায় দীওয়ান পরিবর্তনের মত হলো। আমাদের যুক্তি এই যে, দিয়ত মূলত কাযীর ফায়ছালার সময় সাব্যস্ত হয়। এর কারণ আমরা উল্লেখ করেছি যে, 'সদৃশ'-ই হলো মূল সাব্যস্ত জিনিস। কিন্তু বিচারের মাধ্যমে সেটা মালের দিকে স্থানান্তরিত হয়। তদ্রূপ শুধু হত্যাকারীর উপর ওয়াজিব হওয়াই হলো মূল বিধান। তবে আকিলাহগণ তার পক্ষ হতে তা বহন করে। বিষয়টা যখন এমনই হলো তখন বিচারের সময় যারা আকিলাহ হবে, তারাই পক্ষ হতে দায় বহন করবে।

বিচারের পর দীওয়ান পরিবর্তনের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, আদালতের ফায়ছালার মাধ্যমে সাব্যস্ত বিধান স্থির হয়ে গেছে। সুতরাং-এরপর তা স্থানান্তরিত হতে পারে না। তবে হত্যাকারীর হিসসা বসরার দীওয়ান হতে তার প্রাপ্ত 'দান' থেকে উশুল করা হবে। কেননা, সেটা তো দান থেকে উশুল করা হয়। আর তার 'দান' ও সম্মানী হচ্ছে বসরায়।

পক্ষান্তরে আকিলাহদের উপর ফায়ছালা জারি হওয়ার পর যদি (মৃত্যুর কারণে বা অন্য কোন কারণে) আকিলাহদের সংখ্যা কমে যায়,তাহলে বিষয়টি ভিন্ন হবে। অর্থাৎ ফায়ছালা দ্বারা স্থির হয়ে যাওয়ার পরও, বংশ সূত্রে নিকটতম গোত্রকে তাদের সঙ্গে যুক্ত করা হবে। কেননা, স্থানান্তরিত করার অর্থ হলো প্রথম ফায়ছালা বাতিল করা। সুতরাং তা কোন অবস্থাতেই জাইয হবে না। পক্ষান্তরে যুক্ত করার অর্থ হলো তাদের উপর যে দায় আরোপের ফায়ছালা করা হয়েছে, সে দায় বহনকারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা। সুতরাং তাতে প্রথম ফায়ছালাটিকে আরো দৃঢ় করা হয়, বাতিল করা হয় না।

এই ভিত্তিতে, হত্যাকারীর বাসস্থান যদি কুফাতে হয় অথচ (কুফার দীওয়ানে) তার নামে কোন সম্মানী নেই, আর বাছরায় স্থায়ী আবাস গ্রহণের আগ পর্যন্ত তার উপর দিয়তের ফায়ছালা জারী করা হয়-এক্ষেত্রে আকিলাহ হিসাবে বছরাবাসীদের উপর দিয়তের ফায়ছালা করা হবে।

আর যদি কাযী কুফাবাসীদের উপর দিয়তের ফায়ছালা করে ফেলেন তাহলে তা তাদের থেকে (বছরাবাসীদের দিকে) স্থানান্তরিত হবে না।

একই ভাবে গ্রাম্য লোক যদি হত্যার পর বিচারের পূর্বে দীওয়ানভুক্ত হয়ে পড়ে, তাহলে দীওয়ানভুক্তদের উপর দিয়তের ফায়ছালা করা হবে। পক্ষান্তরে বিচারের পর দীওয়ানভুক্ত হলে তার গ্রামের আকিলাহদের উপর দিয়তের ফায়ছালা করা হবে। এবং তাদের থেকে স্থানান্তরিত করা হবে না।

পক্ষান্তরে যদি গ্রামের বাসিন্দা একজন লোকের বিপক্ষে তাদের নিজস্ব মালে তিন বছরের দিয়ত আদায়ের ফায়ছালা দেয়া হয়। এরপর দান ও সম্মানীর জন্য ইমাম বা শাসক তাদের নাম দীওয়ানভুক্ত করেন, তাহলে বিষয়টি ভিন্ন হবে, অর্থাৎ তখন তাদের প্রাপ্য সম্মানীতে দিয়ত ধার্য হবে, যদিও প্রথমে তাদের নিজস্ব মালে দিয়ত ধার্যের ফায়ছালা করা হয়েছিল।

কেননা, এতে প্রথম ফায়ছালা ভঙ্গ করার কোন ব্যাপার নেই। কেননা, ফায়ছালা করা হয়েছিল তাদের নিজস্ব মাল থেকে দিয়ত আদায় করার,(আকিলাহদের মাল থেকে নয়।) আর দীওয়ান থেকে প্রাপ্ত, সম্মানীও তো তাদের নিজস্ব মালে।

তবে আদায় করার দিক থেকে সবচেয়ে সহজ যেটা, সেটা থেকে দিয়ত আদায়ের ফায়ছালা প্রদান করা হবে। আর তারা দীওয়ানভুক্ত সম্মানী প্রাপ্ত হওয়ার পর সম্মানী থেকে দিয়ত আদায় করাই অধিকতর সহজ হবে। হাঁ, সে শ্রেণীর মাল দ্বারা দিয়ত আদায়ের ফায়ছালা করা হয়েছে, সম্মানীর মাল যদি সেই শ্রেণী থেকে ভিন্ন হয়। যেমন ফায়ছালা হলো উট দিয়ে দিয়ত আদায়ের, আর সম্মানী হচ্ছে দিরহাম, তখন আর কখনই দিয়ত দিরহামে পরিবর্তিত হবে না। কেননা, তাতে প্রথম ফায়ছালাটি বাতিল

করা হয়। তবে তা সম্মানীর মাল থেকে আদায় করা হবে, কেননা, এটা তার জন্য সহজতর।

ইমাম কুদূরী (র) বলেনঃ আযাদকৃত গোলামের আকিলাহ হচ্ছে তার মনিবের গোত্র।

কেননা, তাদেরই দ্বারা তার সাহায্য লাভ হয়। আর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিম্নোক্ত বাণী তা সমর্থন করেঃ مَولَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ (ابوداود، ترمذى) অর্থাৎ কোন কাউমের আযাকৃত গোলাম তাদেরই অন্তর্ভূক্ত। (আবূ দাউদ, তিরমিযী)

ইমাম কুদূরী (র) বলেনঃ আর সৌহার্দ্য মূলক 'ওয়ালা' সম্পর্কে আবদ্ধ ব্যক্তির আকিলাহ হবে তার মাওলা এবং মাওলার গোত্র।

কেননা, এই 'ওয়ালা' সম্পর্ক দ্বারা সাহায্য লাভ হয়। সুতরাং তা মুক্তিনির্ভর ওয়ালা-এর সদৃশ হলো। এ বিষয়ে শাফেয়ী (র)-এর মতভিন্নতা রয়েছে। আর ওয়ালা-ক্রান্ত আলোচনায় তা বিগত হয়েছে।

ইমাম কুদুরী (র) বলেনঃ আর দিয়তের দশমাংশের অর্ধেকের কমের ক্ষেত্রে আকিলাহগণ দায় বহন করবে না। বরং দিয়তের দশমাংশের অর্ধেক বা তার বেশীর ক্ষেত্রে তারা দায় বহন করবে।

এক্ষেত্রে দলীল হলো হযরত ইবনে আব্বাস (রা) পর্যন্ত উপনীত মাওকূফ সনদে এবং তার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা পর্যন্ত উন্নীত সনদে বর্ণিত হাদীস ঃ

لاَ تَعْقِلُ الْعَوَاقِلُ عَمَدًا وَلاَ عَبْدًا وَلاَ صُلْحًا وَلاَ اِعْتِرَافًا وَلاَمَادُوْنَ اَرْشِ الْمُوْضِحَةِ

আকিলাহগণ ইচ্ছাকৃত অপরাধের দায়,গোলামের অপরাধের দায়, সমঝোতার দায়, স্বীকারোক্তির দায়,এবং مُوْضِحَةٌ (হাঁড় বের হয়ে যাওয়া) জখমের দিয়তের নীচে কোন দায় বহন করবে না।

আর مُوْضِحَةٌ জখমের দায় হলো জানের দিয়তের দশমাংশের অর্ধেক।

তাছাড়া যুক্তিগত কারণ এই যে, আকিলাদের পক্ষ হতে দায় বহন করা হয় 'নির্মূলতা' পরিহার করার জন্য, আর অল্প পরিমাণের ক্ষেত্রে নির্মূলতা নেই। নির্মূলতা হলো বেশী পরিমাণের ক্ষেত্রে আর অল্প ও বেশীর মাঝে পার্থক্য নির্ধারণকারী পরিমাণ (শরীয়ত থেকে) শ্রুত-দলিল দ্বারা জানা গেছে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেনঃ এর চেয়ে কম যা হবে, তা অপরাধকারীর মাল থেকে আদায় করা হবে।

এক্ষেত্রে কিয়াসের দাবী হলো অল্প ও বেশীর মাঝে সমতা বিধান করা। সুতরাং সর্বপ্রকার দিয়তই আকিলাহদের উপর ধার্য হওয়া আবশ্যক; যেমন শাফেয়ী (র)

বলেছেনঃ কিংবা এভাবে সমতা বিধান করা যে, আকিলাহদের উপর কিছুই ওয়াজিব হবে না (বরং সর্বপ্রকার দিয়ত অপরাধকারীর উপর ওয়াজিব হবে) তবে আমরা (এই মাত্র) বর্ণিত হাদীসের কারণে কিয়াস বর্জন করেছি। আর বর্ণিত এই হাদীসের কারণেও যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'জানীন' বা গর্ভস্থ সন্তানের দিয়ত আকিলাহদের উপর সাব্যস্ত করেছেন, আর তা হলো পুরুষের দিয়তের দশমাংশের অর্ধেক। যেমন 'দিয়ত' প্রসঙ্গে তা আলোচিত হয়েছে।

সুতরাং এর চাইতে কম পরিমাণের ক্ষেত্রে মালের ক্ষতিপূরণের রীতি অনুসরণ করা হবে, অর্থাৎ সে ক্ষেত্রে ন্যায়বান ব্যক্তির মূল্যায়ণ দ্বারা ওয়াজিব হবে। যেমন মালের ক্ষতিপূরণ মূল্যায়ণ দ্বারা সাব্যস্ত হয়।

এ জন্যই কিয়াসের ভিত্তিতে এক্ষেত্রে অপরাধকারীর মালে ক্ষতিপূরণ বর্তায়।

ইমাম কুদূরী (র) বলেনঃ আকিলাহগণ গোলামের অপরাধের দায় বহন করবে না, সমঝোতার মাধ্যমে যা অবশ্য ধার্য হয়, সেটারও দায় বহন করবে না এবং অপরাধকারীর স্বীকারোক্তি দ্বারা যা সাব্যস্ত হয়, সেটারও দায় বহন করবে না।

কারণ আমাদের বর্ণিত হাদীস।

তাছাড়া যুক্তিগত কারণ এই যে, গোলামের সাথে তাদের পরস্পর সাহায্য গ্রহণের সম্পর্ক নেই, আর স্বীকারোক্তি ও সমঝোতা দ্বারা আকিলাদের উপর বাধ্যতামূলক হয় না। কেননা, তাদের উপর তার কর্তৃত্ব নেই।

ইমাম কুদূরী (র) বলেনঃ তবে যদি স্বীকারোক্তির ব্যাপারে তারা তাকে সত্যায়ন করে।

কেননা, তাদের সত্যায়ণ দ্বারা কথিত হক সাব্যস্ত হয়ে গেছে। আর তাদের উপর তা আরোপ করা থেকে নিবৃত্ত থাকা ছিল তাদের অধিকার রক্ষার জন্য। কিন্তু নিজেদের উপর তাদের কর্তৃত্ব রয়েছে। (সুতরাং নিজেদের উপর কিছু আবশ্যক করে নিলে তা আবশ্যক হয়ে যাবে।)

আর কেউ যদি ভুলক্রমে হত্যার স্বীকারোক্তি করে, কিন্তু অভিভাবকরা (প্রথমে নীরব থেকে) কয়েক বছর পর তা কাযীর দরবারে উত্থাপন করে, তাহলে কাযী ফায়ছালা করার দিন থেকে তিন বছরের মেয়াদে তার বিপক্ষে তার নিজের মাল থেকে দিয়ত প্রদানের ফায়সালা করবেন।

কেননা, বাইয়েনাহ্ বা সাক্ষ্য প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত ক্ষেত্রে বিচারের সময় থেকে মেয়াদ নির্ধারণ করা হয়েছে। সুতরাং স্বীকারোক্তি দ্বারা সাব্যস্ত হকের ক্ষেত্রে আরো স্বাভাবিকভাবেই তা হবে।

হত্যাকারী এবং অপরাধের (শিকার ব্যক্তির) অভিভাবক যদি পরস্পরকে এই মর্মে সত্যায়ন করে যে, অমুক শহরের কাযী তার কুফাস্থ আকিলাহদের বিপক্ষে বাইয়েনার মাধ্যমে দিয়তের ফায়ছালা করেছেন; কিন্তু আকিলাহগণ তাদেরকে অসত্যায়ন করে, তাহলে আকিলাহদের উপর দায় বর্তাবে না।

কেননা, তাদের পরস্পরের সত্যায়ন আকিলাহদের বিপক্ষে প্রমাণ নয়।

আর অপরাধ কারীর বিপক্ষে তার নিজস্ব মালেও কিছু সাব্যস্ত হবে না।

কেননা, তাদের পরস্পর সত্যায়নের কারণে আদালতের ফায়ছালা দ্বারা দিয়ত আকিলাহদের উপর স্থির হয়ে গেছে। আর তাদের পরস্পরের সত্যায়ন তাদের ক্ষেত্রে প্রমাণ রূপে গণ্য।

প্রথম মাসআলাটির কথা ভিন্ন।[১]

তবে যদি আকিলাহদের সাথে তার নামেও দীওয়ানী সম্মানী বরাদ্দ হয়ে থাকে, তখন তার উপর তার হিসসা পরিমাণ ওয়াজিব হবে।

কেননা, তার নিজের হিসসার ক্ষেত্রে সে নিজের বিপক্ষে স্বীকারোক্তিদাকারী। পক্ষান্তরে আকিলাহদের হিসসার ক্ষেত্রে তাদের বিপক্ষে স্বীকারোক্তিকারী (যা গ্রহণ যোগ্য নয়।)

ইমাম কুদূরী (র) বলেনঃ কোন স্বাধীন ব্যক্তি যদি গোলামের ক্ষেত্রে অপরাধ সংঘটন করে, অর্থাৎ ভুলক্রমে তাকে হত্যা করে , তাহলে তার আকিলাহদের উপর গোলামের মূল-দায় বর্তাবে।

কেননা, এটা হল নফস বা প্রাণ সত্তার বিনিময় (সম্পদের বিনিময় নয়।) যেমন আমাদের মূলনীতি সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে।

আর ইমাম শাফেয়ী (র)-এর দুটি মতের একটি মত অনুযায়ী স্বাধীন ব্যক্তির নিজস্ব সম্পদে মূল্যদায় বর্তাবে। যেমন আমাদের মুলনীতি সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। আর ইমাম শাফেয়ী (র)-এর দুটি মতের একটি মত অনুযায়ী স্বাধীন ব্যক্তির নিজস্ব সম্পদে মূল্যদায় বর্তাবে। কেননা, তার মতে এটা হলো তার সম্পদের বিনিময়। একারণে তিনি মূল্যের পরিমাণ যাই হোক তা ধার্য কারেন। (আমাদের মতে স্বাধীন ব্যক্তির দিয়ত থেকে দশ দিরহাম কম ধার্য করা হয়।)

আর গোলামের জানের চেয়ে নীচের 'দিয়ত-দায়' আকিলাহগণ বহন করবে না।

১. প্রথম মাসআলা দ্বারা তিনি "স্বীকারোক্তি ও সমঝোতা আকিলাহদের উপর কিছু সাব্যস্ত করে না,"-এই মাসআলাটি বুঝিয়েছেন। এই মাসআলা থেকে বোঝা যায় যে, স্বীকারোক্তি দ্বারা সাব্যস্ত দায় স্বীকারোক্তিকারীর সম্পদে ধার্য হবে।

এর কারণ এই যে, আকিলাহদের উপর দিয়ত সাব্যস্তকারী কারণ হলো কাযীর ফায়ছালা। আর সেটা সেখানে পাওয়া যায়নি। সুতরাং স্বীকারোক্তিকারীর মালেই তা ধার্য করা হবে।

কেননা, পূর্বের আলোচনা অনুযায়ী আমাদের মতে জানের নীচের ক্ষেত্রে সম্পদের বিধান অনুসরণ করা হবে।

আর ইমাম শাফেয়ী (র) এর দু'টি মতের একটি অনুযায়ী আকিলাহগণই তার দায় বহন করবে। স্বাধীন ব্যক্তির ক্ষেত্রে যেমন হয়ে থাকে। আর ইতিপূর্বে তা আলোচিত হয়েছে।

আর আমাদের ইমামগণ বলেনঃ (মুসলিম) হত্যাকারীর যদি কোন আকিলাহ না থাকে, তাহলে তার দিয়ত বাইতুল মালে ধার্য হবে। কেননা, মুসলমানদের জামাতই হলো তার সাহায্যকারী পক্ষ। আর এই সাব্যস্ত বিষয়ে তাদেরকেই কারো চেয়ে অধিকতর খাস নয়। এ কারণেই তো সে মারা গেলে তার মীরাছ বাইতুল মালের অনুকূলে জমা হয়। সুতরাং একইভাবে তার উপর যে অর্থদায় বর্তাবে সেটা বাইতুল মালের উপর ওয়াজিব হবে।

আর ইমাম আবু হানীফা (র) হতে 'অতি বিরল' একটি বর্ণনা রয়েছে যে,তার নিজস্ব মালে দিয়ত সাব্যস্ত হবে।

এর যুক্তি এই যে, মূলনীতি হলো সরাসরি হত্যাকারীর উপর দিয়ত ওয়াজিব হওয়া। কেননা, এটা 'নষ্টকৃত'-এর বিনিময়। আর 'নষ্টকরণ' তার পক্ষ হতেই হয়েছে,(আকিলাহদের পক্ষ হতে নয়।) তবে হালকাকরণ নিশ্চিত করার জন্য আকিলাহগণ (তার পক্ষ হতে) তা বহন করে। যেমন পিছনে তা আলোচিত হয়েছে। সুতরাং তার যদি আকিলাহ না থাকে তাহলে বিধান মূল অবস্থায় ফিরে আসবে।

আর 'লিআন-প্রাপ্তার'পুত্র-এর দিয়ত-দায় বহন করবে তার মায়ের আকিলাহগণ।

কেননা, তার নাম ও বংশ পরিচয় তার মা থেকে সাব্যস্ত, বাবা থেকে নয়।

সেই হিসাবে তারা যদি আকিলাহগণ রূপে তার দিয়ত-দায় বহন করে, তারপর বাবা তার পিতৃত্ব দাবী করে,তাহলে মা-এর আকিলাহগণ যা আদায় করেছে, তা পিতার আকিলাহদের কাছ থেকে রুজু করবে। তবে মায়ের আকিলাহদের অনুকূলে এবং বাবার আকিলাহদের প্রতিকূলে কাযীর ফায়ছালা জারি করার দিন থেকে তিন বছরের মেয়াদে।

কেননা, এটা প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, দিয়ত বাবার আকিলাহদের উপর ওয়াজিব ছিল। কারণ বাবা তার মিথ্যাচার স্বীকার করে নেয়ার সময় প্রমাণিত হয়েছে যে, বাবা পুত্রের বংশ পরিচয় (সূচনা থেকে) বহাল ছিল। এজন্যই মিথ্যাচার স্বীকার করা দ্বারা পূর্বের লিআনও বাতিল হয়ে গেছে। আর পিতৃপরিচয় যখন মূল থেকেই সাব্যস্ত বলে প্রকাশ পেল, তখন এটাও প্রকাশ পেল যে, মায়ের আকিলাহরা বাবার আকিলাহদের উপর সাব্যস্ত দায় বহন করেছে। সুতরাং তারা তা তাদের কাছ থেকে রুজু নেবে। কেননা, এ বিষয়ে তারা নিরুপায় ছিল। (স্বেচ্ছায় প্রদানকারী ছিলনা।)

তদ্রূপ মোকাতাব যদি (কিতাবাত চুক্তির বিনিময় পরিশোধের মত) পর্যাপ্ত অর্থ রেখে মারা যায়. আর তার স্বাধীন পুত্র থাকে। কিন্তু তার কিতাবাত চুক্তির বিনিময় পরিশোধ করার আগেই তার পুত্র কোন 'অপরাধ' সংঘটন করে এবং তার মায়ের আকিলাহগণ তার দিয়ত-দায় বহন করে,এরপর কিতাবাত চুক্তির বিনিময় পরিশোধ করা হয়, (তাহলে মাতৃ০আকিলাহগণ পিতৃ-আকিলাহদের কাছ থেকে রুজু করবে।)

কেননা, বিনিময় পরিশোধের সময় পিতার স্বাধীনতা লাভের লগ্ন থেকে অর্থাৎ তার জীবনের শেষক্ষণ থেকে পুত্রের 'ওয়ালা' সম্পর্ক(মাতৃ-গোষ্ঠী থেকে) পিতৃ-গোষ্ঠীতে স্থানান্তরিত হয়ে যাবে। সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, মাতৃ-গোষ্ঠী পিতৃগোষ্ঠীর পক্ষ হতে দিয়ত দায় বহন করেছে। সুতরাং তারা তাদের কাছ থেকে তা রুজু করবে।

তদ্রূপ কোন লোক যদি কোন বাচ্চাকে, কোন মানুষকে, হত্যা করার আদেশ করে, আর সে ঐ লোককে হত্যা করে, আর বাচ্চার আকিলাহগণ 'দিয়ত-দায়' বহন করে, তাহলে তারা আদেশ দাতার আকিলাহদের কাছ থেকে আদায়কৃত দিয়ত রুজু করবে। যদি হত্যার আদেশ বাইয়েনাহ বা দলীল দ্বারা প্রমাণিত হয়। আর যদি আদেশ দাতার স্বীকারোক্তি দ্বারা প্রমাণিত হয়, তাহলে তার নিজস্ব মাল থেকে রুজু করবে।

আর এ ক্ষেত্রেও আদেশ দাতার বিপক্ষে কিংবা তার আকিলাহদের বিপক্ষে কাযী কর্তৃক দিয়তের ফায়ছালা জারি করার দিন থেকে তিন বছরের মেয়াদ সাব্যস্ত হবে।

কেননা, সহজ করার নীতি হিসাবে দিয়ত সমূহ (তিন বছরের) মেয়াদ বদ্ধ অবস্থায় ওয়াজিব হয়।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেনঃ এখানে কয়েকটি মাসআলা রয়েছে, যা ইমাম মুহাম্মদ (র) বিক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করেছেন। তবে যে মূলনীতির ভিত্তিতে(মাসআলাগুলো)তিনি আহরণ করেছেন, সেটাকে এভাবে পেশ করা যায় যে, হত্যাকারীর অবস্থা যদি গুণগতভাবে পরিবর্তিত হয় এবং তার 'ওয়ালা' সম্পদ নব উদ্ভূত কোন কারণ দ্বারা স্থানান্তরিত হয়, তাহলে তার 'অপরাধ-দায়' প্রথম পক্ষ থেকে(দ্বিতীয় পক্ষে) স্থানান্তরিত হবে না। ঐ অপরাধের দায় সম্পর্কে আদালতের ফায়ছালা জারি হোক বা না হোক।

আর যদি (গুণগত অবস্থায় পরিবর্তন না হয়, বরং) কোন অজ্ঞাত অবস্থায় প্রকাশ ঘটে। যেমন লিআন প্রাপ্তার সন্তানের বংশ পরিচয়, তাহলে অপরাধের দায় প্রথম পক্ষ থেকে (দ্বিতীয় পক্ষে) স্থানান্তরিত হয়ে যাবে। অপরাধের দায় সম্পর্কে আদালতের ফায়ছালা জারি হোক বা না হোক।

আর যদি অপরাধকারীর অবস্থায় গুণগত পরিবর্তন না ঘটে, কিন্তু আকিলাহ পরিবর্তন হয়ে যায়, তাহলে সে ক্ষেত্রে বিচারকালের অবস্থা বিবেচ্য হবে। সুতরাং যদি প্রথম দলের বিপক্ষে দিয়তের ফায়ছালা হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে সেটা দ্বিতীয় দলের দিকে স্থানান্তরিত হবে না। আর যদি প্রথম দলের বিপক্ষে দিয়তের ফায়ছালা না হয়ে

থাকে, তাহলে (প্রথম দলের পরিবর্তে) দ্বিতীয় দলের বিপক্ষে দিয়তের ফায়ছালা করা হবে।

পক্ষান্তরে আকিলাহগণ যদি একই থাকে, আর তার 'দিয়ত দায়'-এর পরিমাণ বাড়ে (যেমন আকিলাহদের একজন মারা গেল) কিংবা কামে গেল (যেমন তাদের কোন বাচ্চা প্রাপ্ত বয়স্ক হয়ে তাদের সঙ্গে যুক্ত হলে।) সে ক্ষেত্রে তারা বিচারের আগে ও পরে (উভয় অবস্থায়) অপরাধের বিধান (তথা দিয়ত পরিশোধে শরীক হবে।) তবে আগে যেটা আদায় হয়ে গেছে, তাতে তারা শরীক হবে না।

মোট কথা চিন্তাভাবনা করে এই মূলনীতিটি যে পূর্ণ রূপে অনুধাবন করতে পারবে, তার সামনে যত সমতুল্য নযীর.বা বিপরীত নযীর আসবে, সে সেগুলোর বিধান আহোহণ করতে সক্ষম হবে। আল্লাহ্ সঠিক বিষয় অধিক জানেন।

كِتَابُ الْوَصَايَا
অধ্যায় ঃ অসিয়ত

অসিয়তের বিবরণ, বৈধ অসিয়ত, মুস্তাহাব অসিয়ত এবং অসিয়ত প্রত্যাহার

ইমাম কুদুরী (র) বলেনঃ অসিয়ত করা ওয়াজিব নয়; বরং তা মুসতাহাব।

কিয়াস অবশ্য অসিয়তের বৈধতাকে অস্বীকার করবে। কেননা, এর অর্থ হলোঃ অসিয়ত কারীর মালিকানা বিলুপ্তির অবস্থার দিকে সম্বন্ধিত করে মালিকানা প্রদান। অথচ যদি মালিকানা বিদ্যমান থাকার অবস্থার দিকে সম্বন্ধিত করে বলে যে, তোমাকে আগামীকাল এটার মালিক বানালাম তাহলেও সেটা বাতিল বলে গণ্য হয়। সুতরাং এটা তো আরো স্বাভাবিক কারণেই বাতিল হবে। তবে আমরা এটাকে মনে করেছি;(কুরআন, হাদীস ও ইজমার ভিত্তিতে এবং) অসিয়তের প্রতি মানুষের প্রয়োজনের কারণে।

কেননা, মানুষ তার দীর্ঘ আশা দ্বারা ধোঁকা গ্রাস্ত অবস্থায় আছে, আমলে ত্রুটি করে। ফলে যখন তার রোগব্যাধি হয় এবং মৃত্যু-আশংকা দেখা দেয়, তখন মালের (সদ্ব্যবহারের) বিষয়ে যা কিছু ত্রুটি হয়েছে, তার কিছু ক্ষতিপূরণ করতে চেষ্টা করে।

পরবর্তীতে যদি সে তা বহাল রেখে মৃত্যুবরণ করে, তাহলে তো তার পরকালীন উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হলো। আর যদি আরোগ্য লাভ করে, তাহলে সেটাকে সে তার বর্তমান প্রয়োজনেও ব্যবহার করতে পারে।

আর অসিয়ত প্রবর্তনের উদ্দেশ্যও তাই। সুতরাং আমরা সেটার বৈধতা গ্রহণ করেছি।

আর ইজারার ক্ষেত্রেও আমরা একই কথা বর্ণনা করে এসেছি।

আর (কিয়াসের জবাব এই যে,) প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে মৃত্যুর পরে মালিকানা বহাল থাকে, যেমন কাফন দাফনের পরিমাণের ক্ষেত্রে এবং ঋণের ক্ষেত্রে বহাল থাকে।

আর আল্লাহ্‌র কিতাব এর বৈধতা ঘোষণা করেছে। আর তা হলো আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِى بِهَا أَوْ دَيْنٍ-

অসিয়তের পরে, যে অসিয়ত সে করবে কিংবা ঋণের পরে। (৪ঃ১১)।

এবং সুন্নাহও তার বৈধতা ঘোষণা করছে। আর তাহলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের বাণী ঃ

—৬৫

اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ اَمْوَالِكُمْ فِىْ اٰخِرِ اَعْمَارِكُمْ زِيَادَةً لَّكُمْ فِىْ اَعْمَالِكُمْ تَضَعُوْنَهَا حَيْثُ شِئْتُمْ (اَوْ قَالَ حَيْثُ اَحْبَبْتُمْ)۔

আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জীবনের শেষ দিকে তোমাদের সম্পদের এক তৃতীয়াংশ সাদ্কা করেছেন, যাতে তোমরা তোমাদের আমল বৃদ্ধি করতে পারো, যেখানে তোমাদের ইচ্ছা। কিংবা বলেছেনঃ যেখানে তোমাদের পছন্দ, সেখানে তোমরা তা ব্যবহার করতে পারো।

আর এর উপর উম্মতের ইজমা সম্পন্ন হয়েছে। এরপর এক তৃতীয়াংশ সম্পদের ক্ষেত্রে ওয়ারিছদের অনুমতি ছাড়া 'আজনবীর' অনুকূলে অসিয়ত করাও বৈধ রয়েছে, এর কারণ আমাদের বর্ণিত হাদীস।

অবশ্য অসিয়তের ক্ষেত্রে সর্বোত্তম পন্থা কোনটা, তা আমরা ইনশাআল্লাহ বর্ণনা করবো।

ইমাম কুদূরী (র) বলেনঃ এক তৃতীয়াংশের বেশী অসিয়ত করা জাইয নয়।

কেননা, হযরত সাআদ ইবন আবূ ওয়াক্কাস (রা)-এর হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম, হযরত সাআদ (রা)-এর সমস্ত সম্পদের অসিয়ত করার এবং অর্ধেকের অসিয়ত করার অবদার নাকচ করে দিয়ে বলেছেনঃ হাঁ, এক তৃতীয়াংশ করতে পারো, তবে এক তৃতীয়াংশও অনেক।

তাছাড়া যুক্তিগত কারণ এই যে, এই মাল হলো ওয়ারিছদের হক। কেননা অছিয়তকারীর মালিকানা বিলুপ্ত হয়ে ওয়ারিছদের দিকে স্থানান্তরিত হওয়ার 'কারণ' সম্পন্ন হয়েছে, আর তা হলো মাল থেকে অছিয়তকারীর অমুখাপেক্ষী হয়ে পড়া। সুতরাং এই অমুখাপেক্ষিতা মালের সঙ্গে তাদের সম্পৃক্তিকে সাব্যস্ত করেছে। তবে আজনবীদের[১] ব্যাপারে এক তৃতীয়াংশ পরিমাণ মালের ক্ষেত্রে শরীয়ত ওয়ারিছদের সম্পৃক্তিকে প্রকাশ করেনি, যাতে আমাদের (এইমাত্র) বর্ণিত পন্থায় অছিয়তকারী তার পিছনের ত্রুটি ক্ষতিপূরণ করতে পারে। কিন্তু ওয়ারিছদের (অনুকূলে অছিয়ত করার) ক্ষেত্রে উক্ত সম্পৃক্তিকে প্রকাশ করেছে। (সুতরাং কোন ওয়ারিছের নামে অছিয়ত করা সিদ্ধ নয়)।

এক্ষেত্রে সম্পৃক্তিকে প্রকাশ করার) কারণ এই যে, স্বাভাবিক অবস্থা এটাই যে, অনিচ্ছাকৃত হলেও (এক ওয়ারিছকে অন্য ওয়ারিছের উপর) অগ্রাধিকার প্রদানের যে ভাব প্রকাশ পায়, তা পরিহার করার জন্য ওয়ারিছদের কাউকে সে উক্ত তৃতীয়াংশ মাল দান করবে না। যেমন সামনে আমরা বর্ণনা করবো। আর হাদীস শরীফে এসেছে ঃ

اَلْحَيْفُ فِى الْوَصِيَّةِ مِنْ اَكْبَرِ الْكَبَائِرِ۔

অছিয়তের ক্ষেত্রে অবিচার করা সবচেয়ে বড় গুনাহগুলির অন্তর্ভুক্ত।

---

১. এখানে আজনবী দ্বারা উদ্দেশ্য হল ওয়ারিছদের ছাড়া অন্য যে কেউ, আত্মীয় হোক বা অনাত্মীয়, পরিচিত হোক বা অপরিচিত।

আর আলিমগণ অবিচার এর ব্যাখ্যা করেছেন, এক তৃতীয়াংশের বেশী অছিয়ত করা এবং কোন ওয়ারিছের নামে অছিয়ত করা।

ইমাম কুদূরী (র) বলেনঃ তবে যদি তার মৃত্যুর পর ওয়ারিছরা তা অনুমোদন করে এবং তারা সবাই প্রাপ্ত বয়স্ক হয়।

কেননা, এই নিষিদ্ধতা ছিল তাদের অধিকারের কারণে, আর তারা তা রহিত করেছে।

তার জীবদ্দশায় তাদের অনুমোদনের বিষয়টি বিবেচ্য নয়।

কেননা তা হবে হক সাব্যস্ত হওয়ার আগে (হক প্রয়োগ করা)। কারণ (তাদের অনুকূলে) হক সাব্যস্ত হবে অছিয়তকারীর মৃত্যুর সময়। সুতরাং (জীবদ্দশায় অনুমোদন দানের পর) তার মৃত্যুর পরে অনুমোদন প্রত্যাহার করে নেয়ার হক তাদের রয়েছে। মৃত্যুর পর অনুমোদন দানের বিষয়টি ভিন্ন। তখন অনুমোদন প্রত্যাহার করার অধিকার থাকবে না। কেননা উক্ত অনুমোদন হচ্ছে (তাদের অনুকূলে) হক সাব্যস্ত হওয়ার পরে। সুতরাং তাদের তা থেকে ফিরে আসার অধিকার নেই।

(জীবদ্দশায় প্রদত্ত অনুমোদন রদ করার অধিকার রয়েছে। কেননা অনুমোদন যথা সময়ের সঙ্গে যুক্ত না হওয়ায় তা গ্রহণযোগ্য ছিল না) কেননা যা বাতিল তা অস্তিত্বহীন।

বেশীর চেয়ে বেশী এই যে, অনুমোদন প্রদানের সময় 'মৃত্যু রোগের' প্রথম মুহূর্তের দিকে সম্বন্দিত হয়ে তাদের হক সাব্যস্ত হবে। কিন্তু এই সম্বায়ন প্রকাশ পাবে বিদ্যমান বস্তুর ক্ষেত্রে। কিন্তু এখানে অনুমোদন কর্মটি সঠিক পাত্রের সঙ্গে যুক্ত না হওয়ায় বিগত ও অস্তিত্বহীন হয়ে গেছে।

তাছাড়া (দ্বিতীয় যুক্তি এই যে,) ওয়ারিছের অনুকূলে প্রকৃত মালিকানা সাব্যস্ত হবে মৃত্যুর সময়। পক্ষান্তরে মৃত্যুর পূর্বে শুধু মালিকানার 'হক' সাব্যস্ত হয়। (যা অছিয়তকারীকে দুই তৃতীয়াংশে হস্তক্ষেপ করা থেকে বাধা দেয়) কিন্তু ওয়ারিছের হক যদি সর্ববিষয়ে মৃত্যুরোগের প্রথম সময়ের দিকে সম্বন্ধিতা হয় তাহলে তো মৃত্যুর পূর্বেই মালিকানার হক প্রকৃত মালিকানায় রূপান্তরিত হয়ে যায়। আর মালিকানার হক বাতিল হওয়ার বিষয়ে সম্মতি প্রকৃত মালিকানা বাতিল হওয়ার বিষয়ে সম্মতি প্রমাণ করে না।

তদ্রূপ অছিয়ত যদি কোন ওয়ারিছের জন্য হয়, আর অন্যরা তা অনুমোদন করে, তাহলে তার বিধানও সেটাই হবে, যা আমরা উল্লেখ করেছি।

আর যা কিছু ওয়ারিছের অনুমোদনের মাধ্যমে বৈধতা লাভ করে আমাদের মতে যা অনুমোদন প্রাপ্ত ব্যক্তি সেটার মালিকানা লাভ করে অছিয়তকারীর পক্ষ হতে। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী (র) এর মতে অনুমোদন প্রাপ্ত ব্যক্তি সেটার মালিকানা লাভ করে ওয়ারিছের পক্ষ হতে।

আমাদের বক্তব্যই সঠিক। কেননা অছিয়ত প্রাপ্ত ব্যক্তির মালিকানার 'কারণ' অছিয়তকারীর পক্ষ হতে প্রকাশ পেয়েছে। পক্ষান্তরে অনুমোদনের অর্থ হচ্ছে শুধু বাধা উন্মোচন।

আর (অনুমোদন প্রদানের পর অনুমোদন প্রাপ্ত ব্যক্তির পক্ষ হতে) কব্জা করা শর্ত নয়। (অথচ ওয়ারিছের পক্ষ হতে হেবা বা দান এলে কব্জা শর্ত হতো।)

সুতরাং ওয়ারিছের অনুমোদন দানের বিষয়টি বন্ধকগ্রহণকারীর মত হলো, বন্ধকদাতার বিক্রয় চুক্তিকে অনুমোদন প্রদান করে।[১]

ইমাম কুদূরী (র) বলেনঃ হত্যাকারীর অনুকূলে অছিয়ত জাইয হবে না। হত্যা কর্ম ইচ্ছাকৃত হোক বা অনিচ্ছাকৃত, যদি সে প্রত্যক্ষ হত্যাকারী হয়ে থাকে, (হত্যার কারণ সৃষ্টিকারী নয়।) কেননা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

لَا وَصِيَّةَ لِلْقَاتِلِ (অর্থাৎ হত্যাকারীর অনুকূলে কোন অছিয়ত নেই।)

তাছাড়া যুক্তিগত কারণ এই যে, আল্লাহ যেটাকে নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত বিলম্বিত করেছেন, সেটাকে সে তাড়াতাড়ি লাভ করতে চেয়েছে। সুতরাং মীরাছ থেকে যেমন তাকে বঞ্চিত করা হয়েছে, তেমনি অছিয়ত থেকেও তাকে বঞ্চিত করা হবে।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেনঃ হত্যাকারীর অনুকূলে অছিয়ত জাইয হবে। একই মতপার্থক্য হবে যদি অছিয়তকারী কোন লোকের মাঝে অছিয়ত করে, আর সে অছিয়তকারীকে হত্যা করে।

আমাদের মতে অছিয়ত বাতিল হয়ে যায়। কিন্তু তাঁর মতে বাতিল হবে না। উভয় অবস্থায় তাঁর বিপক্ষে প্রমাণ হলো আমাদের বর্ণিত হাদীছ।

আর ওয়ারিছরা যদি হত্যাকারীর নামে অছিয়তকে অনুমোদন করে, তাহলে ইমাম আবু হানীফা ও মুহম্মদ (র) এর মতে তা জাইয হবে। আর ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন ঃ তা জাইয হবে না।

কেননা তার অপরাধ বহাল রয়েছে। আর সে কারণেই নিষেধাজ্ঞা এসেছে।

সাহেবায়নের যুক্তি এই যে, ওয়ারিছদের হকের কারণে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। কেননা অছিয়ত বাতিল হওয়ার উপকারিতা তাদেরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে, মীরাছ বাতিল হওয়ার ক্ষেত্রে যেমন হয়ে থাকে। তাছাড়া কারণ এই যে, ওয়ারিছগণ স্বভাবতই হত্যাকারীর অনুকূলে অছিয়তে সম্মত হবে না, যেমন তারা ওয়ারিছদের কারো নামে অছিয়তে সম্মত হবে না।

ইমাম কুদূরী (র) বলেনঃ আর নিজের কোন ওয়ারিছের অনুকূলে অছিয়ত করাও জাইয হবে না।

কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

إِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى أَعْطٰى كُلَّ ذِىْ حَقٍّ حَقَّهُ أَلَا لَا وَصِيَّةَ لِلْوَارِثِ۔

---

১. এক্ষেত্রে ক্রেতা বন্ধক দাতার পক্ষ হতে মালিকানা লাভ করে, অনুমোদন প্রদানকারী বন্ধক গ্রহীতার পক্ষ হতে নয়। সে শুধু বাধা দূর করেছে।

আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেক হকদারকে তার হক দান করেছেন, কোনো ওয়ারিছের অনুকূলে অসিয়ত করা জাইয় নেই। তাছাড়া যুক্তিগত কারণ এই যে একজনকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কারণে অন্যজন কষ্ট পাবে। সুতরাং সেটাকে বৈধ করার অর্থ আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা।

তা ছাড়া আমাদের বর্ণিত হাদীছের আলোকে এটা হলো অবিচার।

আর মৃত্যুর সময় ওয়ারিছ হওয়া না হওয়ার বিষয়টি বিবেচ্য হবে, অছিয়ত করার সময় নয়। কেননা এটা হলো মৃত্যুর পরবর্তী সময়ের দিকে সম্পৃক্তিত মালিকানা প্রদান আর সেটার হুকুম মৃত্যুর পর সাব্যস্ত হবে।

আর ওয়ারিছের নামে মৃতুরোগীর দান ও হেবার বিষয়টি অছিয়তের নযীর। কেননা এটাও গুণগতভাবে অছিয়ত, তাই তো তা শুধু এক তৃতীয়াংশ থেকে কার্যকর হয়।

পক্ষান্তরে ওয়ারিছের অনুকূলে মৃত্যুরোগীর (ঋণ সংক্রান্ত) স্বীকারোক্তির বিষয়টি এর বিপরীত। কেননা এটা বর্তমানে সময়ের হস্তক্ষেপ (মৃত্যুর পরবর্তী সময়ের দিকে সম্বান্বিত হস্তক্ষেপ নয়।) সুতরাং স্বীকারোক্তির সময় ওয়ারিছ হওয়া না হওয়ার বিষয়টি বিবেচ্য হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেনঃ তবে অন্যান্য ওয়ারিছ যদি তা অনুমোদন করে।

আর আমাদের বর্ণিত হাদীছে এই ব্যতিক্রম (اِلاَّ اَنْ يَّشَاءَ الْوَارِثُ) বলে বর্ণিত হয়েছে।

তাছাড়া যুক্তিগত কারন এই যে, এই নিষেধাজ্ঞা ছিল তাদের অধিকারের কারণে, সুতরাং তাদের অনুমোদন প্রদানের কারণে তা জাইয হবে। আর যদি কেউ অনুমোদন করে, আর কেউ না করে, তাহলে অনুমোদনদাতার হিসসার পরিমাণ তা জাইয হবে। কেননা নিজের উপর তার কর্তৃত্ব রয়েছে। কিন্তু প্রত্যাখ্যানকারীর ক্ষেত্রে তা বাতিল হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেনঃ আর মুসলমান ব্যক্তির কাফিরের অনুকূলে এবং কাফির ব্যক্তির মুসলমানের অনুকূলে অছিয়ত করা জাইয রয়েছে।

প্রথমটির প্রমাণ হলো আল্লাহর তা'আলার বাণী –

لاَيَنْهَا كُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْا اِلَيْهِمْ –

আল্লাহ্ তোমাদেরকে এই লোকদের প্রতি সদাচার করতে এবং তাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখতে নিষেধ করেন না, যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বের করে দেয়নি।

দ্বিতীয়টির যুক্তি এই যে, যিম্মাচুক্তির মাধ্যমে মুআমালাতের লেনদেনের ক্ষেত্রে তারা মুসলমানদের সমান হয়ে পড়েছে। একারণেই জীবদ্দশায় উভয় পক্ষ হতে স্বেচ্ছাদান বৈধ রয়েছে, সুতরাং মৃত্যুর পরও তাই হবে।

আর জামে ছাগীর কিতাবে রয়েছে যে, হারবীর অনুকূলে অছিয়ত বাতিল হবে।

কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

اِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ قَاتَلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ-

বরং আল্লাহ্ তোমাদেরকে ঐ লোকদের সম্পর্ক নিষেধ করেছেন, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে দ্বীনের ব্যাপারে লড়াই করেছে।

ইমাম কুদূরী বলেনঃ আর অছিয়ত কবুল করার প্রশ্ন আসবে মৃত্যুর পর। সুতরাং অছিয়ত প্রাপ্ত ব্যক্তি যদি অছিয়তকারীর জীবদ্দশায় অছিয়ত কবুল করে বা প্রত্যাখ্যান করে, তবে তা বাতিল হবে।

কেননা অছিয়তের হুকুম সাব্যস্ত হওয়ার সময় হলো মৃত্যুর পর। কারণ মৃত্যুর সঙ্গে তা সম্পৃক্ত। সুতরাং মৃত্যুর পূর্বে তা গ্রহণ বা বর্জন বিবেচ্য হবে না। যেমন অছিয়ত করার পূর্বে তা বিবেচ্য হয় না।

ইমাম কুদূরী (র) বলেনঃ আর মুস্তাহাব হলো এক তৃতীয়াংশের কম পরিমাণে অছিয়ত করা।

ওয়ারিছরা ধনী হোক বা দরিদ্র, তৃতীয়াংশ থেকে কম করার ক্ষেত্রে নিজের মাল তাদের জন্য রেখে যাওয়ার মাধ্যমে আত্মীয়তা রক্ষার দিক রয়েছে। পূর্ণ তৃতীয়াংশ অছিয়ত করার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা এটা হলো অছিয়তকারীর নিজের সম্পূর্ণ হক উশুল করে নেয়া (ওয়ারিছের জন্য কিছুই না রাখা) সুতরাং কোন আত্মীয়তা রক্ষা হল না এবং কোন অনুগ্রহ প্রদর্শন হলো না।

এরপর (প্রশ্ন হলো) তৃতীয়াংশের কম পরিমাণে অছিয়ত করা উত্তম, না অছিয়ত না করা উত্তম? এ সম্পর্কে মাশায়েখে কিরাম বলেন ঃ ওয়ারিছরা যদি অসচ্ছল হয় এবং মীরাছের যে হিসসাস লাভ করবে তা দ্বারা স্বচ্ছলতা লাভ করা সম্ভব না হয়, তাহলে অছিয়ত না করা উত্তম। কেননা তাতে নিকটাত্মীয়কে সদকা করার ছাওয়াব রয়েছে। আর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

اَفْضَلُ الصَّدَقَةُ عَلٰى ذِىْ الرَّحْمِ الْكَاشِحِ - (مسند احمد)

–সর্বোত্তম সাদাকা হলো বৈরী নিকটাত্মীয়কে সাদকা করা। তাছাড়া এতে গরীবের হক এবং নিকটাত্মীয়র হক দুটোই রক্ষা করা হয়।

আর যদি তারা সচ্ছল হয়, কিংবা তাদের প্রাপ্য মীরাছের হিসসা দ্বারা সচ্ছলতা লাভ করার মত হয়, তাহলে অছিয়ত করা উত্তম। কেননা সেটা হবে আজনাবীকে ছাদাকা করা, আর অছিয়ত না করা অর্থ হলো নিকটাত্মীয়কে হিবা করা। এর মধ্যে প্রথমটি উত্তম। কেননা তা (শুধু) আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে করা হয়।

আর কারো কারো মতে এই ছূরতে তাকে ইখতিয়ার প্রদান করা হবে। কেননা দুটোর প্রতিটি একটি ফযীলত ধারণ করছে, অর্থাৎ সাদাকা কিংবা আত্মীয়তা রক্ষা। সুতরাং দুটি উত্তম কাজের মাঝে তাকে ইখতিয়ার প্রদান করা হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেনঃ কবুল করা দ্বারা অছিয়তকৃত বস্তুর মালিকানা লাভ হয়।

ইমাম যুফার (র) এ ব্যাপারে ভিন্ন মত পোষণ করেন, আর তাই ইমাম শাফেয়ী (র) এর দুটি মতের একটি। তিনি বলেনঃ অছিয়ত হলো মীরাছের সমগোত্রীয়। কেননা দুটোর প্রতিটিতেই স্থলবর্তিতার অর্থ আছে। কারণ এটা হলো মালিকানা হস্তান্তর আর মীরাছ কবুল ছাড়াই সাব্যস্ত হয়ে যায়, সুতরাং অছিয়ত তেমন হবে।

আমাদের যুক্তি এই যে, অছিয়ত অর্থ (স্থলবর্তিতার ভিত্তিতে নয়, বরং) স্বতন্ত্রভাবে নতুন মালিকানা সৃষ্টি করা। এ কারণেই অছিয়ত প্রাপ্ত ব্যক্তি দোষজনিত কারণে বিক্রেতাকে তা ফেরত দিতে পারেনা। এবং তা তাকে ফেরত দেয়া যায় না।[১]

আর কেউ অন্যের অনুকূলে তা গ্রহণ করা ছাড়া মালিকানা সাব্যস্ত করতে পারে না (মালিক হতে না চাইলে তাকে মালিক বানাতে পারে না।)

পক্ষান্তরে মীরাছ হচ্ছে স্থলবর্তিতা। এ কারণে মীরাছের ক্ষেত্রে এই সমস্ত বিধান (অর্থাৎ দোষজনিত কারণে ফেরত অধিকার) সাব্যস্ত হয়। সুতরাং তার কবুল করা ছাড়াই শরীয়তের পক্ষ হতে বাধ্যতামূলক ভাবে তাতে ওয়ারিছদের মালিকানা সাব্যস্ত হয়।

ইমাম কুদূরী (র) বলেনঃ তবে একটি মাসআলায় (কবুল করা ছাড়াই মালিকানা সাব্যস্ত হয়ে যায়) তা এই যে, অছিয়তকারী মারা গেলে, তারপর অছিয়তপ্রাপ্ত ব্যক্তিও কবুল করার আগে মারা গেল তখন অছিয়তকৃত বস্তু অছিয়ত প্রাপ্ত ব্যক্তির ওয়ারিছদের মালিকানার অন্তর্ভূক্ত হয়ে যায়।

এটা সূক্ষ্ম কিয়াসের সিদ্ধান্ত। কিয়াসের দাবী হলো অছিয়ত বাতিল হয়ে যাওয়া। এর কারণ এই যে, মালিকানা কবুল করার উপর নির্ভর করে। সুতরাং এটা বিক্রেতার প্রস্তাব কবুল করার আগে ক্রেতার মারা যাওয়ার মত হলো।

সূক্ষ্ম কিয়াসের যুক্তি এই যে, অছিয়তকারী মৃত্যু দ্বারা তার পক্ষ হতে অছিয়ত পূর্ণতা লাভ করেছে, যার পর তার পক্ষ হতে অছিয়ত নাকচ হতে পারে না।

তবে অছিয়তপ্রাপ্ত ব্যক্তির হকের কারণে তা স্থগিত ছিল। কিন্তু যখন সে মারা গেল, তখন অছিয়তকৃত বস্তু তার মালিকানার অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। যেমন ক্রেতার অনুকূলে ইখতিয়ারের শর্তযুক্ত বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রেতা যদি অনুমোদন প্রদানের পূর্বে মারা যায়।

ইমাম কুদূরী (র) বলেনঃ কেউ যদি অছিয়ত করে, অথচ তার উপর রয়েছে সম্পদ (বণ্টনকারী ঋণ, তাহলে অছিয়ত জাইয হবে না।

কেননা, দুটি প্রয়োজনের মধ্যে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণে ঋণের বিষয়টি অছিয়তের চেয়ে অগ্রবর্তী হবে। কেননা ঋণ পরিশোধ করা হলো ফরজ, আর অছিয়ত

---

১. অথচ অসিয়তপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি অসিয়তকারীর স্থলবর্তী হতো, তাহলে সে যেমন ফেরত দিতে পারতো, তেমনি তাকে ফেরত দেয়া যেতো।

হলো স্বেচ্ছাদান। আর সব সময় পর্যায়ক্রমে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ দ্বারাই শুরু করা হয়। তবে যদি পাওনাদাররা অছিয়কারীকে ঋণ থেকে দায়মুক্ত করে দেয়। সুতরাং অছিয়তের প্রতি তার প্রয়োজনের কারণে শরীয়ত অনুমোদিত (তৃতীয়াংশ) পরিমাণে অছিয়ত কার্যকর হবে।

ইমাম কুদুরী (র) বলেনঃ বাচ্চার অছিয়ত ছহীহ হবে।

ইমাম শাফেয়ী (র) এর মতে যদি বিভিন্ন কল্যাণমূলক কাজে অছিয়ত করা হয়, তাহলে সহীহ হবে। কেননা ওমর (রা) বয়ঃসন্ধিক্ষণে উপনীত বালকের অছিয়ত অনুমোদন করেছেন।

তাছাড়া যুক্তিগত কারণ এই যে, বাচ্চার অছিয়তের সিদ্ধতার জন্য কল্যাণ রয়েছে। কেননা এটা হলো আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য নিজের মাল নিজের জন্য খরচ করা। পক্ষান্তরে যদি অছিয়ত কার্যকর না করা হয়, তাহলে তার মাল অন্যের জন্য থেকে যাবে।

আমাদের যুক্তি এই যে, অছিয়ত হচ্ছে স্বেচ্ছাদান আর বাচ্চা স্বেচ্ছাদানের উপযুক্ত নয়। তাছাড়া বাচ্চার বক্তব্য অবশ্য সাব্যস্তকারী নয়। অথচ তার অছিয়তকে সিদ্ধতাদানের অর্থ হলো তার বক্তব্যকে বিধান অবশ্যসাবস্তকারী বলে সিদ্ধান্ত দেয়া।

আর উল্লেখিত সাহাবীর বর্ণনাটির ব্যাখ্যা এই যে, রূপক অর্থে তাকে প্রায় প্রাপ্ত বয়স্ক বা يافع বলা হয়েছে (মূলত সেছিল প্রাপ্ত বয়স্ক) অথবা তার অছিয়ত ছিল তার কাফন দাফনের বিষয়ে। আর আমাদের মতে তা জাইয।

আর (ছাওয়াব লাভের ব্যাপারে আমাদের বক্তব্য এই যে,) ওয়ারিছদের জন্য অছিয়ত না করার দ্বারা সে ছওয়াব সংরক্ষণ করতে পারে, যেমন আমরা বর্ণনা করেছি। আর উপকার ও ক্ষতির ক্ষেত্রে বিবেচ্য হলো হস্তক্ষেপ সমূহের মূল অবস্থা, ঘটনাক্রমে বিদ্যমান বর্তমান অবস্থা নয়। এটাকে তালাকের উপর কিয়াস করুন, বাচ্চা এবঙ তার অসী তালাক দেয়ার অধিকারী নয়। (অথচ উদ্ভূত অবস্থার কারণে তা লাভজনকও হতে পারে, যেমন গরীব কুশ্রী স্ত্রীকে তালাক দিয়ে তার রূপসী ও সচ্ছল বোনকে বিবাহ করা।)

তদ্রূপ যদি সে অছিয়ত করে প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার আগে মারা যায়, তাহলে অছিয়ত সম্পাদনের সময় যোগ্যতা না থাকার কারণে তার অছিয়ত সিদ্ধ হয় না।

তদ্রূপ সে যদি বলেঃ আমি যখন প্রাপ্ত বয়স্ক হবো, তখন আমার এক তৃতীয়াংশ মাল অছিয়ত হবে। সেক্ষেত্রে তার যোগ্যতা অসম্পূর্ণ হওয়ার কারণে তা জাইয হয় না। সুতরাং তাৎক্ষণিকভাবে এবং ঝুলন্ত অবস্থায় সে অছিয়ত করার অধিকারী হবে না। তালাক প্রদান ও মুক্তি দানের ক্ষেত্রে যেমন হয়ে থাকে।

গোলাম ও মুকাতাবের বিষয়টি ভিন্ন। (সে যদি বলে আমি যখন আযাদ হব তখন আমার এক তৃতীয়াংশ মাল অছিয়ত হবে, এটা গ্রহণ যোগ্য) কেননা তার যোগ্যতা পূর্ণমাত্রায় রয়েছে। কিন্তু মনিবের হক হচ্ছে প্রতিবন্ধক। সুতরাং মনিবের হক রহিত হওয়ার অবস্থার দিকে তা সম্বন্ধিত করা জায়েয় হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেনঃ মুকাতাবের (তাৎক্ষণিক) অছিয়ত ছাহীহ হবে না. যদিও সে কিতাবাতের বিনিময় পরিশোধের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ রেখে যায়। (তবে মুক্তির শর্তের ঝুলন্ত অছিয়ত ছহী হবে।)

কেননা তার মাল স্বেচ্ছাদানকে গ্রহণ করে না। তবে কেউ কেউ বলেনঃ ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে ছহীহ হবে না. আর ছাহেবায়নের মতে ছহীহ হবে। বস্তুত মুকাতাবের অছিয়তের এই মাসআলাটিকে ঐ মুকাতাবের দিকে প্রত্যাবর্তিত করা হয়েছে, যে বলে যে, ভবিষ্যতে আমি যে কোন গোলামের মালিক, সে আযাদ হবে। এরপর সে মুক্তিলাভ করলো এবং গোলামের মালিক হলো। এ বিষয়ে মতপার্থক্যটি সুপরিচিত এবং যথাস্থানে তা আলোচিত হয়েছে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ গর্ভস্থ সন্তানের অনুকূলে এবং (দাসীর) গর্ভস্থ সন্তান সম্পর্কে অছিয়ত করা জাইয হবে, যদি অছিয়তের সময় থেকে ছয় মাসের কম সময়ে সে জন্ম লাভ করে।

প্রথমটির ক্ষেত্রে কারণ এই যে, অছিয়ত করার অর্থ এক হিসাবে স্থলবর্তী নিয়োগ করা (বর্তমানে মালিক বানানো নয়)। কেননা অছিয়তকারী তাকে নিজের আংশিক সম্পদের ক্ষেত্রে স্থলবর্তী বানাচ্ছে। আর জানীন (গর্ভস্থ সন্তান) মীরাছের ক্ষেত্রে স্থলবর্তী হতে পারে। সুতরাং অছিয়তের ক্ষেত্রেও হতে পারবে। কেননা অছিয়ত মীরাছের সমগোত্রীয়। তবে পার্থক্য এই যে, অছিয়ত (কবুল না করে) রদ করলে রদ হয়ে যায়। কেননা অছিয়ত করার মধ্যে অছিয়তকারীর পক্ষ হতে মালিক বানানোর অর্থ রয়েছে।

(গর্ভস্থ সন্তানকে কোন কিছু) হেবা করার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, হেবা করার অর্থ নিছক মালিকানা প্রদান (স্থলবর্তীকরণ নয়।) আর তার উপর কারো কর্তৃত্ব নেই, যাতে সে তাকে কোন কিছুর মালিক বানাতে পারে।

দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে কারণ এই যে, সে (দুনিয়াতে) অস্তিত্ব লাভের পথে রয়েছে। কেননা আমাদের আলোচনা হচ্ছে ঐ অবস্থায়, যখন অছিয়ত করার সময় তার অস্তিত্ব ছিল বলে নিশ্চিতভাবে জানা যায়। আর মৃতব্যক্তির প্রয়োজন ও অপরাগতার প্রেক্ষিতে অছিয়তের বিষয়টি অতি প্রশস্ত।) এ কারণে এটা অস্তিত্বহীন বস্তুর ক্ষেত্রেও সিদ্ধ হয়। যেমন (গাছের) ফল (না আসা অবস্থায় অছিয়ত করা)। সুতরাং অস্তিত্বসম্পন্ন বস্তুর ক্ষেত্রে আরো স্বাভাবিক কারণেই তা সিদ্ধ হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেনঃ কেউ যদি কোন দাসী সম্পর্কে তার গর্ভস্থ সন্তানটিকে বাদ দিয়ে অছিয়ত করে তাহলে অছিয়তও সিদ্ধ হবে এবও বাদ দেয়াও সিদ্ধ হবে।

কেননা, দাসী শব্দটি শব্দগতভাবে গর্ভস্থ সন্তানকে অন্তর্ভুক্ত করে না। তবে নিঃশর্ত উচ্চারণের কারণে অনুবর্তী রূপে গর্ভস্থ সন্তান (অছিয়ত প্রাপ্ত ব্যক্তির) প্রাপ্য হয়ে যায়। সুতরাং অছিয়তের ক্ষেত্রে যখন যাকে পৃথকভাবে উল্লেখ করবে, তখন তার পৃথকীকরণ সিদ্ধ হবে।

তাছাড়া আরেকটি যুক্তি এই যে, গর্ভস্থ সন্তান সম্পর্কে পৃথকভাবে অছিয়ত করা যায়। সুতরাং অছিয়ত থেকে তার বাদ দেয়াও সিদ্ধ হবে। আর এটাই মূলনীতি যে, যেটাকে আলাদাভাবে চুক্তিভুক্ত করা যায়, সেটাকে চুক্তি থেকে বাদ ও দেয়া যায়। কেননা উভয়ের মাঝে কোন পার্থক্য নেই।[১] আর যেটাকে পৃথকভাবে চুক্তিভুক্ত করা সিদ্ধ নয়, সেটাকে চুক্তি থেকে বাদ দেয়াও সিদ্ধ নয়। বিক্রয় পর্বে (ফাসিদ বিক্রয় অধ্যায়) এই মূলনীতি আলোচিত হয়েছে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেনঃ আর অছিয়তকারীর জন্য অছিয়ত প্রত্যাহার করা জাইয।

কেননা এটা হলো স্বেচ্ছাদান, যা এখনো পূর্ণতা লাভ করেনি। সুতরাং তা থেকে ফিরে আসা জাইয হবে। হেবার ক্ষেত্রে যেমন হয়ে থাকে। হেবা অধ্যায়ে বিষয়টিকে আমরা সুপ্রমাণিত করে এসেছি।

তাছাড়া আরেকটি কারণ এই যে, অছিয়ত প্রাপ্ত ব্যক্তির অছিয়ত কবুল করার বিষয়টি অছিয়তকারীর মৃত্যুর উপর নির্ভর করে। আর ঈজাব (বা প্রস্তাব) কবুল করার আগে তা বাতিল করা যায়। বিক্রয়ের ক্ষেত্রে যেমন হয়ে থাকে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেনঃ যখন সে স্পষ্টভাষায় প্রত্যাহার করবে কিংবা এমন কাজ করে, যা প্রত্যাহার প্রমাণ করে তখন সেটা প্রত্যাহারযোগ্য বলে গণ্য হবে।

স্পষ্টভাষায় প্রত্যাহারের বিষয়টি তো পরিষ্কার। আচরণের মাধ্যমে পরোক্ষ প্রত্যাহারের বিষয়টিও একই রকম। কেননা সেটা প্রত্যক্ষের অনুরূপ ক্রিয়া করে। সুতরাং সেটা তার স্পষ্টবক্তব্য 'বাতিল করলাম'–এর স্থলবর্তী হবে। আর বিষয়টি ইখতিয়ারের শর্তসম্বলিত বিক্রয়ের মত হবে। কেননা সে ক্ষেত্রেও পরোক্ষ প্রমাণ দ্বারা ইখতিয়ার বাতিল হয়ে যায়।

এরপর যে সমস্ত হস্তক্ষেপ মানুষ অন্যের মালিকানায় করে, তা দ্বারা মালিকের মালিকানা রহিত হয়ে যায়। অছিয়তকারী যদি ঐ হস্তক্ষেপ অছিয়তকৃত বস্তুটিতে করে, তাহলে সেটা 'অছিয়ত প্রত্যাহার' প্রমাণ করবে। গছব (যা জবর দখল) অধ্যায়ে আমরা ঐ হস্তক্ষেপগুলো উল্লেখ করেছি। আর যে সমস্ত হস্তক্ষেপ অছিয়তকৃত বস্তুতে বৃদ্ধি ঘটায় এবং ঐ বর্ধিত বস্তুটি ছাড়া মূল বস্তুটি অর্পণ করা সম্ভব না হয়, সেটাও প্রত্যাহার বলেই গণ্য হবে, যদি অছিয়তকারী নিজে তা করে থাকে। যেমন ছাতুতে ঘী মাখানো এবং ভিটায় অছিয়তকারী ঘর বানালো। আর (অছিয়তকৃত) তুলা গরম পোশাকে ভরে সেলাই করলো এবং অছিয়তকৃত কাপড়কে জামার ভিতরের আবরণ যা বাইরের আচরণ রূপে সেলাই করলো। কেননা এগুলোকে সংযোজিত ও বর্ধিত অংশ ছাড়া অর্পণ করা সম্ভব নয়। এবং সেগুলোকে বিযুক্ত করাও সম্ভব নয়। আর এই হস্তক্ষেপ অছিয়তকারীর পক্ষ হতে তার নিজস্ব মালিকানায় সম্পন্ন হয়েছে।

অছিয়তকৃত বাড়ীতে চুনা লাগানো এবং বাড়ীতে দেয়াল ভাঙ্গার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা সেটা মূল অছিয়তকৃত বস্তুর অনুবর্তী বস্তুতে হস্তক্ষেপ (সুতরাং তা দ্বারা প্রত্যাহার সাব্যস্ত হবে না।)

---

১. কেননা দু'টোই নির্ভর করে বস্তুটি নির্দিষ্ট হওয়ার উপর। সুতরাং অজ্ঞাত বস্তুর চুক্তিভুক্তি যেমন সিদ্ধ নয়, তেমনি চুক্তি থেকে অজ্ঞাত বস্তু বাদ দেয়াও সিদ্ধ নয়।

আর যে **সমস্ত হস্তক্ষেপ** অছিয়তকারীর মালিকানা বিলুপ্ত করে, তা প্রত্যাহার বলে গণ্য হবে। যেমন কেউ অছিয়তকৃত বস্তুটি বিক্রি করলো, এর পর তা ক্রয় করলো কিংবা কাউকে তা হেবা করলো তারপর তা প্রত্যাহার করলো। কেননা অসিয়ত শুধু তার নিজের মালিকানায় কার্যকর হয়। সুতরাং মালিকানা বিলুপ্ত করার অর্থ হবে প্রত্যাহার করা।

আর অসিয়কৃত বকরী জবাই করার অর্থ হবে অসিয়ত প্রত্যাহার করা। কেননা সাধারণত নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করার জন্য জবাই করা হয়। সুতরাং নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করার বিষয়টিও এক্ষেত্রে একটি মূলনীতি হলো।

অসিয়তকৃত কাপড় ধোয়া দ্বারা প্রত্যাহার সাব্যস্ত হবে না। কেননা, কেউ যখন অন্যকে কাপড় দেয়ার ইচ্ছা করে, তখন সাধারণত সেটা সে ধুয়ে দেয়। সুতরাং এর অর্থ হবে অছিয়তকে স্থিরকরণ।

ইমাম কুদূরী (র) বলেনঃ কেউ যদি অসিয়ত করার কথা অস্বীকার করে, তবে তা প্রত্যাহার বলে গণ্য হবে না।

ইমাম মুহম্মদ (র) এমনই উল্লেখ করেছেন। আর ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেনঃ এটা প্রত্যাহার বলে গণ্য হবে।

কেননা প্রত্যাহার করার অর্থ হলো বর্তমানে অছিয়তকে নাকচ করা। আর অস্বীকার করার অর্থ হলো বিগত ও বর্তমান উভয় সময়ে অছিয়তকে নাকচ করা। সুতরাং সেটা দ্বারা প্রত্যাহার সাব্যস্ত হওয়া আরো স্বাভাবিক।

ইমাম মুহম্মদ (র) এর যুক্তি এই যে, অস্বীকার করার অর্থ হলো শুধু বিগত সময়ে অছিয়তকে নাকচ করা। আর বর্তমানে সেটার অস্তিত্ব হচ্ছে বিগত অনস্তিত্বের অব্যাহত থাকার অনিবার্য প্রয়োজন।

আর (মূল ঘটনা, অসিয়ত করার পর অস্বীকার করা হওয়ার কারণে বর্তমানে তার মিথ্যাচার যখন সাব্যস্ত হলো তখন তার অস্বীকৃতি অর্থহীন হবে। (সুতরাং তার অনিবার্যতা বলে সাব্যস্ত বিষয়টাও বাতিল হবে।)

কিংবা প্রত্যাহার অর্থ বিগত সময়ে সাব্যস্ত করা এবং বর্তমানে নাকচ করা। আর অস্বীকার অর্থ বিগত সময়ে এবং বর্তমানে নাকচ করা। তাহলে এই দাঁড়াল যে, প্রত্যাহার অর্থ বিগত সময়ে সাব্যস্ত করা, আর অস্বীকার অর্থ বিগত সময়ে নাকচ করা। সুতরাং (দুটোয় বৈপরিত্যের কারণে) অস্বীকার দ্বারা প্রকৃতপক্ষে প্রত্যাহার সাব্যস্ত হবে না।

এজন্যই বিবাহ অস্বীকার করা বিচ্ছেদ বলে গণ্য হবে না।[১]

আর যদি অসিয়তকারী বলে ঃ অমুকের নামে যত অসিয়ত করেছি তা হারাম এবং রিবা, তাহলে একথা দ্বারা প্রত্যাহার সাব্যস্ত হবে না।

---

১. অর্থাৎ অস্বীকারকে তালাকের বিকল্প শব্দ রূপে গ্রহণ করা হবে না। কেননা, অস্বীকার বিগত সময়ে বিবাহের অনস্তিত্ব দাবী করে, আর তালাক বিগত সময়ে বিবাহের অস্তিত্ব দাবী করে।

কেননা, বিশেষিতকরণ মূল্যের বিদ্যমানতা প্রমাণ করে। পক্ষান্তরে যদি সে বলে যে তা বাতিল, তাহলে প্রত্যাহার সাব্যস্ত হবে। কেননা বাতিল অর্থ বিলুপ্ত ও নিশ্চিহ্ন।

আর যদি বলেঃ অসিয়তটিকে আমি বিলম্বিত করে দিয়েছি, তাহলে প্রত্যাহার হবে না। কেননা বিলম্বিতকরণ রহিত হওয়ার জন্য। যেমন ঋণকে বিলম্বিত করা। পক্ষান্তরে যদি লে পরিত্যাগ করেছি, তাহলে প্রত্যাহার হবে। কেননা এর অর্থ হলো রহিতকরণ।

আর যদি বলে ঃ যে গোলাম আমি অমুকের জন্য অসিয়ত করেছি সেটা অমুকের জন্য তাহলে এটা প্রত্যাহার বলো গণ্য হবে। কেননা শব্দটি শরীকানা কর্তন প্রমাণ করে। পক্ষান্তরে যদি একজন লোকের নামে একটি গোলাম অসিয়ত করে। তারপর একই গোলাম একজন লোকের নামে অসিয়ত করে, তাহলে শরীকানা সাব্যস্ত হবে। কেননা অসিয়তের পাত্র তথা গোলাম শরীকানার সম্ভাবনা ও উপযোগিতা রাখে। এবং শব্দটিও শরীকানা প্রকাশের উপযোগী। তদ্রূপ যদি বলেঃ যে সমস্ত অসিয়ত আমি অমুকের জন্য করেছি, তা আমার ওয়ারিছ অমুকের জন্য, তাহলে তা প্রথম জন থেকে প্রত্যাহার হবে। এর কারণ আমরা বর্ণনা করেছি। আর সেটা ওয়ারিছদের অনুকূলে অসিয়ত হবে এবং তার বিধান আমরা আলোচনা করেছি।

আর যদি বলেঃ আমি যে সমস্ত অসিয়ত অমুককে করেছি, তা অন্য অমুকের জন্য অথচ একথা বলার সময় সেই অমুক মৃত ছিল, তাহলে প্রথম অসিয়ত স্বঅবস্থায় বহাল থাকবে।

কেননা প্রথম অসিয়তটি বাতিল হয়, তা দ্বিতীয় জনের জন্য সাব্যস্ত হওয়ার অনিবার্য প্রয়োজনে। কিন্তু এখানে তো দ্বিতীয় জনের জন্য সাব্যস্ত হয়নি। সুতরাং প্রথম জনের জন্যই বহাল থেকে যাবে। পক্ষান্তরে যদি ঐ কথা বলার সময় অমুক জীবিত থাকে, এরপর অসিয়তকারীর মৃত্যুর আগে সে মারা যায়, তাহলে উভয় অসিয়ত বাতিল হওয়ার কারণে সেটা ওয়ারিছদের জন্য হয়ে যাবে। প্রথমটি বাতিল হবে প্রত্যাহারের কারণে, আর দ্বিতীয়টি বাতিল হবে মৃত্যুর কারণে। আল্লাহ অধিক অবগত।

একতৃতীয়াংশ মালের অসিয়ত প্রসঙ্গ

ইমাম কুদূরী (র) বলেনঃ কেউ যদি কোন লোকের অনুকূলে তার মালের এক তৃতীয়াংশ অসিয়ত করে আবার অন্য এক জনের অনুকূলে তার মালের এক তৃতীয়াংশ অসিয়ত করে আর ওয়ারিছগণ তা অনুমোদন না করে, তাহলে একতৃতীয়াংশ উভয়ের মাঝে বণ্টিত হবে।

কেননা পূর্বে যেমন আলোচনা হয়েছে, সে অনুযায়ী ওয়ারিছদের অনুমোদন ছাড়া যেহেতু অসিয়ত এক তৃতীয়াংশ থেকে বাড়ানো যাবে না, সেহেতু এক তৃতীয়াংশ উভয়ের প্রাপ্য হক থেকে কম হবে। অথচ হকদার হওয়ার কারণের ক্ষেত্রে উভয়ে সমান; সুতরাং হকদার হওয়ার ক্ষেত্রেও সমান হবে। আর পাত্রটি শরীকানা গ্রহণ করে। সুতরাং তা উভয়ের মাঝে শরীকানাভুক্ত হবে।

আর যদি দুজনের একজনের জন্য একতৃতীয়াংশের অসিয়ত করে, আর অপর জনের জন্য এক ষষ্ঠাংশের অসিয়ত করে, তাহলে এক তৃতীয়াংশ উভয়ের মাঝে তিনভাগ হবে।

কেননা উভয়ের প্রত্যেকে বিশুদ্ধকরণ দ্বারা ভাগ বাসিয়েছে অথচ এক তৃতীয়াংশ উভয়ের হক থেকে কম। সুতরাং একতৃতীয়াংশকে উভয়ে নিজেদের হকের পরিমাণ অনুযায়ী বণ্ট করে নেবে। (মৃতের পাওনাদারদের ক্ষেত্রে যেমন হয়ে থাকে। সুতরাং অল্পতরটিকে একভাগ এবং অধিকতর (দ্বিগুণ) কে দুই ভাগ ধরা হবে। এভাবে তিন ভাগ হলো। তন্মধ্যে এক ভাগ হবে অল্পতর হিসসার এর অধিকারীর জন্য এবং দুইভাগ হবে অধিকতর হিসসার অধিকারীর জন্য।

আর যদি দু'জনের একজনের জন্য সমস্ত মালের অসিয়ত করে, আর অপর জনের জন্য মালের একতৃতীয়াংশের অসিয়ত করে আর ওয়ারিছগণ তা অনুমোদন না করে তাহলে ছাহেবায়নের মতে উভয়ের মাঝে চারভাগ করে বণ্টিত হবে। আর ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন ঃ এক তৃতীয়াংশ উভয়ের মাঝে অর্ধেক করে বণ্টিত হবে।

আর ইমাম আবু হানীফা (র) এক তৃতীয়াংশের বেশী অসিয়তপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে অতিরিক্ত অংশ দান করেন না। তবে (তিনটি ক্ষেত্রে অর্থাৎ) محاباة (বা মূল্যহাস

করণ)[১] এবং سِعَايَة (বা উপার্জন প্রচেষ্টা) এবং اَلدَّرَاهِمُ الْمُرْسَلَةُ (অনির্ধারিত দিরহাম)[২] এর ক্ষেত্রে।

মতপার্থক্যপূর্ণ ছুরতে ছাহেবায়নের যুক্তি এই যে, অছিয়তকারী (একজনের অনুকূলে সমগ্র মালের অসিয়ত করা দ্বারা) দুটি জিনিসের ইচ্ছা করেছে, প্রথমত অছিয়তপ্রাপ্ত ব্যক্তি সমগ্র মালের হকদার হওয়া, দ্বিতীয়ত তাকে অপর অছিয়তপ্রাপ্ত ব্যক্তির উপর প্রাধান্য প্রদান করা। এর মধ্যে সমগ্র মালের হকদার হওয়া তো ওয়ারিছদের হকের কারণে নিষিদ্ধ হয়েছে। তাতে (অপর অসিয়ত প্রাপ্ত ব্যক্তির উপর) প্রাধান্য প্রদানের ব্যাপারে কোন প্রতিবন্ধক নেই। সুতরাং প্রাধান্য সাব্যস্ত হবে। যেমন مُحَابَاةٌ বা মূল্য হ্রাসকরণ ও তার সমগোত্রীয় অন্য দুটি মাসআলার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে।

ইমাম আবু হানীফা (রঃ) এর যুক্তি এই যে, ওয়ারিছদের পক্ষ হতে অনুমোদন না থাকার (ক্ষেত্রে বলতে হবে যে,) উক্ত অসিয়ত শরীয়ত সম্মত হয়নি। কেননা কোন অবস্থাতেই অসিয়ত কার্যকর হবে না। সুতরাং হকদারি মূলতই বাতিল হয়ে যাবে। আর প্রধান্যের বিষয়টি তো হকদারির অন্তর্গত হয়ে সাব্যস্ত হবে। সুতরাং হকদারি বাতিল হওয়ার কারণে প্রাধান্যদানের বিষয়টিও বাতিল হয়ে যাবে। যেমন বিক্রয়ের অন্তর্গত রূপে সাব্যস্ত مُحَابَاةٌ (বা মূল্যহ্রাসকরণ–যা বিক্রয় সিদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে সিদ্ধ হয়, আর

১. مُحَابَاةٌ এর সূরত এই যে, মৃত্যুরোগীর দুটি গোলাম ছিল, একটির মূল্য এগারশ দিরহাম, অন্যটির মূল্য ছয়শ দিরহাম। এমতাবস্থায় সে অসিয়ত করলো যে, দুটি গোলামের একটিকে অমুকের কাছে একশ দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করা হয়, আর অন্যটি অন্য অমুকের কাছে একশ দিরহামে বিক্রি করা হয়। ফলে এখানে একজনের অনুকূলে এক হাজার দিরহামের এবং অন্যজনের অনুকূলে পাঁচশ দিরহামের মূল্যহ্রাস হলো। যেহেতু এটা মৃত্যুরোগের সময়ের ঘটনা, সেহেতু এভাবেই হবে অসিয়ত। এখন যদি এই দুটি গোলাম ছাড়া তার কোন মাল না থাকে, আর ওয়ারিছগণ তা অনুমোদন না করে, তাহলে সম্পদের এক তৃতীয়াংশ পরিমাণের ক্ষেত্রে মূল্যহ্রাসকরণ সিদ্ধ হবে এবং এই তৃতীয়াংশ সম্পদের এক তৃতীয়াংশ পরিমাণের ক্ষেত্রে মূল্যহ্রাসকরণ সিদ্ধ হবে এবং এই তৃতীয়াংশ উভয়ের মাঝে তিনভাগ হিসাবে বণ্টিত হবে। এক হাজারের অসিয়ত প্রাপ্ত ব্যক্তিকে তার অসিয়তের পরিমাণ হিসাবে এবং পাঁচশ-এর অসিয়ত প্রাপ্ত ব্যক্তিকে তার অসিয়তের পরিমাণ হিসাবে উক্ত তৃতীয়াংশের ভাগ প্রদান করা হবে। সুতরাং যার অনুকূলে এক হাজারের মূল্যহ্রাস ছিল, সে তৃতীয়াংশের দুই তৃতীয়াংশ নিবে। আর যার অনুকূলে পাঁচশ দিরহামের মূল্যহ্রাস ছিল, সে তৃতীয়াংশের একতৃতীয়াংশ নিবে। কেননা একহাজার হলো পনেরশ এর দুই তৃতীয়াংশ। কিন্তু এটা যদি ইমাম আবু হানীফা (রহ) এর মতে অন্য সমস্ত অসিয়তের মত হতো, তাহলে অসিয়ত প্রাপ্ত ব্যক্তিকে একতৃতীয়াংশের বেশী ভাগ না দেয়া আবশ্যক হতো।

২. اَلدَّرَاهِمُ الْمُرْسَلَةُ (বা অনির্ধারিত দিরহামের) সূরত এই যে, একজনের জন্য দুই হাজার দিরহামের এবং অন্যজনের জন্য এক হাজার দিরহামের অসিয়ত করলো আর তার সম্পদের এক তৃতীয়াংশের পরিমাণ হলো এক হাজার দিরহাম। এ অবস্থায় ওয়ারিছগণ যদি অসিয়ত অনুমোদন না করে, তাহলে এই তৃতীয়াংশ উভয়ের মাঝে তিনভাগ করে বণ্টন করা হবে এবং উভয়ের প্রত্যেকে তার অনুকূলে কৃত সমগ্র অসিয়ত অনুযায়ী ভাগ লাভ করবে; কেননা কৃত অসিয়ত দু'টি তাদের সূত্রগত দিক থেকে সিদ্ধ রয়েছে; কেননা এই পরিমাণ ছাড়াও তার অন্য মাল থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। তখন এই পরিমাণই তৃতীয়াংশ থেকে বের হয়ে আসতে পারে। পক্ষান্তরে যদি এক জনের জন্য তার সম্পদের তৃতীয়াংশের অসিয়ত করে, আর অন্য জনের জন্য অর্ধেক মালের বা সমগ্র মালের অসিয়ত করে, তাহলে কথিত শব্দটি সূত্রগত দিক থেকে বৈধ হবে না; কেননা আরো মাল যদি বের হয়, তাহলে সেটাও তো কথিত শর্তের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

বিক্রয় বাতিল হওয়ার ক্ষেত্রে তা বাতিল হয়ে যায়।) সর্বসম্মত ক্ষেত্রে তিনটির বিষয় ভিন্ন। কেননা সামগ্রিকভাবে ওয়ারিছদের অনুমোদন ছাড়াও সেগুলোর কার্যকারিতা রয়েছে, যেমন অছিয়তের বাইরে যদি অতিরিক্ত সম্পদ থাকে। সুতরাং প্রাধান্যদানের ক্ষেত্রে বিবেচ্য হবে। কেননা ক্ষেত্র বিশেষে তা শরিয়তসম্মত হয়েছে। আমাদের আলোচ্য ক্ষেত্রটি তা থেকে ভিন্ন।

আর অনির্ধারিত দিরহাম বিক্রি করার এই মাসআলাটি ঐ ছুরতের বিপরীত, যখন সে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির কোন নির্দিষ্ট বস্তু (যেমন গোলাম বা ঘোড়া) সম্পর্কে অসিয়ত করে, আর তার মূল্য মোট সম্পদের একতৃতীয়াংশ থেকে বেশী হয়, তখন অসিয়ত প্রাপ্ত ব্যক্তি শুধু এক তৃতীয়াংশ হিসাবে ভাগ পাবে, যদিও সম্ভাবনা আছে যে, পরবর্তীতে কোন ভাবে মাল রেখে গেল এবং অছিয়তকৃত বস্তু সমগ্র সম্পদের এক তৃতীয়াংশ থেকে বের হয়ে এলো। কেননা সেখানে অসিয়ত প্রাপ্ত ব্যক্তির হক নির্ধারিত পরিত্যক্ত সম্পত্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়। প্রমাণ এই যে, যদি ঐ নির্ধারিত বস্তু ধ্বংস হয়ে যায়, আর অছিয়তকারী অন্যমাল লাভ করে, তাহলেও অসিয়ত বাতিল হয়ে যায়। পক্ষান্তরে অনির্ধারিত এক হাজার দিরহাম যদি ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে পরবর্তীতে অর্জিত দিরহামে অসিয়ত কার্যকর থাকবে। সুতরাং এক্ষেত্রে অসিয়ত প্রাপ্ত ব্যক্তির হক হুবহু ঐ জিনিসের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয় না, যার সাথে ওয়ারিছদের হক সম্পৃক্ত হয়েছে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেনঃ কেউ যদি তার পুত্রের প্রাপ্য অংশের অসিয়ত করে, তাহলে অসিয়ত বাতিল হবে। পক্ষান্তরে যদি পুত্রের প্রাপ্য অংশের সমপরিমাণের অসিয়ত করে, তাহলে অসিয়ত সিদ্ধ হবে।

কেননা, প্রথমটির অর্থ হলো অন্যের মাল সম্পর্কে অসিয়ত করা। কারণ পুত্রের প্রাপ্য অংশ' হচ্ছে তা, যা মৃত্যুর পর পুত্র লাভ করবে। (আর অন্যের মাল অসিয়ত করা বৈধ নয়) পক্ষান্তরে দ্বিতীয়টির অর্থ হলো, পুত্রের প্রাপ্য অংশের সদৃশ বা সমপরিমাণের অসিয়ত করা। আর কোন বস্তুর সদৃশ বা সমপরিমাণ হুবহু ঐ বস্তু নয়। যদিও সেটা তার পরিমাণ দ্বারা নিরূপিত হয়, সুতরাং তা বৈধ হবে। আর ইমাম যুফার (র) বলেনঃ প্রথম ছুরতেও জাইয হবে। অর্থাৎ তিনি বর্তমান অবস্থা বিবেচনা করেছেন। আর বর্তমান অবস্থায় সবটাই তো তার মাল। এর জবাব সেটাই, যা আমরা বলেছি।

ইমাম কুদূরী (র) বলেনঃ কেউ যদি তার মালের এক ভাগ কারো জন্য অসিয়ত করে, তাহলে ওয়ারিছদের হিস্‌সা সমূহের সর্বনিম্ন হিস্‌সা তার প্রাপ্য হবে। তবে যদি তা ষষ্ঠাংশেরও কম হয়, তাহলে তাকে ষষ্ঠাংশপূর্ণ করে দেয়া হবে, তার চেয়ে বৃদ্ধি করা হবে না। এটা ইমাম আবু হানীফা (র) এর মত। ছাহেবায়ন বলেনঃ ওয়ারিছদের সর্বনিম্নজনের হিস্‌সা তার প্রাপ্য হবে। (আর সেটা ষষ্ঠাংশের বেশী হলে বেশী দেয়া হবে) তবে তা এক তৃতীয়াংশের বেশী করা হবে না। অবশ্য ওয়ারিছরা অনুমোদন করলে ভিন্ন কথা।

কেননা 'ভাগ বা হিস্‌সা' শব্দ দ্বারা লোক প্রচলনে ওয়ারিছদের হিসসাসমূহের একটিই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। বিশেষত অসিয়তের ক্ষেত্রে আর সর্বনিম্নটি সুনিশ্চিত। সুতরাং শব্দটিকে সেদিকেই ফিরানো হবে। তবে যদি একতৃতীয়াংশের বেশী হয়, তাহলে এক তৃতীয়াংশের দিকে তা ফিরানো হবে। কেননা ওয়ারিছদের অনুমোদনহীনতার ক্ষেত্রে তার চেয়ে বেশী করার সুযোগ নেই।

ইমাম আবু হানীফা (র) এর যুক্তি এই যে, হিস্‌সা বা ভাগ দ্বারা এক ষষ্ঠাংশই উদ্দেশ্য হয়। এবনে মসউদ (র) হতে সেটাই বর্ণিত হয়েছে। আর এক বর্ণনায় এটাকে তিনি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত উন্নীত করেছেন।

তাছাড়া হিসসা বা ভাগ শব্দ উল্লেখ করে তা দ্বারা এক সষ্ঠাংশ উদ্দেশ্য করা হয়। কেননা বসরার কাযী ইয়ায (র) বলেছেনঃ সাহমের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে এক ষষ্ঠাংশ। আবার সাহম বা ভাগ উল্লেখ করে ওয়ারিছদের ভাগও বুঝানো হয়ে থাকে। সুতরাং আমরা যেটা বলেছি, সেটাই তাকে প্রদান করা হবে।

আমাদের মাশায়েখগণ বলেছেনঃ এটা হলো কুফার লোকদের প্রচলন। পক্ষান্তরে আমাদের প্রচলনে جُزْءٌ বা অংশ এবং سَهْمٌ বা হিস্‌সা সমার্থক হবে।

আর যদি সে তার মালের 'একটি অংশের' অসিয়ত করে, তাহলে ওয়ারিছদেরকে বলা হবে যে, তোমরা তাকে যে পরিমাণ তোমাদের ইচ্ছা, তা দিয়ে দাও।

কেননা শব্দটি পরিমাণ অজ্ঞাত শব্দ, যা অল্প ও বেশী সবটাকে অন্তর্ভুক্ত করে। তবে পরিমাণের অজ্ঞতা অছিয়তের সিদ্ধতাকে রোধ করে না। আর অছিয়তকারীর মৃত্যুর পর ওয়ারিছরা হল তার স্থলাভিষিক্ত, সুতরাং পরিমাণ নির্ধারণের ভার তাদের দিকেই প্রত্যাবর্তিত হবে। **আর কেউ যদি বলেঃ আমার মালের এক ষষ্ঠাংশ অমুকের। তারপর সেই মজলিসে বা অন্য মজলিসে যদি বলে, আমার মালের এক তৃতীয়াংশ তার জন্য। আর ওয়ারিছগণ যদি তা অনুমোদন করে, তাহলে মালের এক তৃতীয়াংশ তার জন্য হবে এবং এক ষষ্ঠাংশ তাতে একীভূত হয়ে যাবে।**

আর কেউ যদি বলেঃ আমার মালের এক ষষ্ঠাংশ অমুকের। তারপর সেই মজলিসে বা অন্য মজলিসে সে বলে, আমার মালের এক ষষ্ঠাংশ অমুকের; তাহলে সর্বমোট একষষ্ঠাংশই তার প্রাপ্য হবে।

কেননা মালের দিকে সম্বন্ধযুক্ত অবস্থায় নির্দিষ্ট করেই ষষ্ঠাংশকে সে উল্লেখ করেছে। আর নির্দিষ্ট শব্দকে পুনরুক্ত করলে দ্বিতীয়টি দ্বারা হুবহু প্রথমটি উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। ভাষার ব্যাকরণে এটাই স্বীকৃত বিষয়।

ইমাম কুদূরী (র) বলেনঃ কেউ যদি তার দিরহামের এক তৃতীয়াংশ কিংবা তার মেষপালের এক তৃতীয়াংশ (কারো নামে) অসিয়ত করে এরপর ঐ দিরহামের বা মেষপালের দুই তৃতীয়াংশ ধ্বংস হয়ে যায় এবং শুধু এক তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকে, আর তার অছিয়তকারী অবশিষ্ট মালের এক তৃতীয়াংশ থেকে বের হয়ে

আসে তাহলে (দিরহাম বা মেষপালের) অবশিষ্ট সমগ্রটুকু অছিয়তপ্রাপ্ত ব্যক্তির হবে।

ইমাম যুফার (র) বলেনঃ সে (দিরহাম বা মেষপালের) অবশিষ্টের এক তৃতীয়াংশ পাবে।

কেননা, ধ্বংস প্রাপ্ত ও অবশিষ্ট সম্পদের প্রতিটিতে ওয়ারিছ ও অসিয়ত প্রাপ্ত সকলে শরীক বলে গণ্য হবে। আর যৌথ সম্পদের যতটুকু নষ্ট হয় শরিকানার ভিত্তিতেই নষ্ট হয়। আর যা অবশিষ্ট থাকে, সেটাও শরীকানার ভিত্তিতেই অবশিষ্ট থাকে। আর বিষয়টি ঐ অবস্থার মত হলো, যখন উত্তরাধিকার সম্পত্তি বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত হয়।[১]

আমাদের যুক্তি এই যে, একশ্রেণীর সম্পদের ক্ষেত্রে শরীকদারদের একজনের (ব্যাপ্ত) হককে একটি অংশে একত্র করা সম্ভব। একারণেই এক শ্রেণীর সম্পদের ক্ষেত্রে (শরীকদারদের বা কোন একজনের দাবীর মুখে) বাধ্যতামূলক বণ্টন কার্যকর হয়। আর বণ্টন মানেই হলো ব্যাপ্ত হককে এক স্থানে সংকুচিত করে আনা। আর অসিয়ত অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য, তাই অছিয়তের ব্যাপ্ত হককে অবশিষ্ট একক-এ (তথা একতৃতীয়াংশে) একত্র করেছি। আর দিরহামগুলো এক দিরহামের মত হয়ে গেলো।[২]

বিভিন্ন শ্রেণীর সম্পদ থাকার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা সেখানে বাধ্যতামূলক বণ্টনের দিক থেকেও (বিভিন্ন শ্রেণীর সম্পদে ব্যাপ্ত হককে একটি শ্রেণীর মালের মাঝে) একত্র করা সম্ভব নয়। সুতরাং অগ্রাধিকার রক্ষার দিক থেকে ব্যাপ্ত হককে একত্র করা সম্ভব হবে না।

ইমাম কুদূরী (র) বলেনঃ কেউ যদি তার কাপড়সমূহের এক তৃতীয়াংশের অসিয়ত করে, এরপর এর দুই তৃতীয়াংশ নষ্ট হয়ে যায়, শুধু এক তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকে, আর তা তার অবশিষ্ট মালের তৃতীয়াংশ থেকে বের হয়ে আসে, তাহলে অবশিষ্ট কাপড়ের এক তৃতীয়াংশ শুধু সে পাবে।

মাশায়েখে কিরাম বলেছেনঃ এ বিধান তখন হবে, যখন কাপড়গুলো বিভিন্ন শ্রেণীর হয়। পক্ষান্তরে যদি একই শ্রেণীর হয়, তাহলে সেটা দিরহামসমূহের পর্যায়ভুক্ত হবে। পাত্র পরিমাপিত ও পাল্লা পরিমাপিত বস্তুও দিরহাম সমূহের পর্যায়ভুক্ত হবে।

কেননা এক্ষেত্রেও (শরীকদারদের কোন একজনের দাবীর মুখে) বাধ্যতামূলক বণ্টনের ভিত্তিতে ব্যাপ্ত হককে একত্রীকরণ কার্যকর হয়।

---

১. যেমন কারো উটপাল, গরুর পাল ও মেষপাল আছে, আর সে এই সম্পদগুলোর এক তৃতীয়াংশ অসিয়ত করলো, এরপর তিনটি পালের দুটি পাল ধ্বংস হয়ে গেল, একটি পাল শুধু অবশিষ্ট থাকলো। এমতাবস্থায় সর্বসম্মতিক্রমে অসিয়ত প্রাপ্ত ব্যক্তি ঐ অবশিষ্ট পালের এক তৃতীয়াংশ পাবে।

২. অর্থাৎ দিরহাম সমূহের এক তৃতীয়াংশের অসিয়ত, তিন দিরহাম থেকে একটি দিরহাম অসিয়ত করার মত হলো। সেক্ষেত্রে যদি দুটি দিরহাম নষ্ট হয়ে যায়, এবং অবশিষ্ট দিরহামটি তার সমগ্র সম্পদের এক তৃতীয়াংশ থেকে বের হয়ে আসে, তাহলে উক্ত দিরহামটি অসিয়ত প্রাপ্ত হয়, সুতরাং এখানে আলোচ্য ক্ষেত্রেও তাই হবে।

আর যদি সে তার তিনটি গোলামের এক তৃতীয়াংশের অসিয়ত করে এরপর দুটি গোলাম মারা যায়, তাহলে অসিয়ত প্রাপ্ত ব্যক্তি শুধু অবশিষ্টটির এক তৃতীয়াংশ পাবে। বিভিন্ন বাড়ীর ক্ষেত্রেও একই বিধান।

কারো কারো মতে, এটা হলো ইমাম আবু হানীফা (র) এর অভিমত। কেননা বাড়ী ও গোলামের ক্ষেত্রে তিনি (শরীকদারের দাবীর মুখে) বাধ্যতামূলক বন্টন বৈধ মনে করেন না।

আর কারো কারো মতে, এটা হলো সবার অভিমত। কেননা ছাহেবায়নের মতে, কাযীর ইজতিহাদ করার এবং ব্যাপ্ত হককে (একটি গোলামের বা একটি বাড়ীর মাঝে) একত্রীকরণের অধিকার রয়েছে। কিন্তু কাযীর রায় ছাড়া একত্রীকরণ সম্ভব হবে না।[১]

তবে পূর্বে বর্ণিত কারণে প্রথমোক্ত মতটি ইমাম আবু হানীফা (র) এর মাযহারের সঙ্গে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ।[২]

ইমাম কুদূরী (র) বলেনঃ কেউ যদি কোন ব্যক্তির অনুকূলে একহাজার দিরহামের অসিয়ত করে, আর তার কাছে নগদ আকারে এবং ঋণ আকারে মাল থাকে, সেক্ষেত্রে ঐ এক হাজার যদি নগদ বিদ্যমান মালের এক তৃতীয়াংশ থেকে বের হয়ে আসে, তাহলে অসিয়তপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে তা থেকে এক হাজার দিরহাম পরিশোধ করে দেয়া হবে।

কেননা, কারো হক ক্ষুণ্ন না করেই প্রত্যেক হকদারকে তার হক প্রদান করা সম্ভব। সুতরাং এটিই গ্রহণ করা হবে।

আর যদি নগদ বিদ্যমান মালের এক তৃতীয়াংশ থেকে ঐ এক হাজার বের হয়ে না আসে, (যেমন নগদ মালের পরিমাণ হল দুই হাজার) তাহলে তাকে নগদ মালের এক তৃতীয়াংশ প্রদান করা হবে। আর যখনই ঋণের কোন অংশ উশুল হয়ে আসবে, তখন সে তা থেকে একতৃতীয়াংশ গ্রহণ করে, যতক্ষণ না এক হাজার পূর্ণ হয়। কেননা অসিয়ত প্রাপ্ত ব্যক্তি ওয়ারিছের শরীকদার আর তাকে নগদ মালের সঙ্গে খাস করার অর্থ ওয়ারিছদের হক ক্ষুণ্ন করা। কেননা ঋণের উপর নগদ মালের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে।

তাছাড়া ঋণ সর্বাবস্থায় মাল রূপে গণ্য হয় না, বরং উশুল হওয়ার সময় মাল রূপে গণ্য হয়। সুতরাং আমরা যে সিদ্ধান্ত উল্লেখ করেছি, তাতে (উভয় পক্ষের দিকে) সুদৃষ্টির ব্যাপারে সমতা সৃষ্টি হয়।

ইমাম কুদূরী (র) বলেনঃ কেউ যদি যায়দ ও আমরের নামে নিজের এক তৃতীয়াংশ মালের অসিয়ত করে, অথচ দেখা গেলো যে, অছিয়ত করার সময় আমর মৃত ছিল, তাহলে একতৃতীয়াংশের সবটুকু যায়দের জন্য হবে।

---

১. আর আমাদের আলোচ্য ক্ষেত্রে কাযীর ফায়ছালা নেই। সুতরা সবার মতেই এখানে ব্যাপ্ত হক একত্রীকরণ সম্পন্ন হয়নি ফলে নষ্ট হওয়া ও বেঁচে যাওয়া মাল শরীকানা সম্পন্ন হবে।

২. বর্ণিত কারণটি এই যে, বাধ্যতামূলক বণ্টনের মাধ্যমে ব্যাপ্ত হককে একত্র করা যেখানে সম্ভব হবে, সেখানে অছিয়তকে অগ্রাধিকার প্রদানের জন্যও ব্যাপ্ত হককে একত্র করা সম্ভব হবে।

কেননা মৃত ব্যক্তি অছিয়তের উপযুক্ত নয়। সুতরাং সে অসিয়ত লাভের উপযুক্ত জীবিত ব্যক্তির প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে না। যায়দ ও একটি দেয়ালকে অসিয়ত করার ক্ষেত্রে যেমন হয়ে থাকে।

আর ইমাম আবু ইউসুফ (র) হতে বর্ণিত আছে যে, অছিয়তকারী যদি তার মৃত্যু সম্পর্কে অবগত না থাকে, তাহলে বিষয়টির হুকুম ভিন্ন হবে। কেননা মৃতের অনুকূলে অসিয়ত করা অর্থহীন। সুতরাং বোঝা গেল যে, অছিয়তকারী এক তৃতীয়াংশের সমগ্রটুকু জীবিতকে প্রদান করতে সম্মত রয়েছে।

আর সে যদি বলে যে, আমার মালের এক তৃতীয়াংশ যায়দ ও আমরের মাঝে বণ্টিত হবে। অথচ যায়দ মৃত, তাহলে আমর এক তৃতীয়াংশের অর্ধেক পাবে। কেননা মাঝে বণ্টিত হওয়ার শব্দের দাবী হলো উভয়ের প্রত্যেকের জন্য এক তৃতীয়াংশের অর্ধেক হওয়া। পক্ষান্তরে পূর্ববর্তী মাসআলাটি ভিন্ন। লক্ষ্যণীয় যে, যদি কেউ বলে যে, আমার মালের এক তৃতীয়াংশ যায়দের জন্য একথা বলে নীরব থাকে, তাহলে পূর্ণ একতৃতীয়াংশ তার হবে। পক্ষন্তরে যদি বলে যে 'আমার মালের একতৃতীয়াংশ অমুকের মাঝে' এরপর নীরব থাকে, তাহলে সে পূর্ণ তৃতীয়াংশের অধিকারী হবে না।[১]

ইমাম কুদূরী (র) বলেনঃ কেউ যদি তার মালের এক তৃতীয়াংশের অসিয়ত করে, অথচ তার কোন মাল নেই, এরপর সে মাল উপার্জন করলো, সে ক্ষেত্রে অছিয়তপ্রাপ্ত ব্যক্তি ঐ মালের এক তৃতীয়াংশ পাবে, যা মৃত্যুর সময় অছিয়তকারীর মালিকানায় থাকে।

কেননা 'অসিয়তের' অর্থ স্থলাভিষিক্তকরণ চুক্তি, যা মৃত্যুর পরবর্তী সময়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত হবে। এবং মৃত্যুর পর তার বিধান সাব্যস্ত হবে। সুতরাং মৃত্যুর সময় মাল বিদ্যমান থাকা শর্ত হবে। মৃত্যুর আগে নয়।

তদ্রূপ সে একতৃতীয়াংশের অধিকারী হবে যদি অসিয়ত করার সময় তার মাল থাকে, কিন্তু পরে তা ধ্বংস হয়ে যায়। এরপর পুনরায় সে মাল উপার্জন করে। কারণ সেটাই আমরা বর্ণনা করেছি (যে, অসিয়ত মৃত্যপরবর্তী সময়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়।)

আর যদি সে তার মেষপালের একতৃতীয়াংশের অসিয়ত করে, আর অছিয়তকারীর মৃত্যুর আগে মেষপাল ধ্বংস হয়ে যায়, কিংবা তার কোন মেষপালই ছিলই না, সেক্ষেত্রে অসিয়ত বাতিল বলে গণ্য হবে। কেননা আমরা উল্লেখ করে এসেছি যে, অসিয়ত করার অর্থ মৃত্যুর পর মালিকানা সাব্যস্ত করা। সুতরাং মৃত্যুর সময় অছিয়তকৃত বস্তুর বিদ্যমানতা বিবেচ্য হবে। আর এই অসিয়ত নির্দিষ্ট বস্তুর সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছে। সুতরাং মৃত্যুর সময় এর অবিদ্যমানতার কারণে অসিয়ত বাতিল হবে।

আর যদি অসিয়ত করার সময় তার মেষপাল না থাকে, আর মেষপালের মালিক হওয়ার পর মৃত্যুবরণ করে, তাহলে বিশুদ্ধ মতে অসিয়ত সিদ্ধ হবে। কেননা অসিয়তটি

১. মোট কথা, যদি মালিকানা প্রদানমূলক শব্দ ব্যবহার করে, তাহলে সমগ্রটুকু জীবিত জনের জন্য হবে। আর যদি বণ্টনমূলক শব্দ ব্যবহার করে, তাহলে জীবিত ব্যক্তি শুধু তার জন্য নির্ধারণকৃত অংশ পাবে।

যদি মাল বা সম্পদ শব্দ যোগে হতো, তাহলে অসিয়ত সিদ্ধ হবো। সুতরাং সম্পদের একটি প্রকারের নামোল্লেখ করে যে অসিয়ত হবে, তারও একই বিধান হবে।

এর কারণ এই যে, মৃত্যুর পূর্বে উক্ত মালের বিদ্যমানতা অছিয়তের জন্য অপ্রয়োজনীয় বিষয়। আসল বিবেচ্য বিষয় হলো মৃত্যুর সময় তা বিদ্যমান থাকা।

আর যদি অসিয়তকারী বলে যে, সে আমার মাল থেকে একটি বকরীর পাবে। অথচ তার কোন বকরী নেই, তাহলে তাকে একটি বকরী মূল্য প্রদান করা হবে।

কেননা সে যখন বকরীটিকে মালের সাথে সম্পৃক্ত করেছে (অথচ বস্তুগতভাবে বকরী তার মালে নেই) তখন আমরা বুঝতে পাররাম যে, তার উদ্দেশ্য হলো বকরীর মূল্যগুণ অছিয়ত করা (বকরী-সত্তা অছিয়ত করা উদ্দেশ্য নয়।) কেননা বকরীর সম্পদগুণ তার সাধারণ মালের মাঝে বিদ্যমান রয়েছে।

পক্ষান্তরে যদি সে একটি বকরীর অছিয়ত করে, কিন্তু সেটাকে নিজের মালের সাথে সম্বন্ধযুক্ত না করে, অথচ তার কোন বকরী নেই, তাহলে কারো কারো মতে তার অছিয়ত সহীহ হবে না।

কেননা, এক্ষেত্রে অছিয়তকে বৈধতা দানকারী বিষয় হচ্ছে বকরীকে মালের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করা। পক্ষান্তরে সম্বন্ধযুক্ত করা ছাড়া বকরীর বস্তুসত্তা ও গুণসত্তা উদ্দেশ্য হবে।

আর কারো কারো মতে তা সহীহ হবে। কেননা যখন সে 'বকরী' শব্দটি উল্লেখ করেছে অথচ তার মালিকানায় কোন বকরী নেই, তখন বোঝা গেল যে, তার উদ্দেশ্য হল বকরীর সম্পদ সত্তা।

আর সে যদি বলে ঃ 'আমার বকরীর পাল থেকে একটি বকরী' অথচ তার কোন বকরী নেই, তাহলে অছিয়ত বাতিল হবে। কেননা যখন বকরীটিকে সে বকরীর পালের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করেছে, তখন আমরা বুঝতে পারলাম যে, তার উদ্দেশ্য হচ্ছে বকরীর বস্তু সত্তা। কেননা বকরীটিকে সে বকরীর পালের অংশ হিসেবে সাব্যস্ত করেছে। পক্ষান্তরে বকরীকে মালের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করার বিষয়টি ভিন্ন, (তখন বোঝা যায় যে বকরীর সম্পদ সত্তা উদ্দেশ্য)। এর উপর ভিত্তি করে বহু মাসআলা আহরণ করা হয়।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন ঃ কেউ যদি তার মালের এক তৃতীয়াংশ তার উম্মেওয়ালাদদের জন্য, দরিদ্রদের জন্য এবং নিঃস্বদের জন্য অছিয়ত করে, আর উম্মেওয়ালাদদের সংখ্যা হলো তিন জন; তাহলে তাদের প্রাপ্য হবে পাঁচ হিসসার তিন হিসসা।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেন ঃ এটা ইমাম আবু হানীফা ও আবু ইউসুফ (র) এর অভিমত।

আর মুহম্মদ (র) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, অছিয়তকৃত মাল সাত ভাগে বণ্টিত হবে। উম্মেওয়ালাদরা পাবে তিন ভাগ, আর দরিদ্র ও নিঃস্বদের প্রতিটি দল পাবে দুই ভাগ করে। এ সিদ্ধান্তের মূল এই যে, উম্মেওয়ালাদদের জন্য অছিয়ত করা (সূক্ষ্ম কিয়াস

মতে) জাইয রয়েছে। আর দরিদ্র ও নিঃস্ব দু'টি আলাদা শ্রেণী। যাকাত পর্বে আমরা উভয় শ্রেণীর পরিচয় ব্যাখ্যা করেছি।

ইমাম মুহম্মদ (র)-এর যুক্তি এই যে, এখানে বহুবচনের শব্দ উল্লেখিত হয়েছে। আর মীরাছের ক্ষেত্রে বহুবচনের সর্বনিম্ন পরিমাণ দুই গণ্য করা হয়। কুরআনে আমরা তাই পেয়েছি। (আর অছিয়ত হলো মীরাছের সমগোত্রীয়) ; সুতরাং প্রতিটি শ্রেণী থেকে দু'জন হলো, আর উম্মে ওয়ালাদ তিনজন হলো, এ কারণে সাত ভাগে ভাগ করা হবে।

শায়খায়নের যুক্তি এই যে, 'ال' যুক্ত বহুবচন দ্বারা جنس বা শ্রেণীর জাতিসত্তা উদ্দেশ্য হয়। আর তা সমগ্রের সম্ভাবনাসহ সর্বনিম্নকে অন্তর্ভুক্ত করে। বিশেষত যখন সমগ্রের দিকে শব্দটিকে অভিমুখী করা দুঃসাধ্য হয়। সুতরাং প্রতিটি শ্রেণী থেকে একজন বিবেচ্য হবে, এবং হিসাবে পাঁচ-এ পৌছবে। আর তিনভাগ তিন জনের জন্য হবে।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন ঃ যদি কেউ অমুকের জন্য এবং নিঃস্বদের জন্য তার মালের এক তৃতীয়াংশ অছিয়ত করে, তাহলে শায়খায়নের মতে তৃতীয়াংশের অর্ধেক অমুকের জন্য এবং বাকি অর্ধেক নিঃস্বদের জন্য হবে। আর ইমাম মুহম্মদ (র)-এর মতে তৃতীয়াংশের এক-তৃতীয়াংশ অমুকের হবে, আর দুই তৃতীয়াংশ নিঃস্বদের হবে।

আর যদি সে নিঃস্বদের জন্য অছিয়ত করে, তাহলে শায়খায়নের মতে অসিয়তের মাল একজন নিঃস্বকে দান করার হক তার রয়েছে। আর ইমাম মুহম্মদ (র)-এর মতে অন্তত: দু'জন নিঃস্ব ব্যক্তিকে দান করতে হবে।

এর ভিত্তি হলো আমাদের এই মাত্র বর্ণিত বক্তব্য।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন ঃ কেউ যদি এক ব্যক্তির নামে একশ দিরহামের অসিয়ত করে, আর অন্য একজনের নামে একশ দিরহামের অসিয়ত করে, এরপর তৃতীয় একজনকে বলে, আমি তোমাকে তাদের দু'জনের সঙ্গে শরীক করলাম, তাহলে সে প্রতিটি একশ থেকে এক তৃতীয়াংশ পাবে।

কেননা আভিধানিকভাবে শরীকানা শব্দটি সমতার জন্য ব্যবহৃত হয়। আর আমাদের কথিত সমাধান দ্বারা সমতা বিধান করা সম্ভব। কেননা উভয় মালের পরিমাণ অভিন্ন। আর তিনজনের প্রত্যেকে একশ-এর দুই-তৃতীয়াংশ লাভ করছে। পক্ষান্তরে যদি একজনকে চারশ দিরহাম এবং অন্যজনকে দু'শ দিরহামের অসিয়ত করে, আর তৃতীয় জনকে শরীক করে, তাহলে বিষয়টি ভিন্ন হবে। কেননা দু'টি মালের পরিমাণ ভিন্ন হওয়ার কারণে সবার মাঝে সমতা বিধান করা সম্ভব হবে না। সুতরাং শরিকানা শব্দটির উপর যথাসম্ভব আমল করার জন্য আমরা তৃতীয়জনকে পূর্ববর্তী দু'জনের প্রত্যেকের সমান সাব্যস্ত করবো এবং উভয়ের প্রত্যেকের অংশকে অর্ধেকে ভাগ করবো।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন ঃ কেউ যদি বলে যে, অমুকের অনুকূলে আমার যিম্মায় ঋণ রয়েছে, আর তারা তাকে সত্যায়ন করলো। অর্থাৎ একথা সে তার

ওয়ারিসদেরকে সম্বোধন করে বলেছে; তাহলে তার ঋণের স্বীকারোক্তিটিকে এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত সত্যায়ন করা হবে।

এটা হল সূক্ষ্ম কিয়াসের দাবী। পক্ষান্তরে সাধারণ কিয়াসের দাবী অনুযায়ী তাকে সত্যায়ন করা হবে না। কেননা অজ্ঞাত পরিমাণ সম্পর্কে স্বীকারোক্তি যদিও বৈধ রয়েছে, কিন্তু ব্যাখ্যা প্রদান ছাড়া সে সম্পর্কে ফায়সালা দেয়া যাবে না। আর তাদের সত্যায়নের কথিত বিষয়টি শরীয়তের বিধানের বিরোধীরূপে প্রকাশ পেয়েছে। কেননা দাবীদারকে প্রমাণ ছাড়া সত্যায়ন করা সম্ভব নয়। সুতরাং এই স্বীকারোক্তিটিকে সর্বদিক থেকে স্বীকারোক্তিরূপে সাব্যস্ত করা অসম্ভব। সুতরাং তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

সূক্ষ্ম কিয়াসের যুক্তি এই যে, আমরা জানি যে, (এই স্বীকারোক্তি দ্বারা) তার উদ্দেশ্য হলো, স্বীকারোক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে ওয়ারিসদের উপর অগ্রাধিকার প্রদান করা। আর অসিয়তের সূত্রে তার ইচ্ছা কার্যকর করা সম্ভব। আর এমন ব্যক্তির এই স্বীকারোক্তির প্রয়োজন হতে পারে যে, স্বীকারোক্তিকারীর যিম্মায় মূল ঋণ সাব্যস্ত থাকার বিষয় জানে, কিন্তু পরিমাণ জানে না; যাতে লোকটিকে দায়মুক্ত করার জন্য নিজের দিক থেকে সে চেষ্টা করতে পারে। সুতরাং এটা অসিয়ত বলে সাব্যস্ত করার মাধ্যমে, পরিমাণ নির্ধারণের বিষয়টিকে সে অসিয়তপ্রাপ্ত ব্যক্তির হাতে অর্পণ করলো। যেন সে বললো ঃ যদি অমুক তোমার কাছে আসে এবং কিছু পাওনা দাবী করে, তাহলে সে যা চায় তা আমার মাল থেকে তাকে দিয়ে দিও। আর এটা এক-তৃতীয়াংশ থেকে বিবেচিত হয়। এ কারণেই এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত তাকে সত্যায়ন করা হবে। কিন্তু অতিরিক্ত পরিমাণের ক্ষেত্রে নয়।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন ঃ আর যদি সে এই অজ্ঞাত স্বীকারোক্তি ছাড়াও কিছু অসিয়ত করে, তাহলে অসিয়ত প্রাপ্তদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ পৃথক করে রাখা হবে। আর দুই তৃতীয়াংশ হবে ওয়ারিসদের জন্য।

কেননা তাদের মীরাছের পরিমাণ জানা আছে। তদ্রূপ অসিয়তের পরিমাণও জানা আছে। পক্ষান্তরে এই স্বীকারোক্তির পরিমাণ অজ্ঞাত। সুতরাং তা 'পরিজ্ঞাত' এর প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে না। সুতরাং পরিজ্ঞাত অসিয়তের জন্য পৃথকীকরণকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।

(অপরিজ্ঞাত পরিমাণ সম্পর্কে) স্বীকারোক্তির অন্য একটি ফায়দাও রয়েছে; তা এই যে, ওয়ারিছ ও অসিয়তপ্রাপ্ত দুই পক্ষের কোন এক পক্ষ হয়তো এই স্বীকারোক্তিকৃত পরিমাণ সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত আছে। আর অন্য পক্ষ হয়তো খুবই বিবাদ-প্রিয়। ফলে ঋণের পাওনাদার পাওনা দাবী করার পর তার প্রাপ্য আলাদা করার ব্যাপারে হয়তো তারা বিবাদে লিপ্ত হয়ে পড়বে। পক্ষান্তরে স্বীকারোক্তির পর প্রত্যেকেরই তার হস্তস্থিত মালের ব্যাপারে বিনা বিবাদে স্বীকারোক্তি গ্রহণ করে নেয়া সহীহ হয়ে যাবে। আর যখন এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণ আলাদা করা হবে, তখন অসিয়তপ্রাপ্তদেরকে বলা হবে যে, যে পরিমাণ ইচ্ছা সেই পরিমাণের ক্ষেত্রে স্বীকারোক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে সত্যায়ন কর। তদ্রূপ

ওয়ারিছদের বলা হবে, যে পরিমাণ ইচ্ছা সেই পরিমাণের ক্ষেত্রে তাকে সত্যায়ন কর। কেননা পাওনাদারের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে ঋণ, কিন্তু কার্যকর করার ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে অসিয়ত। সুতরাং (ওয়ারিছ ও অসিয়তপ্রাপ্ত) প্রত্যেক পক্ষ যখন কিছু পরিমাণের স্বীকারোক্তি করলো, তখন প্রকাশ পেল যে, পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে এমন একটা ঋণ রয়েছে, যা উভয় হিসসায় ব্যাপ্ত অবস্থায় রয়েছে। সুতরাং এক-তৃতীয়াংশের অধিকারীদের (অর্থাৎ অসিয়তপ্রাপ্তদের) থেকে যে পরিমানের স্বীকারোক্তি তারা করবে, তার এক-তৃতীয়াংশ গ্রহণ করা হবে। আর ওয়ারিছদের থেকে যে পরিমাণের স্বীকারোক্তি তারা করবে তার দুই-তৃতীয়াংশ নেয়া হবে। যাতে প্রত্যেক পক্ষে স্বীকারোক্তি তার প্রাপ্য হক অনুপাতে কার্যকর হয়। আর উভয় পক্ষের প্রত্যেকের উপর তাদের জানা সম্পর্কে কসম করা আবশ্যক হবে, যদি স্বীকারোক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি তার চেয়ে অধিক পরিমাণ দাবী করে। কেননা সে এমন বিষয়ে কসম করছে যা অন্য দু'জনের মাঝে সম্পন্ন হয়েছে। (নিজের কোন কর্মের উপর সে কসম করছে না।)

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন ঃ কেউ যদি কোন আজনাবীর অনুকূলে এবং তার ওয়ারিছদের অনুকূলে কোন অছিয়ত করে, তাহলে আজনাবী ব্যক্তি অছিয়তের অর্ধেক পাবে, আর ওয়ারিছের অসিয়ত বাতিল হয়ে যাবে।

কেননা সে এমন বিষয়ে অছিয়ত করেছে, যে বিষয়ে অসিয়ত করার অধিকার তার রয়েছে। আবার এমন বিষয়ে অসিয়ত করেছে, যে বিষয়ে অছিয়ত করার অধিকার তার নেই। সুতরাং প্রথম ক্ষেত্রেই তার অসিয়ত সিদ্ধ হবে, আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বাতিল হয়ে যাবে।

পক্ষান্তরে একজন জীবিত ও একজন মৃত ব্যক্তির জন্য অসিয়ত করার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা মৃত ব্যক্তি অসিয়তের উপযুক্ত নয়। সুতরাং সে জীবিত ব্যক্তির প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। ফলে সবটুকুই জীবিত ব্যক্তির জন্য হবে। পক্ষান্তরে ওয়ারিছ অসিয়তের উপযুক্ত পাত্র। এজন্যই অন্যান্য ওয়ারিছদের অনুমোদনক্রমে তা সিদ্ধ হয়। সুতরাং ক্ষেত্র দু'টি পার্থক্যপূর্ণ হয়ে গেল।

একই ভিত্তিতে বিধান হবে যদি সে নিজের হত্যাকারীর জন্য এবং আজনবী ব্যক্তির জন্য অসিয়ত করে।

তবে এই মাসআলাটি ওয়ারিছ এবং আজনবী ব্যক্তির জন্য কোন নির্দিষ্ট বস্তু বা ঋণ স্বীকার করা থেকে ভিন্ন। কেননা সে ক্ষেত্রে আজনবী ব্যক্তির ব্যাপারেও স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য হবে না। এটা এজন্য যে, অসিয়ত অর্থ একটি হস্তক্ষেপকে অস্তিত্ব দান করা। আর সেই হস্তক্ষেপের বিধান রূপে (আজনবী ও ওয়ারিছ, উভয় অসিয়তপ্রাপ্ত ব্যক্তির মাঝে) শরীকানা সাব্যস্ত হয়। সুতরাং উভয়ের মাঝে যে অসিয়তের হকদার হওয়ার যোগ্যতা রাখে, তার ক্ষেত্রে অসিয়ত গ্রহণযোগ্য হবে।

পক্ষান্তরে স্বীকারোক্তি করার অর্থ হলো বিগত সময়ে ঘটিত কোন বিষয় সম্পর্কে খবর প্রদান। সুতরাং সে বিগত সময়ে শরীকানা বিদ্যমান থাকার খবর প্রদান করেছে.

আর (আজনবীর অনুকূলে) এই স্বীকারোক্তিকে (শরীকানায়) **এই গুণটি** ছাড়া সাব্যস্ত করার কোন উপায় নেই। কেননা সেটা স্বীকারোক্তিকারীর প্রদত্ত খবরের বিপরীত হবে। তদ্রূপ এই গুণটি সাব্যস্ত করারও কোন উপায় নেই। কেননা এখন ওয়ারিছ তাতে তার শরীকদার হয়ে পড়ে।

তাছাড়া (পূর্ববর্তী শরীকানার ভিত্তিতে) আজনবী ব্যক্তি যদি কোন কিছু কবযা করে, তাহলে ওয়ারিছের অধিকার থাকবে তাতে তার শরীকদার হওয়ার।[১] সুতরাং ঐ পরিমাণের ক্ষেত্রে তার কবযা বাতিল হয়ে যাবে। এভাবে সে কবযা করতে থাকবে, আর ওয়ারিছ তার শরীকদার হতে থাকবে। এভাবে সমগ্রের ক্ষেত্রেই স্বীকারোক্তি বাতিল হয়ে যাবে। সুতরাং স্বীকারোক্তি আজনবীর অনুকূলে অর্থবহ হবে না।

পক্ষান্তরে হস্তক্ষেপের নতুন অস্তিত্বদানের ক্ষেত্রে অর্থাৎ অসিয়তের ক্ষেত্রে, (আজনবীর অনুকূলে) বহাল থাকার ক্ষেত্রে এবং (ওয়ারিছের বিপক্ষে) বাতিল হওয়ার ক্ষেত্রে, একজনের হিস্‌সা অন্য জনের হিসসা থেকে পৃথক।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন ঃ কারো যদি উত্তম, মধ্যম ও নিকৃষ্ট তিনটি কাপড় থাকে এবং প্রতিটি কাপড় একজন করে লোকের নামে অসিয়ত করে, আর একটি কাপড় নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু সেটা যে কোন্‌টা, তা জানা যায়নি, আর ওয়ারিছগণ তা অস্বীকার করে, তাহলে অসিয়ত বাতিল হয়ে যাবে।

ওয়ারিছদের অস্বীকার করার অর্থ এই যে, ওয়ারিছ অসিয়ত প্রাপ্তদের প্রত্যেককে নির্দিষ্টভাবে বললো যে, তোমার প্রাপ্য কাপড় যেটা সেটা নষ্ট হয়ে গেছে। সুতরাং এক্ষেত্রে হকদার তথা অসিয়ত প্রাপ্ত ব্যক্তি অজ্ঞাত হয়ে গেল, আর অসিয়তপ্রাপ্ত ব্যক্তির অজ্ঞতা আদালতের ফায়সালার সিদ্ধতাকে এবং উদ্দেশ্য অর্জনকে বাধাগ্রস্ত করে। সুতরাং তা বাতিল হয়ে যাবে।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন ঃ তবে ওয়ারিছরা যদি অবশিষ্ট কাপড় দু'টি অর্পণ করে তাহলে ভিন্ন কথা। কেননা যখন তারা অর্পণ করবে, তখন বাধা তথা অস্বীকৃতি বিদূরিত হবে। সুতরাং উত্তম কাপড়ের হকদার দু'টি কাপড়ের উৎকৃষ্টতরটির দুই-তৃতীয়াংশ পাবে, আর মধ্যম কাপড়ের হকদার উৎকৃষ্ট কাপড়ের এক-তৃতীয়াংশ পাবে এবং দু'টি কাপড়ের নিকৃষ্টতরটির এক-তৃতীয়াংশ পাবে।

আর নিকৃষ্ট কাপড়ের হকদার দু'টি কাপড়ের নিকৃষ্টতরটির দুই তৃতীয়াংশ পাবে।

---

১. যেমন একজনের হক অন্যজনের হক থেকে পৃথক নয়। বরং প্রতিটি অংশেই উভয়ে শরীকদার হবে। মোট কথা, স্বীকারোক্তিকারীর স্বীকারোক্তি আজনবীর অনুকূলে সিদ্ধ হয়। আর এই স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে সে যদি কোন কিছু কবযা করে, তাহলে তা দ্বারা প্রদত্ত খবর সাব্যস্ত হবে। আর প্রদত্ত খবর হলো সম্মিলিত ঋণ। সুতরাং তার অনুকূলে স্বীকারোক্তির অর্থ হবে পূর্ববর্তী চুক্তি বলে উভয়ের অনুকূলে স্বীকারোক্তি। সুতরাং একাংশ বাতিল হলে অপরাংশও অনিবার্যভাবে বাতিল হবে। সুতরাং অনিবার্য কারণেই স্বাকারোক্তিটি পূর্ণরূপে শরীকানার ভিত্তিতে সাব্যস্ত হবে। সুতরাং আজনবী যেটাই গ্রহণ করবে, সেটাতেই ওয়ারিছদের শরীকানা সাব্যস্ত হবে এবং এই পরিমাণের ক্ষেত্রে তার কবযা বতিল হয়ে যাবে। এভাবে স্বীকারোক্তির বৈধতার ভিত্তিতে সে কবযা করতে থাকবে, আর উপরোক্ত অনিবার্য কারণে ওয়ারিছদের শরীকদারী সাব্যস্ত হতে থাকবে, এভাবে সমগ্রের ক্ষেত্রেই আজনবীর কথা বাতিল হয়ে যাবে।

কেননা উৎকৃষ্ট কাপড়ের হকদার যে, তার তো নিশ্চিত রূপেই নিকৃষ্ট কাপড়টিতে কোন হক নাই। কেননা কাপড়টি বাস্তবে মধ্যম হবে কিংবা নিকৃষ্ট হবে। আর ঐ দু'টিতে তার কোন হক নেই, তদ্রূপ নিকৃষ্ট কাপড়ের হকদার যে, তার বিদ্যমান উৎকৃষ্ট কাপড়টিতে নিশ্চিতভাবেই কোন হক নেই। কেননা বিদ্যমান কাপড়টি উৎকৃষ্ট হবে কিংবা মধ্যম হবে। আর ঐ দু'টিতে তার কোন হক নেই। আর নিকৃষ্টটি বাস্তবেই নিকৃষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং সম্বাবনার ক্ষেত্র থেকে (অর্থাৎ বিদ্যমান নিকৃষ্টটি থেকে) তাকে প্রদান করা হবে। আর যখন উৎকৃষ্টের দুই তৃতীয়াংশ এবং নিকৃষ্টতরের দুই তৃতীয়াংশ চলে গেল, তখন উৎকৃষ্টের এক তৃতীয়াংশ এবং নিকৃষ্টের এক তৃতীয়াংশ শুধু বাকি থাকলো। তখন মধ্যম কাপড়ের হকদারের হক অনিবার্যভাবেই নির্দিষ্টরূপে ঐ অবশিষ্টটিতে নির্ধারিত হয়ে গেল।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন ঃ একটি বাড়ী যদি দু'জন লোকের মাঝে শরীকানাধীন হয়, আর তাদের একজন (ঐ বাড়ীর) নির্দিষ্ট একটি ঘর কোন একজন লোকের নামে অছিয়ত করে, তাহলে বাড়ীটি ভাগ করা হবে। এরপর ঘরটি যদি অসিয়তকারীর ভাগে পড়ে, তাহলে তা অসিয়তপ্রাপ্ত ব্যক্তির হবে।

এটা ইমাম আবু হানীফা ও আবু ইউসুফ (র)-এর অভিমত। আর ইমাম মুহম্মদ (র)-এর মতে ঘরটি অর্ধেক অসিয়তপ্রাপ্ত ব্যক্তির হবে।

আর যদি ঘরটি অপরজনের ভাগে পড়ে, তাহলে অসিয়তপ্রাপ্ত ব্যক্তি ঘরের সম-আয়তন পাবে।

এটা ইমাম আবু হানীফা ও আবু ইউসুফ (র) এর অভিমত। আর ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন ঃ ঘরের অর্ধেকের সম-আয়তন পাবে।

ইমাম মুহম্মদ (র) এর যুক্তি এই যে, অছিয়তকারী ব্যক্তি তার মালিকানাধীন এবং অন্যের মালিকানাধীন বস্তুর অছিয়ত করেছে। কেননা বাড়ীর সমগ্র অংশ শরীকানাধীন। সুতরাং প্রথম ক্ষেত্রে অছিয়ত কার্যকর হবে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয়ক্ষেত্রে অসিয়ত স্থগিত থাকবে। আর বন্টনের পর যদিও সে অবশিষ্ট অংশের মালিকানা লাভ করছে, কিন্তু মূলতঃ বন্টন হচ্ছে বিনিময়। সুতরাং পূর্ববর্তী অসিয়ত তাতে কার্যকর হবে না। যেমন যদি কেউ অন্যের মালিকানাধীন কোন জিনিসের অসিয়ত করে, তারপর তা ক্রয় করে।

অসিয়ত করার পর যদি তারা বাড়ী ভাগ করে, আর ঘরটি অসিয়তকারীর ভাগে পড়ে তাহলে অসিয়তকৃত বস্তুটির মূল সত্তায় অর্থাৎ অর্ধেক ঘরের উপর অসিয়তটি কার্যকর হবে। আর যদি তা অপরজনের হিসসায় পড়ে, তাহলে অসিয়তকৃত বস্তুটি হাতছাড়া হওয়ার ক্ষেত্রে তার বদলের মাঝে অসিয়ত কার্যকর করার ভিত্তিতে অসিয়তপ্রাপ্ত ব্যক্তি ঘরের অর্ধেকের সম-আয়তন লাভ করবে। যেমন অসিয়তকৃত দাসীকে যদি ভুলক্রমে হত্যা করা হয়, তাহলে তার বদলের ক্ষেত্রে (অর্থাৎ দিয়তের ক্ষেত্রে) অসিয়ত কার্যকর হয়। পক্ষান্তরে অসিয়তকৃত গোলাম যদি বিক্রি করে দেয়া হয়, তাহলে বিষয়টি ভিন্ন হবে, অর্থাৎ তার মূল্যের সাথে অসিয়তের সম্পর্ক হবে না।

কেননা আমরা পূর্বে বর্ণনা করে এসেছি যে, বিক্রয়ের পদক্ষেপ গ্রহণের কারণে অসিয়ত বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু বন্টনের কারণে বাতিল হবে না, (কেননা বিক্রয় অসিয়ত প্রত্যাহারের প্রমাণ, বণ্টন প্রত্যাহারের প্রমাণ নয়।)

শায়খায়নের যুক্তি এই যে, সে এমন জিনিস সম্পর্কে অসিয়ত করেছে যাতে বন্টনের মাধ্যমে তার মালিকানা স্থিত হবে। কেননা বাহ্যিক অবস্থা এটাই যে, সে এমন মালিকানাধীন বস্তুর অছিয়ত করার ইচ্ছা করছে, যা সর্বদিক থেকে ভোগযোগ্য। আর তা বন্টনের মাধ্যমেই সম্ভব হবে। কেননা এজমালি বস্তুতে ভোগ সুবিধা খণ্ডিত হয়ে থাকে। আর যখন ঘরটি তার ভাগে পড়বে, তখন সমগ্র ঘরেই তার মালিকানা স্থিত হবে। সুতরাং তাতে অসিয়ত কার্যকর হবে। আর এই বন্টনে বিনিময়ের গুণটি অনুবর্তী, (মুখ্য নয়।) আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে সুবিধা ভোগের পূর্ণতা বিধানের জন্য মালিকানাকে স্থিতকরণ। এ কারণেই এক্ষেত্রে বন্টনের বিষয়ে বাধ্য করা হয়। আর স্থিতকরণের দিকটি বিবেচনায় এনে এমন ধরে নেয়া হবে, যেন ঘরটি শুরু থেকেই তার মালিকানায় ছিল।

আর যদি ঘরটি অপরজনের ভাগে পড়ে, তাহলে অসিয়তকারীর হিসসায় ভূমি থেকে ঘরের সমগ্রের আয়তনের পরিমাণে অসিয়ত কার্যকর হবে। এর কারণ এই যে, এটা ঘরের বিনিময়। যেমন আমরা উল্লেখ করে এসেছি, কিংবা অসিয়তকারীর উদ্দেশ্যকে যথাসম্ভব বাস্তবায়নের জন্য বলা হবে যে, ঘর উল্লেখ করা দ্বারা তার উদ্দেশ্য হচ্ছে, তা দ্বারা পরিমাণ নির্ধারণ। তবে ঘর তার হিসসায় পড়ার ক্ষেত্রে ঘরটিই অসিয়তের ক্ষেত্র রূপে নির্ধারিত হয়ে যাবে, যাতে ঘরের উল্লেখ দ্বারা পরিমাণ নির্ধারণ এবং মালিকানা প্রদান-উভয় দিকটি একত্র করা হয়ে যায়। আর যদি ঘরটি অপরজনের হিসসায় পড়ে তাহলে সেক্ষেত্রে শুধু পরিমাণ নির্ধারণের দিকটির উপর আমরা আমল করবো।

কিংবা বলা হবে যে, দুই ছূরতের এক ছূরতে অর্থাৎ ঘরটি অপরজনের ভাগে পড়ার ক্ষেত্রে ঘরের উল্লেখ দ্বারা সে পরিমাণ নির্ধারণের ইচ্ছা করেছে। পক্ষান্তরে অন্য ছূরতে অর্থাৎ নিজের ভাগে পড়ার ছূরতে ঘরের বস্তু সত্তার মালিকানা প্রদানের ইচ্ছা করেছে। যেমন নবজাতক সন্তানের মুক্তিকে এবং স্ত্রীর তালাককে যদি তার দাসীর প্রথম প্রসবকৃত সন্তানের সঙ্গে ঝুলন্ত করে, তাহলে তালাকের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে নিঃশর্ত সন্তান উদ্দেশ্য হবে। পক্ষান্তরে মুক্তির ক্ষেত্রে জীবিত সন্তান উদ্দেশ্য হবে।

আর ঘরটি যদি অপরজনের ভাগে পড়ে, আর বাড়ীটি হয় একশ হাত এবং ঘরটি হয় দশ হাত, তাহলে তার হিস্সা (পঞ্চাশ হাত) অসিয়তপ্রাপ্ত এবং ওয়ারিছদের মাঝে দশভাগে বন্টিত হবে। দশভাগের নয় ভাগ ওয়ারিছদের জন্য, আর একভাগ অসিয়তপ্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য। এটা ইমাম মুহম্মদ (র) এর অভিমত। সুতরাং অসিয়তপ্রাপ্ত ব্যক্তি অর্ধেক ঘরের পাঁচ হাত গ্রহণ করবে। আর ওয়ারিছরা পাবে ঘর বাদ দিয়ে বাড়ীর অর্ধেক, অর্থাৎ পয়তাল্লিশ হাত। সুতরাং প্রতি পাঁচ হাতকে এক হিস্সা ধরা হবে। এভাবে দশ হিস্সা হবে।

আর শায়খায়নের মতে এগার হিস্‌সা হিসাবে বন্টন করা হবে। কেননা, অসিয়তপ্রাপ্ত ব্যক্তি দশ হাত গ্রহণ করবে, আর ওয়ারিছগণ পঁয়তাল্লিশ হাত গ্রহণ করবে; ফলে এগার হিস্‌সা হয়ে যাবে; অসিয়তপ্রাপ্ত ব্যক্তির দুই হিস্‌সা এবং ওয়ারিছদের নয় হিস্‌সা।

আর অসিয়তের স্থলে যদি স্বীকারোক্তির বিষয় হয়, তাহলে কারো কারো মতে সেটাও একই মতপার্থক্যপূর্ণ হবে। আর কারো কারো মতে এক্ষেত্রে কোন মতপার্থক্য নেই। (বরং ইমাম মুহম্মদ (র) শায়খায়নের মত গ্রহণ করেছেন।)

ইমাম মুহম্মদ (র) এর যুক্তি এবং পার্থক্যের কারণ এই যে, অন্যের মালিকানাধীন বস্তুর ক্ষেত্রে স্বীকাররোক্তি গ্রহণযোগ্য। এজন্যই কারো পক্ষে অন্যের মালিকানাধীন বস্তু সম্পর্কে স্বীকারোক্তি করে, এরপর সে তার মালিকানা লাভ করে, তখন তাকে তা স্বীকারোক্তি প্রাপ্ত ব্যক্তির হাতে অর্পণ করার আদেশ দেয়া হবে। পক্ষান্তরে অন্যের মালিকানাধীন বস্তু সম্পর্কে অসিয়ত করা সহীহ নয়। এজন্য যদি সে কোনভাবে ঐ বস্তুর মালিকানা লাভ করে, তারপর মারা যায়, তখন অছিয়ত সহীহ হবে না এবং কার্যকর হবে না।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন ঃ কেউ যদি কারো পক্ষে কোন ব্যক্তির মাল থেকে নির্ধারিত এক হাজার দিরহাম সম্পর্কে অছিয়ত করে, আর অছিয়তকারীর মৃত্যুর পর মালের মালিক তা অনুমোদন করে। তারপর যদি সে উক্ত মাল অসিয়প্রাপ্ত ব্যক্তিকে প্রদান করে, তাহলে তা জাইয হবে। তবে অনুমোদনের পর সে অর্পণ করা থেকে বিরতও থাকতে পারে।

কেননা এই অসিয়তের অর্থ হল অন্যের মাল দান করা। সুতরাং সেটা তার অনুমোদনের উপর নির্ভর করবে। যখন সে তা অনুমোদন করলো, তখন তার পক্ষ হতেও সেটা দান হলো। সুতরাং দান অর্পণ করা থেকে বিরত থাকার অধিকার তার থাকবে। পক্ষান্তরে যদি সে একতৃতীয়াংশের বেশী অছিয়ত করে, আর ওয়ারিছরা তা অনুমোদন করে (তাহলে তারা অর্পণ করা থেকে বিরত থাকতে পারবে না।) কেননা অসিয়ত তার মূলগত দিক থেকে বৈধ হয়েছে। আর সেটা তার মালিকানাধীন বস্তুর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। (একতৃতীয়াশের অধিকের ক্ষেত্রে) নিষিদ্ধতা ছিল ওয়ারিছদের অধিকারের কারণে। তারা যখন অনুমোদন করলো, তখন তাদের হক রহিত হয়ে গেল এবং অসিয়তকারীর দিক থেকে তা কার্যকর হয়ে গেল।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন ঃ দুই পুত্র যদি পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তি এক হাজার দিরহাম বন্টন করে। এরপর দু'জনের একজন যদি কোন লোকের পক্ষে এই স্বীকারোক্তি করে যে, পিতা তার নামে তার সম্পদের এক তৃতীয়াংশ অসিয়ত করেছে; সেক্ষেত্রে স্বীকারোক্তিকারী তাকে তার হস্তস্থ মালের এক তৃতীয়াংশ প্রদান করবে।

এটা হলো সূক্ষ্ম কিয়াসের দাবী। পক্ষান্তরে সাধারণ কিয়াসের দাবী এই যে, সে তাকে তার হস্তস্থ মালের অর্ধেক প্রদান করবে। এটাই ইমাম যুফার (র) এর অভিমত।

কেননা, অসিয়তপ্রাপ্ত ব্যক্তির অনুকূলে তার স্বীকারোক্তি, তার সাথে তার সমতার স্বীকারোক্তিকেও অন্তর্ভুক্ত করে। আর সমতা বিধান হবে তাকে অর্ধেক প্রদানের মাধ্যমে যাতে কাছে তার অর্ধেক অবিশিষ্ট থাকে।

সূক্ষ্ম কিয়াসের যুক্তি এই যে, সে এমন এক তৃতীয়াংশ সম্পর্কে স্বীকারোক্তি করেছে, যা সমগ্র মীরাছ সম্পত্তিতে ব্যাপ্ত রয়েছে। আর সেটা উভয়ের হাতে রয়েছে। সুতরাং সে তার হস্তস্থ মালের একতৃতীয়াংশ সম্পর্কে স্বীকারোক্তিকারী হবে। পক্ষান্তরে যদি তাদের দু'জনের একজন অন্য কারো অনুকূলে (পিতার) ঋণের স্বীকারোক্তি করে, তাহলে বিষয়টি ভিন্ন হবে। কেননা ঋণ পরিশোধ করা মীরাছ বন্টনের উপর অগ্রবর্তী। সুতরাং (ঋণের স্বীকারোক্তির মাধ্যমে প্রকারান্তরে) তার অগ্রবর্তীতার স্বীকারোক্তিকারী হলো। কাজেই ঋণ পরিশোধকে মীরাছ বন্টনের উপর প্রাধান্য দেয়া হবে। (এবং ঋণ যদি তার হস্তস্থ সমস্ত মাল গ্রাস করে, তাহলে সমস্ত মালই তাকে প্রদান করতে হবে।)

পক্ষান্তরে একতৃতীয়াংশের অসিয়ত প্রাপ্ত ব্যক্তি হচ্ছে ওয়ারিছের শরীক। সুতরাং ওয়ারিছদের অনুকূলে দুই তৃতীয়াংশ বহাল থাকলে তবেই তার অনুকূলে এক তৃতীয়াংশ দেয়া হবে।

তাছাড়া অসিয়তপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি স্বীকারোক্তিকারী থেকে তার হস্তস্থ মালের অর্ধেক নিয়ে নেয়, তাহলে হতে পারে যে, অপর পুত্রও তার অনুকূলে ঐ পরিমাণের স্বীকারোক্তি করে বসবে। তখন সে একই সূত্রে অপরজন থেকে তার হস্তস্থ মালের অর্ধেক নিয়ে নেবে। ফলে মীরাছি সম্পত্তির অর্ধেক তার হাতে চলে যাবে এবং এক তৃতীয়াংশের বেশী হয়ে যাবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ কেউ যদি কোন ব্যক্তির নামে কোন দাসীর অসিয়ত করে, আর অসিয়তকারীর মৃত্যুর পর দাসী একটি সন্তান প্রসব করে, আর দাসী ও সন্তান উভয়ে একতৃতীয়াংশ সম্পত্তি থেকে বের হয়ে আসে, তাহলে দু'টোই অসিয়তপ্রাপ্ত ব্যক্তির প্রাপ্য হবে।

কেননা মাতা মূল হিসাবে অসিয়তভুক্ত হয়েছে; আর সন্তান যুক্ত থাকার সময় অনুবর্তীরূপে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এরপর যখন বন্টনের পূর্বে সে সন্তান প্রসব করল, আর বন্টনের পূর্বে সম্পত্তি মাইয়েতের মালিকানায় বহাল থাকে, এজন্যই তা দ্বারা তার ঋণ পরিশোধ করা হয়। সুতরাং সন্তান অছিয়তের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। এবং দুটো অসিয়তপ্রাপ্ত ব্যক্তির প্রাপ্য হয়ে যাবে।

আর যদি (দাসী ও সন্তান) উভয়ে এক তৃতীয়াংশ থেকে বের হয়ে না আসে, তাহলে সে এক তৃতীয়াংশ পরিমাণ গ্রহণ করবে। আর ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহম্মদ (র) এর মতে তার সাথে নির্দিষ্ট অংশ (অর্থাৎ এক তৃতীয়াংশ) সে উভয় থেকে গ্রহণ করবে।

আর ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন ঃ এক তৃতীয়াংশ সে মাতা থেকে গ্রহণ করবে, এরপর যদি আরো প্রাপ্য বাকি থাকে, তাহলে সেটা সন্তান থেকে গ্রহণ করবে।

আর 'জামে সাগীর' কিতাবে ইমাম মুহম্মদ (র) মাসআলাটির স্বরূপ এভাবে নির্ধাণ করে বলেছেন ঃ এক লোকের ছয়শ দিরহাম রয়েছে। আর তিনশ দিরহাম সমমূল্যের একটি দাসী রয়েছে। এমতাবস্থায় সে কোন লোকের নামে দাসীটি সম্পর্কে অসিয়ত করলো, এরপর সে মারা গেল, আর বন্টনের পূর্বে দাসী তিনশ দিরহাম সমমূল্যের একটি সন্তান প্রসব জরলো, সেক্ষেত্রে ইমাম মুহম্মদ (র) এর মতে মাতা এবং সন্তানের এক তৃতীয়াংশ অসিয়তপ্রাপ্ত ব্যক্তির প্রাপ্য হবে। আর শায়খায়নের মতে সে দাসী ও সন্তান উভয়ের দুই তৃতীয়াংশ পাবে।

শায়খায়নের যুক্তি সেটাই, যা আমরা উল্লেখ করেছি যে, সন্তান সংযুক্ত অবস্থায় অনুবর্তী রূপে অসিয়তের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সুতরাং পরবর্তীতে বিযুক্ত হওয়ার কারণে অসিয়ত থেকে বহির্ভুত হবে না। বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এবং মুক্তিদানের ক্ষেত্রে যেমন হয়ে থাকে। সুতরাং অগ্রবর্তী না করে উভয়ের ক্ষেত্রে সমভাবে অসিয়ত কার্যকর করা হবে।

ইমাম মুহম্মদ (র) এর যুক্তি এই যে, অসিয়তের ক্ষেত্রে মাতা হলো মূল, আর সন্তান হলো অনুবর্তী; আর অনুবর্তী মূলের প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে না। সুতরাং যদি উভয়ের ক্ষেত্রে আমরা অসিয়তকে কার্যকর করি, তাহলে মূলের অংশ বিশেষের ক্ষেত্রে অসিয়ত ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর তা বৈধ নয়। বিক্রয়ের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা অনুবর্তীর ক্ষেত্রে বিক্রয়ের কার্যকর করা মূলের ক্ষেত্রে বিক্রয় ভঙ্গকে অনিবার্য করে না, বরং মূলের ক্ষেত্রেও তা পূর্ণ ও বিশুদ্ধ রূপে বহাল থাকে। তবে সন্তানের দখল গ্রহণ যুক্ত হওয়ার সময় তার মুকাবেলায় মূল্যের অংশ বিশেষ সাব্যস্ত হওয়া অনিবার্য প্রয়োজনে মূল্যের মুকাবেলায় মূল্যের অংশবিশেষ সাব্যস্ত হবে না। কিন্তু বিক্রয় চুক্তিতে মূল্য হচ্ছে অনুবর্তী বিষয়। এ কারণেই মূল্য উল্লেখ ছাড়া বিক্রয় সম্পন্ন হয়, যদিও তা অকার্যকর হয়।

এ বিধান হবে তখন, যখন বন্টনের পূর্বে সন্তান প্রসব করবে। পক্ষান্তরে যদি বন্টনের পর প্রসব করে, তাহলে তা অসিয়তপ্রাপ্ত ব্যক্তির হবে। কেননা বন্টনের পর যেহেতু মূল্যের মাঝে তার মালিকানা স্থিত হয়ে গেছে, সেহেতু এটা হবে তার পূর্ণ মালিকানাধীন সম্পদের বিশেষ বৃদ্ধি।

পরিচ্ছেদ ঃ অসিয়তের অবস্থা বিবেচনা প্রসঙ্গে

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন ঃ মৃত্যুরোগী যদি কোন স্ত্রীলোকের অনুকূলে কোন ঋণের স্বীকারোক্তি, কিংবা তার নামে কোন কিছুর অসিয়ত করে, কিংবা তাকে কোন কিছু হেবা করে, এরপর তাকে বিবাহ করে, তারপর মারা যায়, তাহলে ঋণের স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য হবে, বিন্তু অসিয়ত ও হেবা বাতিল হবে।

কেননা স্বীকারোক্তি নিজস্ব সত্তাগতভাবেই বিধান অবশ্য সাব্যস্তকারী। আর স্বীকারোক্তি উচ্চারিত হওয়ার সময় স্ত্রীলোকটি ছিল আজনবী; একারণেই তা সমগ্র সম্পদ থেকে বিবেচ্য হয়। আর স্বীকারোক্তি সুস্থ অবস্থায় হোক কিংবা মৃত্যুরোগের

অবস্থায় (স্বীকারোক্তির বিষয়টি) ঋণ হওয়ার কারণে স্বীকারোক্তি বাতিল হয় না। তবে দ্বিতীয়টি প্রথমটি থেকে বিলম্বিত হয়। (অর্থাৎ আগে সুস্থাবস্থায় স্বীকারোক্তি ঋণ শোধ করা হয়।)

অসিয়তের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা তা মৃত্যুর সময় সাব্যস্ত করা হয়। আর তখন সে স্ত্রী হওয়ার কারণে ওয়ারিছ হয়ে যায়। আর ওয়ারিছের জন্য অসিয়ত গ্রহণযোগ্য নয়। আর হেবা যদিও তাৎক্ষণিকভাবে সাব্যস্ত বিধান, কিন্তু গুণগতভাবে তা মৃত্যুর পরবর্তী সময়ের দিকে সম্বন্ধযুক্ত বিষয়ের মত। কেননা হেবার বিধান মৃত্যুর সময় স্থিত হয়। লক্ষ্যনীয় যে, পরিবেষ্টনকারী ঋণের কারণে তা বাতিল হয়ে যায়। আর ঋণ না থাকার অবস্থায় তা এক তৃতীয়াংশ সম্পদ থেকে বিবেচ্য হয়।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন ঃ মৃত্যুরোগী যদি তার খৃষ্টান পুত্রের অনুকূলে ঋণের স্বীকারোক্তি করে, কিংবা তাকে কোন কিছু হেবা করে কিংবা তার নামে কোন কিছুর অসিয়ত করে, আর তার মৃত্যুর পূর্বে পুত্র ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে এগুলো সব বাতিল হবে।

হেবা ও অসিয়ত বাতিল হওয়ার কারণ আমরা বলেছি যে, মৃত্যুর সময় সে ওয়ারিছ হয়ে গেছে, অথচ এ দু'টি মৃত্যুর সময় কিংবা মৃত্যুর পরে অবশ্য সাব্যস্ত করা হয়। পক্ষান্তরে স্বীকারোক্তি যদিও স্বকীয়ভাবেই বিধান অবশ্য সাবস্ত্যকারী, তবে মীরাছ লাভ করার কারণ, তথা পুত্রত্ব স্বীকারোক্তি করার সময় বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং অন্য ওয়ারিছদের উপর অগ্রাধিকার প্রদানের দুর্নাম করার ক্ষেত্রে সেটা বিবেচ্য হবে। পক্ষান্তরে পূর্বে বর্ণিত মাসআলাটি ভিন্ন। কেননা সেখানে মীরাছ লাভের কারণ হচ্ছে স্ত্রীত্ব। আর তা হচ্ছে স্বীকারোক্তির পরবর্তীকালে উদ্ভূত অবস্থা। এমন কি যদি স্বীকারোক্তি করার সময় স্ত্রীত্ব বিদ্যমান থাকে, আর সে খৃষ্টান হয়। এরপর তার মৃত্যুর পূর্বে সে ইসলাম গ্রহণকরে, তাহলে স্বীকারোক্তির সময় মীরাছ লাভের কারণ বিদ্যমান থাকার কারণে স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য হবে না।

তদ্রূপ পুত্র যদি গোলাম বা মুকাতাব হয়, এরপর মৃত্যুর পূর্বে তাকে আযাদ করে দেয়া হয়; (তাহলে সব বতিল হবে।)

কারণ সেটাই, যা আমরা উল্লেখ করেছি। স্বীকারোক্তি অধ্যায়ে ইমাম মুহম্মদ (র) উল্লেখ করেছেন যে, গোলামের যিম্মায় যদি ঋণ না থাকে, তবে তার পক্ষে পিতার স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা সে মূলত পুত্রের মনিবের অনুকূলে স্বীকারোক্তি করেছে, আর মনিব তো হচ্ছে আজনবী। পক্ষান্তরে গোলামের যিম্মায় যদি ঋণ থাকে, তাহলে স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা এটা হচ্ছে গোলামের অনুকূলে স্বীকারোক্তি, আর সে হচ্ছে তার পুত্র।

অসিয়ত বাতিল হবে। কারণ আমরা উল্লেখ করেছি যে, অসিয়তের ক্ষেত্রে মৃত্যুর সময় হলো বিবেচ্য।

আর হেবা সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তা বৈধ হবে। কেননা এটা হলো তাৎক্ষণিক মালিকানা প্রদান, আর তখন সে গোলাম। পক্ষান্তরে সাধারণ বর্ণনা মতে মৃত্যুরোগের সময় কৃত হেবা অসিয়তের পর্যায়ভুক্ত। সুতরাং তা সহীহ হবে না।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন ঃ পঙ্গু, অর্ধাঙ্গ, অবশ, হাত অবশ-রোগী এবং যক্ষা রোগী, যদি তাদের রোগ দীর্ঘস্থায়ী হয়, আর তাতে মৃত্যুর আশংকা দেখা না দেয়, তাহলে তার কৃত হেবা সমগ্র সম্পদ থেকে গণ্য হবে।

কেননা রোগ দীর্ঘস্থায়ী হয়ে গেলে, তা স্বভাবভুক্ত হয়ে যায়। একারণেই তখন আর চিকিৎসা নিয়ে মানুষ ব্যস্ত হয় না। এরপর যদি শয্যাশায়ী হয়, তাহলে সেটা নব উদ্ভূত রোগ বলে গণ্য হবে। তখন যদি হেবা করে, তাহলে সেটা এক তৃতীয়াংশ থেকে গণ্য হবে।)

আর যদি ঐ সকল ব্যাধি দেখা দেয়ার সময় সে শয্যাশায়ী হয়ে যায়, আর হেবা করে এবং ঐ দিনগুলোতে মারা যায়, তাহলে হেবা এক তৃতীয়াংশ থেকে বিবেচ্য হবে।

কেননা ঐ ব্যাধিতে মৃত্যুর আশংকা করা হয়, এজন্যই সে চিকিৎসায় ব্যস্ত হয়। সুতরাং এটা মৃত্যু রোগ বলে বিবেচ্য হবে। আল্লাহ্ অধিক অবগত।

মৃত্যু রোগ অবস্থায় মুক্তিদান

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ কেউ যদি মৃত্যু রোগের অবস্থায় কোন গোলামকে মুক্তি দান করে কিংবা অতি হ্রাসকৃত মূল্যে বিক্রি করে কিংবা হেবা করে, তাহলে এগুলো সবই বৈধ হবে, তবে এক তৃতীয়াংশ থেকে তা বিবেচ্য হবে। আর এই তিনজনের প্রত্যেকে অসিয়তপ্রাপ্তদের সঙ্গে তৃতীয়াংশ থেকেই তাদের প্রাপ্য গ্রহণ করবে।

কোন কোন সংস্করণে جَائِزٌ (বৈধ) এর পরিবর্তে فَهُوَ وَصِيَّةٌ (তাহলে তা অসিয়ত হবে) রয়েছে। সেক্ষেত্রে উদ্দেশ্য হলো একথা বোঝানো যে, (অসিয়তের মত) ঐগুলোও তৃতীয়াংশ থেকে বিবেচ্য হবে, এবং অসিয়তপ্রাপ্তদের সঙ্গে তৃতীয়াংশ থেকে তারা তাদের প্রাপ্য গ্রহণ করবে। প্রকৃত অসিয়ত উদ্দেশ্য নয়। কেননা অসিয়ত তো হলো মৃত্যুর পরবর্তী সময়ে ওয়াজিব করা। অথচ এগুলো হচ্ছে মৃত্যুর সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত না হয়ে তাৎক্ষণিকবাবে সাব্যস্ত। আর এক তৃতীয়াংশ থেকে বিবেচ্য হওয়ার কারণ হলো ওয়ারিছদের হক সম্পৃক্ত হওয়া।

তদ্রূপ একই বিধান হবে ঐ সকল দায় দায়িত্বের ব্যাপারে যা মৃত্যুরোগী স্বতন্ত্রভাবে নিজের উপর ওয়াজিব করে নেয়। যেমন যামিন হওয়া এবং কাফীল হওয়া। এগুলো অসিয়তের হুকুমভুক্ত হবে, (অর্থাৎ এক তৃতীয়াংশ থেকে বিবেচ্য হবে)। কেননা হেবার মত এদুটোতেও সে অভিযুক্ত হবে।

আর যেকোন আর্থিক দায় মৃত্যুর পরবর্তী সময়ের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করাকে ওয়াজিব করবে, সেটা এক-তৃতীয়াংশ থেকে গণ্য হবে, যদিও তা সুস্থ অবস্থায় সাব্যস্ত করে থাকে। কেননা সম্বন্ধযুক্ত অবস্থা বিবেচ্য হবে, চুক্তির অবস্থা নয়।

আর যেসকল হস্তক্ষেপ মৃত্যুর সাথে সংযুক্ত না করে কার্যকর করে ফেলেছে (যেমন মুক্তিদান ও হেবা করা) সেক্ষেত্রে চুক্তির অবস্থা বিবেচ্য হবে। যদি সে চুক্তির সময় সুস্থ থাকে, তাহলে তার হস্তক্ষেপ সমগ্র সম্পদ থেকে বিবেচ্য হবে। আর যদি মৃত্যুরোগের রোগী হয়, তাহলে এক-তৃতীয়াংশ থেকে বিবেচ্য হবে।

আর যেকোন রাগ থেকে মানুষ সুস্থ হয়ে যায়, সেটা সুস্থ অবস্থার মতই গণ্য হবে। কেননা আরোগ্য লাভ দ্বারা পরিস্কার হয়ে গেছে যে, তার সম্পদে কারো কোন হক নেই।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ যদি সে কোন গোলামকে অতিহ্রাসকৃত মূল্যে বিক্রি করে, তারপর অন্য একটি গোলামকে আযাদ করে, আর এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ ঐ দু'টির পরিমাণ থেকে কম হয়, তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে হ্রাসকৃত মূল্যে বিক্রয় অগ্রাধিকার লাভ করবে; আর যদি আগে একটি গোলামকে আযাদ করে, তারপর একটি গোলামকে অতিহ্রাসকৃত মূল্যে বিক্রি করে, তাহলে দু'টোই সমান হবে (অর্থাৎ এক-তৃতীয়াংশ থেকে সমান হিস্সা পাবে)। আর সাহেবায়ন (র) বলেন ঃ উভয় মাসআলাতে মুক্তিদানের বিষয়টি অগ্রাধিকার লাভ করবে।

এ বিষয়ে মীলনীতি এই যে, অসিয়ত সমূহের মধ্যে কোনটি যদি এক-তৃতীয়াংশ থেকে অতিক্রম না করে, তাহলে প্রত্যেক অসিয়তপ্রাপ্ত ব্যক্তি তার সমগ্র অসিয়তের পরিমাণ অনুপাতে এক-তৃতীয়াংশ হিস্সা লাভ করবে। কেউ কারো উপর অগ্রাধিকার লাভ করবে না। তবে মৃত্যুরোগের অবস্থায় সম্পন্ন মুক্তিদান এবং অসিয়তকারীর মৃত্যুর সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত মুক্তিদান, যেমন বিশুদ্ধরূপে[1] মুদাব্বার ঘোষণা করা এবং মৃত্যুরোগের সময় সম্পন্ন অতিহ্রাসকৃত মূল্যে বিক্রয় (এগুলো অগ্রাধিকার লাভ করবে)।

কেননা অসিয়তগুলো ('কারণ'-এর দিক থেকে) সমতাপূর্ণ। আর হকদার হওয়ার কারণ-এর ক্ষেত্রে সমতা মূল হক-দার হওয়ার ক্ষেত্রেও সমতা অবশ্য সাব্যস্ত করে। তবে এই মাত্র আমাদের উল্লেখকৃত (দু'ধরণের) মুক্তিদানকে অগ্রাধিকার প্রদানের কারণ এই যে, তা অধিকতর শক্তিশালী। কেননা তাতে অসিয়তকারীর পক্ষ হতে 'প্রত্যাহার' যুক্ত হতে পারে না। পক্ষান্তরে অন্যগুলোতে প্রত্যাহার যুক্ত হতে পারে।

তদ্রূপ অতিহ্রাসকৃত মূল্যে বিক্রয়ের ক্ষেত্রেও অসিয়তকারীর দিক থেকে প্রত্যাহার যুক্ত হতে পারে না। আর উপরোক্ত মুক্তি ও বিক্রয়কে যখন অগ্রাধিকার প্রদান করা হলো, তখন এগুলো উশুল করার পর এক-তৃতীয়াংশ থেকে যা অবশিষ্ট থাকবে, তাতে ঐ দু'জন হকদার ছাড়া অন্যরা, অসিয়তপ্রাপ্তরা সমান হবে। এদের ক্ষেত্রে একজনকে অন্যজনের উপর অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে না।

মতপার্থক্যপূর্ণ ক্ষেত্রে সাহেবায়নের যুক্তি এই যে, মুক্তিদান হ্রাসকৃত মূল্যে বিক্রয় থেকে অধিকতর শক্তিশালী, কেননা তা নাকচ হতে পারে না। পক্ষান্তরে হ্রাসকৃত মূল্যে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রেতার দিক থেকে তা নাকচ হতে পারে। আর উচ্চারণগত অগ্রবর্তিতার বিষয়টি বিবেচ্য নয়। কেননা তা সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রবর্তিতা অবশ্য সাব্যস্ত করে না। (কেননা তা স্থিতি লাভের সময় হলো মৃত্যুপরবর্তী সময়, আর তখন সবগুলো যুগপৎ স্থিতি লাভ করে)।

ইমাম আবু হানীফা (র) এর যুক্তি এই যে, অতিহ্রাসকৃত মূল্যে বিক্রয়ের বিষয়টি অধিকতর শক্তিশালী। কেননা, তা বিনিময় চুক্তির অন্তর্গত হয়ে সাব্যস্ত হয়। সুতরাং গুণগতভাবে এটা দান হলেও শব্দগতভাবে (এবং চুক্তিগতভাবে) দান নয়, বরং

---

১. যদি বিশুদ্ধরূপে মুদাব্বার ঘোষণা না করা হয়। যেমন বললো ঃ আমার মৃত্যুর একদিন বা দু'দিন পরে সে আযাদ হবে, তাহলে অন্যান্য অসিয়তের উপর অগ্রাধিকার লাভ করবে না।

বিনিময়। পক্ষান্তরে মুক্তিদান শব্দগতভাবে এবং গুণগতভবে উভয় দিক থেকেই 'দান' রূপে গণ্য।

সুতরাং অতি হ্রাসকৃত মূল্যে বিক্রয় যখন প্রথমে অস্তিত্ব লাভ করবে, তখন সে অধিকতর দুর্বলটিকে রোধ রবে। পক্ষান্তরে মুক্তিদান যখন প্রথমে অস্তিত্ব লাভ করবে এবং সাব্যস্ত হয়ে যাবে, আর সাব্যস্ত হওয়াকে রোধ করা সম্ভব নয়, তখন তার অনিবার্য ফল হবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। (সুতরাং দু'টোই সমান হবে।)

এই মূলনীতির ভিত্তিতেই ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন ঃ যদি প্রথমে অতিহ্রাসকৃত মূল্যে বিক্রি করে, তারপর আযাদ করে, তারপর (তৃতীয় একটি গোলামকে) অতি হ্রাসকৃত মূল্যে বিক্রি করে, তাহলে দু'টি বিক্রয়ের মাঝে এক-তৃতীয়াংশকে অর্ধেক করে বন্টন করা হবে। কেননা (বিনিময় চুক্তির অন্তর্গত রূপে সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে) দু'টোই সমান।

এরপর শেষ হ্রাসকৃত বিক্রয়ের ভাগে যা পড়েছে, সেটা তার মাঝে ও মুক্তিদানের মাঝে বন্টিত হবে। কেননা মুক্তিদান তার আগে সম্পন্ন হয়েছে। ফলে উভয়টি সমতা লাভ করেছে।

আর যদি প্রথমে একটি গোলামকে মুক্তি দান করে, তারপর একটি গোলামকে হ্রাসকৃত মূল্যে বিক্রি করে, তারপর একটি গোলামকে মুক্তিদান করে, তাহলে প্রথম মুক্তিদানের মাঝে এবং হ্রাসকৃত মূল্যে বিক্রয়ের মাঝে এক-তৃতীয়াংশ অর্ধেক করে বন্টন করা হবে। আর প্রথম মুক্তিদানের ভাগে যা আসবে, সেটাকে তার মাঝে এবং দ্বিতীয় মুক্তিদানের মাঝে বন্টন করা হবে।

আর সাহেবায়নের মতে মুক্তিদান সর্ববাস্থায় অগ্রাধিকার লাভ করবে।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন ঃ যদি অসিয়ত করে যে, এই একশ দিরহাম দ্বারা একটি গোলামকে খরিদ করে তার পক্ষ হতে যেন আযাদ করা হয়, তারপর তা থেকে যদি একটি দিরহাম নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে অবশিষ্ট দিরহাম দ্বারা তার পক্ষ হতে আযাদ করা হবে না। আর যদি তার পক্ষ হতে হজ্জ করানোর অসিয়ত হয়ে থাকে, তাহলে অবশিষ্ট দিরহাম দ্বারা ঐ স্থান থেকে তার পক্ষ হতে হজ্জ করানো হবে, যেখান থেকে ঐ পরিমাণ দ্বারা (মক্কায়) পৌঁছা সম্ভব।

আর যদি একশ দিরহাম থেকে কিছু নষ্ট না হয়ে থাকে, বরং হজ্জের পর কিছু উদ্বৃত্ত থেকে যায়, তাহলে তা ওয়ারিছদেরকে ফেরত দেয়া হবে। আর সাহেবায়ন বলেন ঃ অবশিষ্ট দিরহাম দ্বারা তার পক্ষ হতে গোলাম আযাদ করা হবে।

কেননা, এটা এক প্রকার ইবাদাত সম্পর্কিত অসিয়ত। সুতরাং যথাসম্ভব সেটাকে কার্যকর করা আবশ্যক হবে। হজ্জ সম্পর্কিত অসিয়তের উপর কিয়াস করে এ সিদ্ধান্ত দেয়া হয়েছে।

ইমাম আবু হানীফা (র) এর যুক্তি এই যে, এটা হচ্ছে এমন গোলাম আযাদ করার অসিয়ত, যা একশ দিরহাম দ্বারা খরিদ করা হবে। সুতরাং তার চেয়ে কম মূল্যে

খরিদকৃত গোলামের ক্ষেত্রে অসিয়ত কার্যকর করার অর্থ হবে, অসিয়তকৃত ক্ষেত্রের বাইরে তা কার্যকর করা। আর তা জাইয নয়। পক্ষান্তরে হজ্জ সম্পর্কিত অসিয়তের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা তা সম্পূর্ণরূপে ইবাদত, যা আল্লাহ্‌র হক। ফলে এক্ষেত্রে হকদারের পরিবর্তন হয় না। সুতরাং (হজ্জ সম্পর্কিত অসিয়তের) বিষয়টি এমন হল যে, কোন লোকের নামে একশ দিরহামের অসিয়ত করলো, এরপর তার অংশবিশেষ নষ্ট হয়ে গেল, তখন অবশিষ্টটুকু তাকে প্রদান করা হয়।

কারো কারো মতে এ মাসআলাটির ভিত্তি হলো অন্য একটি মতপার্থক্যপূর্ণ মূলনীতির উপর। আর তা এই যে, সাহেবায়নের মতে 'মুক্তি' হলো আল্লাহ্‌র হক; একারণেই এ বিষয়ে দাবী উত্থাপন ছাড়া সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। সুতরাং (সাহেবায়নের মতে অবশিষ্ট দিরহাম দ্বারা গোলাম খরিদ করে আযাদ করার ক্ষেত্রে) হকদারের পরিবর্তন হয় না।

আর ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে, এটা হলো বান্দার হক। তাই দাবী উত্থাপন ছাড়া এক্ষেত্রে সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণ করা হয় না। (সুতরাং একশ দিরহামের গোলাম আযাদ করার অসিয়তের ক্ষেত্রে কম মূল্যে গোলাম আযাদ করা হলে) হকদার ভিন্ন হয়ে যায়। এটাই অধিক যুক্তিগ্রাহ্য।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন ঃ কেউ যদি দু'জন পুত্র রেখে মারা যায় আর এক দিরহাম এবং একশ দিরহাম মূল্যের একটি গোলাম রেখে যায়; আর অবস্থা এই যে, মৃত্যু রোগের অবস্থায় গোলামটিকে সে আযাদ করে দিয়েছে, আর ওয়ারিশদ্বয় সেটা অনুমোদন করেছে; তাহলে গোলামকে কোন পমিাণের ক্ষেত্রে উপার্জন প্রচেষ্টায় নিয়োজিত হতে হবে না।

কেননা মৃত্যু রোগের সময় মুক্তিদান করা যদিও অসিয়তের পর্যায়ভুক্ত, আর তা এক-তৃতীয়াংশের বেশী পরিমাণে সম্পন্ন হয়েছে, কিন্তু ওয়ারিছদের অনুমোদনের কারণে তা বৈধতা লাভ করবে। কিন্তু নিষিদ্ধতা ছিল তাদের অধিকার সংরক্ষণের জন্য, আর তারা তা রহিত করে দিয়েছে।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন ঃ কেউ যদি তার গোলামকে আযাদ করার অসিয়ত করে, এরপর সে মৃত্যুবরণ করে, আর গোলাম কোন 'অপরাধ' করে এবং (ওয়ারিছগণ) অপরাধের বিপরীতে তাকে অর্পণ করে, তাহলে অছিয়ত বাতিল হয়ে যাবে।

কেননা গোলামকে অর্পণ করা সিদ্ধ হয়েছে। যেহেতু জিনায়াতের (শিকার ব্যক্তির) অভিভাবকের হক অসিয়তকারীর হকের উপর অগ্রবর্তী হবে। কেননা সে তো অসিয়তকারীর দিক থেকেই মালিকানা লাভ করে থাকে। তবে ঐ গোলামের মাঝে অসিয়তকারীর মালিকানা বহাল থাকে, অর্পণ করার মাধ্যমেই শুধু তা বিলুপ্ত হয়। সুতরাং অর্পণ করার মাধ্যমে যখন গোলাম তার মালিকানা থেকে বের হয়ে যাবে, তখন অসিয়ত বাতিল হয়ে যাবে। যেমন অসিয়তকারী যদি গোলামকে বিক্রি করে কিংবা তার মৃত্যুর পর তার ওয়ারিছ যদি (ঋণের কারণে) তাকে বিক্রি করে।

পক্ষান্তরে ওয়ারিছরা যদি গোলামকে (অর্পণ না করে) তার ফিদ্‌য়া বা অপরাধ পণ পরিশোধ করে, তাহলে 'অপরাধ পণ' তাদের মাল থেকে যাবে। কেননা তারাই সে দায় গ্রহণ করেছে, আর অসিয়ত জাইয হয়ে যাবে। কেননা, 'অপরাধ পণ' পরিশোধের মাদ্যমে গোলাম অপরাধ থেকে পবিত্র হয়ে গেছে। যেন সে কোন অপরাধই করেনি। সুতরাং অসিয়ত কার্যকর হবে।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন ঃ কেউ যদি তার মালের এক-তৃতীয়াংশ অন্যকে অসিয়ত করে, আর অসিয়তপ্রাপ্ত ব্যক্তি এবং ওয়ারিছ স্বীকারোক্তি করে যে, মাইয়েত (মৃত্যুর আগে) এই গোলামকে আযাদ করেছে, এরপর অসিয়তপ্রাপ্ত ব্যক্তি বলে যে, সে সুস্থ অবস্থায় তাকে আযাদ করেছে, আর ওয়ারিছ বলে যে, মৃত্যু রোগের অবস্থায় সে তাকে আযাদ করেছে, তাহলে ওয়ারিছের কথা গ্রহণযোগ্য হবে। আর অসিয়তপ্রাপ্ত ব্যক্তি কিছুই পাবে না, তবে যদি তৃতীয়াংশ থেকে কিছু উদ্বৃত্ত থাকে, কিংবা তার পক্ষে এই মর্মে সাক্ষ্য প্রমাণ থাকে যে, সুস্থ অবস্থায় মুক্তিদান সম্পন্ন হয়েছে।

কেননা, অসিয়তপ্রাপ্ত ব্যক্তি দাবী করছে যে, গোলাম আযাদ করার পর যে সম্পত্তি অবশিষ্ট রয়েছে, তার এক-তৃতীংয়াংশের সে হকদার। কেননা সুস্থ অবস্থায় আযাদ করা অর্থ অসিয়ত করা নয়। এ কারণেই তা সমস্ত মাল থেকে কার্যকর হবে। পক্ষান্তরে ওয়ারিছ তা অস্বীকার করছে। কেননা তার দাবী হলো অসুস্থ অবস্থায় আযাদ করা, আর সেটা অসিয়ত রূপে গণ্য হয়। আর অসুস্থ অবস্থায় মুক্তি দান এক-তৃতীয়াংশ সম্পর্কিত অসিয়তের উপর অগ্রাধিকার পেয়ে থাকে। সুতরাং ওয়ারিছ হলো অস্বীকারকারী। আর কসমসহ অস্বীকারকারীর কথাই গ্রহণযোগ্য হয়।

তাছাড়া মুক্তিদান হচ্ছে একটি উদ্ভূত অবস্থা, আর উদ্ভূত অবস্থাগুলাকে নিকটতম সময়ের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করা হয়। কেননা ঐ বিষয়ে নিশ্চয়তা রয়েছে। সুতরাং বাহ্যিক অবস্থা ওয়ারিছের অনুকূলে সাক্ষী হলো, ফলে কসমসহ তার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। তবে যদি গোলামের মূল্যের উপর তৃতীয়াংশ থেকে কিছু উদ্বৃত্ত হয় (সেটা অসিয়তপ্রাপ্ত ব্যক্তির প্রাপ্য হবে।) কেননা ঐ অংশের ক্ষেত্রে তার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। কিংবা যদি তার পক্ষে এই মর্মে সাক্ষ্য-প্রমাণ থাকে যে, মুক্তিদান সুস্থ অবস্থায় সম্পন্ন হয়েছিল। কেননা সাক্ষ্য-প্রমাণ দ্বারা যা সাব্যস্ত হয়, তা চাক্ষুষ সাব্যস্ত হওয়ার সমতুল্য। আর নিজের হক সাব্যস্ত করার জন্য সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপনের ব্যাপারে সে প্রতিপক্ষরূপে গণ্য।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন ঃ কেউ যদি কোন গোলাম রেখে যায়, আর সে ওয়ারিছকে বলে যে, তোমার আব্বা আমাকে সুস্থ অবস্থায় আযাদ করেছেন। আরেক লোক বললো ঃ তোমার আব্বার কাছে আমার এক হাজার দিরহাম পাওনা আছে। আর ওয়ারিছ বললো যে, তোমরা দু'জন সত্য বলেছো, তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে গোলাম তার মূল্য পরিশোধের ব্যাপারে উপার্জন চেষ্টায় নিয়োজিত হবে। আর ছাহেবায়ন বলেন ঃ সে আযাদ হয়ে যাবে, কোন পরিমাণের ক্ষেত্রেই উপার্জন চেষ্টায় নিয়োজিত হবে না।

কেননা ওয়ারিছের একই বাক্যে সত্যায়নের মাধ্যমে ঋণ ও সুস্থাবস্থায় মুক্তিদানের বিষয়টি যুগপৎ প্রকাশ পেয়েছে, সুতরাং এমনই হলো, যেন বিষয় দুটি একসাথে সম্পন্ন হয়েছে। আর সুস্থ অবস্থার মুক্তিদান উপার্জন প্রচেষ্টাকে আবশ্যক করে না, যদিও আযাদকারীর যিম্মায় কোন ঋণ থাকে।

ইমাম আবু হানীফা (র) এর যুক্তি এই যে, ঋণ সম্পর্কিত স্বীকারোক্তি অধিকতর শক্তিশালী। কেননা তা সমগ্র সম্পদ থেকে বিবেচিত হয়। পক্ষান্তরে অসুস্থাবস্থায় মুক্তিদানের স্বীকারোক্তি একতৃতীয়াংশ থেকে বিবেচিত হয়। আর শক্তিশালীতরটি দুর্বলতরটিকে রোধ করে। এখানে রোধ করার অর্থ হলো মুক্তিদান মূলতই বাতিল হয়ে যাওয়া। আর যেহেতু তা সম্পন্ন হওয়ার পর বাতিল হওয়ার সম্ভাবনা রাখে না, সেহেতু উার্জন প্রচেষ্টা অবশ্য সাব্যস্ত করার মাধ্যমে গুণগত দিক থেকে তা রোধ করা হবে।

তাছাড়া কারণ এই যে, ঋণের বিষয়টি অগ্রবর্তী। কেননা তা সম্পৃক্ত করার ক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধক নেই ; সুতরাং সেটাকে সুস্থতার অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত করা হবে। কিন্তু মুক্তিদানকে সুস্থতার অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত করা সম্ভব নয়। কেননা ঋণ মৃত্যুরোগের অবস্থায় বিনিময় ছাড়া মুক্তিদানকে রোধ করে। কাজেই উপার্জন প্রচেষ্টা ওয়াজিব হবে।

একই মতপার্থক্য হবে যদি লোকটা এক হাজার দিরহাম রেখে মারা যায়, আর কোন লোক দাবী করে যে, মৃত ব্যক্তির যিম্মায় আমার এক হাজার দিরহাম ঋণ পাওনা রয়েছে। আর অন্য একজন বলে তার কাছে আমার এক হাজার দিরহাম আমানত রূপে গচ্ছিত ছিল। (আর ওয়ারিছ বললো যে, তোমরা সত্য বলেছো।) এক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে গচ্ছিত আমানত অধিকতর শক্তিশালী হবে। আর সাহেবায়নের মতে উভয়টি সমান হবে।

পরিচ্ছেদ ঃ

কেউ যদি আল্লাহ্র হক সংক্রান্ত কিছুর অসিয়ত করে, তবে সেগুলোর মধ্য হতে ফরয সম্পর্কিত অীছয়তগুলোকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে। অসিয়তকারী সেগুলোর অসিয়ত আগে করুক কিংবা পরে করুক, যেমন হজ্জ, যাকাত ও কাফ্ফারা।

কেননা, ফরয নফল হতে গুরুত্বপূর্ণ। আর অসিয়তকারীর পক্ষ হতে প্রকাশিত অবস্থা হল অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি দিয়ে অছিয়ত শুরু করা।

আর যদি গুরুত্ব ও শক্তিশালী হওয়ার দিক থেকে সবগুলো সমান হয়, আর একতৃতীয়াংশ মাল সবগুলো আদায় করা থেকে কম হয়ে যায়, তাহলে অসিয়তকারী যেটাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে, সেটা দ্বারা শুরু করা হবে।

কেননা বাহ্যিক অবস্থা এটাই যে, সে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণটি দ্বারা শুরু করবে। আর ইমাম তাহাবী (র) বলেছেন যে, তিনি যাকাত দ্বারা শুরু করবেন এবং যাকাতকে হজ্জ

এর উপর অগ্রাধিকার দেবেন। এটি ইমাম আবু ইউসুফ (র) হতে প্রাপ্ত দুটি বর্ণনার একটি বর্ণনা। তাঁর থেকে প্রাপ্ত আরেকটি বর্ণনা এই যে, হজ্জকে যাকাতের উপর অগ্রবর্তী করা হবে। আর এটা ইমাম মুহম্মদ (র) এরও অভিমত।

প্রথমটির যুক্তি এই যে, ফরয হওয়ার ক্ষেত্রে হজ্জ ও যাকাত দুটোই মাল হলেও যাকাতের সঙ্গে বান্দার হকেরও সম্পর্ক রয়েছে। সুতরাং সেটাই অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য হবে। অন্য বর্ণনাটির যুক্তি এই যে, হজ্জ মাল দ্বারা এবং জান দ্বারা আদায় করা হয়, আর যাকাত শুধু মাল দ্বারা আদায় করা হয়। সুতরাং হজ্জ অধিকতর শক্তিশালী হলো।

এরপর হজ্জ ও যাকাত উভয়কে কাফফারা সমুহের উপর অগ্রাধিকার দেয়া হবে। কেননা শক্তিশালী হওয়ার দিক থেকে ঐগুলির উপর ঐ দুটির বৈশিষ্ট্য রয়েছে। কেননা, ঐ দুটি সম্পর্কে এমন সতর্কবাণী এসেছে, যা কাফফারার ক্ষেত্রে আসেনি।

আর অনিচ্ছাকৃত হত্যার কাফফারা, যিহারের কাফফারা এবং ইয়মীনের কাফফারা, ছাদাকাতুল ফিতরের উপর অগ্রাধিকার পাওয়ারযোগ্য। কেননা, ঐ গুলোর ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টি কোরআন দ্বারা জানা গেছে, ছাদাকাতুল ফিতরের বিষয়টি সেরূপ নয়। আর ছাদাকাতুল ফিতর কুরবাণীর উপর অগ্রবর্তী। কেননা ছাদাকাতুল ফিতর ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে সকলের সম্মতি রয়েছে, আর কুরবাণী ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে মতপার্থক্য রয়েছে। আর এই কিয়াস ও সূত্রের ভিত্তিতে কোন ওয়াজিবকে কোন ওয়াজিবের উপর অগ্রাধিকার দেয়া হয়ে থাকে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ আর যা ওয়াজিব নয়, সেগুলোর মধ্য হতে অছিয়তকারী যেটাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে, সেটাকেই অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

এর কারণ আমরা উল্লেখ করেছি যে, বাহ্যিক অবস্থা হলো অছিয়তকারী তার কাছে যেটা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ, সেটাকেও অগ্রাধিকার দেবে। আর বিষয়টি স্পষ্টভাবে অগ্রাধিকার দেয়ার মত হবে।

আলিমগণ বলেছেন যে, আল্লাহর নামে কৃত এবং বান্দার নামে কৃত সমস্ত অছিয়তের উপর একতৃতীয়াংশ মালকে বন্টন করা হবে। এরপর ইবাদতের ভাগে যা পড়েছে, সেই মালকে ঐ ইবাদতগুলো আদায়ের কাজে আমাদের উল্লেখিত বিন্যাস অনুযায়ী ব্যয় করা হবে, এবং ইবাদতের সংখ্যার উপর বন্টিত হবে। সবকটি অছিয়তকে একটি অছিয়তের মত গণ্য করা হবে না।

কেননা, সমস্ত অছিয়ত দ্বারা যদি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে প্রতিটি নিজস্বভাবেই উদ্দেশ্য হতে পারে। সুতরাং মানুষের নামে কৃত অছিয়তগুলো যেমন আলাদা হয় তেমনি এগুলোও আলাদা হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ আর কেউ যদি ফরয হজ্জের অছিয়ত করে, তাহলে ওয়ারিছরা তার পক্ষ হতে একজন লোককে তার শহর থেকে হজ্জ করাবে। আর সে সওয়ারিযোগে হজ্জ করবে।

কেননা, অসিয়তকারীর উপর আল্লাহর নামে যে হজ্জ্ব ফরয হয়েছে, সেটা হলো তার শহর থেকে কৃত হজ্জ্ব। একারণেই হজ্জ্ব ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে এই পরিমাণ মাল থাকা বিবেচ্য হয় , যা তার থেকে হজ্জ আদায় করার জন্য যথেষ্ট হয়। আর তার উপর যা ওয়াজিব হয়েছে, সেটা আদায় করার জন্যই সে অসিয়ত করেছে।

আর 'সওয়ারী যোগে' বলার কারণ এই যে, অসিয়তকারীর উপর তো পদব্রজে হজ্জ করা অপরিহার্য নয়, সুতরাং যে ভাবে তার উপর হজ্জ ওয়াজিব হয়েছে, সেভাবেই তা নিযুক্ত লোকটির সাথে প্রযুক্ত হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেনঃ আর অসিয়তকৃত মাল যদি হজ্জের খরচের জন্য যথেষ্ট না হয়, তাহলে তার পক্ষ হতে ঐ স্থান থেকে হজ্জ করবে, যেখান থেকে তা যথেষ্ট হয়।

কিয়াসের দাবী হলো তার পক্ষ হতে হজ্জ না করানো। কেননা, সে এমন গুণসহ হজ্জ করানোর আদেশ করেছে, যা এই হজ্জটির ক্ষেত্রে আমরা অনুপস্থিত দেখতে পাচ্ছি। তবে আমরা এটাকে একারণে বৈধ বলে সাব্যস্ত করেছি যে, আমরা জানি যে, অসিয়তকারী অসিয়ত কার্যকর করার ইচ্ছা পোষণ করেছে। সুতরাং যতদূর সম্ভব তা কার্যকর করা আবশ্যক হবে। আর এ ক্ষেত্রে আমরা যা উল্লেখ করেছি, তা সম্ভব। আর অসিয়তকে একেবারেই বাতিল করে দেয়ার চেয়ে সেটাই উত্তম।

আর হজ্জের অসিয়ত এবং গোলাম আযাদ করার অসিয়তের মাঝে পার্থক্য ইতিপূবে আমরা বর্ণনা করেছি।

ইমাম কুদূরী (র) বলেনঃ কেউ যদি তার শহর থেকে হজ্জের নিয়তে সফরে বের হয়, আর পথে মারা যায়, এবং তার পক্ষ হতে হজ্জ করানোর অসিয়ত করে, তাহলে তার পক্ষ হতে তার শহর থেকে হজ্জ করতে হবে।

এটা ইমাম আবূ হানীফা (র) এর অভিমত। ইমাম যুফার (র) ও তাই বলেন। আর ইমাম আবূ ইউসূফ ও মুহম্মদ (র)-এর মতে, যে স্থান পর্যন্ত সে পৌছেছে, সেখান থেকে তার পক্ষ হতে হজ্জ করানো হবে। সিদ্ধান্ত সূক্ষ্ম কিয়াসের ভিত্তিতে। একই মত পার্থক্য হবে যদি অন্যের পক্ষ হতে হজ্জকারী পথে মারা যায়।

ছাহেবায়নের যুক্তি এই যে, হজ্জের নিয়তে কৃত সফর ইবাদত-এ পরিণত হয়েছে, এবং তার সফর-পরিমাণ দূরত্ব অতিক্রমের ফরয রহিত হয়ে গেছে, আর আল্লাহর কাছে তার প্রতিদান সাব্যস্ত হয়ে গেছে। সুতরাং ঐ স্থান থেকে তার বদলী হজ্জ শুরু হবে। যেন সে ঐ স্থানের বাসিন্দা। ব্যবসায়ের সফরে বের হওয়ার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, তা ইবাদত রূপে গণ্য হয়নি। সুতরাং এ ক্ষেত্রে তার শহর থেকে তার পক্ষ হতে হজ্জ করানো হবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর যুক্তি এই যে, আমরা ইতিপূর্বে যা বর্ণনা করেছি, তার ভিত্তিতে অসিয়তটি তার শহর থেকে হজ্জ করানোর দিকে অভিমুখী হবে, যাতে ওয়াজিব ইবাদতটি সেভাবেই আদায় হয়, যেভাবে ওয়াজিব হয়েছে। আল্লাহ অধিক অবগত।

নিকটাত্মীয় এবং অন্যান্যদের নামে অসিয়ত

ইমাম কুদূরী (র) বলেনঃ কেউ যদি তার প্রতিবেশীদের নামে অসিয়ত করে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে তার বাড়ীর সংলগ্ন লোকেরা উদ্দেশ্য হবে। আর সাহেবায়ন বলেনঃ সংলগ্ন লোকেরাও হবে এবং অন্যান্যরাও হবে, যারা অসিয়তকারীর মহল্লায় বাস করে এবং মহল্লাহ্র মসজিদ যাদেরকে একত্র করে। এটা হলো সূক্ষ্ম কিয়াসের সিদ্ধান্ত। আর ইমাম আবূ হানীফা (র) এর মতামত হলো কিয়াসের সিদ্ধান্ত। কেননা, جَارٌ (প্রতিবেশী) শব্দটি مُجَاوَرَةٌ থেকে নিষ্পন্ন হয়েছে, যার প্রকৃত অর্থ সংলগ্নতা। এ কারণেই এই সংলগ্নতামূলক প্রতিবেশীতার ভিত্তিতে 'শোফা'-এর হকদার সাব্যস্ত হয়।

তাছাড়া যখন অসিয়তকে সমস্ত প্রতিবেশীর দিকে অভিমুখী করা সম্ভব নয়, তখন বিশিষ্টতম প্রতিবেশীর দিকে অভিমুখী করাই সংগত হবে। আর সে হলো সংলগ্ন প্রতিবেশী।

আর সূক্ষ্ম কিয়াসের যুক্তি এই যে, লোক প্রচলনে এদের সবাইকে جار বা প্রতিবেশী বলে। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিম্নোক্ত বাণী দ্বারা তা সমর্থিত হয়েছে ঃ

لاَ صَلاَةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلاَّ فِى الْمَسْجِدِ (الدار قطنى)

মসজিদের প্রতিবেশীর মসজিদে ছাড়া নামায জাইয নেই। (দারা-কুতনী বর্ণিত।)

আলী (রা) প্রতিবেশীর ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ তারা এমন সকল ব্যক্তি, যারা আযানের আওয়াজ শুনতে পায়।

তাছাড়া অসিয়তকারীর উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রতিবেশীদের প্রতি সদাচার করা। আর (শরীয়তের দৃষ্টিতে) এটা উত্তম হওয়া সংলগ্ন-আসংলগ্ন সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করে, তবে প্রতিবেশিতার জন্য 'মেলামেশা' থকা দরকার। আর মসজিদের অভিন্নতার ক্ষেত্রে তা পাওয়া যাবে।

আর ইমাম শায়েফী (র) যা বলেছেন্ ঃ প্রতিবেশিতা হলো চারদিক থেকে চল্লিশ ঘর পর্যন্ত, তা যুক্তি থেকে দুরে। আর এ বিষয়ে যে হাদীস বর্ণনা করা হয়, তা দুর্বল।

আলিমগণ বলেছেনঃ প্রতিবেশিতার বিষয়ে বাড়ীর মালিক ও বাসিন্দা, পুরুষ ও নারী, মুসলিম ও যিম্মী সবাই সমান। কেননা, جار বা প্রতিবেশি শব্দটি সককে অন্তর্ভুক্ত

করে। ইমাম আবূ হানীফা (র) -এর মতে এমনকি বসবাসকারী গোলামও প্রতিবেশীর অন্তর্ভুক্ত। কেননা, শব্দটি শর্তমুক্ত। তবে ছাহেবায়নের মতে গোলাম অন্তর্ভূক্ত হবে না। কেননা, তার নামে অসিয়রত করার অর্থ হবে, তার মনিবের নামে অসিয়ত করা। অথচ সে তো বাসিন্দা নয়।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ কেউ যদি তার أَصْهَارُ বা কুটুম্বদের নামে অসিয়ত করে, তাহলে অসিয়ত তার স্ত্রীর সকল মাহরাম আত্মীয়দের প্রাপ্য হবে।

কেননা, বর্ণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা যখন হযরত ছাফিয়্যা (রা) কে বিবাহ করেন, তখন তিনি তার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য তাঁর সকল মাহরাম আত্মীয়কে আযাদ করে দেন। আর এদেরকে নবী (স)-এর কুটুম্ব বলে আখ্যায়িত করা হতো।

আর أَصْهَارُ-এর এই ব্যাখ্যা ইমাম মুহাম্মদ (র) ও আবূ উবায়দা (র)-এর পছন্দনীয়। অদ্রূপ তাতে তার পিতার স্ত্রীর,তার পুত্রের স্ত্রীর এবং তার সকল মাহরাম আত্মীয়ের স্ত্রীর মাহরাম আত্মীয়রা অন্তর্ভুক্ত হবে। কেননা, এদের সবাইকে أَصْهَارُ (কুটুম্ব) বলে।

আর অসিয়তকারী যদি তার স্ত্রীকে বিবাহে রেখে কিংবা 'তালাকে রিজয়ী'-এর ইদ্দতে রেখে মারা যায়, তাহলে স্ত্রী পক্ষের কুটুম্বরা অসিয়তের হকদার হবে।

আর যদি সে তাকে 'বায়েন তালাকের' ইদ্দতে রেখে মারা যায়, তাহলে অসিয়তের বিবাহের স্থায়িত্ব দ্বারা হবে। আর তা মৃত্যুর সময় বিদ্যমান থাকা হলো শর্ত।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ কেউ যদি তার'জামাইদের' নামে অসিয়ত করে, তাহলে তার সকল মাহরাম নারীর স্বামীরা এবং স্বামীদের 'মাহরাম' আত্মীয়রা অন্তর্ভুক্ত হবে। কেননা, এদের মতে এটা হলো তাদের,(অর্থাৎ কুফাবাসীদের) লোক প্রচলন। পক্ষান্তরে আমাদের (খোরাসানের) লোক প্রচলনে শুধু মাহরাম নারীদের স্বামীরা অন্তর্ভুক্ত হবে। (স্বামীদের মাহরাম আত্মীয়রা নয়।)

আর তাতে দাসও স্বাধীন এবং দূর ও নিকট সবাই অন্তর্ভুক্ত হবে। কেননা, শব্দটি সবাইকে শামিল করে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেনঃ কেউ যদি তার নিকটাত্মীয়দের নামে অসিয়ত করে, তাহলে সেটা (মাতৃ ও পিতৃকুলের) সকল মাহরাম আত্মীয়দের মধ্য হতে পর্যায়ক্রমে নিকটতরদের জন্য হবে। আর তাতে মা-বাবা ও সন্তান অন্তর্ভুক্ত হবে না। **আর তা দুই বা ততোধিকের জন্য হবে।** এটা ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর অভিমত। **আর ছাহেবায়ন বলেনঃ উক্ত অসিয়ত এমন সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, যারা অসিয়তকারীর ইসলাম গ্রহণ কালের সর্বোচ্চ পূর্বপুরুষের সাথে সম্বন্ধ যুক্ত।**

আর তিনি হলেন ইসলাম গ্রহণকারী প্রথম পূর্বপুরুষ। কিংবা ইসলামী কাল প্রত্যক্ষকারী প্রথম পূর্বপুরুষ। যদিও সে ইসলাম গ্রহণ না করে, যেমন এতে

মাশায়েখদের মতপার্থক্য রয়েছে। এই মতপার্থক্যের ফলাফল প্রকাশ পাবে আবূ তালিবের পুত্রদের ক্ষেত্রে। কেননা, তিনি ইসলামী কাল প্রত্যক্ষ করেছেন, কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করেণনি।[১]

ছাহেবায়নের যুক্তি এই যে, اَلْقَرِيْبُ (নিকট) قَرَابَةٌ (নিকটতা) থেকে নির্গত। সুতরাং اَلْقَرِيْبُ শব্দটি এমন যে করো জন্য প্রযুক্ত শব্দ হবে, যার সঙ্গে নিকট সম্পর্ক রয়েছে। সুতরাং শব্দটি তার মৌল অর্থের দিক থেকে মতপার্থক্যপূর্ণ ক্ষেত্রগুলোকে অর্থাৎ অমাহরাম আত্মীয়দেরকেও এবং দূরবর্তী মাহরাম আত্মীয়দেরকেও শামিল করে।

ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর যুক্তি এই যে, অসিয়ত হলো নারীদের সমগোত্রীয়. আর মীরাছের ক্ষেত্রে পার্যায়ক্রমে নিকটতরকে বিবেচনায় আনা হয়। বস্তুত মীরাছের ক্ষেত্রে উল্লেখিত বহুবচনের শব্দটি দ্বারা দু'জন উদ্দেশ্য। সুতরাং অসিয়তের ক্ষেত্রেও সর্বনিম্ন দু'জন উদ্দেশ্য হবে। আর এই অসিয়তের উদ্দেশ্য হচ্ছে আত্মীয়তার হক রক্ষার ক্ষেত্রে যে, ত্রুটি হয়েছে, তার ক্ষতিপূরণের চেষ্টা করা। আর আত্মীয়তার হকের সম্পর্ক হলো মাহরাম আত্মীয়দের সঙ্গে।'জন্মগত' আত্মীয়তা-এর অন্তর্ভুক্ত হবে না। কেননা, এদেরকে اَقْرِبَاءُ বা নিকটাত্মীয় বলা হয় না। বরং কেউ যদি বাপকে 'নিকটাত্মীয়' বলে, তাহলে এটাকে পিতার প্রতি অসৌজন্য আচরণ বলে গণ্য করা হয়। এর কারণ এই যে, ভাষার প্রচলনে قَرِيْبُ বলে ঐ ব্যক্তিকে, যে অন্যের কাছে অন্য কারো সূত্রে নৈকট্য লাভ করে। অথচ পিতার ও সন্তানের নৈকট্য স্বকীয়ভাবেই হয়, অন্যের মাধ্যমে নয়। আর তা বর্জনের বিষয়ে 'ইজমা' সম্পন্ন হয়ে যাওয়ার পর, শব্দের বাহ্যিক অর্থ বিবেচ্য নয়। সুতরাং ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতে আমরা যা উল্লেখ করেছি, সেটা দ্বারা অসিয়তটি আবদ্ধ হবে। আর ছাহেবায়নের মতে ইসলাম কালের সর্বোচ্চ পূর্ব পুরুষ দ্বারা আবদ্ধ হবে। আর ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে সর্বনিম্ন পূর্বপূরুষ দ্বারা আবদ্ধ হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ কেউ যদি তার নিকটাত্মীয়দের নামে অসিয়ত করে, আর তার দুই চাচা ও দুই মামা থাকে, তাহলে অসিয়ত তার দুই চাচার জন্য হবে।

এটা ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর অভিমত। কেননা, তিনি অধিকতর নিকটাত্মীয়ের বিষয়টি বিবেচনা করেন। যেমন মীরাছের ক্ষেত্রে করা হয়।

আর ছাহেবায়নের মতে তাদের অর্থাৎ দুই চাচা ও দুই মামার মাঝে চার ভাগে বণ্টিত হবে। কেননা, তারা অধিকতর নৈকট্যর বিষয়টি বিবেচনা করেণ না।

আর যদি একজন চাচা ও দু'জন মামা রেখে যায়, তাহলে চাচার প্রাপ্য হবে অসিয়তের অর্ধেক, আর দুই মামার হবে বাকি অর্ধেক।

কেননা, বহুবচনের অর্থগতদিক বিবেচনা করা জরুরী। আর মীরাছের মত অসিয়তের ক্ষেত্রেও তার সংখ্যা হচ্ছে দুই।

১. সুতরাং কোন আলাবী যদি অসিয়ত করে তাহলে প্রথম মতে সর্বোচ্চ পূর্ব পুরুষ আলী (রা) হবেন। সুতরাং আকীল ও জাফর (রা) এর সন্তানেরা এর অন্তর্ভুক্ত হবে না। আর দ্বিতীয় মতে সর্বোচ্চ পূর্ব পুরুষ হবেন আবু তালিব। সুতরাং জাফর ও আকীলের সন্তানেরা এর অন্তর্ভুক্ত হবে।

পক্ষান্তরে যদি একবচনের শব্দ যোগে 'নিকটাত্মীয়'-এর জন্য অসিয়ত করে, তাহলে সমগ্র অসিয়ত চাচার জন্য হবে। কেননা, সেই নিকটতর।

আর যদি (নিকটাত্মীয়দের জন্য অসিয়ত করার ক্ষেত্রে) তার একজন মাত্র চাচা থাকে, তাহলে আমাদের বর্ণিত (বহুবচনের অর্থগত দিক বিবেচনার) কারণে সে এক তৃতীয়াংশের অর্ধেক পাবে।

আর যদি একজন চাচা ও একজন ফুফু এবং একজন মামা ও একজন খালা রেখে যায়, তাহলে অসিয়তটি চাচা ও ফুফুর জন্য হবে। এবং উভয়ের মাঝে সমানভাবে বণ্টিত হবে। কেননা, উভয়ের আত্মীয়তার নৈকট্য সমান। আর তা মামা ও খালার তুলনায় অধিকতর শক্তিশালী। আর ফুফু ওয়ারিছ না হলেও অসিয়তের হকদার। যেমন নিকটাত্মীয় গোলাম কিংবা কাফের হওয়ার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। আমাদের উল্লেখকৃত সকল ক্ষেত্রে একই বিধান হবে যদি 'স্বজনদের' জন্য কিংবা জ্ঞাতীদের জন্য(অর্থাৎ 'নিকটাত্মীয়'-এর সমার্থক বহুবচনের শব্দযোগে) অসিয়ত করে। কেননা, এগুলো (নিকটাত্মীয়তা জ্ঞাপক ও বহুবচনমূলক শব্দ।

এ সকল ক্ষেত্রে যদি, মাহরাম আত্মীয় না থাকে, তাহলে অসিয়ত বাতিল হয়ে যাবে। কেননা, অসিয়ত উক্ত 'গুণ' দ্বারা শর্তযুক্ত।

হিদায়া গ্রন্থকার বলেনঃ কেউ যদি অমুকের পরিবারের জন্য অসিয়ত করে, তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে তা তার স্ত্রীর জন্য প্রযোজ্য হবে।

আর সাহেবায়নের মতে লোক প্রচলনের ভিত্তিতে তা ঐ লোকদেরকে অন্তর্ভুক্ত করবে, যাদেরকে সে প্রতিপালন করে এবং তার ভরণ পোষণ যাদেরকে শামিল করে, আর এটা নাছ বা আয়াত দ্বারা সমর্থিত।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ

وَاْتُوْنِىْ بِاَهْلِكُمْ اَجْمَعِيْنَ

অর্থাৎ তোমরা তোমাদের পরিবারের সবাইকে আমার কাছে নিয়ে আসো। (১২ঃ৯৩)।

ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর যুক্তি এই যে, মৌলিক অর্থে أهل বা পরিবার শব্দটি স্ত্রীর জন্য প্রযুক্ত হয়।

যেমন আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ

وَسَارَ بِاَهْلِهٖ

অর্থাৎ আর তিনি তার পরিবারকে নিয়ে যাত্রা করলেন, (২৮ঃ২৯) তা প্রমাণ করে। আর তা থেকে নিষ্পন্ন আরবদের উক্তি تَأَهَّلَ بِبَلْدَةِ كَذَا। অর্থাৎ সে অমুক শহরে 'أَهَّلَ' গ্রহণ করেছে, বা বিবাহ করেছে। আর শর্তমুক্ত শব্দ তার মৌল অর্থের অভিমুখী হয়ে থাকে।

আর কেউ যদি অমুকের ' آل ' বা খান্দানের জন্য অসিয়ত করে, তাহলে তা তার গোষ্ঠীর ঐ সকল লোকের জন্য হবে.(যারা তার ইসলাম কালের সর্বোচ্চ পূর্বপুরুষের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত।)

কেননা, ' آل' বা খান্দান অর্থ ঐ গোত্র, যার দিকে তার বংশ পরিচয় সম্বন্ধযুক্ত হয়।

আর কেউ যদি অমুকের পরিবারবর্গের জন্য অসিয়ত করে, তাহলে তাতে তার পিতা ও দাদা অন্তর্ভুক্ত হবে। কেননা, পিতা হলেন পরিবারের মূল।

আর কেউ যদি তার বংশীয় লোকদের জন্য কিংবা গোষ্ঠীর জন্য অসিয়ত করে, তাহলে ঐ লোকেরা উদ্দেশ্য হবে, যাদের সঙ্গে তার বংশ পরিচয় সম্বন্ধযুক্ত হয়। আর বংশ পরিচয় পিতার দিক থেকে হয়ে থাকে। তদ্রূপ পিতার পরিবার পরিজন হলো তার গোষ্ঠীর, মাতার পরিচয় নয়। কেননা, মানুষ পিতার গোষ্ঠীর দ্বারাই গোষ্ঠীগত পরিচয় গ্রহণ করে। আত্মীয়তার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, তা মা-বাবা উভয়ের দিক থেকেই হয়ে থাকে।

আর কেউ যদি অমুকের 'পুত্র বংশের' এতীমদের জন্য কিংবা তাদের অন্ধদের জন্য, কিংবা তাদের পঙ্গুদের জন্য,অমূকের জন্য, কিংবা তাদের জন্য, কিংবা তাদের অসিয়ত করে, আর তাদের সংখ্যা যদি 'গণনা সম্ভব' হয়,[১] তাহলে তাদের দরিদ্রেরা ও ধনীরা এবং তাদের পুরুষেরা ও নারীরা অন্তর্ভুক্ত হবে। কেননা, তাদের জন্য মালিকানা সাব্যস্ত করা সম্ভব হবে। আর অসিয়ত অর্থই হলো মালিকানা দান করা। আর যদি তাদের সংখ্যা 'গণনা সম্ভব' না হয়, তাহলে অসিয়ত শুধু তাদের দরিদ্রদের ক্ষেত্রে কার্যকর হবে।

কেননা, অসিয়তের উদ্দেশ্য হলো ছাওয়াব হাসিল করা। আর তা হবে প্রয়োজন পূরণের দ্বারা এবং ক্ষুধা দূর করা দ্বারা, আর এই শব্দগুলো প্রয়োজন গ্রস্ততার দিকে ইংগিত করে। সুতরাং এগুলোকে দরিদ্রদের উপর প্রয়োগ করা সিদ্ধ হবে।

পক্ষান্তরে কেউ যদি অমুকের 'পুত্র-বংশের' যুবকদের জন্য অসিয়ত করে, আর তাদের সংখ্যা 'গণনা সম্ভব' না হয়, কিংবা অমুকের পুত্র-বংশের স্বামীহীন মহিলাদের জন্য অসিয়ত করে, আর তাদের সংখ্যা 'গণনা সম্ভব' না হয়, তাহলে অসিয়ত বাতিল হয়ে যাবে। কেননা, শব্দ দুটিতে প্রয়োজন গ্রস্ততার প্রতি ইংগিত নেই। সুতরাং অসিয়তটিকে দরিদ্রের দিকে অভিমুখী করার সম্ভব নয়।

তদ্রূপ মালের পক্ষে মালিকানা সাব্যস্ত করার মাধ্যমে অসিয়তটিকে সিদ্ধতা দান করা সম্ভব নয়। কেননা, অজ্ঞতার পরিমাণ ব্যাপক এবং তাদের দিকে অভিমুখী করাও অসম্ভব।

---

১. ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে সংখ্যা একশর নীচে হলে তা গণনা সম্ভব, আর একশর বেশী হলে তা গণনা অসম্ভব, আর কারো কারো মতে বিষয়টি কাযীর বিবেচনার উপর ছেড়ে দেয়া হবে। এমত অনুসারেই ফতোয়া হবে।

আর দরিদ্র ও নিঃস্বদের নামে অসিয়ত করার ক্ষেত্রে অসিয়ত তাদের অন্তত দু'জনের দিকে অভিমুখী করা আবশ্যক হবে। এ বিধান হলো বহুবচনের অর্থগত দিক বিবেচনা করার ভিত্তিতে; যেমন পিছনে বলা হয়েছে, অসিয়ত সমূহের ক্ষেত্রে বহুবচনের সর্বনিম্ন পরিমাণ হল দু'জন। আর কেউ যদি 'অমুকের পুত্রদের' জন্য অসিয়ত করে,[১] তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর প্রথম দিকের মত অনুযায়ী কন্যারাও তার অন্তর্ভুক্ত থাকবে,এবং এটাই ছাহেবায়নের মত।

এরপর ইমাম আবু হানীফা (র) তার মত প্রত্যাহার করে বলেছেন ঃ বিশেষভাবে পুরুষদেরকে অন্তর্ভুক্ত করবে। কেননা, শব্দটি মৌল অর্থে পুরুষের জন্য প্রযুক্ত, আর নারীদের জন্য তার প্রয়োগ হলো রূপক। আর সাধারণ ক্ষেত্রে বক্তব্য মৌল অর্থেই উচ্চারিত হয়। পক্ষান্তরে ' بَنُوْ فُلَانٍ ' যদি গোত্রের বা উপগোত্রের নাম হয়, তাহলে পুরুষ ও নারী উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করবে। কেননা, তখন ' بَنُوْ فُلَانٍ ' বলে তাদের ব্যক্তি সত্তা উদ্দেশ্য করা হয় না বরং এটা হলো নিছক বংশ সম্পৃক্তি জ্ঞাপক। যেমন বলা হয়ঃ 'বনী আদম' এ কারণেই তাতে যুক্তিগত ওয়ালা সূত্রে আবদ্ধ এবং সৌহার্দ্যগত ওয়ালা সূত্রে আবদ্ধ মাওয়ালা এবং তাদের মিত্ররা অন্তর্ভুক্ত থাকে।

ইমাম কুদুরী (র) বলেন ঃ কেউ যদি অমুকের وَلَدٌ বা সন্তানের জন্য অসিয়ত করে তাহলে অসিয়ত তার সন্তানের মাঝে বণ্টিত হবে। আর এ ক্ষেত্রে ছেলে ও মেয়ে সমান হবে।

কেননা, 'وَلَدٌ' বা সন্তান শব্দটি অভিন্ন সূত্রে (অর্থাৎ মৌল অর্থের সূত্রে) পুত্র ও কন্যা সকলকে অন্তর্ভুক্ত করে।

আর কেউ যদি অমুকের ওয়ারিছদের জন্য অছিয়ত করে, তাহলে ওয়ারিছদের মাঝে একজন 'পুরুষের জন্য দু'জন স্ত্রীলোকের হিসসার সমান' হারে বণ্টিত হবে।

কেননা, 'ওয়ারিছ' শব্দের স্পষ্ট উল্লেখ দ্বারা সে ঘোষণা করেছে যে, তার ইচ্ছা হলো (নারীর উপর পুরুষকে) অগ্রাধিকার প্রদান করা, মীরাছের ক্ষেত্রে যেমন হয়ে থাকে।

আর কেউ যদি নিজের মাওয়ালীদের অসিয়ত করে, আর অবস্থা এই যে, তার কিছু মাওয়ালী রয়েছে, যাদেরকে সে আযাদ করেছে, আর কিছু মাওয়ালী রয়েছে, যারা তাকে আযাদ করেছে, এ ক্ষেত্রে অসিয়ত বাতিল হবে। আর ইমাম শাফেয়ী (র)-তাঁর কোন কিতাবে লিখেছেন যে, অসিয়ত তাদের সকলের জন্য কার্যকর হবে। আবার অন্যত্র তিনি লিখেছেন যে, তাদের পরস্পর সমঝোতায় উপনীতে হওয়া পর্যন্ত অসিয়ত স্থগিত থাকবে।

---

১. এক্ষেত্রে লোক প্রচলন হলো মুখ্য বিষয়। আরবীতে بَنُوْ فُلَانٍ দ্বারা শুধু পুত্র বোঝানোর প্রচলন যেমন রয়েছে তেমনি পুত্র-কন্যা উভয়কে বোঝানোর প্রচলন রয়েছে। আবার খান্দান ও গোষ্ঠীর বোঝানোর প্রচলনও রয়েছে।

ইমাম শাফেয়ী (র)-এর যুক্তি এই যে, মাওয়ালী এবং মাওয়ালীর-মাওয়ালী সবাইকে মাওয়ালী বলা হয়। সুতরাং এটা ভাই শব্দের মত হলো; (যা আপন ভাই ও সৎভাই সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করে।)

আমাদের যুক্তি এই যে, এখানে মাওয়ালী হওয়ার দিক ভিন্ন। কেননা, দু'লের একটিকে (অর্থাৎ উর্ধতন মাওয়ালীকে) নিয়ামত প্রদানাকারী মাওয়ালী, আর অপরটিকে (অর্থাৎ অধস্তন মাওয়ালীকে) বলা হয় নিয়ামতপ্রাপ্ত মাওয়ালী। সুতরাং শব্দটি যুক্তার্থ বিশিষ্ট হলো। সুতরাং ইতিবাচক অর্থের ক্ষেত্রে একই শব্দ উভয় অর্থকে অন্তর্ভুক্ত করবে না,(কেননা, ইতিবাচক অর্থের ক্ষেত্রে যুক্তার্থ শব্দের ব্যাপকতা নেই।) পক্ষান্তরে কেউ যদি কসম করে যে, অমুকের মাওয়ালীর সঙ্গে সে কথা বলবে না, তা উর্ধ্বতন ও অর্ধঃস্তন উভয় মাওয়ালীকে অন্তর্ভুক্ত করবে। কেননা, এটা (নৈতিবাচক) ক্ষেত্র। আর তাতে কোন বৈপরীত্য নেই।

আর এই অসিয়তের ক্ষেত্রে যাকে সে সুস্থ অবস্থায় আযাদ করেছে এবং যাকে মৃত্যুবোগের অবস্থায় আযাদ করেছে, সবাই অন্তর্ভুক্ত থাকবে। তবে তার মোদাব্বার ও উম্মে মাওয়ালাদরা অন্তর্ভুক্ত হবে না। কেননা, এদের মুক্তি মৃত্যুর পরে সাব্যস্ত হয়. আর অসিয়ত মৃত্যুর অবস্থার সাথে সম্বন্ধযুক্ত হয়। সুতরাং-মৃত্যুর পূর্বেই মাওয়ালী শব্দটি প্রয়োগ সাব্যস্ত হওয়া অপরিহার্য। আর ইমাম আবু ইউসুফ (র) হতে বর্ণিত আছে যে, মুদাব্বার ও উম্মেওয়ালাদরাও অন্তর্ভুক্ত হবে। কেননা, মুক্তির হকদার হওয়ার কারণ (মৃত্যুর আগেই) তাদের জন্য স্থির হয়েছে।

আর ঐ গোলামও এই অসিয়াতের অন্তর্ভুক্ত হবে, যাকে তার মনিব বলেছে যে, তোমাকে যদি প্রহার না করি, তাহলে তুমি আযাদ। কেননা, মৃত্যুর পূর্ব লগ্নে তার প্রহারের অক্ষমতা নিশ্চিত হওয়ার ফলে, গোলামের মুক্তি সাব্যস্ত হয়ে যাবে।

আর যদি তার মাওয়ালী থাকে এবং মাওয়ালীদের সন্তান থাকে, আবার সৌহার্দ্যগত সুত্রের মাওয়ালী থাকে, তাহলে তাকে যারা আযাদ করেছে। তারা এবং তাদের সন্তানের ঐ অসিয়তে অন্তর্ভুক্ত হবে, সৌহার্দ্যগত সূত্রের মাওয়ালীরা অন্তর্ভুক্ত হবে না।

আর ইমাম আবু ইউসুফ (র) হতে বর্ণিত আছে যে, তারাও এর অন্তর্ভুক্ত হবে এবং সবাই তাতে শরীকদার হবে। কেননা, শব্দটি তাদের সবাইকে সমানভাবে অন্তর্ভুক্ত করে।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন ঃ শব্দটির প্রয়োগের দিক ভিন্ন। আযাদকৃত গোলামের ক্ষেত্রে সূত্র হলো অনুগ্রহ প্রদান আর সৌহাদ্যগত ওয়ালা এর ক্ষেত্রে সূত্র হলো বাধ্যবাধকতা গ্রহণের চুক্তি, (যা প্রত্যাহার যোগ্য) আর মুক্তিদান হলো স্থায়ী ও অবশ্য সাব্যস্ত বিষয়। সুতরাং তার জন্য শব্দটির প্রয়োগ অধিকতর উপযুক্ত।

আর ওয়ালীদের মাওয়ালীরা তাদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত হবে না। কেননা,প্রকৃত পক্ষে তারা অন্যের মাওয়ালী, (তার মাওয়ালী নয়), পক্ষান্তরে তার মাওয়ালী এবং তাদের

সন্তানদের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, তার পক্ষ হতে সাব্যস্ত মুক্তিদানের সূত্রে তারা তার দিকে সম্বন্ধযুক্ত হয়। অদ্রূপ যদি তার নিজের মুক্তিদানের সূত্রে সাব্যস্ত মাওয়ালীরা বা তাদের সন্তান বিদ্যমান না থাকে, তাহলে বিষয়টি ভিন্ন হবে।(অর্থাৎ মাওয়ালীদের মাওয়ালীরা অন্তর্ভুক্ত হবে।) কেননা তাদের ক্ষেত্রে শব্দটির প্রযোগ হলো রূপক। সুতরাং মৌল অর্থ বিবেচনা করা অসম্ভব হওয়ার ক্ষেত্রে শব্দটিকে রূপ অর্থের দিকে অভিমুখী করা হবে।

আর (মাওয়ালীদের জন্য অছিয়ত করার ক্ষেত্রে) যদি তার একজন মাত্র মাওলা (আযাদকারী) থাকে, আর মাওয়ালীদের (অর্থাৎ তার আযাককৃতদের) মাওয়ালী থাকে, তাহলে অর্ধেক তার আযাদকারীর প্রাপ্য হবে, আর বাকীটা ওয়ারিছদের জন্য হবে; কেননা মৌল অর্থ ও রূপক অর্থ একত্র করা সম্ভব নয়। ঐ সকল মাওয়ালী এই অীছয়তের অন্তর্ভুক্ত হবে না, যাদেরকে তার পুত্র বা পিতা আযাদ করেছে, কেননা তারা তার মাওয়ালী নয়, মৌল অর্থেও নয়, রূপক অর্থেও নয়। তবে অছিয়তকারী আছাবা হওয়ার সূত্রে পিতার বা পুত্রের মাওয়ালীদের মীরাছ লাভ করে থাকে। আংশিক আযাদকৃত মাওয়লীর বিষয়টি ভিন্ন। কেননা সে (মুক্তিদান সূত্রে) তার সাথে সম্বন্ধযুক্ত হয়। আল্লাহই সঠিক বিষয় অবগত।

বাড়ীতে বসবাসের, গোলামের সেবা গ্রহণের এবং গাছের ফল ভোগ করার বিষয়ে অসিয়ত

ইমাম কুদূরী (র) বলেনঃ নিজের গোলামের খিদমত সম্পর্কে এবং নিজের বাড়ীতে বসবাস সম্পর্কে নির্দিষ্ট কয়েক বছরের অসিয়ত করা জাইয রয়েছে। আবার স্থায়ীভাবে অসিয়ত করাও জাইয রয়েছে।

কেননা, জীবদ্দশায় বিনিময় নিয়ে এবং বিনিময় ছাড়া কাউকে বস্তুর সুবিধার মালিক বানানো সিদ্ধ হয়। সুতরাং অসিয়তকারীর প্রয়োজনে মৃত্যুর পরেও তেমনটি করা সিদ্ধ হবে। বস্তসমূহের ক্ষেত্রে যেমন হয়ে থাকে।

আর গোলাম বা বাড়ী সুবিধা ভোগের ক্ষেত্রে অসিয়তকারীর মালিকানায় আবদ্ধ থাকবে। (পক্ষান্তরে বস্তুসত্তা ওয়ারিছদের মালিকানায় চলে যাবে।) সুতরাং অসিয়তপ্রাপ্ত ব্যক্তি অসিয়তকারীর মালিকানা সূত্রেই উক্ত সুবিধা সমূহের মীলকানা লাভ করবে। যেমন যার জন্য ওয়াকফ করা হয়েছে, সে ওয়াকফের সুবিধাসমূহ ওয়াকিফের মালিকানার ভিত্তিতে ভোগ করে থাকে।

আর এই অছিয়ত নির্ধারিত সময়ের জন্য হতে পারে, আবার স্থায়ীভাবে হতে পারে, আরিয়াত বা ধারে গ্রহণের ক্ষেত্রে যেমন হয়ে থাকে।

কেননা আমাদের মূলনীতি অনুযায়ী আরিয়াত হচ্ছে সুবিধা ভোগের মালিকানা প্রদান। মীরাছের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা মীরাছ অর্থ 'মুরিছ' এর মালিকানাধীন বস্তুতে ওয়ারিছের স্থলাভিষিক্ত লাভ করা। আর স্থলাভিষিক্তি সম্ভব হবে বিদ্যমান থাকে এমন বস্তু সত্তার ক্ষেত্রে। পক্ষান্তরে বস্তুর সুবিধা হচ্ছে সত্যাশ্রয়ী গুণ, যা বিদ্যমান থাকে না। তদ্রূপ গোলামের মজুরি সম্পর্কে এবং বাড়ীর ভাড়া সম্পর্কে অসিয়ত করা জাইয হবে। কেননা তা সুবিধার বিনিময়। সুতরাং সুবিধার বিধান গ্রহণ করবে। আর গুণগত দিক সুবিধা ও সুবিধার বিনিময় উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ গোলামের দাস সত্তা যদি সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ থেকে বের হয়ে আসে, তাহলে খিদমত করার জন্য গোলামকে অছিয়তপ্রাপ্ত ব্যক্তির হাতে অর্পণ করা হবে।

কেননা, ওয়ারিছগণ এক তৃতীয়াংশের ক্ষেত্রে অসিয়তপ্রাপ্ত ব্যক্তির অধিকারের প্রতিদ্বন্ধী হতে পারে না।

আর যদি অসিয়তকারীর এ ছাড়া আর কোন মাল না থাকে, তাহলে সে দুদিন ওয়ারিসদের খিদমত করবে।

কেননা তার হক হলো একতৃতীয়াংশে, আর তাদের হক হলো দুই তৃতীয়াংশে। বস্তু সম্পর্কে অছিয়তের ক্ষেত্রে যেমন হয়ে থাকে।

আর গোলামকে তো অংশগতভাবে বন্টন করা সম্ভব নয়। সুতরাং উভয় হক পূর্ণ করার জন্য আমরা সময়গত পালাক্রমের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। পক্ষান্তরে বসবাস সম্পর্কে অসিয়তকৃত বাড়ীটি যদি তৃতীয়াংশ থেকে বের হয়ে না আসে, তাহলে সুবিধা ভোগ করার জন্য বাড়ীর বস্তুসত্তাকে তিনভাবে ভাগ করা হবে। কেননা এটাকে অংশগত ভাবে ভাগ করা সম্ভব। আর সময়গত দিক থেকে এবং বস্তুগত দিক থেকে সমতা বিধানের কারণে এটা অধিকতর ইনসাফপূর্ণ। পক্ষান্তরে পালাক্রমের ক্ষেত্রে দু'জনের একজনকে সময়গতভাবে অগ্রবর্তী করা হয়। তবে বাড়ীকেও সময়গতভাবে পালাক্রমের ভিত্তিতে ভাগ করে নিলে জাইয হবে। কেননা প্রাপ্য হক তাদের। তবে অধিক ইনসাফপূর্ণ হওয়ার কারণে প্রথমটি অধিকতর উত্তম।

আর ওয়ারিছদের হাতে বাড়ীর যে দুই তৃতীয়াংশ রয়েছে, সেটা বিক্রি করার অধিকার তাদের নেই।

আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র) হতে বর্ণিত রয়েছে যে, তাদের সে অধিকার রয়েছে। কেননা এটা তাদের নিরংকুশ মালিকানাধীন বিষয়।

বাহ্যিক বর্ণনার যুক্তি এই যে, বসবাস সম্পর্কে অছিয়তপ্রাপত ব্যক্তির হক সমগ্র বাড়ীর বসবাসের ক্ষেত্রে সাব্যস্ত রয়েছে। যেমন ধরুন, মৃত ব্যক্তির আরো সম্পদের অস্তিত্ব প্রমাণিত হলো, আর বাড়ীট সমগ্র সম্পদের এক তৃতীয়াংশ থেকেবের হয়ে এলো। তদ্রূপ তার দখলস্থ অংশ ধ্বংস হয়ে গেলে, তাদের দখলস্থ অংশে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার হক তার রয়েছে। আর বিক্র যেহেতু উক্ত হক বাতিল করাকে অন্তর্ভুক্ত করে, তাই তাদেরকে তা থেকে নিষেধ করা হয়েছে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ এরপর অসিয়তপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি মৃত্যুবরণ করে, তখন তা ওয়ারিছদের কাছে ফেরত আসবে।

কেননা অসিয়তকারী অসিয়তপ্রাপ্ত ব্যক্তির অনুকূলে হক সাব্যস্ত করেছে, যেন সে অসিয়তকারীর মালিকানার ভিত্তিতে সুবিধা ভোগ করে। এখন সেই হক যদি অসিয়তপ্রাপ্ত ব্যক্তির ওয়ারিছের দিকে স্থানান্তরিত হয়, তাহলে সে ঐ অসিয়তকারীর পক্ষ হতে তার সম্মতি ছাড়া নতুনভাবে ঐ সুবিধা সমূহের হকদার হবে। আর মালিকের সম্মতি ছাড়া মালিকানার হকদার হওয়া জাইয নায়।

আর অছিয়তপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি অছিয়তকারীর জীবদ্দশায় মারা যায়, তাহলে অছিয়ত বাতিল হয়ে যাবে।

কেননা ইতিপূর্বে আমরা বর্ণনা করে এসেছি যে, অসিয়তের প্রস্তাবনার সম্পর্ক হলো মৃত্যুর সাথে। আর যদি সে তার গোলামের কিংবা তার বাড়ীর আয় সম্পর্কে অসিয়ত করে, আর অসিয়তপ্রাপ্ত ব্যক্তি নিজেই গোলামকে নিজের খিদমতে নিযুক্ত করে, কিংবা বাড়ীতে নিজেই বাস করে, তাহলে কারো কারো মতে তা জাইয হবে। কেননা উদ্দেশ্য

অর্জনের (তথা ঐ দুটি দ্বারা উপকৃত হওয়ার) দিক থেকে সুবিধা সমূহের মূল্য, স্বয়ং সুবিধা সমূহের সমতুল্য.।

তবে বিশুদ্ধতম মত এই যে, তা জাইয হবে না। কেননা গোলাম ও বাড়ীর আয় হচ্ছে দিরহাম বা দীনার; আর সে সম্পর্কেই অসিয়ত সাব্যস্ত হয়েছে, অথচ এটা হলো সুবিধা ভোগ করা। আর এ দুটি হলো বিপরীত বিষয়, (সুতরাং অসিয়ত কার্যকর হল না,) এবং ওয়ারিছদের হক এর ক্ষেত্রেও তা পার্থক্যপূর্ণ। কেননা যদি মৃত ব্যক্তির যিম্মায় কোন ঋণ প্রমাণিত হয়, তাহলে অছিয়তপ্রাপ্ত ব্যক্তির কাছ থেকে সে তা উশুল করার পরও, আর ফেরত নিয়ে তা দ্বারা ঋণ পরিশোধ করা ওয়ারিছদের পক্ষে সম্ভব হতো। কিন্তু স্বয়ং সুবধািসমূহে ভোগ করার পর ওয়ারিছদের পক্ষে তা সম্ভব নয়।

আর খিদমত ও বসবাসের বিষয়ে অসিয়তপ্রাপ্ত ব্যক্তির গোলাম বা বাড়ী নিজে ভাড়া দেয়ার অধিকার নেই।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন ঃ তার সে অধিকার রয়েছে। কেননা অসিয়তের মাধ্যমে সে সুবিধার মীলকানা লাভ করেছে। সুতরাং সে বিনিময়সহ কিংবা বিনিময় ছাড়া তা অন্যাকে মালিক বানাতে পারে। কেননা তাদের মতে বস্তুর সুবিধা স্বয়ং বস্তুরই সমতুল্য। আরিয়াতে বা ধারে প্রদানের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা তাঁর মূলনীতি অনুযায়ী আরিয়াত অর্থ বস্তুর ব্যবহারের বৈধতা প্রদান করা, মালিকানা প্রদান করা নয়।

আমাদের যুক্তি এই যে, অছিয়ত অর্থ বিনিময় ছাড়া মালিকানা প্রদান করা, যা মৃত্যু পরবর্তী সময়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়, সুতরাং বিনিময়ের বিপরীতে অন্যকে মালিকানা প্রদানের সে অধিকার হবে না। এ সিদ্ধান্ত হচ্ছে আরিয়াত বা ধারে প্রদানের উপর কিয়াস করে। কেননা আমাদের মূলনীতি অনুযায়ী আরিয়াত হচ্ছে জীবদ্দশায় বিনিময় ছাড়া মালিমানা প্রদান করা। আর আরিয়াত গ্রহণকারী তা ভাড়ায় প্রদান করার অধিকার রাখে না। কেননা তা হচ্ছে বিনিময়ের বিপরীতে মালিকানা প্রদান। সুতরাং অছিয়তের ক্ষেত্রে বিপরীতে মালিকানা প্রদান বাধ্যতামূলক হয়ে থাকে, আর বিনিময় ছাড়া মালিকানা প্রদান বাধ্যতামূলক নয়। আর দুর্বলতর দ্বারা সবলতর এর মালিকানা লাভ করা যায় না, এবং স্বল্পতর দ্বারা অধিকতর এর মালিকানা লাভ করা যায় না। আর অসিয়ত হচ্ছে অবাধ্যতামূলক স্বেচ্ছায় দান। তবে দানকারী অর্থাৎ অসিয়তকারী ছাড়া অন্য কারো তা ফেরত নেয়ার অধিকার থাকে না। আর মৃত্যুর পর দানকারীর পক্ষে ফেরত নেয়া সম্ভব নয়। এ জন্য ফেরত নেয়ার সুযোগ রহিত হয়ে যায়। তবে সপ্রকৃতিগতভাবে তা বাধ্যতামূলক নয়।

দ্বিতীয় প্রমাণ এই যে, আমাদের মূলনীতি অনুযায়ী বস্তুর সুবিধা মাল নয়, তবে মালের বিনিময়ে সুবিধার মালিকানা প্রদানের অর্থ হলো, তাতে সম্পদগুণ সৃষ্টি করা, যাতে বিনিময় চুক্তিতে সমতা নিশ্চিত হয়। আর সম্পদগুণ সৃষ্টি করার এই কর্তৃত্ব ঐ ব্যক্তির জন্যই সাব্যস্ত হবে, যে বস্তু সত্তার মালিকানা লাভের অনুবর্তী রূপে সুবিধার মালিকানা লাভ করেছে; কিংবা যে বিনিময় চুক্তির মাধ্যমে সুবিধার মালিকানা লাভ

করেছে; যাতে সে ঐ গ্রণসহ সুবিধার মালিকানা প্রদান করতে পারে, যে গুণসহ সে তার মালিমানা লাভ করেছে। পক্ষান্তরে যদি সে বিনিময় ছাড়া স্বতন্ত্ররূপে (ও উদ্দেশ্যভুক্ত রূপ) তার মীলকানা লাভ করে, এর পর বিনিময়ের বিপরীতে তার মালিকানা প্রদান করে, তাহলে গুণগতভাবে সে যে পরিমাণের মালিকানা লাভ করেছে, তার চেয়ে বেশী পরিমাণের মালিকানা প্রদানকারী হবে। আর তা জাইয নয়।

আর অসিয়তপ্রাপ্ত ব্যক্তির অধিকার নেই গোলামকে কুফা থেকে বের করার। তবে যদি অসিয়তপ্রাপ্ত ব্যক্তি ও তার পরিবার কুফার বাইরে থাকে, তখন সে সেবাগ্রহণের জন্য তাকে সেখানে তার পরিবারের কাছে নিয়ে যেতে পারবে, যদি গোলামটি (পরিত্যক্ত সম্পদের) এক তৃতীয়াংশ থেকে বের হয়ে আসে।

কেননা অসিয়তকারীর যে উদ্দেশ্য সাধারণত বোঝা যায়, সে উদ্দেশ্যের উপর অসিয়তকে কার্যকর করা হয়। সুতরাং অসিয়তপ্রাপ্ত ব্যক্তির পরিবার পরিজন যদি শহরেই থাকে, তখন অসিয়তকারীর উদ্দেশ্য হবে গোলামের উপর সফরের কষ্ট আরোপ করা ছাড়া, ঐ শহরেই তার খিদমত গ্রহণে অসিয়তপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে সক্ষম করা। পক্ষান্তরে যদি তারা অন্যত্র থাকে, তাহলে অসিয়তকারীর উদ্দেশ্য হবে এই যে, পরিবারের সবার খিদমতের জন্য গোলামকে যেন সে তাদের কাছে নিয়ে যায়।

আর যদি সে তার গোলামের কিংবা তার বাড়ীর আয় সম্পর্কে অছিয়ত করে, তাহলে তা জাইয হবে। কেননা এটা হলো সুবধিার বিনিময়। সুতরাং অসিয়তের বৈধতার ক্ষেত্রে তা সুবিধার বিধান গ্রহণ করবে। কেন হবে না, অথচ প্রকৃতপক্ষে উক্ত আয় হচ্ছে বস্তুসত্তা সম্পন্ন, কারণ তা হলো দিরহাম কিংবা দীনার। সুতরাং তা স্বয়ং সুবিধা সম্পর্কে অসিয়তের চেয়ে বৈধতা লাভের অধিক উপযুক্ত হবে।

আর যদি অসিয়তকারীর এছাড়া আর কোন মাল না থাকে, তাহলে ঐ বছরের আয়ের এক তৃতীয়াংশ অীছয়তপ্রাপ্ত ব্যক্তির হবে। কেননা (গোলামের বা বাড়ীর) আয় হচ্ছে বস্তুসম্পদ, যা অংশগতভাবে বন্টিত হওয়ার যোগ্যতা রাখে। এখন অসিয়তপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি তার মাঝে এবং ওয়ারিছদের মাঝে বাড়ী ভাগ করতে চায়, যাতে সে নিজেই বাড়ী ভাষায় খাটাতে পারে, তার সে অধিকার থাকবে না, তবে ইমাম আবু ইউসুফ (র) হতে প্রাপ্ত একটি বর্ণনা মতে তার সে অধিকার থাকবে।

তিনি বলেন ঃ অসিয়তপ্রাপ্ত ব্যক্তি হচ্ছে ওয়ারিছের শরীক, আর শরীকের ভাগ চাওয়ার অধিকার রয়েছে, সুতরাং অসিয়তপ্রাপ্ত ব্যক্তিরও সে অধিকার থাকবে। তবে আমরা বলি যে, বণ্টনের দাবীর ভিত্তি হলো, যা বণ্টিত হবে সেটাতে অসিয়তপ্রাপ্ত ব্যক্তির হক সাব্যস্ত হওয়া, কেননা সেটাই হচ্ছে দাবীকৃত বিষয়। অথচ বাড়ীর বস্তুসত্তায় তার কোন হক নেই, বরং তার হক হচ্ছে বাড়ীর আয়ের ক্ষেত্রে। সুতরাং সে বাড়ী বন্টনের দাবী করার অধিকারী হবে না।

আর যদি সে তার জন্য নিজের গোলামের খিদমতের অসিয়ত করে, আর অন্য একজনের জন্য গোলামের দেহসত্তার অসিয়ত করে, আর গোলামের সম্পদের এক

তৃতীয়াংশ থেকে বের হয়ে আসে, তাহলে গোলামের দেহসত্তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি পাবে, আর গোলামের খিদমদে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি পাবে।

কেননা, অসিয়তকারী তাদের দু'জনের প্রত্যেকের জন্য নির্দিষ্ট একটি বিষয় ওয়াজিব করেছে। কারণ সে তাদের একজনকে আরেক জনের উপর عَطْفٌ বা সংযুক্ত করে বক্তব্য প্রদান করেছে। (আর ব্যাকরণগতভাবে عَطْفٌ এর বক্তব্য অসিয়তকৃত বিষয়ে উভয়ের শরীকানা দাবী করে না।) সুতরাং এই অবস্থাকে আলাদাভাবে দু'জনের জন্য দুটি বিষয় অসিয়ত করার উপর কিয়াস করা হবে।

আর খিদমত প্রাপকের অনুকূলে অছিয়ত যখন সিদ্ধ হলো, এমতাবস্থায় যদি কারো জন্য গোলামের দেহসত্তার অছিয়ত না করতো, তাহলে সেটা ওয়ারিছদের মীরাছ হতো, আর খিদমত অীছয়তপ্রাপ্ত ব্যক্তির হতো। সুতরাং অন্য কারো নামে দেহসত্তার অসিয়তের ক্ষেত্রেও একই বিধান হবে। কেননা অসিয়ত হলো মীরাছের সমগোত্রীয়। এই হিসাবে যে, উভয় ক্ষেত্রে মালিকানা মৃত্যুর পর সাব্যস্ত হয়ে থাকে। এই মাসআলার বেশ কিছু নযীর বা সমতুল্য মাসআলা রয়েছে।

যেমন কেউ একজনের নামে দাসীর অছিয়ত করলো, আর অন্য একজনের নামে দাসীর গর্ভস্থ সন্তানের অসিয়ত করলো। আর অবস্থা এই যে, দাসী সমগ্র সম্পদের একতৃতীয়াংশ থেকে বের হয়ে আছে। কিংবা একজনর জন্য আংটির অছিয়ত করলো, আর অন্য একজনের নামে আংটির পাথরের অসিয়ত করলো, কিংবা বললো যে, এই খেজুর বস্তা অমুকের, আর তাতে বিদ্যমান খেজুর অমুকের, তাহলে সে যেমন অসিয়ত করেছে, তেমনই হবে। আর এ সমস্ত মাসআলায় পাত্র ওয়ালার পাত্রস্থ বস্তুতে কোন হক থাকবে না।

পক্ষান্তরে দুটি প্রস্তাকবে যদি পৃথক পৃথকভাবে উচ্চারণ করে। তাহলে ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর মতে একই বিধান হবে, আর ইমাম মুহাম্মদ (র) এর মতে দাসীটি দাসীর অসিয়তপ্রাপ্ত ব্যক্তির হবে এবং গর্ভস্থ সন্তানটি উভয়ের মাঝে অর্ধেক করে বন্টিত হবে। এর সমগোত্রীয় (পূর্বোক্ত) মাসআলা গুলোতেও একই বিধান হবে।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর যুক্তি এই যে, দ্বিতীয় বক্তব্যে তার প্রস্তাব দ্বারা এটা পরিস্কার হয়ে গেলো যে, প্রথম বক্তব্যে তার উদ্দেশ্য ছিল অছিয়তপ্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য শুধু দাসীর প্রস্তাব করা, (সন্তানটি উদ্দেশ্যভুক্ত ছিল না।) আর তার পক্ষ হতে এই বিবরণ প্রাদান সিদ্ধ হয়েছে। যদিও তা প্রথম বক্তব্য থেকে আলাদা ছিল। কেননা অছিয়ত অছিয়তকারীর জীবদ্দশায় কোন কিছু অপরিহার্য করে না। সুতরাং এক্ষেত্রে যুক্ত ও বিযুক্ত বিবরণ সমান। দাসসত্তার এবং তার খিদমতের অছিয়তের ক্ষেত্রে যেমন হয়ে থাকে।

ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর বক্তব্য এই যে, خَاتَمٌ বা আংটি শব্দটি রিং ও পাথর দুটোকেই অন্তর্ভূক্ত করে। তদ্রূপ দাসী শব্দটি তাকে এবং তার গর্ভস্থ সন্তানকে অন্তর্ভুক্ত করে, খেজুর বাক্স শব্দটিও তাই। আর আমাদের মূলনীতি এই যে, যে সাধারণ

শব্দের 'অবশ্য দাবী ' হলো সাঠিক রূপে বিধানের সাব্যস্ত হওয়া. সেটা خَاصٌ বা বিশিষ্ট শব্দের পর্যায়ভুক্ত। সুতরাং পাথরের ক্ষেত্রে দুটি অসিয়ত একত্র হয়েছে। আর দুটির প্রতিটি হচ্ছে স্বতন্ত্র প্রস্তাবের অসিয়ত। সুতরাং পাথরটি উভয়ের মাঝে অর্ধেক করে বণ্টিত হবে। পাথরটি সম্পর্কে দ্বিতীয় ব্যক্তির জন্য অসিয়ত করার অর্থ, প্রথম জন থেকে প্রত্যাহার বলে গণ্য হবে না, দ্বিতীয় জনের আংটি সম্পর্কে অসিয়তের ক্ষেত্রে যেমন (সেটাকে প্রথম জন থেকে প্রত্যাহার বলে গণ্য করা হয় না, বরং আংটি উভয়ের মাঝে বণ্টিত হয়।)

দাস সত্তার সঙ্গে খিদমতের অসিয়তের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, رَقَبَةٌ বা দাস সত্তার শব্দটি খিদমতকে অন্তর্ভুক্ত করে না,বরং দাসসত্তার অসিয়ত প্রাপ্ত ব্যক্তি এই ভিত্তিতে তার সেবা লাভ করে যে, দাস সত্তার 'সুবিধা' তার মালিকানায় হাসিল হয়েছে।

সুতরাং অসিয়তকারী যদি দাস সত্তার সেবা সম্পর্কে অন্যের জন্য অসিয়ত করে, তাহলে দাস সত্তার অসিয়তপ্রাপ্ত ব্যক্তির তাতে কোন হক থাকে না।

পক্ষান্তরে (বিবরণ মূলক দ্বিতীয়) বক্তব্য যদি যুক্ত রূপে উচ্চারিত হয়, তাহলে বিষয়টি ভিন্ন হবে। কেননা, তা বিশিষ্ট করা ও ব্যতিক্রম করার প্রমাণ। সুতরাং বোঝা যাবে যে, অসিয়তকারী আংটিওয়ালার জন্য শুধু রিং-এর অসিয়ত করেছে, পাথরের নয়।

জামে ছাগীর কিতাবে ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেছেনঃ কেউ যদি অন্য কারো জন্য তার বাগানের ফল সম্পর্কে অসিয়ত করে, এরপর গাছে ফল থাকা অবস্থায় সে মৃত্যু বরণ করে, তাহলে শুধু বিদ্যমান এই ফল অসিয়তপ্রাপ্ত ব্যক্তির প্রাপ্য হবে।

আর সে যদি অসিয়তের প্রস্তাবে বলে ঃ আমার বাগানের সব সময়ের ফল তার জন্য, তাহলে এই ফল তার-প্রাপ্য হবে।

আর যদি সে তার বাগানের আয় সম্পর্কে অসিয়ত করে, তাহলে বর্তমান আয় এবং ভবিষ্যতের আয় তার প্রাপ্য হবে।

এ পার্থক্যের কারণ এই যে, লোক প্রচলনে ফল দ্বারা শুধু বিদ্যমানগুলো উদ্দেশ্য হয়, সুতরাং তা অতিরিক্ত প্রমাণ ছাড়া অবিদ্যমান গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করবে না। যেমন স্পষ্টভাবে স্থায়ী শব্দ বলা। কারণ অবিদ্যমান গুলোর অন্তর্ভুক্ত ছাড়া স্থায়ী হবে না। আর যা অবিদ্যমান, তা যদিও কোন বস্তু নয়, কিন্তু তা উল্লেখিত হওয়ার যোগ্য। (আর উল্লেখ দ্বারা অসিয়তভুক্ত হয়ে যাবে। এবং যখন বিদ্যমান হবে তখন অসিয়ত কার্যকর হবে।)

পক্ষান্তরে আয় শব্দটি লোক প্রচলনে বিদ্যমানকে এবং সামনে একের পর অস্তিত্ব লাভের সম্ভাবনাপূর্ণকে অন্তর্ভুক্ত করে। যেমন বলা হয়, অমুক তার বাগানের বা জমির বা বাড়ীর আয় দ্বারা জীবন ধারণ করে। সুতরাং আয় শব্দটি যখন শর্তমুক্ত রূপে উচ্চারিত হয়,তখন লোক প্রচলন অনুযায়ী অন্য কোন প্রমাণের উপর নির্ভর করা ছাড়াই উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করে।

পক্ষান্তরে ফল শব্দটি শর্তমুক্ত রূপে উচ্চারিত হওয়ার সময় তা দ্বারা বিদ্যমানই শুধু উদ্দেশ্য হয়। সুতরাং সেটা স্থায়ীর দিকে অভিমুখী হওয়ার জন্য অতিরিক্ত প্রমাণের মুখাপেক্ষী হয়।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেনঃ কেউ যদি কোন লোকের জন্য স্থায়ীভাবে তার মেষপালের পশম সম্পর্কে অসিয়ত করে কিংবা শাবক বা দুধ সম্পর্কে স্থায়ীভাবে অসিয়ত করে, তারপর সে মৃত্যু বরণ করে, তাহলে অসিয়তকারীর মৃত্যুর দিন বকরীর গর্ভে যে বাচ্চা থাকবে এবং তার ওলানে যে দুধ থাকবে এবং তার পিঠে যে পশম থাকবে, সেটাই অসিয়তপ্রাপ্য ব্যক্তির প্যাপ্য হবে, 'স্থায়ী' শব্দ উচ্চারণ করুক বা না করুক।

কেননা, অসিয়ত হলো মৃত্যুর সময়ের প্রাস্তাব। সুতরাং মৃত্যুর দিন এই জিনিসগুলোর বিদ্যমানতা বিবেচ্য হবে। এটা পূর্ববর্তী ফল ও আয়-এর মাসআলা দুটি থেকে ভিন্ন।

পার্থক্যের কারণ এই যে, অবিদ্যমান বস্তুর মালিকানা প্রদানের বিষয়টি কিয়াস প্রত্যাখ্যান করে। কেননা, তা মালিকানার পাত্র হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। তবে অবিদ্যমান ফলের ও আয়ের ক্ষেত্রে সেগুলোর উপর চুক্তি সম্পাদনের বৈধতা শরীয়তে এসেছে। যেমন مُسَاقَاةٌ বা 'জল-সিঞ্চন' চুক্তি এবং ইজারা চুক্তি। সুতরাং এ বিধান অসিয়তের ক্ষেত্রে এর বৈধতাকে আরো উত্তম রূপে সাব্যস্ত করবে। কেননা, অসিয়তের ক্ষেত্র আরো প্রশস্ত। পক্ষান্তরে অবিদ্যমান বাচ্চা এবং তার সমগোষ্ঠীর অন্য দুটিতে সেগুলোর উপর চুক্তি সম্পাদন মূলতই বৈধ নয়। এবং কোন চুক্তি দ্বারাই তার হকদার হওয়া সাব্যস্ত হয় না। সুতরাং সেগুলো অসিয়তেরও অন্তর্ভুক্ত হবে না। তবে বিদ্যমান গুলোর বিষয়টি ভিন্ন । কেননা, বিক্রয় চুক্তিতে পরোক্ষভাবে সেগুলোর হকদার হওয়া জায়েয হয় এবং খোলা চুক্তিতে স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য রূপে সেগুলোর হকদার হওয়া জাইয হয়। সুতরাং অসিয়ত দ্বারাও সেগুলোর হকদার হওয়া জাইয হবে। সঠিক বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা অধিক অবগত।

যিম্মীর অসিয়ত

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন ঃ কোন ইহুদী বা খৃষ্টান যদি সুস্থতার অবস্থায় কোন ইবাদতখানা বা গীর্জা তৈরী করে, তারপর সে মারা যায়, তাহলে তা মীরাছ রূপে গণ্য হবে। কেননা, ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে এটা ওয়াকফের পর্যায়ভুক্ত। আর তাঁর মতে 'ওয়াকফ'-এ মীরাছ কার্যকর হয়। ওয়াকফ বাধ্যতামূলক হয় না। সুতরাং-এটাও তেমন হবে। আর ছাহেবায়নের মতে যেহেতু এটা নাফরামানির কাজ, সুতরাং তাদের মতে এই ওয়াকফ সহীহ নয়।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেনঃ আর যদি ইহুদী বা খৃষ্টান লোকটি নির্দিষ্ট একদল লোকের নামে ঐ সম্পর্কে অসিয়ত করে, তাহলে তা তার সম্পদের একতৃতীয়াংশ থেকে কার্যকর হবে।

অর্থাৎ যদি সে অসিয়ত করে যে, বাড়ীটিকে যেন ইবাদতখানা বা গীর্জা বানানো হয়, আর তা অমুক লোকদের প্রদান করা হয়, তাহলে তা তার সম্পদের এক তৃতীয়াংশ থেকে কার্যকর হবে।

কেননা, অসিয়তের মধ্যে স্থলাভিষিক্তকরণের এবং মালিকানা প্রদানের দিক রয়েছে। আর তার সেটা করার কর্তৃত্ব রয়েছে। সুতরাং উভয় দিকের বিবেচনায় তার কর্মকে সিদ্ধতা দান করা সম্ভব ।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেনঃ আর যদি সে অনির্দিষ্ট একদল লোকের নামে তার বাড়ীকে গীর্জা বানানোর অসিয়ত করে, তাহলে ইমাম আবু হনীফা (র)-এর মতে অসিয়ত জাইয হবে। আর ছাহেবায়নের মতে অসিয়ত বাতিল হবে।

কেননা, প্রকৃতপক্ষে এটা নাফরমানির কাজ, যদিও তাদের বিশ্বাস মতে ছাওয়াবের কাজ। আর নাফরমানি সম্পর্কিত অসিয়ত বাতিল যোগ্য। কেননা, তা কার্যকর করার অর্থ নাফরমানির কাজকে স্থিতি দান করা।

ইমাম আবু হানীফা (র)-এর যুক্তি এই যে, তাদের বিশ্বাস মতে এটা পুণ্যের কাজ। আর আমাদেরকে আদেশ করা হয়েছে, যেন আমরা তাদেরকে তাদের ধর্মের উপর ছেড়ে দেই। সুতরাং আকীদা-বিশ্বাসের ভিত্তিতে অসিয়তটি বৈধ হবে। লক্ষণীয় যে, যদি সে এমন কোন বিষয়ে অসিয়ত করে, যা প্রকৃতপক্ষে ছাওয়াবের কাজ, কিন্তু তাদের বিশ্বাসমতে পাপকর্ম,সে ক্ষেত্রে তাদের ধর্মবিশ্বাস বিবেচনার ভিত্তিতে অসিয়তটি বৈধ হবে না। সুতরাং এর বিপরীত ক্ষেত্রেও একই বিধান হবে।

আর ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মধ্যে ইবাদতখানা ও গীর্জা নির্মাণের মাঝে এবং তা বানানোর অসিয়ত করার ব্যাপারে মতপার্থক্যের কারণ এই যে, স্বকীয়ভাবে নির্মাণ-নির্মাণকারীর মালিকানা বিলপ্তির কারণ নয় । বরং মালিকানা বিলুপ্ত হয় সেটা একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য সংরক্ষিত হওয়ার কারণে, মুসলমানদের মসজিদের ক্ষেত্রে যেমন হয়ে থাকে। আর গীর্জা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌র জন্য সংরক্ষিত হয়নি। সুতরাং তা নির্মাণ কারীর মালিকানায় বহাল থাকবে, এবং তার পক্ষ হতে মীরাছ লাভ করা হবে।

তাছাড়া (আল্লাহ্‌র নামে সংরক্ষিত না হওয়ার প্রমাণ এই যে,) তারা সেখানে বসবাসের জন্য বিভিন্ন কক্ষ তৈরী করে। সুতরাং তার সাথে বান্দার হক সম্পৃক্ত থাকায় সেটা আল্লাহ্‌র জন্য সংরক্ষিত হলো না। আর এই ছূরতে মসজিদের ক্ষেত্রেও মীরাছ জারী হবে। কেননা, তা আল্লাহ্‌র জন্য সংরক্ষিত হয়নি, (গীর্জা সম্পর্কে) অসিয়তের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, অসিয়ত প্রবর্তনই করা হয়েছে মালিকানা বিলূপ্ত করার জন্য। তবে তাদের মতে যা ইবাদত বা পুণ্যকর্ম নয়, সে ক্ষেত্রে অসিয়তের দাবী (তথা মালিকানা বিলোপ) সাব্যস্ত হওয়া নিষিদ্ধ হয়েছে। সুতরাং পুণ্যকর্মের ক্ষেত্রে কৃত অসিয়ত তার দাবীর উপর বহাল থাকবে.। এবং অসিয়তকারীর মালিকানা বিলুপ্ত হয়ে যাবে। সুতরাং তাতে মীরাছ-কার্যকর হবে না।

আর সার কথা এই যে, যিম্মীর ওয়াছিয়ত চার প্রকার ঃ প্রথমত তাদের বিশ্বাস মতে বিষয়টি পুণ্যকর্ম হওয়া, কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে পুণ্য কর্ম না হওয়া।

আর সেটা তা, যা আমরা উল্লেখ করলাম (অর্থাৎ গীজা নির্মাণ), তদ্রূপ যিম্মী যদি অসিয়ত করে যে, তার শূকরগুলো জবাই করে যেন মুশরিকদের খাওয়ানো হয়। এটা যদি অনির্দিষ্ট নামে হয়, তাহলে তা মতপার্থক্যপূর্ণ হবে। যেমন আমরা উল্লেখ করে এসেছি। এবং কারণও আমরা বর্ণনা করেছি।

দ্বিতীয়ত: এমন বিষয়ে সে অসিয়ত করলো, যা আমাদের ক্ষেত্রে ইবাদত ও ছাওয়াবের কাজ, কিন্তু তাদের বিশ্বাস মতে পুণ্যকর্ম নয়। যেমন হজ্জ-এর অসিয়ত করলো, কিংবা মুসলমানদের জন্য মসজিদ তৈরীর অসিয়ত করলো, কিংবা মুসলমানদের মসজিদে বাতি লাগানোর অসিয়ত করলো। এই অসিয়ত সর্বসম্মতভাবে বাতিল। তাদের ধর্মবিশ্বাসকে বিবেচনায় এনে এ সিদ্ধান্ত হয়েছে। তবে যদি তা নির্দিষ্ট কোন লোক বা লোকদলের নামে হয়, (তাহলে তা কার্যকর হবে।) কেননা, অসিয়ত প্রাপ্ত লোকেরা নির্দিষ্ট হওয়ার কারণে এটা হচ্ছে মালিকানা প্রদান। আর নির্ধারিত দিকটি হচ্ছে পরামর্শ যা পালন করা জরুরী নয়।)

তৃতীয়ত: এমন অসিয়ত করা, যা আমাদের ক্ষেত্রে এবং তাদেরও ক্ষেত্রে পুণ্যকর্ম। যেমন সে বাইতুল মুকাদ্দাসে বাতি জ্বালানোর অসিয়ত করলো। কিংবা রোমের ইহুদী বা খৃষ্টানরা অসিয়ত করলো যে, তাতারীদের বিরুদ্ধে অভিযানে যেন অসিয়তকৃত বস্তু ব্যয় করা হয়। এই অসিয়ত জাইয হবে। অসিয়তপ্রাপ্ত ব্যক্তি নিদিষ্ট হোক বা অনির্দিষ্ট। কেননা, এটা এমন বিষয় সম্পর্কে অসিয়ত যা প্রকৃতপক্ষে পুণ্যকর্ম এবং তাদের বিশ্বাস মতেও পুণ্যকর্ম।

চতুর্থত: এমন অসিয়ত করা, যা আমাদের মতেও ছাওয়াবের কাজ নয় এবং তাদের মতেও পণ্যকর্ম নয়। যেমন গায়িকা ও বিলাপকারিণীদের নামে অসিয়ত করলো। এই অসিয়ত অবৈধ হবে। কেননা, তা আমাদের ক্ষেত্রে এবং তাদের ক্ষেত্রে নাফরমানির কাজ। তবে যদি তা নির্দিষ্ট কিছু লোকের নামে হয়, তাহলে মালিকানা প্রদান ও স্থলাভিষিক্তকরণ হিসাবে তা সিদ্ধ হবে। আর বিদআতপন্থী বা প্রবৃত্তি পরায়ণ ব্যক্তি যদি কুফুরি না করে, তাহলে অসিয়তের ক্ষেত্রে সে মুসলমানদের পর্যায়ভুক্ত হবে ; কেননা, (শরীয়তের পক্ষ হতে) আমাদেরকে বাহ্যিক অবস্থার উপর বিধানের ভিত্তি করার আদেশ করা হয়েছে।

আর যদি সে কুফুরি করে তাহলে সে মুরতাদের পর্যায়ভুক্ত হবে। সুতরাং মুরতাদের হস্তক্ষেপ সমূহের ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফা (র) ও ছাহেবায়ন (র)-এর মাঝে যে সুপরিচিত মতপার্থক্য রয়েছে,তা এখানেও প্রযোজ্য হবে।

আর মুরতাদ নারীর ক্ষেত্রে বিশুদ্ধতম মত এই যে, তার অসিয়তসমূহ সিদ্ধ হবে। কেননা, সেতো মুরতাদ অবস্থায় জীবিত থাকবে। (সুতরাং অসিয়তের বৈধতার ক্ষেত্রে সে যিম্মী নারীর মত হবে।)

মুরতাদের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, হয় সে ইসলাম গ্রহণ করবে, না হয় তাকে হত্যা করা হবে।

ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেন ঃ হরবী যদি আমাদের দারুল ইসলামে নিরাপত্তা নিয়ে প্রবেশ করে এবং কোন মুসলিমের নামে বা কোন যিম্মীর নামে তার সমগ্র সম্পদের অসিয়ত করে, তাহলে তা বৈধ হবে।

কেননা, এক তৃতীয়াংশের অতিরিক্ত সম্পদের অসিয়ত করার নিষিদ্ধতা হচ্ছে ওয়ারিছদের হকের কারণে। এ কারণেই তাদের অনুমোদন ক্রমে তা কার্যকর হয়। অথচ তার ওয়ারিছরা দারুল হরবে থাকার কারণে তাদের বিবেচনাযোগ্য কোন হক নেই। কেননা, আমাদের জন্য তারা মৃত তুল্য।

তাছাড়া তার মালের 'হুরমত' বা সম্মান যোগ্যতা হচ্ছে প্রদত্ত নিরাপত্তার কারণে। আর নিরাপত্তা ছিল তার অনুকূলে, তার ওয়ারিছদের অনুকূলে নয়।

আর যদি সমগ্র সম্পদের চেয়ে কম সম্পদের অসিয়ত করে তাহলে অসিয়ত পরিমাণ নেয়া হবে, আর অবশিষ্ট অংশ তার ওয়ারিছদের ফেরত দেয়া হবে। আর এই ফেরত প্রদান নিরাপত্তা প্রাপ্ত হারবীরও অধিকারভুক্ত।

আর সে যদি মৃত্যুর সময় দারুল ইসলামে তার গোলামকে আযাদ করে বা মুদাব্বার ঘোষণা করে, তাহলে এক তৃতীয়াংশের বিষয়টি বিবেচনা ছাড়াই তার পক্ষ হতে তা বৈধ হবে। এর কারণ আমরা বর্ণনা করেছি।

তদ্রূপ যদি কোন মুসলমান বা যিম্মী তার নামে কোন অসিয়ত করে, তাহলে তা জাইয হবে। কেননা, যতক্ষণ সে দারুল ইসলামে রয়েছে, ততক্ষণ লেনদেন ও মুআমালার ক্ষেত্রে সে যিম্মীর মত হবে। একারণেই তার জীবদ্দশায় তার পক্ষ হতে কৃত

মালিকানা প্রদান জাতীয় চুক্তি সমূহ সিদ্ধ হয়, এবং তার জীবদ্দশায় তার দান করা সিদ্ধ হয়। সুতরাং তার মৃত্যুর পরও একই বিধান হবে।

তবে ইমাম আবু হানীফা ও আবু ইউসুফ (র) হতে প্রাপ্ত একটা বর্ণনা মতে তা জাইয হবে না। কেননা, সে হারবী সম্প্রাদয়ভুক্ত নিরাপত্তা প্রাপ্ত ব্যক্তি। কারণ তার ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা রয়েছে। আর তাকে ফিরে যাওয়ার সুযোগ প্রদান করা হবে, এবং জিয্‌য়া ছাড়া তাকে এক বছরের বেশী অবস্থনের সুযোগ তাকে দেয়া হবে না।

আর যিম্মী যদি এক তৃতীয়াংশের বেশী সম্পদের অসিয়ত করে, কিংবা তার কোন ওয়ারিসের নামে অসিয়ত করে,তাহলে মুসলমানদের উপর কিয়াসের ভিত্তিতে তা জাইয হবে না।

কেননা, মুআমালা সংক্রান্ত বিষয়ে সে ইসলামের বিধান সমুহের বাধ্যবাধকতা গ্রহণ করেছে।

আর সে যদি তার ধর্ম থেকে ভিন্নধর্মী কারো নামে অসিয়ত করে, তাহলে মীরাছের উপর কিয়াসের ভিত্তিতে তা বৈধ হবে।

কেননা, সমস্ত কুফুর অভিন্নমিল্লাতভুক্ত।

আর যদি দারুল ইসলামের কোন যিম্মী দারুল হরবের কোন হারবীর জন্য অসিয়ত করে, তাহলে তা জাইয হবে না।

কেননা, আবাসভুমির ভিন্নতার কারণে মীরাছী সম্পর্ক নিষিদ্ধ, আর অসিয়ত হচ্ছে মীরাছের সমগোত্রীয় বিধান। আল্লাহ্ অধিক অবগত।

অসী ও তাঁর ইখতিয়ার সমূহ

ইমাম কুদূরী (র) বলেনঃ কেউ যদি কোন ব্যক্তিকে অসী নিয়োগ করে, আর অসী নিয়োগকারীর জ্ঞাতসারে তা গ্রহণ করে, আর অজ্ঞাতসারে তা প্রত্যাখ্যান করে, তাহলে তা প্রত্যাখ্যান বলে গণ্য হবে না।

কেননা, মৃতব্যক্তি তো তার উপর আস্থা রেখে দুনিয়া থেকে চলে গেছে। সুতরাং যদি তার জীবদ্দশায় তার অজ্ঞাতসারে কিংবা তার মৃত্যুর পর অসীর পক্ষ হতে প্রত্যাখ্যান করা সিদ্ধ হয়, তাহলে অসিয়তকারী অসীর দিক থেকে প্রতারিত হবে। সুতরাং তার প্রত্যাখ্যান করাকেই নাকচ করে দেয়া হবে। পক্ষান্তরে অনির্ধারিত কোন গোলাম খরিদ করায় ওকীল এবং তার মাল বিক্রি করার ওকীলের বিষয়টি ভিন্ন। অর্থাৎ মুআক্কিলের অজ্ঞাতসারে তার ওয়াকালহ দায়িত্ব প্রত্যাখ্যান করা গ্রহণযোগ্য। কেননা, সে ক্ষেত্রে মুআক্কিলের ক্ষতি নেই। কারণ মুআক্কিল জীবিত এবং নিজেই কর্ম সম্পাদনে সক্ষম।

আর যদি অছিয়তকারীর জ্ঞাতসারে প্রত্যাখ্যান করে, তাহলে তা রদ বলে গৃহীত হবে।

কেননা, তার উপর বাধ্যতামূলকভাবে দায়িত্ব চাপানোর কর্তৃত্ব অসি নিয়োগকারীর নেই। আর তাতে অসি নিয়োগকারীর ধোঁকাগ্রস্ত হওয়ার দিক নেই। কেননা, তার পক্ষে অন্যকে স্থলবর্তী নিযুক্ত করা সম্ভব।

আর যদি অসী তার দায়িত্ব গ্রহণও না করে এবং রদও না করে, এমতাবস্থায় অসি নিয়োগকারীর মৃত্যু হয়ে যায়, তাহলে অসীর ইচ্ছাধিকার থাকবে। ইচ্ছা করলে সে গ্রহণ করবে। ইচ্ছা করলে গ্রহণ করবে না।

কেননা, অসি নিয়োগকারীর বাধ্যতা আরোপ করার কর্তৃত্ব নেই। সুতরাং অসি ইচ্ছাধিকার প্রাপ্ত থাকবে।

এ অবস্থায় যদি সে অসি নিয়োগ কারীর পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে কিছু বিক্রি করে, তাহলে অসির দায়িত্ব তার উপর বাধতামূলক হয়ে যাবে। কেননা, বিক্রি করা হচ্ছে দায় গ্রহণের প্রমাণ। আর মৃত্যুর পর প্রমাণ রূপে তা বিবেচ্য হবে। 'অসিদায়িত্ব' প্রাপ্তি সম্পর্কে তার জানা থাকুক কিংবা জানা না থাকুক। পক্ষান্তরে, ওকীল যদি ওয়াকালাহ দায়িত্ব প্রদান সম্পর্কে অবগত না থাকে, আর বিক্রি করে, তাহলে বিষয়টি ভিন্ন হবে। অর্থাৎ তার বিক্রিয় কার্যকর হবে না।

কেননা, অসি-দায়িত্ব হচ্ছে স্থলাভিষিক্ত হওয়া। কারণ তা মৃত ব্যক্তির কর্তৃত্ব রহিত হওয়ার অবস্থার সাথে (অর্থাৎ মৃত্যুর অবস্থার সাথে)। সুতরাং মৃত ব্যক্তির কর্তৃত্ব অসির দিকে স্থানান্তরিত হবে। আর সেটা যখন স্থলাভিষিক্ত হবে তখন অসির অবগতির উপর তা নির্ভরশীল হবে না, হকের বিষয়টি যেমন হয়ে থাকে। (ওয়ারিছের অবগতির উপর নির্ভরশীল নয়।) পক্ষান্তরে ওকীল নিযুক্ত করার অর্থ হলো নায়েব বা স্থলবর্তী নিযুক্ত করা। কেননা, তা মুআক্কিলের কর্তৃত্ব বিদ্যমান থাকা অবস্থায় সাব্যস্ত হয়।

সুতরাং তার অবগতি ছাড়া তা সিদ্ধ হবে না। যেমন ক্রয় বিক্রয়ের মাধ্যমে মালিকানা সাব্যস্ত করা অবগতি ছাড়া সাব্যস্ত হয় না।

আর অবগতি লাভের পদ্ধতি এবং অবগতি প্রদানের শর্ত সাব্যস্ত পূর্ববর্তী 'আদাবুল কাযী' পর্বে আমরা বর্ণনা করেছি।

আর যদি সে অসির দায়িত্ব গ্রহণ না করে এবং এ অবস্থায় অসিনিয়োগকারীর মৃত্যু হয়ে যায়, এরপর অসি বলে যে, আমি দায়িত্ব গ্রহণ করবো না, পরে আবার বলে যে, দায়িত্ব গ্রহণ করবো, তাহলে তার সে অধিকার থাকবে, যদি গ্রহণ করবো না বলার পর কাযী তাকে অসির দায়িত্ব থেকে বাদ দিয়ে থাকেন।

কেননা, শুধু তার 'গ্রহণ করবো না' বক্তব্য দ্বারা অসি-নিয়োগ বাতিল হয় না। কেননা, তা বাতিল করায় মৃতব্যক্তির জন্য ক্ষতি রয়েছে। পক্ষান্তরে অসি নিয়োগ বহাল রাখায় অসির যে ক্ষতি, তা দাওয়ার দ্বারা পূরণ করা হয়। আর প্রথম ক্ষতিটি, যা অধিকতর গুরুতর তা রোধ করা করা উত্তম। তবে কাযীর তাকে 'অসির দায়িত্ব' থেকে বাদ দেয়া সিদ্ধ। কেননা, এ বিষয়ে কাযীর ইজতিহাদি ক্ষমতা রয়েছে। আর মানুষের ক্ষতি রোধ করার (জন্য পদক্ষেপ গ্রহণের) অধিকার তার ররেছে। আর হতে পারে যে, অসি তার দায়িত্ব পালনে অপরাগ হয়ে যাবে। তখন অসির দায়িত্ব বহাল থাকায় সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাই কাযী তার থেকে ক্ষতি রোধ করবেন এবং মৃত ব্যক্তির মাল হিফাযতকারী ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাকারী নিযুক্ত করবেন। এভাবে উভয় পক্ষ হতে ক্ষতি বিদূরিত হয়ে যাবে। এসব কারণে কাযীর পক্ষ হতে অসিকে তার দায়িত্ব থেকে বাদ দেয়া কার্যকর হবে। সুতরাং কাযীর বের করার পর যদি সে বলে যে, আমি দায়িত্ব গ্রহণ করবো, তখন তার কথার দিকে ভ্রূক্ষেপ করা হবে না। কেননা, কাযীর বাতিল করার মাধ্যমে, তার অসিদায়িত্ব বাতিল হওয়ার পর সে তা গ্রহণ করেছে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেনঃ কেউ যদি কোন গোলামকে বা কাফিরকে বা ফাসিককে অসি নিয়োগ করে, তাহলে কাযী তাদেরকে অব্যাহতি দিয়ে অন্যকে অসি নিযুক্ত করবে।

কুদূরীর أَخْرَجَ শব্দ অসিনিয়োগের সিদ্ধতার দিকে ইংগিত করে। কেননা, দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া দায়িত্বের অস্তিত্ব লাভের পর হতে পারে।

মাবছূত কিতাবে ইমাম মুহাম্মদ (র) উল্লেখ করেছেন যে, অসিয়তটি বাতিল হবে। কেউ কেউ বলেছেন,এই সকল ছূরতে (অর্থাৎ তিনটি ছূরতে) বাতিল হওয়ার অর্থ (কাযীর ফায়সালার পর) অচিরেই তা বাতিল হবে।

আর কারো কারো মতে, গোলামের ক্ষেত্রে এর অর্থ- প্রকৃতপক্ষেই এবং মূলতই তা বাতিল। কেননা, তার কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা নেই। আর অন্য দুটিতে এর অর্থ হলো অচিরেই বাতিল হবে। আর কারো কারো মতে, কাফিরের ক্ষেত্রেও প্রকৃতপক্ষেই বাতিল। কেননা, মুসলমানের উপর কাফিরের কর্তৃত্ব নেই।

অসি নিয়োগের বৈধতা, এরপর কাযী কর্তৃক অব্যাহতি প্রদানের যুক্তি এই যে, এতে মূল কল্যাণকামিতা সাব্যস্ত রয়েছে। কেননা, গোলামের প্রকৃত সক্ষমতা রয়েছে। আর আমাদের মূলনীতি অনুযায়ী ফাসিকের কর্তৃত্ব রয়েছে এবং সামগ্রিকভাবে কাফিরেরও কর্তৃত্ব রয়েরে। এতে কল্যাণকামিতা পূর্ণতা লাভ করেনি। কারণ গোলামের কর্তৃত্ব মনিবের অনুমোদনের উপর নির্ভশিল। আবার অনুমোদন প্রদানের পর মনিব তা রহিত করতে সক্ষম। তদ্রূপ ধর্মীয় শত্রুতা কাফিরকে মুসলমানের ক্ষেত্রে, মুসলমানের কল্যাণকামিতা বর্জন করতে প্ররোচিত করবে। আর ফাসিক তো খিয়ানতের অভিযোগে অভিযুক্ত হবে, তাই কল্যাণকামিতা পূর্ণ করার জন্য কাযী তাদেরকে অসিয়তের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেবেন এবং অন্যকে তার স্থলে নিযুক্ত করবেন।

মাবসূত কিতাবে ইমাম মুহাম্মদ (র) শর্ত আরোপ করেছেন যে, ফাসিকের মালের ব্যাপারে ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তি হতে হবে। এই দোষটি তাকে বের করে তার পরিবর্তে অন্যকে নিযুক্ত করার অজুহাত রূপে গ্রহণযোগ্য হবে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেনঃ কেউ যদি নিজের গোলামকে অসি নিযুক্ত করে, অথচ ওয়ারিছদের মাঝে বড় (প্রাপ্ত বয়স্ক) মানুষ রয়েছে, তাহলে তাকে অসি নিয়োগ করা সহীহ হবে না।

কেননা, প্রাপ্ত বয়স্কের অধিকার রয়েছে গোলামকে কোন পদক্ষেপ থেকে বিরত রাখার, কিংবা গোলাম তার প্রাপ্য অংশ বিক্রি করে দেয়ার, তখন ক্রেতা তাকে বিরত রাখতে পারে। ফলে সে অসির দায়িত্বের হক পূরা করতে অপরাগ হয়ে যাবে,এবং সে পূর্ণ উপকার দিতে পারবে না।

পক্ষান্তরে ওয়ারিছরা সবাই যদি ছোট হয়, তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র-এর মতে গোলামকে অসি নিযুক্ত করা জাইয হবে। ছাহেবায়নের মতে তা জাইয হবে না। আর এটাই কিয়াসের দাবী।

আর কেউ কেউ বলেন যে, এ বিষয়ে ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মত দ্বিধাপূর্ণ। কখনো তা ইমাম আবু হানীফা(র)-এর সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। আবার কখনো তা ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে।

কিয়াসের যুক্তি এই যে, (তার নিজের গোলামের ক্ষেত্রে) কর্তৃত্ব অবিদ্যমান। কেননা, দাসত্ব কর্তত্বের বিরোধী। তাছাড়া তাতে মালিকের উপর মালিকানাধীনের কর্তৃত্ব সাব্যস্ত করা হয়। আর এটা শরীয়ত অনুমোদিত বিষয়ের বিপরীত।

তাছাড়া পিতার পক্ষ হতে প্রাপ্ত কর্তৃত্ব খন্ডিত হতে পারে না। অথচ এই অসির দায়িত্ব বিবেচনা করলে তা খন্ডিত হয়। কেননা, গোলাম তো নিজেকে বিক্রি করতে পারবে না। সুতরাং এটা মূল কর্তৃত্বকে ভঙ্গ করা হবে।[১]

ইমাম আবু হানীফা (র)-এর যুক্তি এই যে, গোলাম, শরীয়তের বিধানের সম্বোধন পাত্র, এবং হস্তক্ষেপের ব্যাপারে 'স্বয়ং সম্পূর্ণ'। সুতরাং সে অসি দায়িত্ব পালনের যোগ্য হবে। আর তার উপর কারো কর্তৃত্ব নেই। কেননা, অপ্রাপ্ত বয়স্করা মালিক হলেও তাদের বাধা দারন করার কর্তৃত্ব নেই। সুতরাং (তাদের মালিকানা এবং তার অসি-দায়িত্বের মাঝে) কোন বৈপরিত্য নেই। আর মনিব কর্তৃক তাকে অসি-নিয়োগ করা, তাদের প্রতি তার কল্যাণকামী হওয়ার কথা জ্ঞাপন করছে। সুতরাং তার অবস্থা মুকাতাবের মত হলো।

আর ইমাম আবু হানীফা (র) হতে বর্ণিত মত অনুযায়ী অসি দায়িত্ব খন্ডিত হতে পারে। কিংবা আমরা বলবো যে, খন্ডিত করণের দিকে যাওয়া হয়েছে, যাতে মূল কর্মটিকে অর্থাৎ ছোটদের স্বার্থ রক্ষার জন্য নিজের গোলামকে অছী নিযুক্ত করণকে) বাতিল করা পর্যন্ত না গড়ার। আর মূল কর্মকে সিদ্ধতা দানের জন্য গুণের পরিবর্তন উত্তম।

ইমাম কুদূরী (র) বলেনঃ কেউ যদি এমন কাউকে অসি নিযুক্ত করে, যে অসি দায়িত্ব পালনে অপারগ, তাহলে কাযী তার সাথে অন্য একজনকে যুক্ত করে দেবেন, যাতে অসিনিয়োগকারী ও তার ওয়ারিছদের হক রক্ষা হয়। এটা এজন্য যে, সংশ্লিষ্টদের স্বার্থ রক্ষার পূর্ণতা বিধান সম্পন্ন হবে তার সঙ্গে অন্য একজনকে যুক্ত করা দ্বারা। কেননা, দ্বিতীয়জন প্রথম জনকে (বিচ্যুতি থেকে) রক্ষা করবে এবং কিছু বিষয়ে তাকে সহগোগিতা দেবে। ফলে অন্যের সহায়তা দ্বারা স্বার্থ রক্ষা পূর্ণ হবে।

আর অসি নিজে যদি কাযীর কাছে অপারগতার অভিযোগ করে, তাহলে কাযী প্রকৃত অবস্থা জানার আগ পর্যন্ত তার কথায় সাড়া দেবেন না। কেননা, আপত্তিকারী নিজের বোঝা হালকা করার জন্য মিথ্যা বলতে পারে।

আর কাযীর কাছে যখন তার অপারগতা নিশ্চিতভাবে প্রকাশ পেয়ে যাবে, তখন উভয় পক্ষের স্বার্থ রক্ষার জন্য কাযী পরিবর্তন করে দেবেন।

আর অসি যদি ব্যবস্থাপনায় সক্ষম হয় এবং আমানতদার হয়, তাহলে তাকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি প্রদানের অধিকার কাযীর নেই।

কেননা, কাযী যদি অন্যকে নির্বাচন করেন, তাহলে সে তার চেয়ে নীচের মর্যার হবে। কেননা, সে তো ছিল স্বয়ং মৃত ব্যক্তির নির্বাচিত এবং তার পছন্দনীয়। সুতরাং তাকে বহাল রাখাই অধিকতর উত্তম হবে।

---

১. অর্থাৎ মূল তো ছিল পিতার কর্তৃত্ব, যে, নিজের গোলামকে অসি নিযুক্ত করেছে। আর পিতা সবকিছু বিক্রি করায় কর্তৃত্বের অধিকারী ছিল। কিন্তু গোলামকে কর্তৃত্ব প্রদান করার পর সে নিজেকে বিক্রি করার কর্তৃত্ব লাভ করে না। সুতরাং গোলামের কাছে এসে কর্তৃত্ব খন্ডিত হয়ে গেছে।

একারণেই তো মৃত ব্যক্তির পিতার পুর্ণ স্নেহ বিদ্যমান থাকা অবস্থায়ও তার উপর তাকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে।

সুতরাং অন্যের উপর আরো স্বাভাবিক কারণেই তাকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।

তদ্রূপ ওয়ারিছরা কিংবা তাদের কেউ যদি কাযীর কাছে অভিযোগ করে, তাহলে তার পক্ষ হতে খিয়ানত প্রকাশ না পাওয়া পর্যন্ত তাকে বরখাস্ত করা কাযীর জন্য উচিত হবে না। কেননা, সে মৃতব্যক্তির কাছ থেকে কর্তৃত্ব লাভ করেছে, তবে তার পক্ষ হতে খিয়ানত প্রকাশ পেলে তখন বলা হবে যে, মৃত ব্যক্তি তো তার আমানতের কারণে তাকে অসী নিযুক্ত করেছিল, আর তা অনুপস্থিত হয়ে পড়েছে। সুতরাং সে যদি জীবিত থাকতো, তাহলে তো অবশ্যই তাকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিতো। সুতরাং মৃত ব্যক্তির অপারগতার অবস্থায় কাযী তার স্থলবর্তী হবে যেন তার পক্ষ হতে কোন অসি ছিলই না।

ইমাম কুদূরী (র) বলেনঃ কেউ যদি দু'জনকে অসি নিয়োগ করে, তাহলে ইমাম আবু হানীফা ও মুহাম্মদ (র)-এর মতে তাদের একজন অপরজনকে বাদ দিয়ে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে না।

তবে কয়েকটি ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম, যা ইনশাআল্লাহ আমরা বর্ণনা করবো। আর ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন ঃ সকল বিষয়ে উভয়ের প্রত্যেকে একক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে।

কেননা, অসির দায়িত্ব পালনের উপর মৃত ব্যক্তির কর্তৃত্ব অসির দিকে স্থানান্তরিত হওয়া। আর কর্তৃত্ব শরীয়ত প্রদত্ত একটি গুণ, যা খণ্ডিত হয় না। সুতরাং প্রত্যেকের জন্য তা পুর্ণ রূপে সাব্যস্ত হবে। যেমন বোনকে বিবাহ দানের ব্যাপারে দুই ভাইয়ের কর্তৃত্ব এর কারণ এই যে, অসির দায়িত্ব হচ্ছে স্থলাভিষিক্ত হওয়া। আর স্থলাবিষিক্ত হওয়া। আর স্থলাভিষিক্ত হওয়া তখনই সাব্যস্ত হবে, যখন তার দিকে কর্তৃত্ব সেইভাবে স্থানান্তরিত হবে, যেভাবে অসি নিয়োগকারীর জন্য সাব্যস্ত ছিল। আর তার জন্য তা পূর্ণতার গুণসহ সাব্যস্ত ছিল।

তাছাড়া পিতার তাদের দু'জনকে নির্বাচন করা প্রমাণ করে যে, উভয়ের প্রত্যেকেই ওয়ারিছদের প্রতি স্নেহগুণের বিষয়ে বিশিষ্ট। সুতরাং এটাকে প্রত্যেকের আত্মীয়তা সম্পর্কের পর্যায়ভুক্ত ধরা হবে।

তারফায়নের যুক্তি এই যে, অসির হস্তক্ষেপের কর্তৃত্ব লাভ হয় (মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে তা) অর্পণ দ্বারা। সুতরাং অর্পণের প্রকৃতি বিবেচনায় রাখতে হবে। আর তাহলো উভয়ের একত্র হওয়ার গুণ। কারণ এটা অর্থবহ শর্ত। আর অসি নিয়োগকারী দু'জন ছাড়া সম্মত হয়নি,আর একজন দু'জনের মত নয়। পক্ষান্তরে বিবাহ দানের ক্ষেত্রে দু'ভাইয়ের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, সেখানে কারণ হলো নিকটাত্মীয়তা, আর তা উভয়ের মাঝে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান রয়েছে।

তাছাড়া বিবাহ দান হচ্ছে ওয়ালীর উপর মেয়ের প্রাপ্য হক। এমনকি যদি সমকক্ষ কোন পাত্র মেয়ের জন্য পায়গাম দেয়, আর মেয়ে তাকে সেখানে বিবাহ দেয়ার জন্য ওয়ালীর কাছে দাবী জানায়, তাহলে তা করার ওয়ালীর উপর অবশ্য কর্তব্য হয়ে যায়।

পক্ষান্তরে এখানে অসি একক ইচ্ছাধিকারী হয়ে থাকে। মোট কথা, প্রথম ক্ষেত্রে দু'ভাইয়ের একজন অপর জনের উপর সাব্যস্ত হক আদায় কেরেছে। সুতরাং তা সহীহ হবে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে দুই অসির একজন অপর জনের প্রাপ্য হক নিজে নিজে উশুল করেছে। কেননা, হস্তক্ষেপের কর্তৃত্ব উভয়ের ছিল। সুতরাং সে যখন একা অপরজনের হক-এ হস্তক্ষেপ করলো তখন তা সহীহ হবে না। এই মাসআলার মুল হচ্ছে দু'জনের দেনা একজনের আদায় করে দেয়া এবং দু'জনের পাওয়া ঋণ (একজনের উশুল করে নেয়া।)

পক্ষান্তরে উপরে উল্লেখিত বিষয়গুলো ভিন্ন। কেননা, সেগুলো হচ্ছে অনিবার্য প্রয়োজনভুক্ত বিষয়, কর্তৃত্বভুক্ত বিষয় নয়। আর অনিবার্য প্রয়োজনভুক্ত বিষয় গুলো সর্বদা ব্যতিক্রম হয়ে থাকে। আর তা হলো ঐ সকল ছূরত যা ইমাম কুদূরী (র) কিতাবে ব্যতিক্রম রূপে উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন ঃ

তবে মৃত ব্যক্তির কাফন ক্রয় করা এবং তার দাফনের ব্যবস্থা করা।

কেননা, এক্ষেত্রে বিলম্ব করায় মৃতব্যক্তির লাশ নষ্ট হওয়ার আশংকা রয়েছে। একারণেই বিলম্ব হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবেশীদের হস্তক্ষেপ করার অধিকার রয়েছে।

এবং ছোটদের খাদ্য ও পোষাক খরিদ করা।

কেননা, অনাহারে ও বিনা বস্ত্রে তার প্রাণহানির আশংকা রয়েছে।

তদ্রূপ স্বয়ং গচ্ছিত দ্রব্য ফেরত দেয়া এবং গছবকৃত বস্তু ফেরত দেয়া এবং চুক্তি দ্বারা ক্রয়কতৃ বস্তু ফেরত দেয়া এবং মাল হিফাজত করা এবং ঋণ পরিশোধ করা।

কেননা, এগুলো কর্তৃত্বভুক্ত বিষয় নায়। মালিক এবং ঋণের পাওনাদার যখন তাদের মালের সবশ্রেণীর বস্তু নাগালে পেয়ে যায়, তাহলে তখন তারা সেগুলোর মালিকানা দখল করতে পারে। আর মাল তার হাতে পড়ে, সে-ই তা হিফাজত করতে পারে। সুতরাং একজনের হিফাজত করার অর্থ হলো অপর জনকে সাহায্য করা। তাছাড়া এসকল ক্ষেত্রে মতামত প্রয়োগের প্রয়োজন পড়ে না।

আর সুনির্দিষ্ট অসিয়ত কার্যকর করা এবং দুনির্দিষ্ট গোলামকে আযাদ করা।

কেননা, এক্ষেত্রে মতামত প্রয়োগের প্রয়োজন নেই।

আর মৃতব্যক্তির পক্ষ হতে কারো বিপক্ষে মামলা পরিচালা করা।

কেননা, এক্ষেত্রে কাযীর মজলিসে একত্র হওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। একারণেই দুই ওকীলের একজন এককভাবে মামলা পরিচালনা করতে পারে।

আর হেবা ও দান গ্রহণ করা।

কেননা, তা হাতছাড়া হওয়ার আশংকা রয়েছে। তাছাড়া মা এবং বাচ্চা যার প্রতিপালনে আছে, সে তা করতে পারে। সুতরাং তা কর্তৃত্বভুক্ত বিষয় হলো না।

আর এমন জিনিস বিক্রি করা, যা নষ্ট হওয়ার আশংকা রয়েছে।

কেননা, এ বিষয়ে অনিবার্য প্রয়োজন রয়েছে, যা কারো অজানা নয়।

আর বিক্ষিপ্ত মাল একত্র করে সংরক্ষণ করা।

কেননা, বিলম্বে তা নষ্ট হওয়ার আশংকা রয়েছে। তাছাড়া যার হাতে তা পড়বে, তারই সেটা সংরক্ষণ করার অধিকার রয়েছে। সুতরাং এটা কর্তৃত্বভুক্ত বিষয় হলো না।

আর 'জামে ছাগীর' কিতাবে রয়েছে যে, দুই একজনের কিছু বিক্রি করার বা পাওনা তাগাদা করার অধিকার নেই। এখানে তাগাদা অর্থ কবযা বা হস্তগত করা। তাদের লোক প্রচলনে শব্দটি দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য হতো। (আমাদের লোক প্রচলনে শব্দটির অর্থ হলো চাপ দেয়া।)

এর কারণ এই যে, নিয়োগকারী কবযা করার ক্ষেত্রে তাদের উভয়ের সম্মিলিত আমানতদারিতে সম্মত রয়েছে। (একক আমানতদারিতে সম্মত নয়।) তাছাড়া এটা হলো বিনিময় গুণ সম্পন্ন বিশেষত্ব। শ্রেণী ভিন্নতার ক্ষেত্রে, যথাস্থানে তা আলোচিত হয়েছে। সুতরাং এটা কর্তৃত্বভুক্ত বিষয় হলো।

আর যদি প্রত্যেককে স্বতন্ত্রভাবে অসি নিযুক্ত করে, তাহলে কারো কারো মতে, আলাদাভাবে নিযুক্ত দুই ওকীলের মত অসী দ্বয়ের প্রত্যেকে এককভাবে হস্তক্ষেপ করতে পারবে।

এর কারণ এই যে, আলাদাভাবে নিযুক্ত করার অর্থ এই যে, একজনের মতামত ও বিচক্ষণতার প্রতি সে সন্তুষ্ট রয়েছে। আর কারো কারো মতে, উভয় ক্ষেত্রে একই মত পার্থক্য রয়েছে। কেননা, অসি-দায়িত্ব মৃত্যুর সময় সাব্যস্ত হচ্ছে,(সুতরাং তা যুগপৎ সাব্যস্ত হচ্ছে।) ওকীল দ্বয়ের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, ওকালাতের সাব্যস্ত হওয়া আগে-পরে হতে পারে।

আর যদি দু'জনের একজন মারা যায়, তাহলে কাযী তার স্থলে অন্য একজনকে নিযুক্ত করবে না।

তারফায়নের মতে এর কারণ এই যে, (অধিকার গতভাবে) অবশিষ্ট জন একক হস্তক্ষেপে অপরাগ। সুতরাং মৃত ব্যক্তির কল্যাণ রক্ষার্থে কাযী অবশিষ্ট অসির সঙ্গে অন্য একজন অসিকে যুক্ত করে দেবেন, তার অক্ষমতার ক্ষেত্রে।

আর ইমাম ইউসুফ (র)-এর মতে অসিদ্বয়ের জীবিতজন যদিও একক হস্তক্ষেপে সক্ষম, কিন্তু অসি নিয়োগকারীর উদ্দেশ্য ছিল যে, তার হক সমূহ রক্ষার বিষয়ে দু'জন হস্তক্ষেপকারীকে তার স্থলাভিষিক্ত রূপে রেখে যাবেন। আর মৃত অসির স্থলে অন্য একজন অসি নিযুক্ত করার মাধ্যমে তার উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন করা সম্ভব।

আর মৃত অসি যদি জীবিত অসিকে নিজের পক্ষ হতে অসি নিযুক্ত করে যায়, তাহলে প্রকাশিত বর্ণনা মতে জীবিত অসির একক হস্তক্ষেপের অধিকার থাকবে, অন্য একজনকে অসি নিযুক্ত করার ক্ষেত্রে যেমন হয়ে থাকে।

এক্ষেত্রে কাযীর অন্য অসি নিয়োগ করার প্রয়োজন হবে না। কেননা, মৃত অসির মতামত তার স্থলাভিষিক্ত জীবিত অসির মতামতের মাধ্যমে গুণগতভাবে বিদ্যমান রয়েছে।

আর ইমাম আবূ হানীফা (র) হতে (হাসান বিন যিয়াদের সূত্রে) প্রাপ্ত বর্ণনা মতে, জীবিত অসি একক হস্তক্ষেপের অধিকার পাবে না। কেননা, অসি নিয়োগকারী তার একক হস্তক্ষেপে সম্মত ছিল না।

পক্ষান্তরে অন্য একজনকে অসি নিয়োগ করার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা, তখন তার হস্তক্ষেপ দু'জনের মতামতের ভিত্তিতে কার্যকর হবে, যেমন মৃত অসি নিয়োগকারীর ইচ্ছা ছিল।

অসি যদি মারা যায় এবং অন্য একজনকে অসি নিয়োগ করে যায়, তাহলে আমাদের মতে সে মৃত অসির সম্পদের ক্ষেত্রে তার অসি হবে, আবার প্রথম মৃত অসি নিয়োগকারীরও অসি হবে।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেনঃ সে প্রথম মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির ক্ষেত্রে অসি হবে না। তিনি জীবদ্দশায় ওকীল নিয়োগের উপর কিয়াস করে এ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। আর (অসি নিয়োগ ও ওকীল নিয়োগ) উভয়ের মাঝে যোগসূত্র এই যে, প্রথম মৃত ব্যক্তি মৃত অসির মতামতের প্রতি সন্তুষ্ট ছিল, অন্য কারো মতামতের প্রতি নয়।

আমাদের যুক্তি এই যে, মৃত অসি তার দিকে স্থানান্তরিত কর্তৃত্ব বলেই হস্তক্ষেপ করছে। সুতরাং(ঐ কর্তৃত্ব বলে) সে অন্যকে অসি নিয়োগ করারও অধিকার হবে। (এতীমদের জন্য) দাদার ক্ষেত্রে যেমন হয়ে থাকে। লক্ষণীয় যে, অসি নিয়োগকারীর যে, কর্তৃত্ব বিদ্যমান ছিল, তা মালের ক্ষেত্রে অসির দিকে স্থানান্তরিত হয়েছে, আর জানের ক্ষেত্রে(অর্থাৎ এতীমের দেহসত্তার ক্ষেত্রে) দাদার দিকে স্থানান্তরিত হয়েছে। আর দাদার দিকে যা স্থানান্তরিত হয়েছে, সে বিষয়ে সে পিতার স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। সুতরাং অসির ক্ষেত্রেও তাই হবে।

এর কারণ এই যে, অসি নিয়োগ করার অর্থ হলো, যে বিষয়ে তার কর্তৃত্ব ছিল, সে বিষয়ে অন্যকে তার স্থলাভিষিক্ত করা। আর অসির মৃত্যুর সময় উভয় পরিত্যক্ত সম্পত্তিতেই কর্তৃত্ব ছিল। সুতরাং উভয় ক্ষেত্রেই দ্বিতীয় অসিকে প্রথম অসির স্থানে অবস্থান প্রদান করা হবে।

তাছাড়া মূল অসি নিয়োগকারী তার সম্পত্তির বিষয়ে তাকে অসি নিয়োগ করেছে, অথচ তার জানা ছিল যে, অসি নিজে তার নিয়োগকারীর উদ্দেশ্য পূর্ণ করার আগেই তার মৃত্যু হতে পারে। আর উদ্দেশ্য হচ্ছে তার পক্ষ হতে যে ত্রুটি হয়ে গেছে, তার সংশোধন করা। সুতরাং তাতে বোঝা যায় যে, (মৃত্যুর সময়) অসি কর্তৃক অন্যকে অসি নিয়োগের বিষয়ে সে সম্মত আছে।

ওকীলের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা মুআক্কিল তো জীবিত রয়েছে। ফলে নিজের উদ্দেশ্য নিজেই সাধন করা তার পক্ষে সম্ভব। সুতরাং ওকীল কর্তৃক অন্যকে ওকীল নিযুক্ত করার (বা তার মৃত্যুর সময়) কাউকে অসি নিযুক্ত করার বিষয়ে সে সম্মত হবে না।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন ঃ ওয়ারিছদের স্থলবর্তী হয়ে, তাদের পক্ষ হতে অসি কর্তৃক অসিয়তপ্রাপ্ত ব্যক্তির সাথে ভাগাভাগি করা বৈধ। পক্ষান্তরে অসিয়তপ্রাপ্ত ব্যক্তির পক্ষ হতে ওয়ারিছদের সাথে অছির ভাগাভাগি করা বৈধ নয়, বাতিল।

কেননা ওয়ারিছ মৃত ব্যক্তির স্থলাভিষিক্ত, তাই মৃত ব্যক্তির খরিদ করা বস্তু ওয়ারিছ দোষজনিত কারণে ফেরত দিতে পারে, আবার মৃত ব্যক্তির বিক্রি করা বস্তু দোষের কারণে ওয়ারিছের কাছে ফেরত দেয়া যায় এবং মুরিছ বা মৃত ব্যক্তির খরিদ করার কারণে ওয়ারিছকে ধোঁকাগ্রস্ত গণ্য করা হয়।[১]

তদ্রূপ অসিও মৃত ব্যক্তিরও স্থলাভিষিক্ত। সুতরাং ওয়ারিচের অনুপস্থিতিতে তার পক্ষ হতে সে বাদী বা বিবাদী হবে। সুতরাং ওয়ারিছের বিপক্ষে তার বন্টন সিদ্ধ হবে। এমন কি ওয়ারিছ যদি উপস্থিত হয়, আর দেখে যে, অসির হাতে তার যে প্রাপ্য অংশ ছিল, তা নষ্ট হয়ে গেছে, তাহলে সে অসিয়তপ্রাপ্ত ব্যক্তির শরীকদার হতে পারবে না।

পক্ষান্তরে অসিয়তপ্রাপ্ত ব্যক্তি সবদিক থেকে মৃত ব্যক্তির খলীফা বা স্থলাভিষিক্ত নয়। কেননা সে নতুন একটি কারণ তথা অসিয়ত দ্বারা উক্ত মালের মালিক হয়েছে। এ কারণেই সে দোষজনিত কারণে ফেরত দিতে পারে না এবং তার কাছে ফেরত দেয়া যায় না। আর অসিয়তকারীর খরিদ করার কারণে তাকে ধোকাগ্রস্ত গণ্য করা হয় না। সুতরাং তার অনুপস্থিতিতে অসি তার স্থলাভিষিক্ত (রূপে তার পক্ষ হতে বিবাদী) হবে না। সুতরাং যদি বন্টনের পর তার জন্য আলাদা করে রাখা মাল অসির কাছে থাকা অবস্থায় নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে অবশিষ্ট মালের (যা ওয়ারিছের কাছে রয়েছে) এক-তৃতীয়াংশ তার প্রাপ্য হবে। কেননা কৃত বন্টন তার বিপক্ষে কার্যকর হয়নি। তবে অসি উক্ত মালের দায় বহনকারী হবে না। কেননা সে ঐ মালের ক্ষেত্রে আমীন বা আমানত রক্ষক এবং পরিত্যক্ত সম্পত্তি সংরক্ষণের কর্তৃত্ব তার ছিল। সুতরাং বন্টনের পূর্বে পরিত্যক্ত সম্পত্তির অংশবিশেষ ধ্বংস হওয়ার মতই তা হবে এবং অবশিষ্ট মালের এক-তৃতীয়াংশ অসিয়তপ্রাপ্ত ব্যক্তির প্রাপ্য হবে। কেননা সে ওয়ারিছের শরীকদার। সুতরাং শরীকানা মালের যা কিছু ধ্বংস হবে তা শরীকানা হিসাবেই ধ্বংস হবে। আর যা বাকি থাকবে, তা শরীকানা হিসাবেই বাকি থাকবে।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন ঃ অসি যদি ওয়ারিছদের সাথে ভাগাভাগি করে এবং অসিয়তপ্রাপ্ত ব্যক্তির অংশ হাতে নেয়, তারপর (তার হাতে থাকা অবস্থায়) তা ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে অবশিষ্ট মাল থেকে এক-তৃতীয়াংশ সে আদায় করে নেবে।

এর কারণ সেটাই, যা আমরা বর্ণনা করেছি।

আর মৃত ব্যক্তি যদি একটি হজ্জের অসিয়ত করে, আর অসি ওয়ারিছদের সাথে মীরাছি সম্পত্তি ভাগাভাগি করে এক-তৃতীয়াংশ নিয়ে নেয় এবং তার হাতে থাকা মাল ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে অবশিষ্ট মালের এক-তৃতীয়াংশ থেকে মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে হজ্জ আদায় করা হবে।

---

১. মুরিছ যদি একটি দাসী খরীদ করে, এবং তার মৃত্যুর পর তা ওয়ারিছের অধিকারে আসে, আর ওয়ারিছ তার সঙ্গে সহবাসের কারণে সন্তান হয়, তারপর দাসীর দাবীদার আত্মপ্রকাশ করে, তাহলে দাবীদার দাসীর মালিক হবে, কিন্তু সন্তানের মালিক হবে না, বরং সন্তান আযাদ হয়ে যাবে। কেননা ওয়ারিছ ধোঁকাগ্রস্ত হয়েছে। স্বয়ং মুরিছ এ অবস্থার সম্মুখীন হলে তাকেও ধোঁকাগ্রস্ত গণ্য করা হতো। আর ওয়ারিছ যদি মুরিছ এর স্থলাভিষিক্ত না হতো, তাহলে তাকে ধোঁকাগ্রস্ত গণ্য করা হতো না।

একই বিধান হবে যদি অসি মৃত ব্যক্তির পক্ষ হতে হজ্জ করার জন্য কোন লোকের হাতে অসিয়তকৃত মাল অর্পণ করে, আর ঐ লোকের হাতে তা ধ্বংস হয়ে যায়।

আর ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন ঃ নষ্ট হয়ে যাওয়া মাল যদি সম্পদের এক-তৃতীয়াংশকে বেষ্টনকারী হয়, তাহলে সে কিছুই পুনঃগ্রহণ করতে পারবে না। আর যদি বেষ্টনকারী না হয়, তাহলে এক-তৃতীয়াংশ পূর্ণ হওয়ার পরিমাণ পুনঃগ্রহণ করতে পারবে।

আর ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন ঃ কোন অবস্থাতেই সে পুনঃগ্রহণ করতে পারবে না। কেননা এই বন্টন ছিল অসিয়তকারীর হক, অথচ অসিয়তকারী নিজে যদি তার পক্ষ হতে হজ্জ করানোর জন্য অসিয়ত পরিমাণ মাল আলাদা করে নিত, আর ঐ মাল ধ্বংস হয়ে যেতো, তাহলে তার উপর নতুন কোন মাল অপরিহার্য হতো না। বরং অসিয়ত বাতিল হয়ে যেত। সুতরাং তার স্থলাভিষিক্ত অসির মাল আলাদা করার পরও একই বিধান হবে।

ইমাম আবু ইউসুফ (র) এর যুক্তি এই যে, অসিয়তের প্রয়োগক্ষেত্র হলো সম্পদের এক তৃতীয়াংশ। সুতরাং অসিয়তের ক্ষেত্র যতক্ষণ বিদ্যমান থাকবে, ততক্ষণ অসিয়ত কার্যকর করা আবশ্যক হবে। আর এক-তৃতীয়াংশ যদি বাকি না থাকে, তখন অসিয়তের ক্ষেত্র বিলুপ্ত হওয়ার কারণে অসিয়ত বাতিল হয়ে যাবে।

ইমাম আবু হানীফা (র) এর যুক্তি এই যে, বন্টন নিজস্ব কারণে উদ্দেশ্য হয় না, বরং বন্টনের উদ্দেশ্য তথা হজ্জ আদায়ের প্রয়োজনে তা করা হয়। সুতরাং হজ্জ আদায় না হওয়া ছাড়া বন্টন বিবেচ্য হবে না। আর বিষয়টি বন্টনের পূর্বে মাল ধ্বংস হওয়ার মত হল। সুতরাং অবশিষ্ট মালের এক তৃতীয়াংশ থেকে হজ্জ করানো হবে।

তাছাড়া বন্টনের পূর্ণতা হয় নির্দিষ্ট খাতে মাল ব্যয় করা দ্বারা। কেননা ঐ মালের কোন দখল গ্রহলকারী নেই। সুতরাং ঐ খাতে যতক্ষণ ব্যয় না হবে, ততক্ষণ বন্টন পূর্ণ হবে না। ফলে তা বন্টনের পূর্বে ধ্বংস হওয়ার মতই হলো।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন ঃ কেউ যদি তিন হাজার দিরহামের অসিয়ত করে, আর ওয়ারিছগণের কাযীর হাতে তা অর্পণ করে, আর কাযী তা বন্টন করেন,আর পুরো সময় অসিয়তপ্রাপ্ত ব্যক্তি অনুপস্থিত থাকে, তাহলে তার বন্টন বৈধ হবে।

কেননা অসিয়ত বিশুদ্ধ হয়েছে। এ কারণেই তো অসিয়ত কবূল করার পূর্বেই যদি অসিয়তপ্রাপ্ত ব্যক্তি মারা যায়, তাহলে সেটা তার ওয়ারিছদের মীরাছ হয়ে যায়। আর কাযীকে (মুসলমানদের যাবতীয় বিষয়ের) তত্ত্বাবধায়করূপে নিযুক্ত করা হয়েছে: বিশেষত: মৃতদের এবং অনুপস্থিত লোকদের ক্ষেত্রে।

আর কল্যাণ রক্ষা ও তত্ত্বাবধানের অংশ হলো অনুপস্থিত ব্যক্তির হিসসা আলাদা করে রাখা এবং (তার পক্ষ হতে) তা কবযা করে রাখা। সুতরাং কাযীর এ পদক্ষেপ কার্যকর হবে এবং সিদ্ধ হবে। এমন কি অনুপস্থিত ব্যক্তি যদি উপস্থিত হয়, আর

কবযাকৃত বস্তু ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে ওয়ারিছদের উপর তার কোন দাবী-দাওয়া থাকবে না।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন, পাওনাদারদের উপস্থিতি ছাড়া অসি যদি মীরাছী সম্পদের কোন গোলাম বিক্রি করে, তাহলে তা বৈধ হবে।

কেননা অসি হচ্ছে মৃত ব্যক্তির স্থলাভিষিক্ত। আর মৃত ব্যক্তি তার জীবদ্দশায় নিজে যদি বিক্রয় সম্পাদন করতো, তাহলে পাওনাদারদের অনুপস্থিতিতেও তা বৈধ হতো, এমন কি মৃত্যু রোগের অবস্থায় করলেও। সুতরাং তার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি যদি তা করে, তাহলে তা বৈধ হবে।

এটা এ কারণে যে, পাওনাদারদের 'হক'-এর সম্পর্ক হলো বস্তুর সম্পদগুলোর সাথে; বস্তুর বস্তুসত্তার সাথে নয়, আর বিক্রয় বস্তুর সম্পদগুণ বাতিল করে না, কেননা তা স্থলবর্তী রেখে হাতছাড়া হয়। আর সেটা হলো বস্তুর বিক্রয় মূল্য। ঋণগ্রস্ত গোলামের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা পাওনাদারদের তাকে উপার্জনে নিযুক্ত করার অধিকার রয়েছে। কিন্তু এখানে অবস্থা তা থেকে ভিন্ন।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন ঃ কেউ যদি অসিয়ত করে যে, তার গোলামকে বিক্রি করে তার বিক্রয়মূল্য যেন মিসকীনদের মাঝে সাদাকা করা হয়, আর অসি গোলামকে বিক্রি করে মূল্য হস্তগত করে, তারপর তার হাতে তা নষ্ট হয়ে যায়, এরপর গোলামের হকদার বের হয়ে আসে, তাহলে অসি ক্রেতার অনুকূলে মূল্যের দায় বহন করবে।

কেননা সে-ই হচ্ছে বিক্রয় চুক্তি সম্পাদনকারী। সুতরাং চুক্তির দায়-দায়িত্ব তার উপরই বর্তাবে। আর এটিও চুক্তির একটি দায়। কেননা ক্রেতা বিক্রয় দ্রব্য তার অনুকূলে নিরাপদ থাকবে বলেই মূল্য ব্যয় করতে সম্মত হয়েছে। অথচ বিক্রয় দ্রব্য নিরাপদ থাকেনি। সুতরাং (সাব্যস্ত হল যে,) অসি অন্যর মাল তার সম্মতি ছাড়া গ্রহণ করেছে। সুতরাং তা ফেরত দেয়া তার অবশ্য কর্তব্য হবে।

আর সে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে তা আদায় করে নেবে।

কেননা সে মৃত ব্যক্তির অনুকূলে কাজ করছে। সুতরাং তার মাল থেকেই তা আদায় করে নেবে। ওকীলের ক্ষেত্রে যেমন হয়ে থাকে। ইমাম আবু হানীফা (র) প্রথম দিকে বলতেন ঃ সে মৃত ব্যক্তির মাল থেকে কিছু নেবে না। কেননা সে বিক্রয় মূল্য কবযা করার কারণে দায় গ্রহণ করেছে। পরে তিনি আমাদের উল্লেখকৃত মতের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছেন।

আর সে সমগ্র পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে আদায় করে নেবে।

ইমাম মুহম্মদ (র) হতে বর্ণিত রয়েছে যে, সে একতৃতীয়াংশ থেকে আদায় করে নেবে। কেননা এই আদায় করাটা অসিয়তের সূত্রে হচ্ছে। সুতরাং তা অসিয়তের বিধান গ্রহণ করবে। আর অসিয়তের ক্ষেত্র হচ্ছে এক-তৃতীয়াংশ।

প্রকাশিত বর্ণনার যুক্তি এই যে, সে ধোঁকাগ্রস্থতার সূত্রে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে তা আদায় করে নেবে। আর তা মৃত ব্যক্তির উপর ঋণ রূপে ছিল। আর ঋণ সমগ্র পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে পরিশোধ করা হয়।

পক্ষান্তরে কাযী বা তাঁর নিযুক্ত 'আমীন' যদি বিক্রয় সম্পাদন করে, তাহলে বিষয়টি ভিন্ন হবে। অর্থাৎ তার উপর কোন দায় সাব্যস্ত হবে না। কেননা কাযীর উপর দায় আরোপ করার অর্থ হলো 'বিচার-ব্যবস্থা' অচল করে দেয়া। কেননা দণ্ড চেপে বসার আশংকায় বিচার দায়িত্বের আমানত হবন করা হতে সবাই বিরত থাকবে। ফলে জনস্বার্থ বিপন্ন হবে। আর কাযীর নিযুক্ত 'আমীন' হচ্ছে কাযীর নিযুক্ত দূত। বার্তাবাহকের বিষয়টি যেমন হয়ে থাকে। কিন্তু অসির বিষয়টি তেমন নয়। কেননা সে ওকীলের পর্যায়ভুক্ত। আর 'বিচার অধ্যায়ে' বিষয়টি আলোচিত হয়েছে।

আর মীরাছ সম্পত্তি যদি ধ্বংস হয়ে গিয়ে থাকে; কিংবা পর্যাপ্ত সম্পত্তি না থাকে, তাহলে অসি কারো কাছ থেকে আদায় করে নিতে পারবে না। মৃত ব্যক্তির উপর অন্য ঋণ থাকলে যেমন হয়ে থাকে।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন ঃ অসি যদি মীরাছ বন্টন করে, আর অপ্রাপ্ত বয়স্ক কোন ওয়ারিছের ভাগে একটি গোলাম পড়ে, এরপর অসী গোলামটিকে বিক্রি করে তার মূল্য হস্তগত করে এবং তা তার হাতে ধ্বংস হয়ে যায়, আর গোলামের কোন হকদার বের হয়, তাহলে অসি (ক্রেতার অনুকূলে যে দায় বহন করবে, সেটা) অপ্রাপ্ত বয়স্ক ওয়ারিছের মাল থেকে তা আদায় করে নেবে।

কেননা সে তার হয়ে কাজ করেছে; আর অপ্রাপ্ত বয়স্ক তার অন্যান্য ওয়ারিছের কাছ থেকে তার হিস্‌সা রুজু করবে। কেননা সে যা পেয়েছিল, তার হকদার বের হওয়ার কারণে বন্টন ভেঙ্গে গেছে।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন ঃ অসি যদি (কোন ব্যক্তির কাছে ঋণবাবদ প্রাপ্য) এতীমের মালের ব্যাপারে 'হাওয়ালা' গ্রহণ করে, তাহলে এতীমের জন্য এটা কল্যাণজনক হলে জাইয হবে।

যেমন 'হাওয়ালা' বহনকারীর অধিক স্বচ্ছল হওয়া। কেননা অসির কর্তৃত্ব হলো কল্যাণভিত্তিক। আর যদি 'হাওয়ালাকারী' ব্যক্তি অধিকতর স্বচ্ছল হয়, তাহলে অসির 'হাওয়ালা' গ্রহণ করা জাইয হবে না। কেননা এতে আংশিকভাবে হলেও (অর্থাৎ আদায়ের বিলম্বের দিক থেকে হলেও) এতীমের মাল নষ্ট করা হয়েছে।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন ঃ অসির ক্রয়-বিক্রয় এমন মূল্যেই শুধু জাইয হবে, যাতে মানুষ সাধারণত: ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে।

কেননা অতিরিক্ত ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে কল্যাণের দিক নেই। পক্ষান্তরে সাধারণ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার বিষয়টি ভিন্ন। কেননা তা পরিহার করা সম্ভব নয়। সুতরাং তা বিবেচনা করার অর্থ ক্রয়-বিক্রয়ের দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়া। ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে অনুমতিপ্রাপ্ত বালক, অনুমতিপ্রাপ্ত গোলাম এবং মুকাতাবের অর্ধেক ক্ষতিগ্রস্ত

হওয়া সত্ত্বেও ক্রয়-বিক্রয় জাইয হবে। কেননা তারা মালিকানার ভিত্তিতে হস্তক্ষেপ করে, কারণ অনুমতির অর্থ নিষেধাজ্ঞা রহিত করণ। অসির বিষয়টি ভিন্ন। কেননা সে কল্যাণভিত্তিক শরীয়ত অনুমোদিত স্থলাভিষিক্ত হওয়ার ভিত্তিতে হস্তক্ষেপ করে। সুতরাং তার বৈধতা কল্যাণের ক্ষেত্র দ্বারা আবদ্ধ হবে।

সাহেবায়নের মতে, তারা তা করতে পারবে না। কেননা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও ক্রয়-বিক্রয়ে হস্তক্ষেপ করার অর্থ স্বেচ্ছায় দান করা, যার কোন প্রয়োজন নেই। আর তারা স্বেচ্ছায় দান করার যোগ্যতা সম্পন্ন নয়।

অসির নামে 'ক্রয়-পত্র' লেখার সময় 'অসিয়ত পত্র' আলাদা এবং 'ক্রয়পত্র' আলাদা লিখতে হবে। কেননা সেটাই সাক্ষী-পত্রের শেষে তফসীল ছাড়াই তার সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করবে। ফলে সেটা তাকে মিথ্যা কথনের দোষী বানাবে।

আর কেউ কেউ বলেছেন ঃ এভাবে লিখতে হবে, 'অমুকের পুত্র অমুক থেকে ক্রয় করেছে'। এভাবে লেখা যাবে না 'অমুকের অসি অমুকের কাছে থেকে ক্রয় করেছে'। এর কারণ আমরা বর্ণনা করেছি।

আর কারো কারো মতে, এতে কোন অসুবিধা নেই। কেননা "অসায়া' বা অসির দায়িত্বের বিষয়টি প্রকাশ্যেই জানা থাকে।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন ঃ অনুপস্থিত প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির ক্ষেত্রে অসির যেকোন জিনিস বিক্রয় বৈধ, তবে স্থাবর সম্পত্তি নয়।

কেননা পিতাও প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের কর্তৃত্বের অধিকারী নয়, এছাড়া অন্য সব কিছু বিক্রয়ের কর্তৃত্ব তার রয়েছে। সুতরাং এক্ষেত্রে পিতার নিযুক্ত অসিও একই রকম কর্তৃত্ব লাভ করবে।

অবশ্য কিয়াসের দাবী ছিল এই যে, অসি অস্থাবর সম্পত্তিও বিক্রি করার অধিকারী হবে না। কেননা, প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের ক্ষেত্রে পিতা (প্রকৃত কর্তৃত্বের সূত্রে) তা বিক্রি করার অধিকারী নয়। তবে সূক্ষ্ম কিয়াসের ভিত্তিতে আমরা তা বৈধ করেছি।

কেননা সেগুলো তাড়াতাড়ি নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনার কারণে বিক্রি করাতেই সংরক্ষণ হয়। আর মূল্য সংরক্ষণ করা অধিকতর সহজ। আর অসি সংরক্ষণের অধিকারী। পক্ষান্তরে স্থাবর সম্পত্তি স্বকীয়ভাবেই সংরক্ষিত।

অসি অর্পিত সম্পদে ব্যবসা করতে পারবে না।

কেননা, সংরক্ষণ করার দায়িত্ব তার উপর অর্পণ করা হয়েছে, ব্যবসা করার দায়িত্ব নয়।

ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহম্মদ (র) বলেন ঃ পিতার নিযুক্ত অসি প্রাপ্তবয়স্ক অনুপস্থিত সন্তানের ক্ষেত্রে যে কর্তৃত্ব লাভ করবে, ভাইয়ের নিযুক্ত অসিও অপ্রাপ্ত বয়স্ক ভাই এবং প্রাপ্ত বয়স্ক অনুপস্থিত ভাইয়ের ক্ষেত্রে সেই কর্তৃত্ব লাভ করবে। মাতার নিযুক্ত অসি এবং চাচার নিযুক্ত অসি সম্পর্কেও একই কথা।

এই সিদ্ধান্ত হলো এদের (অর্থাৎ ভাই, মা ও চাচার) মীরাছি সম্পত্তির ক্ষেত্রে। কেননা তাদের নিযুক্ত অসি তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়ে থাকে। আর সংরক্ষণভুক্ত যাবতীয় পদক্ষেপ তারা নিজেরা গ্রহণ করতে পারে। সুতরাং তাদের অসি তা পারবে।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন ঃ অপ্রাপ্ত বয়স্কের সম্পত্তি পরিচালনার ব্যাপারে পিতার নিযুক্ত অসি দাদার চেয়ে বেশী হকদার।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন ঃ দাদা বেশী হকদার হবে। কেননা পিতার অনুপস্থিতিতে দাদাকে শরীয়ত পিতার স্থলাভিষিক্ত করেছে। এমনকি দাদা সমগ্র মীরাছের অধিকারী হতে পারে। সুতরাং দাদাকে পিতার নিযুক্ত অসির উপর অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

আমাদের যুক্তি এই যে, অসি নিযুক্ত করার মাধ্যমে পিতার কর্তৃত্ব অসির দিকে স্থানান্তরিত হয়। সুতরাং গুণগতভাবে পিতার কর্তৃত্ব বিদ্যমান রয়েছে। তাই তাকে দাদার উপর অগ্রাধিকার দেয়া হবে, যেমন স্বয়ং পিতাকে দাদার উপর অগ্রাধিকার দেয়া হয়।

এটা এজন্য যে, দাদার বিদ্যমানতার বিষয়টি অবগত হওয়া সত্ত্বেও অসিকে নির্বাচন করা প্রমাণ করে যে, অসির হস্তক্ষেপ তার সন্তানদের জন্য তার পিতার চেয়ে অধিক কল্যাণজনক হবে।

আর পিতা যদি অসি নিযুক্ত না করে, তাহলে দাদা পিতার পর্যায়ভুক্ত হবে।

কেননা দাদা হলো তার নিকটতম মানুষ এবং তার প্রতি স্নেহশীলতম মানুষ। এ কারণেই দাদা তাকে বিবাহ দেয়ার অধিকারী, অসি নয়। তবে আমাদের বর্ণিত কারণে আর্থিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে পিতার নিযুক্ত অসিকে দাদার উপর অগ্রাধিকার দেয়া হয়।

পরিচ্ছেদ ঃ সাক্ষ্য প্রসঙ্গে

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন ঃ দু'জন অসি যদি সাক্ষ্য দেয় যে, মৃত ব্যক্তি অমুককে তাদের সঙ্গে অসি নিযুক্ত করেছে, তাহলে সাক্ষ্য বাতিল হবে। কেননা, যেহেতু তারা নিজেদের সহযোগী সাব্যস্ত করছে, সেহেতু এ বিষয়ে তারা অভিযুক্ত হবে।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন ঃ তবে সাক্ষ্যপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি তা দাবী করে; (তাহলে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে।)

এটা সূক্ষ্ম কিয়াসের সিদ্ধান্ত। সাধারণ কিয়াসের দাবী অনুযায়ী এটা প্রথম মাসআলার মতই। এর কারণ অভিযোগের আশংকা, যা আমরা বর্ণনা করেছি।

সূক্ষ্ম কিয়াসের যুক্তি এই যে, সূচনাতেই কাযীর অসি নিয়োগের কর্তৃত্ব রয়েছে, আবার অসিদ্বয়ের সাক্ষ্য ছাড়াই অন্য একজনকে তার সম্মতিক্রমে তাদের সঙ্গে যুক্ত করার কর্তৃত্ব রয়েছে। সুতরাং তাদের সাক্ষ্য দ্বারা কাযীর উপর থেকে নির্ধারণের দায় ও

কষ্ট রহিত হবে। এরপর অসায়া (বা অসি-দায়িত্ব) সাব্যস্ত হবে কাযীর নিযুক্ত করা দ্বারা, তাদের সাক্ষ্য দ্বারা নয়।)

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন ঃ পুত্রদ্বয়ের ব্যাপারেও একই কথা।

অর্থাৎ পুত্রদ্বয় যদি সাক্ষ্য দেয় যে, মৃত ব্যক্তি অমুককে অসি নিযুক্ত করেছে, আর অমুক তা অস্বীকার করে। কেননা, মীরাছী সম্পত্তির তত্ত্বাধায়ক নিয়োগের মাধ্যমে তারা নিজেদের জন্য সুবিধা টেনে আনতে চাচ্ছে।

আর যদি অসিদ্বয় অপ্রাপ্ত বয়স্ক ওয়ারিছের অনুকূলে মৃত ব্যক্তির কোন মাল সম্পর্কে, কিংবা অন্য কোন মাল সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় যে, (বালক এটার মালিক), তাহলে তাদের সাক্ষ্য বাতিল হবে।

কেননা 'সাক্ষ্য-বস্তু'তে তারা নিজেদের জন্য হস্তক্ষেপের কর্তৃত্ব প্রমাণ করতে চাচ্ছে।

আর যদি অসিদ্বয় প্রাপ্তবয়স্ক ওয়ারিছের অনুকূলে মৃত ব্যক্তির কোন মাল সম্পর্কে সাক্ষ্য দেয় যে, (সে এটার মালিক), তাহলে সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। পক্ষান্তরে মৃত ব্যক্তির মাল ছাড়া অন্য কারো মাল সম্পর্কে সাক্ষ্য দিলে তা গ্রহণযোগ্য হবে।

এটা ইমাম আবু হানীফা (র)-এর অভিমত। আর সাহেবায়ন বলেন ঃ প্রাপ্তবয়স্ক ওয়ারিছের অনুকূলে সাক্ষ্য প্রদান করলে, উভয় ক্ষেত্রেই তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে।

কেননা ওয়ারিছরা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার অবস্থায় (এই সাক্ষ্য দ্বারা) তাদের অনুকূলে মীরাছি সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপের কর্তৃত্ব সাব্যস্ত হচ্ছে না। সুতরাং তাদের সাক্ষ্য অভিযোগের সম্বাবনা থেকে মুক্ত।

ইমাম আবু হানীফা (র)-এর যুক্তি এই যে, তাদের অনুকূলে সংরক্ষনের কর্তৃত্ব সাব্যস্ত হবে এবং ওয়ারিছের অনুপস্থিতিতে অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের কর্তৃত্ব সাব্যস্ত হবে। সুতরাং তাতে অভিযোগের সম্ভাবনা সাব্যস্ত হবে।

পক্ষান্তরে অসির মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি ছাড়া অন্য কারো মালের ব্যাপারে সাক্ষ্য দানের বিষয়টি ভিন্ন। কেননা ঐ মালের ব্যাপারে পিতার নিযুক্ত অসির কর্তৃত্ব নেই। কারণ মৃত ব্যক্তি (বা পিতা) তাকে নিজের পরিত্যক্ত সম্পদে স্থলাভিষিক্ত করেছে, অন্য সম্পদের ক্ষেত্রে নয়।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন ঃ দু'জন লোক যদি কোন মৃত ব্যক্তির বিপক্ষে দু'জন লোকের অনুকূলে এক হাজার দিরহাম ঋণের সাক্ষ্য দেয়, তাহলে উভয় পক্ষের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি প্রত্যেক দল অপর দলের অনুকূলে এক হাজার দিরহাম অসিয়তের সাক্ষ্য দেয়, তাহলে তা জাইয হবে না।

এটা ইমাম আবু হানীফা ও মুহম্মদ (র)-এর অভিমত। আর ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন ঃ ঋণের ক্ষেত্রেও গ্রহণযোগ্য হবে না।

খাস্সাফ (র)-এর উল্লেখ মতে, ইমাম আবু হানীফা (র) ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর সঙ্গে রয়েছেন। আবার ইমাম আবু ইউসুফ (র) হতে ইমাম মুহম্মদ (র)-এর অনুরূপ মত বর্ণিত হয়েছে।

গ্রহণযোগ্য হওয়ার যুক্তি এই যে, ঋণ (কোন বস্তুসত্তায় সাব্যস্ত হয় না বরং) যিম্মায় (দায়রূপে) সাব্যস্ত হয়। আর যিম্মা বা দায় বিভিন্ন হক গ্রহণ করার যোগ্যতাসম্পন্ন। সুতরাং (উক্ত মালের ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের মাঝে) কোন শরীকানা সাব্যস্ত হয় না।

এ কারণেই তো যদি কোন তৃতীয় ব্যক্তি দুই পক্ষের কোন এক পক্ষের ঋণ (নিজের মাল থেকে) স্বেচ্ছায় পরিশোধ করে দেয়, তাহলে অপর পক্ষের তাতে শরীকানা দাবী করার হক নেই।

আর সাক্ষ্য প্রত্যাখ্যান করার যুক্তি এই যে, মৃত্যুর কারণে ঋণের সম্পর্ক পরিত্যক্ত সম্পত্তির সাথে হয়ে যায়। কেননা 'যিম্মা বা দায়' মৃত্যুর মাধ্যমে বিলুপ্ত হয়ে যায়। এ কারণেই তো দু'পক্ষের কোন এক পক্ষ যদি মিরাছি সম্পত্তি থেকে তাদের হক উশুল করে, তাহলে অপর পক্ষ তাতে শরীকদার হয়ে যায়। সুতরাং তাদের সাক্ষ্য শরীকানার হক সাব্যস্তকারী হচ্ছেএল অভিযোগের সম্ভাবনা সাব্যস্ত হয়ে গেল। ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির জীবদ্দশার অবস্থাটি ভিন্ন।

কেননা তার 'যিম্মা বা দায়' বিদ্যমান থাকার কারণে ঋণ তার যিম্মায় সাব্যস্ত হবে, তার মালে সাব্যস্ত হবে না। সুতরাং উভয় পক্ষের মরীকানা সাব্যস্ত হবে না।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন ঃ দু'জন যদি এই মর্মে সাক্ষ্য দেয় যে, মৃত ব্যক্তি ঐ দু'জনের জন্য তার দাসী সম্পর্কে অসিয়ত করেছে, আর সাক্ষীপ্রাপ্ত ব্যক্তিদ্বয় তাদের সাক্ষ্য দেয় যে, মৃত ব্যক্তি সাক্ষীদ্বয়ের জন্য তার গোলাম সম্পর্কে অসিয়ত করেছে, তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে উভয় পক্ষের সাক্ষ্য বৈধ হবে।

কেননা এখানে শরীকানা নেই। সুতরাং অভিযোগের সুযোগ নেই।

আর যদি তারা সাক্ষ্য দেয় যে, মৃত ব্যক্তি এ দু'জনের জন্য তার সম্পদের এক তৃতীয়াংশ সম্পর্কে অসিয়ত করেছে, আর সাক্ষ্যপ্রাপ্ত দু'জন সাক্ষ্য দিল যে, মৃত ব্যক্তি সাক্ষীদ্বয়ের জন্য তার সম্পদের একতৃতীয়াংশ সম্পর্কে অসিয়ত করেছে, তাহলে সাক্ষ্য বাতিল হবে। তদ্রূপ যদি প্রথম দু'জন এই সাক্ষ্য দেয় যে, মৃত ব্যক্তি এই দু'জনের জন্য গোলাম সম্পর্কে অসিয়ত করেছে, আর সাক্ষ্যপ্রাপ্ত দু'জন এ সাক্ষ্য দেয় যে, মৃত ব্যক্তি প্রথম দু'জনের জন্য তার সম্পদের একতৃতীয়াংশ সম্পর্কে অসিয়ত করেছে, তাহলে সাক্ষ্য বাতিল হবে।

কেননা এই অবস্থাতেও সাক্ষ্য শরীকানা সাব্যস্তকারী হচ্ছে।

كِتَابُ الْخُنْثٰى
অধ্যায় ঃ নপুংষক

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْخُنْثٰى

অধ্যায় ঃ নপুংষক প্রসঙ্গ

পরিচ্ছেদ ঃ নুপুংষক-এর পরিচয়

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ নবজাতকের যদি **পুরুষাঙ্গ ও স্ত্রী-অঙ্গ দু'টোই বিদ্যমান থাকে, তাহলে তাকে খুনছা বা নপুংষক বলে। যদি সে পুরুষাঙ্গ দ্বারা পেশাব করে, তাহলে সে বালক বলে গণ্য হবে, আর যদি স্ত্রী অঙ্গ দ্বারা পেশাব করে, তাহলে স্ত্রীলোক বলে গণ্য হবে।**

কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, কীভাবে তাকে মীরাছের ভাগ দেয়া হবে ? তিনি বললেন ঃ যে পথে সে পেশাব করে. সে পথটা বিবেচ্য হবে। আর আলী (রা) থেকেও এ সম্পর্কে অনূরূপ বর্ণিত হয়েছে।

তাছাড়া যুক্তিগত প্রমাণ এই যে, পেশাব যে অঙ্গ থেকেই হোক, তা প্রমাণ করে যে, এটাই সুস্ত ও মূল অঙ্গ, আর অন্যটা দোষ ও খুঁতের পর্যায়ভুক্ত।

আর যদি দু'পথেই পেশাব করে, তাহলে যে পথে পেশাব আগে আসে, সেটার অনুকূলে বিধান হবে।

কেননা এটা আরেকটা প্রমাণ যে, এটাই হচ্ছে মূল অঙ্গ।

আর উভয় অঙ্গ যদি অগ্রবর্তিতার সমান হয়, তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে আধিক্যের বিষয়টি বিবেচ্য নয়, আর সাহেবায়ন বলেন ঃ অধিকতর পেশাবওয়ালা পথের দিকে সে সম্বন্ধযুক্ত হবে।

কেননা এটা ঐ অঙ্গের শক্তির নিদর্শন এবং সেটা মূল অঙ্গ হওয়ার আলামত। তাছাড়া শরীয়তের মূলনীতিতে অধিকাংশকে সমগ্রের বিধান প্রদান করা হয়। সুতরাং আধিক্য দ্বারা অগ্রাধিকার লাভ করব।

ইমাম আবু হানীফা (র)-এর যুক্তি এই যে, পেশাব বের হওয়ার আধিক্য শক্তি প্রমাণ করে না। কেননা তা কখনো একটি পথের প্রশস্ততা এবং অন্য পথের সংকীর্ণতার কারণে হয়। আর যদি উভয় পথ দিয়ে সমান পরিমাণে বের হয়, তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে সে 'জটিল-খুন্‌ছা'। কেননা এখানে অগ্রাধিকার নির্ধারক কিছু নেই।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ খুনছা যখন প্রাপ্তবয়স্ক হবে এবং তার দাড়ী গজাবে কিংবা স্ত্রীলোকের সঙ্গে সহবাসে সক্ষম হবে, তখন সে পুরুষ বলে গণ্য হবে। তদ্রূপ যদি তার পুরুষের মত স্বপ্নদোষ হয়, কিংবা বুক সমতল হয়। কেননা এগুলো পুরুষ হওয়ার আলামত।

আর যদি তার স্ত্রীলোকের মত স্তন স্ফীত হয়, কিংবা তার বুকে দুধ নামে, কিংবা হায়যগ্রস্তা হয়, কিংবা গর্ভবতী হয়, কিংবা তার স্ত্রী-অঙ্গে সঙ্গম করা সম্ভব হয়, তাহলে সে স্ত্রীলোক বলে গণ্য হবে।

কেননা এগুলো স্ত্রীলোকদের আলামত।

আর যদি প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তার মধ্যে এসকল আলামতের কোনটি প্রকাশ না পায়, তাহলে সে 'জটিল-খুন্‌ছা' বলে গণ্য হবে। তদ্রূপ যদি এসকল আলামত পরস্পর বিরোধী রূপে প্রকাশ পায়, তাহলেও সে 'জটিল-খুন্‌ছা' রূপে গণ্য হবে।

পরিচ্ছেদ ঃ খুনছা-এর বিধান প্রসঙ্গে

'জটিল-খুনছা' সম্পর্কে মূলনীতি এই যে, তার ক্ষেত্রে দ্বীনি বিষয়গুলোতে অধিকতর সতর্কতাপূর্ণ ও দৃঢ়তাপূর্ণ দিকটি গ্রহণ করা হবে, এবং এমন কোন বিধান সাব্যস্ত হওয়ার ফায়সালা দেয়া হবে না, যার সাব্যস্ত হওয়া সম্পর্কে সন্দেহ রয়েছে।

ইমাম কুদূরী (র) বলেন ঃ খুনছা যখন ইমামের পেছনে দাঁড়াবে, তখন সে পুরুষ ও নারীদের কাতারের মাঝে দাঁড়াবে।

কেননা, তার স্ত্রীলোক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং সে পুরুষদের মধ্যবর্তী হবে না, যাতে পুরুষদের নামায নষ্ট না হয়। আবার স্ত্রীলোকদেরও মধ্যবর্তী হবে না। কেননা তার পুরুষ হওয়ার সম্ভাবনা আছে, তখন তার নিজের নামায নষ্ট হবে।

আর যদি সে স্ত্রীলোকদের কাতারে দাঁড়ায়, তাহলে তার নামায দোহরানো আমার কাছে ভাল মনে হয়।

কেননা তার পুরুষ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

আর যদি সে পুরুষদের কাতারে দাঁড়ায়, তাহলে তার নামায পূর্ণ হবে। আর তার ডান পাশে ও বাম পাশে দাঁড়িয়েছে এবং তার বরাবর পেছনে যে দাঁড়িয়েছে, তারা সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে তাদের নামায পুনরায় আদায় করবে।

কেননা তার স্ত্রীলোক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

আর আমাদের কাছে ভাল মনে হয় যে, সে মুখে নেকাব রেখে নামায পড়বে।

কেনননা তার স্ত্রীলোক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

আর নামাযে সে স্ত্রীলোকদের মত বসবে।

কেননা যদি সে পুরুষ হয়, তাহলে সুন্নত তরক করলো, যা সামগ্রিকভাবে জাইয রয়েছে। পক্ষান্তরে যদি সে স্ত্রীলোক হয়, তাহলে তো মাকরূহ-এ লিপ্ত হলো। কেননা স্ত্রীলোকদের জন্য যথাসম্ভব সতর রক্ষা করা ওয়াজিব।

আর যদি সে নেকাব ছাড়া নামায পড়ে, তাহলে আমি তাকে নামায দোহরাতে বলবো।

কেননা সে স্ত্রীরোক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

আর এ আদেশ হলো মুস্তাহাব হিসাবে। সুতরাং যদি না দোহরায়, তাহলে যথেষ্ট হবে।

আর যদি তার সম্পদ থাকে, তাহলে তার জন্য একটি দাসী খরিদ করা হবে, যে তার খতনা করবে।

কেননা, সে পুরুষ হোক বা নারী, তার গুপ্তাঙ্গের দিকে তাকানো তার দাসীর জন্য মুবাহ হবে। আর কোন পুরুষের জন্য তার খতনা করা মাকরূহ হবে। কেননা হতে পারে সে স্ত্রীলোক। তদ্রূপ কোন স্ত্রীলোকের জন্য তার খতনা করা মাকরূহ হবে। কেননা হতে পারে সে পুরুষ। সুতরাং আমরা যা বলেছি, তাতেই সতর্কতা রয়েছে।

আর যদি তার সম্পদ না থাকে, তাহলে ইমাম বাইতুল মাল থেকে তার জন্য একটি দাসী ক্রয় করবেন।

কেননা মুসলমানদের প্রয়োজনের জন্যই তো বাইতুল মাল প্রস্তুত করা হয়েছে।

আর যখন সে তার খতনা সম্পন্ন করবে, তখন তাকে বিক্রি করে তার মূল্য বাইতুল মালে ফিরিয়ে দেয়া হবে।

কেননা তার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে।

আর সারা জীবন তার জন্য অলংকার ও রেশমী পোশাক পরিধান করা এবং পুরুষদের সামনে কিংবা স্ত্রীলোকদের সামনে খোলামেলা হওয়া, এবং গায়রে মাহরাম নারী বা যুরুষের সাথে একান্ত হওয়া, কিংবা পুরুষ মাহরাম ছাড়া সফর করা, তার জন্য মাকরূহ হবে। হারামের সম্ভাবনা থেকে বাঁচার জন্য এ বিধান।

আর যদি সে বয়ঃসন্ধিক্ষণে ইহরাম বাঁধে, সেক্ষেত্রে ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন, তার পোশাক সম্পর্কে আমার কিছু জানা নেই। কেননা সে পুরুষ হলে সেলাই করা কাপড় পরা তার জন্য মাকরূহ হবে; আর স্ত্রীলোক হলে সেলাই করা কাপড় বাদ দেয়া মাকরূহ হবে।

আর ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন ঃ সে স্ত্রীলোকের পোশাক পরিধান করবে। কেননা স্ত্রীলোক অবস্থায় সেলাই করা কাপড় বাদ দেয়া, পুরুষ অবস্থায় সেলাই করা কাপড় পরার চেয়ে জঘন্য। তবে তার উপর কোন দণ্ড আসবে না। কেননা সে প্রাপ্তবয়স্ক হয়নি।

আর কেউ যদি একথা বলে, স্ত্রী তালাকের বা গোলাম আযাদের মাঝে করে যে, 'তুমি প্রথম যে সন্তানটি প্রসব করবে, তা যদি ছেলে হয়, এরপর দেখা গেল যে, সে খুনছা প্রসব করেছে, তাহলে তালাক বা আযাদী সাব্যস্ত হবে না; যতক্ষণ না খুনছার পরিচয় স্পষ্ট না হয়। কেননা খুনছাত্ব সন্দেহ দ্বারা সাব্যস্ত হয় না। আর যদি সে বলে ঃ আমার প্রতিটি গোলাম আযাদ, কিংবা যদি বলে ঃ আমার প্রতিটি দাসী আযাদ, আর তার মালিকানাধীনে একটি খুনছা থাকে, তাহলে সে আযাদ হবে না; যতক্ষণ না তার বিষয়টি পরিষ্কার হয়। কারণ সেটাই -যা আমরা বর্ণনা করেছি।

আর যদি উভয় কথা একসঙ্গে বলে, তাহলে খুনছা আযাদ হয়ে যাবে। কেননা দু'টি অবস্থার একটির বিষয়ে নিশ্চয়তা রয়েছে। কারণ সে তো উভয় গুণ থেকে খালি নাছয়।

আর খুনছা যদি বলে ঃ আমি পুরুষ কিংবা আমি নারী, তাহলে 'জটিল-খুনছা' অবস্থায় তার কথা গ্রহণ করা হবে না। কেননা তা এমন দাবী, যা দ্বীনের দাবীর বিপরীত। পক্ষান্তরে যদি 'জটিল-খুন্ছা' না হয়, তাহলে তার কথা গ্রহণযোগ্য হওয়া উচিত। কেননা নিজের অবস্থা সে অন্যের চেয়ে ভাল জানবে।

আর যদি তার অবস্থা পরিষ্কার হওয়ার আগে সে মারা যায়, তাহলে পুরুষ বা নারী কেউ তাকে গোসল দেবে না। কেননা পুরুষ ও নারীর মাঝে গোসল দেয়ার বৈধতা সাব্যস্ত নয়। সুতরাং হারাম হওয়ার সম্ভাবনার কারণে তা পরিহার করা হবে, এবং গোসল দেয়া অসম্ভব হওয়ার কারণে মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করানো হবে। আর সে যদি বয়ঃসন্ধিক্ষণে উপনীত হয়, তাহলে সে পুরুষ বা নারীর গোসলের সময় উপস্থিত হবে না। কেননা তার পুরুস বা নারী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

আর তাকে কবর দেয়ার সময় যদি তার কবর পর্দা দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়, তাহলে সেটা অতি উত্তম। কেননা সে যদি নারী হয়, তাহলে আমরা একটা ওয়াজিব আদায় করলাম, আর যদি পুরুষ হয়, তাহলে পর্দা ঘেরাও করা তার জন্য ক্ষতিকর হবে না।

আর তার মৃত্যুর পর যদি তার এবং একজন পুরুষের এবং একজন স্ত্রীলোকের জানাযা পড়া হয়, তাহলে পুরুষকে ইমামের সংলগ্ন স্থানে রাখা হবে এবং খুনছাকে তার পেছনে রাখা হবে, আর স্ত্রীলোকটিকে খুনছারও পেছনে রাখা হবে। অর্থাৎ তার স্ত্রীলোক হওয়ার সম্ভাবনার কারণে তাকে পুরুষ থেকে পেছনে রাকা হবে; আবার পুরুষ হওয়ার সম্ভাবনার কারণে তাকে স্ত্রীলোকের আগে রাখা হবে।

আর যদি কোন ওযরের কারণে তাকে একজন পুরুষের সঙ্গে একই কবরে দাফন করা হয়, তাহলে খুনছাকে পুরষের পেছনে (অর্থাৎ পুরুষকে কেবলার পাশে) রাকা হবে। কেননা তার নারী হওয়ার সম্ভাবনা আছে; উভয়ের মাঝে মাটির আড়াল রাখা হবে।

আর যদি তাকে কোন স্ত্রীলোকের সাথে কবর দেয়া হয়, তাহলে খুন্ছাকে আগে রাখা হবে। কেননা তার পুরুষ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

আর যদি জানাযার খাটে স্ত্রীলোকদের মত আবরণ দেয়া হয়, তাহলে আমার কাছে তা অধিক প্রিয়।

কেননা তার স্ত্রীলোক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং তাকে স্ত্রীলোকের মত পাঁচ কাপড়ে কাফন দেয়া আমার কাছে অধিক প্রিয়। কেননা, সে যদি স্ত্রীলোক হয়, তাহলে তো সুন্নত পালন করা হলো, আর যদি পুরুষ হয়, তাহলে তিন কাপড়ের বেশী হলো, আর তাতে কোন অসুবিধা নেই।

আর যদি তার পিতা মারা যায় এবং একজন পুত্র সন্তান রেখে যায়, তাহলে ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে মীরাছ সম্পত্তি উভয়ের মাঝে তিন ভাগে ভাগ হবে। পুত্রের জন্য দুই ভাগ এবং খুনছার জন্য এক ভাগ; অর্থাৎ ইমাম আবু হানীফা (র) এর মতে মীরাছের ক্ষেত্রে সে স্ত্রীলোক বলে গণ্য হবে, তবে যদি অন্য অবস্থা প্রকাশ পায়।

আর সাহেবায়ন বলেন ঃ খুনছা পুরুষের মীরাছের অর্ধেক এবং নারীর অর্ধেক পাবে। ইমাম শা'বী (র) এরও এই মত। আর ইমাম শা'বী (র) এর মতামতের হিসাব সম্পর্কে আলিমগণের মতপার্থক্য রয়েছে।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন ঃ উভয়ের মাঝে সম্পত্তি বারো ভাগে বন্টিত হবে। পুত্রের জন্য সাত ভাগ আর খুনছার জন্য পাঁচ ভাগ।

আর ইমাম আবু ইউসুফ (র) বলেন ঃ সম্পত্তি উভয়ের মাঝে সাত ভাগে বণ্টিত হবে। পুত্রের জন্য চার ভাগ এবং খুনছার জন্য তিন ভাগ।

কেননা একা অবস্থায় পুত্র সমগ্র মীরাছ পায়, আর খুনছা পায় তিন-চতুর্থাংশ। সুতরাং উভয়ের একত্র হওয়ার অবস্থায়, উভয়ের মাঝে তাদে হক-এর পরিমাণ অনুযায়ী বন্টন করা হবে। খুনছা পাবে তিন-এর হিসাবে, আর পুত্র পাবে চার এর হিসাবে। সুতরাং মোট সাত ভাগ হবে।

ইমাম মুহম্মদ (র) এর যুক্তি এই যে, খুনছা যদি পুরুষ হয়, তাহলে উবয়ের মাঝে মাল অর্ধেক করে ভাগ হবে। পক্ষান্তরে খুনছা যদি মেয়ে হয়, তাহলে উভয়ের মাঝে মাল তিনভাগে ভাগ হবে। সুতরাং আমাদের এমন একটি সংখ্যার প্রয়োজন হয়েছে, যার অর্ধেক ও এক তৃতীয়াংশ মিলে যায়। আর এমন সর্বনিম্ন সংখ্যা হলো ছয়। সুতরাং এক অবস্থায় সম্পত্তি উভয়ের মাঝে অর্ধেক করে বন্টিত হবে, প্রত্যেকের জন্য তিন ভাগ। আর অন্য অবস্থায় এক তৃতীয়াংশ হারে খুনছার দুই ভাগ তো নিশ্চিতভাবে সাব্যস্ত থাকবে, শুধু অতিরিক্ত ভাগের ব্যাপারে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। সুতরাং সেটাকে অর্ধেক করা হবে। আর খুনছা পাবে দুই ভাগ ও অর্ধেক। এভাবে ভগ্নতা দেখা দিল, আর এই ভগ্নতা দূর করার জন্য ভাগ দ্বিগুণ করা হলো এবং এভাবে হিসাব বারোতে গিয়ে দাঁড়ালো। খুনছার জন্য পাঁচভাগ এবং পুত্রের জন্য সাত ভাগ।

ইমাম আবু হানীফা (র) এর যুক্তি এই যে, এখানে প্রথমে প্রয়োজন হলো মালের 'অংশ-পরিমাণ' সাব্যস্ত করা। আর সর্বনিম্ন পরিমাণটি অর্থাৎ মেয়ের অংশটি হচ্ছে

নিশ্চিত, তার অতিরিক্ত যা তাতে সন্দেহ রয়েছে। সুতরাং সুনিশ্চিতকে সাব্যস্ত করে তার উপরই আমরা সীমাবদ্ধ রেখেছি। কেননা মাল সন্দেহ দ্বারা সাব্যস্ত হয় না। আর বিষয়টি এমন হলো, যেন অন্য কোন কারণ দ্বারা হিসসা অবশ্য সাব্যস্ত হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। সেক্ষেত্রেও সুনিশ্চিত পরিমাণকে গ্রহণ করা হয়, এটাও তেমন হবে।

তবে অবস্থা যদি এই হয় যে, খুনছাকে ছেলে ধরলে সে যে হিসসা পায়, সেটাই সর্বনিম্ন হিসসা হয়, তাহলে খুনছাকে ছেলের হিসসা দেয়া হবে।

এর ছূরত এই যে, মৃতা স্ত্রীর ওয়ারিছরা হলো —স্বামী, মা, একজন আপন বোন, আর সেই হলো খুনছা।

কিংবা মৃত স্বামীর ওয়ারিছরা হলো—স্ত্রী, বৈপিত্রীয় দুই ভাই এবং আপন বোন, আর সেই হলো খুনছা।

সুতরাং আমাদের মতে প্রথম মাসআলায় স্বামীর প্রাপ্য হলো অর্ধেক, এবং মায়ের প্রাপ্য হলো এক তৃতীয়াংশ এবং অবশিষ্ট হলো খুনছার প্রাপ্য। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় ছূরতে স্ত্রীর প্রাপ্য হলো এক-চতুর্তাংশ এবং বৈপিত্রীয় দুই ভাইয়ের প্রাপ্য হলো এক-তৃতীয়াংশ এবং অবশিষ্ট হলো খুনছার প্রাপ্য। (অবশিষ্টটুকুই তাকে দেয়া হবে)। কেননা উভয় হিসসার মধ্যে এটাই হলো স্বল্পতর।

সঠিক বিষয় আল্লাহ্ই অধিক জানেন।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেছেন ঃ বোবা ব্যক্তিকে যদি তার অসিয়তনামা পড়ে শোনানো হয়, এরপর তাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, আমরা কি এই পত্রে যা কিছু আছে সে সম্পর্কে তোমার নামে সাক্ষ্য দিব ? তখন সে মাথা নেড়ে হাঁ বলে, কিংবা লিখে দেয়, সুতরাং তার পক্ষ হতে যদি এমন ইংগিত আসে, যা দ্বারা বোঝা যায় মুখে শুধু জগড়তা আছে, তার ক্ষেত্রে তা জাইয হবে না।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন ঃ উভয় অবস্থায় তা জাইয হবে। কেননা বাক অক্ষমতাই হলো বৈধতা দানকারী। আর অক্ষমতা উভয় অবস্থাকেই অন্তর্ভুক্ত করে। আর জন্মগত ও উদ্ভূত অবস্থার মাঝে কোন পার্থক্য নেই। যেমন (জবাই ছাড়া) হালাল হওয়ার ক্ষেত্রে বন্যপ্রাণী এবং বন্যতাগ্রস্ত পালিত পশুর মাঝে কোন পার্থক্য নেই।

আমাদের ইমামগণের মতপার্থক্যের কারণ এই যে. ইশারাকে তখনই কথা বলে বিবেচনা করা হবে. যখন তা সুপরিচিত ও সুপরিজ্ঞাত হয়। আর তা হলো বোবা ব্যক্তির ইশারা. জিহ্বার জড়তা সম্পন্ন ব্যক্তির ইশারা নয়। এমনকি কারো জড়তা যদি দীর্ঘস্থায়ী হয়ে যায়, এবং তার ইশারা সমূহ সুনির্দিষ্ট ও সুপরিজ্ঞাত হয়ে যায়, তাহলে আলিমগণের মতে সেও বোবা ব্যক্তির মত হবে।

তাছাড়া ত্রুটিতো এসেছে তার পক্ষ হতে, কেননা সে অসিয়তের বিষয়টি এ সময় পর্যন্ত বিলম্বিত করেছে, বোবা ব্যক্তির পক্ষ হতে তো কোন ত্রুটি নেই।

তাছাড়া উদ্ভূত অবস্থা বিদূরিত হওয়ার মুখে রয়েছে, জন্মগতটা নয়। সুতরাং একটাকে অন্যটার উপর কিয়াস করা চলবে না। আর বিগড়ে যাওয়া পালিত পশুর বিধান আমরা নাস দ্বারা জেনেছি।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন ঃ বোবা ব্যক্তি যদি কোন পত্র লেখে কিংবা ইংগিতে কিছু বলে, যা দ্বারা তার উদ্দেশ্য বোঝা যায়, তাহলে তার বিবাহ করা, তালাক দেয়া, আযাদ করা এবং ক্রয়-বিক্রয় করা জাইয হবে। আর তার জন্য কিসাস গ্রহণ করা হবে এবং তার থেকেও কিসাস গ্রহণ কর হবে। তবে তার উপর 'হদ' বা নির্ধারিত শাস্তি জারি করা হবে না এবং তার অনুকূলেও 'হদ' গ্রহণ করা হবে না।

আর লেখার বিষয়ে কারণ এই যে, কাছের লোকের ক্ষেত্রে সম্বোধন যেমন, দূরের লোকের জন্য লেখাও তেমনি। লক্ষণীয় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবলীগের দায়িত্ব কখনো আদায় করেছেন কথায়, এবং অনুপস্থিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে

কখনো লেখায়। আর অনুপস্থিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে লেখার বৈধতাদানকারী হচ্ছে কথা বলার অপারগতা। আর বোবা ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই অপরাগতা হলো স্পষ্টতর ও অনিবার্যতর।

আর লেখায় রয়েছে তিনটি স্তর। ছাপ সম্পন্ন (হাওয়া বা পানিতে নয়) এবং শিরোনামযুক্ত (যেমন অমুকের পক্ষ হতে অমুকের নামে)। আলিমগণের মতে এ ধরনের লেখা উপস্থিত ও অনুপস্থিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে কথার সমতুল্য। দ্বিতীয়তঃ ছাপসম্পন্ন, তবে শিরোনাম যুক্ত নয়, যেমন দেয়ালে কিংবা পাতায়। এক্ষেত্রে লেখকের নিয়ত জিজ্ঞাসা করা হবে। কেননা তা স্পষ্ট ইংগিতের সতুল্য। সুতরাং এক্ষেত্রে নিয়তের উপস্থিতি জরুরী। তৃতীয়তঃ ছাপবিহীন, যেমন হাওয়ায় বা পানিতে লেখা। এটা অশ্রুত ও কথার মত। সুতরাং তা দ্বারা কোন বিধান সাব্যস্ত হবে না।

আর ইশারাকে বোবা ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই সকল বিধানের (বিবাহ ইত্যাদির) ব্যাপারে প্রয়োজনের কারণে প্রমাণ সাব্যস্ত করা হয়েছে। কেননা এ সকল বিধান হচ্ছে বান্দার হক সম্পর্কিত। আর তা এক শব্দ বাদ দিয়ে অন্য শব্দের সঙ্গে নির্দিষ্ট নয়। (বরং যে কোন শব্দ দ্বারা এবং যেকোন ভাষার শব্দ দ্বারা তা সম্পন্ন হতে পারে)। এমনকি কখনো শব্দ ছাড়াও হয়ে থাকে। আর কিসাস ও বান্দার হক এবং হদ-এর ক্ষেত্রে প্রয়োজন নেই। কেননা এর সম্পর্ক হলো আল্লাহর হকের সঙ্গে। তাছাড়া তা সন্দেহ দ্বারা রহিত হয়ে যায়। আর হতে পারে যে, সে (অর্থাৎ বোবা ব্যক্তি) অপবাদ আরোপকারীকে সত্যায়ন করেছে। সুতরাং সন্দেহের কারণে হদ কার্যকর করা হবে না। তদ্রূপ ইশারায় অপবাদ প্রদানের ক্ষেত্রেও হদ আরোপ করা হবে না। কেননা সুস্পষ্টরূপে অপবাদ পাওয়া যায়নি। অথচ তা হলো শর্ত।

আর হদ ও কিসাসের মাঝে পার্থক্য এই যে, হদ এমন বিবরণ দ্বারা সাব্যস্ত হয় না, যাতে সন্দেহ রযেছে।

লক্ষণীয় যে, যদি 'হারাম-সহবাস' শব্দ যোগে সাক্ষ্য দেয়, কিংবা 'হারাম-সহবাস' শব্দযোগে স্বীকারোক্তি করে, তাহলে সন্দেহের কারণে তাতে হদ জারী হয় না। পক্ষান্তরে যদি নিঃশর্ত হত্যা শব্দযোগে সাক্ষ্য দেয় বা স্বীকারোক্তি করে, তাহলে কিসাস জারী হয়, যদিও ইচ্ছাকৃতভাবে শব্দটি সেখানে উচ্চারিত না হয়।

এর কারণ এই যে, কিসাস-এর মাঝে বিনিময়ের অর্থ রয়েছে। কেননা এটাকে ক্ষতিপূরণরূপে শরীয়ত কর্তৃক অনুমোদন করা হয়েছে। সুতরাং সন্দেহসহ তা সাব্যস্ত হতে পারে। বান্দার হক সম্পর্কিত অন্যান্য বিনিময় সমূহের ক্ষেত্রে যেমন হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে খালেছ আল্লাহর হক সম্পর্কিত হদগুলো শাসনকারী ও হঁশিয়ারকারী রূপে শরীয়ত কর্তৃক অনুমোদন করা হয়েছে। তাতে বিনিময়ের অর্থ নেই। সুতরাং প্রয়োজন না থাকার কারণে সন্দেহের সাথে তা সাব্যস্ত হবে না।

মাবসূত গ্রন্থের ইকরার বা স্বীকারোক্তি অধ্যায়ে ইমাম মুহম্মদ (র) উল্লেখ করেছেন যে, অনুপস্থিত ব্যক্তির পক্ষ হতে আসা পত্র তার উপর সাব্যস্ত হওয়া কিসাসের ক্ষেত্রে

প্রমাণ নয়। হতে পারে যে, এখানেও একই বিধান। তখন তাতে দু'টি বর্ণনা সাব্যস্ত হবে। আবার হতে পারে যে, বোবা ব্যক্তির বিষয়টি ঐ অনুপস্থিত ব্যক্তি থেকে ভিন্ন। কেননা বাকশক্তি বিদ্যমান থাকার কারণে সামগ্রিকভাবে অনুপস্থিত ব্যক্তির মৌখিক বক্তব্য লাভ করা সম্ভব। পক্ষান্তরে বোবা ব্যক্তির বিষয়টি তেমন নয়। কেননা প্রতিবন্ধক বিপদের কারণে তার মৌখিক বক্তব্য লাভ করা সম্ভব নয়।

আর মাসআলাটি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, লিখতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও ইশারা বিবেচ্য হবে।

আমাদের কোন কোন মাশায়েখ যেমন ধারণা করেছেন তেমন নয় যে, লেখার উপর সক্ষমতার অবস্থায় ইশারা বিবেচ্য হবে না। তাদের যুক্তি এই যে, এটা হলো জরুরী কালীন প্রমাণ। আর এখানে এর প্রয়োজন নেই।

তাদের ধারণা ভুল হওয়ার কারণ এই যে, মুহম্মদ (র) লেখা ও ইশারা উভয়কে সমান বলে একত্র করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন ঃ ইশারা করুক কিংবা লিখুক।

আর দু'টো সমান হওয়ার কারণ এই যে, উভয়ের প্রতিটি জরুরী কালীন প্রমাণ। কেননা লেখায় অতিরিক্ত স্পষ্টতা আছে, যা ইশারায় নেই। ইশারায় এমন অতিরিক্ত বিষয় রয়েছে, যা লেখায় নেই। কেননা কলমের চিহ্নের চেয়ে ইশারা-কথায় অধিকতর নিকটবর্তী। সুতরাং দু'টো সমান হয়ে গেল।

অনুরূপ ঐ ব্যক্তির বিধান, যে একদিন বা দুই দিন কোন উদ্ভূত কারণে নির্বাক হয়েছিল।

এর কারণ সেটাই, যা আমরা মুখের জড়তাসম্পন্ন ব্যক্তি সম্পর্কে বলেছি যে, বাকযন্ত্র তো বিদ্যমান রয়েছে। আর কেউ কেউ বলেছেন যে, যে ব্যক্তি এক বা দু'দিন নির্বাক থাকে', একথাটা 'জিহ্বার জড়তা সম্পন্ন' ব্যক্তির ব্যাখ্যা।

ইমাম মুহম্মদ (র) বলেন ঃ যদি কিছু বকরী জবাই করা থাকে, আর তার মধ্যে কিছু জবাই ছাড়া মৃত বকরী থাকে, তাহলে যদি জবাইকৃতগুলো সংখ্যায় বেশী হয়, তাহলে তা থেকে বেছে বেছে দেখে শুনে নিয়ে তা খাওয়া যেতে পারে। আর যদি মৃত বকরী বেশী হয়, কিংবা অর্ধেক হয়, তাহলে তা খাওয়া যাবে না।

এই বিধান তখনকার জন্য, যখন অবস্থা স্বাভাবিক হয়। পক্ষান্তরে অনিবার্য প্রয়োজনের অবস্থায় কম বেশী ও সমান এই সমস্ত অবস্থায়ই তা খাওয়া যাবে।

কেননা অনিবার্য প্রয়োজনের অবস্থায় তো নিশ্চিত মৃত জন্তু তার জন্য হালাল হয়ে যায়। সুতরাং যেটি জবাইকৃত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, সেটি তো আরো উত্তম রূপে হালাল হবে। তবে চিন্তা করে বাছাই করবে। কিননা সামগ্রিকভাবে জবাইকৃত পশু পর্যন্ত উপনীত হওয়ার এটাই একমাত্র পন্থা। সুতরাং বিনা প্রয়োজনে তা বাদ দেবে না।

আর শাফেয়ী (র) বলেন ঃ স্বাভাবিক অবস্থায় খাওয়া জাইয হবে না, যদিও জবাইকৃত বকরী সংখ্যায় অধিক হয়। কেননা চিন্তা-ভাবনা হলো জরুরীকালীন সময়ের

প্রমাণ। সুতরাং বিনা প্রয়োজনে সেদিকে যাওয়া যাবে না। আর এখানে প্রয়োজন নেই। কেননা, এখানে হলো স্বাভাবিক অবস্থা।

আমাদের যুক্তি এই যে, বৈধতা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রবলতাকে অনিবার্য প্রয়োজনের পর্যায়ভুক্ত করা হয়। লক্ষণীয় যে, মুসলমানদের বাজার তো হারাম জিনিস, চুরির জিনিস, গসবের জিনিস থেকে খালি হয় না। তা সত্ত্বেও প্রবল অবস্থার উপর ভরসা করে যে কোন জিনিস গ্রহণ করা মুবাহ বা বৈধ রয়েছে। এটা এ কারণে যে, অল্প থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। সুতরাং অসুবিধা দূরীকরণের জন্য তা বিবেচনায় আনার বিষয়টি রহিত হয়েছে। যেমন সামান্য নাজাসাত বা অপবিত্রতা এবং সতর সামান্য খুলে যাওয়া।

পক্ষান্তরে উভয় প্রকার যদি অর্ধেক অর্ধেক হয়, কিংবা মৃত বকরীর সংখ্যা যদি অধিক হয়, তাহলে বিষয়টি ভিন্ন। কেননা সেক্ষেত্রে অনিবার্যতা নেই। আল্লাহ্ই অধিক জানেন এবং তাঁর নিকটেই আমাদের প্রত্যাবর্তন।

॥ চতুর্থ খণ্ড সমাপ্ত ॥

ইফা—২০১৩-২০১৪/অ: স:/৫০৭৬—৩,২৫০